বঙ্গদর্শন।

[নবপর্য্যায়]

মাসিক পত্র।

চতুর্থ বর্ষ।

১৩১১।

লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, গোপালকৃষ্ণ, ৺সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

সহঃ সম্পাদক
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আজি	২৫
আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর	৫০৬
আমি সে জানি	২১৫
ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ	৩০৬, ৩৭২
উৎসবের দিন	৫১৩
এপার-ওপার	৬৫০
কর্সিকাদ্বীপের একটি গল্প	২২৮
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া	৩৮৮
খুড়ামহাশয়	২৮৮
গীতার কালনির্ণয়	১৫
গীতার দর্শন	২১৭
গুরুদক্ষিণা	১৬৩
গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন	১৯৪
গ্রন্থ-সমালোচনা	৬১, ১১১
জয়সঙ্গীত	৬০১
জীবক	২৯৭
তপস্যা	২৭৩
ত্রিবঙ্কুর	৪৬৮, ৫২০, ৫৯৭
ত্রিবঙ্কুররাজ্যে	৪১৫
দিল্লির শিল্পপ্রদর্শনী	৪৭৯
দেশীয় মন্ত্র	৬১০
দেশের কথা	২১০
নবজীবনের আদর্শ	৫৭৮
নমস্কার	২০৯
নিশীথিনী	৩০
নৌকাডুবি	৪৫, ৭১, ১১৩, ১৭৫, ২৬৫, ৩২৩, ৩৩৫, ৩৯১, ৪৩৯, ৫২৬, ৫৪৮, ৫৮৫
পথে	৫৩৭
পাগল	২০৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পুরুষসিংহ	২১৪
পূজার পোষাক	৩৭৫
প্রকৃতির প্রতি	৪৯০
প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তসঙ্কলন	৪০৩
প্রার্থনা	১৩৩, ৫৭১
বঙ্গভাষা বনাম আসামী ভাষা	১৫১
বড়োদারাজ গায়কবাড়	৪৩৮
বংশীধ্বনি	২১৬
বাচ্ছা-চর	৫০০
ব্রাহ্মণ	৪২৫
বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদাবলী	৮৭
বিদ্যাপতির প্রকাশিত পদাবলী	১
বিবাহযাত্রী	৪৭৪
বেদান্তের প্রথমকথা	১৩৮
ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য	৬৪, ১২৫, ১৮৬
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র	১০৭
মলক্কুজাতি তাইমুরী	১৫৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ	৫৭৫
মাধবী	১০৫
মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ	৪৬১
যাত্রা ও থিয়েটার	৩৪৮
য়ুনিভার্সিটি-বিল	১৪৫
রঘুবংশ	৬০৫
রাজা রামমোহন রায়	৫৩৯
রামায়ণের রচনাকাল	৩৫২, ৪৫১, ৫৫৯
রেডিয়ম্	৪২০
লক্ষ্মী-সরস্বতী	৪১৪
শিবাজি-উৎসব	৩১৮
শুভযাত্রা	৩৩৪
সফলতার সদুপায়	৬২২
সংযম	৬২৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র	৪৯১
সাময়িক প্রসঙ্গ	৮১, ১৪৫, ২১০
সারি সত্যের আলোচনা	৫৫, ১৬৮, ৩০১, ৪৩৩, ৪৮৪, ৫২৩
সাহিত্যপ্রসঙ্গ	৯৯, ১৫১
স্বদেশী সমাজ	২৩৮
স্বদেশী সমাজের পরিশিষ্ট	৩১২
স্বীকার	১৬১
স্মৃতিমন্দির	২৬
হনুমান্	৩১
হিন্দুদর্শন	৩৮৫

বিদ্যাপতির প্রকাশিত-পদাবলী।*

১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃতইতিহাস-নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, তাহা লোকপ্রবাদমাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণবাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন। প্রচুর প্রমাণ দ্বারা তিনি যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত হইল।—"(১) মৈথিলভাষায় রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমাদেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালাদেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বিস্ফীগ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগদখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতিলিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃতপুস্তক মিথিলায় প্রচলিত

* বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে পঠিত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ অপ্রকাশিত পদাবলী, জ্যৈষ্ঠসংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবে।

দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতিরচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।” রাজকৃষ্ণবাবুর এই দশটি সিদ্ধান্ত এতাবৎকাল প্রামাণ্য রহিয়াছে, কোনটিই খণ্ডিত অথবা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নাই। দুইটির সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার বংশধরদিগের নিকট আছে, এ কথা আরও অনেকে বলেন; তালপত্রের প্রতিলিপিও প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, কবির রচিত অমূল্য পদাবলী ও তাঁহার রচিত বহুতর সংস্কৃতগ্রন্থের একখানিও পাণ্ডুলিপি অথবা তালপত্র তাঁহার বংশধরদিগের অথবা অপর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, অথচ সম্ভবত সেগুলি তাঁহার বিশেষ আদরের ও যত্নের সামগ্রী ছিল। বিস্ফীগ্রামের দানপত্র-সম্বন্ধেও নূতন তথ্য নিরূপিত হইয়াছে। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধে উক্ত দানপত্রের একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রায় দশবৎসর পরে গ্রিয়ার্সন্ দানপত্রের সম্পূর্ণ প্রতিলিপি পাইয়া *Indian Antiquary* পত্রে প্রকাশ করেন। সে সময় পর্য্যন্ত তিনি মূল দানপত্র দেখিতে পান নাই। কিছুদিন পরে দানপত্রের তাম্রলিপি পাইয়া তাহার প্রতিকৃতি এসিয়াটিক্ সোসাইটির কর্ম্মবিবরণীতে (Proceedings) প্রকাশ করেন। আরও কিছুদিন পরে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন যে, তাম্রলিপি কৃত্রিম, আসল নহে। বোধ হয়, মূল দানপত্রখানি হারাইয়া বা নষ্ট হইয়া যাওয়াতে বিদ্যাপতির কোন বংশধর একখানি নূতন তাম্রলিপি প্রস্তুত করাইয়া থাকিবেন, এবং সেই সময় তাহাতে তারিখের গোল থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বিদ্যাপতির গীতাবলী স্বতন্ত্রপুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, পদকল্পতরুর কবিতাকুসুমও বর্ণাশুদ্ধিকণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রচারিত হইবার দুইবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৮০ সালে, শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র নিজের নাম অপ্রকাশিত রাখিয়া মহাজনপদাবলী হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী স্বতন্ত্র-গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রথমে প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের যথোচিত প্রশংসা হয় নাই। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণী, এমন কি, তাঁহার কৃত অনেক টীকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সে ঋণ স্বীকার করেন নাই, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার সংগৃহীত পাঠ ও তৎকৃত টীকা প্রমাদশূন্য হয় নাই, এবং বিদ্যাপতির জন্মস্থানসম্বন্ধে তাঁহারও ভ্রান্ত ধারণা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বার্থশূন্য উদ্যম ও পরিশ্রমে সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। রাজকৃষ্ণবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ‘প্রাচীনকাব্য-সংগ্রহ’সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদাবাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যা-

পতির পদাবলী সারদাবাবু স্বতন্ত্রপুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অক্ষয়বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিশেষ পারদর্শী ছাত্র, ক্রমে সাহিত্যসমাজেও উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইলেন। সারদাবাবু মেধাবী, সহপাঠীদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া এক্ষণে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহুশাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপরদিকে সপ্তপরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ শিক্ষিতসমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, বটতলার জীর্ণ মলিনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল। যাঁহারা ভারতচন্দ্র রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদের পুত্রগণ এই বৈষ্ণবকবির সমাদর করিতে শিখিলেন। সৌভাগ্য কবির নয়, কারণ বৈষ্ণবভিক্ষুকের ঘরে ও রাজপ্রাসাদে কবির তুল্য প্রীতি। বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত কোন পদে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

> মণি কাদব লপটায় রে।
> তঁই কি তনিক গুণ যায় রে॥

মণি কর্দ্দমলিপ্ত হয়, তাহাতে কি তাহার গুণ যায়? 'কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা?' যে মণি চিনে, সেই সৌভাগ্যশালী। যে শিবসিংহ রাজা বিদ্যাপতিকে গ্রামদান করিয়াছিলেন, কবির পরিচয়েই আজ তাঁহার পরিচয়। কবির পদাবলীতে তাঁহার নাম পুনঃপুন অনুস্যূত না থাকিলে রাজা শিবসিংহকে আজ কে চিনিত? বিদ্যাপতিকে তাঁহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য স্বয়ং গরিমান্বিত হইয়াছে।

সাহিত্যের ভদ্রপল্লীতে বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ হইল, কিন্তু পাঠের, টীকার, অর্থের, অসংখ্য ভ্রম রহিয়া গেল। কারণ নানা, তাহার মধ্যে দুইটি নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথম, ভাষা। বিদ্যাপতির ভাষা প্রাচীন বঙ্গভাষা কি না, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মিথিলার ও বঙ্গদেশের কথিত ও লিখিত ভাষায় কতদূর সাদৃশ্য ও পার্থক্য ছিল, সে কথার বিচার বা আলোচনা না করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি, কিন্তু দুইজনের ভাষায় কোন সাদৃশ্য নাই। বীরভূম ও মিথিলায় যত ব্যবধান, কলিকাতা ও চট্টগ্রামের পরস্পর দূরত্ব তাহার অপেক্ষা অধিক, কিন্তু উভয় স্থানের লিখিত ভাষায় বড় প্রভেদ নাই। যাহাকে ব্রজভাষা ও ব্রজবুলি বলা যায়, তাহাও ঠিক কোন দেশের ভাষা নয়, পুঁথির ও গানের ভাষা, এবং বিদ্যাপতিই তাহার স্রষ্টা। বঙ্গদেশে বিস্তর বৈষ্ণবকবি সেই ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, তরলতায় ও মধুময়ী মোহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুকরণে ভূরিভূরি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ভাষা দুর্ব্বোধ। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে এদেশে বিদ্যাপতির গীতাবলীর বহুলপ্রচার ছিল না, সেইজন্য বৈষ্ণবদাস বলিয়া গিয়াছেন, 'আছিল গোপতে, যতন করি পঁহু মোর (চৈতন্য-

দেব), জগতে করল পরকাশ।' সেকালে বিদ্যাপতির ভাষা বৈষ্ণব ভাবুক ও কবিদিগের নিকট তেমন দুরূহ ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের 'পর সাম্প্রদায়িকতার কারণে পদাবলীর চর্চ্চা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। সম্প্রদায় যত বড়ই হউক, জাতির অপেক্ষা ছোট। বৈষ্ণব যাহা ভক্তিপূর্ব্বক পড়ে, শাক্ত হয় ত তাহাতে উদাসীন। ক্রমে লোকে বিদ্যাপতির ভাষা ভুলিল, পদাবলী দিনদিন দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় কারণ, লিপিকরের উৎপাত। বর্গীর দৌরাত্ম্য দেশের লোককে ছাড়িয়া দেশের পুঁথিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কোন শাসন নাই, কোন নিয়ম নাই, যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমন লিখে। জ, ন, শ, ইকার, উকার কখন্ যে কোন্ আকার ধারণ করে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পরাধীন জাতি এই এক পুঁথি লিখিবার সময় মনের সাধ মিটাইয়া স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া লইল। এখন, পুঁথি নকল করা ও ছাপান অক্ষরে বই তৈয়ারি করায় অনেক তফাৎ। মুদ্রাযন্ত্রে যে অক্ষর সাজায়, সে পাণ্ডুলিপির অক্ষরই দেখে, শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে না, শব্দের অর্থ বুঝিবার বিদ্যারও তাহার অভাব। শব্দ সাজাইতে তাহার যে ভ্রম হয়, অপর লোকে বারবার তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। কিন্তু যে পুঁথি লিখে, পুঁথিগত বিদ্যার তাহার একটু অভিমান থাকে। নকল করিবার সময় শব্দ পাঠ করিয়া লিখে, কেবল একএকটি অক্ষর দেখিয়া লিখে না। কোন কথা না বুঝিতে পারিলে কিংবা কোন শব্দ তাহার বিবেচনায় অসঙ্গত বোধ হইলে আর একটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। অথচ সে যাহা লিখিবে, তাহা সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই। ছাপা অক্ষরের প্রুফ দশবার কাটিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিতে হস্তক্ষেপ করিয়া পাঠপরিবর্ত্তনরূপ মহাপাতকের ভাগী কে হইবে? বিদ্যাপতির পদাবলী একে গীত, তাহার উপর লিপিকরের গুণপনা, পরিবর্ত্তন যে অনেক ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। পাঠপরিবর্ত্তনে পদগুলি অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে, অনেকসময় ভিন্ন ভিন্ন পাঠ মিলাইয়াও সদর্থ করা যায় না। স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিদ্যাপতির পদাবলীর আরও অনেকগুলি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অর্থবোধের কিছু আনুকূল্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও বহুতর ভ্রম রহিয়াছে। সে কথা পরে বলিতেছি।

রাজকৃষ্ণবাবুর প্রথম ও প্রধান সিদ্ধান্ত এই যে, মৈথিলভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে এবং তাহাদের ভণিতা এদেশে প্রচলিত ভণিতার অনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ তিনি একটি গীতের পাঠান্তর ও একটি নূতন গীত উদ্ধৃত করেন। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারদিগের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ সংবাদ। নূতন পদ এরূপ আর কত আছে এবং এদেশে প্রচলিত কতগুলি পদের পাঠান্তর মিথিলায় পাওয়া যায়, এই দুইটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আর সাতটিমাত্র মৈথিল পদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, হয় মিথিলায় আর পদ

নাই, অথবা যাহা আছে তাহা প্রকাশযোগ্য নহে, কিংবা পদকল্পতরু হইতে ভণিতা-সংবলিত পদগুলি বাছিয়া সঙ্কলন করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান কৃতার্থ ও অধ্যবসায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শেষের অনুমানই সত্য মনে হয়। মহাজনপদাবলী ও প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে যে সঙ্কলন প্রকাশিত হয়, মোটের উপর তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার পরের সঙ্কলনগুলি আরও বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হইবে, এরূপ আশা করা যায়, কিন্তু তদনুরূপ হয় নাই। বরং কোন কোন সংস্করণে পদগুলি সাজাইবার প্রণালী বিকৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি; তিনি মিথিলাবাসী হইলেও বঙ্গভাষার আদিকবি বলিয়া এদেশে তাঁহার সমাদর ও সম্মান। তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাবলী সঙ্কলন, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা নিরূপণ করা বাঙালীর কর্ত্তব্য, কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু অধ্যবসায়ের যে পথ প্রদর্শন করেন, তাহা আর কেহ অনুসরণ করেন নাই। বাঙালী ক্ষান্ত হইল বটে, কিন্তু যে জাতির অসীম অধ্যবসায়, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সংগ্রহে যাহাদিগের আত্মপরজ্ঞান নাই, সেইজাতীয় একজন পণ্ডিত বাঙালীর অসমাপিত কর্ত্তব্য সমাপনে যত্নবান্ হইলেন। যে সময় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলনে ও গ্রন্থের উপক্রমণিকা লিখনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার্সন্ মিথিলায় তৎপ্রদেশপ্রচলিত বিদ্যাপতির গীতাবলী প্রভৃত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে সঙ্কলন করিয়া মৈথিল পণ্ডিতদিগের সহায়তায় অর্থ করিতেছিলেন। সারদাবাবুর স্বতন্ত্র সঙ্কলন প্রকাশ হইবার ন্যূনাধিক ছয়-বৎসর পরে, খৃষ্টাব্দ ১৮৮১-৮২ সালে গ্রিয়ার্সন্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে মৈথিলভাষার ব্যাকরণ, রচনাসংগ্রহ ও শব্দার্থ প্রকাশ করেন (An Introduction to the Maithili language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy, and Vocabulary)। এই সংগ্রহে বিদ্যাপতি-বিরচিত ৮২টি পদ সানুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭৬টি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, অবশিষ্ট ৬টি অপরাপর প্রসঙ্গে। এই পদগুলির অধিক সংখ্যাই বঙ্গভাষায় অদ্যাবধি অপ্রকাশিত রহিয়াছে। বিদ্যাপতিসম্বন্ধে গ্রিয়ার্সন্ আরও কয়েকটি তত্ত্ব নির্ণয় করেন। দানপত্রের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮৮৫ সালের *Indian Antiquary* পত্রে তিনি সারদাবাবুর লিখিত উপক্রমণিকার প্রশংসা করিয়া আদ্যন্ত অনুবাদ, শিবসিংহের সম্পূর্ণ বংশবল্লী প্রকাশ এবং অপর প্রবন্ধে বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলীর পূর্ব্বভাষে বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস, ত্রিহুতে প্রচলিত সমুদায় পদ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রতি কিছু কঠোর কটাক্ষপাত করেন। নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উদ্ধৃত করিতেছি। "These spurious songs of Vidyapati have been more than once collected... I have gone carefully through every poem in both these collections

(প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ এবং সারদাবাবুর সঙ্কলন), and am in a position to state that not more than five or six of them altogether show even a resemblance to songs admitted up here (ত্রিহুত) to be the work of Vidyapati. Even these are so distorted, both in language and in rhythm, that identification is by no means easy. The songs in the Bengali recension will not even scan according to Maithili rules of prosody, much less can they be brought within the bounds of any rules of Maithili Grammar. The fact is that both these Bengali collections are most interesting as showing the influence of Vidyapati over the Bengali mind, but in no way can they be considered as containing more than a few lines really written by himself." খৃষ্টীয় ১৮৮২ সালে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করেন; ১৮৮৫ সালে তাঁহার মতের কিছু পরিবর্তন হয়। সে বৎসর *Indian Antiquary* পত্রে লেখেন—"Owing to the influence of Chaitanya, Vidyapati's poems obtained an immense popularity in Bengal, and were speedily compiled into written manuals of devotion, an honour to which they did not attain in their native country of Bihar." প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ-সন্নিবিষ্ট-পদাবলী-সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ মতান্তর হয়। "While containing a number of hymns undoubtedly written by Vidypati it also contains a great number certainly not written by him and the bulk is of very doubtful origin." আটবৎসর পরে, ইংরাজি ১৮৯৩ সালে, এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রে প্রসঙ্গক্রমে আর এক মত প্রচার করেন। "Vidyapati Thakur, who lived in 1400 A. C. has only left us a few songs which have come down to us through five centuries of oral transmission, and which now cannot be in the form in which they were written." বিদ্যাপতির মৈথিল-পদাবলীর প্রথম সঙ্কলনকর্ত্তা বলিয়া গ্রিয়ার্সন্ চিরকাল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদভাজন হইয়া থাকিবেন; বিদ্যাপতিসম্বন্ধে তাঁহার কোন মত খণ্ডন করিতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু তাঁহার এই মতগুলি সমীচীন বোধ হয় না। মিথিলায় বিদ্যাপতির সর্ব্বসুদ্ধ ৮২টি মাত্র পদ আছে এবং তাহাতেই তাঁহার এত যশ, এই অনুমানই কিছু বিস্ময়জনক। পাঠান্তর-সম্বন্ধেও তিনি কিছু অসাবধানতার সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, উভয়রূপে দেখিলে, আরও অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মৈথিলব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া ছন্দ ও ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইবারই কথা, কিন্তু শুধু সেই কারণে এ-দেশে প্রচলিত পদগুলিকে কৃত্রিম অথবা জাল স্থির করিয়া অবহেলা করা স্বাধীনচেতা

রসগ্রাহী ব্যক্তির উচিত হয় না। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি ও এদেশের সংগ্রহের কাব্যাংশ তুলনা করিয়া বিচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। যদি বিদ্যাপতি দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বঙ্গবাসী, একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল, এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রিয়ার্সন্-কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে বঙ্গবাসী জাল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এদেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ার্সন্ যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী। তাঁহার দ্বিতীয় কথা কতক প্রামাণিক। বিদ্যাপতির পদ বলিয়া যাহা এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার কতক-গুলি যে তাঁহার রচিত নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং পাঠের যে অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না; কিন্তু অপরগুলি কিছু রূপান্তরিত হইলেও যে বিদ্যাপতির রচনা, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না। গ্রিয়ার্সনের তৃতীয় কথা কোনমতেই মানিয়া লওয়া যায় না। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন গীত হইয়া আসিতেছে, তেমনি পরম্পরাক্রমে পুঁথিতেও লিখিত হইয়া আসিতেছে। এই ভারতে লিপি-বিদ্যার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে বহুতর মহাগ্রন্থ মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল, সহস্রবৎসর ধরিয়া কেবল কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিতেছিল, সে সকল গ্রন্থ কি লুপ্ত অথবা অতিবিকৃত হইয়াছে? গ্রন্থ ছাড়িয়া যদি কেবল গীতের উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি তানসেনের, শোরী মিঞার গীত কত কালের? তাঁহাদের গান যেমন রচিত হইয়াছিল, তেমনি রহিয়াছে। গ্রিয়ার্সনের এই মত অপ্রামাণ্য, এরূপ যুক্তিতে বিদ্যাপতির কোন পদ ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না।

এদেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর যে কয়-খানি স্বতন্ত্র সঙ্কলন আছে, সকলগুলিই প্রধা-নত পদকল্পতরু হইতে নির্ব্বাচিত। প্রথম তরুণাবস্থায় সারদাবাবু যে সঙ্কলনখানি প্রকাশ করেন, তাহাতে পাঠে ও টীকায় অনেক ভ্রম আছে জানিয়া তিনি সেই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছেন। অক্ষয়-বাবুর প্রাচীনকাব্যসংগ্রহে 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট' বলিয়া যে পদগুলি আছে, তাহাতে নির্ব্বাচনের কোন প্রণালী নাই, কয়েকটি পদ বিদ্যাপতির, অবশিষ্ট অপর কবিদিগের। পরবর্ত্তী সঙ্কলনকারগণ এ বিষয়ে অক্ষয়বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিয়া ভাল করিয়াছেন। কিন্তু পদনির্ব্বাচনে কোন সঙ্কলনকার কোন-রূপ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দেন নাই। ভণিতা থাকিলেই বিদ্যাপতি, না থাকিলে নয়। বিদ্যাপতির নামযুক্ত পদ কবির না হইতে পারে এবং অপরভণিতাযুক্ত বা একেবারে ভণিতাশূন্য পদও তাঁহার হইতে পারে, এই সকল সম্ভাবনা-সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুমাত্র চিন্তার পরিচয় দেন নাই। ভাষা ও ভাবগত প্রমাণ, শব্দযোজনা ও ছন্দোবন্ধে কবির যে বিশেষত্ব আছে, সে সকলের প্রতি কোন সঙ্কলনকার লক্ষ্য করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে, একই সঙ্কলনে ভিন্ন ভিন্ন

পদের ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্ণ ও মজ্জাগত এত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় যে, তৎসমুদায় একই কবির রচনা বলিয়া কোনমতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বিদ্যাপতি নাম অথবা উপাধিধারী অপর কোন কবি এদেশে ছিলেন কি না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বিদ্যাপতির নামসংবলিত কোন পদ পরিত্যাগ করিতে না পারিলেও সঙ্কলনকারের কর্ত্তব্য সম্ভব-অসম্ভব-সম্বন্ধে প্রমাণাদি ও যুক্তি প্রয়োগে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ মুক্ত করিয়া দেওয়া, এবং বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য কিরূপে নিরূপিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। ভ্রষ্টলক্ষ্য সঙ্কলনকারগণ নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন।

কবির অনুকরণের প্রাচুর্য্যে সঙ্কলনকার কিছু সংশয়ে পড়িতে পারেন। বিদ্যাপতির যেরূপ অনুকরণ হইয়াছিল, বোধ হয় কোন দেশে কোন কবির তদ্রূপ হয় নাই। বঙ্গের পশ্চিমদ্বারে বিদ্যাপতি ও অন্তঃপুরমধ্যে চণ্ডীদাস যে সঞ্চিত মধুররসার্দ্র আবেগময়ী রাগিণীতে পঞ্চমস্বরে গান গাহিয়াছিলেন, তাহার দিগন্তপ্রসারী পূর্ণবিকাশ হইল বৈষ্ণব কবিদিগের শত শত কোকিলকণ্ঠ ঝঙ্কারে। জয়দেবের আলাপমূর্চ্ছনা বিদ্যাপতির গানে স্ফুটবাক্ বৈদন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগমনীসঙ্গীত বিদ্যাপতির ললিত রাগিণীতে। তাহার পর সঙ্কীর্ত্তনক্ষেত্রে যখন গৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইলেন, তখন সুরসরিৎ জাহ্নবী যেমন উষরভূমিকে উর্ব্বর করিয়া, বিপুল প্রবাহপরিসরে, পুলকিত কলকলনাদে, গদ্গদকণ্ঠে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি-অনুসারিণী হইয়াছিলেন, সেইরূপ চৈতন্যের হরিহরিধ্বনির অনুগামিনী অমৃতনিষ্যন্দিনী উচ্ছ্বসিত কাব্যধারা শতসহস্রমুখী হইয়া, তরল, শ্রুতিশীতল, মধুর তরঙ্গভঙ্গে তরতররবে ন্যায়ব্যাকরণদর্শনদগ্ধ বঙ্গদেশকে সরস, সিক্ত, প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল! প্রাচীন কবির মধুররসাশ্রিত পদ ছিল একবেণীস্রোতস্বিনীতুল্য, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি বহুতর ভাবপ্রবাহিণীর মিলনে নানা সঙ্গমতীর্থ হইয়া উঠিল! ভাব চৈতন্যদেবের, ভাষা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের—বৈষ্ণব কবিতার ইহাই উপাদান। চণ্ডীদাসের অপেক্ষা বিদ্যাপতির অনুকরণ অনেক অধিক। তাঁহারই ভাষা ভাঙিয়া-চুরিয়া, গড়িয়া-গঠিয়া, রূপরস, ছন্দোবন্ধ, ঠামভঙ্গী, শব্দ, উৎপ্রেক্ষা, উপমা তাঁহারই পদাবলী হইতে লইয়া লোকমনোমোহন বৈষ্ণবকাব্যসমূহ সৃজিত হইল। মিথিলাবাসী বিদ্যাপতি বাঙালীর কবি নয়, এমন কথা কে বলিবে? যে বলে, সে রাধাকৃষ্ণপ্রেমরজ্জু গলায় দিয়া বৈষ্ণবকাব্যের অমৃতসায়রে ডুবিয়া মরুক!

যাঁহারা বিদ্যাপতির অনুকরণে কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গোবিন্দকবিরাজ প্রধান। গোবিন্দদাস স্বয়ং প্রতিভান্বিত ক্ষমতাশালী কবি, কিন্তু বিদ্যাপতির আশ্রয় তিনি কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির শিষ্যত্ব তিনি অপূর্ব্ব কৌশল ও কবিত্বের সহিত স্বীকার করিয়াছেন—

বিদ্যাপতিপদ মোহে উপদেশল
রাধা রসময় কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈসন হেরল
যো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥

বন্দনায় বলিয়াছেন—

বিদ্যাপতি-পদযুগল-সরোরুহ-নিষ্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর পিবইতে কর অনুবন্ধে॥

সেই অনুবন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দদাস কেবল বন্দনা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বকবির অনেক কথা, এমন কি অনেক পদের অংশ নিজরচিত গীতে গ্রথিত করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির ভণিতা ভাঙিয়া অথবা অসম্পূর্ণ পদ পাইয়া তাঁহার নামের সহিত আপনার নাম গাঁথিয়া দেন। যেমন—

বিদ্যাপতি ভণ মিছে নহে ভাখী।
গোবিন্দদাস কহ তুঁহু তঁহি সাখী।

গীতান্তরে—

এত করি বিষাদ ভাবি রঁহু মাধব
রাই প্রেমতে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর।

অপর পদে—

পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর॥

উদ্দেশ্য অসাধু নয়, কারণ তাহা হইলে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির নাম একেবারেই লোপ করিতে পারিতেন। সাগরসঙ্গমে স্রোতস্বিনীর যে আনন্দ, সহকার অবলম্বনে চূতলতিকার যে আনন্দ, বিদ্যাপতির গীতে আপনার নাম মিশাইলে গোবিন্দদাসেরও সেই আনন্দ, কিন্তু বিদ্যাপতির গীতসঙ্কলনকারের পথে যে কণ্টক রোপণ করিয়া যাইতেছেন, গোবিন্দদাস সে কথা ভাবেন নাই। কণ্টক দেখিয়া সঙ্কলনকারও সে পথে অগ্রসর হন নাই, এরূপ পদগুলি প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই পদগুলি যে বিদ্যাপতির,—রচনা, ভাষা ও ভাবগৌরব এবং যুক্ত ভণিতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সকল পদ বিদ্যাপতির সঙ্কলনেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। গোবিন্দদাসের দৃষ্টান্ত অন্য বৈষ্ণবকবিও অনুসরণ করিয়াছেন, যথা—

বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শূর।
রাধামোহন দাস রসপূর॥

রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র, ইনি পদামৃতসমুদ্রের সংগ্রহীতা ও টীকাকর্ত্তা।

গোবিন্দদাস ও অপর কবিগণ বিদ্যাপতির ভণিতায় নিজ নিজ নাম সংযুক্ত করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু এমন পদও আছে, যাহার সম্বন্ধে কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায় না। পদকল্পতরুতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি আছে—

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভিত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাহি মেটি কোইউ ন শুনায়ে।
বদন সেচই কেই জল লেই ধায়ে॥
কি কহব মাধব কউলমুখী।
যতনে জীয়াওল সকল সখী॥
কাহুক নলিনী কাহুক চন্দনা।
কোই কহয়ে আওল নন্দনন্দনা॥
সরস মৃণাল হৃদয় ধরি কোই।
চাঁদকিরণে কেহো রাখয়ে গোই॥
কেহ মলয়ানিল বারই চীরে।
কোই করয় নব কিশলয় দূরে॥
মধুকরধুনি শুনি কোই মুদে কান।
করতলতালে কোই কোকিল খেদান॥
কান্ত-দিগন্তহি কোন কোন যায়।
কেহো কেহো হরি তুয়া গুণ পরখায়॥
নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস গান॥

এ পদটি কাহার রচিত মনে হয়? বিদ্যা-

পতির পদ বলিয়া কোন সঙ্কলনকারের মনে হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহাদিগের অপরাধ কি? 'বিদ্যাপতির পরিশিষ্টে'ও নরনারায়ণ অথবা বিজয়নারায়ণের নামগন্ধ নাই। অথচ বিদ্যাপতির পদাবলীর মৈথিল পুঁথিতে এই পদ প্রায় অবিকল এই আকারে পাইয়াছি। প্রথম শ্লোক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, 'বিশেথ' (বিশেষ) ও 'রেথ' মিলিয়াছে। 'ষ'য়ের উচ্চারণ 'খ'য়ের মত আমাদের দেশে হয় না, মিথিলায় হয়; যখন মৈথিল উচ্চারণপ্রণালীতে মিল সাধিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, পদের ভাষাও মৈথিল। মৈথিল পুঁথি না পাইলে ত এ পদ কখনই বিদ্যাপতির সঙ্কলনে স্থান পাইত না! এরকম কত ঘটিয়াছে, কে বলিতে পারে? কত ভিক্ষুক, কত তস্কর, বিদ্যাপতির রত্নভাণ্ডার হইতে যাচ্ঞা বা লুণ্ঠন করিয়া ধনবান্ হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির কি ক্ষতি হইয়াছে? লক্ষ্মীর ভাণ্ডার অকাতরে দান করিলে কিংবা লুঠ করিলে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু সরস্বতীর ভাণ্ডার কে শূন্য করিতে পারে? বিদ্যাপতির প্রসাদে অনেক কবি যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি এই বৈষ্ণবকবিকুলচূড়ামণির যশোরাশি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে?

যে বন্যার মুখে বিদ্যাপতি পড়িয়াছিলেন, ক্ষুদ্র কবি হইলে তাহাতে ভাসিয়া যাইত। শ্রেষ্ঠ কবি সেই, অনুকরণে-বিকৃতিতে যাঁহার গৌরব ম্লান হয় না, কালের তরঙ্গাঘাতে যাঁহার রাজ্যের তটভঙ্গ হয় না। একটি অপ্রকাশিত কবিতার ভণিতায় বিদ্যাপতি আপনাকে কবিরাজ বলিয়াছেন। কবির রাজ্য বাণীর রাজ্য—বাণী স্থিরা, কমলা চঞ্চলা। বাণী যাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দেন, তিনি নিষ্কণ্টকে চিরকাল রাজ্যভোগ করেন। কবিতাই কবির সম্পত্তি, কবিতাই তাঁহার পরোয়ানা। বিদ্যাপতি রাজার পরোয়ানায় হয় তাঁহার নামাঙ্কিত মোহর, না হয় তাঁহার পাঞ্জার ছাপ আছে, যাহাতে নাই, তাহা তাঁহার সামগ্রী নয়। শুধু ভণিতায় যদি বিদ্যাপতি হইত, তাহা হইলে ত বিদ্যাপতির পদের ভাবনা থাকিত না! কোন্ পদ বিদ্যাপতির, কোন্ পদে আংশিক বিকৃত হইয়াছে, কোন্ পদ একেবারেই তাহার নয়, তাহা এই দেশের পদাবলী হইতেই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ তিনটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম পদে দুইএকটি শব্দের সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে—

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর রে॥
ঝঞ্চা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওয়ত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক,—পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কইসে গোঙায়বি
হরি বিনু দিনরাতিয়া॥

ইহাতে পাঞ্জার পুরা ছাপ রহিয়াছে, একটি অঙ্গুলিচিহ্নও অস্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয় পদ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই—

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হইলে কার মুখ চাব॥
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥

ভণিতায় কবির, রাজা শিবসিংহ ও লছিমা-দেবীর নাম থাকিলেও, কলিকাতায় টাকায় ছয় সের হিসাবে যেমন খাঁটি দুধ পাওয়া যায়, এই পদ সে হিসাবেও বিদ্যাপতির খাঁটি পদ নয়। কোন কোন পদে চণ্ডীদাস ও অপর কবিদিগের পদাংশের সংযোজনা আছে। চণ্ডীদাসের রচনা বিদ্যাপতির প্রতি আরোপ করা শুধু গুরুতর অপরাধ নহে, অজ্ঞতার প্রমাণ, কারণ উভয় কবির ভাষায় কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই।

আর একটি পদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥

* * * *

আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥

এই পদটিকে মনে কোন দ্বিধা না করিয়া, বিনা আপত্তিতে যদি কেহ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদ্যাপতির-বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। যে কয়েকটি সঙ্কলনে এই পদ দেখিয়াছি, তাহার কোন-কোনটিতে ইহার সম্বন্ধে কোনপ্রকার অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ বাংলায় এখন যদি কেহ পদ রচনা করিয়া তাহাতে বিদ্যাপতির নাম জুড়িয়া দেয়, তাহা হইলেও হয় ত সঙ্কলনকার তাহাকে সংগ্রহভুক্ত করেন!

পক্ষান্তরে, ভণিতা না থাকিলেও যে বিদ্যাপতির পদ হইতে পারে, সঙ্কলনকারগণ সে সম্ভাবনার দূর কল্পনাও করিতে পারেন নাই, কিন্তু এরূপ অনেকগুলি পদ আছে, এবং ভণিতা না থাকিবার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে। পদকল্পতরুতে এই পদটি পাইয়াছি—

মনমথ তোহে কি কহব অনেক।
দিঠি অপরাধে পরাণ পয় পীড়সি
এ তুয়া কোন বিবেক॥
ডাহিন নয়নে পিশুনগণ বারণ
পরিজন বামহি আধ।
আধ নয়নকোণে যব হরি পেখলুঁ
তাহে ভেল এত পরমাদ॥
পুরবাহির পথ করত গতাগত
কো নাহি হেরত কান।
তোহারি কুসুমশর কতিহুঁ না সঞ্চরু
হামারি হৃদয়ে পাঁচ বাণ॥

পদকল্পতরু হইতে আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

সজনি তেজলু জীবনক আশ।
দারুণ বরিখ জীউ ভেল অন্তর
নাহ রহল পরবাস॥
বাদর দরদর নাহি দিন অবসর
গরগরি গরজে ঘনঘটা।
অনিল হিলোল ঘন মেঘ ঘেরয়ে
যামিনী ঝলকত তড়িতছটা॥

ঘন ঘন নিসর ডাহুক ডাহুকীগণ
চাতক পিউপিউ নীরে।
শিখণ্ডমণ্ডল কামে কামাকুল
নিরঘাত শবদ করে॥৮

ভণিতা নাই, সুতরাং সঙ্কলনকার নিরপেক্ষভাবে এইরূপ পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এ দুইটি যে বিদ্যাপতির অবিকৃত বিশুদ্ধ পদ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। রচনাকৌশলে, ভাষার গঠনে ও ভাবের সঙ্কেতে বিদ্যাপতির মৈথিল পদের সহিত এই পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভণিতা নাই বলিয়া কোন সংগ্রহকার সঙ্কলন করেন নাই, এবং সেই কারণে পাঠপরিবর্ত্তন অথবা অর্থবিকৃতির সুযোগ হয় নাই। রাজপুরুষদিগের পক্ষে দেশের অঙ্গচ্ছেদ যেমন সহজসাধ্য, পাঠকার ও টীকাকারের পক্ষে কবি ও কাব্যের মুণ্ডচ্ছেদ সেইরূপ অনায়াসসাধ্য। বিশেষ এই উভয়বিধ ছেদনকার্য্যে অসির প্রয়োজন হয় না, মসি ও শাণিতাগ্র লেখনী হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সঙ্কলনের পর টীকা ও অর্থ। বিদ্যাপতির পদ দুর্ব্বোধ হইবার প্রথম কারণ ভাষা, দ্বিতীয় পাঠের বিকৃতি। তাঁহার রচনায় বড় বড় আভিধানিক শব্দ অধিক নাই, কিন্তু পাঁচশত বৎসরে শব্দের অর্থেও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক শব্দ এখন যে অর্থে আমরা ব্যবহার করি, বিদ্যাপতি সে অর্থে প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার শব্দশিল্প বড় সূক্ষ্ম, তিনি শব্দরত্নকার। ভাষা আমাদের পক্ষে অপরিজ্ঞাত ও অনভ্যস্ত, অর্থশৈথিল্য ও অর্থভ্রম হইবার সতত সম্ভাবনা। ক্রিয়া, অব্যয়শব্দ প্রভৃতি লইয়া অনেকসময় ভ্রম হয়। এদিকে পদকল্পতরু, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে কোনরূপ টীকা পাওয়া যায় না। পাঠপরিবর্ত্তন হইবারও প্রধান কারণ ভাষা এবং শব্দের জটিলতা, এবং তাহাতে স্থানে স্থানে অর্থনির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পদামৃতসমুদ্রের প্রধান দোষ সঙ্কলনকার রাধামোহন ঠাকুর স্বরচিত পদ অধিক সংখ্যায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, বৈষ্ণবকবিগুরুদিগের অল্পসংখ্যক পদ দিয়াছেন। বিদ্যাপতির কতিপয় পদ আছে। যে পদটি তাঁহার নিজের দুর্ব্বোধ মনে হইয়াছে, রাধামোহন ঠাকুর সহজ সংস্কৃতভাষায় তাহারই ভাবার্থ করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের যথেষ্ট সহায়তা হয় না। যাহা দুর্ব্বোধ, তাহা সুবোধ করাই যে টীকার ও অর্থের প্রধান উদ্দেশ্য, আধুনিক টীকাকারেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া, টীকাস্তূপের উপর কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়াছেন। কাজটা নিতান্ত কঠিন নয়। কোষ, দর্পণ, দীপিকা, মঞ্জরী, ব্যাকরণসূত্র প্রভৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে, কিছু উদ্ধার, কিছু আহরণ করিয়া অগাধপাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকারাশি সংগ্রহ করা যায়। তথাপি কবির প্রতি কৃপা করিয়া টীকার ভার কিছু লঘু করিলে হইত ভাল। স্ত্রীলোকের বেশবিন্যাসের ষোড়শ প্রকার ও তাহার তালিকা, বিরহের দশ দশার নামকথন, কন্দর্পের পঞ্চ কুসুমশরের নাম, দশাবতারের নাম ইত্যাদি ইত্যাদি কতকগুলি অত্যন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি প্রাচীন বয়োবৃদ্ধ টীকাকারদিগের উপর বরাত দিলেও হইত। কিন্তু এই এত টীকা পড়িয়াও অর্থসুগমতার তেমন সুবিধা হয় না। তখন

রাজপথে মিঠাইবিক্রেতার একটা ছড়া মনে পড়ে। তাহার মিঠাইয়ে—দিল্লীর লাড্ডু কি না, বলিতে পারি না—ঘি আছে, চিনি আছে, বাদাম-কিস্‌মিস্-পেস্তা প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় পদার্থ আছে—জল নেই! তেমনি আমাদের এই সকল টীকার টীকা আছে, টিপ্পনী আছে, অলঙ্কার আছে, ব্যাকরণ আছে—অর্থ নাই! স্থানে স্থানে টীকাকারমহোদয়গণ অর্থ বুঝাইতে পারেন নাই, এবং শব্দার্থেও অনেকসময় গোল বাধাইয়াছেন। এমন কথা প্রমাণাভাবে বলা যায় না, অতএব কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

প্রাচীন বৈষ্ণবপুঁথির মতে, মিথিলায় প্রচলিত প্রণালীতে ও গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে রাধার বয়ঃসন্ধিবর্ণনে পদাবলীর আরম্ভ, কারণ তাহাই উভয়পক্ষে পূর্ব্বরাগের সূচনা। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপস্থিত আলোচনার বহির্ভূত, কিন্তু কে কোন্ পথের পথিক হইবে, অনুরাগ অথবা উদাসীনতার পথ অবলম্বন করিবে, তাহাও সন্ধিস্থলে স্থির করিতে হয়। বয়ঃসন্ধির প্রথম পদ "শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল, শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল" ইত্যাদি সকলের স্মরণ আছে। সেই পদের শেষের দুইটি শ্লোক এই—

মাধব পেখলু অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা॥
বিদ্যাপতি কহ তুহু অগেয়ানী।
দুহু একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী॥

চারপাঁচ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত কোন সঙ্কলনে এইরূপ টীকা ও অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—"আগেয়ানী—অজ্ঞানী, অজ্ঞান। সেয়ানী—সেয়ানা বা চতুর; যুবতী। চতুর লোকে ইহাকে দুইএর একত্র যোগ কহে অর্থাৎ শৈশব-যৌবনের সম্মিলন বলে। 'কো কহে সেয়ানী' এইরূপ পাঠ ধরিলে—কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে—এইরূপ অর্থ হইবে।" অর্থ ত হইল, কিন্তু বুঝিতে ত পারা গেল না! শব্দ একটিও দুরূহ নাই, ভাবার্থ লইয়াই গোল। সেয়ানী অর্থে চতুর ও যুবতী, অর্থাৎ উভয়লিঙ্গ বিশেষণ; চতুর লোকে কি কহে, তাহা বুঝিলাম। আবার 'ইহকো'-শব্দের অর্থ 'ইহাকে' না হইয়া যদি 'কে ইহাকে' হয়, তাহা হইলে কি অর্থ হইবে, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু সংশয় ত ঘুচিল না। আগেয়ানী কে? টীকার অর্থে পুংলিঙ্গ বিশেষণ মনে হয়। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি রাগ করিয়া কাহাকে অজ্ঞানী বলিতেছেন, ও কেন বলিতেছেন? যে বলিয়াছিল, মাধব পেখলু অপরূপ বালা, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা, কবি যে তাহাকেই তিরস্কার করিতেছেন, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আর তাহার অপরাধ এই যে, সে বলিয়াছিল, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা। চতুর লোকে বলে দুহু একযোগ, সে বলিয়াছিল দুহু এক ভেলা, তবে সে অজ্ঞানী হইল কেন? অর্থান্তরে, কে ইহাকে যুবতী বলে, ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সম্মিলন ঘটিয়াছে, ইহাও ত সেই অজ্ঞানীর কথা, কবি তাহাকে খামখা একটা দুর্ব্বাক্য বলিলেন কেন? একটি শব্দের অর্থের গোল করিয়া টীকাকার এই শ্লোক-দুইটির অর্থ করিতে পারেন নাই। যে ভাষায় বিদ্যাপতি রচনা করিয়াছিলেন, সে ভাষায় সেয়ানীশব্দ উভয়লিঙ্গ হয় না, সুতরাং এই শব্দের অর্থ চতুর হইতে পারে না। পুংলিঙ্গ,

সেয়ান অথবা সেয়ানা—স্ত্রীলিঙ্গ, সেয়ানী। আবার সেয়ানী অর্থে যুবতীও নয়। শব্দের শিথিল প্রয়োগে সেয়ানীশব্দের অর্থ যুবতী হইতে পারে, কিন্তু অদ্বিতীয় শব্দকুশলী বিদ্যাপতি সেরূপ প্রয়োগ করিবার লোক নহেন। সেয়ানী অর্থে চতুরা অথবা কিশোরী, এখানে কিশোরী। আগেয়ানী স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ, দূতীর প্রতি প্রযুক্ত। দূতী প্রৌঢ়া, রসিকা, বাগ্‌বিদগ্ধা নহে, বালা গোপকন্যা, শব্দনির্ব্বাচনে অনভিজ্ঞা। অপরূপ বালা দেখিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বর্ণন করিবে, স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। তরুণী বলিলে যথার্থ বর্ণনা হয় না, আবার ওদিকে বালিকাও নয়। ঠিক শব্দটি খুঁজিয়া না পাইয়া সেই গোপকুমারী বলিয়া উঠিল, শৈশব যৌবন দুহু এক ভেলা। তাহাকেই অতি মধুর ভৎর্সনা করিয়া কবি কহিতেছেন, শৈশব যৌবন দুই এক হয় না, দুইয়ের একযোগে একটি অপূর্ব্ব তৃতীয় পদার্থ সৃষ্ট হয়। হে গোপকন্যে, হে অজ্ঞানতিমিরাবৃতনয়নে, যাহাকে দেখিয়াছ, সে কিশোরী, শৈশব-যৌবনের সন্ধিরেখাস্থলে কমলারুণলাঞ্ছিত চরণপাতে দণ্ডায়মানা! আধার শৈশবের, কিন্তু যৌবনস্পর্শে চকিতচঞ্চল!

প্রথম মিলনের একটি পদে নায়িকার সঙ্কোচ, আশঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভণিতা এই—

> বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
> পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

টীকাকার 'তরসি'শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "তরসি—বলে, বলপূর্ব্বক। অথবা তরস্বী—বলবান্, বলিষ্ঠ।" অর্থ হইল কি? পরশিতে বলপূর্ব্বক হস্তদ্বারা হস্ত ঠেলিয়া দেয়, অথবা বলবান্ স্পর্শ করিতে হাত দিয়া হাত ঠেলিয়া দেয়, না বলপূর্ব্বক স্পর্শ করিতে হাত ঠেলিয়া দেয়? যে অর্থ করা যায়, তাহাতেই কিছু বিস্মিত হইতে হয়। 'সেয়ানী'শব্দের মত 'তরসি' যে উভয়লিঙ্গ বিশেষণ প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহাও বলা যায় না, কারণ বলপূর্ব্বক হস্ত ঠেলিয়া দেওয়া নায়িকার পক্ষেই প্রযোজ্য মনে হয়। অনেক বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিতে হয় যে, তরস্বী আর কেহ নয়, টীকাকার নিজে, কারণ তিনি গায়ের জোরে এই অর্থ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির সঙ্কলনকার ও টীকাকারগণ যদি যত্নপূর্ব্বক প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যাপতির রচনা বুঝিবার ও বুঝাইবার অনেক আনুকূল্য হয়, কিন্তু তাঁহারা কোষ, দর্পণ, ব্যাকরণ লইয়া ব্যস্ত, অন্য দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করেন না। বিদ্যাপতির এই পংক্তিটি পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি—গোবিন্দদাস অবিকল এই আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের পদে রহিয়াছে—

> লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
> ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারী॥
> পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
> হেরইতে বদন নয়ান জল খলই॥

তরসি—তরাসে, ত্রাসে। স্পর্শ করিলে ত্রাসে করে কর ঠেলিয়া দেয়—এই সহজ অর্থ পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার উপর তরস্বিতা প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই।

বিরহক্লিষ্ট নায়িকার তন্বিমাবর্ণনে কবি কহিতেছেন,—

সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তক দোসর দেহা।

তত্র টীকা। "তন্তক দোসর—দ্বিতীয়তন্তুবৎ, তাঁতের সদৃশ। এত কৃশ যে, তাঁতের দ্বিতীয় বলিলেই হয়।" ভাল কথা, কিন্তু তাঁতের সদৃশ দেহ হইলে সখীগণ সাহস করিয়া ছুঁইতে পারে না কেন? পাছে বেহালার তারের মত পিড়িংপিড়িং করিয়া উঠে, সেই ভয়ে? তাঁত যে এত স্পর্শকাতর, সে কথা ত কেহ জানিত না! ধুনুরিযন্ত্রের গুণ তাঁতের, কিন্তু তাহা কিরূপ স্পর্শসহিষ্ণু, শীতকালে বোধ করি সকলে দেখিয়া থাকিবেন। অভিধানে তন্তর অর্থ তাঁত ছাড়া সূতাও লেখে, এবং মাকড়সার জালকে লূতাতন্তু বলে। তন্তুবায়, তাঁতি ও মাকড়সা। তন্তক দোসর দেহা—দ্বিতীয় সূতার ন্যায় দেহ, সখীগণ সাহসে ছুঁইতে পারে না, ছুঁইলে পাছে ছিঁড়িয়া যায়, সেই ভয়ে। এরূপ অর্থ করিলে কি অসঙ্গত হইত?

এমন কত দেখাইব? সঙ্কলনকারগণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া টীকা ও অর্থ করেন, তাঁহারাই যদি অর্থ করিতে অনবরত এইরূপে ভ্রমে পতিত হন, তাহা হইলে সাধারণ পাঠকের অবস্থা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। একজন সঙ্কলনকার বৈষ্ণব কবি ও ভক্তদিগের প্রতিভানির্ব্বাচিত মধুর শব্দ, ভাবোল্লাস ও ভাবসম্মিলন পুরাতন বিবেচনায় ত্যাগ করিয়া মাথুরের পর পুনর্ম্মিলন আখ্যা দিয়াছেন, এবং অতৃপ্তি ও অনুভবের চরম-অভিব্যক্তি-স্বরূপ সেই নিত্য নূতন পদে—জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল—গ্রন্থ সমাপ্ত না করিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের একটি গাঢ়রসঘটিত পদে সমাপ্ত করিয়াছেন। সঙ্কলনকার কি ভাবসম্মিলনের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গীতার কালনির্ণয়।*

ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকতাসম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতই উদয় হয়; যথা, গীতার প্রণেতা কে? তাহার প্রণয়নকালই বা কি? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে, আনুমানিক প্রমাণে সম্ভব-অসম্ভব-বিবেচনায়, যাহা সঙ্গত বোধ হয়, তাহা পাঠকদের সম্মুখে ধারণ করাই আমার অভিপ্রেত। ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ব্যাসদেব মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং

* Gita and the Gospel.—By Neil Alexander.
ছদ্মনামের পুস্তিকায় এই বিষয়ে অল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা দৃষ্ট হইবে।

ব্যাসদেবই গীতার প্রণেতা বলিয়া সাধারণ লোকের ধারণা। ঐরূপ ধরিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই, কেন না, গীতাকারের নামধাম ভারতসাহিত্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গীতার রচনাকৌশলে প্রকাশ পায় যে, উহাতে ভগবৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু গীতা-গ্রন্থখানিকে কি ভগবৎপ্রচারিত বলা যাইতে পারে? ইহাতে অবশ্য অনেক পরমার্থতত্ত্ব সন্নিবিষ্ট আছে, অনেক সারবান্ ধর্ম্মোপদেশ আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার সকল কথাই যে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা নহে। ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থের যে সকল লক্ষণ প্রত্যাশিত, তাহা ইহাতে সর্ব্বাংশে বিদ্যমান আছে, আমি এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। দ্বিতীয়ত, যদি শ্রীকৃষ্ণ সত্যই গীতার রচনাকর্ত্তা হন, তবে গীতাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক বলিতে হয়। কিন্তু কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে গীতারচনার বহুকাল পূর্ব্বে সঙ্ঘটিত, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বেদসঙ্কলনের সমকালীন ঘটনা, খৃষ্টপূর্ব্ব সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। এবং গীতার জন্ম বৈদিক সময়ের অনেক পরে, বোধ করি ইহাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। গীতা শ্রুতি নহে, স্মৃতির মধ্যে গণ্য।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আবির্ভাবকালে ঈশ্বরাবতাররূপে আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইতেন, তাহা হইলে সে সময়ে অথবা তাঁহার তিরোভাবের পরে ধর্ম্মরাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, যেমন খৃষ্টের আবির্ভাবকালে হইয়াছিল; যদি তাহা হইত, তবে পরবর্ত্তী শত শত বৎসরের সাহিত্যে তাহার কোন-না-কোন নিদর্শন থাকা সম্ভব, কিন্তু তাহা কোথায়? ব্রাহ্মণ বল, আদিম উপনিষদ্ বল, কোথাও এ কথার কোন প্রসঙ্গই নাই। শতপথব্রাহ্মণ, যাহা কুরুপাঞ্চালপ্রদেশে বিরচিত, যাহাতে মহাভারতের অনেক বীরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, দেবকীপুত্র বলিয়া কথিত, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচিত নহেন। এই সকল গ্রন্থের পর অনেককাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত, কিন্তু দেবতা বলিয়া অর্চ্চিত নহেন। পাণিনিতে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" বলিয়া একটি সূত্র আছে, তাহা হইতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, তখনকার কালে কৃষ্ণার্জ্জুনভক্ত কোন উপাসক-সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু গীতাতে দেবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ একাধিপত্য সূচিত, তদনুযায়ী বিশ্বাস ঐ সূত্র হইতে প্রমাণিত হয় না। পাণিনির মহাভাষ্যেও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কোন নিদর্শন নাই।

এই ত একপ্রকার প্রমাণ। এখন দেখা যাউক, গীতোক্ত ঘটনাটি কতদূর সম্ভব? দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে উদ্যত, এমন সময়ে যে একপক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথস্থাপনপূর্ব্বক অষ্টাদশ অধ্যায় যোগশাস্ত্র শুনিতে বসিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই সুযোগে কৌরবসেনাপতিগণ কৃষ্ণার্জ্জুনের

প্রতি অজস্র বাণনিক্ষেপ করিতে কেনই বা ক্ষান্ত থাকিবেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অর্জ্জুনের স্থায় প্রতিভাশালী পুরুষ এক ইসারায় সমস্তটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আমি ত গীতা হইতেই দেখিতে পাই যে, অনেক সময়ে কৃষ্ণোপদেশের ভাবার্থগ্রহণে অর্জ্জুন নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। সে যাক্, আবার এরূপ যুক্তিও শুনিয়াছি যে, আরম্ভে হয় ত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ছিল না, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন ছিল, শেষের কয়েক অধ্যায় উত্তরকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি এক ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তবে অন্য ভাগ প্রক্ষিপ্ত হইবার বিচিত্র কি? ফলে, ঐ কথা স্বীকার করিলে, সমগ্র গ্রন্থখানি অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। যাঁহারা প্রচলিত বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য এইরূপ ওকালতী করিতে তৎপর, আমি তাঁহাদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে প্রস্তুত নহি।

আর এক কথা। ধর, রণক্ষেত্রে সত্যসত্যই এইরূপ ধর্ম্মালোচনা চলিয়াছিল, কিন্তু ব্যাসদেব তো আর সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কেমন করিয়া সমস্তটা শুনিলেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেবতুল্য মহর্ষি যোগবলে দূর হইতে সকলি জানিতে পারিয়াছিলেন। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর নাই। যুক্তিক্ষেত্রে দৈবী শক্তির অবতারণা করিলে, অসম্ভবকে সম্ভব করা কিছুই কষ্টসাধ্য নহে। "শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়"—সকলি সম্ভবে। দৈবশক্তিপ্রয়োগের কাছে কোন্ যুক্তিই টিকিতে পারে না।

যাঁহারা গীতার প্রাচীনত্বসমর্থনের জন্য সমুৎসুক হইয়া এইরূপ একদেশদর্শী যুক্তি অবলম্বন করেন, আমি তাঁহাদের দোষ দিতেছি না—শাস্ত্র যত প্রাচীন হয়, সেই পরিমাণে তাহা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমি কেবল সত্যের উদ্দেশে এই স্থানে ভিন্নমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। দুই পক্ষেরই যুক্তি তুলনা করিয়া আমার বিচারে দাঁড়ায় এই যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা প্রণয়ন করেন নাই; অন্য কোন ব্যক্তি গীতার প্রণেতা। যুদ্ধপ্রসঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে বিশুদ্ধ জ্ঞানধর্ম প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে কথাপ্রসঙ্গে বাহির করিতেছেন, ইহাই সম্ভব। [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত [illegible] বিষয়ে আমার একমত [illegible] গীতার ভাষা, ভাব ও মতামত আলোচনা করিয়া দেখিলে ঐ গ্রন্থ কোন্ সময়কার নয়, তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ ধারণা হয়। কোন্ সময়কার নয়, তাহা আগে স্থির হইলে, সাহিত্যক্ষেত্রে গীতার স্থান ও তাহার প্রণয়নকাল আপনা-আপনি একটা দাঁড়াইয়া যায়। [illegible] প্রথম, ঋগ্বেদসংহিতা। ঐ সময়ে বৈদিক ঋষিগণ প্রাকৃতিক দেবতাদের স্তবস্তুতিপূর্ণ সূক্তাবলী রচনা করিতেছিলেন, সে কাল গীতার বহুশতাব্দী পূর্ববর্তী, ইহা সর্ববাদিসম্মত। [illegible] বৈদিক সূক্তসকল সংকলিত হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম, এই সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। এই সময়ে আমরা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করি। তখন ঋগ্বেদের যে

কবিত্বের উচ্ছ্বাস, তাহা আর নাই। তখন এদেশে পৌরোহিত্যের প্রভাব দিগ্বিদিক্-প্রসারিত হইতেছে। সাহিত্যেও পৌরোহিত্যের আভা প্রতিফলিত। সে সময়ে যে সাহিত্যভাণ্ডার প্রস্তুত হয়, তাহার ক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত—পশ্চিমে শতদ্রু হইতে পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ও গীতার আবির্ভাবকাল নহে। গীতার জন্ম ইহারও অনেক পরে।

গীতার অনেকস্থলে ত্রিবেদেরই উল্লেখ দেখা যায়, চতুর্থ যে অথর্ব্ববেদ, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ভগবান্ একস্থানে ঋক্, যজু, সাম রূপে আত্মবর্ণন করিয়াছেন (৯/১৭); বিভূতিযোগাধ্যায়ে বেদের মধ্যে আপনাকে সামবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (১০/২২); কিন্তু কোথাও অথর্ব্ববেদের কোন কথাই নাই। ইহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে গীতার প্রণয়নকাল সাব্যস্ত হয় এবং এই কারণে কোন কোন পণ্ডিত গীতার প্রাচীনত্ব অনুমান করেন, কিন্তু এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না। অথর্ব্ববেদ বহুকাল পর্য্যন্ত সাহিত্যসমাজে বেদ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। উহাতে যাতুবিদ্যা (যাদু), ভৈষজ্য প্রভৃতি নানা বিষয় আছে, যাহা যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্ম্মের উপযোগী নহে। কর্ম্মকাণ্ডে ব্যবহারযোগ্য বিষয় উহাতে অতি অল্পই আছে এবং যাহা আছে, তাহা শেষভাগে প্রক্ষিপ্ত। এই হেতু শ্রৌত-গ্রন্থাবলীর মধ্যে অথর্ব্ববেদের কোন মাহাত্ম্য নাই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে উহার কোন উল্লেখ নাই। শতপথব্রাহ্মণও বেদকে ত্রয়ীবিদ্যা বলিয়াই জানেন—বৌদ্ধযুগেও উহা ত্রয়ী-বিদ্যারূপে পরিচিত। কৌশীতকীব্রাহ্মণে—ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত—অধিক কি, অমরকোষেও * অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। যদিও পাতঞ্জলভাষ্য এবং কোন কোন উপনিষদে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে, তথাপি মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে আসিয়া না পৌঁছিলে উহার বৈদিক প্রতিপত্তি অনুভূত হয় না। বিষ্ণুপুরাণে অথর্ব্ববেদের একজন স্বতন্ত্র পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গোপথব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদ ব্রহ্মবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত। কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে উহার বেদাসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদ বেদের মধ্যে গণ্য হইবার পূর্ব্বে বহুকাল অতিক্রান্ত হয়; এখনো পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের অনেকানেক অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণেরা ঐ বেদকে বেদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই সকল কারণে, অথর্ব্ববেদের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া গীতার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হয় না।

উপনিষৎসকল বেদের শেষভাগ, এই-জন্য উপনিষৎকে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশ ব্রাহ্মণনামে অভিহিত, তাহা উপনিষদ্ অপেক্ষাও প্রাচীনতর, সন্দেহ নাই। উপনিষদ্ আবার একসময়কার রচনা নহে। উহাদের রচনা ও বিষয় ভেদে কাল-

* ঋক্সামযজুষী—ইতি বেদাস্ত্রয়ী—(স্বর্গবর্গ)।

বিভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপনিষদ্ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি আধুনিক, কতক বা এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী। উপনিষৎসমস্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের শীর্ষস্থানীয় আদিম উপনিষদ্গুলি গদ্যে প্রণীত; সে গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের অনুরূপ নহে, ব্রাহ্মণগদ্যের আদর্শে রচিত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশীতকী এইশ্রেণীভুক্ত, কেনোপনিষদ্ গদ্যপদ্যে বিরচিত। কেনোপনিষদ্ হইতে আমরা ছন্দোবদ্ধ পদ্যোপনিষদে আসিয়া পড়ি—কঠোপনিষদ্, ঈশোপনিষদ্, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, মহানারায়ণী—এই সমস্ত দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়শ্রেণীর উপনিষদ্গুলি আবার গদ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই গদ্য আধুনিক সংস্কৃতগদ্যের ধরণে রচিত। মৈত্রায়ণীয় ও অপর কয়েকটি উপনিষদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চতুর্থশ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত উপনিষদ্ পরিগণিত, তাহা অথর্ব্ব-উপনিষদ্, গদ্যপদ্যে বিরচিত। যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, সর্ব্বসমেত প্রায় সপ্তবিংশতি-সংখ্যক হইবে।* ইহাদের অনেকগুলি আধুনিক, এমন কি, আল্লোপনিষদ্নামক গ্রন্থবিশেষ ইহার মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য এই উপনিষৎত্রয় অথর্ব্বোপনিষদের অন্তর্ভূত। ইহাদের দার্শনিক ভিত্তি বেদান্ত।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত তত্ত্বের উপদেশ সন্নিবেশিত, তাহা চারপ্রকার—

১। আত্মতত্ত্ব।

২। যোগসাধন।

৩। সন্ন্যাস।

৪। অবতারবাদ ও কৃষ্ণ-বিষ্ণু-শিবের দেবত্বপ্রতিষ্ঠা।

গীতার কালনিরূপণ করিতে হইলে ইহাকে কঠাদি দ্বিতীয়শ্রেণীর পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই শ্রেণীর উপনিষদের উপদেশ ও ভাবার্থ গীতায় অনুকরণীয়; এমন কি, ইহাদের কতিপয় শ্লোক গীতার মধ্যে সশরীরে সমানীত দেখা যায়।

অথর্ব্বোপনিষদের সহিত গীতোক্ত উপদেশের সমধিক সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। অপরাপর তত্ত্ব ছাড়িয়া অবতারবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কিয়ৎপরিমাণে গীতার কালনির্ণয়ের সন্ধান পাইতে পারি। গীতার যে অবতারবাদের কথা আছে, তাহা বেদে নাই, ব্রাহ্মণে নাই, আদ্যোপনিষদ্গুলিতেও নাই। ঈশ্বরের অবতারকল্পনা—কৃষ্ণ বিষ্ণু-শিবের ঈশ্বরত্বস্থাপন—সাম্প্রদায়িক ভাবে আর্য্যধর্ম্মের এইরূপ পরিবর্ত্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পরিচায়ক। এই হিসাবে গীতাকে অথর্ব্বোপনিষদের সমকালবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না।

গীতার পূর্ব্বে যে আমাদের দর্শনশাস্ত্রসকল প্রণীত হইয়াছিল—সাংখ্যদর্শন, যোগ ও বেদান্তদর্শন—শুধু মুখে মুখে অসম্বদ্ধ, অসম্পূর্ণ কথায় নয়, কিন্তু শাস্ত্র বা সূত্রাকারে গীতার সময় সে সমস্ত প্রচলিত ছিল, গীতার মধ্য হইতেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। গীতায় সাংখ্যতত্ত্বসকল বিস্তারিতরূপে উপদিষ্ট—

* Macdonell's Sanskrit Literature.

সাংখ্যদর্শনকে গীতার দার্শনিক ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতার সময় সাংখ্যশাস্ত্র [illegible] গঠিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ আছে। তাহার সাক্ষী অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৩শ ও ১৯শ শ্লোক দেখ। ১৩শ শ্লোকের "সাংখ্যে কৃতান্তে" অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্তে এবং ১৯শ শ্লোকোক্ত 'গুণসংখ্যানে' অর্থাৎ গুণের সংখ্যাকরণে—ভাষ্যকারেরা এই বাক্যগুলি সাংখ্যশাস্ত্র অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে যে, তখনকার কালে সাংখ্যদর্শন [illegible] পরিণত হইয়াছে।

যোগদর্শনও গীতার আদরের বস্তু। ইহার এক নামই যোগশাস্ত্র। জ্ঞানযোগে সাংখ্য, কর্মযোগে যোগশাস্ত্র—গীতার অবলম্বন। আমরা দেখিতে পাই যে, পাতঞ্জলদর্শনের যোগসাধনপ্রণালী গীতোপদেশের অন্তর্ভূত [illegible] প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তি-[illegible] কথা যাহা কিছু নূতন তাহাই গীতার নিজস্ব সম্পত্তি। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে যোগশাস্ত্রসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"[illegible] পুরাতন যোগশাস্ত্র কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়াছিল; হে পরন্তপ! তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ-উক্ত রহস্য আমি আজ তোমাকে বলিলাম।" [illegible] সহিত গীতার [illegible] ঘনিষ্ঠ [illegible] বুঝিবার আবশ্যক [illegible] প্রতীয়মান হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে গীতার সময় বেদান্তদর্শনের অস্তিত্ব ও লোকসমাজে প্রচার সহজেই প্রতিপন্ন হয়। ইহা ছাড়া, ১৩শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকোক্ত 'ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব' কথাগুলি এই প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য, উহা পরে আলোচিত হইবে।

উল্লিখিত দর্শনত্রয়ের মধ্যে সাংখ্যই প্রাচীনতম। কপিলমুনি সাংখ্যশাস্ত্রের আদি-গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বৌদ্ধযুগেরও পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বলিয়া ধারণা হয়, কেন না, বৌদ্ধধর্ম্মে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রভাব বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, আর বৌদ্ধদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিল-বাস্তু, কপিলের নাম হইতেই তাহার নামকরণ হয়। সে যাহা হউক, কপিলের স্বরচিত কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাংখ্যসূত্র পাইয়াছি, তাহা অপেক্ষা-কৃত আধুনিক। গীতার সময় দর্শনশাস্ত্র সকল কি আকারে প্রচলিত ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। যদি এমন মনে করা যায় যে, সে সময় পাতঞ্জলদর্শন বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে গীতার প্রণয়নকাল খৃঃ পূঃ দুই শতাব্দীরও উত্তরকাল হইয়া পড়ে।

কিন্তু যদিও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রাচীনত্ব-

[illegible] তাহার [illegible] করেন—"আমি তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু।" যদি

হইতে সংগৃহীত—সেই সমস্ত দর্শনের সমন্বয়-সাধনেই গীতার বিশেষত্ব, তখন গীতার কাল

নিদানপক্ষে দর্শনসূত্রসঙ্কলনের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মরক্ষণের প্রতি গীতার বিশেষ লক্ষ্য। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে সমাজ-বিপ্লবের আশঙ্কা উহাতে পদে পদে সূচিত হইতেছে। পরধর্ম্মের তুলনায় স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, পরধর্ম্মাবলম্বন বিনাশের মূল— এইরূপ উপদেশ আর্য্যসমাজের আদিম অবস্থার কথা নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সমাজে যে ঘোরতর জাতিবিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লব নিবারণ করা ঐ সমস্ত উপদেশের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এ অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে গীতাকে বুদ্ধের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন ভক্তোপাসনা, সাকারবাদ ও ভক্তিযোগের কথাসকল আধুনিক কালের অনুকূল সাক্ষ্য প্রদান করে।

সূত্রসাহিত্যের পর মহাভারত ও মনু-সংহিতার উল্লেখ করিতে হয়। ইহাদের প্রভাবও গীতার স্থানে স্থানে উপলব্ধি করা যায়। সৃষ্টিপ্রকরণ, বর্ণাশ্রমের কর্ম্মবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে মনুর সহিত গীতার সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, গদাচক্র-ধারী বিষ্ণু, সেনাপতি স্কন্দ, সমুদ্রমন্থনপ্রসূত উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, মরুদাদির কথা হইতে মহাভারত ও পৌরাণিক আখ্যানসকল স্মরণপথে উদিত হয়। মহাভারতে আছে, ভীষ্মদেব দেহত্যাগের পূর্ব্বে সদ্গতিলাভার্থ শরশয্যায় উত্তরায়ণ প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। গীতাও উপদেশ দিতেছেন যে, যোগীর উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ হইলে সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়। মোক্ষ অর্থে নির্ব্বাণশব্দের প্রয়োগ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। মহাভারতের সাদৃশ্য হইতে গীতার কাল-নির্ণয়ের বিশেষ কোন সাহায্য হয় কি না, দেখা যাউক।

মহাভারত যদি একসময়কার রচনা হইত ও তাহার রচনাকাল অকাট্য প্রমাণদ্বারা নিরূপণ করা সুসাধ্য হইত, তাহা হইলে গীতা মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া তাহার কালনির্ণয়ে আমরা অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম, কিন্তু সে পথ বন্ধ। বঙ্কিমবাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে মহাভারতের মধ্য হইতেই দেখাইয়াছেন যে, মহাভারতের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথমটি আদিম কঙ্কাল, তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনু-ষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ছিল আর কিছুই নাই। ইহা চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। প্রথম-শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেই অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয়-শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবে-চনা করা যাইতে পারে। প্রথম স্তরে ও দ্বিতীয় স্তরে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অব-তার বলিয়া সুচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন ঐশী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টত বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চ্চিত; নিজেও নিজের

ঈশ্বরত্ব ঘোষণা করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষপ্রকারে যত্নশীল। ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরো এক স্তর আছে, তাহা তৃতীয় স্তর। এই তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথা ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও মহাভারতকে স্তরে স্তরে বিভক্ত করেন—

১। আদিম কঙ্কাল (কাব্য)।

২। চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রী সংহিতা (মহাকাব্য)।

৩। স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের আকার।

৪। পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তাংশ।

তাঁহাদের মতে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাভারতের ব্যাপ্তিকাল। প্রায় সহস্র বৎসরে সহস্র শ্লোক লক্ষাধিক শ্লোকে পুষ্টিলাভ করিয়াছে—বীররসাত্মক কাব্য তাহার এই বর্ত্তমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে। এইকালমধ্যে কৃষ্ণ সামান্য নর, নরোত্তম, নারায়ণ—মনুষ্য হইতে ক্রমে দেবতার পদে সমারূঢ় হইয়াছেন।

এই সংযোজনার মধ্যে গীতা কোন্ স্তরে স্থাপিত হইতে পারে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবদ্গীতা ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত, কিন্তু গীতা মহাভারতের প্রক্ষিপ্তাংশ কি না এবং কোন্ সময়েই বা প্রক্ষিপ্ত, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বিস্তর বাদানুবাদ চলিতেছে। অতএব ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত বলিলেও গীতার কালনির্ণয় অধিকদূর অগ্রসর হয় না। মহাভারতের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে—তাহা এই—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ। আদি, ১ম, ১৭১

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দুঃখাভিভূত হইয়া রথোপস্থে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন, হে সঞ্জয়, আমি বিজয়ের আশা পরিত্যাগ করিলাম।" কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? ইহাতে ত গীতার নামোল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে যে, এইশ্লোকোক্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী কোনকালে গীতা রচিত হইয়াছিল, যেমন মহাভারতের শকুন্তলাখ্যান অবলম্বন করিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল বিরচিত। তাহা ছাড়া, উক্ত শ্লোক কোন্ স্তরের অন্তর্গত, তাহা নিরূপণ করাও সহজ নহে। মহাত্মা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ বাহ্যাভ্যন্তর নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গীতানুবাদের উপক্রমণিকায় গীতার জন্মকাল অন্তত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী অনুমান করেন। গীতার ভাষা, ছন্দ, রচনাপ্রণালী, দর্শন, বেদ-যজ্ঞ-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে উহার মতামত ইত্যাদি বিষয় লইয়া আভ্যন্তরিক প্রমাণ। গীতার কালনির্ণয়ের উপযোগী বাহ্যপ্রমাণ যাহা পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যুক্তির সারাংশ এই:—

"তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্যকার—শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর লোক, অতএব গীতাগ্রন্থখানি অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিল, ইহা নিশ্চিত।

'কাদম্বরী' প্রণেতা বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। তাহার একস্থানে রাজবাটী-বর্ণনায় মহাভারতের সহিত রাজার প্রাসাদের উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং "অনন্তগীতাকর্ণনানন্দিতনর" এই শব্দগুলি সেই প্রাসাদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। এই বিশেষণ প্রাসাদের প্রতি প্রয়োগ এবং মহাভারতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে তার দুই ভিন্নার্থ হয়। প্রাসাদে প্রযুক্ত হইলে এই অর্থ হয় যে, সেখানকার লোকেরা অনন্ত গীতশ্রবণে আমোদিত। মহাভারতের সম্বন্ধে এই যে, লোকেরা সেখানে অনন্তগীতা অর্থাৎ ভগবদ্গীতা শ্রবণে আনন্দিত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাদম্বরীরচনার সময় মহাভারত ও গীতা পাঠ জনসাধারণে প্রচলিত ছিল।

বাণভট্টের হর্ষচরিতে কবি কালিদাসের নামোল্লেখ আছে, সুতরাং বাণভট্টের পূর্ব্বে কালিদাসের জন্মকাল বলা যাইতে পারে। কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত, ইহা একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। কালিদাসের কাব্যে গীতার বচন হইতে উদ্ধৃত শ্লোক দৃষ্ট হয়। দুইএকটি উদাহরণ দিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মহাত্মা তেলঙ্গ রঘুবংশ হইতে একটি দিয়াছেন, তাহা দশম সর্গে দেবতাদের বিষ্ণুস্তবের ৩১তম শ্লোক—

অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকো হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ॥
কি আছে অলব্ধ কিম্বা অপ্রাপ্য তোমার,
নিত্য পরিপূর্ণ, প্রভু, বিশ্বের আধার?
জনম-করম তবু করিছ গ্রহণ।
কেবল লোকের হিত করিতে সাধন॥

নবীনচন্দ্র দাস।

ইহা হইতে গীতার অনেক স্থানের শ্লোক ও ভাবার্থ স্মরণ হয়। ভগবানের যে কোন কর্ত্তব্য নাই, লোকানুগ্রহের জন্যই তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত, তাহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ২০শ হইতে ২৪শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের "দিব্য জন্ম কর্ম্ম" এই বাক্যগুলি শব্দশ অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪/৯

বিষ্ণুস্তবের আর একটি শ্লোক আমার মনে হইতেছে—

(২৭) ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণাম্ অভূয়ঃসন্নিবৃত্তয়ে॥
বিষয়বিরাগমতি যেই যতিগণ
যোগবলে নিজ চিত্ত নিবেশি তোমায়।
সর্ব্বকর্ম্ম তোমা'পরে করে সমর্পণ
মোক্ষগতি পায় তারা তোমারই কৃপায়॥

নবীনচন্দ্র দাস।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

এ দুয়ের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য, তাহা বিনা ঋণগ্রহণে উৎপন্ন হইতে পারে না।

আবার, কুমারসম্ভবের ষষ্ঠ সর্গে ৬৭তম শ্লোকে সপ্তর্ষিদের মুখে হিমালয় স্থাবর বলিয়া বর্ণিত। গীতার বিভূতিযোগাধ্যায়েও ভগবান্ "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" বলিয়া আত্মবর্ণন করিতেছেন। মল্লিনাথ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যথার্থই লিখিয়াছেন—"'স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ' ইতি গীতাবচনাৎ।"

এই কয়েকটি উদাহরণ হইতে কালিদাসের কাব্যে গীতার আভাস সহজেই উপলব্ধ হয়, সুতরাং গীতা পঞ্চমশতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত গীতানুবাদকের সহিত আমাদের এক মত। অতঃপর তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, গীতা বেদান্তসূত্র অপেক্ষাও প্রাচীন। এই মত সমর্থনে তিনি যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা তাহা অনুসরণ করিতে পারিলাম না। বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র প্রাচীনশাস্ত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে গীতার কোন নামোল্লেখ নাই। কোন কোন সূত্রে প্রমাণস্বরূপ স্মৃতির কথা আছে বটে, কিন্তু সে কোন্ স্মৃতি, তাহার নির্দ্দেশ নাই। ভাষ্যকারেরা বলেন, সে স্মৃতি গীতা, কিন্তু সে তাঁহাদের নিজের মত, তাহার পৃষ্ঠপোষকপ্রমাণাভাব। অন্যান্য পণ্ডিতেরা ইহাতে মতভেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বেদান্তসূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র —গীতা স্বয়ং একস্থানে সেই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩/৫

"ঋষিগণকর্ত্তৃক বিবিধ ছন্দে এবং হেতুবিশিষ্ট সুনিশ্চিত 'ব্রহ্মসূত্র'পদ দ্বারা উহা (ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব) পৃথক্‌রূপে বহুধা গীত হইয়াছে।"

ভট্ট মোক্ষমূলর তাঁহার প্রণীত ষড়্‌দর্শনে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লোকে 'ব্রহ্মসূত্র' পদে 'বেদান্তসূত্র' বুঝিতে হইবে। "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই দুই বিশেষণ সূত্রশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। বেদান্তসূত্রে যে স্মৃতির প্রমাণ কথিত আছে, তাহা গীতা ভিন্ন অন্য কোন স্মৃতি হইতে পারে—স্মৃতির মূল যে শ্রুতি, তাহার বচনও হইতে পারে; এ বিষয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যেও মতভেদ; কিন্তু, তাঁহারা যাহাই বলুন, গীতোক্ত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসূত্রের অর্থে গৃহীত হওয়া যতদূর সঙ্গত, তাহার বিপরীতপক্ষে তাঁহাদের ব্যাখ্যা তেমন প্রতীতিজনক নহে।

অতএব গীতার কালনির্ণয়সম্বন্ধে তেলঙ্গমহোদয় যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ ধরিবার নাই, এমন নহে। সে যাহা হউক, তিনি গীতার যে জন্মকাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও উহাকে দূরে ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না—বরং আরো উত্তরকালীন বলিলেও বলা যাইতে পারে। অনেকানেক সমীচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের পক্ষপাতী। গীতার সময় প্রাচীন যোগশাস্ত্র লুপ্তপ্রায়, ইহাতে তাহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হইতেছে। কাপিল সাংখ্যও এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে যে, কপিলমুনি সিদ্ধযোগীর পদে সমারূঢ় হইয়াছেন। ১০/২৬ ব্যাসদেবও অসিত-দেবলের সঙ্গে দেবর্ষিমধ্যে পরিগণিত। ১০/১৩ তাহা ছাড়া, গীতার ভাষাও বৈদিক নহে, সামান্য ব্যতিক্রম বাদে আধুনিক সংস্কৃত, ইত্যাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গীতার প্রণয়নকাল বহু প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায় না। উপনিষদের অথর্ব্বভাগ, মহাভারতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের গঠনকাল যাহা, গীতার রচনাকাল মোটের উপর তাহাই ধরা যাইতে

পারে—বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্ত্তী —খৃষ্টাব্দপ্রবর্ত্তনের কিছুকাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সঙ্গত। যাহা হউক, এ সকলই অনুমানের উপর নির্ভর, আমি এ বিষয়ে কোন অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এ কথা বলিতে সাহস করি না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজি।

আজি পূর্ণ হ'ত যদি আজিকারি মাঝে!
তপনখচিত এই নভ চন্দ্রাতপ,
সুগভীর নীল ছটা মাথায় বিরাজে,
বান্ধববিটপী যত পল্লব-সৌষ্ঠব
বিকাশে কবির মত সুন্দর প্রচুর,—
সহকারে বাড়ে ফল নিটোল কঠিন
সরস কৈশোরসম! তপ্ত সুমধুর
সোমরসসম আলো! জরালসহীন
সারাদিন চলে যায়—ক্ষণে কর্ম্মপর,
ক্ষণে নেত্রবারিমোছা, ব্যথিত অন্তর,—
কভু তীব্র রৌদ্রালোকে বহ্নিময় পথে
চলে যাওয়া বহুদূর বাধাহীন পদে,
কভু স্থির বসে থাকা ক্ষান্ত দিয়া কাজে!
আজি পূর্ণ হয়ে যাক্ আজিকার মাঝে।

৺সতীশচন্দ্র রায়।

স্মৃতিমন্দির।

পৃথিবীপতি বাদশাহ্ তাঁহার মর্ম্মবেদনার ছবি শ্বেতমর্ম্মরে রচনা করিয়া রাজধানী আগ্রার উপান্তভাগে যমুনাতীরে রাখিয়া গিয়াছেন। আগ্রার তাজমহল শাজাহান বাদশাহের তুষারধবল পাষাণময় শোকাশ্রু। আজ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, সে বাদশাহ নাই এবং যাঁহার অবশেষের উপর এই শোকমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্ত শোক করিবার ইহ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। কিন্তু এই বিয়োগবিধুর প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাসের ছবি দেখিয়া আজ পর্য্যন্ত কতশত মৃত্যুপীড়িত নরনারীর হৃদয়তল হইতে রুদ্ধশোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কে তাহার অনুসন্ধান করে। আসমুদ্র-হিমাচলবিস্তৃত সাম্রাজ্যের একাধীশ্বর, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত যাঁহার সিংহাসন, কেশববক্ষোবিলম্বিত-কৌস্তভনিন্দিত কোহিনুর যাঁহার শিরোভূষণ, ত্রিংশৎকোটি মানব যাঁহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা যোড়হস্ত, সেই সাহান-সাহা বাদশাহ শতচেষ্টাতেও একটিমাত্র নারীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। হায়! মানব, তোমার ক্ষমতা এতই তুচ্ছ, তুমি এতই দুর্ব্বল!

শোকের সান্ত্বনা, সুখের সহচরী, রোগের সেবা, অবসরের চিত্তবিনোদন, সংসারমরুভূমির সুশীতলচ্ছায়া-রূপিণী মহিষীকে বাহুবেষ্টনের মধ্যে রাখিতে শাজাহান কি না করিতে পারিতেন। কিন্তু কৈ, তাঁহার হৃদয়পিঞ্জরের পক্ষিণী আর্‌যুমন্দ্‌বানু কৈ রহিল? সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, বহুবর্ষ ধরিয়া যে পার্শ্বচরী ছিল, হঠাৎ তাহাকে হারাইয়া এক নিমিষে বিশাল বিশ্বে নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন, একাকী হওয়া কি কঠিন, তাহা যাহার সে দুঃখ ঘটিয়াছে, সেই জানে। সূর্য্যচন্দ্রের যেখানে গতিরোধ, বায়ু যেখানে ধীরে প্রবাহিত হয়, সেই মোগলরাজান্তঃপুরে সবলে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বহর কাল যখন বাদশাহের প্রেমবেষ্টন হইতে রাজমহিষীকে হরণ করিল, শাজাহানের তাৎকালিক মনোভাব অনুভবযোগ্য মাত্র, বর্ণনাতীত। শোকের প্রথমোচ্ছ্বাস অতিবাহিত হইলে, মৃত্যুকে যথাসম্ভব সুন্দর, রমণীয় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে বাদশাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন;—এ ইচ্ছা স্বাভাবিক। জীবিত থাকিতে যাহার ভাবনা আমরা ভাবি, যাহার জন্ত আমরা কাজ করি, যাহার প্রয়োজন সাধন করিয়া দিয়া আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করি, মৃত্যুর পরেও তাহারি ভাবনা ভাবিতে, তাহারি উদ্দেশে কাজ করিতে আমাদের মন চাহে—ইহা প্রেমের ধর্ম্ম। আমাদের প্রেমের পাত্র মৃত্যুর অধীন বটে, কিন্তু প্রেম চিরজীবী। ইহসংসারে আমাদের প্রেম ব্যর্থ, মর্ম্মাহত হইতে পারে; যম আমাদের প্রেমের পাত্রকে সময়ে-অসময়ে আমাদের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে; কিন্তু সেই ব্যর্থ, মর্ম্মাহত, বিয়োগপীড়িত প্রেম সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে প্রেমভাজনকে অনুসরণ করে—তাহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। অবরোধসৌন্দর্য্যের শিরোমণি মমতাজকে বাদশাহ যে ভালবাসিতেন, সেই অনির্ভিন্ন গভীর ভালবাসাই এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মৃত্যু-মন্দিরের সৃষ্টিকর্ত্তা। নচেৎ অর্থ, অহঙ্কার ও ক্ষমতার সাধ্য কি যে, পাষাণমন্দির এমন সুন্দর করিয়া রচিতে পারে, পাষাণে এত কোমলতাসন্নিবেশ করিতে পারে, প্রস্তরকে এমন শোকনম্র করিয়া তুলিতে পারে।

শশিসূর্য্যবিরাজিত, নক্ষত্রখচিত, উদার, উন্মুক্ত, নীল নভোমণ্ডলের নিম্নে, ইহপর-লোকব্যাপী অসীম প্রেমের কি মহিমান্বিত ছবি! যুগযুগান্তের সাক্ষিস্বরূপিণী, স্নেহধারপ্রবাহিণী শীতসলিলা যমুনার নিকট—আজ কত-কালের কথা—শুনিয়াছি একদা বিয়োগ-বিধুরা ব্রজবালা তাহার মর্ম্মবেদনা শুনাইয়া-ছিল। দুনিয়ার মালিক মোগলবাদশাহ বিশ্ববিজয়ী মৃত্যুর নিকট পরাজিত হইয়া জীবিতরূপিণী মহিষীর শবদেহ বুকে করিয়া সজলনয়নে সন্তপ্তের চিরশান্তি সেই যমুনার কাছে আসিয়াছিলেন। শাজাহান আজ নাই, কিন্তু করুণাময়ী কালিন্দী বাদশাহের দুঃখভার আজও বুকে করিয়া বহিতেছে;—সুস্নিগ্ধ প্রভাতে, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়, নিবিড়-নিস্তব্ধ নিশীথে তুষারশীতল জলধারায় ভূপতির এই মৃত্যুজ্বালা ধুইয়া-লইয়া অনন্ত মহাসাগরে ফেলিতেছে। যুগ-যুগান্তজীবী প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যে অনিন্দ্যসুন্দর শ্মশানচ্ছবির চতুর্দ্দিকস্থ মহা-শূন্যে রাজাধিরাজের শোকশ্বাস আজিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাই হে প্রেমিক, তোমার শোক আজ বিশ্বব্যাপী—জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—সমগ্র বিশ্বের মৃত্যুপীড়িত নর-নারী সেই শোক অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়া তোমার শোকসাক্ষী, যমুনাসৈকতস্থিত প্রস্তরীভূত দীর্ঘশ্বাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতেছে।

হে পরলোকগতা রাজরাজেশ্বরি আর্য্যমন্দ-বানু, তুমি ঐশ্বর্য্য ও বিদ্বেষ পরিপূর্ণ সপত্নী-বহুল মোগলরাজান্তঃপুরে সুখে ছিলে কি দুঃখে ছিলে, তাহা তুমিই জান। কল্পনার বলে ঐতিহাসিকবৃন্দ, যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ দিল্লীশ্বরের হৃদয়ে তোমার কি-পরিমাণ স্থান ছিল, তাহা বোধ হয় তুমি অথবা সম্রাট্‌ কেহই জানিতে না। যে ইহ-লোক হইতে চলিয়া গেলে পৃথিবীর সব সুখ, সব আনন্দ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া যায়, জীবন তুচ্ছ ও দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হয়, জীবিত থাকিতে সে যে আমাদের কত আত্মীয়, কত নিকট ছিল, তাহা তাহাকে জানাইবার আমাদের অবসর হয় না, ইহা সংসারের অতি-বড় প্রাচীন এবং অতি-বড় কঠিন দুঃখ। শাজাহানের বুঝি সেই দুঃখই ঘটিয়াছিল। অকারণ-অশনিসম্পাত-তুল্য সুস্থকায়া প্রসূতিকা মহিষীর মৃত্যুসংবাদ যখন বাদশাহ পাইলেন, রাজকার্য্যনিরত স্বল্পাবসর শাজাহান তখনও বুঝি তোমাকে জানাইতে পারেন নাই—তুমি তাঁহার কত

প্রিয় ছিলে। তাই তোমার সমাধিমন্দিরে বাদশাহের এত ব্যাকুলতা আমরা দেখিতে পাই। বিশ-বৎসর ধরিয়া 'বলি বলি' করিয়া রাজ্যেশ্বর যে কথা বলিবার অবসর পান নাই, তোমার অবসানের পর প্রায় বিশ-বৎসর ধরিয়া 'তাজ' নির্ম্মাণ করিতে করিতে, তাহার প্রতি প্রস্তরসন্নিবেশের মধ্যে কত যত্নে বাদশাহ সে কথা কতবার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যাহার চক্ষু আছে, সে-ই দেখিতে পায়। রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট জীবিতকাল সমস্তই ঐ কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়াছেন, তথাপি রাজরাজেশ্বরের তৃপ্তি হইয়াছিল কি না, কে জানে। জরাজীর্ণ-দেহে, অবসন্নমনে, জীবনের সায়াহ্নে বাদশাহ যখন স্বীয়পুত্রকর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, তখন পুত্রের নিকট প্রাসাদমধ্যস্থ এমন একটি ঘর নির্জ্জনবাসের জন্য চাহিয়াছিলেন, যেখান হইতে দিনান্তে একবারও 'তাজ' দেখিতে পান। জীবনের শেষতম নিমেষে যখন কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত, তেজোহীন চক্ষুতারকায় মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তখনো বাদশাহ ইহপরকাল ভুলিয়া প্রাণপণে সুদূর সমাধিমন্দিরের প্রতি পলকহীন দৃষ্টি রাখিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

মোগলবাদশাহের অবরোধপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া করিয়া, প্রাসাদসংলগ্ন উপবনের গন্ধবায়ু সেবন করিয়া, সহস্রদর্পণখচিত মর্ম্মরগৃহে উৎসমুখনিঃসৃত সুগন্ধজলে স্নান করিয়া, পারসিক স্বর্ণসুরা পান করিয়া, মণিমাণিক্য-খচিত বহুমূল্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া, হিন্দুস্থানের বাদশাহের সহিত একত্রে ময়ূরসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সুখ পাইয়াছিলে কি না, জানি না। কিন্তু হে পরলোকবাসিনি, তোমার স্মৃতিটুকু লইয়া পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ জীবনের অবশিষ্টাংশ কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, যদি তোমার 'পরীলোকে' বসিয়া তাহা একবারও দেখিয়া থাক, তবে বোধ করি সুখ ও গর্ব্ব দুই-ই অনুভব করিয়াছ, এবং শাজাহানের জীবনব্যাপী তপস্যাও সার্থক হইয়াছে।

এ পৃথিবী হইতে যে একবার অবসর গ্রহণ করে, সে আর ফিরে না, আমাদিগকে পরলোকগত প্রিয়পাত্রের স্মৃতি লইয়াই থাকিতে হয়—উহাই আমাদিগের অবশিষ্ট জীবনযাত্রার সম্বল। কিন্তু নিরাকারব্রহ্মোপাসনার অধিকারী যেমন সকলে হইতে পারে না, তেমনি নিরবয়ব স্মৃতি সংসারের জ্বাল-জঞ্জাল হইতে যাবজ্জীবন স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল রাখা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাই আমরা স্মৃতির উদ্বোধক একটা-কিছু চাই, যাহা আমরা প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে রাখিতে পারি। অপরূপলালিত্য-পরিপূর্ণা, মহামহিমান্বিতা, পাষাণসুন্দরী 'তাজ' ব্যতীত এই রাজদম্পতির প্রেম আজ পর্য্যন্ত সুমহান্ মর্ত্ত্যলোকে কে জাগাইয়া রাখিতে পারিত বলিতে পারি না।

রক্তপাষাণবেদিকার উপরে শ্বেতপ্রস্তরাসন পাতিয়া, স্পন্দহীন-মহামৌন-পাষাণযোগিনী আজ সার্দ্ধদ্বিশত বর্ষ ধরিয়া লোকান্তরিত রাজমহিষীর পার্থিবদেহাবশেষ কোলে করিয়া মহাযোগে নিমগ্ন রহিয়াছে। সুদীর্ঘকালের তপোমাহাত্ম্যে পাষাণরাণীর দেহ

সর্ব্বপ্রকার-অনাবশ্যকবাহুল্য-বর্জ্জিত, তপঃপ্রভাবে তাহার প্রতি অঙ্গ দিয়া স্নিগ্ধ-কান্ত-সুনির্ম্মল লাবণ্যজ্যোতি গড়াইয়া পড়িতেছে। সমাধিশায়িতা সাম্রাজ্ঞীর প্রেমপ্রভাবে, প্রেমার্জ্জিতপুণ্যমহিমায়, নির্জ্জীব পাষাণপ্রতিমা অপূর্ব্বলাবণ্যময়ী প্রৌঢ়া সুন্দরীর সর্ব্বপ্রকার গরিমায় ও মহিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সুবৃহৎ তোরণদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার যে এই বাক্যহীনা সুন্দরী পাষাণীকে চক্ষু তুলিয়া দেখিয়াছে, তাহার চক্ষু সার্থক।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামশোভাসম্পন্ন উপবনমধ্যে অমল-ধবল পাষাণসুন্দরী 'তাজ'—অনন্ত-নীল চন্দ্রাতপতুল্য গগনতলে অমল-ধবল পাষাণসুন্দরী 'তাজ'—গোপাঙ্গনার আনন্দ-বর্দ্ধন নন্দনন্দনের নর্ম্মসহচরী নীলবসনা যমুনার উপকূলে পাষাণসুন্দরী 'তাজ'—অনন্তনীলিমাময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে 'তাজের' এই অনিন্দনীয় ধবল সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমাধিমন্দিরের কারুখচিত অভ্যন্তরশোভা দেখিলে মনে হয়, সম্পদ্-লালিতা রাজমহিষীর শেষনিবাস যথার্থ তাঁহার উপযুক্ত করিয়াই বাদশাহ রচিয়া গিয়াছেন। স্থপতির অদ্ভুত কৌশলে ভিত্তি-গাত্রে বিচিত্রবর্ণাঙ্কিত ফুল, পল্লব, পত্র, পক্ষি-গুলি যেন সজীব বলিয়া মনে হয়, অথচ সমাধিমধ্যস্থ পীতাভ ক্ষীণালোকে শোক-মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ দেখিলে মৃত্যুরাজ্যের উল্লাসবিহীন গম্ভীর ছায়া মনের উপরে আপনি আসিয়া পড়ে। আলোকপ্রবেশ-পথ প্রশস্ত হইলেও এরূপ সুকৌশলে স্থাপিত যে, প্রাণসঞ্চারক সূর্য্যরশ্মি প্রচুরপরিমাণে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুমন্দিরের সুগভীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দিতে পারে না। যে ক্ষীণা-লোকটুকু প্রবেশ করে, তাহা নবোদিত সূর্য্যের রক্তরশ্মি নহে, তাহা সমাধিমধ্যস্থ অন্ধকারের সহিত মিশিয়া পীতবর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, যেন সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ পূর্ব্বে রাজেন্দ্রাণীর জীবমানে যে সূর্য্যালোক ছিল, তাহারই কিয়দংশ যেন তাঁহার শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিমন্দিরে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজরাজেশ্বরীর বিচিত্রকারুকার্য্যখচিত সমাধির সন্নিহিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম-যাজকগণ যখন ভক্তিপরিপ্লুত গদগদকণ্ঠে নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতি পরাৎপর পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তন করে, তখন কবরচূড়ার অপূর্ব্ব নির্ম্মাণকৌশলে শ্রোতার মনে হয়, যেন ধীরে ধীরে বায়ুস্তরসকল ভেদ করিয়া ক্রমে অস্ফুটতর হইতে হইতে ভক্তমুখোচ্চারিত নামসঙ্কীর্ত্তন অনন্তের মহিমাময় সিংহাসন-তলে পৌঁছিতেছে। হে পরলোকগত পৃথ্বী-নাথ, অনাদিকাল হইতে যে প্রিয়বিরহ এবং অপ্রিয়সম্মিলনে বিধাতার বিশ্ব জর্জ্জরীভূত ও ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে, যে মৃত্যু আসিয়া দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে বিশ্বসংসারের সকল সৌন্দর্য্য, সকল আনন্দ হরণ করিয়া জীবনের অস্থিকঙ্কালগুলি আনিয়া জগতের চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছে, তাহা হইতে কাহারো অব্যাহতি নাই। যে সমস্ত উপাদান একত্র সম্মিলিত হইলে সুখ মানবের নিকট আপনি আসিয়া ধরা দেয়, তোমার তাহার একটিরো অভাব ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একটি-মাত্র ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, এক আঘাতে কে তোমাকে ভূলুণ্ঠিত করিল? কোথা হইতে

কি সূত্র অবলম্বন করিয়া, কোন্ সময়, কাহার উপরে, কি আঘাত আসিয়া পড়িবে, যিনি সর্ব্বকার্য্যকারণের নিদান, সেই সর্ব্বেশ্বর ভিন্ন এ কথার উত্তর কে দিবে ?

জন্ম এবং মৃত্যু, এ দুইটি জীবজগতের অতি-বড় বৃহৎ ঘটনা। জন্মের মধ্যে আমরা ভগবানের অজস্র করুণা দেখিয়া থাকি, এবং মৃত্যু ঘটিলেই কাতরকণ্ঠে বিধাতার নির্দ্দয়তা ঘোষণা করি ; কিন্তু জানি না, সেই নির্দ্দয়তার মধ্যে কি গভীর কল্যাণ জীবস্থিতের নিমিত্ত কল্যাণময় সঞ্চয় করিয়া রাখেন। নিদাঘসন্ধ্যার প্রবল ঝটিকা এবং প্রাণসংহারিণী বিদ্যুৎশিখাই আমরা দেখি, কিন্তু বিশ্বদেবতার স্নেহধারস্বরূপ নববারিধারায় যে সুমহৎ কল্যাণ সাধিত হয়, তৎপ্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

যে ইন্দ্রপ্রস্থে আজ তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, সেই বিস্তীর্ণ জনপদের উপভোগ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের যুদ্ধোন্মুখ বহু অক্ষৌহিণী বাহিনীর মধ্যে রথস্থাপন করিয়া, সাময়িক করুণায় কর্ত্তব্যবিরত মহাবীরের প্রতি উপদেশচ্ছলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সর্ব্বময় যোগেশ্বরের কল্যাণকর উপদেশবাক্যে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিত, তবে বোধ করি জীবনের আনন্দটুকু আমরা নিঃশেষে ভোগ করিতে পারিতাম, অপরিহার্য্য মৃত্যুভয়ে আমরা এত সন্ত্রস্ত ও কাতর হইতাম না ; কিন্তু তাহা হইবার নয়! তাই হে সম্রাট্, ইন্দুমতীর বিরহে সূর্য্যবংশীয় নরপতি বিলাপ করিয়াছেন, তুমি পাষাণময়ী বিলাপগীতি রচনা করিয়া গিয়াছ। পরবর্ত্তিগণের সে সাধ থাকিলেও বোধ করি সাধ্য নাই—তাহারা কেবল নিশীথনয়নজলে প্রিয়জনের পুণ্যস্মৃতিটুকু ধুইয়া ধুইয়া আজীবন অমলিন করিয়া রাখে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নিশীথিনী।

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা,
দিগন্ত মিলায় বনে, নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে মধুময় ধরণীর ফুল।
সেই আলো-প্রস্ফুটিত শতদল কুসুম সুন্দর,
তারি 'পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা, গভীর অন্তর

বিদারি', অতল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান,
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস-জোয়ারের টান !
রসভরা বহে বায়ু বনস্পতিশাখায় সঞ্চরি,
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি !
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লাগিছে শিশির,
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর।
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই,
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই !

৺সতীশচন্দ্র রায়।

হনুমান্।

যৌথ-পরিবারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং পত্নীর যেরূপ স্থান, ভৃত্য বা সচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান ; এই বিচিত্র প্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত হইয়া গৃহধর্ম্মকে কিরূপ অখণ্ড সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে পারে, —রামায়ণকাব্যে তাহা উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

হনুমান্ প্রথমত সুগ্রীবের সচিবরূপে রামলক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হন। ইনি সচিবোচিত সদ্‌গুণাবলীতে ভূষিত ; ইঁহার প্রথম আলাপ শ্রবণ করিয়াই রাম মুগ্ধচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—'এ ব্যক্তিকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হয়, ইহার বহুকথার মধ্যে একটিও অপশব্দ শ্রুত হইল না',—

"বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।"

"ঋক্, যজু ও সামবেদে পারদর্শী না হইলে এভাবে কেহ কথা কহিতে পারে না। ইহার মুখ, চক্ষু ও ভ্রূ দোষশূন্য এবং কণ্ঠোচ্চারিত বাণী হৃদয়হর্ষিণী।" অশোকবনে সীতার সঙ্গে পরিচয়ের প্রাক্কালে ইনি তাঁহার সহিত সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবেন কি না—মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইনি শাস্ত্রদর্শী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যই সচিবের প্রধান গুণ নহে—অটল প্রভুভক্তিও তাঁহার অত্যাবশ্যক গুণ।

সুগ্রীব বালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় প্রখরসৌরকরমণ্ডিত যবদ্বীপ, কোথায় রক্তিমাভ দুরতিক্রম্য লোহিতসাগরের খর্জ্জুর ও গুবাকতরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা দক্ষিণসমুদ্রের সীমান্তস্থিত স্থির অভ্রাবলীর ন্যায় পুষ্পিতকগিরি—পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীতচিত্তে সুগ্রীব

পর্য্যটন করিতেছিলেন। তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্ব্বদা তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ছিলেন, তন্মধ্যে হনুমান্ সর্ব্বপ্রধান। সুগ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য এক সময়ে একান্ত হতাশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়া গেল না—সুগ্রীবের নির্দ্দিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয়া গিয়াছে—অতঃপর সুগ্রীবের আদেশে তাহাদের শিরশ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, এই শঙ্কায় বানরবাহিনী আকুল হইয়া উঠিল;—তাহারা পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎপিপাসাতুর, নিরাশাগ্রস্ত এবং মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাসার তাড়নায় ইতস্তত পর্য্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ-চক্রবাক-দর্শনে এবং জল-ভারার্দ্র-শীতলবায়ু-স্পর্শে কোন জলাশয় অদূরবর্ত্তী বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা বহুক্রোশ-ব্যাপী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা পৃথিবীনিম্নে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবহুল মনোরম রাজ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইলে, তাহারা প্রাণের আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া পড়িল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ ও সেনাপতি তার সমস্ত বানরবৃন্দকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"কিষ্কিন্ধায় ফিরিয়া গেলে ক্রূরপ্রকৃতি সুগ্রীবের হস্তে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত, এস আমরা এই সুরক্ষিত সুন্দর অধিত্যকায় সুখে বাস করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।" সমস্ত বানরসৈন্য এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিল—"সুগ্রীব উগ্রস্বভাব এবং রাম স্ত্রৈণ। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইয়াছে, এখন রামের প্রীতির জন্য সুগ্রীব অবশ্যই আমাদিগকে হত্যা করিবে।" হনুমান্ সুগ্রীবকে ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করাতে অঙ্গদ উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন—"যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসমা তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অতি জঘন্য; বালি এই দুরাচারকে রক্ষকরূপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দুষ্ট প্রস্তরদ্বারা গর্ত্তের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, সুতরাং তাহাকে আর কিরূপে ধর্ম্মজ্ঞ বলিব? সুগ্রীব পাপী, কৃতঘ্ন ও চপল, সে স্বয়ং আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করে নাই, বীর রামই আমার যৌবরাজ্যের কারণ। রামের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছিল—লক্ষ্মণের ভয়ে জানকীর অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আবার ধর্ম্মজ্ঞান কি? সে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে—এখন জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে কেহ আর তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। সে গুণবান্ বা নির্গুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে—আমি শত্রুপুত্র।"

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও সুগ্রীবের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল।

এই উত্তেজিত সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে হনুমান্ অটলসঙ্কল্পারূঢ়। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"যুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না,

এই বানরমণ্ডলী লইয়া এই স্থানে আপনি রাজত্ব করিতে পারিবেন! বানরগণ চঞ্চল-স্বভাব, তাহারা এখানে স্ত্রীপুত্রহীন হইয়া কখনই আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এই জাম্ববান্, সুহোত্র, নীল এবং আমি,—আমাদিগকে আপনি সামদানাদি রাজগুণে কিংবা উৎকট দণ্ড দ্বারাও সুগ্রীব হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না। আপনি তারের বাক্যে এই গর্ত্তে অবস্থান নিরাপদ্ মনে করিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বাণে ইহার বিদারণ অতি অকিঞ্চিৎকর।"

বিপৎকালে এই ধৈর্য্য ও তেজ প্রকাশ করিয়া হনুমান্ বানরমণ্ডলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

হনুমান্ সুগ্রীবের শুধু আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্য ছিলেন না, সতত তাঁহাকে সুমন্ত্রণা এবং তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিয়া দিতেন। জগদ্ভ্রমণক্লান্ত সুগ্রীবকে ইনিই, মাতঙ্গমুনির আশ্রমসন্নিকটে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বালিবধের পরে যখন বর্ষাক্ষয়ে শরৎকালের সূচনায় গিরিনদীসমূহ মন্থরগতি হইল—তাহাদের পুলিনদেশ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্যাম সপ্তচ্ছদতরুর তরুণ পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃক্ষের কুসুমিত সৌন্দর্য্য গগনালম্বিত হইয়া গিরিসানুদেশে চিত্রপটের ন্যায় অঙ্কিত হইল, সেই সুখশরৎকালে কিষ্কিন্ধাপুরী রমণীগণের সমতালপদাক্ষর তন্ত্রীগীতে বিলাসের পর্য্যঙ্কে সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল,—সুগ্রীবের শুভ্র প্রাসাদশেখর কাঞ্চীর নিস্বন এবং স্খলিত হেমসূত্রের হিল্লোলে স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কিষ্কিন্ধার গিরিগুহার একটি স্থানে ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় কর্ত্তব্যের স্থিরচক্ষু জাগ্রত ছিল—তাহা বিলাসের মোহে ক্ষণেকের জন্যও আচ্ছন্ন হয় নাই, তাহা সতত প্রভুর হিতপন্থার প্রতি স্থিরলক্ষ্য ছিল। লক্ষ্মণের কিষ্কিন্ধাপ্রবেশের বহুপূর্ব্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হনুমান্ সুগ্রীবকে রামের সঙ্গে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত বানরবাহিনীকে রামকার্য্যে সমবেত করিবার জন্য আদেশ বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। সে আদেশ এই—

"ত্রিপঞ্চরাত্রাদূর্দ্ধং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ।
তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

'যে বানর পঞ্চদশ দিবসের পরে কিষ্কিন্ধায় উপস্থিত হইবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে—ইহাতে আর বিচারবিবেচনা নাই।'

ইহার পরে রোষস্ফুরিতাধরে লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধায় প্রবেশ করিলেন। বিলাসী সুগ্রীব বিপৎ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি না করিয়া ক্রূরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—

"ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্।
লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে॥
ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ।
মিত্রং ত্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্॥
সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্॥"

"আমি কোনরূপ অন্যায় আচরণ বা দুর্ব্যবহার করি নাই; রামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। লক্ষ্মণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি,

আমার ত ভয় করিবার কিছু নাই; তবে বিনা কারণে মিত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইমাত্র আশঙ্কা। মিত্রলাভ অতিসুলভ, কিন্তু মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন।'

তখন বড় বিভ্রাট দেখিয়া হনুমান্ কামবশীভূত সুগ্রীবকে অদূরস্থ পুষ্পিত-সপ্তচ্ছদবৃক্ষ দেখাইয়া শরৎকালের আবির্ভাব বুঝাইয়া দিলেন—"রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আর্ত্ত, তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, আপনি প্রতিশ্রুতিপালনে তৎপর হন নাই তাঁহারা দুঃখে পড়িয়া ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি পরিবারবর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষ্মণের পদে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তাঁহার শরে কিষ্কিন্ধা বিনষ্ট হইবে।" হনুমানের বাক্যে আতঙ্কিত হইয়া সুগ্রীব স্বীয়-কণ্ঠবিলম্বিত ক্রীড়ামাল্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষ্মণকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হনুমান্ সুগ্রীবকে শুভমন্ত্রণাদ্বারা অন্যায়পথ হইতে সাবধানে রক্ষা করিতেন,—শুধু আদেশ শ্রবণ ও অনুমোদন করিয়া যাইতেন না। এদিকে সুগ্রীবের বিরুদ্ধে কোন ষড়্যন্ত্র হইলে একাকী তিনি একশতের মত দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া তাহা নিবারণ করিতেন—সুগ্রীবের বিপৎকালে তাঁহার সমস্ত ক্লেশের সমধিকভাগ নিজে বহন করিতেন,—কিষ্কিন্ধার বিলাসহিল্লোল তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে বদ্ধলক্ষ্য চক্ষু ক্ষণেকের জন্যও বিলাসমোহাচ্ছন্ন হইতে দিতেন না।

সুগ্রীবের এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভৃত্য, শাস্ত্রদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষী সচিব, রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাঁহার গুণমুগ্ধ ও একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন।

রামলক্ষ্মণকে প্রথম দর্শন করিয়াই তাঁহার যে হৃদয়োচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম আলাপেই প্রকাশ পাইতেছে—

"বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন—আপনারা কে? আপনাদের বাহু আয়ত, সুবৃত্ত ও পরিঘোপম;—আপনারা দুইজনে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ। আপনাদের সুলক্ষণ দেহ সর্ব্বভূষণধারণযোগ্য—আপনারা ভূষণহীন কেন?"

রাম-সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল। সুগ্রীব যখন সমস্ত সৈন্য সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনুমান্‌কে স্বীয়-নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটি অভিজ্ঞানস্বরূপ সীতার জন্য দিয়াছিলেন, তাঁহার মন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল এ কার্য্যে হনুমান্‌ই সফলতা লাভ করিবেন।

নানাদিদেশ ঘুরিয়া সৈন্যবৃন্দ সীতার কোন খোঁজই পাইল না; বন্ধুর পর্ণপুষ্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহারা সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল। এই সময়ে তাহারা অনশনে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল,—সহসা জটায়ুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি তাহাদিগকে সীতার সন্ধান বলিয়া দিল—সীতা দূর সমুদ্রের পারে লঙ্কাপুরীতে আছেন, বানরগণের মধ্যে কেহ সেইখানে না গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা বিস্ময়ে, ভয়বিহ্বলচক্ষে অপার জলরাশি দেখিতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে চূর্ণতরঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে—সীমাহীন বিশাল সরিৎপতির তাণ্ডব-নর্ত্তন দূর-পাতাল-আকাশস্পর্শী,—উন্মাদনময় ফেনিল আবর্ত্তরাশি। তাহারা ভয়ব্যথিত হইয়া পড়িল,—কে এই অবধিশূন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে ? শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ একে একে দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং অস্ফুটবাক্ অনন্ত জলরাশির কলকল্লোল শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। অঙ্গদ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"পরপারে যাইতে পারি, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, সন্দেহ।" নৈরাশ্যবিহ্বল ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই অনিলোদ্ধূত ভ্রান্ত উর্ম্মিসঙ্কুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার সাধ্য কাহারও নাই—ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্যের মধ্যে হনুমান্ মৌনভাবে এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন,—বানরগণের নানা আশঙ্কা ও বিক্রমসূচক আলাপ তিনি নিঃশব্দে শুনিতেছিলেন—নিজে কোন কথাই বলেন নাই ; জাম্ববান্ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"বীর বানরলোকস্য সর্ব্বশাস্ত্রবিদাং বর।
তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনুমন্ কিং ন জল্পসি ॥"

"বানরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তার বরণীয় হনুমন্, তুমি একান্ত মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছ কেন ? এই বিষণ্ণ সৈন্যদিগকে আর কে উৎসাহ দিয়া কথা বলিবে—তুমি ভিন্ন এ কার্য্যের ভার আর কে লইতে পারে ?"

হনুমান্ শুধু আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ কার্য্য যে তাঁহারই,—তিনি তাহা জানিতেন। জাম্ববানের কথার উত্তর না দিয়া তিনি সচল হিমাচলের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে সমুত্থান করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অসীম সাহস ও স্বীয়শক্তিতে বিপুল আস্থা তাঁহার ললাটে একটি প্রদীপ্ত শিখা অঙ্কিত করিয়া দিল।

কি ভাবে তিনি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কবিকল্পনায় জড়িত হইয়া আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্রোশব্যাপী সমুদ্র তিনি বহু কৃচ্ছ্র ও বিপদ্ সহ্য করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—তিনি পথে বিশ্রামের জন্য মৈনাকপর্ব্বতের রম্য একটি শৃঙ্গ সম্মুখে প্রসারিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকার্য্য সম্পাদন না করিয়া বিশ্রাম করিতে তিনি ইচ্ছা করেন নাই ; তিনি বলিয়াছিলেন—

"যথা রাঘবনির্ম্মুক্তঃ শরঃ শ্বসনবিক্রমঃ।
গচ্ছেৎ তদ্বৎ গমিষ্যামি লঙ্কাং রাবণপালিতাম্ ॥"

প্রকৃতই তিনি রামকরনির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন। রামের ইচ্ছার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের ন্যায় আশুগতি হনুমান্ লঙ্কাপুরীতে উপস্থিত হইলেন।

লঙ্কায় পৌঁছিয়া হনুমান্ সরল, খর্জ্জুর ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ বেলাভূমির অদূরে স্বর্ণবর্ণ প্রাচীরের উর্দ্ধে সপ্ততল হর্ম্ম্যরাজির উচ্চশীর্ষ দেখিতে পাইলেন। পর্ব্বতশীর্ষস্থিত দুর্গম লঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং দুর্গাদির সংস্থান দেখিয়া হনুমান্ ভীত হইলেন। যে উৎসাহে তিনি পুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে উৎসাহ যেন সহসা দমিয়া গেল,

সুরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মুখে সহসা আশঙ্কার কথা উচ্চারিত হইল—

"ন হি যুদ্ধেন বৈ লঙ্কা শক্যা জেতুং সুরৈরপি।
ইমাস্তুবিষমাঃ লঙ্কাং দুর্গাং রাবণপালিতাম্।
প্রাপ্যাপি সুমহাবাহুঃ কিং করিষ্যতি রাঘবঃ॥"

'এই লঙ্কা দেবগণও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত এই দুর্গম, ভীষণ লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বা কি করিবেন!' যাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস—

"ন হি রামসমঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে ত্রিদশেষ্বপি।"

—'দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুল্য নহেন', তাঁহার অটল বিশ্বাসের মূলে যেন একটা আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দ্দেশে সুগন্ধি নীপ, প্রিয়ঙ্গু ও করবীতরু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভিত ছিল, হনুমান্ সেই দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রাত্রিকালে রাবণের শয্যাগৃহে যখন তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় তিনি চোরের ন্যায় সন্তর্পণে দেখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার নির্ভীক চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। হস্তিদন্তনির্ম্মিত উজ্জ্বলস্বর্ণমণ্ডিত খট্টায় মহার্ঘ আস্তরণ বিস্তারিত, তাহার এক পার্শ্বে শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় একটি ছত্র—তন্নিম্নে মহাবলশালী উগ্রমূর্ত্তি রাবণ প্রসুপ্ত—তাহাকে দেখিয়া—

" * * * পরমোদ্বিগ্নঃ সোঽপাসর্পৎ সুভীতবৎ।"

উদ্বিগ্নভাবে হনুমান্ ভীতচিত্তে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। অশোকবনে সীতার সম্মুখে উপস্থিত রাবণকে দেখিয়াও তাঁহার মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—

"স তথাপ্যুগ্রতেজাঃ সন্ নির্ধূতস্তস্য তেজসা।
পত্রে গুহ্যান্তরে সক্তো মতিমান্ সংবৃতোঽভবৎ।"

উগ্রমূর্ত্তি রাবণের তেজে তাড়িত হইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষের শাখাপল্লবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। কোন মহাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেশ্যের বিরাট্ ভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের কথা মনে করিয়া সময়ে সময়ে এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু হনুমানের উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে শীঘ্রই উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। তাঁহার লঙ্কাপরিদর্শনব্যাপারে তিনি কত চিন্তা ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাল্মীকি তাহার ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন।

প্রকাশ্যভাবে, তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং বৈদেহীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারে—

"ঘাতয়ন্তীহ কার্য্যাণি দূতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।"

পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে অনেক সময়ে দূতগণ কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে—সুতরাং স্পর্দ্ধা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছদ্মবেশে তিনি রাত্রিকালে লঙ্কা অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শনৈঃশনৈ নিশীথিনী আসিয়া লঙ্কার প্রতি বিলাসপ্রকোষ্ঠে প্রমোদদীপাবলী জ্বালিয়া দিল; হনুমান্ রাবণের বিশাল পুরীতে রমণীবৃন্দের বিচিত্র আমোদপ্রমোদ প্রত্যক্ষ করিলেন। পানশালায় শর্করাসব, ফলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সুরা বৃহৎ স্বর্ণভাজনে সজ্জিত ছিল; রাবণ এবং তাহার স্ত্রীগণ কুক্কুটের মাংস, দধিসিক্ত বরাহমাংস কতক আহার করিয়া কতক ফেলিয়া রাখিয়াছে; অম্ল ও লবণপাত্র এবং নানা-

প্রকার অর্দ্ধভক্ষিত ফল চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নৃত্যগীতক্লান্তা অঙ্গনাগণের অলসলুলিত দেহ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; নানাস্থান হইতে আহৃত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভুজসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্র-কুসুমখচিত মাল্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; একটু দূরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা লঙ্কাপুরীশ্বরী প্রসুপ্তা মন্দোদরীর স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় কান্তি দেখিয়া মনে করিলেন, এই সীতা। তাঁহার চেষ্টা কৃতার্থ হইল ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে সাশ্রুনেত্র হইলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামবিরহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা থাকিতে পারেন না, এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য শান্তির ভাব পতিপরায়ণা সীতার পক্ষে অসম্ভব। আবার হনুমান্ বিমর্ষ হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই তিনি নাই। হায়, সীতা কি রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইবার সময় স্বর্গের একটি স্খলিত মুক্তাহারের ন্যায় সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন, অথবা পঞ্জরাবদ্ধ শারিকার ন্যায় অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? রাবণের উৎপীড়নে হয় ত বা তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। যে রামচন্দ্র তাঁহার শোকে উন্মত্ত হইয়া অশোকপুষ্পগুচ্ছকে আলিঙ্গন দিতে ধাবিত হন, রাত্রিদিন যাঁহার চক্ষে নিদ্রা নাই, স্বপ্নেও যাঁহার মুখ হইতে 'সীতা' এই মধুরবাক্য নিঃসৃত হয়, সেই বিরহবিধুর প্রভুর নিকট হনুমান্ কি বলিয়া উপস্থিত হইবেন? ঊর্ম্মিময় ক্রীড়োন্মত্ত মহাবারিধির বেলাভূমিতে যে বিপুল বানরবাহিনী তাঁহার মুখ হইতে সীতার সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আকাশপানে তাকাইয়া আছে—তাহাদের নিকট তিনি যাইয়া কি বলিবেন? অনুসন্ধানশ্রান্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাশ্যের একটা প্রবল আবর্ত্ত আসিয়া পড়িল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে আশা আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইল; হনুমান্ লঙ্কার বিচিত্র হর্ম্ম্যসমূহ ও বিচিত্র কাননরাজি পুনরায় পর্য্যটন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, আশার মৃত্যুমন্ত্রে যেন তিনি পুনরায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রক্ষঃপ্রাসাদের সমস্ত স্থান তিনি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। রক্ষঃপুরীর বিশালতা তাঁহার নিকট শূন্যময় বলিয়া বোধ হইল। কোথায়ও সীতা নাই—সীতা জীবিত নাই,—হনুমান্ গভীর-নৈরাশ্য-মগ্ন হইয়া ক্লান্তপাদক্ষেপে কোথায় যাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। "রাজপুত্রদ্বয় এবং বানরবাহিনী আমার প্রতীক্ষায় আছে, আমি তাহাদের উদ্ধত আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব না। রামচন্দ্র নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, লক্ষ্মণ স্বীয় অগ্নিতুল্য শরদ্বারা নিজে ভস্মীভূত হইবেন—সুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে;—আমার প্রত্যাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী।" এই ভাবিয়া হনুমান্ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; কখনও বা রাবণকে বধ করিবার জন্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, —কখনও বা স্থির করিলেন—

"চিতাং কৃত্বা প্রবেক্ষ্যামি।"

'প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব'; "কিংবা সাগরোপকূলে অনশনে দেহত্যাগ করিব,"—

"শরীরং ভক্ষয়িষ্যন্তি বায়সাঃ শ্বাপদানি চ।"

'আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া

ফেলিবে।' কখনও বা ভাবিলেন, "আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বনে বনে জীবন কাটাইব।"

প্রভুর কার্য্য অথবা কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের যে ব্যগ্রতা হনুমানের চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্য কোথায়ও তাহা দেখা যায় না। রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"যাহি ভৃত্য নিযুক্তঃ সন্ ভর্তৃকর্ম্মণি দুষ্করে।
কুর্য্যাৎ তদনুরাগেণ তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥"

'যিনি প্রভুকর্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করেন,—তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। হনুমান্ প্রাণপণে এবং অনুরাগের সহিত রামের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রভুসেবার এই উন্নত আদর্শ ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া থাকে। হনুমান্ বিপুল শারীরিক শ্রম পণ্ড হইল দেখিয়া অধ্যাত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হইলেন।

"আমি নৈরাশ্যমগ্ন হইলে বহু ব্যক্তির আশা বিফল হইবে। বহু ব্যক্তির শান্তিসুখ আমার সফলতার উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং চিতাপ্রবেশ বা বানপ্রস্থ-অবলম্বন আমার পক্ষে উচিত হয় না। আমার উপর যে সুমহান্ ন্যাস অর্পিত, তাহার সাধনে যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়।" "সুতরাং,

"ইহৈব নিয়তাহারো বৎস্যামি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।"

'এই স্থানেই আমি ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক সংযতাহারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব।' তখন করজোড়ে হনুমান্ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ মৃদু বিকম্পিত হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিল—

"নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদ্‌গণেভ্যঃ॥"

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রুদ্র, যম, ইন্দ্র প্রভৃতিকে নমস্কার করিলেন এবং—"নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ"—সুগ্রীবকে নমস্কার করিয়া ধ্যানিবৎ স্থির হইয়া রহিলেন। তখন হনুমান্ স্বীয় হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইলেন। এবার তিনি হৃষ্টমনে সীতাকে খুঁজিতে অশোকবনে প্রবেশ করিলেন।

এস্থানে হনুমান্ সাধারণ ভৃত্য নহেন—সাধারণ সচিব নহেন, এস্থানে তিনি প্রভুভক্তির সিদ্ধতপস্বী, তপঃপ্রভাব তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। রাবণের অন্তঃপুরে তিনি যখন দেখিতে পাইলেন, স্খলিতহারা কোন রমণী অৰ্দ্ধনগ্নদেহে অপর একটি সুন্দরীকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, কোন সুলক্ষণা রমণীর দেহযষ্টি হইতে চেলাঞ্চল উড়িয়া গিয়াছে—নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাসবেগে কাহারও সুবৃত্ত বক্ষোজযুগল আন্দোলিত হইতেছে, আবার কোন রমণী ভুজান্তরসংলগ্ন বীণাকে গাঢ়রূপে পরিরম্ভণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে প্রসুপ্তা হইয়া আছে—তখন,

"জগাম মহতীং শঙ্কাং ধর্ম্মসাধ্বসশঙ্কিতঃ।
পরদারাবরোধস্য প্রসুপ্তস্য নিরীক্ষণম্।"

অন্তঃপুরের প্রসুপ্তপরস্ত্রী দর্শনে ধর্ম্ম লুপ্ত হইল, এই চিন্তায় হনুমান্ অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

"ইদং খলু মমাত্যর্থং ধর্ম্মলোপং করিষ্যতি।"

আজ নিশ্চয়ই আমার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল—এই আশঙ্কায় হনুমান্ বিকল হইলেন; কিন্তু তিনি তন্নতন্ন করিয়া স্বহৃদয় অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন—তথায় কোন কলঙ্কের রেখা পড়ে নাই।

"ন তু মে মনসা কিঞ্চিৎ বৈকৃত্যমুপপদ্যতে।"
"মনো হি হেতুঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তনে।
শুভাশুভাস্ববস্থাসু তচ্চ মে সুব্যবস্থিতম্॥"

'আমার চিত্তে বিকারের লেশ নাই; মনই ইন্দ্রিয়গণের পাপপুণ্যের প্রবর্ত্তক,—কিন্তু আমার মন শুভসঙ্কল্পে দৃঢ়।'—"আর বৈদেহীকে অনুসন্ধান করিতে হইলে, রমণীবৃন্দের মধ্যেই করিতে হইবে—তাহার উপায়ান্তর নাই।"

এই তাপসচরিত্র রামকার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির ইহাই প্রাক্-সূচনা। হনূমান্ অশোকবনে সীতার ম্লান, উপবাসশীর্ণ, ক্লিন্নকাষায়বাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন—রাবণ সহস্ররূপে শক্তিসম্পন্ন হউক—তাহার রক্ষা নাই। ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীস্বরূপিণী—রামের অমোঘ বাণ যদি প্রভাবশূন্য হয়, এই সাধ্বীর তপস্তেজ তাহাতে তীক্ষ্ণতা প্রদান করিবে। সীতা আপনিই আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থা অপর সহায় উপলক্ষ্যমাত্র, সীতা—"রক্ষিতা স্বেন শীলেন।" ধর্ম্মনিষ্ঠ হনূমান্ ধর্ম্মবল কি, তাহা জানিতেন; এইজন্যই সীতাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত আশঙ্কা দূরীভূত হইল,—আত্মপক্ষের বলের উপর প্রবল আস্থা জন্মিল।

এই নৈতিক পবিত্রতা আমরা কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাশা করি নাই। যেখানে বালির ন্যায় মহিমান্বিত রাজা স্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া দুন্দুভিকে হত্যা করেন, যেখানে রামসখা মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব জ্যেষ্ঠের জীবিতকালেই সেই জ্যেষ্ঠের পত্নীকে স্বীয় প্রমোদশয্যায় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যেখানে পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পানে মুক্তলজ্জা তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই—সেই কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে উগ্রতপা, তীক্ষ্ণনৈতিকবুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ত্তব্যকার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাসলেশবর্জ্জিত ও বিপদে অকুণ্ঠিত দাস্যভক্তির অবতার হনূমান্‌কে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে সীতার অনুসন্ধান করিয়াও যখন হনূমান্ বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্মশক্তির বিকাশ করিতে চেষ্টা করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল। তখন উন্নতকর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া তিনি তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এই বৃত্তির উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধনা ও পবিত্র জীবন তাঁহার ছিল।

তিনি এবার প্রফুল্ল, তাঁহার শ্রম এবার সার্থক হইবে,—সাফল্যের পূর্ব্বভরসা তিনি মনে মনে পাইলেন। অশোকবনে যাইয়া তিনি শিংশপাবৃক্ষ হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন,—সীতা সুখার্হা অথচ দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা, তিনি উপবাসকৃশা, পঙ্কদিগ্ধ পদ্মিনীর ন্যায়—"বিভাতি ন বিভাতি চ"—প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন না;—তাঁহার দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌষেয়বাস,—তাঁহার চতুর্দ্দিকে উৎকট স্বপ্নের ন্যায় একাক্ষী, শঙ্কুকর্ণা, লম্বিতস্তনী, ধ্বস্তকেশী, বিকট রাক্ষসীমূর্ত্তি,—নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বর্গীয় সুষমাকে পরিবেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে—কিন্তু সেই দীনা তাপসীমূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব ধৈর্য্য সূচিত।

"নাত্যর্থং ক্ষুভ্যতে দেবী গঙ্গেব জলদাগমে।"

'জলদাগমে গঙ্গার ন্যায় ইনি ক্ষোভরহিত।' যখন রাক্ষসীরা আসিয়া কেহ শূল দ্বারা তাঁহার প্লীহা উৎপাটন করিতে চাহিল,—হরিজটা, বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপ চেড়ীবৃন্দের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে "মুষ্টিমুদ্যম্য তর্জ্জতি", কেহ বা "ভ্রাময়তি মহৎ শূলং"—কেহ কেহ বা মাংসলোলুপ শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া তাণ্ডবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, তখন একবার সীতার সেই সুগম্ভীর ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল,—তিনি "ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি,"—ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার যখন রাবণ নানাপ্রকার লোভপ্রদর্শনেও তাঁহাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া মুষ্টিপ্রহার করিতে অগ্রসর হইল—ধান্যমালিনী আসিয়া রাবণকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—তখনও সীতার ধৈর্য্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপমানিতা সীতা ধূলিলুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু এই উৎকট বিপদ্‌রাশির মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় স্বীয় পুণ্যপ্রভায় দীপ্ত ছিলেন, তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বর্গের তেজ স্ফুরিত হইতেছিল। হনুমান্ এই বিপন্না সাধ্বীর প্রতি পূজকের ন্যায় ভক্তির চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষারূঢ় ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, প্রথমত তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইবেন, রাক্ষসগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে—তাঁহার সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই সমূহ গোলযোগ উৎপন্ন হইবে। চেড়ীগণ যখন ত্রিজটার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু দূরে গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরুর শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সুকেশীর বক্র কেশগুচ্ছ তাঁহার কর্ণান্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হনুমান্ শিংশপাবৃক্ষ হইতে মৃদুস্বরে রামের ইতিহাস কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; সহসা অনির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আশাতীতরূপে প্রিয় রামকথা শুনিয়া সীতার গণ্ড বাহিয়া অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল। তিনি স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষে শিংশপাবৃক্ষের ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন—তাঁহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশান্ত নিবিড়ভাবে তাঁহার মুখপদ্ম ঘিরিয়া পড়িল।

হনুমান্ এই সুযোগে করজোড়ে বলিতে লাগিলেন—

"কা নু পদ্মপলাশাক্ষি ক্লিষ্টকৌশেয়বাসিনি।
দ্রুমস্য শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে॥
কিমর্থং তব নেত্রাভ্যাং বারি স্রবতি শোকজম্।
পুণ্ডরীকপলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণমিবোদকম্॥"

'হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্লিষ্টকৌষেয়বাসিনি, অনিন্দিতে, আপনি কে, অশোকের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? পদ্মপলাশদলের ন্যায় আপনার দুইটি সুন্দর চক্ষু অশ্রুবর্ষণ করিতেছে কেন?'

সীতা নিজের পরিচয় দিয়া হনুমান্‌কে নিম্নে অবতরণ করিতে ইঙ্গিত করিলে, হনুমান্ তাঁহার দৌত্যের কথা সীতাকে জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু হনুমান্‌কে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া রাবণভ্রমে সীতা আতঙ্কিত হইলেন; তাঁহার কুন্দশুভ্র অঙ্গুলিগুলি অশোকের শাখা ছাড়িয়া দিল; তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; সেই ভয়ের মধ্যেও তিনি একটু আনন্দ পাইয়াছিলেন, একএকবার মনে করিতেছিলেন, ইঁহাকে দেখিয়া আমার চিত্ত হৃষ্ট হইতেছে কেন?

হনুমান্ তখন তাঁহার প্রতীতির জন্য রামের সমস্ত ইতিহাস তাঁহাকে শুনাইলেন শ্যামবর্ণ রাম এবং "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের দেহসৌষ্ঠব সমস্ত বর্ণন করিলেন—তখন সীতার বিশ্বাস হইল, হনুমান্ রামের দূত। বিপৎসমুদ্রে পতিতা সীতা সেই শেষরাত্রে যেন কূল পাইলেন,—আশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়া কিরণদান করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা হনুমান্‌কে শতশত প্রশ্ন করিলেন, রামের কার্য্যকলাপ, তাঁহার অভিপ্রায়—সমস্ত জানিয়া সীতা পুলকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হনুমানের নিকট রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক ছিল—তাহা তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ আনিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি তাহা দেন নাই। সাধারণ দূত সেই অঙ্গুরীয়ক দ্বারাই কথোপকথনের মুখবন্ধ করিত, কিন্তু হনুমান্ সেই বাহ্যচিহ্নের উপর ততটা মূল্য আরোপ করেন নাই। তাঁহার পরিচয়ে সীতার সম্পূর্ণ প্রতীতি উৎপাদন করিয়া শেষে অঙ্গুরীয়কটি দিয়াছিলেন।

সীতাকে তিনি পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া যাইবেন, এই প্রস্তাব করিলে সীতা স্বীকৃতা হইলেন না,—কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি হনুমানের প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল।

সীতার নিকট হইতে অভিজ্ঞানস্বরূপ চূড়ামণি লইয়া তিনি বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈন্যবল, সভা ও মন্ত্রণাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপে সমস্ত তথ্য অবগত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা তিনি উচিত মনে করিলেন না। এ সম্বন্ধে সুগ্রীব কি রাম তাঁহাকে কোন উপদেশই দেন নাই—তথাপি তাঁহার দৌত্য সম্পূর্ণরূপে সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক মনে করিলেন। তিনি যদি তস্করের মত ফিরিয়া যান, তবে তাঁহার জগজ্জয়ী মহাপ্রতাপশালী প্রভু রামচন্দ্রের ভৃত্যের যোগ্য কার্য্য করা হয় না, এই ভাবিয়া তিনি অশোকবনের তরুলতা উৎপাটন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যাইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, "কে এক মহাশক্তিধর বীর অশোকবন ভগ্ন করিয়া রাক্ষসগণকে ভয় দেখাইতেছে—সীতার সঙ্গে সে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছে।" রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল,—বহু রাক্ষসসৈন্য নষ্ট করিয়া হনুমান্ ধরা দিলেন। রাবণের সভায় আনীত হইলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল—তিনি বিষ্ণু, ইন্দ্র, কিংবা কুবের, ইঁহাদের মধ্যে কাহার দূত?

হনুমান্ বলিলেন—

"ধনদেন ন মে সখ্যং বিষ্ণুনা নাস্মি চোদিতঃ।"
"কেনচিদ্রামকার্য্যেণ আগতোহস্মি তবান্তিকম্॥"

'কুবেরের সঙ্গে আমার সখ্য নাই, বিষ্ণুও আমাকে পাঠান নাই, আমি রামের কোন কার্য্যের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।'

এই সভায় রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিপুল প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি রাবণকে ধর্ম্ম-সঙ্গত উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ অবহেলা করিলে লঙ্কার ভাবী বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া রাবণপ্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের জন্ম যেরূপ অবিচলিত সাহসে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাহাতে আমরা তাঁহার কর্ত্তব্য-কঠোর অটলসঙ্কল্পারূঢ় মূর্ত্তির আভাস পাইয়া চমৎকৃত হই। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী সম্রাটের সম্মুখে ধর্ম্মের কথা ধর্ম্মযাজকের মত কহিয়াছিলেন,—পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ন্যায় ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়-ভিত্তিতে বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিলেন,—ক্রুদ্ধ রাবণ যখন তাঁহার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করিল, তখনও তাঁহার উজ্জল উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,—তাঁহার প্রশস্ত ললাট একটুও ভয়কুঞ্চিত হয় নাই। বিভীষণের উপদেশে তাঁহার অপরপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

হনুমান্ যখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাঁহার পথপ্রেক্ষী বানরমণ্ডলীর নিকট সীতার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নিরাশাবিশীর্ণ মৃতকল্প কপিকুল এক বিশাল আনন্দকলরবে জাগিয়া উঠিল, তাহারা নাচিয়া-গাহিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।

হনুমান্ বহুকষ্ট সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছিলেন। আজ একদিনের জন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিলেন,—সেই আনন্দোচ্ছ্বাসে সমুদ্রের উপকূল টলমল্ করিতে লাগিল। সুগ্রীবের আদেশ-রক্ষিত মধুবনে যাইয়া তাহারা একটি প্লাবন বা ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় পতিত হইল,—মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বানর তাহাদিগকে বাধা দিতে যাইয়া প্রহার-জর্জ্জরিতদেহে পলায়ন করিল।

তখন হনুমান্ একদিনের জন্য বন্ধুজনের সঙ্গে মধু খাইয়া উন্মত্ত হইলেন। সকলে মিলিয়া তাহারা উৎসবের দিন কিভাবে কাটাইয়াছিল, বাল্মীকি তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

"গায়ন্তি কেচিৎ প্রহসন্তি কেচিৎ
নৃত্যন্তি কেচিৎ প্রণমন্তি কেচিৎ।"—

'কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ নাচিতে লাগিল, কেহ বা প্রণাম করিতে লাগিল।'

হনুমান্ লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই; তিনি রামকে লঙ্কার যে সকল অবস্থা জানাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। হনুমান্ জিজ্ঞাসিত হইয়া রামকে লঙ্কাসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"লঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দৃঢ়বদ্ধ ও অর্গলযুক্ত, উহার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড চারিটি দ্বার আছে। ঐ দ্বারে বৃহৎ প্রস্তর, শর ও যন্ত্রসকল সংগৃহীত রহিয়াছে। উপস্থিত হইবামাত্র প্রতিপক্ষসৈন্য তদ্দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বারে যন্ত্রসজ্জিত লৌহময় শত শত শতঘ্নী আছে। লঙ্কার চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর, উহা মণিরত্নখচিত ও দুর্লঙ্ঘ্য। উহার পরই একটি ভয়ঙ্কর পরিখা আছে। উহা অগাধ ও নক্র-কুম্ভীরপূর্ণ। প্রত্যেক দ্বারে একএকটি

বিস্তীর্ণ সেতু দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা যন্ত্র-লম্বিত, শত্রুসৈন্য উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্রদ্বারা সেতু রক্ষিত হয় এবং ঐ যন্ত্রবলেই তাহারা পরিখায় নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। লঙ্কায় নদীদুর্গ, পর্ব্বতদুর্গ ও চতুর্ব্বিধ কৃত্রিম দুর্গ আছে। ঐ পুরী দূরপ্রসারিত সমুদ্রের পারে। সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উহার চতুর্দ্দিক্ নিরুদ্দেশ।"

হনুমান্ গুণীর সম্মান জানিতেন। রাবণকে দেখিয়া হনুমানের মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। তাহার ধর্ম্মশূন্যতাদর্শনে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সচল হিমাদ্রির ন্যায় সমুন্নতদেহ রাক্ষসরাজের প্রতাপ দেখিয়া হনুমান্ বলিয়া উঠিয়াছিলেন —

"অহো রূপমহো ধৈর্য্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্ব্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্ম্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥"

'ইঁহার কি অপূর্ব্ব রূপ, কি ধৈর্য্য, কি শক্তি, কি কান্তি, সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি ইনি অধর্ম্মশীল না হইতেন, তবে সমস্ত দেবতারা, এমন কি ইন্দ্রও, ইঁহার আশ্রয়ভিক্ষা করিতে পারিতেন।' রামচন্দ্রকে হনুমান্ বলিয়াছিলেন —

"রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু ধীরস্বভাব ও সাবধান, তিনি স্বয়ংই সতত সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।"

রামায়ণের সর্ব্বত্র হনুমান্ আশা ও শান্তির কথা বহন করিয়া আনিয়াছেন। অশোকবনে সীতা যখন চেড়ীগণপীড়িতা হইয়া দুঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,—যখন লঙ্কাপুরী কালরজনীর মত তাঁহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন শুভ অঙ্গুরীয়কের অভিজ্ঞান লইয়া হনুমান্ তাঁহাকে নৈরাশ্যসমুদ্র হইতে আশার তরণীতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। রাম যখন বিরহখিন্ন হইয়া মরুভূর উত্তপ্তবায়ুপীড়িত পান্থের ন্যায় সীতার সংবাদের জন্য উন্মুখ হইয়াছিলেন—বানরসৈন্যগণ যখন সুগ্রীবকৃত প্রাণদণ্ডের ভয়ে শুষ্কমুখে কাতর নৈরাশ্যে সমুদ্রের ঊর্দ্ধচর দাত্যূহ ও টিট্টিভপক্ষীর গতিতে কোন সুসংবাদের প্রত্যাশা করিয়া আশঙ্কাপীড়িত হইয়াছিল—তখন হনুমান্ অমৃতৌষধির ন্যায় সুবার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া নৈরাশ্যের রাজ্য আশার কলকোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন। আর যেদিন চতুর্দ্দশবৎসরান্তে ফলমূলাহারী ও অনশনকৃশ রাজর্ষি ভরত নন্দিগ্রামের আশ্রমে ভ্রাতৃপাদুকাবিভূষিত মস্তকে রামের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্দ্দশবৎসরান্তে রাম ফিরিয়া না আসিলে—"প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্"—অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে যিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন—সেই আদর্শভ্রাতা রাজর্ষির ঘোর আশা ও আশঙ্কার দিনে তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশী হনুমান্ বলিয়াছিলেন—

"বসন্তং দণ্ডকারণ্যে যং ত্বং চীরজটাধরম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থং সত্বাং কুশলমব্রবীৎ॥"

'রাজন্, আপনি দণ্ডকারণ্যবাসী চীরজটাধর যে জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।'

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সুগ্রীব ও অঙ্গদকে মণিময় হার এবং অন্যান্য আভরণ প্রদান করিলেন। সীতাদেবী তখন

স্বীয়কণ্ঠলম্বিত উজ্জ্বল মুক্তাহার খুলিয়া রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রাম বলিলেন, "তুমি এই হার যাহাকে দিয়া সুখী হও, তাহাকেই উহা দান কর।" সেই বহুমূল্য হার উপহার পাইয়া হনুমান্ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

হনুমানের এই কয়েকটি গুণের কথা বাল্মীকি লিখিয়াছেন—ধৈর্য্যমিশ্র তেজ, নীতির সহিত সরলতা, সামর্থ্য ও বিনয়,— যশ, পৌরুষ ও বুদ্ধি; 'পরস্পরবিরোধী গুণরাশি তাঁহার চরিত্রে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাহাদের সকলগুলিকেই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য কবি লিখিয়াছেন, সীতাদেবীর হারের তিনি সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন।

ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, সীতা, দশরথ প্রভৃতি সকলেরই রামের প্রতি অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়,—ইঁহারা রামের স্বগণ; কিন্তু কোথাকার এক বর্ব্বরদেশের অনুর্ব্বর মৃত্তিকায় এই ভক্তিকুসুম অসাধনে উৎপন্ন হইল—তাহা আমরা আশাতীতরূপে পাইয়া সবিস্ময়ে দর্শন করি। বিভীষণ ও সুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের প্রভুভক্তির তুল্য গভীর নহে এবং তাঁহাদের সোহার্দ্দ্যে আদানপ্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ অহেতুকী। হনুমান্ আদর্শপ্রজা, আদর্শভৃত্য, আদর্শসচিব ও আদর্শযোদ্ধা। রাম এবং সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার ভক্তি অবিচল। পরবর্ত্তী হিন্দুগণ তাঁহার এই প্রভুপরায়ণতার প্রতিই বিশেষরূপে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু আমার বোধ হয়, ভক্তি অপেক্ষা উন্নতকর্ত্তব্যের প্রেরণাই তাঁহাকে অধিকতররূপে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। তিনি কোন কার্য্যই শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে করেন নাই, তিনি প্রতি পাদক্ষেপে স্বীয় হৃদয়ের নিভৃতে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন দেখিতে পাই—তিনি আত্মান্বেষী সন্ন্যাসীর মত নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া অতিশয় কঠোর কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিয়াছেন। বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায়, নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে, কর্ত্তব্যবুদ্ধির খরজ্যোতি পড়িয়া তাঁহাকে পথ চিনাইয়া দিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধিই ভগবদ্দাস্যভাব,—বৈষ্ণবেরা এইজন্যই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। আজ এই হিন্দুস্থানে বহুসহস্র লোক হনুমানের উপাসক—এই উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদর্শ চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে পারিলে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্ম যে নবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুণ্যপথে প্রধাবিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নৌকাডুবি।

৩৩

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে! তুই কোথায় চলিয়াছিস্?"

উমেশ কহিল, "আমি মাঠাকরুণের সঙ্গে যাইতেছি।"

রমেশ। আমি যে তোর কাশী পর্য্যন্ত টিকিট্ করিয়া দিয়াছি। এ যে গাজিপুরের ঘাট। আমরা ত কাশী যাইব না।

উমেশ। আমিও যাইব না।

উমেশ যে তাহাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা রমেশের মনে ছিল না—কিন্তু ছোঁড়াটার অবিচলিত দৃঢ়তা দেখিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইল। কমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কমলা, উমেশকেও লইতে হইবে নাকি?"

কমলা কহিল, "না লইলে ও কোথায় যাইবে?"

রমেশ। কেন, কাশীতে ওর আত্মীয় আছে।

কমলা। না, ও আমাদেরি সঙ্গে যাইবে বলিয়াছে। উমেশ, দেখিস্, তুই খুড়োমশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস্, নহিলে বিদেশে ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইবি।

কোন্ দেশে যাইতে হইবে, কাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, এ সমস্ত মীমাংসার ভার কমলা একলাই লইয়াছে। রমেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বন্ধন পূর্ব্বে কমলা নম্রভাবে স্বীকার করিত, কিন্তু হঠাৎ এই শেষ কয়দিনের মধ্যে তাহা যেন সে কাটাইয়া উঠিয়াছে।

অতএব উমেশও তাহার ক্ষুদ্র একটি কাপড়ের পুঁটুলি কক্ষে লইয়া চলিল, এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা হইল না।

সহর এবং সাহেবপাড়ার মাঝামাঝি একটা জায়গায় খুড়োমশায়ের একটি ছোট বাংলা। তাহার পশ্চাতে আমবাগান, সম্মুখে বাঁধানো কূপ—সাম্নের দিকে অনুচ্চ প্রাচীরের বেষ্টন—কূপের সিঞ্চিত জলে কপি-কড়াইশুঁটির ক্ষেত শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রথমদিনে কমলা ও রমেশ এই বাংলাতে গিয়াই উঠিল।

চক্রবর্ত্তিখুড়ার স্ত্রী হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলিয়া খুড়া লোকসমাজে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁহার দৌর্ব্বল্যের বাহ্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা। সাম্নের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি। তাঁহার সম্বন্ধে জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রী পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

আসল কথা, এই দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন, তখন হরিভাবিনীকে ম্যালেরিয়ায় খুব শক্ত করিয়া ধরে। বায়ুপরিবর্ত্তন ছাড়া

আর-কোনো উপায় না দেখিয়া চক্রবর্ত্তী গাজিপুর-ইস্কুলের মাষ্টারি জোগাড় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেও তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রতি চক্রবর্ত্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মে নাই।

অতিথিদিগকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া চক্রবর্ত্তী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"সেজ বৌ!"

সেজবৌ তখন প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়া গম ভাঙাইতেছিলেন এবং ছোটবড় নানাপ্রকার ভাঁড়ে ও হাঁড়িতে নানাজাতীয় চাট্‌নি রৌদ্রে সাজাইতেছিলেন।

চক্রবর্ত্তী আসিয়াই কহিলেন—"এই বুঝি! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে—গায়ে একখানা র‍্যাপার দিতে নাই?"

হরিভাবিনী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি! ঠাণ্ডা আবার কোথায়—রৌদ্রে পিঠ পুড়িতেছে!

চক্রবর্ত্তী। সেটাই কি ভাল? ছায়া-জিনিষটা ত দুর্ম্মূল্য নয়!

হরিভাবিনী। আচ্ছা সে হবে—তুমি আসিতে এত দেরি করিলে কেন?

চক্রবর্ত্তী। সে অনেক কথা। আপাতত ঘরে অতিথি উপস্থিত। সেবার আয়োজন করিতে হইবে।

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী অভ্যাগতদের পরিচয় দিলেন। চক্রবর্ত্তীর ঘরে হঠাৎ এরূপ বিদেশী অতিথির সমাগম প্রায় ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সস্ত্রীক অতিথির জন্য হরিভাবিনী প্রস্তুত ছিলেন না—তিনি কহিলেন—"ওমা, তোমার এখানে ঘর কোথায়?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "আগে ত পরিচয় হোক্, তার পরে ঘরের কথা পরে হইবে। আমাদের শৈল কোথায়?"

হরিভাবিনী। সে তাহার ছেলেকে স্নান করাইতেছে!

চক্রবর্ত্তী তাড়াতাড়ি কমলাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিলেন। কমলা হরিভাবিনীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি দক্ষিণ করপুটে কমলার চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিলেন এবং স্বামীকে কহিলেন, "দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মত।"

বিধু ইঁহাদের বড় মেয়ে—কানপুরে স্বামিগৃহে থাকে। চক্রবর্ত্তী মনে মনে হাসিলেন, তিনি জানিতেন, কমলার সহিত বিধুর কোন সাদৃশ্য নাই, কিন্তু হরিভাবিনী রূপগুণে বাহিরের মেয়ের জয় স্বীকার করিতে পারেন না। শৈলজা তাঁহার ঘরেই থাকে, পাছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ তুলনায় বিচারে হার হয়, এইজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থলে রাখিয়া জয়পতাকা গৃহিণী আপন গৃহের মধ্যেই অচল করিলেন।

হরিভাবিনী। ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন বাড়ীর ত মেরামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি—ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।

বাজারে চক্রবর্ত্তীর একটা ছোট বাড়ী মেরামত হইতেছে বটে, কিন্তু সেটা একটা দোকান—সেখানে বাস করিবার কোনো সুবিধাও নাই, সঙ্কল্পও নাই।

চক্রবর্ত্তী এই মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ

না করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "মা যদি কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তবে কি উঁহাকে এ ঘরে আনি! যেখানে সন্তানের চলিয়া যায়, সেখানে মায়েরও চলে। কি বল মা! সত্য কথা বলিতেছি—একটু কষ্ট দিতে ভালও লাগে, নহিলে স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। (স্ত্রীর প্রতি) যাই হোক্, তুমি আর বাহিরে দাঁড়াইয়ো না শরৎকালের রৌদ্রটা বড় খারাপ!"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী রমেশের নিকট বাহিরে চলিয়া গেলেন।

হরিভাবিনী কমলার বিস্তারিত পরিচয় লইতে লাগিলেন। "তোমার স্বামী বুঝি উকিল? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন? তিনি কত রোজগার করেন? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই? তবে চলে কি করিয়া? তোমার শ্বশুরের বুঝি সম্পত্তি আছে? জান না? ওমা কেমন মেয়ে গো? শ্বশুরবাড়ীর খবর রাখ না? সংসারখরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাশুড়ি যখন নাই, তখন ত সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে! তুমি ত নেহাৎ কচি মেয়েটি নও—আমার বড়-জামাই যা-কিছু রোজগার করে, সমস্তই বিধুর হাতে গণিয়া দেয়" ইত্যাদি প্রশ্ন ও মন্তব্যের দ্বারা অতি অল্পকালের মধ্যেই কমলাকে অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। কমলাও যে রমেশের অবস্থা ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কত অল্প জানে এবং তাহাদের সম্বন্ধ বিচার করিলে এই অল্পজ্ঞান যে কত অসঙ্গত ও লোকসমাজে লজ্জাকর, হরিভাবিনীর প্রশ্নমালায় তাহা তাহার মনে স্পষ্ট উদয় হইল। সে ভাবিয়া দেখিল, আজ পর্য্যন্ত রমেশের সঙ্গে ভাল করিয়া কোনো কথা আলোচনা করিবার অবকাশমাত্র সে পায় নাই—সে রমেশের স্ত্রী হইয়া রমেশের সম্বন্ধে কিছুই জানে না! আজ ইহা তাহার নিজের কাছে অদ্ভুত বোধ হইল এবং নিজের এই অকিঞ্চিৎকরত্বে লজ্জা তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল।

হরিভাবিনী আবার সুরু করিলেন— "বৌমা, দেখি তোমার বালা? এ সোনা ত তেমন ভাল নয়? বাপের বাড়ী হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়-জামাই দুইমাস-অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।"

এই সমস্ত সওয়াল-জবাবের মধ্যে শৈলজা তাহার দুইবৎসর বয়সের কন্যার হাত ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা শ্যামবর্ণ, তাহার মুখখানি ছোটখাট,—মুষ্টিমেয়, চোখ-দুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখ দেখিলেই স্থির বুদ্ধি এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তির ভাব চোখে পড়ে।

শৈলজার ছোট মেয়েটি কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তকাল পর্য্যবেক্ষণের পর বলিয়া উঠিল—"মাসী"—বিধুর সঙ্গে সাদৃশ্য বিচার করিয়া যে বলিল, তাহা নহে—একটা বিশেষ-বয়সের যে-কোন মেয়েকে তাহার অপ্রিয় বোধ না হইলেই তাহাকেই সে নির্ব্বিচারে মাসীনামে অভিহিত করে। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

হরিভাবিনী শৈলজার নিকট কমলার

পরিচয় দিয়া কহিলেন—"ইঁহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্ত্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহাদের গাজিপুরে আনিয়াছেন।"

শৈলজা কমলার মুখের দিকে চাহিল, কমলাও শৈলজার মুখের দিকে চাহিল, এবং সেই দৃষ্টিপাতেই একমুহূর্ত্তে উভয়ের সখ্য-বন্ধন বাঁধিয়া গেল। হরিভাবিনী আতিথ্যের আয়োজনে চলিয়া গেলেন—শৈলজা কমলার হাত ধরিয়া কহিল, "এস ভাই, আমার ঘরে এস!"

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হইল। শৈলজার সঙ্গে কমলার বয়সের যে প্রভেদ ছিল, তাহা চোখে দেখিয়া সহসা বোঝা যায় না। শৈলজার সবসুদ্ধ একটু ছোটখাট সংক্ষিপ্তরকমের ভাব—কমলার ঠিক তাহার উল্টা—আয়তনে ও ভাবে-ভঙ্গীতে সে আপনার বয়সকে অনেকটা ছাড়াইয়া গেছে। বিবাহের পর হইতে তাহার মাথার উপরে শ্বশুরবাড়ীর কোন-রকমের চাপ না থাকাতেই হৌক্ বা যে কারণেই হৌক্, দেখিতে দেখিতে সে অসঙ্কোচে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের ভাবের মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ ছিল। তাহার সম্মুখে যাহা-কিছু উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তত মনে মনেও সে প্রশ্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। "চুপ কর", "যাহা বলি তাহাই করিয়া যাও", "বৌমানুষের অত 'নেই'করা শোভা পায় না"—এ সব কথা তাহাকে আজ পর্য্যন্ত শুনিতে হয় নাই। তাই সে যেন মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া উঠিয়াছে—তাহার সরলতার মধ্যে সবলতা আছে।

শৈলজার মেয়ে উমি উভয়ের মনোযোগ নিজের প্রতি সম্পূর্ণ একচেটে করিয়া লইবার বিধিমত চেষ্টা করিলেও, দুই নূতন সখীর মধ্যে কথাবার্ত্তা জমিয়া উঠিল। এই কথোপ-কথনব্যাপারে কমলা নিজের তরফের দৈন্য সহজেই বুঝিতে পারিল। শৈলজার বলিবার ঢের কথা আছে, কিন্তু কমলার বলিবার কিছুই নাই। কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেন্সিলের ক্ষীণ রেখামাত্র—তাহার সকল জায়গা পরিস্ফুট সুসংলগ্ন নহে, তাহাতে আজও একটুও রং ফলানো হয় নাই। কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই—হৃদয়ের মধ্যে অভাব অনুভব করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্রোহ-ভাবও উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চেহারাটা তাহার চোখে ফুটিয়া ওঠে নাই। বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল—যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুর বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোনো ঝঙ্কার দিবার নাই—স্বামীর কথা সে কি বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কি আছে! বলিবার আগ্রহই বা কোথায়! সুখের বোঝাই লইয়া শৈলজার ইতিহাস যেখা হুহু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।

শৈলজার স্বামী বিপিন গাজিপুরে অহিফেনবিভাগে কাজ করে। চক্রবর্ত্তীর দুটিমাত্র মেয়ে। বড় মেয়ে ত শ্বশুরবাড়ী

গেছে। ছোটটিকে প্রাণ ধরিয়া বিদায় দিতে না পারিয়া চক্রবর্ত্তী একটি নিঃস্ব জামাই বাছিয়া আনিলেন এবং সাহেবসুবাকে ধরিয়া এইখানেই তাহার একটা কাজ জুটাইয়া দিলেন। বিপিন ইঁহাদের বাড়ীতেই থাকে।

কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ একসময় শৈল বলিল, "তুমি একটু বোস ভাই, আমি এখনি আসিতেছি।"—পরক্ষণেই একটু হাসিয়া কারণ দর্শাইয়া কহিল—"উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন খাইয়া আপিসে যাইবেন।"

কমলা সরল বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল, "উনি আসিয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিতে পারিলে?"

শৈলজা। আর ঠাট্টা করিতে হইবে না! সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে, আমিও তেম্নি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্ত্তাটির পায়ের শব্দ চেন না!

এই বলিয়া হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া একটু নাড়া দিয়া আঁচলে-বদ্ধ চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া মেয়ে কোলে লইয়া শৈলজা চলিয়া গেল। পদশব্দের ভাষা যে এতই সহজ, তাহা কমলা আজও জানিতে পারে নাই। সে চুপ করিয়া বসিয়া জান্‌লার বাহিরে চোখ রাখিয়া তাই ভাবিতে লাগিল। জান্‌লার বাহিরে একটা পেয়ারা-গাছে ডাল ছাইয়া পেয়ারার ফুল ধরিয়াছে, সেই সমস্ত ফুলের কেশরের মধ্যে মৌমাছির দল তখন লুটোপুটি করিতেছিল।

৩৪

একটু ফাঁকা জায়গায় গঙ্গার ধারে একটা আলাদা বাড়ী লইবার চেষ্টা হইতেছে। রমেশ গাজিপুর-আদালতে বিধি অনুসারে প্রবেশলাভ করিবার জন্য ও জিনিষপত্র আনিতে একবার কলিকাতায় যাইতে হইবে, স্থির করিয়াছে—কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইতেছে না। কলিকাতার একটা বিশেষ গলির চিত্র মনে উঠিলেই রমেশের বুকের ভিতরটা এখনো যেন কিসে চাপিয়া ধরে। এখনো জাল ছেঁড়ে নাই—অথচ কমলার সহিত স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইতে বিলম্ব করিলে আর চলে না। এই সমস্ত দ্বিধায় কলিকাতায় যাত্রার দিন পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

কমলা চক্রবর্ত্তীর অন্তঃপুরেই থাকে। এ বাংলায় ঘর নিতান্ত কম বলিয়া রমেশকে বাহিরের ঘরেই থাকিতে হয়—কমলার সহিত তাহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় না।

এই অনিবার্য্য বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া শৈলজা কেবলি কমলার কাছে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। কমলা কহিল, "কেন ভাই তুমি এত হাহুতাশ করিতেছ? এমনী কি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?"

শৈলজা হাসিয়া কহিল, "ইস্, তাই ত! একেবারে যে পাষাণের মত কঠিন মন! ও সব ছলনায় আমাকে ভুলাইতে পারিবে না! তোমার মনের মধ্যে যে কি হইতেছে, সে কি আর আমি জানি না?"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ভাই, সত্যি করিয়া বল, দুইদিন যদি বিপিনবাবু তোমাকে দেখা না দেন, তা হইলে কি অম্নি—"

শৈলজা সগর্ব্বে কহিল—"ইস্, দুইদিন

দেখা না দিয়া তাঁর নাকি থাকিবার জো আছে!"

এই বলিয়া বিপিনবাবুর অধৈর্য্যসম্বন্ধে শৈলজা গল্প করিতে লাগিল। প্রথম-প্রথম বিবাহের পর বালক বিপিন গুরুজনের ব্যূহভেদ করিয়া তাহার বালিকা বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবে কতপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল, কবে ব্যর্থ হইয়াছিল, কবে ধরা পড়িয়াছিল, দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধদুঃখলাঘবের জন্য বিপিনের মধ্যাহ্ন-ভোজনকালে একটা আয়নার মধ্যে গুরুজনদের অজ্ঞাতে উভয়ের কিরূপ দৃষ্টিবিনিময় চলিত, তাহা বলিতে বলিতে পুরাতন স্মৃতির আনন্দকৌতুকে শৈলজার মুখখানি হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে যখন আপিসে যাইবার পালা আরম্ভ হইল, তখন উভয়ের বেদনা এবং বিপিনের যখন-তখন আপিস-পলায়ন, সেও অনেক কথা! তাহার পরে একবার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কিছুদিনের জন্য বিপিনের পাটনায় যাইবার কথা হয়, তখন শৈলজা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে?" বিপিন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল, "কেন পারিব না, খুব পারিব!" সেই স্পর্দ্ধাবাক্যে শৈলজার মনে খুব অভিমান হইয়াছিল—সে প্রাণপণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, বিদায়ের পূর্ব্বরাত্রে সে কোনমতে লেশমাত্র শোকপ্রকাশ করিবে না; কেমন করিয়া সে প্রতিজ্ঞা হঠাৎ চোখের জলের প্লাবনে ভাসিয়া গেল এবং পরদিনে যখন যাত্রার আয়োজন সমস্তই স্থির, তখন বিপিনের অকস্মাৎ এম্নি মাথা ধরিয়া কি-এক-রকমের অসুখ করিতে লাগিল যে, যাত্রা বন্ধ করিতে হইল, তাহার পরে ডাক্তার যখন ওষুধ দিয়া গেল, তখন সে ওষুধের শিশি গোপনে নর্দ্দামার মধ্যে শূন্য করিয়া অপূর্ব্ব উপায়ে ক্রিয়া করিয়া ব্যাধির অবসান হইল—এ সমস্ত কাহিনী বলিতে বলিতে কখন্ যে বেলা অবসান হইয়া আসে, শৈলজার তাহাতে হুঁস্ থাকে না—অথচ এমনসময় হঠাৎ দূরে বাহির-দরজায় একটা কিসের শব্দ হয়-কি-না-হয়, অম্নি শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়ে। বিপিনবাবু আপিস্ হইতে ফিরিয়াছেন। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে একটি উৎকণ্ঠিত হৃদয় সেই পথের ধারের বাহির দরজার দিকেই কান পাতিয়া বসিয়া ছিল।

কমলার কাছে এ সমস্ত কথা যে একেবারেই আকাশকুসুমের মত, তাহা নয়—ইহার আভাস সে কিছু কিছু পাইয়াছে। প্রথম কয়েকমাস রমেশের সহিত প্রথম পরিচয়ের রহস্যের মধ্যে যেন এইরকমেরই একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার পরেও ইস্কুল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া কমলা যখন রমেশের কাছে ফিরিয়া আসিল, তখনো মাঝে মাঝে এমন-সকল ঢেউ অপূর্ব্ব সঙ্গীতে ও অপরূপ নৃত্যে তাহার হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে—যাহার ঠিক অর্থটি সে আজ শৈলজার এই সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু তাহার এ সমস্তই ভাঙাচোরা, ইহার ধারাবাহিকতা কিছুই নাই। তাহাকে যেন কোন-একটা পরিণাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। শৈলজা ও বিপিনের মধ্যে যে-একটা আগ্রহের টান, সেটা রমেশ ও তাহার মধ্যে কোথায়? এই

যে কয়েকদিন তাহাদের দেখাশোনা বন্ধ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে এম্‌নী কি অস্থিরতা উপস্থিত হইয়াছে—এবং রমেশও যে তাহাকে দেখিবার জন্ম বাহিরে বসিয়া-বসিয়া কোনপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ইতিমধ্যে যেদিন রবিবার আসিল, সে-দিন শৈলজা কিছু মুস্কিলে পড়িল। তাহার নূতন সখীকে দীর্ঘকাল একেবারে একলা পরিত্যাগ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ আজ ছুটির দিন একেবারে ব্যর্থ করিবে, এত-বড় ত্যাগশীলতাও তাহার নাই। এদিকে রমেশবাবু নিকটে থাকিতেও কমলা যখন মিলনে বঞ্চিত হইয়া আছে, তখন ছুটির উৎসবে নিজের বরাদ্দ পূরা ভোগ করিতে তাহার ব্যথাও বোধ হইল। আহা, যদি কোনোমতে রমেশের সহিত কমলার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দেওয়া যায়!

এ সকল বিষয় লইয়া গুরুজনদের সহিত পরামর্শ চলে না—কিন্তু চক্রবর্ত্তী পরামর্শের জন্ম অপেক্ষা করিবার লোক নহেন। তিনি বাড়ীতে প্রচার করিয়া দিলেন, আজ তিনি বিশেষ কাজে সহরের বাহিরে যাইতেছেন। রমেশকে বুঝাইয়া গেলেন যে, বাহিরের লোক আজ কেহ তাঁহার বাড়ীতে আসিতেছে না—সদরদরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। এ খবর তাঁহার কন্যাকেও বিশেষ করিয়া শোনাইয়া দিলেন—নিশ্চয় জানিতেন, কোন্‌ ইঙ্গিতের কি অর্থ, তাহা বুঝিতে শৈলজার বিলম্ব হয় না।

স্নানের পর শৈলজা কমলাকে বলিল, "এস ভাই, তোমার চুল শুকাইয়া দিই!"

কমলা কহিল—"কেন, আজ এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

শৈলজা। "সে কথা পরে হইবে—তোমার চুলটা আগে বাঁধিয়া দিই।"—বলিয়া কমলার মাথা লইয়া পড়িল। আজ বিনানির সংখ্যা অনেক বেশি—খোঁপা একটা বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

তাহার পরে কাপড় লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা বিষম তর্ক বাধিয়া গেল। শৈলজা তাহাকে যে রঙীন কাপড় পরাইতে চায়, কমলা তাহা পরিবার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে শৈলজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ম পরিতে হইল!

মধ্যাহ্নে আহারের পর শৈলজা তাহার স্বামীকে কানে-কানে কি-একটা বলিয়া ক্ষণকালের জন্ম ছুটি লইয়া আসিল। তাহার পরে কমলাকে বাহিরের ঘরে পাঠাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল।

রমেশের কাছে কমলা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার অসঙ্কোচে গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সমাজে লজ্জাপ্রকাশের যে কোনো বিধান আছে, তাহা জানিবার সে কোনো অবসর পায় নাই। পরিচয়ের আরম্ভেই রমেশ সঙ্কোচ ভাঙিয়া দিয়াছিল। নির্লজ্জতার অপবাদ দিয়া ধিক্কার দিবার সঙ্গিনীও তাহার কাছে কেহ ছিল না।

কিন্তু আজ শৈলজার অনুরোধ পালন করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। স্বামীর কাছে শৈলজা যে অধিকারে যায়, তাহা সে জানিয়াছে—কমলা সেই অধিকারের গৌরব যখন অনুভব করিতেছে না, তখন

দীনভাবে সে আজ কেমন করিয়া যাইবে।

কমলাকে যখন কিছুতেই রাজি করা গেল না, তখন শৈল মনে করিল, রমেশের 'পরে সে অভিমান করিয়াছে। অভিমান করিবার কথাই বটে! কয়টা দিন কাটিয়া গেল, অথচ রমেশবাবু কোনো ছুতা করিয়া একবার দেখাসাক্ষাতের চেষ্টাও করিলেন না!

বাড়ীর গৃহিণী তখন আহারান্তে ঘরে দুয়ার দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শৈলজা বিপিনকে আসিয়া কহিল, "রমেশবাবুকে তুমি আজ কমলার নাম করিয়া বাড়ীর মধ্যেই ডাকিয়া আন। বাবা কিছু মনে করিবেন না, মা কিছু জানিতেই পারিবেন না।" বিপিনের মত চুপচাপ মুখচোরা লোকের পক্ষে এরূপ দৌত্য কোনমতেই রুচিকর নহে, তথাপি ছুটির দিনে এই অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে সে সাহস করিল না।

রমেশ তখন বাহিরের ঘরের জাজিম-পাতা মেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া এক পায়ের উচ্ছ্রিত হাঁটুর উপরে আর-এক পা তুলিয়া-দিয়া পায়োনিয়ার্ পড়িতেছিল। পাঠ্য অংশ শেষ করিয়া যখন কাজের অভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের প্রতি মনোযোগ দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় বিপিনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সঙ্গিহিসাবে বিপিন যে খুব প্রথম-শ্রেণীর পদার্থ, তাহা না হইলেও, বিদেশে মধ্যাহ্নযাপনের পক্ষে রমেশ তাহাকে পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল এবং বলিয়া উঠিল, "আসুন্ বিপিনবাবু, আসুন, বসুন্।"

বিপিন না বসিয়াই একটুখানি মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "আপনাকে একবার ইনি ভিতরে ডাকিতেছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে, কমলা?"

বিপিন কহিল—"হুঁ।"

রমেশ কিছু আশ্চর্য্য হইল। রমেশ পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছে, কমলাকে সে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক-দ্বিধাগ্রস্ত মন তৎপূর্ব্বে এই কয়দিন অবকাশ পাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। কল্পনায় কমলাকে গৃহিণীপদে অভিষিক্ত করিয়া সে মনকে নানাপ্রকার ভাবী সুখের আশ্বাসে উত্তেজিত করিয়াও তুলিয়াছে—কিন্তু প্রথম আরম্ভটাই দুরূহ। কিছুদিন হইতে কমলার প্রতি যেটুকু দূরত্ব রক্ষা করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া গেছে, হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া সেটা ভাঙিয়া ফেলিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এইজন্যই বাড়ীভাড়া করিবার দিকে তাহার তেমন সত্বরতা ছিল না।

কমলা ডাকিয়াছে শুনিয়া রমেশের মনে হইল, নিশ্চয় বিশেষ কোন একটা প্রয়োজন পড়িয়াছে। তবু প্রয়োজনের ডাক হইলেও তাহার মনের মধ্যে একটা হিল্লোল উঠিল। বিপিনের অনুবর্ত্তী হইয়া পায়োনিয়রটা ফেলিয়া-রাখিয়া যখন সে অন্তঃপুরে যাত্রা করিল, তখন এই মধুকরগুঞ্জরিত কার্ত্তিকের আলস্যদীর্ঘ জনহীন মধ্যাহ্নে একটা অভিসারের আভাস তাহার চিত্তকে একটুখানি চঞ্চল করিল।

বিপিন কিছুদূর হইতে ঘর দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কমলা মনে করিয়াছিল, শৈলজা তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া-

দিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেছে। তাই সে খোলা-দরজার চৌকাঠের উপর বসিয়া সাম্‌নের বাগানের দিকে চাহিয়া ছিল। শৈল কেমন করিয়া কমলার অন্তরে-বাহিরে একটা ভালবাসার সুর বাঁধিয়া দিয়াছিল। ঈষত্তপ্ত বাতাসে বাহিরে গাছের পল্লবগুলি যেমন মর্ম্মরশব্দে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—কমলার বুকের ভিতরেও মাঝে মাঝে তেম্‌নি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়া উঠিয়া অব্যক্ত বেদনায় একটি অপরূপ স্পন্দনের সঞ্চার করিতেছিল। শৈল যে তাহাকে আজ একটু বিশেষ করিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল, সেই সাজ তাহাকে স্তরে-স্তরে বেষ্টন করিয়া তাহাকে যেন নীরবে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের একটি অপূর্ব্ব কাব্য শুনাইতেছিল। সে যেন আপনাকে স্বর্ণথালে সজ্জিত সুগন্ধ-বিহ্বল নৈবেদ্যের সদ্যোবিকশিত পুষ্পরাশির মত অনুভব করিতেছিল—চারিদিকে শরতের মধ্যাহ্ন নির্জ্জন সোনার মন্দিরটির মত নির্ম্মল নীলাকাশে চূড়া তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—কিন্তু হায়, দেবতা কোথায়!

এমন সময়ে রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন তাহার পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—"কমলা", তখন সে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত তরঙ্গিত হইতে লাগিল। যে কমলা ইতিপূর্ব্বে কখনো রমেশের কাছে বিশেষ লজ্জা অনুভব করে নাই, সে আজ ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

আজিকার সাজসজ্জায় ও ভাবে-আভাসে রমেশ কমলাকে নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। হঠাৎ কমলার এই বিকাশ তাহাকে আশ্চর্য্য এবং অভিভূত করিল। সে আস্তে আস্তে কমলার কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কমলা, তুমি আমাকে ডাকিয়াছ?"

কমলা চম্‌কিয়া-উঠিয়া অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিল—"না, না, না, আমি ডাকি নাই—আমি কেন ডাকিতে যাইব!"

রমেশ কহিল, "ডাকিলেই বা দোষ কি কমলা?"

কমলা দ্বিগুণ প্রবলতার সহিত বলিল—"না, আমি ডাকি নাই!"

রমেশ কহিল, "তা বেশ কথা! তুমি না ডাকিতেই আমি আসিয়াছি! তাই বলিয়াই কি অনাদরে ফিরিয়া যাইতে হইবে?"

কমলা। তুমি এখানে আসিয়াছ, সকলে জানিতে পারিলে রাগ করিবেন—তুমি যাও! আমি তোমাকে ডাকি নাই।

রমেশ কমলার হাত চাপিয়া-ধরিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমার ঘরে এস—সেখানে বাহিরের লোক কেহ নাই।"

কমলা কম্পিতকলেবরে তাড়াতাড়ি রমেশের হাত ছাড়াইয়া-লইয়া পাশের ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

রমেশ বুঝিল, এ সমস্তই বাড়ীর কোনো মেয়ের ষড়্‌যন্ত্র—এই বুঝিয়া পুলকিতদেহে বাহিরের ঘরে গেল। চিৎ হইয়া পড়িয়া আর-একবার পায়োনিয়রটা টানিয়া-লইয়া তাহার বিজ্ঞাপনশ্রেণীর উপরে চোখ বুলাইতে

লাগিল, কিন্তু কিছুই অর্থগ্রহ হইল না। তাহার হৃদয়াকাশে নানারঙের ভাবের মেঘ উল্টো-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শৈল রুদ্ধঘরে ঘা দিল—কেহ দরজা খুলিল না। তখন সে দরজার খড়্‌খড়ি খুলিয়া বাহির হইতে হাত গলাইয়া-দিয়া ছিট্‌কিনি খুলিয়া ফেলিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, কমলা মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এম্‌নি কি ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহার জন্য কমলা এত আঘাত পায়! তাড়াতাড়ি তাহার পাশে বসিয়া তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কেন ভাই, তোমার কী হইয়াছে—তুমি কেন কাঁদিতেছ!"

কমলা কহিল, "তুমি কেন উঁহাকে ডাকিয়া আনিলে? তোমার ভারি অন্যায়!"

কমলার এই সকল আকস্মিক আবেগের প্রবলতা তাহার নিজের পক্ষে এবং অন্যের পক্ষে বোঝা ভারি শক্ত। ইহার মধ্যে যে তাহার কতদিনের গুপ্তবেদনার সঞ্চয় আছে, তাহা কেহই জানে না!

কমলা আজ একটা কল্পনা-লোক অধিকার করিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়া ছিল! রমেশ যদি বেশ সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে সুখেরই হইত। কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া ফেলা হইল। কমলাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা, ষ্টীমারে রমেশের ঔদাসীন্য, এ সমস্তই মনের তলদেশে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কাছে পাইলেই যে পাওয়া হইল, ডাকিয়া আনিলেই যে আসা হইল, তাহা নহে—আসল জিনিষটি যে কি, তাহা গাজিপুরে আসার পরে কমলা অতি অল্পদিনেই যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিন্তু শৈলর পক্ষে এ সব কথা বোঝা শক্ত। কমলা এবং রমেশের মাঝখানে যে কোনো প্রকারের সত্যকার ব্যবধান থাকিতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। সে বহুযত্নে কমলার মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, রমেশবাবু কি তোমাকে কোনো কঠিন কথা বলিয়াছেন? হয় ত ইনি তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রাগ করিয়াছেন। তুমি বলিলে না কেন যে, এ সমস্ত আমার কাজ!"

কমলা কহিল, "না না, তিনি কিছুই বলেন নাই। কিন্তু কেন তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে?"

শৈল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই দোষ হইয়াছে, মাপ কর!"

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া-বসিয়া শৈলর গলা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—"যাও ভাই, যাও তুমি, বিপিনবাবু রাগ করিতেছেন!"

বাহিরে নির্জ্জনঘরে রমেশ পায়োনিয়রের উপর অনেকক্ষণ বৃথা চোখ বুলাইয়া এক-সময় সবলে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পর উঠিয়া-বসিয়া কহিল—"না, আর না। কালিই কলিকাতায় গিয়া প্রস্তুত হইয়া

আসিব। কমলাকে আমার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যত দিনবিলম্ব হইতেছে, ততই আমার অন্যায় বাড়িতেছে।”

রমেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধি হঠাৎ আজ পূর্ণভাবে জাগ্রত হইয়া সমস্ত দ্বিধা-সংশয় এক লম্ফে অতিক্রম করিল।

ক্রমশ।

সার সত্যের আলোচনা।

কাণ্ট্ ঘরের লোক।

আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে, ভেদজ্ঞান হইতে অভেদজ্ঞানে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছি। পথের মাঝে বিশেষ বিশেষ ঘাটি-স্থানে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সমুত্থিত রহিয়াছে। সে প্রাচীরগুলার প্রতিষ্ঠাকর্ত্রী হ'চ্চেন ভেদবুদ্ধি। সেগুলা ভাঙিয়া-ফেলিয়া সম্মুখের পথ পরিস্কার করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। একটা প্রাচীর হ'চ্চে ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে দাঁড়-করাইয়া-তোলা কাল্পনিক প্রভেদ। আমি দেখাইতে চাই—প্রভেদ কেবল উপরে-উপরে, ভিতরে-ভিতরে দুয়ের মধ্যে খুবই মিল রহিয়াছে। দেখাইতে চাই যে, ১-২-৩ এবং 1 2-3'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, সা-রে-গা-মা এবং Do-re-mi-fa'র মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এবং ইউরোপীয় তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে অনেকটা সেই ধাঁচা'র প্রভেদ। যাঁহারা বলেন যে, “সোপাধিক,” “নিরুপাধিক,” “আভাসচৈতন্য,” “কূটস্থচৈতন্য,” এরূপ-ধরণের কোনো কথার উল্লেখ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, তাঁহারা যদি একবার একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থখানি প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চক্ষু ফুটিবে। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, Transcendental apperceptionএর নামই কূটস্থচৈতন্য; Empirical apperceptionএর নামই আভাসচৈতন্য; Transcendentএর নামই নিরুপাধিক; Immanentএর নামই সোপাধিক। তা ছাড়া, কাণ্টের দর্শনে সোপাধিক এবং নিরুপাধিকের সন্ধিস্থলে বেশীর ভাগ আর-একটি কথা দেখিতে পাইবেন—সেটি হ'চ্চে Transcendental। Transcedent মুখ্য-রকমের নিরুপাধিক, Transcendental গৌণরকমের নিরুপাধিক, অর্থাৎ-কিনা—সোপাধিকের কিনারা-ঘ্যাঁসা নিরুপাধিক।

কাণ্টের জন্য আমার কেন এত মাথাব্যথা? অবশ্যই তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে। সে কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে কাণ্ট্ যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিতরে অনেকগুলি খাঁটি-সত্য চাপাচুপি দেওয়া আছে। কাণ্টের দর্শন-সমুদ্রে ডুব দিয়া সেই

গুলি উদ্ধৃত করিয়া আনিয়া যদি দেশীয় পণ্ডিত-গণের চক্ষের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, তাহার একটিও নূতন নহে—সমস্তই আমাদের দেশের বহুপুরাতন পৈতৃক-সম্পত্তি। দুঃখের বিষয় এই যে, কাণ্টের নিজের তত্ত্বান্বেষণের সেই প্রকৃষ্ট ফলগুলি তাঁহার নিজের ভোগে আসিল না—শুদ্ধকেবল ইউরোপীয় ধর্ম্ম-যাজকদিগের প্রচলিত মতামতের সঙ্গে সেগুলির মিল্ না-হওয়া-গতিকে। তেলে-জলে কেমন করিয়াই বা মিশ খাইবে। আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সার সত্যের দৃঢ় ডাঙাভূমিতে দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; কাণ্ট্ এক পা বাড়াইয়া সার সত্যের ডাঙায় ভর স্থাপন করিয়াছেন, আর, তাঁহার আর-এক পা রহিয়াছে সংশয়ের তরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান পিছনের নৌকায় ভর দিয়া—ইত্যবসরে তিনি তাঁহার চারিদিকের ধর্ম্মযাজকদিগের ভ্রুকুটী-কুটিল মুখভঙ্গী দেখিয়া পিছনের পা ডাঙায় উঠাইতে সাহস পাইলেন না। কাণ্টের এক পা সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান—আর-এক পা ধ্রুব-সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখিয়া আমার মনে এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কাণ্ট্ অৰ্দ্ধ সংশয়বাদী—অৰ্দ্ধ স্থিরবাদী। তা বই, যাঁহারা বলেন যে, কাণ্ট্ প্রকৃতপক্ষেই সংশয়বাদী, তাঁহাদের কথায় আমি কোনোক্রমেই সায় দিতে পারি না। তবে, এটা আমি মানি যে, আধুনিক ইউরোপের (বিশেষত ইংলণ্ডের) আর-আর খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ কাণ্টের দর্শনের উপরি-স্তরের তরঙ্গ-দোলায় দুলিয়া বেড়ানো একটা খেলা পাইয়াছেন মন্দ না; তাঁহাদের মস্তিষ্ক-চালনার পক্ষে তাহা একপ্রকার ফুট্‌বল্ বা লন্‌টেনিস্ বা পোলো। এতদ্ব্যতীত, কাণ্টের দর্শনের অন্তস্তলে যে অগাধ নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত জল রহিয়াছে, তাহার তাঁহারা বড় একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। কাণ্টের এই-শ্রেণীর বহির্ভক্ত চেলারা সংশয়বাদের লৌহ-শৃঙ্খলকেই আপনাদের কণ্ঠের হার করিয়াছেন, এ কথা খুবই সত্য—কিন্তু সে দোষ কাণ্টের নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ইউরোপের দেখাদেখি নব্য ভারতবাসীরা তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের আবিষ্কৃত তত্ত্বজ্ঞানের পথকে ব্যাঘ্রের মতো ডরাইতে শিখিয়াছেন। ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের সাম্প্রদায়িক স্থূলদৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের পথ যে অধঃপতনের পথ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে—তাহা তো হইবারই কথা! তত্ত্বজ্ঞানের আলোক যদি তাঁহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক কোটরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সাধের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দ্যায়, তবে তাঁহাদের আর থাকিবে কি? কিন্তু আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের তো আর সেরূপ মর্ম্মান্তিক বিরোধ নাই! উল্টা বরং বলা যাইতে পারে যে, আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিত্তিমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহা তত্ত্বজ্ঞান। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলে যে, অবিদ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল; কেবল তত্ত্বজ্ঞানই পরম-পুরুষার্থের সোপান। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা—নব্যভারতের বিদ্বন্মণ্ডলীর মুখে প্রায়শই এইরূপ একটা ইউরোপীয় বাঁধি-গৎ যখন-তখন শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাতে সত্যকে পাওয়া যায় না—

লাভের মধ্যে কেবল সংশয়ই সার হয়। যেন—তত্ত্বজ্ঞান অবিদ্যারই নামান্তর। ন্যায়-শাস্ত্রীয় ঢেঁকীর কচ্‌কচিকেই তাঁহারা জানেন একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান। এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, তত্ত্বজ্ঞান ঢেঁকির কচ্‌কচিও নহে, আর, সংশয়ের বিভ্রান্তিও নহে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞান সেই ধ্রুবতত্ত্বের জ্ঞান, যাহার সংস্পর্শে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি,"—হৃদয়ের গাঁট খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় পাইয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে কাণ্ট্‌ সংশয়-বাদীর সর্দ্দার বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাও কাহারো অবিদিত নাই যে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ সংশয়ের দিক্ দিয়াও যা'ন নাই, পরন্তু তাঁহাদের গন্তব্যপথে তাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত প্রতিপদে অগ্রসর হইয়াছেন; তবুও যে আমি কাণ্ট্‌কে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের দলভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না কেন, তাহার কারণ ঐ যাহা আমি একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি;—কি? না, কাণ্ট্‌ নিতান্তই দায়ে পড়িয়া সংশয়-বাদে আক্রান্ত হইয়াছেন; তা বই, সংশয়বাদ তাঁহার প্রকৃত মনের কথা নহে। তাঁহার আবিষ্কৃত পথ নিতান্তই একটা নূতন পার্ব্বত্য-পথ, যদিচ তাহা ইউরোপের কাছেই নূতন—ভারতের কাছে বহুপুরাতন; অমন একটা নূতন পথের উচ্চশিখরে দৃঢ়তার সহিত ভর দিয়া দাঁড়ানো প্রথম আবিষ্কর্ত্তার পক্ষে কিরূপ অসমসাহসিক কার্য্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাণ্ট্‌ যে তাহা করিতে ইতস্তত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আমরা একটুও দোষ দিতে পারি না। একা হাতে তিনি যাহা করিয়াছেন—যথেষ্ট করিয়াছেন! তাঁহার সংশয়বাদের জটিল জঙ্গলের মধ্য হইতে প্রকৃত তত্ত্বের আলোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল আলোকিত করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে—ইহা অনেকে হয় তো জানেন না, কিন্তু যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতে পা'ন।

কাণ্টের মর্ম্মস্থানীয় গোড়ার কথা বেশী নহে—দুই-তিনটি। একটি হ'চ্চে—পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, কি? না,—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind—সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা, ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। কাণ্টের এ কথাটি বড্ড একটা নূতন কথা হইত, যদি সাংখ্যদর্শনের গোড়াতেই না থাকিত যে, প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ। ভাবনা তো ফাঁকা হইবেই;—ভাবনা জোগাইতেছেন কে? না, সংবিৎরূপী বা চৈতন্যরূপী পুরুষ; ইনি যে খঞ্জ অর্থাৎ চলৎশক্তিরহিত। সাক্ষাৎ উপলব্ধি তো অন্ধ হইবেই—সাক্ষাৎ উপলব্ধি জোগাইতেছেন কে? না, প্রকৃতি; ইনি যে অন্ধ। সাংখ্য বলেন যে, পুরুষ খঞ্জ হইয়াও—খঞ্জ নহেন কেবল প্রকৃতির গুণে; প্রকৃতি অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহেন কেবল পুরুষের গুণে। কাণ্ট্‌ বলেন, ভাবনা ফাঁকা হইয়াও—ফাঁকা নহে কেবল সাক্ষাৎ উপলব্ধির গুণে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ হইয়াও—অন্ধ নহে কেবল ভাবনার গুণে।

কাণ্টের আর-একটি গোড়ার কথা হচ্চে— Synthetic unity of apperception— সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। কাণ্ট্ বলেন— The synthetic unity of consciousness is an objective condition of all knowledge; a condition, not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me. ইহার অর্থ:—

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ঘটিত-(অর্থাৎ বস্তুঘটিত)-মূল-নিবন্ধন। এম্নি-একটা মূল-নিবন্ধন—অর্থাৎ যাহা নহিলে নয় এম্নি-একটা গোড়ার কথা —যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানগোচরে উপনীত হইবার জন্য জ্ঞেয়বস্তুর পক্ষেও তাহা আবশ্যক। কাণ্ট্ এ যাহা বলিয়াছেন, এটা একটা জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বটে, কিন্তু যতটা জটিল মনে হইতেছে, ততটা নহে। উহার মুখ হইতে দার্শনিক-ভাষার মুখোস্ খুলিয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা রাক্ষসও নহে, দৈত্যও নহে, অসুরও নহে, পরন্তু উহা আমাদের একটি চিরপরিচিত ঘরের লোক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হোক্।

লৌকিক-ব্যবহারের পক্ষে এ কথা খুব সত্য যে, আগে কাঁচা-মাল (raw material), পরে তৈয়ারি-জিনিষ (manufactured articles)। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়াইবোষ যে, যাহাকে আমরা কাঁচা-মাল ঠাওরাই, তাহা প্রকৃতপক্ষে কাঁচা-মাল নহে; তাহাও তৈয়ারি-জিনিষ। চর্কাকাটা বুড়ীর নিকটে তুলা কাঁচা-মাল, সূতা তৈয়ারি-জিনিষ; তাঁতির নিকটে সূতা কাঁচা-মাল, বস্ত্র তৈয়ারি-জিনিষ; দর্জ্জির নিকটে বস্ত্র কাঁচা-মাল, পোষাক তৈয়ারি-জিনিষ। তেম্নি আবার, ইষ্টকনির্ম্মাতার নিকটে মৃত্তিকা কাঁচা-মাল—ইঁট তৈয়ারি-জিনিষ, রাজমজুরের নিকটে ইষ্টক কাঁচা-মাল, দেয়াল তৈয়ারি-জিনিষ। প্রকৃতিমাতার কাছে তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ, মৃত্তিকাও তৈয়ারি-জিনিষ। বস্ত্রবয়ন করিবার পূর্ব্বে যেমন সূত্র সংগ্রহ করা চাই, তেম্নি বৃক্ষ ভাবিবার পূর্ব্বে বৃক্ষ যে কিরূপ, তাহা চক্ষে দেখা চাই; এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, বৃক্ষের মূর্ত্তি যাহা আমরা চক্ষে দেখি, তাহা কাঁচা-মাল এবং বৃক্ষের ভাব যাহা আমরা মনে ভাবি, তাহা তৈয়ারি-জিনিষ। এই গেল একদিকের কথা; আর-এক দিকের কথা এই যে, বস্ত্রই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—সূতাও তৈয়ারি-জিনিষ। সূতাই যে কেবল তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—তুলাও তৈয়ারি-জিনিষ। মনে-ভাবা বৃক্ষই যে তৈয়ারি-জিনিষ, তাহা নহে—চক্ষে-দেখা বৃক্ষও তৈয়ারি-জিনিষ। তাহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, মনে-ভাবা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্তা আমরা আপনারা; চক্ষে-দেখা বৃক্ষ তৈয়ারি করিবার কর্ত্রী হ'চ্চেন প্রকৃতি। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, চক্ষে-দেখা বৃক্ষই হো'ক, আর মনে-ভাবা বৃক্ষই হো'ক, তাহা গড়িয়া তুলিবার মূল প্রকরণ-পদ্ধতি একইপ্রকার—সে প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে সংযোজনা synthesis। শাখা-পত্র-

ফল-ফুলের সংযোজনা ব্যতিরেকে মনে-ভাবা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, চক্ষে-দেখা বৃক্ষেরও গঠনকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। গঠনকার্য্যের মূল প্রকরণ-পদ্ধতি উভয়ত্রই সমান—এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, গঠন-কার্য্যের নির্ব্বাহকর্ত্তা কি দুই স্থলে দুই বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা দুই স্থলেই একই অভিন্ন ব্যক্তি। এক ব্যক্তিকে আমি ইষ্টক তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি, আর-এক ব্যক্তিকে থাম তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি; তাই আমি বলি যে, ইষ্টকের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র, আর, স্তম্ভের গঠন-কর্ত্তা স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে, প্রকৃতি-মাতাকে আমি বৃক্ষ তৈয়ারি করিতে দেখি নাই; অথচ যখনই আমি বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখনই একেবারেই একটা তৈয়ারি বৃক্ষ আমার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। ইহাতে দর্শকের মনোমধ্যে এই-রূপ একটা সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে বুঝি প্রকৃতিমাতা বাহিরে বসিয়া কার্য্য করেন না; তবে বুঝি তিনি প্রতিজনের অন্তরের অন্তঃপুরে বসিয়া কার্য্য করেন? নহিলে তাঁহাকে কেহ চক্ষে দেখিতে না পায় কেন? তবে কি আমার অন্তরে দুই ব্যক্তি একত্রে যুগলে-বাঁধা থাকিয়া—এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের দৃশ্য-মূর্ত্তি, আর-এক ব্যক্তি রচনা করিতেছেন বৃক্ষের ভাব-মূর্ত্তি? রূপক-চ্ছলে বলিতে-চাও-বলো দুই ব্যক্তি। পরন্তু কাণ্ট্‌ ও-জায়গায় বলেন একই জ্ঞানের দুই পৃষ্ঠ। এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে আভাসচৈতন্য Emperical consciousness; আর এক পৃষ্ঠ হ'চ্চে কূটস্থচৈতন্য Transcendental consciousness; তাহার মধ্যে আভাস-চৈতন্য আহঙ্কারিক subjective অর্থাৎ ব্যক্তি-গত; কূটস্থচৈতন্য objective বস্তুগত অর্থাৎ সর্ব্বগত। তার সাক্ষী কাণ্ট্‌ বলিয়াছেন, The synthetic unity of apperception is an *objective* condition of all knowledge "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য সমস্ত জ্ঞানের বস্তু-ঘটিত-মূল-নিবন্ধন।" এই কথা বলিয়া তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, a condition not necessary for myself only, in order to know an object, but one to which each intuition must be subject in order to become an object for me. "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য জ্ঞানের এমি-একটা মূল-নিবন্ধন যে, বস্তু জানিবার জন্য তাহা জ্ঞাতার পক্ষে তো আবশ্যক বটেই, তা ছাড়া, জ্ঞাতার জ্ঞানগোচরে উপনীত হইবার জন্য তাহা জ্ঞেয়-বস্তুর পক্ষেও আবশ্যক।" মোটামুটি সহজ ভাষায় বলিলাম জ্ঞেয়-বস্তু—কিন্তু কাণ্টের চুল-চেরা ভাষায় জ্ঞেয়-বস্তু হ'চ্চে Intuition অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধির বিষয়; যেমন—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বৃক্ষ। কাণ্টের কথার মর্ম্মনিহিত তাৎপর্য্য এই যে, সেই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান 'বৃক্ষমূর্ত্তি, যাহাকে আমরা সচরাচর বলি প্রকৃতির স্বহস্তবিরচিত, তাহাতেও সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যের কার্য্যকারিতা রহিয়াছে। একটা তৈয়ারি বৃক্ষ যখন আমা-দের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়, তখন, তাহা সেই সাংবিত ঐক্যের যোগসূত্রে বাঁধা হইয়াই আমাদের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত

হয়।' কাণ্টের এই দুরূহ কথাটা খুব সহজ ভাষায় মোটামুটি বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে এইরূপে : একই অভিন্ন ব্যক্তি দর্শন এবং চিন্তন, উভয় কার্য্যেরই কর্ত্তা। বৃক্ষ দেখিবার সময় যে ব্যক্তি চাক্ষুষ আলোকে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের মূর্ত্তি সংগঠন করে, বৃক্ষ ভাবিবার সময়েও সেই ব্যক্তি মানসিক আলোকে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের ভাব সংগঠন করে। সংযোজনা-কার্য্য দুইস্থলেই সমান চলে; ভাবনা-কার্য্যেও যেমন চলে—দর্শন-কার্য্যেও তেমনি চলে। কাজেই বলিতে হয় যে, সংযোজনা-কার্য্য synthesis জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। সংযোজনা মস্ত একটা টানা-জাল। সেই টানা-জালে কালের এক মুহূর্ত্তের সঙ্গে আর-আর মুহূর্ত্তের এবং আকাশের এক দেশের সঙ্গে আর-আর দেশের যোগ বাঁধা হইয়া পড়িতেছে নিত্য-নিয়ত। সেই মহাবিস্তীর্ণ যোগ-রশ্মিজালের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছে সাংবিত ঐক্যের জ্যোতির্ম্মণ্ডল। আর, সাংবিত ঐক্য ঐ মহাবিস্তীর্ণ যোগজালের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত বলিয়া কাণ্ট্ সাংবিত ঐক্যের বিশেষণ দিয়াছেন যোগাত্মক। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যোজনা-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংবিতের ঐক্য আমাদের জ্ঞানের উপলব্ধিগোচর হয়। গায়ক যখন স্বরপরম্পরা সংযোজনা করিয়া গান করে, তখনই আপনাকে গায়করূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে। আমরা যখন আলোক-রশ্মিযোগে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষ দর্শন করি, তখনই আমরা বৃক্ষের দ্রষ্টারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা মনোমধ্যে শাখাপত্র-ফলফুল সংযোজনা করিয়া বৃক্ষের একটা ভাব দাঁড় করাইতে চেষ্টা করি, তখন আমরা বৃক্ষের মন্তারূপে আপনাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। যখন আমরা বৃক্ষের দৃশ্যমূর্ত্তিতে বৃক্ষের মানসিক ভাব সংযোজিত করিয়া বা অধ্যারোপিত করিয়া উভয়ের ঐক্য অবধারণ করি, তখন আমরা আপনাকে বোদ্ধারূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। সুষুপ্তিকালে যখন আমরা সংযোজনার জাল গুটাইয়া-লইয়া ও-সকল কিছুই করি না—তখন আমরা আপনাকে কোনো-কিছু-রূপেই উপলব্ধি করি না। প্রথমে কাণ্ট্ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং ভাবনার মধ্যে প্রভেদের সূচনা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভাবনা ফাঁকা—ভাবনা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি অন্ধ। তাহার পরে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি দুইকে সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অভেদ-জ্ঞানের গোড়া'র কথাটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিয়াছেন। কাণ্টের ভিতরকার কথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে, যাহাতে ভাবনা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি পরস্পরের সহিত একীভূত। অর্থাৎ যেখানে ভাবনাও যা এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধিও তা, একই। এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের নাম দিয়াছেন কাণ্ট্ Intellectual intuition।

কাণ্ট্ বলেন "And yet this (অর্থাৎ 'সাংবিত সংযোজনা) need not be a principle for every possible understanding, but only for that which gives nothing manifold through

its pure apperception in the representation, I am. An understanding which through its self-consciousness could give the manifold of intuition, and by whose representation the object of that representation should at the same time exist, would not require a special act of the synthesis of the manifold for the unity of its consciousness, while the human understanding which possesses the power of thought only, but not of intuition, requires such an act.

ইহার তাৎপর্য্যার্থ :—

"আমি সব জ্ঞানের সম্বন্ধে বলিতেছি না—কেবল আমাদের জ্ঞানের সম্বন্ধেই বলিতেছি যে, সংযোজনা জ্ঞানের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। আমাদের জ্ঞানে আমি আছি বলিলেই কিছু আর সব আছে বুঝায় না। পরন্তু যে জ্ঞান এরূপ যে, তাহার আত্মসত্তাতেই সর্ব্বসত্তা সিদ্ধ হয়, সে জ্ঞানের সাংবিত ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজনা-রূপিণী স্বতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে, মনুষ্যের বুদ্ধিতে কেবল ভাবনা-প্রবর্ত্তনেরই শক্তি আছে, তা' বই, সাক্ষাৎ উপলব্ধি-সংঘটনের শক্তি নাই; তাই মনুষ্যবুদ্ধির সাংবিত ঐক্যের জন্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিচিত্র বিষয়সকলের সংযোজন-ক্রিয়া নিতান্তই আবশ্যক।" কাণ্টের এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভাবনাশক্তি আমাদের নিজের শক্তি; পরন্তু সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটাইবার শক্তি আমাদের নিজের নহে;—এ শক্তি ঐশী শক্তি। এইজন্য, সেই ঐশী শক্তির প্রসাদলব্ধ সাক্ষাৎ উপলব্ধি-গোচর বিষয়সকল আত্মসাৎ করিবার জন্য, সংযোজন-ক্রিয়ার বা ভাবনার পরিচালনা আমাদের জ্ঞানের পক্ষে আবশ্যক। পক্ষান্তরে, উপনিষদে আছে—"স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—ঈশ্বরের জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐশ্বরিক জ্ঞান সংযোজনারূপিণী প্রক্রিয়ার বশবর্ত্তী নহে। কাণ্টের এই জায়গা'র কথাটি বিশেষমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক; অতএব বারান্তরে তাহার যথাবিহিত চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

কর্ম্মক্ষেত্র।—শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

আমাদিগকে দায়ে পড়িয়া অনেক বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িতে হয়। তাহার অধিকাংশই পড়িতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, সময়ের অপব্যয় স্বীকার করিতে হয়, এবং

পরিচয় দিতে 'বঙ্গদর্শনে'র খানিকটা স্থান নষ্ট করিতে হয়। কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই এই কষ্ট ও বিড়ম্বনা আমরা স্বীকার করি; ইচ্ছাধীন হইলে অনেক বাঙ্গলা উপন্যাসই দুইচারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতাম। সেইজন্য, কদাচিৎ একআধখানি সুখপাঠ্য উপন্যাস যখন হাতে আসে, তখন আমাদের বড়ই আহ্লাদ হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ উপেক্ষা করিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করে। এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

গ্রন্থকার যে মানবচরিত্রজ্ঞ এবং রসাবতারণায় সুনিপুণ, তাহার পরিচয় এই উপন্যাসের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যেখানে যে রসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে সেই রসই বেশ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে হাস্যরসের চেষ্টা আছে, সেখানে না হাসিয়া থাকা যায় না; যেখানে করুণরসের উদ্যম, সেখানে হৃদয় আর্দ্র হইয়া আইসে; যেখানে মনুষ্যচরিত্রের পাশবিকতার অবতারণা, সেখানে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। ইহাই ত সাহিত্যিক দক্ষতা।

চরিত্রচিত্রণেও গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। বিরাজমোহিনী, তরঙ্গিণী, অদ্বৈত ঘোষ এবং তাহার পত্নী অনঙ্গমঞ্জরী, এই কয়টি চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে—নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারেই ফুটিয়াছে। ইহার মধ্যে অনঙ্গমঞ্জরী বিশেষরূপে উল্লেখের যোগ্য। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ অভিনব, মৌলিক, অথচ স্বভাবানুবর্ত্তী। এই চরিত্রের কল্পনা ও পরিণতির জন্য দামোদরবাবুর বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। সনাতন মুখোপাধ্যায় এই উপাখ্যানের প্রাণস্বরূপ—সকল অনুষ্ঠানের, সকল ঘটনার, সকল পরিণতির তিনিই মূলীভূত—অথচ তাঁহার চরিত্র এই উপন্যাসে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, কতকটা পুস্তকখানি পড়িয়া জানিতে হয়, কতকটা ভাবিয়া লইতে হয়; তবে, ভাবিয়া লইতে পারা যায়, এরূপ উপকরণ পুস্তকেই আছে। সনাতন-চরিত্রের এই অপরিস্ফুটতা, গ্রন্থকারের নিন্দার কথা নহে; বরং তাঁহার প্রশংসার কথা। কার্য্যত তিনি ত সংসারক্ষেত্রে প্রচ্ছন্নভাবেই বিচরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার চরিত্র কতকটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া গ্রন্থকার ভালই করিয়াছেন। আর, তিনিই উপন্যাসের প্রাণ বলিয়াই হয় ত পরিস্ফুট নহেন। প্রাণ ত চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই প্রচ্ছন্ন—অন্তরালে অবস্থিত।

এই পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"সাধ্যমতে স্বার্থসিদ্ধির বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া যথাসম্ভব পরহিত-সাধন-ব্রত গ্রহণ করিতে পারিলে, মানব স্বকীয় আত্মার এবং সমাজের প্রভূত উন্নতি সংসাধিত করিতে পারেন, এই তত্ত্বকথা বর্ত্তমান সামান্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।"

আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি যে, গ্রন্থকার ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। উপন্যাসখানি সর্ব্বতোভাবে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

[১ম প্রস্তাব]

মুসলমানিরাজশক্তি এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে প্রবলপ্রতাপে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার পূর্ব্বকালপর্য্যন্ত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্যব্যাপারে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের নৌবিদ্যাবিশারদ অধিবাসিবর্গের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবার কথা নানাদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশান্তমহাসাগরের বহুসংখ্যক দ্বীপ-উপদ্বীপে অদ্যাপি তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

কোন্ পুরাকালে এই বাণিজ্যপথ আবিস্কৃত হইয়া ভারতবর্ষের প্রভুত্ববিস্তারের সূত্রপাত করে, তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যতদিনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহারও বহুপূর্ব্বে ভারতবাসীর সমুদ্রপথে বিবিধ দবীয় দ্বীপে খ্যাতি হওয়া সম্ভব। ইহা সমুদ্রোপকূলের মানবসমাজের সাধারণ কাহিনী। স্বাভাবিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা জীবিকার্জ্জনের অভিনব-উপায়-উদ্ভাবনকামনায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী মানবসমাজ যে-কোন উপায়ে সমুদ্রপথে বিচরণ করিবার চেষ্টা করে; প্রথমে নিকটে-নিকটে ক্রমে দূরে-দূরে গমনাগমন করিতে করিতে অর্ণবপোতের গঠন ও চালনকৌশল আবিষ্কার করিয়া মানবসমাজ বাণিজ্যের সঙ্গে রাজ্য ও জ্ঞান বিস্তারের সূত্রপাত করিয়া থাকে। সকল দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; ভারতবর্ষেও এইভাবেই অতি পুরাকালে সমুদ্রপথে গমনাগমন প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গের পক্ষে সমুদ্রপথে দেশবিদেশে বাণিজ্যযাত্রার প্রথা পূর্ণপ্রতাপে প্রচলিত ছিল, তাহার নানা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদুপলক্ষে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ-উপদ্বীপে কতদূর পর্য্যন্ত ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা এ পর্য্যন্ত যথারীতি চেষ্টা না করিলেও, পাশ্চাত্য লেখকবর্গের গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে ক্রমশ নানা তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। প্রশান্তমহাসাগরের অসংখ্য

দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সাহিত্য, বর্ণমালা ও উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়া এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে ভারতীয়-জ্ঞানসাম্রাজ্য-বিস্তারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহাদের অকুতোভয় অধ্যবসায়ে অতি পুরাকালে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাদের কথা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সেকালের লোকের নিকট বাষ্পবলে জলযান পরিচালনা করিবার কৌশল অপরিচিত ছিল; অর্ণবপোতের নির্ম্মাণকৌশলও পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা সেই অসম্পূর্ণ গঠন ও চালনকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল অপরিজ্ঞাত সমুদ্রপথে দূরদেশে গমনাগমন করিত, তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায় কাহার না বিস্ময় উৎপাদন করিবে?

ভারতবর্ষের লোকে অতি পুরাকালেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সমুদ্রপথে নৈসর্গিক নিয়মে যে বায়ুপ্রবাহ প্রচলিত আছে, তাহা পুরাকাল হইতে এক নিয়মে এক পথে এক ভাবেই চলাচল করিয়া আসিতেছে। ইহাকে আধুনিক সভ্যসমাজ "বাণিজ্যবায়ু" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বায়ুপ্রবাহ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত বাণিজ্যবায়ু কিয়ৎকাল পরে উত্তরপূর্ব্ব হইতে পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সিংহল, সুমাত্রা ও প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে নৈসর্গিক বায়ুপ্রবাহের সহায়তায় পোতচালনা করা যাইতে পারে। এই পথেই ভারতীয় বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বঙ্গোপকূল হইতে প্রশান্তমহাসাগরে গমন করিতে হইলে প্রথমে দক্ষিণাবর্ত্তে সিংহলে উপনীত হইয়া তথা হইতে সুমাত্রাদ্বীপের শ্রীভোজনামক প্রসিদ্ধ বন্দরে ও তথা হইতে প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অর্ণবপোত চালনা করিতে হইত। তজ্জন্য সিংহল ও সুমাত্রা ভারতীয় সমুদ্রযাত্রায় প্রধান আশ্রয়স্থলে পরিণত হইয়াছিল। এই পথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের জ্ঞানগৌরব বহুদূরদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচ্যশিল্পাদর্শের ইতিহাসলেখক যাপাননিবাসী স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত কাকাসু ও কাকুরা ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—মুসলমানের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের নাবিকগণ পুরাতন বাণিজ্যপথে অগ্রসর হইয়া সিংহল, যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক চীনসাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং তৎসূত্রে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের সমুদ্রোপকূলে বর্ণসঙ্কর জাতির অভ্যুদয় সাধিত হয়।*

* Down to the days of the Mahomedan conquest went, by the ancient highways of the sea, the intrepid mariners of the Bengal coast, founding their colonies in Ceylon, Java and Sumatra, leaving Aryan blood to mingle with that of the seaboard races of Burma and Siam, and finding Cathay and India fast in mutual intercourse.—*Ideals of the East*.

যে শক্তি এইরূপে নিকট হইতে দূরে—দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে,—ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তারের সহায়তাসাধন করিয়াছিল, তাহা চীনরাজ্যে ব্যাপ্ত হইবার পর যাপানদ্বীপপুঞ্জেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তজ্জন্য যাপান বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও আমাদের সহিত একসূত্রে আবদ্ধ। যাঁহারা যাপানের নবজীবনদাতা ভুবনবিখ্যাত কর্ম্মবীর, তাঁহারা কেহই যাপানের আদিমনিবাসী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—তাঁহারা সূর্য্যবংশসম্ভূত। যাহারা জাপানের আদিমনিবাসী, তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি উত্তরাংশে বাস করিতেছে। সূর্য্যবংশোদ্ভূত নবাগত বীরবৃন্দের আক্রমণে পরাভূত হইয়া তাহারা ক্রমে উত্তরাঞ্চলে পলায়ন করায় যাপানদ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলে দিগ্বিজয়িগণের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। এই সূর্য্যবংশোদ্ভূত বীরবৃন্দ কোন্ দেশ হইতে যাপানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও তাহার উত্তরসীমাসংলগ্ন মালভূমির ক্ষত্রিয়গণই সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। সে হিসাবে যাপানের সহিত ভারতবর্ষের কোন সংস্রব থাকিলেও তাহার প্রমাণ আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা নাই। রক্তসংস্রবে যাপাননিবাসী সূর্য্যবংশীয়গণ ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত না হইলেও, জ্ঞানসংস্রবে উভয় দেশের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ সময়ে কি সূত্রে কোন্ পথে যাপানের ন্যায় সুদূর সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এখনও প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রুষ ও চীনসাম্রাজ্য, তাহার মধ্যস্থলে যাপানদ্বীপপুঞ্জ এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের সন্ধিক্ষেত্ররূপে দণ্ডায়মান। তথায় চীনসাম্রাজ্যের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায় ভাষা ও সাহিত্যে তাহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। চীনসাম্রাজ্যের ভিতর দিয়াই যাপানদ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের যুক্তরাজ্য অপেক্ষা আয়তনে কিঞ্চিৎ বড় অথচ ক্ষুদ্র-বৃহৎ তিনসহস্র দ্বীপে বিভক্ত যাপানরাজ্য কিরূপে ভারতবর্ষের প্রভাবে পুরাকালে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিরতিশয় কৌতূহলের আকর। এশিয়াখণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ সুদূরদেশে এত ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক এশিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। কাহারও সহিত কাহারও আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করিবার উপায় নাই। তাহার উপর ভাষা, ধর্ম্ম ও আচারগত পার্থক্যে এশিয়ার আধুনিক অধিবাসিগণ পরস্পরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে অসমর্থ। এই অসহায় অবস্থার সন্ধানলাভ করিয়া পাশ্চাত্য প্রবলপুরুষগণ এশিয়ার নানাবিভাগে অধিকার স্থাপন করিয়া এশিয়ার পূর্ব্বগৌরব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

এখন সমগ্র এশিয়াখণ্ড ইউরোপের ক্রীড়া-কন্দুক।

পুরাকালে এশিয়ার অবস্থা এরূপ শোচনীয় ছিল না। নদ-নদী-পর্ব্বত-প্রান্তর এশিয়ার মধ্যে ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ করিয়া এশিয়াকে নানা দেশে বিভক্ত করিলেও, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে এক অখণ্ড জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের জ্ঞান সেই মহাদেশকে সমুন্নত করিয়া এশিয়া হইতে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত জ্ঞানবিস্তার করিয়াছিল। অন্যান্য প্রমাণ অল্পাধিকপরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি এশিয়ার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের ধর্ম্মই সমগ্র সভ্যসমাজের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত রহিয়াছে।

অতি পুরাকাল হইতেই এশিয়ার লোকে জ্ঞানের সমাদর করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। বাণিজ্যপথে এক দেশের লোক অন্যদেশে গমনাগমন করিয়া এক দেশের জ্ঞান অন্যদেশে বিস্তৃত করিয়া দিত। কোন্ জ্ঞান প্রথমে কোন্ দেশে উদ্ভূত হইয়াছিল, এতকাল পরে তাহার তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব। পুরাকালে এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানালোক জ্বলিয়া উঠে তাহা সকল বিভাগকেই আলোকিত করিয়াছিল। তাহা এশিয়াবাসীর সাধারণ সম্পত্তি। তজ্জন্য এশিয়া অন্যদেশের নিকট ঋণ স্বীকার করে না।

অধিবাসিগণ দুই ভাবে জীবনযাপন করিত বলিয়া দুই শ্রেণীর শিক্ষা এশিয়াবাসীকে সমুন্নত করিয়াছিল। একশ্রেণী ভ্রমণশীল; অপরশ্রেণী গৃহবাসী। যাহারা নিয়ত দেশ হইতে দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া নানাদেশে বাস করিত, তাহারা কালক্রমে চীনদেশে আসিয়া গৃহবাসী হয়; যাহারা ভ্রমণবিমুখ, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে আশ্রমস্থাপন করিয়াছিল। যাহারা মধ্য-এশিয়ায় বিচরণ করিত, তাহারা হয় চীন না হয় ভারতবর্ষের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইত। তজ্জন্য মধ্য-এশিয়ায় চীন ও পূর্ব্বপশ্চিমাংশে ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার আদর্শরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই উভয় পুরাতন রাজ্যেই বিবিধ বিদ্যা সমুন্নত হইয়া মানবসমাজের গৌরববর্দ্ধন করে। ভারতবর্ষে মানবসভ্যতাবিকাশের ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে সুপরিচিত। চীনদেশে মানবসভ্যতাবিকাশের ইতিহাস সেরূপ সুপরিচিত নহে। তজ্জন্য তাহার আলোচনা আবশ্যক।

কাকাসু ও কাকুরা চীনদেশের ইতিহাসের দশটি ভিন্ন ভিন্ন সুবার কল্পনা করিয়াছেন। তদনুসারে খৃষ্টাবির্ভাবের সহস্রবৎসর পূর্ব্ব হইতে চীনদেশের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। চীন তদপেক্ষা বহুপুরাতন সভ্যদেশ। কোন্ সময়ে সে দেশে সভ্যতার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু তিনসহস্র বৎসরের বহুপূর্ব্বেও যে চীনসাম্রাজ্য বিবিধ বিদ্যার অধিকারী হইয়া সভ্যতা-সোপানে সমুন্নত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিবার উপযুক্ত কারণের অভাব নাই।

তাতারদেশের চিরভ্রমণলোলুপ, উদ্ধতস্বভাব মানবসমাজ চীনদেশে উপনীত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় হইতেই সে দেশে সভ্যতাবিকাশের সূত্রপাত হয়। যাহারা নিয়ত স্তরবারিহস্তে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিত, তাহারা একস্থানে সমাজবদ্ধ করিয়া

হলকর্ষণে নিযুক্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে পুরাতন সংস্কার সহসা তিরোহিত হয় নাই। সময়ে সময়ে তাতার হইতে নূতন নূতন মানবপ্রবাহ চীনদেশের জনসমুদ্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বসংস্কার নিরন্তর জাগরূক রাখিত। তজ্জন্য চীনদেশে ব্যক্তিগত অপেক্ষা জাতিগত ভাব বিশেষভাবে বিকশিত হয়। ভারতবর্ষের অধিবাসিবর্গের মধ্যে কুলগত ভাব প্রবাহিত হইয়া কালে ব্যক্তিগত ভাব পরিস্ফুট করিয়াছিল। দুইটি বিভিন্ন কারণের উত্তেজনায় এই দুই পুরাতন মানবসমাজে দুই পথে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নিয়ত আত্মোন্নতিসাধনের জন্য ধর্ম্মপ্রবণ হইয়া নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়; চীন কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া নিয়ত সমাজোন্নতিসাধনের জন্য কর্ম্মপ্রবণ হইয়া নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভারতের চিন্তা, ভারতের জ্ঞান প্রত্যেক মনুষ্যকে সমুন্নত করিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে; চীনের চিন্তা, চীনের জ্ঞান সমগ্র সমাজকে সমুন্নত করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যের সমুন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছে। তজ্জন্য উভয় দেশের চিন্তা বিভিন্নপথে ধাবিত হইলেও, মানবহিতৈষণা উভয় দেশেরই মূলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীন ও ভারতবর্ষ এইরূপ বিভিন্ন উপায়ে মানবহিতাকাঙ্ক্ষা সাধন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে সহসা মতপার্থক্য বিদূরিত হইয়া উভয় সাম্রাজ্যের জ্ঞানসম্মিলন সাধিত হইয়া যায়। তাহার ফলে এশিয়াখণ্ডে কনফুশস্ ও শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ঐক্য স্থাপিত হইয়া এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

'সু'নামক চীনদেশের সুবিখ্যাত রাজবংশের আধিপত্য প্রবল থাকিবার সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে কনফুশসের সমাজহিতৈষণার সুপরিচিত মূলমন্ত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। পুরাকাল হইতে নানাভাবে চীনদেশে সে কথা সূত্ররূপে পুনঃপুন ব্যাখ্যাত হইয়া মানবসমাজকে সমাজোন্নতির জন্য কর্ম্মনিষ্ঠ করিতেছিল, কনফুশসের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় তাহাই জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া চীনের ধর্ম্মমত বলিয়া খ্যাতিলাভ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকে ধর্ম্মমত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। ইহার সহিত পরকালের সংস্রব নাই, মানবাত্মার সংস্রব নাই, সকল কথাই ইহকালের কথা, জনসমাজের কথা, প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতির কথা। যে কথা লোকে বুঝিত, লোকহৃদয়ে তাহার জন্য অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিয়া মানবসমাজকে পুরাকাল হইতেই লোকহিতৈষণায় উদ্দীপিত করিত। তাহাই অভিনব উৎসাহে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া চীনের নরনারীর নিকট ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিল। কনফুশসের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি সমাজোন্নতির কামনায় আত্মত্যাগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য অল্পলোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য জনসাধারণ ব্যাকুল হইল না; তাহারা কেবল আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যই শিক্ষা করিতে লাগিল।

শাক্যসিংহও আত্মত্যাগের শিক্ষায়

প্রত্যেক মনুষ্যকে সমুন্নত করিয়া সমগ্র মানবসমাজের সমুন্নতিসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অল্পলোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; জনসমাজ তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যই শিক্ষা করিতে লাগিল। সমগ্র এশিয়াখণ্ডে আত্মত্যাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞান ও চীনদেশের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করিয়া সর্ব্বত্র নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে লাগিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বেই এই অভিনব ধর্ম্মমত মধ্য-এশিয়ায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতবর্ষ হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইয়া ভূমধ্যসাগরতীরে ও পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইয়া প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপ-উপদ্বীপে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের সমসময়ে তাহা চীনরাজ্যেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। চীন তাহাকে নূতন মত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। সুতরাং কন্‌ফুশস্‌ ও শাক্যসিংহ তুল্যভাবে পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমন্বয় সাধিত হইবার পূর্ব্বে চীনদেশের পশ্চিমাংশে ও ভারতবর্ষের উত্তরাংশে এশিয়ার সমুন্নত মধ্যদেশে যে জাতি বাস করিত, তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইত। তাহারা সভ্যসমাজের ইতিহাসে নানা নামে অভিহিত ; তাহাদের কোন শাখা ভারতে ও কোন শাখা চীনদেশে আপতিত হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সাধিত করিত। 'সু'নামক রাজবংশের শাসনসময়ে মধ্য-এশিয়ার এই সকল উদ্ধত বীরপুরুষ চীনদেশে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহারা চীনদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সিন্‌নামক রাজবংশের অধিকার স্থাপন করে এবং কিছুকালের মধ্যে তাহাদের অন্য শাখা কাশ্মীর ও মধ্যভারতে তুরুষ্করাজবংশের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দেয়। কণিষ্কনামক ইতিহাসবিখ্যাত নরপতি ভারতাভিযানের নেতা হইলেও, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন। মহারাজচক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনে যে ধর্ম্ম নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কণিষ্কের কল্যাণে তাহা আরও সুদূরদেশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তজ্জন্য চীন ও যাপানসাম্রাজ্যে কণিষ্কের নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

বৌদ্ধধর্ম্ম বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়া বহুপ্রকারে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এক দেশে একরূপ, অন্যদেশে অন্যরূপ আচারব্যবহার ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। নদীর উৎপত্তিস্থানের নদীর আয়তন, গতি ও বিমল জলরাশি যেমন নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইবার সময়ে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল প্রবাহের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে ধাবিত হইবার পূর্ব্বেই মতপার্থক্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল ; এখন তাহার শাখা গণনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিকগণ উত্তর ও দক্ষিণ নামক দুইটি প্রধান বিভাগ কল্পনা করিয়া মহাযান ও হীনযান নামক দুইটি প্রধান শাখার বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই উভয় শাখাই নানারূপ মতপার্থক্যে বহুসংখ্যক প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের পূর্ব্বসংস্কার

ও অজ্ঞানতার সহিত সমন্বয় সাধন করিতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নানাদেশে নানাভাবে প্রবেশলাভ করিয়া স্থানে স্থানে তাহার মূলমন্ত্র পর্য্যন্ত রূপান্তরিত করিতে ত্রুটি করে নাই। চীনসাম্রাজ্যে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে তাহার সহিত নানা মতভেদ ও মলিনতা সংযুক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য চীনদেশ হইতে ধর্ম্মপিপাসু সন্ন্যাসিগণ নানা সময়ে গুরুস্থান ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। বাণিজ্যের সংস্রব অপেক্ষা ধর্ম্মের সংস্রব একসময়ে ভারতবর্ষের দিকে চীনদেশের লোকচিত্ত অধিকতর আগ্রহে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান প্রচারের ধর্ম্ম। তাহা যেখানে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া পুনরায় তথা হইতে অন্যস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। প্রথম প্রচার-ক্ষেত্র বারাণসীধাম হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে কাশ্মীর ও গান্ধারের পথে পশ্চিমাঞ্চলে এবং অঙ্গবঙ্গের পথে পূর্ব্বাঞ্চলে প্রচারিত হইয়াছিল। কাশ্মীর হইতে উত্তরাঞ্চলে এবং পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণাঞ্চলে প্রচারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম জলে-স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একদা কাশ্মীর ও গান্ধার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়া বহুসংখ্যক বিখ্যাত বৌদ্ধসন্ন্যাসীর জন্মভূমি বলিয়া ইতিহাসে গৌরবলাভ করে। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে বৌদ্ধধর্ম্মে বহুগ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনসাম্রাজ্যে অদ্যাপি তাহার প্রভাব বর্ত্তমান। চীনদেশ হইতে বৌদ্ধমত মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার পথে যাপানদ্বীপপুঞ্জে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই সূত্রে যাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে পরিচয় সংস্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের অন্যান্য জ্ঞানও যাপানদ্বীপপুঞ্জে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

যাপানে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য-এশিয়ায় শক-হূন প্রভৃতি প্রবলজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে নানা নূতনরাজ্যে প্রবেশলাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত চীনদেশে প্রচারিত হইলেও হূনদিগের দ্বারা নানা ভ্রান্তসংস্কারও প্রচারিত হইয়াছিল। হূন-জাতি চীনসাম্রাজ্যে অধিকারবিস্তার করিয়াই সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসিগণ চীনদেশে আধিপত্যবিস্তার করিয়া তদ্দেশে ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভারতবর্ষের বৌদ্ধশ্রমণ চীনদেশে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কাকাসু ও কাকুরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নানারূপ তথ্যানুসন্ধানের পর লিখিয়াছেন,—বঙ্গোপকূল হইতে সমুদ্রপথে ও মধ্যভারতের মরুভূমির পথে প্রচারকগণ ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমনাগমন করিতেন।*

* This history of the long succession of important teachers, implying the constant flow of a stream of wandering thinkers from India to

এই উভয় পথই নিরতিশয় দুর্গম। সে পথে যাঁহারা গমনাগমন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মধ্যপথে জীবনবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন। অথচ এই দুর্গমপথে ভারতবর্ষের ও চীনদেশের বৌদ্ধশ্রমণগণ কি অক্লান্ত অধ্যবসায়ে অকুতোভয় পদবিক্ষেপে ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মশিক্ষার অনুরাগে নিরন্তর ধাবিত হইতেন! বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া ভারতবর্ষের যে প্রদেশ চীন ও যাপান-সাম্রাজ্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রপথ বাঙালীর অধিকৃত বলিয়া তাহারা প্রশান্তমহাসাগরের সর্ব্বস্থলে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যের সঙ্গে ধর্ম্মবিস্তার করিত। যাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইবার পর তদ্দেশে ভারতবর্ষের শ্রমণগণের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের সহায়তাসাধন করে।

পৃথিবীতে বাঙালীর নাম চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাসের অভাবে সে কলঙ্ক কল্পনাবলে ক্রমে ঘনীভূত করিয়া লেখকবর্গ তাহাকে দুরপনেয় করিয়া তুলিতেছেন। বাঙালী আজি অধঃপতিত হইলেও, চিরদিন এরূপ অধঃপতিতভাবে জীবনযাপন করে নাই। তাহার জীবনেও একদা গৌরবের দিন আসিয়াছিল। সেদিন বাঙালীর বীরবাহু দিগ্বিজয়ে বিশ্ব বশীভূত করিয়া রাজসিংহাসন অপহরণ করিতে সমর্থ না হইলেও, জ্ঞানবিস্তারে ভারতবর্ষের মুখ সমুজ্জ্বল করিয়া জগতে কীর্ত্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন প্রশান্তসাগরের দ্বীপপুঞ্জের ভগ্ন-মন্দিরে বা গিরিকোটরে অদ্যাপি পর্য্যটকবর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। যাপানেও তাহার চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

China throughout the period, raises the interesting question of the means of intercourse. It appears that besides the searoute from the Bengal Coast by Ceylon to the mouth of the Yang-tse-kiang, there were two great landways, which both began at Tonko in China, at the mouth of the Gobi Desert, divided before reaching the Oxus, into the northern and southern passes of Tensan, and so on to the Indus.- *Ideals of the East.*

নৌকাডুবি।

৩৫

রমেশ ঠিক করিয়াছিল কলিকাতায় সে কেবল কাজ সারিয়া চলিয়া আসিবে, কলুটোলার সে গলির ধার দিয়াও যাইবে না। সেদিনকার শরৎ-মধ্যাহ্নে লজ্জায়, সজ্জায়, অভিমানে বিজড়িত কমলার সেই মূর্ত্তিখানি রমেশের হৃদয়ের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। গাজিপুর হইতে রেলগাড়ি করিয়া যখন সে চলিয়াছিল—দুই ধারে হেমন্তের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র অগ্রহায়ণের সোনার রৌদ্রে ঝলকিয়া উঠিতেছিল—তখন সেদিনকার সেই আরক্তিম মুখচ্ছবিটুকু এই হিল্লোলিত শ্যামলতায়, এই দিগন্তব্যাপ্ত স্বর্ণপ্লাবনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঈষৎ শীতবায়ুর রোমাঞ্চস্পর্শ রমেশের শরীরে-মনে গভীরতর একটি স্পন্দনের সঞ্চার করিয়া দিল। রেলওয়ে-ষ্টেশনের গোলমাল, লোক-জনের ভিড়, সমস্ত তাহার কাছে স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

রমেশ দর্জ্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া উঠিল। দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই কাজ-কর্ম্মে কাটে, বাকি সময়টা ফুরাইতে চায় না। রমেশ কলিকাতায় যে দলের সহিত মিশ্রিত, এবারে আসিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতে পারিল না। পাছে পথে কাহারো সহিত দৈবাৎ দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে যথাসাধ্য সাবধানে থাকিত।

কিন্তু রমেশ কলিকাতায় আসিতেই একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। যে নির্জ্জন অবকাশের মাঝখানে, যে নির্ম্মল শান্তির পরিবেষ্টনে কমলা তাহার নব কৈশোরের প্রথম আবির্ভাব লইয়া রমেশের কাছে রমণীয় হইয়া দেখা দিয়াছিল, কলিকাতায় তাহার মোহ অনেকটা ছুটিয়া গেল। দর্জ্জিপাড়ার বাসায় রমেশ কমলাকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া ভালবাসার মুগ্ধনেত্রে দেখিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু এখানে তাহার মন কোনমতে সাড়া দিল না। আজ কমলা তাহার কাছে অপরিণতা অশিক্ষিতা বালিকার রূপে প্রতিভাত হইল। কেমন করিয়া যে সে তাহাকে কোনোদিন প্রেয়সীর ভাবে দেখিয়াছিল, আজ তাহা রমেশ ভাল বুঝিতেই পারিল না। যে বালিকা পৃথিবীকে গোলাকার বলিয়া সবে-মাত্র শিখিয়াছে এবং এখনো আয়ত্ত করিতে পারে নাই—যে বালিকা স্বপ্নেও জানে না প্রথম চার্ল্‌সের কি কারণে মুণ্ডপাত হইয়াছিল, সে-ও যে শিক্ষিত স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিতে পারে, তাহারো কল্যাণময় সেবাকুশলতা যে দুর্ম্মূল্য, তাহারো পরিপূর্ণ হৃদয়োৎসর্গ যে বহুপুণ্যের পুরস্কার, কলি-কাতার হাওয়ায় রমেশের মন তাহা স্বীকার করিতে পারিল না। যাহা সরল, যাহা অযাচিত, যাহা চেষ্টা করিয়া পাওয়া যায়

না,—যাহা বসন্তে দক্ষিণের বাতাসের মত আপনার বিচিত্র সুগন্ধের সম্পূর্ণভার বহন করিয়া অকস্মাৎ পূর্ণপরিণতভাবে প্রবাহিত হইয়া যায়—চেষ্টানিরত জনতার অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের মধ্যে তাহার দুর্লভতা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। তা ছাড়া, কলিকাতার হাওয়ায় রমেশের পুরাতন যে স্মৃতিসঞ্চয় স্তরে স্তরে মেঘস্তূপের মত জমিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে রমেশের মনকে চারিদিক্ হইতে ঘনাইয়া-ধরিয়া আর-সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিল।

তবু রমেশ নিজেরই সহিত যুদ্ধ করিতে ছাড়িল না। যেমনি হউক, কমলাকে রমেশ মনে মনে পরিণীত-স্ত্রী-রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কমলাকে অবিলম্বে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ না করিলে অন্যায় হয়, অধর্ম্ম হয়। হেমনলিনীর সম্বন্ধেও অন্যায় কিছু যে হয় না, তাহা নহে—কিন্তু তুলনা করিলে তাহা অপেক্ষাকৃত লঘুতর এবং সম্ভবত এতদিনে হেমনলিনী রমেশের প্রতি বিরক্ত ও বিমুখ হইয়া সেই অন্যায়ের দায়িত্বভার হইতে রমেশকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। এই ভাবিয়া সে দর্জ্জিপাড়ার শূন্য বাসা আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল—কোনমতেই কলুটোলার দিকে ঘেঁসিল না।

জোর যতই অতিরিক্তমাত্রায় প্রয়োগ করা যায়, জোর ততই কমিয়া আসিতে থাকে। হেমনলিনীকে কোনোমতেই মনের মধ্যে আমল দিবে না, এই পণ করিতে করিতেই অহোরাত্র হেমনলিনীর কথা রমেশের মনে জাগরূক থাকে। ভুলিবার কঠিন সঙ্কল্পই স্মরণে রাখিবার প্রবল সহায় হইয়া উঠিল।

রমেশের যদি কিছুমাত্র তাড়া থাকিত, তবে বহুপূর্ব্বেই কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সে ফিরিতে পারিত। কিন্তু সামান্য কাজ গড়াইতে গড়াইতে বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল।

কাল রমেশ প্রথমে কার্য্যানুরোধে এলাহাবাদে যাত্রা করিয়া সেখান হইতে গাজিপুরে ফিরিবে। এতদিন সে ধৈর্য্যরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সে ধৈর্য্যের কি কোনো পুরস্কার নাই? বিদায়ের আগে গোপনে একবার কলুটোলার খবর লইয়া আসিলে ক্ষতি কি?

সেইদিন দুপুরবেলায় তাহার বাসায় একটি ডেস্কের দেরাজ খুলিতেই হঠাৎ একখানি কাগজ তাহার হাতে উঠিয়া আসিল। সেই কাগজখানিতে যাহা লেখা ছিল, তাহা কোনো অর্থবিশিষ্ট ভাষা নহে—তাহা একটি হার্ম্মোনিয়মের গতের স্বরলিপি, হেমনলিনীর হাতে লেখা।

রমেশ হঠাৎ এই কাগজখানি হাতে তুলিয়া লইবামাত্র একটি নিস্তব্ধ-নিঃশব্দ গীতসমুদ্র ভৈরবীতে, বেহাগে, মুলতানে দিক্ হইতে দিগন্তরে জাগিয়া উঠিল; আকাঙ্ক্ষার আবেগে, বিচ্ছেদের বেদনায়, মিলনের আশ্বাসে এক কূল হইতে আর-এক সুদূর অদৃশ্য উপকূল পর্য্যন্ত স্বরসাগর তরঙ্গিত হইতে লাগিল। বুকের ভিতরে একটি হার্ম্মোনিয়ম্ বাজিয়া-বাজিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার শ্রবণাতীত কোমল করুণধ্বনিতে এই মধ্যাহ্নকালীন রাজধানীর প্রবল কর্ম্মালোড়ন একেবারে প্লাবিত ও আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রমেশ এই কাগজখণ্ডটিকে ললাটে-কপোলে স্পর্শ

করিল, প্রাণপণে ইহার ঘ্রাণ লইল, ডেস্কের উপরে প্রসারিত করিয়া ইহার 'পরে মাথা রাখিয়া ক্ষণকাল পড়িয়া রহিল।

আজ কলুটোলার সেই গলিতে যাওয়া স্থির করিয়া সে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। তাহাতে কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত বিস্তারিত করিয়া লিখিল। এবারে গাজিপুরে ফিরিয়া-গিয়া সে অগত্যা হতভাগিনী কমলাকে নিজের পরিণীত-পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে, তাহাও জ্ঞাপন করিল। এইরূপে হেমনলিনীর সহিত তাহার সর্ব্বতোভাবে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে সত্যঘটনা সম্পূর্ণভাবে জানাইয়া এই পত্রদ্বারা সে বিদায়গ্রহণ করিল।

চিঠি লিখিয়া লেফাফার মধ্যে পুরিয়া উপরে কাহারো নাম লিখিল না, ভিতরেও কাহাকেও সম্বোধন করিল না। অন্নদাবাবুর ভৃত্যেরা রমেশের প্রতি অনুরক্ত ছিল—কারণ রমেশ হেমনলিনীর সম্পর্কীয় স্বজন-পরিজন সকলকে একটা বিশেষ মমতার সহিত দেখিত। এইজন্য সেই বাড়ীর চাকরবাকরেরা রমেশের নিকট হইতে নানা উপলক্ষ্যে কাপড়চোপড়পার্ব্বণী হইতে বঞ্চিত হইত না। রমেশ ঠিক করিয়াছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে কলুটোলার বাড়ীতে গিয়া একবার সে দূর হইতে হেমনলিনীকে দেখিয়া আসিবে এবং কোনো একজন চাকরকে দিয়া এই চিঠি গোপনে হেমনলিনীর হাতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে চিরকালের মত তাহার পূর্ব্ববন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার সময় রমেশ চিঠিখানি হাতে লইয়া সেই চিরপরিচিত গলির মধ্যে কম্পিতবক্ষে কম্পিতপদে প্রবেশ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া দেখিল—দ্বার রুদ্ধ, উপরে চাহিয়া দেখিল—সমস্ত জানালা বন্ধ, বাড়ী শূন্য, অন্ধকার।

তবু রমেশ দ্বারে ঘা দিল। দুইচারবার আঘাত করিতে করিতে ভিতর হইতে একজন বেহারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেও সুখন্ নাকি ?"

বেহারা কহিল, "হাঁ বাবু, আমি সুখন্।"

রমেশ। বাবু কোথায় গেছেন।

বেহারা। দিদিঠাকরুণকে লইয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

রমেশ। কোথায় গেছেন ?

বেহারা। তাহা ত বলিতে পারি না।

রমেশ। আর কে সঙ্গে গেছেন ?

বেহারা। নলিন্‌বাবু সঙ্গে গেছেন।

রমেশ। নলিন্‌বাবুটি কে ?

বেহারা। তাহা ত বলিতে পারি না।

রমেশ প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিল, নলিন্‌বাবু যুবাপুরুষ, কিছুকাল হইতে এই বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন। যদিও রমেশ হেমনলিনীর আশা ত্যাগ করিয়াই যাইতেছিল, তথাপি নলিনবাবুটির প্রতি তাহার সদ্ভাব আকৃষ্ট হইল না।

রমেশ। তোর দিদিঠাকরুণের শরীর কেমন আছে ?

বেহারা কহিল, "তাঁহার শরীর ত ভালই আছে!"

সুখন্-বেহারাটা ভাবিয়াছিল, এই সুসংবাদে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবেন। অন্তর্যামী জানেন, সুখন্-বেহারা ভুল বুঝিয়াছিল।

রমেশ কহিল, "আমি একবার উপরের ঘরে যাইব।"

বেহারা তাহার ধূমোচ্ছ্বসিত কেরোসিনের ডিপা লইয়া রমেশকে উপরে লইয়া গেল। রমেশ ভূতের মত ঘরে ঘরে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল—দুই-একটা চৌকি ও সোফা বাছিয়া-লইয়া তাহার উপরে বসিল। জিনিষ-পত্র, গৃহসজ্জা, সমস্তই ঠিক পূর্ব্বের মতই আছে, মাঝে হইতে নলিনবাবুটি কে আসিল? পৃথিবীতে কাহারো অভাবে অধিকদিন কিছুই শূন্য থাকে না! যে বাতায়নে রমেশ একদিন হেমনলিনীর পাশে দাঁড়াইয়া ক্ষান্ত-বর্ষণ শ্রাবণদিনের সূর্য্যাস্ত-আভায় দুটি হৃদয়ের নিঃশব্দ মিলনকে মণ্ডিত করিয়া লইয়াছিল—সেই বাতায়নে আর কি সূর্য্যাস্তের আভা পড়ে না? সেই বাতায়নে আর কেহ আসিয়া আর একদিন যখন যুগলমূর্ত্তি রচনা করিতে চাহিবে, তখন পূর্ব্ব ইতিহাস আসিয়া কি তাহাদের স্থানরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, নিঃশব্দে তর্জ্জনী তুলিয়া তাহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবে? ক্ষুণ্ণ অভিমানে রমেশের হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরদিনে রমেশ এলাহাবাদে না গিয়া একেবারে গাজিপুরে চলিয়া গেল।

৩৬

কলিকাতায় রমেশ প্রায় মাসখানেক কাটাইয়া আসিয়াছে। এই একমাস কমলার পক্ষে অল্পদিন নহে। কমলার জীবনে একটা পরিণতির স্রোত হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বহিতেছে। উষার আলো যেমন দেখিতে দেখিতে প্রভাতের রৌদ্রে ফুটিয়া পড়ে—কমলার নারীপ্রকৃতি তেমনি অতি অল্প-কালের মধ্যেই সুপ্তি হইতে জাগরণের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিল। শৈলজার সহিত যদি তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইত, শৈলজার জীবন হইতে প্রেমালোকের ছটা ও উত্তাপ যদি প্রতিফলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের উপরে না পড়িত, তবে কতকাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইত বলা যায় না।

এখন বাহিরের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ তাহাকে মাঝে মাঝে অনির্ব্বচনীয় ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের সিংহদ্বারটি যেন খুলিয়া গেছে, তাই বিশ্বজগৎ সেখানে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছে। এখন প্রতিদিন প্রভাত তাহার কাছে নূতন হইয়া ফোটে। মধ্যাহ্নে শীতের রৌদ্র জানালার উপর দিয়া বাঁকিয়া তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সেই রৌদ্রে পা মেলিয়া-দিয়া বাহিরের বনস্থলীর মর্ম্মরগুঞ্জনের সহিত তাহার হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে কি-সকল অব্যক্ত কথা গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া উঠে। শৈলজার প্রফুল্লমুখ, তাহার স্মিতহাস্য, তাহার সাজসজ্জা, তাহার আসা-যাওয়া, সমস্ত তাহার কাছে একটি কাব্যের মত, সঙ্গীতের মত, কাহিনীর মত লাগে। পূর্ব্বে বেশভূষায় কমলার নিতান্ত অনাদর ছিল, চুল বাঁধিতে, ভাল করিয়া সাজিতে তাহার অত্যন্ত বিরক্তি-বোধ হইত। এখন আর সে ভাব নাই। এখন সে বিশেষ অনুরোধ করিয়া শৈলজার কাছ হইতে বিচিত্র-রকমের চুল-বাঁধা শিখিয়া লইয়াছে। এখন সে আপনিই একটু নৈপুণ্যের সহিত কাপড়টি পরে, আঁচলটি পরিপাটি করিয়া বিন্যাস করে—সীঁথাটি সোজা করিয়া, সরু করিয়া কাটিতে যথেষ্ট যত্ন করে এবং

সীঁথায় সিঁদূরের রেখাটি যেমন-তেমন করিয়া লাগায় না। খুড়ার বাগান হইতে শীতকালের নানারঙের বিলাতীফুল সংগ্রহ করিয়া কমলা অনেকক্ষণ বসিয়া একটি কাঁচের পাত্রের উপরে নানারকম করিয়া সাজাইতে চেষ্টা করে—মনের মত সাজানটি হইলে তাহার উপরে জলের ছিটা দিয়া দেয়ালে একটি শেল্‌ফের উপরে রাখিয়া দেয়। কমলা পশম-বোনা এবং সেলাই কিছু-কিছু শিখিয়াছিল, কিন্তু তাহা তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল—এখন সে অবকাশের সময় সেলাইয়ের বাক্স খুলিয়া নানা রঙের পশম মিলাইয়া নানা ছাঁদের অনাবশ্যক কারুকার্য্য রচনা করিবার চেষ্টা করে। কমলা কোনোকালে গাহিতে শেখে নাই, সেজন্য কোনো অভাবও অনুভব করে নাই—আজকাল শৈলজার বাংলা বইগুলি হইতে গান বাছিয়া একটি ছোট খাতায় কাপি করিয়া গান গাহিবার সাধ মিটাইতেছে।

ইতিমধ্যে রমেশের আসিবার দেরি দেখিয়া শৈলজার বিশেষ অনুরোধে খুড়া কমলাদের বাসের জন্য সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে একটি বাংলা ঠিক করিয়াছেন। অল্পস্বল্প আস্‌বাব সংগ্রহ করিয়া বাড়ীটি বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন এবং নূতন ঘরকন্নার জন্য আবশ্যকমত চাকরদাসীও ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অনেকদিন দেরি করিয়া রমেশ যখন গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল, তখন খুড়ার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিবার আর কোনো ছুতা থাকিল না। এতদিন পরে কমলা নিজের স্বাধীন ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাংলাটির চারিদিকে বাগান করিবার মত জমি যথেষ্ট আছে। দুই-সারি সুদীর্ঘ শিশুগাছের ভিতর দিয়া একটি ছায়াময় রাস্তা গিয়াছে। শীতের শীর্ণগঙ্গা বহুদূরে সরিয়া-গিয়া বাড়ী এবং গঙ্গার মাঝখানে একটি নীচু চর পড়িয়াছে—সেই চরে চাষারা স্থানে স্থানে গোধূম চাষ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে তরমুজ ও খরমুজা লাগাইতেছে। বাড়ীর দক্ষিণসীমানায় গঙ্গার দিকে একটি বৃহৎ বৃদ্ধ নিমগাছ আছে, তাহার তলা বাঁধানো।

বহুদিন ভাড়াটের অভাবে বাড়ী ও জমি অনাদৃত অবস্থায় থাকাতে বাগানে গাছপালা প্রায় কিছুই ছিল না এবং ঘরগুলিও অপরিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। কিন্তু কমলার কাছে এ সমস্তই অত্যন্ত ভাল লাগিল। গৃহিণীপদলাভের আনন্দ-আভায় তাহার চক্ষে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিল। কোন্ ঘর কি কাজে ব্যবহার করিতে হইবে, জমির কোথায় কিরূপ গাছপালা লাগাইতে হইবে, তাহা সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইল। খুড়ার সহিত পরামর্শ করিয়া কমলা সমস্ত জমিতে চাষ দিয়া লইবার ব্যবস্থা করিল। নিজে উপস্থিত থাকিয়া রান্নাঘরের চুলা বানাইয়া লইল এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভাঁড়ার ঘরে, যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা সাধন করিল। সমস্তদিন ধোয়া-মাজা, গোছানো-গাছানো,—কাজকর্ম্মের আর অন্ত নাই। চারিদিকেই কমলার মমত্ব আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সমস্তই আমার, আমার

হাতেই গড়িয়া উঠিবে—এই জমির বাগান, এই ঘরের পারিপাট্য, এই ঘরকন্নার আরাম, সমস্তই আমার ইচ্ছা ও চেষ্টার অপেক্ষায় অনাগত ভবিষ্যৎ হইতে আমার দিকে তাকাইয়া আছে—এই কথা স্মরণ করিয়া এবং তাহার নিজরচিত সুগঠিত সেই ভাবী গার্হস্থ্যটিকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া কমলা নীড়রচনারত বিহঙ্গীর মত কর্ম্মপরায়ণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রমেশ হেমনলিনীর প্রতি অভিমানের আক্ষেপ হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গাজিপুরে আসিয়াছিল। সে মনে মনে বলিতেছিল, "হেমনলিনী যদি আমাকে এত সহজে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে পারে, তবে আমিও তাহার জন্য বৃথা খেদ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিব না।" এই বলিয়া হেমনলিনীর সহিত তুলনায় কমলাকে সে জোর করিয়া বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। রূপে কমলা যে হেমনলিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে কথা কাহারো অস্বীকার করিবার জো নাই। অবশ্য কমলা গাহিতে-বাজাইতে, ইংরাজি লিখিতে-পড়িতে জানে না, কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনায় সে কাহারো চেয়ে ন্যূন নহে; তাহার বোধশক্তির একটা অসামান্যতা আছে—বোধ করি বেশি বানান মুখস্থ ও পড়া মুখস্থ করিতে হয় নাই বলিয়াই তাহার বুদ্ধি এরূপ আশ্চর্য্য তাজা রহিয়াছে।

এইরূপে রমেশ নানা তর্ক দ্বারা কমলাকেই হৃদয়রাজ্যে জয়ী করিয়া হেমনলিনীর চপল ব্যবহারের সমুচিত প্রতিশোধ লইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল। এ সম্বন্ধে মনে মনে নিজের প্রতি এতই বল-প্রয়োগ করিতেছিল, যেন ব্যাপারটা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

কিন্তু দুরূহতা অধিকক্ষণ রহিল না। গৃহকর্ম্মের মধ্যে রমণীর সৌন্দর্য্য যেমন বিচিত্র, যেমন মধুর, এমন আর কোথাও নহে—এইজন্য আলস্য বরঞ্চ পুরুষকে শোভা পায়, কিন্তু নারীকে সাজে না;—স্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহ যেমন নদীর শোভা এবং স্বাস্থ্যকরতাকে জাগাইয়া রাখে—তেমনি কর্ম্মের ধারা রমণীর দেহমনের সমস্ত কান্তিকে নানাভাবে নানাভঙ্গীতে খেলাইয়া তরঙ্গিত করিয়া রাখে।

রমেশ আজ কমলাকে কর্ম্মের মাঝখানে দেখিল—সে যেন পাখীকে খাঁচার বাহিরে আকাশে উড়িতে দেখিল। তাহার প্রফুল্ল মুখ, তাহার সুনিপুণ পটুত্ব, তাহার কর্ম্মোদ্যমের লীলালহরী রমেশের মনে এক নূতন বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিয়া দিল।

এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ভাব তাহার মনের মধ্যে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল,—রমেশ চিরকাল একলা ছিল, বিচ্ছিন্ন ছিল—আজ সে ঐ কমলাকে কেন্দ্রস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেকে একটি সংসারপরিধির অন্তর্ভূত দেখিল। নিজের একটা মূল্য, একটা গৌরব বুঝিল,—একটা বিশেষ অধিকার লাভ করিল। এই সুন্দরী, এই কিশোরী, এই কল্যাণী রমেশের সংসারকে গড়িয়া তুলিবার, বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আপনাকে কেমন পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত উৎসর্গ করিয়াছে। ইহার মধ্যেই সে আপনার সমস্ত সার্থকতা অনুভব করিতেছে—আপনার সমস্ত লাবণ্য, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত প্রীতি এই

সংসারসৃজনের মধ্যে নিঃশেষে নিযুক্ত হইয়াছে;—কমলার ব্যস্ত চরণের গতি, তাহার তৎপর হস্তের কর্ম্ম প্রতি-মুহূর্ত্তে রমেশের কাছে কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের পদের মত বোধ হইতে লাগিল। রমেশ মনে মনে একটি গর্ব্ব অনুভব করিল। সে বুঝিল, সে এবং তাহার সংসার কমলার দ্বারা মহামূল্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন কমলাকে রমেশ তাহার স্বস্থানে দেখে নাই—আজ তাহাকে আপন নূতন সংসারের শিখরদেশে যখন দেখিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একটা মহিমা দেখিতে পাইল।

কমলার কাছে আসিয়া রমেশ কহিল—"কমলা, করিতেছ কি? শ্রান্ত হইয়া পড়িবে যে!"

কমলা তাহার কাজের মাঝখানে একটুখানি থামিয়া রমেশের দিকে মুখ তুলিয়া তাহার মিষ্টমুখের হাসি হাসিল—কহিল, "না, আমার কিছু হইবে না।"

রমেশ যে তাহার তত্ত্ব লইতে আসিল, এটুকু সে পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার কাজের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মুগ্ধ রমেশ ছুতা করিয়া আবার তাহার কাছে গিয়া কহিল—"তোমার খাওয়া হইয়াছে ত কমলা?"

কমলা কহিল, "বেশ, খাওয়া হয় নাই ত কি! কোন্‌কালে খাইয়াছি!"

রমেশ এ খবর জানিত—তবু এই প্রশ্নের ছলে কমলাকে একটুখানি আদর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না—কমলাও রমেশের এই অনাবশ্যক প্রশ্নে যে একটুখানি খুসি হয় নাই, তাহা নহে।

রমেশ আবার একটুখানি কথাবার্ত্তার সূত্রপাত করিবার জন্য কহিল, "কমলা, তুমি নিজের হাতে কত করিবে—আমাকে একটু খাটাইয়া লও না!"

কর্ম্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্ম্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়-একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়। কমলা হাসিয়া কহিল, "না, এ সমস্ত কাজ তোমাদের নয়!"

রমেশ কহিল, "পুরুষরা নিতান্তই সহিষ্ণু বলিয়া পুরুষজাতির প্রতি তোমাদের এই অবজ্ঞা আমরা সহ্য করিয়া থাকি, বিদ্রোহ করি না—তোমাদের মত যদি স্ত্রীলোক হইতাম, তবে তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিতাম। আচ্ছা, খুড়াকে ত তুমি খাটাইতে ত্রুটি কর না—আমি এতই কি অকর্ম্মণ্য!"

কমলা কহিল, "তা জানি না, কিন্তু তুমি রান্নাঘরের ঝুল ঝাড়াইতেছ, তাহা মনে করিলেই আমার হাসি পায়। তুমি এখান থেকে সর—এখানে ভারি ধূলা উড়াইয়াছে।"

রমেশ কমলার সহিত কথা চালাইবার জন্য বলিল "ধূলা ত লোকবিচার করে না, ধূলা আমাকেও যে চক্ষে দেখে, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখে!"

কমলা। আমার কাজ আছে বলিয়া ধূলা সহিতেছি, তোমার কাজ নাই, তুমি কেন ধূলা সহিবে?

রমেশ ভৃত্যদের কান বাঁচাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কাজ থাক্ বা না থাক্, তুমি যাহা সহ্য করিবে, আমি তাহার অংশ লইব।"

কমলার কর্ণমূল একটুখানি লাল হইয়া উঠিল—রমেশের কথার কোন উত্তর না দিয়া কমলা একটু সরিয়া-গিয়া কহিল—"উমেশ, এইখানটায় আর-এক-ঘড়া জল ঢাল্‌না—দেখ্‌ছিস্‌ নে কত কাদা জমিয়া আছে! ঝাঁটাটা আমার হাতে দে দেখি।"—বলিয়া ঝাঁটা লইয়া খুব বেগে মার্জ্জনকার্য্যে নিযুক্ত হইল।

রমেশ কমলাকে ঝাঁট দিতে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, "আহা, কমলা, ও কি করিতেছ?"

পিছন হইতে শুনিতে পাইল, "কেন রমেশবাবু, অন্যায় কাজটা কি হইতেছে? এদিকে ইংরাজি পড়িয়া আপনারা মুখে সাম্য প্রচার করেন; ঝাঁট দেওয়ার কাজটা যদি এতই হেয় মনে হয়, তবে চাকরের হাতেই বা ঝাঁটা দেন কেন? আমি মূর্খ, আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, সতী মায়ের হাতের ঐ ঝাঁটার প্রত্যেক কাঠি সূর্য্যের রশ্মিচ্ছটার মত আমার কাছে উজ্জ্বল ঠেকে। মা, তোমার জঙ্গল আমি একরকম প্রায় শেষ করিয়া আসিলাম, কোন্‌খানে তরকারীর ক্ষেৎ করিবে, আমাকে একবার দেখাইয়া দিতে হইবে।"

কমলা কহিল "খুড়ামশায়, একটুখানি সবুর কর, আমার এ ঘর সারা হইল বলিয়া!"

এই বলিয়া কমলা ঘর-পরিষ্কার শেষ করিয়া কোমরে-জড়ানো আঁচল মাথায় তুলিয়া বাহিরে আসিয়া খুড়ার সহিত তরকারীর ক্ষেৎ লইয়া গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। তরকারীর ক্ষেৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকারে অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে না, উমেশের এইরূপ ধারণা ছিল, সুতরাং এই প্রসঙ্গের মাঝখানে বিশেষ ঔৎসুক্যসহকারে সে-ও আসিয়া প্রবেশ করিল। রমেশও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু কপি-বীট-শালগমের আবাদসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বশত আলোচনার গভীর মাঝখানে তাহার স্থান হইল না। সে যা দুইএকটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, তাহা প্রাসঙ্গিক না হওয়াতে আলোচনাসমিতি তাহাতে বিশেষ কর্ণপাত করিল না!

এম্‌নি করিয়া দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইয়া গেল, কিন্তু ঘরগোছানো এখনো ঠিকমত হইয়া উঠিল না। বাংলাঘর অনেকদিন অব্যবহৃত ও রুদ্ধ ছিল, আরো দুই-চারিদিন ঘরগুলি ধোয়া-মাজা করিয়া জান্‌লা-দরজা খুলিয়া না রাখিলে তাহা বাসযোগ্য হইবে না দেখা গেল।

কাজেই আবার আজ সন্ধ্যার পরে খুড়ার বাড়ীতেই আশ্রয় লইতে হইল। আজ তাহাতে রমেশের মনটা কিছু দমিয়া গেল। আজ তাহাদের নিজের নিভৃত ঘরটিতে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বলিবে এবং কমলার সলজ্জ স্মিত-হাস্যটির সম্মুখে রমেশ আপনার পরিপূর্ণ হৃদয় নিবেদন করিয়া দিবে, ইহা সে সমস্তদিন থাকিয়া-থাকিয়া কল্পনা করিতেছিল। আরো দুইচারিদিন বিলম্বের সম্ভাবনা দেখিয়া রমেশ তাহার আদালতপ্রবেশ-সম্বন্ধীয় কাজে পরদিন এলাহাবাদে চলিয়া গেল।

৩৭

কাজের উৎসাহে, এবং সেদিন রমেশের কাছ হইতে যেটুকু আদরের সুস্পষ্ট ভূমিকা পাইয়া-

ছিল তাহাতে, কমলার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে খুড়ার বাড়ীতে ফিরিয়া অকারণে শৈলজার গলা জড়াইয়া ধরিল, শৈলর মেয়ে উমিকে কোলে তুলিয়া বক্ষের উপর সবেগে পীড়ন করিয়া শিশুর ভাষায় তাহার সহিত যা-তা বকিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলাকার রান্নার কাজে যোগ দিবার জন্য সে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। হরিভাবিনী কহিলেন, "আজ সমস্ত-দিন খাটিয়াছ, যাও একটু বিশ্রাম করগে!"

কমলা কহিল, "না, আমার কিছুই শ্রান্তিবোধ হইতেছে না—খুড়ামশায় আমার হাতের কপির-ডাল্না খাইতে চাহিয়াছিলেন, আমি আজ রাঁধিব।"

পরদিন কমলার নূতন বাসায় শৈলর চড়িভাতির নিমন্ত্রণ হইল। বিপিন আহারান্তে আপিসে গেলে পর শৈল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গেল। কমলার অনুরোধে খুড়া সেদিন সোমবারের ইস্কুল কামাই করিয়াছিলেন। দুইজনে মিলিয়া নিমগাছতলায় রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন, উমেশ সহায়কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

রান্না ও আহার হইয়া গেলে পর খুড়া ঘরের মধ্যে গিয়া মধ্যাহ্ননিদ্রায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই সখীতে নিমগাছের ছায়ায় বসিয়া তাহাদের সেই চিরদিনের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। এই গল্পগুলির সহিত মিশিয়া কমলার কাছে এই নদীর তীর, এই শীতের রৌদ্র, এই গাছের ছায়া বড় অপরূপ হইয়া উঠিল,—ঐ মেঘশূন্য নীলাকাশের যত সুদূর উচ্চে রেখার মত হইয়া চিল ভাসিতেছে, কমলার বক্ষোবাসী একটা উদ্দেশহারা আকাঙ্ক্ষা ততদূরেই উধাও হইয়া উড়িয়া গেল।

বেলা যাইতে না যাইতেই শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী আপিস হইতে আসিবে। কমলা কহিল, "একদিনো কি ভাই তোমার নিয়ম ভাঙিবার জো নাই?"

শৈল তাহার কোনো উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিয়া কমলার চিবুক ধরিয়া নাড়া দিল—এবং বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইয়া কহিল, "বাবা, আমি বাড়ী যাইতেছি।"

কমলাকে খুড়া কহিলেন, "মা, তুমিও চল!"

কমলা কহিল, "না, আমার কাজ বাকি আছে, আমি সন্ধ্যার পরে যাইব।"

খুড়া তাঁহার পুরাতন চাকরকে ও উমেশকে কমলার কাছে রাখিয়া শৈলকে বাড়ী পৌছাইয়া দিতে গেলেন, সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল—কহিলেন, "আমার ফিরিতে বেশি বিলম্ব হইবে না!"

কমলা যখন তাহার ঘর-গোছানোর কাজ শেষ করিল, তখনো সূর্য্য অস্ত যায় নাই। সে মাথায়-গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া নিমগাছের তলায় আসিয়া বসিল। দূরে ওপারে যেখানে বড়-বড় গোটা-দুই-তিন নৌকার মাস্তুল অগ্নিবর্ণ আকাশের গায়ে কালো আঁচড় কাটিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারই পশ্চাতের উঁচু পাড়ির আড়ালে সূর্য্য নামিয়া গেল। সম্মুখের সুদূরবিস্তৃত উদার দৃশ্যের উপর দিনান্তের যে করুণ আভাটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহা কমলার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মনের ভাবকে রাঙাইয়া তুলিল।

কমলা আজকাল আপনার মনের ভিতরকার একটি রক্তিমা, একটি গীতধ্বনি, একটি গন্ধোচ্ছ্বাস বেশ স্পষ্ট অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার সখী শৈলর সঙ্গে সে আপনার ভাব সমস্তটা মিলাইয়া পাইতেছে না। বিপিন শৈলজার অন্তরে-বাহিরে যেমন সুনির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, সুবৃহৎ হইয়া আছে—শৈল যেমন কোনো মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভোলে না, সকল অবস্থাতেই বিপিনের জন্য তাহার মন সচেতন হইয়া থাকে—রমেশের সম্বন্ধে কমলার মনের মধ্যে সেরূপ পরিপূর্ণভাব এখনো ত জন্মায় নাই। ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া রমেশ কমলার প্রতি মনোযোগ দিলে সে খুসি হয় বটে, কিন্তু কমলার চিত্ত ত দিনরাত্রি রমেশের জন্য প্রস্তুত হইয়া নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়া নাই, রমেশের কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে সে ত বিশেষ কোনো রস অনুভব করে না।

নিজের হৃদয়ের এই অভাব লইয়া, শৈলজার সহিত তুলনায় নিজের এই লাঘবতা লইয়া কমলা আপনাকে আজ পীড়ন করিতে লাগিল। তাহার গৃহ ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল, এইবার তাহার ভালবাসিবার পালা। সে ভালবাসিবেই! ভালবাসায় সে তাহার ঘর, তাহার মন ভরিয়া ফেলিবে, কোথাও কিছু ফাঁক থাকিবে না। এই স্থির করিয়া, এখনি এই সন্ধ্যা-বেলায়, এই নির্জ্জন তরুতলে সে তাহার সমস্ত মন প্রয়োগ করিয়া রমেশের কথা চিন্তা করিতে চেষ্টা করিল, সে রমেশের জন্য একটা আগ্রহ, একটা বেদনা বোধ করিতে চাহিল। ষ্টীমারে রমেশ তাহার সহিত অকারণে অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিল, সে সব কথা মনে আসিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ কমলা তাহা দূরে ঠেলিয়া দেয়; রমেশ তাহাকে ছুটির সময় অনাবশ্যক ইস্কুলে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কথাও সে জোর করিয়া কোনোমতে সরাইয়া ফেলে—সে সম্পূর্ণভাবে, একান্তভাবে ভালবাসিতে চায়। অনেকদিন পরে আজ সে আপনাকে একলা পাইয়াছে, আজ সে বসিয়া-বসিয়া ভালবাসায় আপনাকে যেন ভরিয়া লইতে লাগিল। মনে মনে রমেশকে ডাকিয়া কহিল, "আমার স্বামী!" স্বামী বলিবামাত্র কমলার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়া রমেশের মানসী মূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। স্বামিভক্তির সুর শৈল কমলার মনে বাঁধিয়া দিয়াছিল।

এমন-সময় উমেশটা একটা ছুতা করিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মা, অনেকক্ষণ তুমি পান খাও নাই—ও বাড়ী হইতে আসিবার সময় আমি পান জোগাড় করিয়া আনিয়াছি।" বলিয়া একটা কাগজে মোড়া কয়েকটা পান কমলার হাতে দিল।

কমলার তখন চৈতন্য হইল—সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উমেশ কহিল, "চক্রবর্ত্তিমশায় গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

কমলা গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বাংলার মধ্যে ঘরগুলি আর একবার দেখিয়া লইবার জন্য প্রবেশ করিল।

বড় ঘরে শীতের সময় আগুন জালিবার জন্য বিলাতী ছাঁদের একটি চুল্লী ছিল। তাহারি সংলগ্ন থাকের উপরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছিল। সেই থাকের উপর

কমলা পানের মোড়ক রাখিয়া কি-একটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিল। এমন-সময় হঠাৎ কাগজের মোড়কে রমেশের হস্তাক্ষরে তাহার নিজের নাম কমলার চোখে পড়িল।

উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি?"

উমেশ কহিল—"বাবুর ঘরের কোণে পড়িয়াছিল, ঝাঁট দিবার সময় তুলিয়া আনিয়াছি।"

কমলা সেই কাগজখানা মেলিয়া-ধরিয়া পড়িতে লাগিল।

হেমনলিনীকে রমেশ সেদিন যে বিস্তারিত চিঠি লিখিয়াছিল, এটা সেই চিঠি। স্বভাবশিথিল রমেশের হাত হইতে কখন্ সেটা কোথায় পড়িয়া গড়াইতেছিল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না।

কমলার পড়া হইয়া গেল। উমেশ কহিল, "মা, অমন করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে! রাত হইয়া যাইতেছে।"

ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কমলার মুখের দিকে চাহিয়া উমেশ ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, আমার কথা শুনিতেছ মা? ঘরে চল, রাত হইল!"

কিছুক্ষণ পরে খুড়ার চাকর আসিয়া কহিল, "মায়ীজি, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে। চল আমরা যাই।"

ক্রমশ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গ-বিভাগ।

বঙ্গ-বিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্ব্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সাম্‌লাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজিকাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতর নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি।

হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কল-কৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্ব্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা-সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাণক্য স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয়, আত্মরক্ষার জন্য দুর্ব্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিবর্সিটিবিলের দ্বারা তোমরা এদেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালীজাতিকে দুর্ব্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি অপর পক্ষ বলিষ্ঠ; আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে!

কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল্—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোল-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালী বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরাজ সুহৃদ্ বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালী সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া উঠে—"আহা, আর কেন, আর কাজ

নাই, আর থাক্।" পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দ্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চ্চা করিতে দেয় নাই—সম্বন্ধ বিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্ব্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিষকেই ঝাড়ে-মূলে উপ্‌ড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে; আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুস্কিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" শ্লোক বাঙালীর কণ্ঠস্থ—কিন্তু বাঙালীর তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না কারণ, শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুলসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতেহাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখ:—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালাজাতিকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশেই বাঙ্‌লাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিবার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক য়ুনিবর্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে, "তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব", তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না? গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, "তোমাদের মৎলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও!" এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, "তোমরা যাহা সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও!" বলিহারি এই "অতএব"!

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকৃই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্ম্মও যথানিয়মে পালিত হয় না—স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন? আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চির-

কাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটেই আমরা বুঝি ভাল, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কি লাভ করিতে পারিতাম, তাহা বর্ত্তমানে কল্পনা করিয়া কোন ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মনকষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি-বা কপটভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনোপক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তায়-ঘাটে, আপিসে-আদালতে, রেলে-ট্র্যামে, কাগজে-পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মনজানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে-ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালী-জাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্ত্তৃপক্ষেরা বাঙালীজাতকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালীজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমা-দিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্ব্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, তাহারো কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন? গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমাদের কি এমনি কপাল!

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পর-তন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড় কোনো জিনিষ গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কি করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? আবার ত সেই রাজ-দরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না?

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়া-ছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্ব্বল হইব না! কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন! মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে! আমা-দের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সে নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না! বাহিরের কিছুতে আমা-দিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা আমরা

কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্ব্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্ব্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক্ করিতে পারে, এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্ব্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা,—ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভ-ক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে, যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকুরি-বাকুরির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে পারে, তবে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পারে বটে। কিন্তু কি করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হোক্, কাল হোক্, গোপনে হোক্, প্রকাশ্যে হোক্, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই—আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন? মনে কর না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস্, তোকে মারিব"—তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, "আমি ঝরণার নীচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কি করিয়া?" তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল?

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর, সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, 'তোমরা কোনো কর্ম্মের নও!' আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল!' অধিকার কিসের! এ মোহ কেন! মহারাণী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্ম্মশালা হইতে আমরা ক্রমে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া

লাভ কি? সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে? ময়দানে মহারাণীর প্রস্তরমূর্ত্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার অনুগ্রহে! যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্য্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড্ কর্ণওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউনহল্ হইতে উদ্বেজিত করিয়া লাভ কি হইবে! এ সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্ত্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ, নিরাশ্বাস হইব না! এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেণ্ট একটা কি করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকলদিকে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি, তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনই বঞ্চিত হইব না।

বৃটিশ গবর্মেণ্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কি সাধ্য, তাহা জানিবার সময় হইবে,—আমাদের নিজের পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত, তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্‌শাল্ কন্‌ফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্ব্বোধ বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখনি ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌কে বলিব ধন্য—তখনি

অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান! হে রাজন্, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ, তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে দাও! আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে! আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্র-মূর্ত্তিই আমাদের পরিত্রাণ! জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে!

বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী।

অতঃপর বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত-পদাবলী। গ্রিয়ার্সন্‌কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৮২টি পদ ও সে-গুলির ইংরাজি অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন সঙ্কলনে সেগুলি সংবলিত হয় নাই। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যাপতির স্বরচিত, এ কথা গ্রিয়ার্সন্ স্বীকার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্কলিত কবিতা ১৬টি। বিদ্যাপতি দীর্ঘ-জীবী ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে রাধাকৃষ্ণসম্বন্ধে মোটে ১৬টি পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রিয়ার্সন্ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অন্বেষণ করেন নাই, গায়কদিগের মুখে বিদ্যাপতির গান সংগ্রহ করেন। তাঁহার সঙ্কলনে ভাবসম্মিলনের একটিও পদ নাই; বিদ্যাপতির গম্ভীর স্তোত্র —"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত ন তুয়া আদি-অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর-লহর-সমানা॥"—অথবা আর কোন স্তোত্র নাই, মাধবের পূর্ব্বরাগের একটিও পদ নাই। উৎকৃষ্ট পদ অনেকগুলি আছে, কিন্তু সমুদায় একত্র করিয়া কাব্য-সৌষ্ঠবে বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলীর সহিত তুলনা হয় না। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনপ্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। বিদ্যাপতির কতকগুলি অশ্লীল পদ আছে শুনিতে পাওয়া যায়। লেখকগণ সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ পদ উদ্ধৃত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এ কথার বিস্তৃত আলোচনার এ অবসর নহে। একটি বৃহৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যা-পতির পদাবলী ধর্ম্মগ্রন্থতুল্য, সঙ্কীর্ত্তনে চৈতন্য-দেব স্বয়ং এই সকল গীত শুনিয়া মুগ্ধ, মূর্চ্ছিত হইতেন, স্থানে স্থানে পদাবলীর পুঁথি অদ্যা-বধি তুলসী-পুষ্পে পূজিত হয়; কাব্যে কাহাকে অশ্লীল বলা যাইতে পারে, কাহাকে পারে না, সে সকল কথার বিচারে এখন প্রবৃত্ত হইব না। যে দেশের শিক্ষার গুণে

আমাদের রুচি বিশুদ্ধ ও সমুন্নত হইয়াছে, আজ কেবল সেইজাতীয় সাক্ষী ডাকিয়া ক্ষান্ত হইব। অতিশয় অশ্লীল ও নিন্দিত পদ গ্রিয়ার্সনের গ্রন্থে অনেকগুলি আছে এবং তিনি ভাষান্তর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি বলেন, "I have grouped the songs into classes, according to the subjects of which they treat; one class, for instance, treating of the first yearnings of the soul after God, another of the full possession of the soul by love for God, another for the estrangement of the soul, and so on. To understand the allegory, it may be taken as a general rule that Radha represents the soul, the messenger or *duti* the evangelist or else the mediator, and Krishna of course the deity." স্থানান্তরে, The glowing stanzas of Vidyapati are read by the devout Hindu with as little of the baser part of human sensuousness as the Song of Solomon is by the Christian priest। অন্যত্র, "They (Vidyapati's poems) became great favourites of the more modern Vaishnava reformer of Bengal— Chaitanya, and through him, songs purporting to be by Vidyapati have become as well known in Bengali households as the Bible is in an English one." জন বীম্‌স্ বিশেষ কিছু বুঝিতেন না, কিন্তু তিনিও *Indian Antiquary* পত্রে বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যের ভক্তিমার্গ পারস্যদেশের সূফী কাব্য ও ভক্তির সহিত উপমিত করেন। যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত দিওয়ান-ই-হাফিজের গজল ও জলালুদ্দীন রুমীর মস্‌নবী মূল কিংবা অনুবাদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তুলনার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। বিচিত্রভাষী বিশ্বপ্রেমিক আমেরিকান্ কবি Walt Whitman। মুক্তবন্ধন কবির সর্ব্বতোমুখী বাণী তূর্য্যনাদে ঘোষণা করিয়াছেন—

"No more modest than immodest.

* * * *

Through me forbidden voices,
Voices of sexes and lusts, voices
veiled and I remove the veil,
Voices indecent by me clarified
and transfigured."

গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহ অতি সামান্য, মিথিলায় বিদ্যাপতির আরও অনেক পদ আছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় চিরকাল বিদ্যাপতির ভক্ত, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া সম্প্রতি মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদাবলী আনাইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা মহারাজা উৎসাহের সহিত এই উদ্যমে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রধানত তাঁহারই যত্নে এই পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। সারদাবাবুর নিকট হইতে পদগুলি আমি পাইয়াছি। এই পদগুলিই এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান ও পুঁথি হইতে

সংগৃহীত হইতেছে বলিয়া পুঁথির কালনির্ণয় করা কিছু সময়সাপেক্ষ এবং অনেক পদ মুখে মুখে সংগৃহীত। এ পর্য্যন্ত আমরা ১৫১টি পদ পাইয়াছি, ইহাতে গ্রিয়ার্সনের প্রকাশিত ৬৩টি; পদ আছে, অপর সঙ্কলনে প্রকাশিত ৭টি এবং এদেশে প্রচলিত ৭টি পদের পাঠান্তর আছে। ইহার মধ্যে ১০টি অপ্রকাশিত শিবগীত। আমাদের পক্ষে প্রায় সকলগুলিই একেবারে নূতন। এখন নূতন, কিন্তু চিরকাল কি নূতন ছিল? এখন বঙ্গদেশীয় ও মৈথিল, দুইরূপ পদবিভাগ করিতে পারা যায়, কিন্তু চিরকাল কি এইরূপ প্রভেদ ছিল? যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিদ্যাপতির দুইচারিটি পদ ব্যতীত এ দেশে আর পাওয়া যায় না, অপরগুলি কেবল অনুকরণ কিংবা জাল, গ্রিয়ার্সনের এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। তিনি মিথিলার সমস্ত পুঁথি দেখেন নাই, পদকল্পতরুও উত্তম রূপে দেখিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশের সঙ্কলনকারগণ এক ভণিতা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি নাই। পদকল্পতরুতেই ভণিতাশূন্য অথবা অপরভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির বহুসংখ্যক পদ আছে। ভণিতাবিযুক্ত যে পদ পদকল্পতরুতে, পদামৃতসমুদ্রে, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পাইয়াছি, এবং যে কারণে কোন সঙ্কলনকার বিদ্যাপতির পদ বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন নাই, ভণিতাযুক্ত সেই পদ মৈথিল পুঁথিতে পাইতেছি। গোবিন্দদাসের এরূপ পদ পাইয়াছি, যাহাতে বিদ্যাপতির মৈথিল পদের ভাব অবিকল গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকবির সে পদ এখন এ দেশে প্রচলিত নাই। চণ্ডীদাস বাঙালী, তাঁহার পুঁথি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইবার কথা, এইজন্য অধিকসংখ্যক পদের ভণিতা পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি বিদেশী, তাঁহার পদ দুর্ব্বোধ, পুঁথির অক্ষরে কিছু প্রভেদ, হয় ত তাঁহার পদাবলী অধিকতর গীত হইত, ভণিতা সময়ে সময়ে লুপ্ত বা বিকৃত হওয়া বিচিত্র নহে। এ দেশে বিদ্যাপতির সঙ্কলনে যতগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ এ দেশে যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাস অনেক পদ সম্পূর্ণ পান নাই, কিন্তু তিনি যাহাও পাইয়াছিলেন, সে সকলগুলিও কোন সঙ্কলনে প্রকাশিত হয় নাই। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে চৈতন্যদেবের সময় ও তাহার কিছুকাল পরেও বিদ্যাপতির সমগ্র পদাবলী এ দেশে প্রচলিত ছিল, এই অনুমানই সঙ্গত বিবেচনা হয়।

মৈথিল পদাবলী ও এদেশের পদাবলীতে ভাষাগত পার্থক্য অনেক, কিন্তু ভাবগত সাদৃশ্য আরও অধিক। বঙ্গদেশের অপেক্ষা মিথিলায় পাঠ ও রচনা পরিবর্ত্তন অল্প। বিদ্যাপতির পর তাহার সমকক্ষ বৈষ্ণবকবি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন নাই। চৈতন্যদেবের ভক্তিস্রোত উজান বহিয়া মিথিলা ভাসাইতে পারে নাই, এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম সে প্রদেশে কখনও প্রবল হয় নাই। সে দেশে মৈথিলী জানকী ও তাঁহার পতি রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি এখনও অচলা। গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে একটি পদে 'হরি'শব্দের পরিবর্ত্তে 'রঘুপতি', এবং কয়েকটি পদের ভণিতায় 'জয় রাম' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'দশ-

রথসূত অরু জনকনন্দিনী' মিথিলার উপাস্য দেব-দেবী, বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। দ্বারভাঙা মজঃফরপুরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্যাপতির প্রায় কিছুই জানেন না। বিদ্যাপতির রচিত সংস্কৃত পুঁথি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ মৈথিল-ভাষায় রচিত পদাবলী এ পর্য্যন্ত সে আকারে প্রকাশিত হয় নাই, ইহাতেই তাঁহার বৈষ্ণব গীতাবলীর কিরূপ সমাদর, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সমাদর নাই বলিয়াই পাঠবিকৃতিরও বাহুল্য নাই। বিদ্যাপতির রচনা আধুনিক মৈথিল ব্যাকরণের অনুযায়ী করিবার চেষ্টা হওয়াতে স্থানে স্থানে আধুনিক মৈথিল ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার অধিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। যেখানে শব্দপরিবর্ত্তন, সেখানেই শ্রুতিপরুষতা-দোষ ঘটিবে। গীতে ও কাব্যে প্রভেদ এই যে, গীত রাগিণী ও লয়ের অবলম্বনে মিষ্ট, তাহার বিচ্ছেদে শব্দযোজনামাত্র; যে শব্দমালা রাগরাগিণীর মুখপ্রেক্ষী নহে, যাহার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হিল্লোলিত রাগিণী সঞ্চরণ করে, শ্লোকের বন্ধনীতে বন্ধনীতে সম রক্ষিত হয়, তাহাই কাব্য। বিদ্যাপতির রচনা উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, সুরেও সঙ্গীত, শব্দেও সঙ্গীত, শব্দপরিবর্ত্তনের প্রয়াস হইলেই রসভঙ্গ হইবে। এ দেশে প্রচলিত পদাবলীর তুলনায় মৈথিল পদগুলিতে ভাষার ও ভঙ্গীর সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য আছে। শব্দলালিত্যে ও ছন্দের তরল গতিতে ঝরঝর নির্ঝরপাততুল্য শ্রবণাভিরাম। অপ্রকাশিত পদগুলির মধ্যে এমন অনেক পদ আছে, যাহা পাঠ করিতে বিস্ময় ও পুলকে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কয়েকটি মৈথিল পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রত্যেক পদের সংক্ষিপ্ত অন্বয়ার্থ করিয়াছি। প্রথম ৩টি পদ আমাদের পুঁথিতে এবং গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনেও আছে।—

কানন কান্থ কান হম শুনল
ভই গেল আনক আনে।
হেরইত শঙ্কররিপু মোহি হরলনি
কি কহব তনিক গেয়ানে॥
চানন চান আঙ্গ হম লেপলি
তঁই বাঢ়ল অতি দাপে।
অধরক লোভসোঁ বিষধর সসরল
ধরই চাহ ফেরি সাপে॥
ভণহি বিদ্যাপতি দুহুক মুদিত মন
মধুকর লোভিত কেলি।
অসহ সহতি কত কোমল কামিনী
যামিনী জীব দয় গেলি॥

কাননে কানাই (আসিয়াছে) শুনিয়া আমি অন্যমনা হইলাম। (যখন কানাইকে) দর্শন করিলাম, (তখন) শঙ্কররিপু মদন আমাকে হরণ করিলেন (আমার চৈতন্য হরণ করিলেন), তাঁহার (মদনের) বিবেচনার (কথা) কি বলিব? (প্রথম বিকার শ্রবণজনিত, দ্বিতীয় বিকার দর্শনে।) চন্দন (এবং) চন্দ্র আমি অঙ্গে লেপন করিলাম (অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া শীতল হইবার আশায় জ্যোৎস্নালোকে বসিলাম), তাহাতে (শ্রবণ ও দর্শনজনিত বিকার) অত্যন্ত দর্পের সহিত বাড়িল। অধরের লোভে বিষধর সর্প নীচে নামিল (বেণী মুক্ত হইয়া মুখের উপর পড়িল), সর্পকে ফিরিয়া ধরিতে চাহিলাম (মুক্ত বেণী যুক্ত করিতে চাহিলাম)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, দুই জনের প্রীত মন, মধুকর কেলিলুব্ধ। কোমল কামিনী অসহ্য কত

সুহ্য করিবে? যামিনী জীবন দিয়া গেল (রজনীতে উভয়ের মিলন হইল)।

দ্বিতীয় পদটি নূতন ধরণের। পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান প্রভৃতি যে সকল পদের বিভাগ আছে, মিথিলায় তাহার অতিরিক্ত 'লাথ'-শীর্ষক একটি বিভাগ দেখা যায়। লাথের অর্থ ছলনা, অপরাধগোপনমানসে কৌশলবাক্য-প্রয়োগ। বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদেও এই শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি—'ভণই বিদ্যাপতি ন করহ লাথ'। অভিসার হইতে সদ্য প্রত্যাগত রাধা ননদের নিকট অপরাধ গোপন করিতেছেন। কবিতার কৌশল এই যে, ছল প্রত্যক্ষ, অথচ গূঢ় রূপকের ভাষায় অভিসারিকা সত্য বর্ণন করিতেছেন।—

ননদি সরূপ নিরূপহ দোষে।
বিনু বিচার অভিচার বুঝইবহ
　শাশু করইবহ রোষে॥
কৌতুক কমল নাল হম তোড়লি
　করই চাহলি অবতংসে।
রোষ কোষসোঁ মধুকর ধাওল
　তেঁহি অধর কর দংশে॥
সরোবরঘাটবাট সঙ্কটতরু
　হেরি নহি শকলহুঁ আগ।
সোঁ কর বাট উবটিঁহম চললহুঁ
　তেঁই কুচ কণ্টক লাগ॥
গরুয় কুম্ভ শির থির নহি থাকয়
　তেঁই উধসল কেশপাশে।
সখীজনসোঁ হম পাছু পড়লহুঁ
　তেঁই ভেল দীঘ নিশাসে॥
পথ অপরাধ পিশুন পরচারল
　তথি হুঁ উত্তর হম দেলা।
অমরখতাহি ধৈরজ নহি রহলে
　তেঁই গদগদ স্বর ভেলা॥
ভণহি বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
　ই সভ রাখহ গোই।
নন্দিসোঁ রসরীতি বচায়ব
　গুপত বেকত নহি হোই॥

ননদ, (আমার) অবয়ব দেখিয়া দোষ নিরূপণ করিতেছ। বিনা বিচারে (দোষ নিরূপণ করিলে) বিদ্বেষ বুঝাইবে (ও) শাশুড়ী রাগ করিবেন। কৌতুক করিয়া মৃণাল হইতে পদ্ম ছিঁড়িয়া আমি শিরোভূষণ করিতে চাহিলাম, কমলকোষ হইতে ক্রুদ্ধ মধুকর ধাবিত হইয়া আমার অধরে দংশন করিল। সরোবরঘাটের পথে তরুসঙ্কট পূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই, ফিরিয়া অন্য পথে যাইতে কুচে কণ্টক লাগিল। গুরুভার পূর্ণকুম্ভ শিরে স্থির থাকে না, সেই কারণে কেশপাশ আলুলিত হইয়াছে। সখীজনের পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম, (দৌড়িয়া আসিতে) নিশ্বাস দীর্ঘ হইয়াছে। পথে দুষ্টলোকে আমাকে বিদ্রূপ করিল, তাহাতে আমি উত্তর দিলাম, ক্রোধে ধৈর্য্য রহিল না, সেইজন্য কণ্ঠস্বর গদ্গদ হইয়াছে। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, এ সকল গোপন করিয়া রাখ। ননদী হইতে রসরীতি রক্ষা করিবে, (তাহা হইলে) গুপ্ত ব্যক্ত হইবে না।

বিরহ-আশঙ্কার একটি পদ। এটিও রাধার উক্তি।—

মাধব তোঁহে জনি যাহ বিদেশে।
হমরো রঙ্গ-রভস লই যয়বহ
　লয়বহ কোন সন্দেশে॥
বনহি গমন কর হোয়তি দোসরমতি
　বিসরি যায়ব পতি মোরা।
হীরা মণি মাণিক একো নহি মাগব
　ফেরি মাগব পহু তোরা॥
যখন গমন কর নয়ন নোর ভরু
　দেখিও ন ভেল পহু ওরা।

একহি নগর বসি পহু ভেল পরবশ
কইসে পুরত মন মোরা॥
পহুসঙ্গ কামিনী বহুত সোহাগিনী
চন্দ্রনিকট যইসে তারা।
ভণহি বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
অপন হৃদয় ধরু সারা॥

মাধব, তুমি বিদেশে যাইও না; আমার রঙ্গরহস্য (আনন্দ) লইয়া যাইবে, (পরে কি) কোন সংবাদ লইবে? বনে (ব্রজপুরী ও মথুরার মধ্যস্থিত বন) গমন করিয়া অনুমতি হইবে, হে প্রাণপতি, আমাকে ভুলিয়া যাইবে। হীরা, মণি, মাণিক্য একটিও চাহিব না, প্রভু তোমাকেই ফিরিয়া চাহিব। যখন গমন কর, (আমার) চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, প্রভু, দর্শনেরও সীমা হয় না (চক্ষু ভরিয়া তোমাকে দেখিতেও পাই না)। এক নগরে বাস করিয়া প্রভু পরবশ হইল (অপর রমণীর প্রেমপ্রার্থী হইল), আমার মনস্কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে? প্রভুর সঙ্গে (থাকিলে) কামিনী অত্যন্ত ভাগ্যবতী হয়, যেমন চন্দ্রের নিকটে তারা। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, আপনার হৃদয়ে সার ধর (আত্মনির্ভর কর)।

গ্রিয়ার্সন্ যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, পদাবলীর অর্থগ্রহণে তদনুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ও অনেকস্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটি কৌতুকাবহ কারণ আছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা লক্ষ্মণাব্দ ধরিয়া বৎসর গণনা করেন, কিন্তু বিদ্যাপতির পদের অর্থ করিবার সময় প্রাচীন কিংবা আধুনিক বাংলাভাষার সহিত প্রাচীন মৈথিলভাষার যে কোন সাদৃশ্য আছে, কোনমতেই তাহা স্বীকার করিতে চান না। গ্রিয়ার্সন্ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আধুনিক মৈথিলভাষায় ‘পারা’ (করিবার শক্তি) অর্থে ‘পার’শব্দের ব্যবহার নাই, কিন্তু বিদ্যাপতির পদে যে সে অর্থে প্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যথা, “লুবুধল নয়ন হটয় কে পার,” লুব্ধনয়নকে কে হটাইতে (নিবারণ করিতে) পারে? মৈথিল পণ্ডিতেরা এ অর্থ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। সংস্কৃতে বিশেষ্য ‘পার’-শব্দের যে অর্থ, তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের অর্থ—পরপারগামী (অর্থাৎ বাঞ্ছিতপ্রার্থী) লুব্ধনয়নকে কে ফিরাইতে পারে? গ্রিয়ার্সন্ এই কষ্টকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলাভাষার অনুরূপ অনুবাদ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে প্রতিজ্ঞা ‘হটয় কে পার’? বিদ্যাপতির আর এক স্থলে আছে—“কহিয় ন পারিয় পহু-মুখ-ভাষা”, প্রভুর মুখের ভাষা (তিনি যাহা কহিয়াছিলেন), কহিতে পারি না। পণ্ডিতের অর্থ—প্রভুর মুখের ভাষার কথন (পুনরাবৃত্তি) পারপ্রাপ্ত হইল না। গৌণার্থে বড় প্রভেদ নাই, তবে পণ্ডিতের অর্থে মুণ্ডপরিভ্রমণ করিয়া নাসিকাধারণের ব্যায়ামকৌশল আছে। আরও এক স্থানে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন, “আকম্প কঠিন সহয় কে পার”, কঠিন আলিঙ্গন কে সহিতে পারে? পণ্ডিতদিগের অর্থ—কঠিন আলিঙ্গনের চরমসীমা কে সহ্য করিতে পারে? এমন পণ্ডিতমণ্ডলীকে পারিয়া উঠা দায়। কিন্তু যাঁহাদিগকে গ্রিয়ার্সন্ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা

ছাড়া মিথিলায় অপর উত্তম পণ্ডিত আছেন, ও তাঁহারা পদাবলীর সুন্দর সদর্থ করিয়া থাকেন।

যে সকল পদ ইতিপূর্ব্বে একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই, অথবা দুইএকটি পদ-কল্পতরুর অতি মনোরম্য অথচ অতি দুর্গম অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে থাকিলেও আমাদের অপরিচিত, এমন কয়েকটি শ্রবণ করুন। এই কবিতা-কয়েকটি আমার বিবেচনায় বিদ্যাপতির মূল রচনা, কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি ঘটে নাই।—

নন্দক নন্দ কদম্বেরি তরু তরই
　ধীরই ধীরই মুরলী বোলাব।
সময় সঙ্কেতনিকেতন বইসল
　বেরি বেরি বোলি পঠাব॥
শ্যামরি, তোরা লাগি
　অনুখনে বিকল মুরারি॥
যমুনাক তীরই উপবন উদবেগল
　ফিরি ফিরি তওহি নিহারি।
গোরস বিকই অবইত যাইতেঁ
　জনি জনি পুছ বনমারী॥
তোঁহই মতিমান সুমতি মধুসূদন
　বচন শুনহ কিছু মোরা।
ভণই বিদ্যাপতি শুনু বরযৌবতি
　বন্দহ নন্দকিশোরা॥

নন্দের নন্দন কদম্বতরুতলে ধীরে ধীরে মুরলী বাজায়। সঙ্কেতনিকেতনে বসিয়া (মিলন-) সময় (আগত জানিয়া) বারবার আহ্বান-ধ্বনি পাঠায়। সুন্দরি, তোর লাগিয়া মুরারি অনুক্ষণ বিকল। যমুনার তীরে উপবনে উদ্বিগ্ন হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই (সঙ্কেতনিকেতনের অভিমুখে) দেখিতেছে। (যে সকল গোপী) দুগ্ধবিক্রয় করিতে আসিতেছে (বা) যাইতেছে, (তাহাদিগের) প্রত্যেককে বনমালী (তোর কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুমতি, আমার কথা কিছু শোন্, মধুসূদন তোর প্রতি অনুরক্ত (হইয়াছে)। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন যুবতীশ্রেষ্ঠ, নন্দকিশোরকে বন্দনা কর।

মাধবকে দেখিয়া রাধা সখীকে কহিতেছেন—

হমে হসি হেরলা থোরারে।
সফল ভেল সখি কৌতুক মোরারে॥
　এ সোএ।
হেরিতহি হরি ভেল আনে রে।
জনি মনমথ মন বেধল বাণে রে॥
　লখল ললিত তনু গাতে রে।
মন ভেল পরশিয় সরসিজপাতে রে॥
　তনু পসরল বিন্দু রে।
নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দু রে॥
　কাঁপল পরম রসালে।
জনি মনসিজ গরই জপেলু তমালে রে॥
　বিদ্যাপতি কবি ভাণেরে।
করত কমলমুখী হরি সাবধানে রে॥

আমাকে অল্প হাসিয়া দেখিল; সখি, আমার কৌতূহল সফল হইল। সই (আমাকে) দেখিয়া হরি অন্যমনা হইল, যেন মন্মথ তাহার চিত্তে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার ললিত গাত্র লক্ষ্য করিলাম, মনে হইল সর-সিজপত্র স্পর্শ করিতেছি। (তাহার) অঙ্গে স্বেদবিন্দু প্রসারিত হইল, (সেই রূপ দেখিয়া) তারাসনাথ চন্দ্র ফিরিয়া পলায়ন করিল। (অনুরাগ-আতিশয্যে) রসার্দ্র হইয়া (তাহার কলেবর) কম্পিত হইল, যেন তমাল কন্দর্পের নামকীর্ত্তন করিতে করিতে গলিয়া গেল। বিদ্যাপতি কবি

কহিতেছে, হরি কমলমুখীকে সচেতন করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার হৃদয়ে অনঙ্গ জাগরণ করিতেছে।

একটি কবিতায় রাধার সহজ-সুন্দর রূপ বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গে দুইটিমাত্র অলঙ্কারের উল্লেখ আছে—কর্ণে কুণ্ডল ও কণ্ঠে বৈদূর্য্য-মণি। এই স্বল্পালঙ্কৃত রূপ কবি তাঁহার অতুল শব্দৈশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন।—

সহজ সুন্দর চিকুর চামর
সজল-জলদ-সমূহ-শামর
সিউথি সরণি সুচার
সিন্দুররাগ আঁকুর রে।
অতি শোহাওন বদনমণ্ডল
নিয়র চঞ্চল কনককুণ্ডল
নয়ন বাণ কমান জনি দুর
আন নহি ফুর রে।
রূপই রতি অতি অনুপ দেখলি
ললিত কনকলতা বিশেষলি
বিধিহ জনি বিনু পরশই সিরিজলি
মদনই অরজলি রে॥
ভূমিতল রাকেশছবিধর
বদনসুষমা অতি মনোহর
কনকলতিকা যেহন সঞ্চর
দোষবরজলি রে॥
দুলভ দৌরী গহল গীমা
দেখল দুহু মিলি রূপসীমা
গুরু পয়োধরভার নিয়রহি
সে ন হোয় কহিরে॥
বাহু বন্ধুর বিপুল হরখল
চারু চন্দনখণ্ড ঘরখল
বলয়যুগ সন আন কিছু
নহি লাগি রহয়হি রে॥
মাঁঝ পিশুনক নেহসম খীণ
সুজননেহ নিতম্বই জনি জিন
চরণ চটুল মরালসম গতি
কুন্দনখ ভতি রে॥
সবকলাময় গুণক আগরী
লখলি বিধিবশই নগর নাগরী
সুকবি বিদ্যাপতি ভণিত রস
বুঝই যদুপতিরে॥

চামর-(তুল্য) কেশ সজল জলদসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ (ও) স্বভাবত সুন্দর, সিন্দুর-রাগের সুন্দর অঙ্কুর সীমন্তপ্রসারী। অতি শোভন বদনমণ্ডলের নিকট চঞ্চল কনক-কুণ্ডল নয়নধনুকের বাণতুল্য দোলায়মান, আর কিছু মনে হয় না। রতিরূপ ললিত কনকলতাশ্রেষ্ঠ অতি অনুপম দেখিলাম; বিধি যেন বিনা স্পর্শে (স্পর্শমলিন না করিয়া) মদনের অর্চনাঞ্জলি সৃজন করিয়াছেন। অতি মনোহর বদনসুষমা ভূমিতলে পূর্ণচন্দ্রচ্ছবি ধারণ করিয়াছে, যেন দোষবর্জ্জিতা অনিন্দ্য কনকলতিকা সঞ্চরণ করিতেছে। গ্রীবা দুর্লভ বৈদূর্য্যমণি ধারণ করিয়াছে, (কণ্ঠ ও মণি) উভয়ে মিলিয়া রূপের সীমা দেখাইতেছে; (তাহার) সমীপেই গুরু পয়োধরভার, তাহা কহা যায় না (বর্ণনাতীত)। বিপুল হর্ষিত (পুলকাঞ্চিত) বন্ধুর বাহুতে বলয়যুগলতুল্য চারু চন্দনখণ্ড ঘর্ষিত, আর কিছু লাগিয়া নাই (হস্তে আর কোন অলঙ্কার নাই)। কটি পিশুনের স্নেহের ন্যায় ক্ষীণ (ক্রূর ব্যক্তির প্রেম যেরূপ ক্ষণস্থায়ী, কটি সেইরূপ ক্ষীণ); নিতম্ব সুজনের স্নেহকে যেন জয় করিয়াছে (সুজনের প্রেম যেরূপ চিরস্থায়ী, নিতম্ব যেন তদপেক্ষা বিপুল); গমন মরালতুল্য, চরণ চটুল, তাহাতে কুন্দকুসুম-(তুল্য) নখ-পংক্তি। সকলকলাময় গুণের অগ্রগণ্যা নাগরী বিধির কৃপায় নগরে দর্শন করিলাম। সুকবি বিদ্যাপতি-(কৃত) কথিত রস যদুপতি বুঝেন।

একটি রূপক শ্রবণ করুন—

সঁঝহি নিজমুখপ্রেম পিয়াই ।
কমলিনী ভমরা রখল ছিপাই ॥
শেজ ভেল পরিমল ফুল ভেল বাসে ।
কতয় ভমরা মোর পরল উপাসে ॥
ভমি ভমি ভমরী বালভু নিজ খোজে ।
মধু পিবি মধুকর শুতল সরোজে ॥
নহি ফুল কহেস নহি উগই ন সূরে ।
সিনেহো নহি যায় জীব সৌ মোরে ।
কেও নহি কহই সখি বালভু বাতই ।
রইন সমাগম ভই গেল প্রাতই ॥
ভণহি বিদ্যাপতি শুনি এ ভমরী ।
বালভু অছি তোর অপনহি নগরী ॥

নিজমুখপ্রেমসুধা পান করাইয়া কমলিনী সন্ধ্যাকালেই ভ্রমরকে গোপন করিয়া রাখিল। ফুল বাসস্থান ও পরিমল শয্যা হইল। ভ্রমরী ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আপনার পতিকে অন্বেষণ করে, (ও কহে), কোথায় আমার ভ্রমর উপবাসী রহিল। (ওদিকে) মধুকর মধু পান করিয়া কমলের মধ্যে শয়ন করিল। ফুলও কিছু কহে না, সূর্য্যও উদয় হয় না। (ভ্রমরী কহিতেছে) স্নেহে, অর্থাৎ স্নেহজনিত বিচ্ছেদ-যাতনায় আমার প্রাণও যায় না। সখি, বল্লভের কথা (সংবাদ) কেহ কহে না, রাত্রে সমাগম (হইবার কথা), প্রভাত হইয়া গেল। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন ভ্রমরি, তোর বল্লভ নিজেরই নগরীতে আছে।

বিরহের প্রথম অবস্থায় রাধা কহিতেছেন—

গমনই গমাউলি গরিমা
অগমন জীবনসন্দেহ ।
দিনই দিনই তনু অবসন ভেল
হিমকমলিনীসম নেহ ॥
অবহু ন সুমিরত মধুরিপু
কি করতি সুন্দরীনাম ।
বিনু দোষ মোহি বিসরল হু
কহিনী রহতি বহু ঠাম ॥
এক দিশ কাহ্নু অওকাদিশ
সুবিদিত বংশ বিশালা ।
দুই পথ চঢ়লি নিতম্বিনী
সংশয় পড়ু কুলবালা ॥
পাঁচবাণ অতি আতয়
ধৈরজ কর মন থিরে ।
বিদ্যাপতি কবিবর ভণ
আঁখ নয়ন বহু নীরে ॥

গমনে (অভিসারে) গরিমা হারাইলাম, না যাইলে জীবনসংশয়। দিনে দিনে তনু অবসন্ন হইল, কমলিনীর সহিত তুষারের যেমন স্নেহ। মধুরিপু (মধুসূদন) এখনও আমাকে স্মরণ করেন না, সুন্দরীনামে (আমার). কি করিবে? বিনা দোষে আমাকে বিস্মৃত হইলেন, (এই) কাহিনী বহুস্থানে থাকিবে। একদিকে কানাই, আর একদিকে সুবিদিত বিশাল বংশ; দুই পথে নিতম্বিনী আরোহণ করিলেন, কুলবালা সংশয়ে পড়িল। মদন অত্যন্ত দহন করিতেছে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মন স্থির কর। বিদ্যাপতি কবিবর কহে, শোকে (আমার নয়নে) অশ্রু বহিতেছে।

অনুভবমিলনের একটি পদ—

সপনে আয়ল সখি মঝ পিয়া পাশে ।
তখনুক কি কহব হৃদয়হুলাসে ॥
ন দেখিয় ধনুগুণ ন দেখু সন্ধানে ।
চৌদিশ পরয়ে কুসুমশরবাণে ॥
বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা ।
চান উগল জনি সমুদ্রহিলোরা ॥
উঠলি চেহায় আলিঙ্গন বেরি ।
রহলি লজায় শুনি শেজ হেরি ॥
ভনই বিদ্যাপতি শুনহ সপনে ।
জত দেখলহ তত পুরতোহ মনে ॥

সখি, স্বপ্নে প্রিয় আমার নিকটে আসিল; তখনকার হৃদয়ের আনন্দ কি কহিব! ধনু-গুণ অথবা সন্ধান (কিছুই) দেখি না, (মাত্র দেখিলাম) চতুর্দ্দিকে মদনের বাণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। অল্পবিকশিত বঙ্কিম নয়ন, যেন সমুদ্রহিল্লোলে চন্দ্রোদয় হইল (সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত ভগ্ন-চঞ্চল চন্দ্রবিম্বের ন্যায় ঈষদুন্মীলিত বঙ্কিম নয়ন)। আলিঙ্গনের সময় চমকিত হইয়া উঠিলাম, শূন্য শয্যা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া রহিলাম। বিদ্যাপতি কহিতেছে, শুন, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছ, তাহা মনে পূর্ণ হইবে।

দুইটি অপ্রকাশিত পদের ভণিতার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। প্রথমটি এই—

দশ অবধান ভণ পুরুষ পেম গুণি
প্রথম সমাগম ভেলা।
আলমশাহ পহু ভাবিনি ভজি রহ
কমলিনী ভমর ভুললা॥

দশ অবধান কে? এই উপাধি অথবা নাম পূর্ব্বে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পুঁথিতে মৈথিলভাষায় একটি টীকা আছে—

বিদ্যাপতিকাঁ উপাধি দশাবধান ছল যে দিল্লীদরবারসোঁ ভেটল ছল।

পদটি ভণিতাযুক্ত অর্থে রাধাকৃষ্ণবিষয়ে নহে, কিন্তু রচনার একই প্রণালী। অভিসার হইতে প্রত্যাগত কোন রমণীকে কবি পথে কহিতেছেন—

গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃগমদ পঙ্কে লেপলা।
জনি সুমেরু শশিখণ্ড উদিত ভেল
জলধর জালহি ঝপলা॥
অভিসারিণি হে কপট করহ কাঁ লাগি।
কোন পুরুষ গুণই লুবুধ তোহর মন
রয়নী গমউলহ জাগি॥

ভণিতার অর্থ—দশাবধান কহিতেছে, গুণবান্ পুরুষের সহিত প্রথম প্রেমসমাগম হইল। কমলিনী যেমন ভ্রমরে ভুলিয়া থাকে, হে ভাবিনি, আলমশাহ প্রভুকে ভজনা করিয়া তাঁহাতে সেইরূপ অনুরক্ত হও। মৈথিল টীকায় রহিয়াছে, বিদ্যাপতির উপাধি দশাবধান ছিল, যাহা দিল্লীদরবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, শিবসিংহকে যখন দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়, সেই সময় বাদশাহ বিদ্যাপতির রচিত গীত শুনিয়া, প্রীত হইয়া, শিবসিংহকে মুক্ত করিয়া দেন। গ্রিয়ার্সন্ অনুমান করেন—"কামিনী করু অসনানে, হেরইতে হির্দয় হনল পচমানে"—এই পদটি বিদ্যাপতি বাদশাহের সাক্ষাতে রচনা করেন। মিথিলায় এইরূপ বিশ্বাস আছে। হয় ত এই পদটিও সেই সময়ের রচনা। যে উপাধি দিল্লীদরবার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভণিতায় তাহাই প্রয়োগ করিয়া অপরা রমণীর বর্ণনা করিয়া বাদশাহের চিত্তবিনোদন করা কবির পক্ষে অধিকতর সম্ভব মনে হয়। দশাবধান-উপাধিযুক্ত আর কোন পদ দেখিতে পাই নাই।

দ্বিতীয় পদটির বিষয় ও অর্থ অবিকল প্রথম পদের অনুরূপ, কেবল ভণিতা ভিন্ন।—

কেকতেও চোরী গুপত কর কতিখন
বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম যুগপতি চিরইজীব জীবথু
গ্যাসদেব সুলতান॥

বিদ্যাপতি কবি কহিতেছে, প্রকাশ্য চুরী কতক্ষণ গোপন করিবে? যুগপতি সুলতান

গ্যাসদেব (এই চুরীর বার্ত্তা) বিদিত আছেন, (তিনি) চিরজীবী হইয়া জীবিত হউন। বোধ হয়, এই গ্যাসদেব গ্যাসউদ্দীন, বঙ্গদেশের পাঠানবংশীয় রাজা। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্যাস-উদ্দীনের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের দানপত্রের কাল প্রচলিত বিশ্বাসমতে খৃষ্টাব্দ ১৪০০। গ্রিয়ার্সনের বিশ্বাস, খৃষ্ট-চতুর্দ্দশ-শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৭৩ সালের পূর্ব্বে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের কোন কারণ নাই। মহলম (মালুম) ও সুলতান, এই দুই শব্দের সন্নিবেশনে অনুমান হয় যে, পদটি গ্যাসউদ্দীনের মনস্তুষ্টির জন্য রচিত ও সম্ভবত তাঁহার সাক্ষাতে গীত।

আর এক শ্রেণীর কবিতা গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে ও মৈথিল পুঁথিতে পাওয়া যায় এবং এ দেশেও ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত আছে। সেগুলি প্রহেলিকা অথবা হেঁয়ালি কবিতা। যখন মৈথিল ও এদেশে প্রচলিত এরূপ পদে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে এগুলি বিদ্যাপতির রচিত নয়, এমন কথা বলা যায় না। এগুলি যে রাজসভায় অথবা রাজাদেশে রচিত, অথবা ক্ষণে-তুষ্ট ক্ষণে-রুষ্ট অব্যবস্থিত রাজচিত্ত প্রসাদনের নিমিত্ত বিরচিত, তাহা কল্পনা করিতে পারা যায়। এই কঠিন সমস্যাগুলি কোন পণ্ডিত পূরণ করিয়া দিতেন, অথবা পণ্ডিতেরা অক্ষম হইলে কবি নিজে অর্থ করিয়া দিতেন ও সাধুধ্বনিতে রাজসভা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, এরূপ অনুমান অসঙ্গত মনে হয় না। পুঁথিতে এই শ্রেণীর একটি পদের ভণিতা এইরূপ—

ভণ বিদ্যাপতি শুনু উমাপতি
সকলগুণনিধান।
যে ই পদক অর্থ লগাবথি
সো জন বড় সেয়ান॥

বিদ্যাপতি কহিতেছে, সকলগুণনিধান উমাপতি শুন, যে এই পদের অর্থ লাগাইবে (করিবে), সে জন বড় চতুর। বিদ্যাপতির সমকালীন উমাপতিনামক আর একজন কবি ছিলেন। কবি ভণিতায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন।

রাধাকৃষ্ণপদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি শিববিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা এখন সকলেই জানেন, ও মিথিলায় সেগুলি বিশেষ প্রচলিত। একটি অপ্রকাশিত পদ উদ্ধৃত করি।—

হে হর তোঁহ প্রভু ত্রিভুবননাথে।
হম নিরদীশ অনাথে॥
করম ধরম তপ হীনে।
পড়লহুঁ পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মঁঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করু আরে॥
সাগরসম দুখভারে।
অবহু করিয় প্রতিকারে॥
ভণহি বিদ্যাপতি ভাণে।
সংকট করিয় তরাণে॥

পদের ভাষা নিতান্ত সরল, কেবল একটি পদ কিছু দুর্ব্বোধ—"বেড় ভাসল মঁঝ ধারে, ভৈরব ধরু করু আরে"; অর্থ, (আমার) নৌকা স্রোতের মধ্যে ভাসিল, হে ভৈরব, ধরিয়া কিনারায় কর।

আমাদের দেশে বিদ্যাপতির পদাবলী যাহা প্রচলিত আছে, সেগুলি নিতান্ত অসম্পূর্ণ। মিথিলার পদগুলি ছাড়িয়া দিয়াও এক পদকল্পতরুতে যতগুলি পদ পাওয়া যায়, তাহাও কখন সংগৃহীত হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে

অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ভণিতায় নানাবিধ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু কোন সঙ্কলনকার সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। ভণিতা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু দেখেন নাই, যে সকল রচনা কোনমতেই বিদ্যাপতির হইতে পারে না, সংশয়শূন্যচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। আবার রচনাগৌরবে যাহা নিঃসন্দেহ বিদ্যাপতির ভণিতা নাই বলিয়া তাহা অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকগুলি মৈথিল পদ একজন ইংরাজের অধ্যবসায়, যত্ন, গুণগ্রাহিতা, উদারতা ও ভাবুকতায়, বিশ বৎসরের উপর হইল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও বহুসংখ্যক অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। মাধুর্য্যে, লালিত্যে, লিপিকৌশলে, ভাবসৌন্দর্য্যে, কাব্যগৌরবে অপ্রকাশিত-পদাবলী প্রকাশিত-পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এগুলি কি হইবে? বিদ্যাপতি ত আমাদের কবি, তাহাতে ত তর্ক কিংবা আপত্তির অবসরমাত্র নাই। চারশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর সহিত এই কবির অমৃতময়ী গীতি বিজড়িত—বৈষ্ণবকাব্যকল্পতরুর গুচ্ছ গুচ্ছ কুসুম প্রধানত এই কবির প্রতিভাসৌরভে সুরভিত! এই সকল নূতন পদ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য, কতক বর্ণমালা ও ভাষার বিভীষিকায় ভীত হইয়া, কিন্তু প্রধানত আমাদিগের নিজের আলস্য-ঔদাস্যে আমরা এই কর্ত্তব্যপালনে বিরত রহিয়াছি। নাতিরত্নবহুলা জননীর মুখের দিকে চাহিয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, খণ্ডকবির অখণ্ডকীর্ত্তি সাহিত্যমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা কৃতার্থ হই।

প্রবন্ধসমাপ্তিতে বিদ্যাপতিবিরচিত একটি অপ্রকাশিত স্তোত্র আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। শিবসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, এই স্তোত্র শক্তির। ভণিতায় শিবসিংহের নাম নাই, তাঁহার পিতা দেবসিংহ ও মাতা হাসিনীদেবীর (হংসিনী) নাম আছে। রাজপণ্ডিত হইয়া বিদ্যাপতির যে সম্মান ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বোধ হয় এই স্তোত্ররচনাকালে সেরূপ হয় নাই, কারণ যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণের মত তিনি দেবসিংহকে 'যাচকজনের গতি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মূল স্তোত্র অতুলনীয়। পরিত্রাণ অথবা মুক্তির কোন প্রার্থনা নাই, আছে কেবল বিস্ময়াভিভূত জ্ঞানলিপ্সুর অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানালোকের প্রার্থনা। ঘনকুঞ্চিতকেশশোভনে, নিখিল বিশ্বে দ্বন্দ্বমায়াপ্রসারিণি, এক অনেক, সহস্রধারিণি, রিপুরঙ্গস্থলপূর্ণকারিণি, সিতাসিতবরণি, কালি পুঞ্জীকৃততিমিরমধ্যবর্ত্তিনি, বাণি বিমলবিদ্যাবিধায়িনি, গায়ত্রীজননি, রবিমণ্ডল-উদ্ভাসিনি, সুরসরিৎ-অলকনন্দাচারিণি, ত্রিমূর্ত্তিগেহিনি, অজ্ঞাতসম্ভবে দেবি, প্রকাশিতা হও, প্রকাশিতা হও!

বিদিতা দেবি বিদিতা হো
অবিরলকেশী শোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিণী
অরিরঙ্গা পুরণন্তী।
কজ্জলরূপ তুয় কালী কহিয়ং
উজ্জ্বল রূপ তুয় বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিয়ে
গঙ্গা কহিয়ে পানী॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মাণী কহিয়ে
হরঘর কহিয়ে গৌরী।

নারায়ণবর কমলা কহিয়ে
কে জান উতপতি তোরি ॥
বিদ্যাপতি কবিবর এহো গাওল
বাচক জনকে গতি।
হাসিনী-দেঈ-পতি গরুড় নরায়ণ
দেবসিংহ নরপতি ॥

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

ইস্‌লামের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। গত ৩০শে মার্চ্চ অধ্যাপক গোল্ডজিহার হাঙ্গেরির একাডেমি অফ্ সায়েন্স সভার একটি সাধারণ অধিবেশনে উক্তনামধেয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। গত জানুয়ারিমাসের রয়াল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটির জার্ণালে সেই প্রবন্ধটির সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

অধ্যাপক গোল্ডজিহার বলেন—পূর্ব্বে আরবদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের নাম ছিল "আল শামানিয়া"। এই শব্দ শ্রামণাশব্দ হইতে উৎপন্ন। মুসলমানধর্ম্মের উন্নতির সময়ে উক্তধর্ম্মাবলম্বী দুইএকজন দার্শনিক প্রকাশ্যভাবে কতকগুলি শ্রামণাসূত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "ধার্ম্মিক ব্যক্তি কষ্টভোগ করেন কেন?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলিতেন, পূর্ব্বজন্মে তিনি অবশ্যই কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আরব-অভিধানে "বুদ্"-শব্দের অর্থ মূর্ত্তি, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি হইতে এই শব্দ আরব্য-ভাষায় প্রতিমূর্ত্তিবাচক সাধারণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরব্য-উপন্যাসে অনেকস্থলে "তাহার কপালে লেখা ছিল" প্রভৃতিরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, এই ভাবের কথা হিন্দুস্থানের প্রচলিত বিশ্বাসের অনুযায়ী। খাঁটি মুসলমানী পুস্তকে এস্থলে "স্বর্গীয়গ্রন্থে লিখিত আছে" বা তদ্রূপ অপর কোন উক্তি থাকিবার কথা। লোকের অদৃষ্ট বিধাতা-পুরুষ ললাটে লিখিয়া যান, ইহা ভারতবর্ষীয়-গণেরই ধারণা। আরব্য-উপন্যাসে অদৃষ্ট-বাদের যেরূপ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে অধ্যাপক সাহেব মনে করেন, উহাতে হিন্দু-প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় অনেকগুলি গল্প "সহস্রাধিক এক রজনী"র অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিজাতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক ইতিহাসচর্চ্চার দিনে তাহারা আর আত্ম-গোপন করিতে পারে নাই।

মুসলমানধর্ম্ম ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এশিয়ার সর্ব্বত্র স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিল। সেই সময়ে এশিয়ার প্রধান

ধর্ম্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম্ম। বিজয়ী মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রভাবে উক্ত ধর্ম্ম ক্রমে স্থানচ্যুত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের উপাদানে নানদেশে প্রাচ্য ইস্‌লাম বিচিত্র-ভাবে পুষ্ট হইয়া নূতন আকার ধারণ করিল। খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দীতে বোগদাদনগরে "জিন্দিকের" দল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল,—এই "জিন্দিক"শব্দ মুসলমানগণ বিধর্ম্মীদিগের, (প্রধানত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের) প্রতি প্রয়োগ করিত। সলিয়া বেন আবদল কাদ্দাস একজন প্রধান 'জিন্দিক' ছিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর যেন মক্কা-নগরীকে ধ্বংস করেন।" ৭৮৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হারূণ আল-রসিদের রাজত্বকালে আবুল অথাইয়া নামক প্রসিদ্ধ মোসলেম পণ্ডিত লিখিয়া-ছিলেন, "যদি তোমরা জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে দেখিতে চাও, তবে ভিক্ষুবেশী রাজ-কুমারের প্রতি লক্ষ্য কর—তাঁহার সাধুত্বই জগতে শ্রেষ্ঠ।" এই লেখক উক্তমত প্রচার করার অপরাধে ৮২৮ খৃঃ অব্দে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রও এই মতাবলম্বনের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। খা' থাইয়া জিন্দিকের দল ক্রমে বলসঞ্চয় করিয়াছিল। ইহার দুই শতাব্দী পরে সুপ্রসিদ্ধ আবুল আল আল'মারি' জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন এবং ইস্‌লামধর্ম্মকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানের বিকাশকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করিতেন এবং নির্ব্বাণের শান্তিই তাঁহার কামনা ছিল। ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পরবর্ত্তী সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই সকল ধর্ম্মমতের পরিপুষ্ট ও সর্ব্বশেষ বিকাশস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। হৃদয়ের কোমলবৃত্তির বিকাশপক্ষে খাঁটি ইস্‌লাম বিশেষ কোন সুযোগ উপস্থিত করে নাই। সুফী-সম্প্রদায়ের মত এই অভাব পূরণ করিতে সমর্থ। ইস্‌-লামের ভিতর দিয়া এই সুফীমত বৌদ্ধধর্ম্মেরই জয়পতাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শোপেন্‌হাওয়ার বলেন, এই সুফী-সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম্মমতকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৌদ্ধদিগের "নির্ব্বাণ" এবং সুফীদিগের "ফণা," বৌদ্ধদিগের "পন্থা" ও সুফীদিগের "তারিক", বৌদ্ধদিগের "ধ্যান" এবং সুফীদিগের "মুরাকাবা", এ সমস্তই একপ্রকারের। সুফী-সম্প্রদায়ের নেতা ইব্রাহিম ইবন এদ্‌হামের জীবনসম্বন্ধে পরবর্ত্তী কালে যে সকল উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের অনেক ঘটনাই তাহার প্রতি আরোপিত। এদহামও জনৈক রাজপুত্র, এক ভিক্ষুর চিত্তশান্তি লক্ষ্য করিয়া গৃহত্যাগী হন, তিনিও 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' মত প্রচার করেন। এই সকল ঘটনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক কথার সঙ্গেও বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনীর আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়।

বিজয়ী মুসলমানধর্ম্মাবলম্বিগণ যে অনেক-সময় বৌদ্ধগৌরব এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার আরও বিবিধ প্রমাণ অধ্যাপকমহাশয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সম্রাট্ হারূণ আলরসিদের পুত্র আল'সবৃত্তির গৃহত্যাগ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ একটি। এই উপাখ্যানটি আরব্য-উপন্যাসেও লিপিবদ্ধ

হইয়াছে—উহা নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ইতিহাসের অনুকৃতি। সিংহলে বুদ্ধদেবের পদচিহ্নকে মুসলমানগণ আদিম পদচিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় প্রাচীন ধারণা পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন। বোখরা-শব্দের অর্থ পরিশুভাষায় "ধর্ম্মাশ্রম", উহা সম্ভবত বৌদ্ধ "বিহার"শব্দের বিকৃতি। এক সময়ে বোখরা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, এই স্থানের সন্নিহিত বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ এখন মুসলমান-উপাখ্যানোক্ত কোন সাধু বা বীরের সমাধিস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিজয়ী ইস্‌লাম জনসাধারণের ভক্তির তীর্থ-স্থানগুলি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এই-ভাবে তাহাদের উপর স্বীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। আমরা পুরীর জগন্নাথমন্দিরকেও এইভাবে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি—ইহাই বর্ত্তমান ইতিহাসের আবিষ্কার। সুফী-সম্প্রদায়ের মত বৌদ্ধমত হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহা যে উত্তরকালে বেদান্ত-ধর্ম্মের প্রচুর উপাদান পাইয়া পুষ্টিলাভ করে, এবং "সোহং"বাদকে নিজের কুক্ষিগত করিয়া লয়—অধ্যাপক গোল্ডজিহার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মুসলমানগণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু হইতে জপমালা গ্রহণ করিয়াছিল—ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত।

অধ্যাপক-গোল্ডজিহার-বর্ণিত বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রভাবের উল্লেখে ইস্‌লামের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যে ধর্ম্ম বেগশালী প্লাবনের মত আসিয়া পড়ে—তাহা স্বীয়পথাশ্রিত ভিন্ন মতের কূপ ও সরিৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রবল হয়। যাহা বৃহৎ, তাহা সর্ব্ব-গ্রাস করিয়া নিজের নিজত্বকে আরও উজ্জ্বল ও ব্যাপক করিয়া দেখায়। কিন্তু যাহার গতি নাই, তাহা নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা বাহিরের হাওয়ার স্পর্শে শিহরিত হইয়া উঠে—পাছে তাহার নিজত্বটুকু কেহ কাড়িয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কা। প্রবল আসিয়া পরের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া স্বাধিকারভুক্ত করিয়া ফেলে, দুর্ব্বল নিজের ক্ষুদ্র সম্বল লইয়া স্বীয় কুটীরের দ্বাররোধ করিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হয়। প্রবলবেগ-শালিনী নদী যেরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর সদর্পে নিজের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লয়—অঙ্গে পাছে পঙ্ক লগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় আবর্ত্ত মন্দীভূত কিংবা উদার পন্থা সঙ্কীর্ণ করে না—পঙ্ককে পবিত্র এবং মলিনকে নির্ম্মল করিয়া লইয়া যায়—ইস্‌লাম স্বীয় প্রভাবের সময় পৃথিবীর উপর সেইরূপ দুর্জ্জয় দর্পে নিজের পন্থা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল—সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রচলিত বিশ্বাস গ্রহণ করিয়া উহা স্বীয় চরিতার্থতা ও পুষ্টি সাধন করিয়াছিল,—সেই সকল উপাদানে ইস্‌লামের বিকৃতি ঘটে নাই, তাহার বিরাট্ দেহ পুষ্ট হইয়াছিল মাত্র।

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা।

গত বৈশাখমাসের ভারতীতে চীনপ্রবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয়-স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধলেখক বলেন, আমাদের দেশে গৃহে গৃহে অনেক অনাথা হিন্দুরমণী আছেন, তাঁহারা শিশু পুত্রকন্যা লইয়া অর্থাভাবে নিতান্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। এরূপ উদা-

হয়ত একটি দুইটি নয়, শত শত। ইঁহাদিগকে ভগবান্ শক্তি দিয়াছেন, ইচ্ছা দিয়াছেন কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি ও অভাব নিবারণের জন্য সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার কোন সুবিধা তাঁহারা সমাজ হইতে পান না। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা প্রদানই তাঁহাদিগের সম্ভ্রম-রক্ষা ও জীবিকাসংস্থানের একমাত্র উপায়। প্রবন্ধলেখক বলেন—পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি প্রদেশে ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা "দেশী মোটা সূতার মোজা বুনিয়া ও বাজারে তাহা ভাল-মন্দ অনুসারে আট হইতে বার পয়সা জোড়া বিক্রয় করিয়া যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করে, তাহা শতবার প্রশংসনীয়!"

প্রকৃতই আমাদের মহিলাকুলের এইরূপ অর্থকরী শিল্পশিক্ষা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষরূপে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত।

হিন্দুরমণীর ইতিপূর্ব্বে সমাজে যে স্থানটি ছিল, এখন আর তাহা নাই। যৌথ-পরিবারে অনাথিনীগণের অন্তত দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন পাইবার সুবিধা ছিল, বিধবাগণ অনেক সংসারেই প্রভুত্ব করিতেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা নানারূপে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেন বটে, কিন্তু নিকটসম্পর্কিত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে দিতেন না,—দূরসম্পর্কিতা রমণীও উদরের দায়ে গৃহত্যাগিনী হইলে আত্মীয়গণের নিন্দার অবধি থাকিত না। যৌথ-পরিবার স্বীয় বিশাল পক্ষপুট উদ্ঘাটন করিয়া ভদ্রমহিলাকুলকে আশ্রয় দিয়াছে,—কোন কোন স্থলে সেই আশ্রয় আরামজনক না হইলেও তাহার উপর সর্ব্বদা নির্ভর করা চলিত।

এখন যৌথ-পরিবারের সেই আশ্রয় অতীতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেকসময় পুত্র মাতার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বীকার করে না, সহোদরাগণ জীবিকার জন্য ভ্রাতাদের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। হিন্দুর বিশাল পরিবার এখন শুধু ভাষার নামে রূপান্তরিত হইতে বসিয়াছে। ঘরে ঘরে নিরাশ্রয় রমণীকুলের দারিদ্র্য অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল অনাথিনীর সাহায্য করিবার কথায় ভীত আত্মীয়, কথা উপস্থিত হইলে, স্বীয় ব্যয়ের লম্বা ফর্দ্দ বাহির করেন—সমাজও তাহাদের দুর্দ্দশানিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করেন নাই।

জীবনসংগ্রামের এই বিষম দুশ্চিন্তা অবলাগণের স্কন্ধে চাপাইলে তাহাদের নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য,—য়ুরোপ তাহার উৎকট দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। হিন্দুর গৃহ যদি হিন্দু-রমণীকে রক্ষা না করে, তবে তাহারা কোথায় যাইবে? এ দেশে এই যে বৎসর-বৎসর হতভাগিনীদের সংখ্যা দ্রুতবেগে পুষ্টিলাভ করিতেছে—এজন্য কাহারা দায়ী?—হিন্দু-সমাজের ঔদাসীন্য এখানে অসহনীয়।

অর্থকরী শিল্পশিক্ষার একটা বিধান করিয়া মহিলাগণের জীবিকাসংস্থানের উপায় করিয়া দেওয়া, এখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই শিল্পশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বিচার্য্য। ইহার জন্য স্কুল স্থাপন করিলে এখনকার রীতি অনুসারে দশবৎসর বয়সের বেশিকাল আর তাহারা বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে না,—একাদশ বর্ষে অবগুণ্ঠনবতী

হইয়া তাহারা অন্তঃপুরের গণ্ডীতে প্রবেশ করিবে,—এই অল্পকালের মধ্যে তাহারা আর কি শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে? অল্পবয়স্কা বিধবারা ঘরের বাহিরে কোন শিক্ষালাভের সুযোগ পান না; এ অবস্থায় ইতিকর্ত্তব্য কি, নির্দ্ধারণ করা কঠিন।

প্রবন্ধলেখক বলেন, বিবাহের বয়সের যে সীমা আছে, তাহা আর স্ত্রীলোকের পক্ষে ঠিক রাখা চলে না। যৌবনে পদার্পণ না করিলে তাহাদের বিবাহ যাহাতে না হয়, এরূপ বিধান করা উচিত; অন্তত আট-দশ বৎসর তাহারা শিক্ষা করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত আবশ্যক; একটা শেষপরীক্ষা থাকা দরকার, যাহাতে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা সমাজের কাছে বিশেষভাবে বরণীয়া হইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষার অনুশীলন না হইলে আমাদের বালকগণের শিক্ষা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না,—আমরা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে সহস্র বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিব না, শিশুগণের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রাইভেট্-টিউটার্-নামক যন্ত্রের উপর নিঃসহায়ভাবে নির্ভর করিতে হইবে। এই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে এখন নানারূপ উদ্যোগের লক্ষণ দেখা যাইতেছে,—বালিকাদিগকে কোথাও অমরকোষের শ্লোক, কোথাও বা কেমীর গান কণ্ঠস্থ করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ সাম্প্রদায়িক মতবিস্তারের আগ্রহপ্রসূত চেষ্টার মধ্যে পড়িয়া তাহারা যে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণজ্ঞান লাভ করিতেছে, তাহা কার্য্যত কোন উপকারেই আসিতেছে না,—মতপ্রচারের আগ্রহে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে না—এবং যে শিক্ষা এখনকার অভাব পূর্ণ করিয়া প্রকৃতরূপে গৃহিণী ও জননী গড়িয়া তুলিবে,—দুর্দ্দিনে হস্তে বল ও গৃহে আরাম প্রদান করিবে—যাহাতে কল্যাণ ও শ্রী এই দুয়ের সমাবেশে হিন্দুর গৃহ বরেণ্য হইয়া উঠিবে, সেদিকে কোনরূপ চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

আমাদের সমাজ বালিকাদিগকে খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করেন—অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ দিয়া সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ কল্পনা করেন, কিন্তু যৌথ-পরিবারের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবার এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য গুরুতর চিন্তার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। অর্থকরী শিল্পশিক্ষা অন্তঃপুরবাসিনীগণকে কি প্রণালীতে প্রদান করা যায়—তাহা বিবেচ্য। তাঁহাদের কোমলহস্তনির্ম্মিত শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করিয়া সম্পদের দিনে যেন স্বগণবর্গ গৌরবান্বিত হইতে পারেন—এবং দুর্দ্দিনে তাহাই যেন তাহাদের জীবিকাসংস্থানের উপায় করিয়া হিন্দুর পর্ণকুটীরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে—সেইদিকে আমাদের অন্তঃপুরশিক্ষার উদ্যম প্রসারিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

অবস্থাপন্ন লোকের গৃহেও স্ত্রীলোকের জন্য কতকগুলি কার্য্য অবধারিত হওয়া উচিত। প্রাচীন অন্নপূর্ণাদের দল ক্রমশ লুপ্ত হইতে বসিয়াছেন। এখন "রাঁধুনী বামনী"র সংখ্যা যেরূপ দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই হারে ধনীর গৃহে রমণীগণ উপন্যাস পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন, সেবাধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত সুকোমলবাহু

কেবলই নূতন প্যাটারণের ব্র্যাস্‌লেটের সন্ধান করিতেছে—জগতের জন্ত যেন তাঁহাদের কোন কার্য্যই নাই, তাঁহাদের কার্য্যের গণ্ডী ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এখন তাঁহারা গৃহসৌষ্ঠবসাধক চিত্রপুত্তলীর শ্রেণীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

য়ুরোপের রমণীগণের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ নহে, সামাজিক আমোদপ্রমোদের উপযোগিনী করিবার জন্ত বাল্যকাল হইতে তাহাদের শ্রমসাধ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের রমণীগণের জন্তও কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে—তাহা হইতে তাহাদের মুক্তি নাই, কৃত্রিম মুক্তি ভাবী দুর্দ্দশার পূর্ব্বাভাস দিতেছে মাত্র। প্রাচীন আদর্শ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু পূর্ব্বশিক্ষার স্থলে সামাজিক অভাবের অনুরূপ নব আদর্শের প্রতিষ্ঠা এখন একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্ত্রীলোকগণ রাজদ্বারে বা মার্চেন্ট-আফিসে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অর্থঅর্জ্জনের চেষ্টা পাইবেন, এই উৎকট কল্পনা প্রাচ্যজগতে অসহনীয়। সাম্যবাদের নামে স্ত্রীলোকদিগকে কঠোর জীবনসংগ্রামে উপস্থিত করা অতি অশোভন—তাঁহাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনা কিছু কল্পনা করা যায় না। তাঁহারা অন্তঃপুরে বাস করিয়া যে সকল শিল্পচর্চ্চার দ্বারা সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। প্রাচীনাগণ সূতা কাটিয়া, স্থলবিশেষে কাপড়ের উপর রেশমী ফুল ও নানারূপ বিচিত্র কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়া পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ভারতীর প্রবন্ধকার কোন কোন ভদ্রপরিবারের মহিলাদের প্রতি ফুলের মালা গাঁথিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণের অনেকসময় হাতে কোন কাজ থাকে না। অবসরকালে যদি নিয়মিতভাবে তাঁহারা কোনরূপ অর্থকরী শিল্পচর্চ্চা করেন, তবে বহুপরিবারের নানারূপ অভাবমোচন হইতে পারে;—অনেক স্থলে অর্দ্ধভুক্ত শিশুগুলি ভাল খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে—অনেক স্থলে পিতা কিংবা স্বামীর দুশ্চিন্তাকুঞ্চিত ললাট প্রসন্নতার শোভা ধারণ করিতে পারে। গৃহলক্ষ্মীগণ এই কাজ কত আন্তরিকতার সহিত সম্পাদন করিবেন, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র স্নেহ এই সকল উদ্যমে তাঁহাদের কোমল বাহুকে অধ্যবসায় শিখাইবে। তাঁহাদের রন্ধনকার্য্যে যে যত্ন ও আগ্রহ দেখা যায়, তাহার তুলনা নাই,—কারণ তাহা গভীরস্নেহপ্রণোদিত। সেই হৃদয়ের ঐকান্তিকতার সঙ্গেই শিল্প তাঁহাদের হস্তে উন্নতিলাভ করিবে। তাঁহাদের কষ্টের একশেষ দেখিয়াও যদি সমাজ কোন প্রতিকারের চেষ্টা না পান, সুযোগ থাকিতে সে সুযোগ যদি তাঁহাদিগকে না দেন, তবে হে শর্ম্মণি, গৃহবর্জ্জিত গৃহলক্ষ্মীগণ তোমাকে আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে যেন হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব না থাকে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মাধবী।

১

আরম্ভিল আবাহন অর্ঘ্যভার বহিয়া অটবী
"মাধবি! মাধবি!"
মৃদুপদসঞ্চরণে সচকিত করি মম হিয়া
এস তুমি প্রিয়া
বিরহী এ বনতল তোমা' লাগি' ব্যাকুলহৃদয়
চাহে বিশ্বময়।

২

জাগাও চরণপাতে ধরণীর স্তব্ধ হিয়াখানি
সঞ্জীবতা আনি'
সহসা জাগিয়া উঠি' মরমে সে র'বে মূরছিয়া
তোমারে হেরিয়া
বকুলবাসিত তার অঙ্গে তব নব বাসখানি
দিয়ো তুমি টানি'।

৩

বর্ষপরে হর্ষে তার সুখদুঃখ উঠিবে কাঁপিয়া
তোমারে হেরিয়া
যূথিকার রন্ধ্র বহি' বাহিরিবে নিশ্বাসে তাহার
মুক্ত হৃদিভার
স্বাগত সুধাবে তোমা' উদয়-অচলে নব-রবি—
"মাধবি! মাধবি!"

৪

নবগীতি সন্ধ্যারুণ গগনের তারকাসভায়
পূজিবে তোমায়
পিকবধূ নিদ্রাজড় নিশীথের ধ্বনি' রুদ্ধদ্বার
তুলিবে ঝঙ্কার
গাহিবে ধরণীতলে তব রূপে বিমোহিত কবি
"মাধবি মাধবি!"

অশোককাননমাঝে প্রবেশিবে বহি অর্ঘ্যডালা
বিরহিণী বালা
একান্তে ডাকিবে তোমা' প্রেমে বিদ্ধ মুগ্ধ মুখচ্ছবি
কোথায় মাধবি
লহ আসি পুষ্পবনে 'অবতরি' প্রেমবিধুরার
পূজা-অর্ঘ্যভার।

৬

আকুল আহ্বান তুলি মর্ম্মরিয়া উঠিবে মলয়
সারাবিশ্বময়
'অকস্মাৎ শান্তচিত্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে চাহিবে নিশ্বাসি'
কার সুধাহাসি
সুপ্ত ষোড়শীর বক্ষে গোপনে করিবে আনাগোনা
অপূর্ব্ব বেদনা।

৭

সহসা গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনি' মুহু বজ্রসম হাঁক
আসিবে বৈশাখ
ছুটিবে কালাগ্নিশিখা পিঙ্গল নয়ন হ'তে তার
দহিয়া সংসার
হায় ওই কান্তিটুকু মিশাইবে নিমেষের তরে
সে বহ্নিভিতরে।

৮

ভরিয়া উঠিবে বিশ্ব বিরহের আকুল নিস্বনে
বিলাপি' সঘনে
রহিয়া রহিয়া কাঁদি' ফিরে যাবে দখিনের বায়
"কোথায় কোথায়!"
চন্দ্রদীপ্ত বনতলে সহসা কাঁদিবে পিকবধূ
"কোথা তুমি মধু!"

৯

অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে মুগ্ধ কবি—
"কোথায় মাধবি?"

অকস্মাৎ ঝঙ্কারিয়া উঠিবে সে ব্যর্থ বনচ্ছবি—
"মাধবি মাধবি!"
ডাকিবে নিশ্বাস ফেলি' সেদিনের অস্তাচলে রবি—
"মাধবি মাধবি!"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র।

হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্যই মোক্ষ। যাহাতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখবৃদ্ধি হয়, তাহা উপদেশ করিবার জন্য দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়। জীবের যতপ্রকার দুঃখ আছে, তন্মধ্যে জন্ম-জরা-মরণের চিরপ্রবাহ "আত্যন্তিক-দুঃখ" নামে কথিত হয়। শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহা অনেকাংশে এবং সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত প্রশমিত হইতে পারে,—অশুভগতির পরিবর্ত্তে শুভগতি হইতে পারে। কিন্তু সেই শুভসম্ভোগের ক্ষয় আছে। ভোগান্তে এই পৃথিবীতে বা অন্যলোকে পুনর্জ্জন্ম আছে—পুনর্মৃত্যু আছে। এইরূপে জন্মের পর জন্ম,—বহুলক্লেশসঙ্কুল জীবন এবং মৃত্যুর স্রোত থামিবে না। একমাত্র আত্মজ্ঞানই ঐ আত্যন্তিক-দুঃখের নিঃশেষ-বিনাশবীজস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহারই নাম কৈবল্য, মুক্তি, অপবর্গ বা মোক্ষ। বেদানুযায়িরূপে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অবলম্বনে তাহাতে যথাধিকারী মানবগণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রের উদয়। এই সকল মহাশাস্ত্র,—বেদ, উপনিষৎ এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভের চক্ষুস্বরূপ এবং শাস্ত্রবিহিত স্বয়ম্প্রকাশ আত্মজ্ঞানালোক দেখাইবার গুরুস্বরূপ।

কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষই এখন বিষয়ে উন্মত্ত। জীবের অন্তিম মহামোক্ষ লক্ষ্য করিয়া কেহ সে সমস্তের আলোচনা করেন না। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরিভাষার বিচার, তর্ক, যুক্তি প্রভৃতি, যাহা দর্শনের অবান্তর শিক্ষা এবং মোক্ষাধিকারে যাহা সমূলে পরিত্যক্ত ও দূরীভূত হইয়াছে, তাহাই জনসমাজে এখন আদরণীয়। কেন না, সে-সব তত্ত্ব সামাজিক বিদ্যার সহায়স্বরূপ এবং ছাত্রগণের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করিবার উপায়বিশেষ।

এ অবস্থায় আমার বিবেচনায় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা বৃথা। কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শাস্ত্রের আলোচনায় মুখ্যফল লাভ হয় না। কেবল অবিদ্যা, তর্ক ও কলহ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। তথাপি লক্ষ্যধারণে, যতদূর সম্ভবে, যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে ছয়-খানিমাত্র প্রধান। অর্থাৎ দুই ন্যায়, দুই সাংখ্য ও দুই মীমাংসা। মহর্ষি গৌতমের প্রণীত ন্যায়দর্শন এবং মহর্ষি কণাদের প্রণীত বৈশেষিকদর্শন, এই উভয়ই ন্যায়শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। মহর্ষি কপিলের প্রকাশিত সাংখ্য-দর্শন এবং মহর্ষি পতঞ্জলির কৃত যোগদর্শন সাধারণত সাংখ্যনামে কথিত হয়। উহার প্রথমটিতে ঈশ্বর স্বীকৃত না হওয়ায় তাহার নাম নিরীশ্বর-সাংখ্য এবং দ্বিতীয়টিতে ঈশ্বর আদৃত হওয়ায় তাহার নাম সেশ্বর-সাংখ্য। মহর্ষি জৈমিনির কৃত মীমাংসা কর্ম্মমীমাংসা নামে খ্যাত, তাহাতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতির বিচার আছে। আর মহর্ষি ব্যাসদেবের কৃত মীমাংসা ব্রহ্মমীমাংসা বলিয়া উক্ত হয়, তাহাতে বেদের জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির বিচার আছে। এই ছয়খানি দর্শনশাস্ত্র ষড়্দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপ, কাশী, মহারাষ্ট্র, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে এই সমস্তের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এবং এখনও এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের বিস্তর বড় বড় অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এই সকল দর্শন, সমস্তই বেদমূলক। তাহা য়ুরোপীয় দর্শনসমূহের ন্যায় গ্রন্থকার-দিগের স্ব স্ব মত নহে। বেদের মধ্যে সৃষ্টি, প্রলয়, প্রকৃতি, অদৃষ্ট, কর্ম্ম, পরমাণু, ব্রহ্ম, মোক্ষ, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল বিচারযোগ্য অবয়ব আছে, এক এক দর্শনে তাহার পরম্পরান্বিত অবয়বসকল বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, দর্শনকারগণ সকলেই একবাক্যে বেদবিহিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মকে মান্য করিয়াছেন। তাহা লঙ্ঘন করিয়া কোন দর্শনকার পূজা-অর্চ্চনা ও উপাসনা সম্বন্ধে কোনরূপ অভিনব সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন নাই। ন্যায়বৈশেষিকে এক ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু সে ঈশ্বরের কোন স্বতন্ত্র উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, নৈয়ায়িকগণ সকল হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর সহ সমভাবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাদেবী প্রভৃতিকে উক্ত ঈশ্বরপদে মানিয়া বেদাগমবিহিতরূপে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সেশ্বর-সাংখ্য অর্থাৎ যোগদর্শনের পণ্ডিত, তাঁহারাও এক ঈশ্বর মানেন, কিন্তু তাঁহাদেরও উপাসনায় স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নাই। অতএব উপরি-উক্ত-রূপে একমাত্র ঈশ্বরে অন্বিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও মহাশক্তিগণের পূজা করিয়া থাকেন। নিরী-শ্বর-সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না; এক অচেতন জড়প্রকৃতি মানেন এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে আত্মার মোক্ষ যাহাতে হয়, তাহার উপদেশ দেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন নিরীশ্বর সম্প্রদায় স্থাপন করেন নাই; এবং প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্যসম্বন্ধে জ্ঞানসাধন করা উচিত বলিয়াও, বেদবিহিত ক্রিয়া ত্যাগ করিতে বলেন নাই। বরং পক্ষান্তরে ঐ সকল দেবদেবীর উদ্দেশে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অবশ্যকর্ত্তব্যতার উপ-দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রের পণ্ডিতেরা এযাবৎকাল তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতে-ছেন। কর্ম্মমীমাংসার তো কথাই নাই। কেন না, তাঁহারই মতে সমস্ত যাগযজ্ঞাদি চলিয়া আসিতেছে। তিনি স্পষ্টবাক্যে ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও,—দেবতাদের চৈতন্য ও শরীর অস্বীকার করিলেও, ক্রিয়ার প্রধান

অঙ্গ যে মন্ত্র, তাহার চৈতন্য মানায়, যজ্ঞানুষ্ঠানকালের নিমিত্ত দেবতার আবির্ভাব ও প্রভাব মানিয়াছেন। বেদান্ত একমাত্র পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বোপাধিশূন্য ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করেন এবং এই সিদ্ধান্তবাক্য বলেন যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মিলে সর্ব্বতোভাবে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মার তাঁহাতে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, দেহাদির মমত্বঘটিত সর্ব্বোপদ্রব বিগত হইয়া অনাময় ব্রহ্মপদলাভ হয়। এইপ্রকার জ্ঞানেই মোক্ষস্থাপন করিয়া এবং মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে দেহাদি-উপাধি-শূন্য উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞানের অনুশীলন করার কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াও, ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অথবা লোকশিক্ষার্থে আশ্রমবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম ও যজ্ঞোৎসবাদি অনুষ্ঠানের বিধি দিয়াছেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়া আত্মগ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মফললাভের নিমিত্ত বিধিবিহিত ধর্ম্মক্রিয়া পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং কর্ম্মমীমাংসা, এই পাঁচখানি দর্শনের মতে তাঁহাদের স্বস্ব-সাম্প্রদায়িক-লক্ষণাক্রান্ত কোন নিরাকার চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসনা পাওয়া যায় না। এস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহর্ষি কপিলের মতে যে, কোনরূপ নিরাকার ঈশ্বর বা অবতীর্ণ ঈশ্বর নাই, এমন নহে। সে কথা পরে বলিব। বেদান্তমতেও ব্রহ্মের ব্যক্তিধর্ম্মবিরহিত মায়োপহিত ঔপাধিক আবির্ভাববিশেষ ঈশ্বরনামে কথিত হন। তাঁহার নানা সংজ্ঞা আছে। কিন্তু উপাসনার অধিকারে এই ভারতবর্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপেই তাঁহার বেদবিহিত অর্চ্চনা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্ররূপে তাঁহার পূজার কোন নিয়ম নাই। বেদান্তের নানাসংজ্ঞিত উক্ত ঈশ্বরোপাধিসকল পরব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন বটে এবং সেজন্য তাঁহাদের বেদবিহিত অর্চ্চনা সগুণ-ব্রহ্মোপাসনারূপে উক্ত হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ ঈশ্বরার্চ্চনা চিত্তশুদ্ধিজনক কর্ম্মযোগ মাত্র।

উপনিষৎ হইতেই ব্রহ্মোপাসনার উদ্ভব। বেদান্তদর্শনে তাহার নানা বিভাগ ও বিচার আছে। ফলতঃ, সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাই উচ্চ-নিম্ন নানা বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা সাবলম্ব হইলেও আত্মজ্ঞানে অধিকতর যুক্ত এবং আত্মজ্ঞানের সোপান। যাহা নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা, তাহা নিরবলম্ব এবং কেবল আত্মজ্ঞানের অনুশীলনমাত্র বলিলেও হয়। সে কথা পরে বলা হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতিবেদান্তাদির পাঠ ও আলোচনামাত্রই তাহার সাধন। ইহার মধ্যে কোনটিই সম্প্রদায়লক্ষণাক্রান্তধর্ম্মরূপী নহে। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি হিন্দু-উপাসক-সম্প্রদায়স্থ যে কোন ব্যক্তির শাস্ত্রবিহিত আত্মজ্ঞান উপার্জ্জনে ইচ্ছা জন্মে, তিনি স্বীয় কুলপরম্পরাগত আশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া তাহা সাধন করিতে পারেন। তাদৃশ মহাত্মার পক্ষে আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ম্মযোগ বা লোকশিক্ষায় পরিণত হয়। তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানের অনুশীলন নহে, অথবা আত্মবিদ্যাতে সংযুক্ত নহে, অথবা সমাধিযোগ বা ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্ম্মযোগে নহে, এমনভাবের বহিরঙ্গ ঈশ্বরোপাসনা বেদান্তমতে

দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যের ও ন্যায়েরও অন্তিমোদ্দেশ্য ঐ আত্মজ্ঞান। কেহ বা ব্রহ্মকে আত্মত্বে গ্রহণ করেন, কেহ বা আত্মাকেই কেবল্যরূপে গ্রহণ করেন, এইমাত্র প্রভেদ। কেহ বা একমাত্র পরমাত্মাকে সকল আত্মার নিরুপাধিক কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করেন, কেহ বা প্রত্যেক আত্মার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিরুপাধিত্ব মানায় মোক্ষাবস্থায় সবগুলি যেন নিরুপাধিরূপ অনির্ব্বচনীয় একত্ব লাভ করে, এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা সংসারাবস্থায়, সকলের মতেই, প্রতিদেহে ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিযুক্ত আত্মা পৃথক্ পৃথক্। মোক্ষাধিকারে আত্মজ্ঞান ও তদবিরোধে সম্যক্ আশ্রমবিহিত আচার ঊর্দ্ধদিকে; এবং সংসারাধিকারে বিধিবিহিত জিজীবিষাসহকৃত আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিম্নভাগে; এই উভয়প্রকার অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য ঈশ্বরোপাসনার উপদেশ দৃষ্ট হয় না। তাহাতে সাংখ্য ও কর্ম্মমীমাংসার ঈশ্বর না মানায় কোন ক্ষতি হয় নাই। বেদান্ত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়া সকল ক্ষতির পূরণ করিয়াছেন।

সর্গারম্ভসম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শনকারদিগের প্রস্থানভেদ, ইহার পর ক্রমে বিবৃত হইবে। 'সর্গ'শব্দে সৃষ্টি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে পরমাণুকে উপাদানকারণ, ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ এবং জীবের অদৃষ্ট বা মায়াকে সহকারিণী সৃষ্টিশক্তি ধরিয়া সর্গারম্ভ করিয়াছেন। পরমাণুসকল সাংখ্যের পঞ্চতন্মাত্রস্থানীয়; ঈশ্বর বেদান্তের সর্ব্বেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও ব্রহ্মার স্থানীয় এবং মায়া অবিদ্যাস্থানীয়। সাংখ্যদর্শন পঞ্চতন্মাত্র বা পরমাণুর প্রপিতামহী মহামাত্রাস্বরূপিণী প্রকৃতিকে সৃষ্টির মূল উপাদানকারণ, পুরুষ অর্থাৎ জীবকে নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতির সমনা মূর্ত্তিবিশেষ জৈবিক-অনাদিকর্ম্ম ও অবিবেকতাকে সহকারিকারণ ধরিয়া সর্গারম্ভ করিয়াছেন। প্রকৃতি বেদান্তের মায়াস্থানীয়, পুরুষ আত্মার স্থানীয়, এবং কর্ম্ম অবিদ্যাস্থানীয়। কর্ম্মমীমাংসা জীবের অনাদি কর্ম্মমূল ধরিয়া সৃষ্টির অনাদিত্ব মানিয়াছেন। সেজন্য নিমিত্তকারণরূপ স্বতন্ত্র এক ঈশ্বরের অনুমানোপন্যাস বা অবতারণার প্রয়োজন হয় নাই। অতএব তথায় জীবই নিমিত্তকারণ। বেদান্ত ব্রহ্মরূপ ঊর্দ্ধমূল হইতে চিরপ্রবৃত্তস্বভাব দৃষ্টনষ্টস্বরূপ সংসারের সর্গারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার শক্তিই উপাদান, নিমিত্ত, সহকারী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কারণের একমাত্র অনির্ব্বচনীয় বীজ। প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি। সর্ব্বজীবের তিনি পরমায়ণ। মোক্ষরূপে তিনি পরমাত্মা; এবং সকল ঈশ্বরোপাধির তিনিই আশ্রয়।

সর্গ-বিসর্গ-সম্বন্ধে প্রধান প্রধান দর্শনের মত এখন ক্রমে নিবেদন করিব। ফলে, আমি ন্যায়বৈশেষিকের পদার্থবিচার, সাংখ্যের তত্ত্বশ্রেণীর বিচার, মীমাংসার শ্রুতিস্মৃতিবিচার এবং বেদান্তের পরিভাষাবিচার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। সে সব বিদ্যায় হস্তক্ষেপ করা আমার ন্যায় বিষয়কর্ম্মী ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে; বিশেষত সে সব তর্কানুমানদ্বারা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ঈশ্বর, কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনা, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান এবং আত্মজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ কর্ম্ম, অদৃষ্ট, মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান—এই সব তত্ত্বসম্বন্ধে

প্রধান প্রধান দর্শনের মত অল্পবিস্তর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য। কেন না, আমি বিবেচনা করি যে, এই বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন যুক্তিপরায়ণ উপাসকবৃন্দ এবং কৃতবিদ্য ধীমান্ মহাশয়দিগের জানা উচিত যে, ঐসকল দর্শনশাস্ত্রের কোন মতের সহ তাঁহাদের মতসকলের ঐক্য আছে কি না। আমার বক্ষ্যমাণ সংক্ষেপবিবরণ হইতে ঐ উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎপরিমাণে সফল হইলে সুখের বিষয় হইবে। অতএব আমি তৎসমস্ত প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

অপূর্ব্বকাহিনী—উপন্যাস। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রকাশক। মূল্য ১৲ এক টাকা।

'ফতেশনা আজায়েব' নামক একখানি উর্দ্দু উপন্যাস অবলম্বনে ইহা লিখিত। আমাদের মনে হয় যে, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, তুরুষ্কোপন্যাস, হাতেমতাই, চাগার দরবেশ্ প্রভৃতির পর এই উপন্যাস রচিত হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্, যে মনে করে আমি লিখিতে জানি, সে ত লিখিতে ছাড়ে না। মূল গ্রন্থকারের পক্ষে বোধ করি ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ।

গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা অপূর্ব্বই বটে! ইহাতে বাদশাহজাদা ও বাদশাহজাদি আছে, তাঁহাদের মিলন আছে, বিরহ আছে, এবং এ শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদিগের নিয়মানুসারে তাঁহাদের পুনর্মিলন অবশ্যই আছে; তদ্ব্যতীত দৈত্য আছে, দানব আছে, ঐন্দ্রজালিক আছে, এবং যাহা না থাকিলে উপন্যাসের বিশেষ অঙ্গহানি হয়—ইন্দ্রজালের দ্বৈরথযুদ্ধও আছে। সুতরাং বলা যায় যে, এরূপ উপন্যাসে যাহা-কিছু থাকা আবশ্যক, সে সকলই আছে। সবই আছে, তবু দুর্ভাগ্যবশত বলিতে হইতেছে যে, সাহিত্যিক নিপুণতা ইহাতে কিছুমাত্র নাই। তবে রাধানাথবাবু তাহার জন্য দায়ী নহেন—তিনি অনুবাদকমাত্র। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক! কিন্তু মূল কল্পনার ভাবের ত্রুটি, ভাষার লালিত্যে শোধরাইবার নহে। যে স্বভাবত কুৎসিত, অলঙ্কার পরিলে তাহাকে আরও কুৎসিত দেখায়, এইরূপ আমাদের ধারণা। তবে যাঁহারা অদ্ভুত গল্প পড়িতে ভালবাসেন, এই উপন্যাসখানি তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে।

ভাষা-প্রবন্ধ।—শ্রীকৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য।০ চারি আনা।

ভাষাশিক্ষার সঙ্গে বালকদিগের যাহাতে নীতিশিক্ষা হয়, এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ

সিদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের রুচি, নীতি ও ভাষা, সকলই ভাল; তবে আমাদের বোধ হয় যে, বালকদিগের জন্য পুস্তকের ভাষা আরও সরল হইলে আরও ভাল হইত পুস্তকখানি যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ইহা 'বোধোদয়ের' পরে এবং 'সীতার বনবাসের' পূর্ব্বে পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের যে নূতন ও অদ্ভুত ব্যবস্থা বিদ্যাদিগ্গজেরা করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অবশ্যই বিদ্যালয়ের (?) পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবে না! কিন্তু বালকদিগকে ইহা ঘরে পড়াইলেও তাহাদের ভাষাশিক্ষার আনুকূল্য হইবে, এইরূপ আমাদের ধারণা।

History of Indigo Disturbance in Bengal, with a full Report of The Nil Durpan Case, Compiled by Lalit Chandra Mitra, M. A. Price Rs. 2.

বাঙ্গলা মাসিকপত্রে ইংরেজি পুস্তকের সমালোচনা হওয়া সঙ্গত কি না, এই ভাবিয়া আমরা একটু ইতস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙ্গলা সাময়িক পত্র যাঁহারা পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যখন ইংরেজি জানেন, তখন ইহা অসঙ্গতই বা হইবে কেন। বিশেষত 'বঙ্গদর্শনের' পক্ষে ইহার সাবেক নজির আছে।

এই ইতিহাসের সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র মিত্র, ৺ দীনবন্ধু মিত্রের আত্মজ—প্রতিভাশালী পিতার উপযুক্ত পুত্র। এই পুস্তক যে কেবলমাত্র প্রভূত পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্নের পরিচয়স্থল, এরূপ নহে; ইহা পিতৃভক্তিরও নিদর্শন। সেই ভক্তিই বোধ হয় এই আন্তরিকতার মূল কারণ।

নীলটা আমাদের দেশেরই জিনিষ। আমাদের দেশের নামানুসারেই প্রাচীন ইউরোপে ইহার নামকরণ হইয়াছিল—ইণ্ডিকম্ (Indicum)। ইংরেজি কথাটা এই কথারই রূপান্তর। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে নীলই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য ছিল। পশ্চিম ইণ্ডিজে উৎকৃষ্টতর নীল হয় বলিয়া একবার তাঁহারা এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে আবার অবলম্বন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বারলক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা এই ব্যবসায় তাঁহাদের চাকর ও আশ্রিতদিগকে ছাড়িয়া দেন। সেই অবধিই অত্যাচারের আরম্ভ, এবং তাহা ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া শেষে এমন পৈশাচিকতায় উঠিয়াছিল যে, এ দেশের অতিমাত্র নিরীহ, প্রায় সর্ব্বংসহ, কৃষিজীবীরাও আর সহ্য করিতে পারিল না। এই অবস্থায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই 'নীলবিভ্রাট' বলিয়া পরিচিত। সেই বিভ্রাটের আমূল ও বিস্তারিত বিবরণ অতি বিশদভাবে ও দক্ষতার সহিত এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। লং-সাহেবের মোকদ্দমার সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজি জানেন, তাঁহারা এই পুস্তক একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে নীলবিভ্রাটের প্রায় সমস্ত ভিতরের কথাই জানিতে পারিবেন। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৩৮

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভাল নাই? মাথা ধরিয়াছে?"

কমলা কহিল, "না। খুড়ামশায়কে দেখিতেছি না কেন?"

শৈল কহিল, "ইস্কুলে বড়দিনের ছুটি আছে—দিদিকে দেখিবার জন্য মা তাঁহাকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছেন—কিছুদিন হইতে দিদির শরীর ভাল নাই।"

কমলা কহিল—"তিনি কবে ফিরিবেন?"

শৈল। তাঁর ফিরিতে অন্তত হপ্তাখানেক দেরি হইবার কথা। কেন ভাই, তাঁর কাছে কি তোমার কোনো দরকার আছে?

ঠিক কি দরকার, তাহা কমলার পক্ষে বলা শক্ত, কিন্তু খুড়ার জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতাবোধ হইতেছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলা নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অনুভব করিয়া একটা নির্ভরের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কি করিবে, কি হইবে, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া উঠিবার এখনো সময় পায় নাই, কেবল ত্রস্ত হৃদয় ভিতরে-ভিতরে একটা-কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

শৈল কহিল, "তোমাদের বাংলা-সাজানো লইয়া তুমি সমস্তদিন বড় বেশি পরিশ্রম কর, আজ তোমাকে বড় খারাপ দেখাইতেছে। আজ সকাল-সকাল খাইয়া শুইতে যাও!"

শৈলকে কমলা যদি সকল কথা বলিতে পারিত, তবে বাঁচিয়া যাইত—কিন্তু বলিবার কথা নয়। "যাহাকে এতকাল আমার স্বামী বলিয়া জানিতাম, সে আমার স্বামী নয়," এ কথা আর যাহাকে হোক্, শৈলকে কোনোমতেই বলা যায় না।

কমলা শোবার ঘরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রদীপের আলোকে আর একবার রমেশের সেই চিঠি লইয়া বসিল। চিঠি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইতেছে, তাহার নাম নাই, ঠিকানা নাই—কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক এবং রমেশের সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল ও কমলাকে লইয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেছে, তাহা চিঠি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। যাহাকে চিঠি লিখিতেছে, রমেশ যে তাহাকেই সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে কোথা হইতে কমলা তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়াতেই অনাথার প্রতি দয়া করিয়া এই ভালবাসার বন্ধন সে অগত্যা চিরকালের মত ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ কথাও চিঠিতে গোপন নাই।

সেই নদীর চরে রমেশের সহিত প্রথম

মিলন হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া আর এই গাজিপুরে আসা পর্য্যন্ত সমস্ত স্মৃতি কমলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল— যাহা অস্পষ্ট ছিল, সমস্ত স্পষ্ট হইল।

রমেশ যখন বরাবর তাহাকে পরের স্ত্রী বলিয়া জানিতেছে এবং ভাবিয়া অস্থির হইতেছে যে, তাহাকে লইয়া কি করিবে, তখন যে কমলা নিশ্চিন্তমনে তাহাকে স্বামী জানিয়া অসঙ্কোচে তাহার সঙ্গে চিরস্থায়ী ঘরকন্নার সম্পর্ক পাতাইতে বসিতেছে, ইহার লজ্জা কমলাকে বারবার করিয়া তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিল। প্রতিদিনের বিচিত্র ঘটনা মনে পড়িয়া সে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। এ লজ্জা তাহার জীবনে একেবারে মাখা হইয়া গেছে—ইহা হইতে কিছুতেই আর তাহার উদ্ধার নাই!

এখন কমলা কি করিবে? আজ ত শৈল তাহার প্রাণের বন্ধু, আজ ত খুড়ার গৃহে তাহার পরম সমাদর, আজ ত তাহার জন্ম বাংলাঘর ভাড়া লইয়া গৃহসজ্জা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু এ সমস্তই যে একটিমাত্র লজ্জাকর মিথ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত—সেই মিথ্যাটুকু সরিয়া গেলেই মুহূর্ত্তপরেই সমস্ত জগৎসংসারে কমলার একেবারেই আর বন্ধু নাই, আদর নাই, আশ্রয় নাই! কমলা কি করিবে!

রুদ্ধঘরের দরজা খুলিয়া-ফেলিয়া কমলা খিড়্‌কির বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকার শীতের রাত্রি—কালো আকাশ কালো পাথরের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডা। কোথাও বাষ্পের লেশ নাই; তারাগুলি সুস্পষ্ট জ্বলিতেছে।

প্রকাণ্ড বিশ্বের এই অবিচলিত স্তব্ধতা কমলাকে পীড়া দিতে লাগিল। সমস্ত এত বৃহৎ, এত বিপুল, অথচ ইহার মাঝখানে কোথাও কমলার জন্য একটিমাত্র উপায়, একটুমাত্র চিন্তা নাই। যাহা হইয়াছে, তাহার একটুও নড়্‌চড়্‌ হইবার জো নাই। সমস্ত নিরতিশয় লজ্জা, সমস্ত নিরুপায় দুঃখ লইয়া একলা কমলা কাহার দিকে তাকাইবে! একটা কথা কেহ বলুক্, একটিমাত্র ইঙ্গিত কেহ করুক্—এই বিশ্বব্যাপী অক্ষুণ্ণ নীরবতার মধ্যে কমলার মত অনভিজ্ঞ বালিকার উপরে একি নিদারুণ অসাধ্য সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে!

সম্মুখে খর্ব্বাকার কলমের আমের বন অন্ধকার রাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা কোনমতেই কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে ঠাণ্ডা ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল তাহার চোখ দিয়া একফোঁটা জল বাহির হইল না।

এমন কতক্ষণ সে বসিয়া থাকিত বলা যায় না—কিন্তু তীব্র শীত তাহার হৃৎপিণ্ডকে দোলাইয়া দিল—তাহার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় যখন নিস্তব্ধ তালবনের অন্তরালে অন্ধকারের একটি প্রান্তকে ছিন্ন করিয়া দিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সকালবেলা কমলা চোখ মেলিয়া দেখিল, শৈল তাহার খাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। অনেক বেলা হইয়া গেছে বুঝিয়া লজ্জিত কমলা তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

শৈল কহিল, "না ভাই, তুমি উঠিয়ো না, আর একটু ঘুমাও—নিশ্চয় তোমার শরীর ভাল নাই। তোমার মুখ বড় শুক্‌নো দেখাইতেছে, চোখের নীচে কালী পড়িয়া গেছে। কি হইয়াছে ভাই আমাকে বল না!"—বলিয়া শৈলজা কমলার পাশে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কমলার বুক ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার অশ্রু আর বাধা মানে না! শৈলজার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া তাহার কান্না একেবারে ফাটিয়া বাহির হইল! শৈল একটি কথাও না বলিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

একটু পরেই কমলা তাড়াতাড়ি শৈলজার বাহুবন্ধন ছাড়াইয়া উঠিয়া পড়িল—চোখ মুছিয়া-ফেলিয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল। শৈল কহিল, "নাও নাও, আর হাসিতে হইবে না! ঢের ঢের মেয়ে দেখিয়াছি, তোমার মত এমন চাপা মেয়ে আমি দেখি নাই। কিন্তু তুমি মনে করিতেছ আমার কাছে লুকাইবে আমাকে তেমন হাবা পাও নাই! তবে বলিব? রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেন নি—তাই রাগ হইয়াছে—অভিমানিনী! কিন্তু তোমারো বোঝা উচিত, তিনি সেখানে কাজে গিয়াছেন, দুদিন বাদেই আসিবেন—ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন, তাই বলিয়া কি অত রাগ করিতে আছে! ছি! তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি—আমি হইলেও ঠিক ঐ কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম। তুমি যদি তখন আমাকে বুঝাইতে আসিতে, আমি কি বুঝিতাম মনে কর? এমন মিছিমিছি কান্না মেয়েমানুষকে অনেক কাঁদিতে হয়! আবার এই কান্না ঘুচিয়া-গিয়া যখন হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তখন কিছুই মনে থাকিবে না!"

এই বলিয়া কমলাকে বুকের কাছে টানিয়া-লইয়া শৈল কহিল—"আজ তুমি মনে করিতেছ, রমেশবাবুকে আর কখনো তুমি মাপ করিবে না তাই না? আচ্ছা সত্যি বল!"

কমলা কহিল—"হাঁ, সত্যিই বলিতেছি!"

শৈল কমলার গালে করতলের আঘাত করিয়া কহিল—"ইস্! তাই বই কি! দেখা যাইবে! আচ্ছা বাজি রাখো!"

এই কান্না এবং হাসি, এই রাগ করা এবং ক্ষমা করা, দাম্পত্যপ্রেমের এই যে তরঙ্গলীলায়িত স্রোতের খেলা—ইহারি একটি ছায়ালোকখচিত সুদূরবিস্তৃত শান্তিময় নিভৃত সুখের ছবি, শৈলজার কথায় মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল!

শৈল অমনি চিবুক ধরিয়া কমলার মুখ তুলিয়া ধরিল। কহিল, "একেই বলে বাড়াবাড়ি! অতটা ভাল নয় ভাই—তুই আমাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিস্! আমার অভিমানের এত জোর নাই। অমন করিয়া কি নিশ্বাস ফেলিতে আছে—শুধু চোখের জলের উপর দিয়া যায়, সেই ভাল!"

আজ শৈলজার ঘরে বিশেষ একটা উৎসব ছিল। আজ তাহাদের বিবাহের সাংবৎসরিক পর্ব্ব। এই পর্ব্বপালন বিপিনের একটা বিশেষ

খেয়াল! পাছে পিতামাতা এবং বাহিরের লোক কেহ জানিতে পারে, এইজন্য এই উৎসবের দিনে শৈল ভারি লজ্জায় থাকে। ইহার আয়োজন এবং অনুষ্ঠান গোপনেই সম্পন্ন হয়। এতকাল পরে বাহিরের লোকের মধ্যে আজ কমলাই কেবল এই উৎসবের সংবাদ জানিয়াছে। শৈল তাহার কাছে গোপন করিতে পারে নাই! বিপিন যে বর্ষে বর্ষে তাহাদের বিবাহের দিনকে বিশেষ গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে চায়, ইহার গর্ব্ব শৈল সখীর কাছে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে কি করিয়া? গতকল্য মধ্যাহ্নে এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। কমলা বলিয়াছিল, "এ বেশ ভাই! আমার কাছে এ বড় ভাল লাগিতেছে!"—শৈল বলিয়াছে, "তোমাদেরও বিবাহের তারিখে এইরকম আমোদ করা যাইবে! কি বল ভাই!"—কমলা তাহাতে সম্মতিপ্রকাশ করিয়াছে। শৈল বলিয়াছে, বরণ না হইলে সমস্ত বড় খালি-খালি ঠেকে—উঁহারা যদি রাজি হন, তবে ইহার পর হইতে আমাদের বিবাহের দিনে তুমি আমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইবে, আর তোমাদের বিবাহের দিনে আমি তোমাদের দুজনকে বরণ করিয়া লইব! কি বল ভাই?"—এ প্রস্তাবও কমলার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। এম্‌নি করিয়া দুই সখীর দুই দাম্পত্যসুখের ধারা কত পুনঃপুন-উদিত পূর্ণচন্দ্রের আলোকে, কত বারবার-প্রত্যাবর্ত্তিত আনন্দস্মৃতির উৎসবহিল্লোলে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাশাপাশি বহিয়া চলিয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া কাল মধ্যাহ্নে কমলার মনের মধ্যে একটা সুখের আবেশ রহিয়া-রহিয়া ঢেউ দিয়া গিয়াছে।

এই উৎসবে স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যে মালাবদল হয়, সে মালা শৈল প্রতিবৎসর নিজের হাতে গাঁথিয়া থাকে, এইবারেও তাই গাঁথিবে। কিন্তু কমলা এবার জেদ্ করিয়া ধরিয়া বসিয়াছে—তাহাদের ফুলশয্যার ফুলের আয়োজন কমলা নিজে প্রস্তুত করিয়া দিবে। এইজন্য কালই তাহার দূত উমেশকে ফুলসংগ্রহের জন্য সে উৎসাহিত করিয়াছে—উমেশও কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই শীতকম্পিতকলেবরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া প্রহরীর চক্ষু এবং ন্যায়-অন্যায়-বোধ বর্জ্জন করিয়া পুষ্পলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

গতকল্য মধ্যাহ্নে নিভৃতঘরে, বাতায়নপ্রবিষ্ট শীতরৌদ্রে চুল এলো করিয়া, পা মেলিয়া-দিয়া, মৃদুগুঞ্জিত স্বরকে মাঝে মাঝে কৌতুকহাস্যে মুখরিত করিয়া দুই সখীতে অত্যন্ত বিস্তারিত-পল্লবিত-ভাবে এই সমস্ত আন্দোলন-আলোচনা হইয়া গেছে। তাহার পরে কাল সন্ধ্যা আসিয়াছে এবং রাত্রিও কাটিয়া গিয়াছে! সিসুতরুশ্রেণীর শুষ্কপত্রগুলাকে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণের দিকে উড়াইয়া-দিয়া শীতের মধ্যাহ্ন নির্জ্জন শয়নঘরের বাতায়নদ্বারে তেম্‌নি করিয়াই স্খলিত রৌদ্রের একটা প্রান্ত মেলিয়া দিল কিন্তু কালিকার বিশ্বসংসার হইতে আজ কমলা একেবারে ভ্রষ্ট হইয়া গেছে।

তাই বলিয়া কি কমলা কালিকার দিনকে ফিরিয়া পাইতে চায়? তাও নয়। কিছু না জানিয়া সে যে বিষম লজ্জার মধ্যে তলাইতে বসিয়াছিল, সেদিকে ফিরিয়া তাকাইতেও

তাহার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বিমুখ হয়। আজিকার এই হতাশ্বাস শূন্যময়তা—এও ভাল!

শৈল কহিল, "আজ আর তোমার কিছুতে হাত দিয়া কাজ নাই—দুপুরবেলায় একটুখানি ঘুমাইয়া লও, তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছে!"

না, আজ কমলা ঘুমাইবে না। সখীত্ব আর ত বেশিদিন চলিবে না, যে দুইএকদিন অবকাশ আছে, প্রণয়ের শেষ কাজগুলি সে সারিয়া-দিয়া যাইতে চায়—এমন সুখের ঘরে এমন সুখের কাজ আর তাহার জীবনে কখনো ঘটিবে কি? নিজের সুখশয্যায় ত আগুন লাগিল, এবার সখীর ফুলশয্যার মালাগাঁথা শেষ করিয়া সে এই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। সমস্তদিন নিজেকে কমলা লেশমাত্র বিশ্রাম দিল না। শৈলর শয়নগৃহ সাজাইল, নানারকম খাবার তৈরি করিল—শীতকালের দিন দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল।

হরিভাবিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, তোদের আজ ব্যাপারখানা কি বল্‌ দেখি?"

শৈল কহিল, "কি জানি মা, কমলের মাথায় পাগ্‌লামি চাপিয়াছে!"

হরিভাবিনী কহিলেন, "আজ বুঝি তোদের পুতুলের বিয়ে?"

শৈল কহিল—"হাঁ মা, বিয়েরই ব্যাপার!" —এই বলিয়া গোপনে কমলাকে মৃদু একটুখানি চিম্‌টি কাটিল।

সন্ধ্যার সময় কমলা শৈলকে গা ধোয়াইয়া চুল বাঁধিয়া লাল বেনারসী শাড়ী পরাইল। তাহার সীঁথায় বড় করিয়া সিঁদুরের রেখা কাটিল, কপালে শ্বেতচন্দন দিল। বলিল, "দিদি, তোমার পায়ে আমি আল্‌তা পরাইয়া দিব!"

শৈল কহিল, "দূর পাগ্‌লি, তোর আর অত করিতে হইবে না।"

কমলা কিছুতেই ছাড়িল না,—লাইন্‌ ঠিক পরিপাটি হইল না, কিন্তু বহুযত্নে সে কমলার পায়ে আল্‌তা রাঙাইয়া দিল। দিয়া, হঠাৎ দুই পা দুই হাতে জড় করিয়া তুলিয়া মাথা নীচু করিয়া চুম্বন করিল। শৈল চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "ও কি ও! অমন কর যদি, তবে আমি যাই!"

এম্‌নি করিয়া কমলা তাহার পত্নীধর্ম্মব্রতের অবসানদিনে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সতী নারীর, এই ভাগ্যবতী গৃহলক্ষ্মীর চরণবন্দনা করিয়া লইল। মনে মনে ভাবিল, "এ জন্মের আশা ত নাই, আর জন্মে যদি শৈলর মত এম্‌নি ভাগ্যলাভ করিতে পারি, তবে কৃতার্থ হইব।"

শৈলর মেয়ে উমিকে এতক্ষণ হিন্দুস্থানী ঝি ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই সে "মা কাছে যাব" বলিয়া ভারি গোলমাল বাধাইয়া দিল। মাতার সুসজ্জিত বেশভূষা তাহার ভাল লাগিল না—ইহা মায়ের পরিচিত বেশ নহে। সে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিতে যাবামাত্র কমলা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—কহিল, "আয় উমি, মাসীর কাছে আয়!"—কিন্তু সে কি হয়, সন্ধ্যাবেলায় আর কাহাকেও নয়, মাকে চাই। কমলা গল্প বলিবার লোভ দেখাইয়া অনেক করিয়া উমিকে আপনার ঘরে লইয়া-গিয়া বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প ফাঁদিল। তাহাকে ভুলাইয়া, গল্প বলিয়া, খাওয়াইয়া, বুকে চাপিয়া-ধরিয়া,

দোলাইয়া, ঘুম পাড়াইয়া নিজের বিছানার উপরে শোয়াইয়া দিল;—কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া চুম্বন করিল। কচি মুখটি চুম্বন করিতেই কমলার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শিশুকে লালন করিবার তৃষ্ণা সমস্ত অপরিতৃপ্ত ভবিষ্যতের বেদনাকে একত্র করিয়া লইয়া আজ তাহার বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, উমির ঘুম ভাঙাইয়া আবার তাহাকে কোলের মধ্যে করিয়া তাহাকে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বকে, তাহার মুখে মাসীসম্বোধন শোনে।

খানিকবাদে শৈলজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"উমি ঘুমাইয়াছে ?"

কমলা কহিল, "হাঁ, ঘুমাইয়াছে।"

শৈল। তবে এইবেলা ওকে ওর বিছানায় শোয়াইয়া দিই গে!

কমলা তাড়াতাড়ি কহিল, "না দিদি, না, আজ ও আমার বিছানাতেই থাক্।"

শৈল। ছোট বিছানায় তোমার যে অসুবিধা হবে ভাই!

কমলা। কিছু অসুবিধা হইবে না! ও এখানেই থাক্!

সন্ধ্যার পর বিপিন ঈষৎ লজ্জিতভাবে শয়নঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলের তাড়নায় পাশের ঘর হইতে সে লাল বেনারসী জোড় পরিয়া আসিল। শৈল রূপার থালায় ঘষা চন্দনের বাটি, গোলাপপাশ ও ফুলের মালা আনিয়া প্রথমে বিপিনের ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিল, পরে তাহার চাদরের উপর গোলাপ ছিটাইয়া দিয়া তাহার গলায় দুইগাছি মালা পরাইয়া গড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিপিন আপনার গলার একগাছি মালা খুলিয়া শৈলকে পরাইয়া দিল এবং আনন্দ হাস্যমুখে শৈলর চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া মাথা নত করিতে যাইতেছিল—কিন্তু শৈল আজ নিয়মভঙ্গ করিল। সে হঠাৎ মুখ সরাইয়া নীরব সঙ্কেতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—বিপিন বুঝিল, অন্তরাল হইতে তৃতীয়পক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে। অনুষ্ঠানের এই অসম্পূর্ণতা সংশোধন করিয়া লইবার যথেষ্ট সময় আছে জানিয়া বিপিন ক্ষান্ত হইল। শৈলজা ফলমূলমিষ্টান্নের বিচিত্র পাত্র বহিয়া মেজের উপর সাজাইয়া দিল। বিপিন খাইতে বসিল এবং শৈল সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে ধুনার পাত্রে ধূপধুনা ও চন্দনের গুঁড়া দিয়া ভূষণঝঙ্কৃত বাহুতে পাখা করিয়া সুগন্ধি ধূমরাশি ঘনাইয়া তুলিতে লাগিল।

কমলা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একসময়ে চলিয়া-গিয়া আপনার ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে মেঝের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। অন্যদিন শৈলজা তাহাকে যথাসময়ে ডাকিয়া-লইয়া একসঙ্গে খাইতে যায়। আজ শৈলর অবকাশ ছিল না। আজ সে স্বামীর পাত্রে প্রসাদ পাইয়া পুষ্পাসনে বসিয়া বিপিনের কাছ হইতে একটা ইংরাজিগল্পের তর্জ্জমা শুনিতেছে। কমলার ঘরের এক কোণে আজিকার প্রস্তুত মিষ্টান্ন প্রভৃতি ঢাকা দেওয়া ছিল—তাহা ঢাকাই রহিয়া গেল। কমলা তাহার অসংবৃত কেশ-

রাশি ভূমির উপরে ছড়াইয়া প্রসারিত বামবাহুর উপর মাথা রাখিয়া বিস্রস্ত বস্ত্রাঞ্চলে কঠিন-শীতল গৃহতলে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

খানিক রাত্রে কমলার বিছানার উপর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, "মা, মা!"

"কি মা"—বলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া বিছানার মধ্যে গিয়া গুন্‌গুন্‌শব্দে উমির ললাটে মৃদুমৃদু করাঘাত করিতে লাগিল—উমি তৎক্ষণাৎ কমলাকে মা মনে করিয়া তাহাকে জড়াইয়া-ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বুকের কাছে এই শিশুদেহকে চাপিয়া-ধরিয়া কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল।

৩৯

কাল সকালে কমলার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবার পরেই শৈল এলাহাবাদে তাহার বাপকে চিঠি পাঠাইল। তাহাতে লিখিল, "কমলা রমেশবাবুর কোন চিঠিপত্র না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছে। একে বেচারা নূতন বিদেশে আসিয়াছে, তাহার পরে রমেশবাবু যখন-তখন তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং চিঠিপত্র লিখিতেছেন না, ইহাতে তাহার কি কষ্ট হইতেছে. একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! তাঁহার এলাহাবাদের কাজ কি আর শেষ হইবে না নাকি? কাজ ত ঢের লোকের থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া দুইছত্র চিঠি লিখিবার কি অবসর পাওয়া যায় না?"

খুড়া রমেশের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার কন্যার পত্রের অংশবিশেষ শুনাইয়া ভৎসনা করিলেন।

কমলার দিকে রমেশের মন যথেষ্টপরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে, এ কথা সত্য, কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তাহার দ্বিধা আরও বাড়িয়া উঠিল। এলাহাবাদে আসিয়া কমলার সেই গৃহরচনার চিত্রটি যখন তাহার মনের সাম্‌নে হইতে কিছুতেই আর সরিতে চাহিল না, যখন তাহাকে বিচিত্র সুখের কল্পনায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, তখনই তাহার মনে হইল, আমার কর্ত্তব্যটা ঠিক কি, তাহা বুঝি প্রবৃত্তির ঝোঁকে আর ঠাহর করিবার শক্তি রহিল না। যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া ঠিক করিয়াছিল, তাহা একান্ত লোভনীয় হইয়া ওঠাতেই তাহার মনে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। কেবলি ভাবিতে লাগিল, কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়া চিরজীবন একটা মিথ্যাকে বহন করিয়া বেড়াইব কি করিয়া? ইহার পরে প্রকৃত ঘটনা আর কোনোকালেই ত কমলাকে বলা যাইবে না!

এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া রমেশ কোনোমতেই এলাহাবাদ হইতে ফিরিতে পারিতেছিল না। ইতিমধ্যে খুড়ার কাছ হইতে সে শৈলর চিঠি শুনিল।

চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারিল, কমলা রমেশের জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে—সে কেবল নিজে লজ্জায় লিখিতে পারে নাই।

ইহাতে রমেশের দ্বিধার দুই শাখা দেখিতে দেখিতে একটাতে আসিয়া মিলিয়া গেল। এখন ত কেবলমাত্র রমেশের সুখদুঃখ লইয়া কথা নয়, কমলাও যে রমেশকে ভালবাসিয়াছে। বিধাতা যে কেবল নদীর চরের উপরে তাহাদের দুইজনকে মিলাইয়া

দিয়াছেন, তাহা নহে, হৃদয়ের মধ্যেও এক করিয়াছেন। যতদিন রমেশের ভালবাসার গতি অন্তদিকে ছিল, ততদিন যথার্থ মিলনের সময় আসে নাই --আজ যখন রমেশ সম্পূর্ণভাবেই কমলার কাছে আত্মসমর্পণের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখন আর সংশয় করিবার বিষয় কি আছে! একটা আছে বটে—প্রকৃত ঘটনাটা কমলাকে বলা হয় নাই। তা, কোনো একদিন সেটাও বলিবার সুযোগ নিশ্চয় আসিবে!

এই ভাবিয়া রমেশ আর বিলম্বমাত্র না করিয়া কমলাকে এক চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল—

"প্রিয়তমাসু—

"কমলা, তোমাকে এই যে সম্ভাষণ করিলাম, ইহাকে চিঠি লিখিবার একটা প্রচলিত পদ্ধতিপালন বলিয়া গণ্য করিয়ো না। যদি তোমাকে আজ পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া না জানিতাম, তবে কখনই আজ 'প্রিয়তমা' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিতাম না। যদি তোমার মনে কখনো কোনো সন্দেহ হইয়া থাকে, যদি তোমার কোমল হৃদয়ে কখনো কোনো আঘাত করিয়া থাকি, তবে এই যে আজ সত্য করিয়া তোমাকে ডাকিলাম 'প্রিয়তমা', ইহাতেই আজ তোমার সমস্ত সংশয়, সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ক্ষালন করিয়া দিক্! ইহার চেয়ে তোমাকে আর বেশি বিস্তারিত করিয়া কি বলিব! এ পর্য্যন্ত আমার অনেক আচরণ তোমার কাছে নিশ্চয় ব্যথাজনক হইয়াছে—সেজন্ত যদি তুমি মনে মনে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাক, তবে আমি প্রতিবাদী হইয়া তাহার লেশমাত্র প্রতিবাদ করিব না—আমি কেবল বলিব, আজ তুমি আমার প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেহই নাই—ইহাতেও যদি আমার সমস্ত অপরাধের, সমস্ত অসঙ্গত আচরণের শেষ জবাব না হয়, তবে আর কিছুতেই হইবে না।

"অতএব কমলা, আজ তোমাকে এই 'প্রিয়তমা'সম্বোধন করিয়া আমাদের পরিচয়হীন সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম, এই 'প্রিয়তমা'সম্বোধন করিয়া আমাদের সুখ-শান্তি-ভালবাসার ভবিষ্যৎকে আরম্ভ করিলাম। তোমার কাছে আমার একান্ত মিনতি, তুমি আজ আমার 'প্রিয়তমা' এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর! ইহা যদি ঠিক তুমি মনে গ্রহণ করিতে পার, তবে কোনো সংশয় লইয়া আমাকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না!

"তাহার পরে, আমি তোমার ভালবাসা পাইয়াছি কি না, সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিবও না। আমার এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের অনুকূল উত্তর একদিন তোমার হৃদয়ের ভিতর দিয়া আমার হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া পৌঁছিবে, ইহাতে আমি সন্দেহমাত্র করি না। ইহা আমি আমার ভালবাসার জোরে বলিতেছি;—আমার যোগ্যতা লইয়া অহঙ্কার করি না, কিন্তু আমার সাধনা কেন সার্থক হইবে না?

"আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা কেমন সহজ হইতেছে না—তাহা রচনার মত শুনাইতেছে—ইচ্ছা করিতেছে, এ চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলি! কিন্তু যে চিঠি

মনের মত হইবে, সে চিঠি এখনি লেখা সম্ভব হইবে না। কেন না, চিঠি দুজনের জিনিষ —কেবল এক পক্ষ যখন চিঠি লেখে, তখন সে চিঠিতে সব কথা ঠিক করিয়া লেখা চলে না—তোমাতে আমাতে যেদিন মনজানা-জানির বাকি থাকিবে না, সেইদিনই চিঠির মত চিঠি লিখিতে পারিব। সাম্‌নাসামনি দুই দরজা খোলা থাকিলে তখনি ঘরে অবাধে হাওয়া খেলে। কমলা, প্রিয়তমা, তোমার হৃদয় কবে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিব!

"এ সব কথার মীমাংসা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে হইবে—ব্যস্ত হইয়া ফল নাই। যেদিন আমার চিঠি পাইবে, তাহার পরের দিন সকালবেলাতেই আমি গাজিপুরে পৌঁছিব। তোমার কাছে আমার অনুরোধ এই, গাজিপুরে পৌঁছিয়া আমাদের বাসাতেই যেন তোমাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন গৃহহারার মত কাটিল—আর আমার ধৈর্য্য নাই এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব—হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তিতে দেখিব। সেই মুহূর্ত্তে দ্বিতীয়বার আমাদের শুভদৃষ্টি হইবে। মনে আছে আমাদের প্রথমবার সেই শুভদৃষ্টি? সেই জ্যোৎস্নারাত্রে, সেই নদীর ধারে, জনশূন্য বালুমরুর মধ্যে? সেখানে ছাদ ছিল না, প্রাচীর ছিল না, পিতামাতাভ্রাতা-আত্মীয়-প্রতিবেশীর সম্বন্ধ ছিল না সে যে গৃহের একেবারে বাহিরে। সে যেন স্বপ্ন, সে যেন কিছুই সত্য নহে। সেইজন্য আর একদিন স্নিগ্ধ-নির্ম্মল প্রাতঃকালের আলোকে গৃহের মধ্যে, সত্যের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করিয়া লইবার অপেক্ষা আছে। পুণ্যপৌষের প্রাতঃকালে আমাদের গৃহদ্বারে তোমার সরল সহাস্য মূর্ত্তিখানি চিরজীবনের মত আমার হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইব, এইজন্য আমি আগ্রহে পরিপূর্ণ হইয়া আছি। প্রিয়তমে, আমি তোমার হৃদয়ের দ্বারে অতিথি—আমাকে ফিরাইয়ো না।

প্রসাদভিক্ষু রমেশ।"

৪০

শৈল ম্লান কমলাকে একটুখানি উৎসাহিত করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, "আজ তোমাদের বাংলায় যাইবে না?"

কমলা কহিল—"না, আর দরকার নাই।"

শৈল। তোমার ঘরসাজানো শেষ হইয়া গেল?

কমলা। হাঁ ভাই, শেষ হইয়া গেছে!

কিছুক্ষণ পরে আবার শৈল আসিয়া কহিল, "একটা জিনিষ যদি দিই ত কি দিবি বল্?"

কমলা কহিল, "আমার কি আছে দিদি?"

শৈল। একেবারে কিছুই নাই?

কমলা। কিছুই না।

শৈল কমলার কপোলে করাঘাত করিয়া কহিল, "ইস্, তাই ত,—যা কিছু ছিল, সমস্তই বুঝি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস্? এটা কি বল্ দেখি?"—বলিয়া শৈল অঞ্চলের ভিতর হইতে একটা চিঠি বাহির করিল।

লেফাফায় রমেশের হস্তাক্ষর দেখিয়া কমলার মুখ তৎক্ষণাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—সে একটুখানি মুখ ফিরাইল!

শৈল কহিল—"ওগো, আর অভিমান দেখাইতে হইবে না, ঢের হইয়াছে! এদিকে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইবার জন্য মনটার

ভিতরে ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে—কিন্তু মুখ ফুটিয়া চাহিলে আমি দিব না—কখনো দিব না —দেখি কতক্ষণ পণ রাখিতে পার!"

এমনসময় উমা একটা সাবানের বাক্সে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-আনিয়া কহিল "মাসি, গ-গ!"

কমলা তাড়াতাড়ি উমিকে কোলে তুলিয়া বারংবার চুমো খাইতে খাইতে শোবার ঘরে লইয়া গেল। উমি তাহার শকটচালনায় অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কিন্তু কমলা কোনোমতেই ছাড়িল না—তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া-গিয়া নানাপ্রকার প্রলাপবাক্যে তাহার মনোরঞ্জন-চেষ্টায় প্রবলবেগে প্রবৃত্ত হইল।

শৈল আসিয়া কহিল—"হার মানিলাম —তোরই জিৎ—আমি ত পারিতাম না! ধন্যি মেয়ে! এই নে ভাই—কেন মিছে অভিশাপ কুড়াইব!"

এই বলিয়া বিছানার উপরে চিঠিখানা ফেলিয়া উমিকে কমলার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

লেফাফাটা লইয়া একটুখানি নাড়াচাড়া করিয়া কমলা চিঠিখানা খুলিল—প্রথম দুই-চারি লাইনের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় সে চিঠি-খানা একবার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রথম ধাক্কার এই প্রবল বিতৃষ্ণার আক্ষেপ সামলা-ইয়া-লইয়া আবার সেই চিঠি মাটি হইতে তুলিয়া সমস্তটা সে পড়িল। সমস্তটা সে ভাল করিয়া বুঝিল কি না বুঝিল, জানি না, কিন্তু তার মনে হইল, যেন সে হাতে করিয়া কি একটা পঙ্কিল পদার্থ নাড়িতেছে। চিঠি-খানা আবার সে ফেলিয়া দিল। যে ব্যক্তি তাহার স্বামী নহে, তাহারই ঘর করিতে হইবে, এইজন্য এই আহ্বান! রমেশ জানিয়া-শুনিয়া এতদিন পরে তাহাকে এই অপমান করিল! গাজিপুরে আসিয়া রমেশের দিকে কমলা যে তাহার হৃদয় অগ্রসর করিয়া দিয়া-ছিল, সে কি রমেশ বলিয়া, না তাহার স্বামী বলিয়া? রমেশ তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিল, সেইজন্যই 'অনাথার' প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে আজ এই ভালবাসার চিঠি লিখি-য়াছে! ভ্রমক্রমে রমেশের কাছে যেটুকু প্রকাশ পাইয়াছিল, সেটুকু কমলা আজ কেমন করিয়া ফিরাইয়া লইবে—কেমন করিয়া! এমন লজ্জা, এমন ঘৃণা কমলার অদৃষ্টে কেন ঘটিল! সে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছে! এবারে 'ঘর' বলিয়া একটা বীভৎস জিনিষ কমলাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে কমলা কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে! রমেশ যে তাহার কাছে এত-বড় বিভীষিকা হইয়া উঠিবে, দুইদিন আগে তাহা কি কমলা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত?

ইতিমধ্যে দ্বারের কাছে উমেশ আসিয়া একটুখানি কাশিল। কমলার কাছে কোনো সাড়া না পাইয়া সে আস্তে আস্তে ডাকিল "মা!" কমলা দ্বারের কাছে আসিল, উমেশ মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "মা, আজ সিধুবাবুরা মেয়ের বিবাহে কলিকাতা হইতে একটা যাত্রার দল আনাইয়াছেন।"

কমলা কহিল, "বেশ ত উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাস্‌।"

উমেশ। কাল সকালে কি ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতে হইবে?

কমলা। না না, ফুলের দরকার নেই!

উমেশ যখন চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কমলা তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল—কহিল, "ও উমেশ, তুই যাত্রা শুনিতে যাইতেছিস্, এই নে, পাঁচটা টাকা নে!"

উমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যাত্রা শুনিবার সঙ্গে পাঁচটা-টাকার কি যোগ, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। কহিল—"মা, সহর হইতে কি তোমার জন্য কিছু কিনিয়া আনিতে হইবে?"

কমলা। না না, আমার কিছু চাই নে। তুই রাখিয়া দে, তোর কাজে লাগিবে।

হতবুদ্ধি উমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে কমলা আবার তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "উমেশ, তুই এই কাপড় পরিয়া যাত্রা শুনিতে যাইবি নাকি—তোকে লোকে বলিবে কি?"

লোকে যে উমেশের নিকট সাজসজ্জা-সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি প্রত্যাশা করে এবং ত্রুটি দেখিলে আলোচনা করিয়া থাকে, উমেশের এরূপ ধারণা ছিল না—এই কারণে ধুতির শুভ্রতা ও উত্তরচ্ছদের একান্ত অভাব-সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কমলার প্রশ্ন শুনিয়া উমেশ কিছু না বলিয়া একটু-খানি হাসিল।

কমলা তাহার দুই জোড়া শাড়ী বাহির করিয়া উমেশের কাছে ফেলিয়া-দিয়া কহিল, "এই নে, যা, পরিস্।"

শাড়ীর চওড়া বাহারে পাড় দেখিয়া উমেশ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কমলার পায়ের কাছে পড়িয়া টিপ্ করিয়া প্রণাম করিল, এবং হাস্যদমনের বৃথাচেষ্টায় সমস্ত মুখখানাকে বিকৃত করিয়া চলিয়া গেল। উমেশ চলিয়া গেলে কমলা দুই-ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবিনে?"

কমলার কাছে শৈলর ত কিছুই গোপন ছিল না—তাই শৈল এতদিন পরে সুযোগ পাইয়া এই দাবী করিল।

কমলা কহিল, "ঐ যে দিদি, দেখ না।" —বলিয়া, মেজের উপরে চিঠি পড়িয়া ছিল, দেখাইয়া দিল। শৈল আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, "বাস্‌রে, এখনো রাগ যায় নাই!"—মাটি হইতে শৈল চিঠি তুলিয়া-লইয়া সমস্তটা পড়িল। চিঠিতে ভালবাসার কথা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু তবু এ কেমনতর চিঠি! মানুষ আপনার স্ত্রীকে কি এম্‌নি করিয়া চিঠি লেখে! এ যেন কি-এক-রকম! শৈল জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন?"

"স্বামী" শব্দটা শুনিয়া চকিতের মধ্যে কমলার দেহমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। সে কহিল—"জানি না!"

শৈল কহিল, "তা হ'লে আজ তুমি বাংলাতেই যাইবে?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, যাইবে।

শৈল কহিল, "আমিও আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিতাম, কিন্তু জান ত ভাই, আজ নরসিংবাবুর বউ আসিবে। মা বরঞ্চ তোমার সঙ্গে যান্।"

কমলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না, মা গিয়া কি করিবেন? সেখানে ত চাকর আছে।"

শৈল হাসিয়া কহিল, "আর তোমার বাহন উমেশ আছে, তোমার ভয় কি ?"

উমা তখন কাহার একটা পেন্সিল সংগ্রহ করিয়া যেখানে-সেখানে আঁচড় কাটিতেছিল এবং চীৎকার করিয়া অব্যক্ত ভাষা উচ্চারণ করিতেছিল, মনে করিতেছিল 'পড়িতেছি'। শৈল তাহার এই সাহিত্যরচনা হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল—সে যখন প্রবল তারস্বরে আপত্তিপ্রকাশ করিল, কমলা বলিল, "একটা মজার জিনিষ দিতেছি আয়!"

এই বলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানার উপর ফেলিয়া আদরের দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। সে যখন প্রতিশ্রুত উপহারের দাবী করিল, তখন কমলা তাহার বাক্স খুলিয়া একজোড়া সোনার ব্রেস্‌লেট্‌ বাহির করিল। এই দুর্লভ খেলেনা পাইয়া উমি ভারি খুসি হইল। মাসী তাহার হাতে পরাইয়া দিতেই সে সেই ঢল্‌ঢলে-গহনাজোড়া-সমেত দুটি হাত সন্তর্পণে তুলিয়া-ধরিয়া সগর্ব্বে তাহার মাকে দেখাইতে গেল। মা ব্যস্ত হইয়া যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত ব্রেস্‌লেট্‌ কাড়িয়া লইল—কহিল, "কমল, তোমার কিরকম বুদ্ধি! এ সব জিনিষ উহার হাতে দাও কেন ?"

এই দুর্ব্যবহারে উমির আর্ত্তনাদের নালিশ গগনভেদ করিয়া উঠিল। কমল কাছে আসিয়া কহিল, "দিদি, এ ব্রেস্‌লেট্‌-জোড়া আমি উমিকেই দিয়াছি।"

শৈল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"পাগল নাকি !"

কমলা কহিল—"আমার মাথা খাও দিদি, এ ব্রেস্‌লেট্‌জোড়া তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিবে না! ইহা ভাঙিয়া উমির হার গড়াইয়া দিয়ো।"

শৈল কহিল, "না, সত্য বলিতেছি, তোর মত ক্ষ্যাপা মেয়ে আমি দেখি নাই!"

এই বলিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিল। কমলা কহিল, "তোদের এখান হইতে আমি ত আজ চলিলাম দিদি—খুব সুখে ছিলাম—এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।"—বলিতে বলিতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল।

শৈলও উদ্‌গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল—"তোর রকমটা কি বল্‌ দেখি কমল, যেন কতদূরেই যাইতেছিস্‌! যে সুখে ছিলি, সে আর আমার বুঝিতে বাকি নাই। এখন তোর সব বাধা দূর হইল, সুখে আপন ঘরে একলা রাজত্ব করিবি—আমরা কখনো গিয়া পড়িলে ভাবিবি আপদ্‌ বিদায় হইলেই বাঁচি!"

বিদায়কালে কমলা শৈলকে প্রণাম করিলে পর শৈল কহিল, "কাল দুপুরবেলা আমি তোদের ওখানে যাইব।"

কমলা তাহার উত্তরে 'হাঁ-না' কিছুই বলিল না।

বাংলায় গিয়া কমলা দেখিল, উমেশ আসিয়াছে। কমলা কহিল—"তুই যে! যাত্রা শুনিতে যাবি না?"

উমেশ কহিল, "তুমি যে আজ এখানে থাকিবে, আমি—"

কমলা। আচ্ছা আচ্ছা, সে তোর ভাবিতে হইবে না। তুই যাত্রা শুনিতে যা—এখানে বিষণ আছে। যা, দেরি করিস্‌ নে!"

উমেশ। এখন ত যাত্রার অনেক দেরি!

কমলা। তা হোক্ না, বিয়ে-বাড়ীতে কত ধুম হইতেছে, ভাল করিয়া দেখিয়া আয় গে যা!

এ সম্বন্ধে উমেশকে অধিক উৎসাহিত করিবার প্রয়োজন ছিল না। সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কমলা হঠাৎ তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"দেখ্, খুড়োমশায় আসিলে তুই—"

এইটুকু বলিয়া কথাটা কি করিয়া শেষ করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না। উমেশ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমলা খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল—"মনে রাখিস্, খুড়োমশায় তোকে ভালবাসেন—তোর যখন যা দরকার হইবে, আমার প্রণাম জানাইয়া তুই তাঁর কাছে চাস্, তিনি দিবেন—তাঁকে আমার প্রণাম দিতে কখনো ভুলিস্‌নে—জানিস্!"

উমেশ এই অনুশাসনের কোনো অর্থ না বুঝিয়া "যে আজ্ঞে" বলিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে বিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "মা-জি, কোথায় যাইতেছ?"

কমলা কহিল, "গঙ্গায় স্নান করিতে চলিয়াছি।"

বিষণ কহিল, "সঙ্গে যাইব?"

কমলা কহিল—"না, তুই ঘরে পাহারা দে!"—বলিয়া তাহার হাতে অনাবশ্যক একটা টাকা দিয়া কমলা গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমশ।

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

[২য় প্রস্তাব]

খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত এশিয়ার সমগ্র পশ্চিমাংশে ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রমণগণের প্রচারকৌশলে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"র মূলমন্ত্র পুনঃপুন বিঘোষিত হইয়া জনসাধারণের হৃদয়ে প্রীতি-পবিত্রতা বিকশিত করিয়া সাধু-সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষের প্রতি লোকচিত্ত আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়া ধর্ম্মের নামে যে যাহা বলিত, নরনারী তাহার গূঢ়মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, ভক্তিপ্রদর্শনে ত্রুটি করিত না। শ্রমণগণের সৌম্য-শান্ত-পবিত্র বেশ ও অলোকসামান্য বিশ্বপ্রেম সভ্য-অসভ্য সকল শ্রেণীর নরনারীর উপরেই অল্পাধিক-প্রভাব বিস্তারে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। অশোকের অনুশাসনে উৎসাহলাভ

করিয়া, প্রচারপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, এশিয়াখণ্ডের জলে-স্থলে বৌদ্ধমত-প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিল। তজ্জন্য কত রাজপুত্র রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ভিক্ষাপাত্রহস্তে নরনারীর দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া, ধর্ম্মসংঘ ও বুদ্ধের মহিমাপ্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই নবধর্ম্মের কথা চীনসাম্রাজ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু অশোকের প্রচারকবর্গের সে দেশে ধর্ম্মপ্রচারে গমন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। চীনদেশের পশ্চিমাংশে,—মধ্য-এশিয়ার সমুন্নত জনসমাজে,—বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানগৌরবের প্রতি চীনসাম্রাজ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার সন্ধান লাভ করিয়া, চীনাধিপতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়ান-নামক সুবিখ্যাত অধ্যাপককে অষ্টাদশ সহধ্যায়ী সমভিব্যাহারে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য মধ্য-এশিয়ায় প্রেরণ করেন। সৈয়ান ও তদীয় সহাধ্যায়িবর্গ মধ্য-এশিয়ায় উপনীত হইয়া, তদ্দেশে বহুসংখ্যক ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে মতঙ্গ ও হোয়ান্ নামধেয় দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ তাঁহার সহিত চীনসাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ করেন। সেই সময় হইতে চীনদেশে ভারতীয় শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচারের সূত্রপাত হয়। তজ্জন্য মতঙ্গের নাম অদ্যাপি চীনদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জন্মভূমি হইতে তাঁহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! যাঁহারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যবিস্তারে জীবন উৎসর্গ করিয়া নানা দূরদেশে ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইয়াছিলেন, স্বদেশে তাঁহাদের নাম-গোত্র বিলুপ্ত হইলেও, পৃথিবী হইতে তাঁহাদের আত্মত্যাগের পুণ্যপ্রতাপ বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি চীনসাম্রাজ্যের বিবিধ বিভাগে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিয়া, সেই সকল বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসিশিক্ষকের আত্মত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মতঙ্গ চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; তিনি চিত্রাঙ্কন করিয়া চৈত্য ও স্তূপ নির্ম্মাণের শিক্ষাপ্রদানে চীনসাম্রাজ্যের শিল্পবিদ্যার উন্নতিসাধন করেন।

মতঙ্গের প্রচারযাত্রার সময়ে লইয়াঙ্গ-নামক স্থানে চীনসাম্রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথায় যে রাজপ্রাসাদে ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণ প্রথম আতিথ্যস্বীকার করেন, তাহা রাজাদেশে বৌদ্ধবিহারে পরিণত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্র বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পুণ্যতীর্থরূপে পূজিত হইয়া থাকে। এই ইতিহাসবিখ্যাত বৌদ্ধবিহার কতকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কোন্ সময়ে কি সূত্রে ধ্বংসমুখে পতিত হয়, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাতার ও ভারতবর্ষ হইতে উপনীত হইয়া শ্রমণগণের এই বিহারে জ্ঞানবিস্তারে নিযুক্ত থাকিবার কিছু কিছু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পশ্চিমাংশ হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশলাভ করে; তজ্জন্য চীনদেশের অধিবাসিবর্গের নিকট মধ্য-এশিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আকর বলিয়া পরিচিত

ছিল। তখনও চীনদেশের লোকে ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হয় নাই। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার নূতন সুযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। কোচিন্-বন্দরের পথে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেও চীনদেশে ভারতবর্ষীয় লোকের সমাগমের সূত্রপাত হইল। তখন জলস্থল উভয় পথে ভারতবর্ষ ও চীন এক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া উঠিল। ইহার ফল অল্পকালেই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদকার্য্য আরব্ধ হইয়া চীনদেশের সাহিত্যে এক অভিনব শক্তিসঞ্চারের সূত্রপাত করিল। সংস্কৃতকাব্যাদির অনুবাদকার্য্যও অসম্পন্ন রহিল না। মূলগ্রন্থানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার টীকা ও ভাষ্য রচনার প্রথাও প্রচলিত হইতে লাগিল। এইরূপে চীনদেশে যে বিপুল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই; বৌদ্ধবিহারের পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত হইয়া, পুনরায় পুরাকীর্ত্তি প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। যেদিন ভারতবর্ষ বা পাশ্চাত্যসমাজ সেই গ্রন্থরাশির অধ্যয়ন ও মর্ম্মানুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইবে, সেদিন ভারতবর্ষের বিলুপ্ত ইতিহাসের বহুবিস্ময়াস্পদ প্রমাণপরম্পরা আবিষ্কৃত হইয়া ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের গৌরব ঘোষণা করিবে। গ্রীস ও রোমের অধঃপতনের পর দীর্ঘকাল ইউরোপের লোকের নিকট গ্রীস ও রোমের পুরাতন জ্ঞানগৌরব অপরিজ্ঞাত ছিল; কালে পুরাতন গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও অনূদিত হইয়া গ্রীক্ জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরবে আধুনিক ইউরোপকে গর্ব্বান্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরব পুনরায় জনসমাজে সুপরিচিত হইবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই;—তিব্বত, চীন, যাপানের অসংখ্য পুরাতন গ্রন্থে তাহার পরিচয় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যেদিন তাহা পুনরায় সভ্যসমাজে প্রচারিত হইবে, সেদিন আমরাও আত্মমর্য্যাদায় সমুন্নত হইতে পারিব।

বৌদ্ধধর্ম্ম এশিয়ার জনসাধারণের প্রকৃতি ও পূর্ব্বসংস্কারের অনুকূল বলিয়া যেখানে প্রচারিত হইয়াছে, সেখান হইতে পুনরায় অন্যদেশে প্রচারিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষের শ্রমণগণকে একাকী পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পশ্চিমাংশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময়ে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, চীনসাম্রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময়েও তাঁহারা ভারতবর্ষের শ্রমণগণের সহচর হইয়াছিলেন। কোরিয়া ও যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের সময় চীনদেশের লোকে সেইরূপ সহায়তা করিয়াছিল। বরং কোরিয়া ও যাপানে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান গৌরব চীনদেশের;—ভারতবর্ষীয় শ্রমণগণ পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তাসাধন করেন।

বৌদ্ধ শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এশিয়াখণ্ডে বিবিধ জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য,—ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা, ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের অধীন হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বিবিধ বিস্তার

সমন্বয় সাধন করে। কাকাসু ও কাকুরা এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন,—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল দুইটি প্রবল সাম্রাজ্যের সন্ধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এক মহাযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। সে যুগের পর্য্যটক, তীর্থযাত্রী ও বণিগবর্গ নিয়ত একদেশ হইতে অন্যদেশে গমনাগমন করিয়া সকল দেশের জ্ঞানগৌরবের সমন্বয়সাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন'।*

সভ্যতাবিকাশের প্রথমাবস্থায় এশিয়ার অধিবাসিবর্গ যে জ্ঞান লইয়া দেশবিদেশে উপনিবেশ-সংস্থাপনে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা কালে দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারসময়ে আবার তাহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তজ্জন্য এশিয়াখণ্ডে যে জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা এশিয়ার সাধারণ সাম্রাজ্য; তাহাতে সকল দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা একক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ তাহার মূল বলিয়া, তাহা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য নামে অভিহিত। এই সাম্রাজ্যবিস্তারে ভারতবর্ষ শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়া ভিন্নদেশ হইতে নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে, একদিকে মুক্তহস্তে বিতরণ, অন্যদিকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিয়া, জ্ঞানের আদান প্রদানের সনাতন নিয়ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক সভ্যসমাজ অসভ্য সমাজকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া নানা তত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন, তদ্দ্বারা ইউরোপীয় জ্ঞান পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষের জ্ঞানও এইরূপে সমগ্র এশিয়ার জ্ঞানগৌরবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা দান করিয়াছি, গ্রহণ করি নাই,—ইতিহাস এরূপ আত্মশ্লাঘার পক্ষসমর্থন করিতে অসমর্থ।

বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় শ্রমণগণকে বিদেশের ভাষা শিক্ষা করিতে হইত; ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক। চীনদেশের ভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য অনূদিত হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইবার কথা অদ্যাপি চীনদেশে প্রচলিত আছে। মুসলমান খলিফাগণ যখন আরবীয়ভাষায় সাহিত্যসঙ্কলন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় বহু পণ্ডিতও অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হন, এ কথা আরবীয় সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে-চীনে, শ্যামে-সিংহলে,—এশিয়াখণ্ডের নানা স্থানে—ভারতবর্ষের লোক বাসস্থান লাভ করিয়া, তদ্দেশের ভাষা ও সাহিত্য গঠনের সহায়তা করিয়াছিলেন, এ কথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কাকাসু ও কাকুরা চীনদেশসম্বন্ধে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন, এক সময়ে লইয়াঙ্গনগরে তিনসহস্র ভারতবর্ষীয় শ্রমণ ও দশসহস্র ভারতবর্ষীয় পরিবারের বাস ছিল।

* We have here the clue to a great era, when North-Western India was a central point between two empires, and through a living world of communication, travellers, pilgrims, and traders carried the common culture back and forth.—*Ideals of the East.*

তাহারা চীনদেশের ধর্ম্ম ও শিল্পাদির উপর ভারতীয়ভাব দৃঢ়মুদ্রিত করিবার জন্যই চীনদেশে বাস করিত। তাহাদের প্রভাবে চীনদেশের ভাবব্যঞ্জক বর্ণমালায় শব্দব্যঞ্জক সামর্থ্য কল্পিত হইয়া, কালক্রমে যাপানদেশের অভিনব বর্ণমালা গঠিত হয়।'*

এশিয়ার যে সকল জনপদে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্য প্রচলিত হইয়াছিল, তদ্দেশের লোকে যে ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া মূলগ্রন্থ পাঠে, ব্যাখ্যায় ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাও স্বাভাবিক কথা। হিয়ঙ্গের এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার কথা সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হিয়ঙ্গের ন্যায় শত শত লোকে নানা দেশে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের জ্ঞান, কখন ভারতবর্ষের মূল গ্রন্থের ভিতর দিয়া, কখন বা ভাষান্তরিত হইয়া, নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাব যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানেই নানা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছে। কলহ-কোলাহল পশুধর্ম্ম; শান্তি ও সদ্ভাববন্ধনই প্রকৃত মানবধর্ম্ম। ভারতবর্ষ মানবধর্ম্মপ্রচারে এশিয়ার কলহ-কোলাহল শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার প্রভাবে দেশে দেশে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীতের সমুন্নতি সাধিত হইয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে কিয়ৎকালের জন্য সভ্যতার সমুন্নতি সাধন করিয়াছিল। প্রাচ্য-শিল্পাদর্শের ইতিহাসলেখক কাকাসু ও কাকুরা নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া, এশিয়ার এই জ্ঞানগৌরবের চিত্রাঙ্কনে ভারতবর্ষের বিজয়ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য এই অভিনব গ্রন্থের সমুচিত সমালোচনায় অগ্রসর হয় নাই।

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যে সকল প্রমাণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অপ্রচুর হইলেও, তদ্দ্বারা ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীনদেশ হইতে বিদ্যাশিক্ষা বা তীর্থদর্শনের জন্য যাহারা নানা ক্লেশে ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন, তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কত লোকে এই ভাবে ভারতভ্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিস্তারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যানির্ণয় করা অসম্ভব। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই চীনদেশের লোকের ভারতভ্রমণের চেষ্টায় বহির্গত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইৎসিং-নামক সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে ইহার উল্লেখ

* There were at one time in Loyang itself, to impress their national religion and art on Chinese soil, more than three thousand Indian Monks and ten thousand Indian families; their great influence may be judged from their having given phonetic values to the Chinese ideographs, a movement which, in the eighth century, resulted in the creation of the present Japanese alphabet.—*Ideals of the East.*

করিয়া গিয়াছেন। * সে সময়ে যাহারা চীনদেশ হইতে বুদ্ধগয়ায় উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের জন্য শ্রীগুপ্তনামধেয় নরপতি একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন ;—ঈৎসিং তাহার ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য-এশিয়ায় খোটাননগরের বৌদ্ধবিত্থালয়ে চীনদেশের চু-সিহিঙ্গ-নামক তীর্থযাত্রীর উপনীত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার পর ফা-লিঙ্গ-নামক তীর্থযাত্রী মধ্য-ভারতে উপনীত হন। বুদ্ধগয়ার নিকট চীনদেশের ভাষায় খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া, ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। দুইখানি খোদিতলিপিতে চি-আই এবং হো-য়ুন নামক চীনদেশের তীর্থযাত্রীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; এবং চি-আই যে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। † এই সকল তীর্থযাত্রীর ভারতভ্রমণকাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাদি চীনদেশে বর্ত্তমান আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহাও নির্ণীত হয় নাই। ফা-হিয়ান্ ও হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গের লিখিত ভারতভ্রমণকাহিনী ঘটনাক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যজাতির হস্তগত ও অনুবাদিত হইয়া, ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। অদ্যাপি তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই নানা বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল ভারতবিবরণী পাঠে জানা যায়,—মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে ভারতবর্ষের সাহিত্য ও বর্ণমালাও প্রচলিত হইয়াছিল। ‡

চীনদেশে গমনাগমন করিবার সহজ পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। স্থলপথে গোবি-মরুভূমি অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করা নিরতিশয় আশঙ্কাজনক হইলেও, সে পথে বহুলোকে বিচরণ করিত ; জলপথে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া চীনদেশে গমনাগমন করা কষ্টসাধ্য হইলেও, লোকে তাহা হইতে বিরত হইত না। তিব্বতের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া গমনাগমনের পথ আবিষ্কৃত হইলে, দূরত্বের হ্রাস হইলেও, গমনাগমনের ক্লেশ বা আশঙ্কার হ্রাস হইতে পারিল না। তথাপি লোকে এই সকল পথের

* We are told by I-tsing who lived about 670 A.D. that 500 years before his time 20 men, or about that number had found their way to the *Mahabodhi* tree in India, and for them and their fellow countrymen a Maharaja called Srigupta built a temple. The establishment was called the "Tchina temple". In I-tsing's days it was in ruins......... Buddhistic Records of the Western World, Introduction.

† J. R. A. S. (New Series) Vol. XIII. 552—572.

§ The customs and spoken language are like those of the people of Khotan, but the written character in use is that of the Brahmans.—Buddhistic Recoreds of the Western World, Vol. I.

আবিষ্কারে ও ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কেবল কৌতূহলচরিতার্থতা ইহার ফল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহার প্রভাব চীনদেশের সমগ্র শিক্ষাদীক্ষার উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই শিক্ষা চীন হইতে কোরিয়া এবং কোরিয়া হইতে যাপানদ্বীপপুঞ্জে ব্যাপ্ত হইবার সময়ে, সে সকল দূরদেশেও ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তার করে। যাপানে তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

যাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, সে দেশের প্রবল পুরুষদিগের মধ্যে কনফ্যুশসের শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎপূর্ব্বে যাপানের ধর্ম্ম পিতৃলোকপূজার সরল ও স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের উপর প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। সাগরবেষ্টিত যাপানদ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার বিস্তৃত জনপদ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, নানা বিষয়ে এশিয়ার অনুগামী হইয়াও, অনেক বিষয়ে স্বাধীনচিন্তার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছে। তজ্জন্য যাপানসাম্রাজ্য আদিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, নীতি ও লোকশিক্ষার কোন প্রবাহ একেবারে লুপ্ত হইবার অবসর প্রদান করে নাই। সে দেশে আদিযুগের পিতৃলোকপূজা, পরবর্ত্তী কনফ্যুশস্ ও শাক্যসিংহের শিক্ষা অদ্যাপি তুল্যভাবে সমাদর লাভ করিতেছে। যাপানবাসীর স্বাধীনচিন্তাপ্রিয় সরল স্বভাব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির নানা উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া, কাব্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, বিবিধ সৌন্দর্য্যের বিকাশসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যাপানবাসীর প্রতিভা যে পথে ধাবিত হইত, উত্তরকালে তাহারি গতি ভারতবর্ষীয়-ভাবানুরক্ত হইয়া, অভিনব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির উপায় উদ্ভাবনে ধাবিত হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্ম চীন ও কোরিয়ারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, যাপানদ্বীপপুঞ্জে সহসা প্রভাববিস্তারে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে যাপানের শাসনপ্রণালী পৃথক্ ছিল। মহারাণী জিঙ্গো যাপানের প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, কোরিয়ারাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর বংশ "সোগাবংশ" নামে পরিচিত। এই বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গই মহারাণী জিঙ্গোর সময় হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাপানের শাসনকার্য্যে আধিপত্য করিতেন। "সোগাবংশীয়" মন্ত্রিবর্গ শাসনকার্য্যে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিলেও, "মনোনোববংশীয়গণ" সেনাবিভাগের কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন। "নাকোচোমীবংশীয়গণ" নৌসেনার অধিপতি থাকিয়া "মনোনোববংশের" দলভুক্ত ছিলেন। "সোগাবংশীয়গণ" উন্নতিশীল, উদারস্বভাব ও জ্ঞানলিপ্সু বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। "মনোনোববংশীয়গণ" স্থিতিশীল, সংস্কারবিরোধী, স্বদেশজাত-সর্ব্বপ্রকার-পুরাতন-সংস্কাররক্ষার্থ নিয়ত বদ্ধপরিকর। এই উভয় দলে প্রাধান্যলাভের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, এক সময়ে নানা বিপ্লবে সমগ্র দেশ বিপর্য্যস্ত করিয়া নরহত্যা ও রাজহত্যায় যাপানের ইতিহাস কলঙ্কিত করেন। সেই সময়ে কোরিয়া হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি যাপান দেশে প্রেরিত হয়। যাপানসম্রাট্ তখন

উভয় দলের মনোমালিন্যে বিপর্য্যস্ত'; স্বাধীনভাবে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। তিনি বুদ্ধমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসু হইলে, উভয় দলে মতভেদ উপস্থিত হইল।

সম্রাট্ স্বয়ং বুদ্ধমূর্ত্তির সমাদর করিবার জন্য উৎসুক হইয়াও, "মনোনোব" ও "নাকোচৌমীবংশীয়" রাজপুরুষগণের প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতে বাধ্য হইলেন। "সোগাবংশীয়" মন্ত্রী আপন উদ্যানবাটীতে মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া, শাক্যসিংহের সম্মানরক্ষা করিলেন। পরবৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হইবামাত্র, অজ্ঞানান্ধ জনসাধারণ বুদ্ধমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাকে তাহার কারণ মনে করিয়া, বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি হ্রদের জলে বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু চীন ও কোরিয়া হইতে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তি ক্রমে যাপানদ্বীপে বাস করিবার জন্য উপনীত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে বুদ্ধমূর্ত্তি পুনঃপুন আনীত হইতে লাগিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজকুমার উমাযাদো বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরক্ত এবং নাগার্জ্জুনের মতানুসরণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যরচনায় নিযুক্ত হইয়া, যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে "অভিধর্ম্ম মোক্ষশাস্ত্র" নামক গ্রন্থ সর্ব্বত্র সুপরিচিত। এই গ্রন্থ চীন, যাপান প্রভৃতি বহু দূরদেশের ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তজ্জন্য এই গ্রন্থের রচয়িতা বসুবন্ধুর নাম বসুন্ধরায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি গান্ধারদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার বাসস্থান উত্তরকালে পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল; তীর্থযাত্রিগণ তথায় উপনীত হইয়া বসুবন্ধুর স্মৃতিসমাদর রক্ষা করিতেন। স্থাননির্দ্দেশের জন্য একখানি ফলকলিপিও রক্ষিত হইয়াছিল। হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গ তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বসুবন্ধু একজন বোধিসত্ত্বরূপে বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। এই পর্য্যন্ত সকল দেশের বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। কিন্তু বসুবন্ধুসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে তিনি বিংশ বা একবিংশ মহাস্থবির বা বৌদ্ধধর্ম্মনেতা। মোক্ষমূলর বলেন,—বসুবন্ধু খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা সত্য হইলে, চীনদেশের বৌদ্ধগ্রন্থের অনেক উক্তি নিতান্ত অলীক হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে মোক্ষমূলরের অনুমান অপেক্ষা চীনদেশের বৌদ্ধসাহিত্যের উক্তি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কাকাশু ও কাকুরা বলেন, বসুবন্ধুর প্রভাব যাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, বসুবন্ধুর শিষ্য মিত্রসেনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গ চীনদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তদ্দেশে ধর্ম্মসংস্কারের সূত্রপাত হইয়া "হোস্সো"নামক অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হিয়ঙ্গ-থ্সাঙ্গের নিকট জ্ঞানশিক্ষার জন্য যাপান হইতেও ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ উপনীত হইতেন। যাপানী শিষ্যগণের মধ্যে দোশো-নামক শ্রমণ হিয়ঙ্গের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, ৬৭৭ খৃষ্টাব্দে

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং কোরিয়া হইতে যাপানদ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও, কালে ভারতবর্ষের বসুবন্ধুর শিক্ষাই সে রাজ্যে ধর্ম্মসংস্কারসাধনের সূত্রপাত করিয়াছিল। তজ্জন্য কাকাসু ও কাকুরা ভারতবর্ষকে "ভাবের মাতৃভূমি" বলিয়া শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া, যাপান পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠভাবে আকৃষ্ট হইতেছে। *

প্রার্থনা।

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত-বড় সুযোগটাতে হতভাগ্য কি যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল—শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এম্‌নি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা মনে করি, পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব চেয়ে জাজ্বল্যমান আমি সব চেয়ে কি চাই, তাহাই বুঝি সব চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট —কিন্তু সেটা ভ্রম। আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট্ ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে সর্ব্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব চেয়ে সত্য ইচ্ছা, নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্য্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয় কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কি, আমার মধ্যে যে

* And now in spite of the separation of ages, Japan is drawn closer to the motherland of thought.—*Ideals of the East*.

একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কি, তাহার গতি কোন্ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?'

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কি, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমত হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয় ত ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কি প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এম্নি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কি চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কি, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কি বলেন। তাঁহারা বলেন, একটি-মাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবীরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও! হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর!

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরো বৃথা। আমরা যখন সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনি এ প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু তবু এখনো প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে, নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে, আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কি, তাহা অনেকসময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিকগে জানিতে হয়। জগতেশ্বর মহাপুরুষেরা আমা

দিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কি আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা!

তখন আরো একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার সুগোচর, যাহারা কেবলি আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্ত্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলি আমার চেতনার অন্তরালবর্ত্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়—এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মত তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন—সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয়—অন্নবস্ত্রধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই-পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য, প্রতিভাসাধ্য কর্ম্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম্ম। ইহা আর-কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার, তাহা আমাদের প্রার্থনার

বহুপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ,—পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না পাওয়া, এবং অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—আবিরাবীর্ম্ম এধি! হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও!—তুমি ত স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য্য ত আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারি কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়,—আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কি চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড় বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ-আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোট-বড় সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড় ইচ্ছা, এই মর্ম্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধন-মান-অর্জ্জন সম্বন্ধেই খাটে, তাহা নহে—আমাদের বড় বড় চেষ্টাসম্বন্ধে আরো বেশি করিয়াই খাটে!

যেমন দেশহিতৈষা। এ প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য, পরম ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে, আলোককে, অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে, সার্থ-

কতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলি মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে, এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে,—সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্ম মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা, তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে,—ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী—বিষয়ানুরাগই হোক আর দেশানুরাগই হোক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে—"বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল; ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

ত্যাগস্বীকার ও তপশ্চরণই যে মহৎ লক্ষ্যের প্রমাণ, তাহা নহে। কৃপণের মত ত্যাগস্বীকার ও তপস্যা কাহার আছে? কিন্তু তাহাতে কেবল টাকাই সঞ্চিত হয়—মনুষ্যত্ব নহে, সার্থকতা নহে। ইংলণ্ড এক-কালে আর্ত্তজাতির সহায় ছিল, দাসত্বের বিরোধী ছিল, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য আজিকার ন্যায় এত অধিক ছিল না—আজ সেই ইংলণ্ড চীনকে আফিম গেলাইতেছে, ভারতবর্ষকে মদ ধরাইতেছে, নিরস্ত্র তিব্বতের নিষ্কলঙ্ক তুষারমণ্ডপ নিরীহমানবরক্তে কলঙ্কিত করিতেছে—ইংলণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এই অধঃপতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল কি? ঐশ্বর্য্যনাশই কি একমাত্র পতন, অনিষ্ট ঘটাইবার ক্ষমতাই কি একমাত্র ক্ষমতা? আমরাও কি এই কথাই বলিব?

জর্ম্মণি যখন জ্ঞানীদের তপোভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, যখন হর্ডর্, লেসিঙ্, গেটে, শিলর্, কাণ্ট্, হেগেলের অভ্যুদয়ে সমস্ত দেশ আলোকিত হইয়াছিল, তখন দরিদ্র জর্ম্মণির এত প্রতাপ ছিল না, তখন তাহার পোলিটিকাল্ অবস্থা হীন ছিল, সেই জর্ম্মণি আজ তপস্যার আসনে সম্রাটের মহার্ঘ সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে, ছুরিছোরায় আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ তাহার জ্যোতিষ্কলোক ম্লান, তাহার তপস্যা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত, তাহার ক্ষুধা সর্ব্বগ্রাসী, আজ সে নির্ম্মম;—অল্পদিন হইল, সে চীনে যে বীভৎস আচরণ করিয়াছে, তাহাতে তৈমুর-জঙ্গিসের বিপুল অপযশ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে—আমরাও কি ইহাকে উন্নতি বলিব? বিস্তারই কি উন্নতি, মেদবৃদ্ধিই কি মানুষের সার্থকতা?

য়ুরোপ ভুলিতেছে মানুষের যথার্থ প্রার্থনা কি—আমরা য়ুরোপের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছি, আমরাও যেন না ভুলি!—মাতালের দ্বারস্থ যে অনুচর দুঃখভোগ করিতেছে, সে যেন

অন্ততঃ এ কথাটা স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, মত্ততার অবাধ স্বাধীনতাই জীবনের শ্রেয় নহে। যে দরিদ্র হতভাগ্য, ধনী মাতালের পাশে দাঁড়াইয়া, তাহার মদের বোতলটাকেই লোভ করিতে শিখিতেছে, ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করুন্!

বেদান্তের প্রথম কথা।

বেদান্ত শুদ্ধ যে একটা দার্শনিক বাদানুবাদ, তাহা নহে। সমগ্র হিন্দুজাতি বেদান্তের দ্বারা পরিচালিত। হিন্দুর যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম, হিন্দুর সাধন-ভজন-ধর্ম্ম, হিন্দুর রাজনীতি, সমাজনীতি, চতুরাশ্রম ও চতুর্ব্বর্ণবিধি—সমস্তই বেদান্তপ্রতিপাদিত শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানের উপরে সংস্থাপিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি অদ্বৈতামৃতরসে পরিপুষ্ট হইয়াছে। সম্পদে-বিপদে প্রতিষ্ঠা ও বিপ্লবে অদ্বৈতমুখীন-নিষ্কামধর্ম্ম-পালনে হিন্দুত্ব মরণকে অতিক্রম করিয়াছে। কত-না সভ্যজাতি কালগর্ভে বিলীন হইল, কিন্তু হিন্দু অমর- কেন না, বেদান্তরস তাহার অস্থিমজ্জাকে সততই স্নিগ্ধ করিতেছে। হিন্দুর দর্শনে ও ধর্ম্মে, সাহিত্যে ও বিধিব্যবস্থায় বেদান্ত কিরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, তাহার সম্যক্ বোধ আবশ্যক। বেদান্তবিজ্ঞানের এই ধারাবাহিক ব্যবহারসঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম না হইলে কোন ফল হয় না—কেবল বাগ্বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় মাত্র। আমি এই প্রবন্ধে বেদান্তের মূলকথা স্থূলত ব্যাখ্যা করিব। এই ব্যাখ্যা পরে যাহাতে ব্যবহারোপযোগী হয়, সেই দিকে আমার লক্ষ্য রহিল।

বেদান্তবিজ্ঞানের আরম্ভ অজ্ঞানে ও পর্য্যবসান জ্ঞানে।

নৈয়ায়িকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক (negative) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত একটি ঘোর প্রমাদ। অজ্ঞান জ্ঞানের বিরোধী। কিন্তু জ্ঞান ভাবপদার্থ (positive)। আত্যন্তিক অভাব কি কখন ভাবের বিরোধী হইতে পারে। যাহা একান্তই নাই, তাহা আবার কি করিয়া বিরোধ ঘটাইবে। বৈদান্তিকেরা অজ্ঞানকে অভাবাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন না। সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারগ্রন্থে অজ্ঞানকে—"জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপম্"—বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞান আংশিক-জ্ঞানরূপেই দৃষ্ট হয়। যখন কেহ বলে, 'আমি অজ্ঞান, আমি জানি না', তখন সে তাহার আংশিক জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। 'কিঞ্চিৎ জানি, কিঞ্চিৎ জানি না'—ইহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে গেলে, 'আমি অজ্ঞান'—এইরূপ বলিতে হয়। মৃত ব্যক্তিকে অজ্ঞান বলা যায় না, কিন্তু মূর্চ্ছিত ব্যক্তি অজ্ঞান হইয়াছে-এইরূপ বলা হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, মূর্চ্ছাকালে জ্ঞান

একান্ত নষ্ট হয় না, কিন্তু সুপ্তভাবে সূক্ষ্মাকারে থাকে। অজ্ঞান জ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব নহে। উহা বস্তুসম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান উৎপন্ন করে। পরে দর্শিত হইবে যে, আংশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি বা ভ্রম উৎপন্ন করে। তজ্জন্যই আংশিক জ্ঞান অজ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানের বিরোধী।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিরোধকে একত্বে পর্য্যবসিত করা। তজ্জন্য বিরোধকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র সূচিত হয়। বিরুদ্ধধর্ম্মীর বিরোধের অপবাদ করিয়া অভেদভাবের প্রতিষ্ঠাকে অপবাদন্যায় (dialectic) বলে। এই অপবাদরীতি অবলম্বনে বেদান্তবিজ্ঞান ভেদবহুলতাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর একতায় লইয়া যায়—অবশেষে ভূমার অনন্ত অধিকারে সমস্ত দ্বৈতবিরোধের তিরোধান নিষ্পন্ন করে।

পাশ্চাত্য নবীন ন্যায়ের আরম্ভ সদসদ্‌বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত; সৎ (being) অসতের (non-beingএর) বিরোধী—এই সিদ্ধান্তটি উহার মূলে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সদসতের বিরোধ কাল্পনিক। প্রথমত সৎ কিংস্বরূপ, তাহা আমার জানা প্রয়োজন। আমার জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া যদি অস্তিকে ধরিতে যাই, তাহা হইলে শূন্যে লম্ফপ্রদান করা হয়। দ্বিতীয়ত অসৎ—যাহা সম্পূর্ণ অভাবময়—ন্যায়ের তর্কজালবিস্তারের একটা কাল্পনিক উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এপ্রকার শূন্যতা বিরোধ তুলিতে পারে না। তজ্জন্য জ্ঞানবিরোধী দ্বন্দসঙ্কুল অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান (experience) অদ্বৈতসিদ্ধির উপযোগী সোপান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞান আংশিকজ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়। আবার আংশিক জ্ঞান বিপরীতবুদ্ধি উৎপন্ন করে। "অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ" —যে বস্তু যাহা নয়, উহাকে তাহাই মনে করা বিপরীতবুদ্ধি। ইহার অপর সংজ্ঞা ভ্রম বা অধ্যাস। আমাদের সমস্ত ধারণা এই ভ্রমাত্মক-অধ্যাস-রচিত। তবে আমি যে লেখনীর দ্বারা লিখিতেছি, তাহা লেখনী নহে, কিন্তু সর্প—এতদ্রূপ ভ্রম নহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে কখন প্রবঞ্চিত করে না। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ কি এস্থলে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া ভ্রমে নিক্ষেপ করে? —কদাচ নহে। রজ্জুতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ পঞ্চবিষয়ই বর্ত্তমান। যদি আমি নেত্রত্বগাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা রজ্জুকে পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে রজ্জু রজ্জুরূপেই প্রতীত হইত, সর্পরূপে প্রকাশ পাইত না। অন্ধকারে চক্ষুর যতদূর কার্য্য করা সাধ্য, ততদূর করিয়াছে;—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাইয়া রজ্জুর সর্পসাদৃশ্যকে সর্পদৃশ্যে পরিণত করিয়াছে। যাহা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্ণেয়, তাহাকে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। তবে যদি কেহ বলে যে, সকল ইন্দ্রিয়গুলি মিলিয়া প্রতারণা করিতে পারে, সে বলার কোন অর্থ নাই। নিখিল মানবকুল যদি প্রবঞ্চক হয়, তাহা হইলে বঞ্চনাকেই সাধুতা বলিতে হইবে। অধ্যাসের অর্থ ইহা নয় যে, যখন একটি অশ্ব দৃষ্ট হয়, সেটি অশ্ব নহে, কিন্তু গর্দ্দভ বা অন্য কোন জন্তু, অথবা তাহা বস্তুপরিনিষ্ঠিত নহে, কেবল কল্পনা। কোন

বস্তু আমার ইন্দ্রিয়গোচর হইলে জ্ঞানের প্রক্রিয়া বা বিষয়বিষয়ীর সামঞ্জস্যে কোন ত্রুটি বা প্রতারণা ঘটে না। কিন্তু যেক্ষণে আমি ঐ বস্তুকে কোন এক ব্যতিরিক্ত আত্মসঙ্গত পদার্থ বলিয়া ধারণা করি, তৎক্ষণেই আমার অধ্যাসভ্রম হয়। যাহা অসঙ্গত (contradictory), তাহাকে সঙ্গত (consistent) মনে করা—যাহা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ, তাহাকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ধারণা করা—যাহা প্রাতিভাসিক (appearance), তাহাকে পারমার্থিক (real) বিবেচনা করা—এতদ্রূপ বিপরীতবুদ্ধিকে অধ্যাস কহে। অন্ধকারে রজ্জু সর্পবৎ প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত সর্পের নিজের কোন সঙ্গতি বা প্রতিষ্ঠা নাই। তথাপি রজ্জুর আত্মসঙ্গতি বা আত্মপ্রতিষ্ঠা অনাত্ম সর্পে আরোপিত হয়।

অন্ধের হস্তিদর্শনকথায় অধ্যাসের লক্ষণ অতি স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। একদা সাতজন অন্ধ হস্তিতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছিল। কোন বন্ধুকর্তৃক হস্তিসন্নিধানে নীত হইলে তাহাদের মধ্যে একজন হস্তীর কর্ণস্পর্শ করিয়া বলিল—"অহো, হস্তী সূর্পাকার।" দ্বিতীয় অপর একজন শুণ্ডস্পর্শ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সূর্পাকার নহে, সর্পাকার।" তৃতীয় পাদস্পর্শ করিয়া সদর্পে ঘোষণা করিল—"সূর্পও নহে, সর্পও নহে, স্তম্ভ" —ইত্যাদি। অন্ধেরা তাহাদের ইন্দ্রিয়কর্তৃক প্রতারিত হয় নাই। তাহারা কর্ণাদি অবয়বসকলের যাহা পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। তবে ভ্রম কি প্রকারে আসিল। আংশিক জ্ঞানই এই প্রমাদ ঘটাইয়াছে। অবয়বসকলের আত্মস্থিতি নাই, অবয়বী হস্তীরই তাহা আছে। সূর্পরূপ কর্ণ নিজেতেই স্থিত, আধারের অপেক্ষা করে না —এইরূপ ধারণাই ভ্রম। কর্ণেতে হস্তিত্ব-আরোপ, আর অনাত্মে আত্মত্ব-আরোপ, একই কথা। যদি অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি পাইত, তাহা হইলে দেখিত যে, তাহারা তাহাদের সূর্প বা সর্পের আকারপ্রকারগুণক্রিয়াদির সম্বন্ধে ভ্রান্ত হয় নাই, কিন্তু স্বরূপধারণায় তাহাদের অধ্যাসভ্রম হইয়াছে।

বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, আমাদের সমস্ত ধারণা (logical judgment) এই অধ্যাসরূপ-ভ্রম-বিজড়িত। আমি সূর্য্য দেখিলাম, আর আমার ধারণা হইল যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র,—স্বপ্রতিষ্ঠ,—আপনাতে আপনি থাকিতে পারে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতেরা আমার অজ্ঞানকে সংশোধিত করিয়া বলিলেন যে, সূর্য্য স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু সৌরজগতের কেন্দ্র। যদ্রূপ গ্রহতারকাসকল তাহাদের স্থিতির জন্য সূর্য্যের উপর নির্ভর করে, তদ্রূপ সূর্য্যও স্বকীয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের অপেক্ষা করে। এই তত্ত্ব শিখিয়া ও জানিয়াও সূর্য্যের স্বাতন্ত্র্যের সংস্কার যায় না। জ্যোতিষকে অগ্রাহ্য করিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনে করা যায় যে, সূর্য্য চিরদিন আকাশে একাকী সম্বন্ধনিরপেক্ষ হইয়া দোদুল্যমান থাকিতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সংস্কার যদি বিশেষরূপ পরিমার্জ্জিত হয়, তাহা হইলে সৌরজগৎকে ছাড়িয়া সূর্য্যের ধারণা না হইতে পারে, কিন্তু সৌরজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা আরোপ না করিয়া সূর্য্যের ধারণা হইবে না। অশিক্ষিত ব্যক্তি অনাত্ম সূর্য্যে

আত্মত্ব আরোপ করে। শিক্ষিত ব্যক্তি সৌরজগতে আত্মস্থিতি আরোপ করিয়া সূর্য্যের ধারণা করে।

সকল ধারণার মূলে দেশ ও কাল বর্ত্তমান। দেশ ও কালের ন্যায় ভ্রমাত্মক আর কিছুই নাই। আমি একটি ত্রিভুজ মনে করিলাম। ত্রিভুজটিকে আত্মসঙ্গতি দিয়া কতই চিত্রবিচিত্র করিলাম। অবশেষে দেখিলাম যে, ত্রিভুজটির কোন আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই। উহা এক বৃহত্তর ত্রিভুজ বা বহুভুজের অংশরূপে গৃহীত না হইলে একেবারেই তিষ্ঠিতে পারে না। বৃহত্তর ত্রিভুজের দশাও সেইরূপ। কাহারও আত্মস্থিতি নাই। তবে প্রতিষ্ঠা কোথায়? গত্যন্তর না দেখিয়া আমরা এক স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ বা মহাদেশের কল্পনা করি ও সমস্ত আংশিক দেশ তাহারই অন্তর্গত করিয়া দেখি। এইরূপ অসঙ্গতির আশ্রয়গ্রহণ না করিলে আমরা কোনপ্রকার ধারণা করিতে অক্ষম। জানি যে, দেশই হউক আর মহাদেশই হউক, যাহা অংশী, তাহা নিজে একটি অংশ—স্বতন্ত্র বা স্বস্থ হইতে পারে না। ইহা জানিয়াশুনিয়া আমরা ভ্রমের পূজা করি, কেন না, আমরা নিরুপায়। আমাদের কালসম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ ভ্রমমূলক। অধ্যাসমূলক সংস্কারের এত প্রবলতা যে, আমরা ইতরেতরাশ্রিত পদার্থসমূহকে বিচারের দ্বারা অনাত্ম ও অপ্রতিষ্ঠ জানিয়াও তাহাদিগকে আত্মস্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ বলিয়া ব্যবহার করি। এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলান্বিত বিশ্বে কোন বস্তু ব্যতিরিক্ত (individual) আত্মবস্তু নহে। আর অনাত্মের সমবায়ে আত্মস্থিতি গঠিত হইতে পারে না, তবে আমরা মহান্ অনবস্থাগর্ত্তে ডুবিয়া যাইবার ভয়ে অংশে পূর্ণতা আরোপ করিয়া ব্যবহারোপলক্ষ্যে বস্তুসকলের আত্মসঙ্গতি সৃষ্টি করি।

অজ্ঞানের কতক পরিচয় পাওয়া গেল। এখন জ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক। জ্ঞানবস্তু পূর্ণ ও সর্ব্বময়। কিছুই জ্ঞানের বাহিরে থাকিতে পারে না। যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান আংশিক জ্ঞান হইয়া যাইবে। জ্ঞানবস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একাকার। জ্ঞান শুদ্ধ জানা নয়, কিন্তু জানাজানির ভূমানন্দ।

পাশ্চাত্য নবীন দার্শনিকেরা জ্ঞানসম্বন্ধে এক ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জ্ঞেয় (object) ও জ্ঞাতার (subjectএর) মুখামুখি স্থিতি (opposition) হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু ইহা আংশিক জ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান নহে। ঘটপটাদি অনাত্মবস্তু যতটা আত্মস্থ হয়, ততটা জ্ঞেয়; যতটা আত্মস্থ না হয়, ততটা অজ্ঞেয়। এইজন্য দ্বৈতজ্ঞান আংশিক জ্ঞান। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানে দ্বৈতের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবস্তুতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মুখামুখি স্থিতি হইতে পারে না। যদি হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যতিরিক্ততা ঘটিবে ও জ্ঞান আংশিক জ্ঞানে পরিণত হইবে। আংশিক জ্ঞান (experience) ও জ্ঞানের (knowledgeএর) ভেদ বুঝিতে না পারায় পাশ্চাত্যদেশে অদ্বৈতের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। একপ্রকার প্রতীচ্য অদ্বৈতবাদ আছে, তাহা জ্ঞানে দ্বৈত আশঙ্কা করে এবং আত্মা চিদানন্দের অতীত কোন অজ্ঞেয় বস্তু, এইরূপ সিদ্ধান্ত করে। জ্ঞানের শুদ্ধাদ্বৈতস্বরূপ না জানায়

এই প্রমাদের উৎপত্তি হইয়াছে। সমগ্র বেদান্তের ইহাই নিষ্পত্তি যে, চিদানন্দই চরম-বস্তু। আচার্য্যদিগেরও এই সিদ্ধান্ত। গৌড়-পাদ আচার্য্য জ্ঞানকে তুরীয় অবস্থা বলিয়া-ছেন। শঙ্করাচার্য্যের ত কথাই নাই। সদা-নন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে ঐরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চদশীকার বলেন যে, স্বয়ম্প্রভা সংবিৎই পরমাত্মা।

জ্ঞানাতীত বা জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তু থাকিতে পারে না। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের পূর্ণ সমন্বয়ই জ্ঞান। জ্ঞান দ্বৈতভেদের (differentiationএর) অপেক্ষা রাখে না। তাহার অন্তরেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আদান-প্রদান। জ্ঞান আত্মস্থিত, স্বপ্রতিষ্ঠ, আত্ম-সঙ্গত। জ্ঞান পূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, অসঙ্গ, আত্মরত।

জ্ঞানবস্তুর অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আংশিক জ্ঞান অসম্ভব। আংশিক জ্ঞান পূর্ণজ্ঞানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ণতার দিকেই ধাবিত হয়। আমরা আমাদের সকল ধারণাতেই জ্ঞানময় আত্মত্বকে বরণ করি। অনাত্মে আত্মসঙ্গতি আরোপ না করিলে কোন পদা-র্থের বোধ হইতে পারে না। অংশের আরম্ভ পূর্ণত্বে ও শেষ পূর্ণত্বে। সর্ব্বময় জ্ঞান না থাকিলে অংশময় ভ্রম বা অধ্যাস কল্পনায় আসে না। দ্বৈতবিশিষ্ট আংশিক জ্ঞান অবশিষ্ট অদ্বৈতজ্ঞানকে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করে।

এই বিশ্বসংসার জ্ঞানেরই রঙ্গভূমি—জানাজানির এক বৃহৎ আড়ম্বর। ঐ যে শিশু অর্দ্ধস্তিমিতলোচনে স্তন্যপান করিতেছে, আর জননীকে সুখস্পর্শে বিহ্বল করিতেছে—ঐ যে পেটুক পায়সসিক্ত সৃক্কণী লেহন করি-তেছে—ঐ যেবিলাসী স্রক্‌চন্দনাদি-সম্ভোগ-লালসায় আকুল হইয়াছে—ঐ যে কঙ্কালসার সমাধিমগ্ন যোগী ভূমানন্দে আত্মহারা হইতে প্রয়াস করিতেছে—এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান-সাগরের তরঙ্গভঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হর্ষ-শোক, প্রীতি-দ্বেষ, ধর্ম্ম-নীতি, বিধি-ব্যবস্থা, শীল-সভ্যতা—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক সুনিয়ত মিলনচেষ্টামাত্র। অচেতন জড়ও জ্ঞানের অন্তর্গত। বেদান্ত বলেন যে, জড় অস্তিমাত্র নহে, উহা ভাতি—অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া জ্ঞাতাকে সদাই আহ্বান করিতেছে। জড় জ্ঞানপক্ষে একেবারে নিষ্ক্রিয় নহে। জ্ঞাতাই নিজবলে জড়কে জানে, কিন্তু জড় জ্ঞানপ্রক্রিয়ায় কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব করে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। ঐ যে সূর্য্যচন্দ্রতারা জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে, উহা কেবল জড়ময় ক্রিয়া নহে—উহা পূর্ণজ্ঞান, জ্ঞেয়রূপে স্ফুরিত হইয়া জ্ঞাতৃপক্ষকে আমন্ত্রণ করিতেছে। যদি আম-ন্ত্রণ না করিয়া জ্ঞাতৃত্বের প্রতিকূল আচরণ করিত, সাধ্য কি যে, কেহ তাহাদিগকে জ্ঞানের অধিকারভুক্ত করে। তরঙ্গিত নদী বা মলয়সমীরণ বা শ্যামল উপবন প্রিয়জনের ন্যায় আদৃত, গৃহীত ও অধিকৃত হইতে ধীরে ধীরে ইঙ্গিতভঙ্গি প্রদর্শন করে বলিয়াই আমি উহাদের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারি। আমি একটি বস্তু জানি, অথচ উহা আমার জ্ঞানাধিকার স্বীকার করে না—ইহা অস-ম্ভব। চেতন হউক বা অচেতন হউক, সকল পদার্থই ভাতিরূপ—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়স্বরূপে জ্ঞানবস্তুর প্রকাশ। জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে আক-র্ষণ করে, জ্ঞেয় জ্ঞাতাকে আহ্বান করে ও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। কোন এক

পক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে জ্ঞানের স্ফুরণ হইত না। কেহ বলিতে পারেন যে, তপ্ত বালুকারাশি বা পূতিগন্ধ জ্ঞাতাকে আমন্ত্রণ করিবার পরিবর্ত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াই থাকে। তবে সেই ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসর কিরূপ হয়? এখানেও জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের আমন্ত্রণ ও আদানপ্রদান আছে। জ্ঞানের নিষ্পত্তি হইয়া গেলে পর অন্যান্য কারণে প্রত্যাখ্যান ঘটে। জ্ঞানক্রিয়ার সমাধান না হইলে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মিলন না হইলে, বিরক্তি বা প্রীতির স্ফুরণ হইতে পারে না।

এই যে বৃহৎ জগদ্ব্যাপার, ইহা জ্ঞানবস্তুরই উদ্বেলন—জানাজানির বিচিত্র লীলা—জ্ঞানজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের পূর্ণসমন্বয়। এই পূর্ণতাই বিষয়বিষয়িরূপ-দ্বৈতভেদ-ক্রমে প্রতিভাত হয়। অন্ধকারে রজ্জুতে যেরূপ সর্প বা যষ্টির ভ্রম হয়, তদ্রূপ অদ্বৈত জ্ঞানবস্তুতে অজ্ঞান-প্রভাবে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদবিলসিত বহুত্বের ভাণ হয়। ব্যাবহারিক রজ্জু কেবল ছায়াময় সর্প বা যষ্টি প্রসব করে। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানরজ্জু—যাহাতে বিশ্ব আলম্বিত—অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত হইয়া ঈশ্বরদেব যক্ষ-রক্ষ, সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, গিরি-নদী-সাগর-বন, মন-বুদ্ধি-চেতনা-বেদনা, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-পাপ-পুণ্য, অহংপ্রত্যয়—ইত্যেবম্প্রকার অস্মদ্-যুষ্মদ্দ্বৈতভাবে (duality of subject and objectএ) প্রতিভাত হয়। এই দ্বৈতপ্রকাশে যে শীতোষ্ণসুখদুঃখাদির দ্বন্দবোধ, তাহা স্বপ্নকল্পনা নহে, কিন্তু যথার্থই বস্তুপরি-নিষ্ঠিত। তথাপি সর্পের সহিত রজ্জুর যে সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক সৃষ্টির সহিত পরম-জ্ঞানের সেই সম্বন্ধ। রজ্জু যদ্রূপ পরিণাম-প্রাপ্ত না হইয়াও যষ্টি বা সর্পরূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান অবিকারী থাকিয়াও বহু-রূপে ব্যাকৃত হয়। উদয়াস্তহীনা স্বয়ম্প্রভা সংবিৎ অখণ্ড ও সর্ব্বময়ী, কিন্তু আংশিক জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডরূপে গৃহীত হইলে ঈশ্বর-রূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করেন, অমররূপে স্বর্গভোগ করেন, নররূপে মর্ত্ত্যে বিচরণ করেন, সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, চন্দ্র হইয়া মনোহরণ করেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—নিশ্চয়ই এই সমস্তই ব্রহ্ম। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। সেই একই বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। পূর্ণজ্ঞানময় আত্মা ভিন্ন আমাদের অনুভূতির অন্য কোন বিষয় নাই। তজ্জন্য খণ্ডপদার্থে পূর্ণতা আরোপ না করিয়া আমাদের কোনপ্রকার ধারণা হইতে পারে না। উচ্চ হইতে নিম্নে দেখিলে পূর্ণে অংশের অধ্যারোপ হয়, আর নিম্নদেশ হইতে ঊর্দ্ধে দেখিলে অংশে পূর্ণের অধ্যাস হয়।

অহো কি মহদ্বস্তু! যাহা অংশতঃ উপলব্ধ হইলে কোটিকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ধারণ করে, তাহার মহত্ত্বের কে পরিমাণ করিবে? অজ্ঞানপ্রসূত যষ্টি বা সর্পের যোজনায় রজ্জু হয় না। কিন্তু রজ্জুতত্ত্বে যষ্টি ও সর্পদৃশ্যের কোন এক সাদৃশ্যসমন্বয় আছে, তাহা না হইলে রজ্জুতে যষ্টি বা সর্পভ্রম হইত না। চিন্ময় আত্মা সকল যোগবিয়োগের অতীত, কিন্তু যাঁহার গর্ভে এই অনন্তলোকব্যাপী বিরোধবিশালতা সমন্বয়লাভ করে, তাঁহার স্বরূপজ্ঞানে মনবুদ্ধি নিশ্চয়ই বিলীন হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অজ্ঞান—

যাহা আংশিকজ্ঞানরূপে দৃষ্ট হয়—তাহা কোথা হইতে আসিল?

যথায় গভীরতা, যথায় আনন্দ আছে, তথায় উপচয় আছে, উচ্ছ্বাস আছে। লৌকিক ব্যবহারে ইহা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। প্রেমিকের হৃদয় প্রিয়বস্তুর দ্বারায় পূর্ণ। সে মিলনানন্দে মত্ত, তাহার অপর সুখসম্ভোগের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সে যদি তাহার প্রিয়জনের একটি ছবি পায়, নিশ্চয়ই তাহার প্রীতি ও পুলকের সঞ্চার হয়। তাহার ঐ ছবির কোন প্রয়োজন ছিল না। দশসহস্র ঐপ্রকার ছবি আনীত ও অপনীত হইতে পারে, তথাপি তাহার প্রিয়জনমিলনজন্য সুখের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। এইপ্রকার অপ্রয়োজনসত্বেও ঐ ছবি তাহার প্রীতি ও আদরের বস্তু। প্রতিরূপে প্রীতি স্বরূপানন্দের উপচয়মাত্র। তাহা আংশিক ভাবে পূর্ণপ্রেমকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই অংশকে কোটিগুণ করিলে পূর্ণতালাভ করা যায় না। অগণন প্রতিরূপের প্রতি অজস্র উচ্ছ্বাস স্বরূপপ্রেমের গভীরতায় লুপ্ত হইয়া যায়, কারণ খণ্ডপ্রীতি প্রেমের পূর্ণতাপক্ষে থাকা না থাকা দুইই সমান। এই লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝা যায়, গভীরতার উপচয় কাহাকে বলে। আনন্দের উপচয় অনেকস্থলে দৃষ্ট হয়। সচরাচর আমরা প্রয়োজনানুসারে সাবধানে ব্যয় করি। কিন্তু উৎসবের দিনে আমরা প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া বাহুল্যসম্ভোগে প্রবৃত্ত হই। অন্নব্যঞ্জন, পিষ্টকপায়স ও সুস্বাদু ফলের ফেলাফেলিছড়াছড়ি। এই প্রচুর আয়োজন হইতে দুইএকটা লেহ্যপের অপসারিত করিলে উৎসবের কোন অঙ্গহানি হয় না। এই পৃথিবীতে আমাদের উদরপূর্ত্তি ও বাসনার তৃপ্তির জন্য এত আয়োজন যে, প্রয়োজনের তালিকায় তাহা গণনা করা চলে না। যদি কপাটভাঙা আম বা লিচুফল বঙ্গদেশে না থাকিত, বঙ্গবাসীর সুখভোগের বোধ হয় বিশেষ কোন বিঘ্ন হইত না। আমরা প্রবৃত্তির দাস, তজ্জন্য এই বাহুল্যলীলার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

চিদ্বস্তুর জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদক্রমে যে আংশিক প্রকাশ হয়, তাহা অনন্ত গভীরতার উপচয়। কিন্তু ঐ উপচিত আংশিক প্রকাশ বিপরীতবুদ্ধি বা অধ্যাস ব্যতীত হইতে পারে না। হস্তীর জ্ঞান না থাকিলে শুণ্ডকে শুণ্ড বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু ঐ অনাত্ম আংশিক অবয়বটিকে আত্মস্থিত সর্পতুল্য কোন পদার্থ বলিয়া ধারণা হয়। স্বরূপের ভেদবহুল প্রতিভাতি অজ্ঞানপ্রভাবেই ঘটিতে পারে, সুতরাং উপচয় বা আংশিক প্রকাশ স্বীকার করিলে অজ্ঞানশক্তি স্বীকার করিতে হয়। পূর্ণবস্তুসম্বন্ধে যদি পূর্ণজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহার বিকাশবহুত্বের সম্ভাবনা থাকে না। অজ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানই কেবল অদ্বৈতকে ঐশ্বর্য্যবিলসিত করিয়া প্রতিভাত করে। এই অজ্ঞান জ্ঞানের আনুষঙ্গিক। অংশ যেরূপ পূর্ণতার মধ্যে বাস করে, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ অজ্ঞান জ্ঞানের সঙ্গী। কিন্তু ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণতা অংশনিরপেক্ষ—যোজনা করিয়া পাওয়া যায় না। আমি একটি বৃক্ষকে অংশ করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে পূর্ণতা আরোপ করিয়া আমি বৃক্ষ-

বস্তুর ধারণা করি, তাহা অংশযোজনায় প্রতিষ্ঠিত নহে। জ্ঞানবস্তু আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মারাম, আত্মক্রীড়। তাহার কোন প্রয়োজন বা আকাঙ্ক্ষা বা অভাব নাই। এই নিষ্প্রয়োজন নিরাকাঙ্ক্ষ পূর্ণতা আছে বলিয়াই উপচয়বাহুল্য সম্ভবে। যাহার প্রয়োজন আছে—অভাব আছে, তাহা অপূর্ণ, তাহার আবার উপচয় কি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত প্রমাদপূর্ণ। তাহা অদ্বৈতকে বস্তুগত দ্বৈতভেদের অপেক্ষী বলিয়া নির্ণয় করে ও জগদ্ব্যাপার যে অজ্ঞান-প্রসূত, এই শ্রৌত রাদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে।

সংক্ষেপে বেদান্তের প্রথম কথা বলিলাম। কিরূপে জ্ঞান ত্রিগুণাত্মক-অজ্ঞান-প্রভাবে ত্রিপাদে বিভক্ত হয় ও কিরূপে জ্ঞানাজ্ঞানের বিরোধসোপান অপবাদচ্ছলে আরোহণ করিয়া তুরীয়ানন্দের একত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহা দ্বিতীয় কথায় যথাসময়ে দেখাইব।

শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

য়ুনিভার্সিটি বিল্।

য়ুনিভার্সিটি বিল্ পাস্ হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তব্ধ হইয়াছি। যতক্ষণ পাস্ হয় নাই, ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম, যেন আমাদের মহা অনর্থপাতের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাস্ হইয়া গেল বলিয়াই অম্‌নি সুনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেশের সত্যই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবমেণ্ট্ আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকারচেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কি? আন্দোলনসভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্ব্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্ত্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেইপরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে! বেদনা যদি অকপট হয়, শঙ্কা যদি ভাণ না হয়, তবে আজ আমরা চুপচাপ করিয়া বসিয়া নিজের দুই গালে চুণকালী লেপিতেছি!

দেশহিতৈষীরা বলেন—আমাদের কি সাধ্য আছে, আমরা কি করিতে পারি!

আমরা যদি কিছুই না করিতে পারি, তবে আমরা যেন কাহারো কাছে কিছুই প্রত্যাশা না করি! এত বড় অক্ষম যাহারা, তাহাদের মুখে কাহারো কাছে কোনো দাবীই শোভা পায় না!

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্নতন্ন করিয়া অনেক আলো-

চনা হইয়া গেছে, সেগুলির পুনরুক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটামুটি দুইএকটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হইলে বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা যাইতে পারে, সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া দুরাশাকে খর্ব্ব করিতেই হয়। লর্ড কার্জ্জন্ ঠিক বলিয়াছেন, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ খুব ভাল—কিন্তু ভারতবন্ধু লাট্‌সাহেব ত বিলাতের সব ভাল আমাদিগকে দিবার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালই মানাইবে কেন?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো, সে-ই তাহার সর্ব্বোত্তম ভালো,—তাহার চেয়ে ভালো আর হইতেই পারে না—অন্যের ভালোর প্রতি লোভ করা বৃথা।

বিলাতী য়ুনিভার্সিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবর্দস্ত শাসনকর্ত্তার আইনের জোরে একরাত্রে পূর্ণ-পরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আমাদের য়ুনিভার্সিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল—স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে খাটিতে পারে না।

সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের য়ুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাঙ্গ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না—এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি—আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরাজের কাছ হইতে আমরা কি পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কি আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কি আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলোয়ে, টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে—বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারো যৎসামান্য আমাদের! রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্ত্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়, তাহার মজুরের কার্য্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিষ যথার্থ আমাদের, তাহা কম ভাল হইলেও, তাহার ত্রুটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

যে বিদ্যা পুঁথিগত,—যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেম্‌নি যে শিক্ষাদান-প্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত, তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেম্‌নি নিষ্ফল। দেশের বিদ্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই বিদ্যাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেণ্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভাল য়ুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্র্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিদ্যাকে অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। আমাদের সমাজ শিক্ষাকে সুলভ করিয়া রাখিয়াছিল—দেশের উচ্চনীচ সকল স্তরেই শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সমস্ত স্বাভাবিক প্রণালী ইংরাজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল—এমন কি, দেশে রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ, কথকতা-যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োন্মুখ হইয়া আসিতেছে। এমন সময়ে ইংরাজিশিক্ষাকেও যদি দুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতী সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে লড়াই পর্য্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে।

এই দুঃসাধ্যতা, দুর্লভতা, জটিলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা-ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়, কোনো সভ্যতার মধ্যে যখন সর্ব্ববিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায়, তখন ইহা বুঝিতে হইবে, তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে, তাহার অনেকটারই প্রতিমুহূর্ত্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল্‌আলমসলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমত রাখা যায়, তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় সুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না, তাহাও নহে—কিন্তু সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনি-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্র্য কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মনুষ্যত্বেরও অভাব—কারণ, সেখানে মনুষ্যত্বের সমস্ত উপকরণই চড়াদরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল, কারণ আমাদের সমাজে সুখ-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে, গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে—রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে, দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে,—কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই, সম্পন্নব্যক্তি দাঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারদিকে পাহারা বসাইয়া রাখে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসম্ভ্রম ছিল—ধনীর ঐশ্বর্য্যে তাহার স্বাভাবিক দাবী ছিল, এইজন্য, তাহার অবস্থা যেমনই হোক, সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই—যাঁহারা জাতিভেদ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুখস্থ বুলি আওড়ান্, তাঁহারা এসব কথা ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতী লাট্ আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার

কি? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বসিয়া-বসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না।

আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি, তাহারই জন্য আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল—রাজার উপরে, বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিদ্যাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তখন বিদ্যাশিক্ষা সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিদ্যার পরস্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজপলিসির অনুকূল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকেপ্রকারে খর্ব্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্ব্বপ্রকার আত্মগৌরববোধকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম—আমরা সে কর্ম্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্ম্মের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিসের জোরে?

তা ছাড়া, বিদ্যাজিনিষটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাট্‌সাহেব তাঁহার অক্‌স্‌ফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলি আস্ফালন করিয়াছেন; এ কথা ভুলিয়াছেন যে, সেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই—সুতরাং সেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেখানে বিদ্যাদানের জন্য উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিদ্যালাভের জন্য প্রস্তুত—পরস্পরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রদ্ধার কণ্টক-প্রাচীর নাই, কাজেই সেখানে মনের জিনিষ মনে গিয়া পৌঁছায়। পেড্‌লারের মত লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক,—শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ, তিনি আমাদিগকে কি দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কি লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, সেখানে সুস্পষ্ট বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে; সেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবে সে সম্বন্ধ হইতে শুধু নিষ্ফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্ব্বাপেক্ষা এইজন্যই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিদ্যামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্‌স্‌ফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে, কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধা-শতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মত করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্ব্বিতা বণিক্‌গৃহিণীর মত উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ষুকবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হৃদ্যতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাঞ্ছনা এই যে, গর্ব্বিত দাতা খুব বড় করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে দুইবেলা খোঁটা দেয়—'এত দিলাম তত দিলাম, কিন্তু ফলে কি হইল ?' মা স্তন্যদান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিসাব রাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয়—স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোরুদ্যমান মুখের মধ্যে গুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ খিট্‌খিট্‌ করিতে থাকে—'এত গেলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিনদিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে !'

আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্‌লার সেদিন বলিয়াছেন, আমরা বিজ্ঞানচর্চ্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আনুকূল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না !

অনুগ্রহজীবীদিগকে এই সব কথাই শুনিতে হয়—অথচ আমাদের বলিবার মুখ নাই। বন্দোবস্ত সমস্ত তোমাদেরই হাতে, এবং সে বন্দোবস্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয়, তাহার সমস্ত পাপ আমাদেরই। এদিকে খাতায় টাকার অঙ্কটাও গ্রেট্‌প্রাইমার্‌ অক্ষরে দেখান হইতেছে—যেন এত বিপুল টাকা এত-বড় প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্য জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না—অতএব ইহার "moral" এই—হে অক্ষম, হে অকর্ম্মণ্য, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ্ম পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না !

ইহাতে বিদ্যালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোন জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না—পরের ঘরে জল-তোলা এবং কাঠ-কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে খোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং যাঁহারা খোঁটা দেন, তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায়, এজন্য তাঁহারা ত্রস্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতী সভ্যতা বস্তুত দুরূহ ও দুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশবৎসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিদ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিষ, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চ্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মত সম্পূর্ণ সুযোগ ও আনুকূল্য পাইলে এই ইস্কুলপাঠ আমরা পেড্‌লার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্ব্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্ম্মগত—তাহার পথ নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম—তাহা ইস্কুলের পড়া নহে, তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কালেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীনবুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই।

বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্যই এগুলি স্মরণীয়, তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসম্ভ্রমের জন্য।' পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশ্বাস না জন্মে!

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মসম্মানবোধের উদ্রেক হয়, বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিবে না এবং সেজন্য আমরা যেন ক্ষোভ অনুভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না, সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মূঢ়তা—এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কি, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মত যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া;—অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্যাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিষ করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরঙ্গরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীন-বেশ, তাহার কৃশতা দেখিয়া ধৈর্য্যভ্রষ্ট না হইয়া আশার সহিত, আনন্দের সহিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া, জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্ত্তব্য। ইহাকে যদি দুরাশা বল, তবে কি পরের রুদ্ধদ্বারে জোড়-হস্তে বসিয়া থাকাই আশা পূর্ণ হইবার এক-মাত্র সহজ প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব্ গবর্মেণ্ট্ গিয়া লিবারেল্ গবর্মেণ্টের অভ্যুদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্কচঞ্চু বিস্তারপূর্ব্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবুদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সদুপায়?

ইহাই যদি হয়, তবে আমাদের অদৃষ্টে এখনো অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে—এখনো আমাদের কঠিন শিক্ষা শেষ হয় নাই! তবে আমাদের অবনত পৃষ্ঠের উপর বিধাতার উদ্যত কশা যেন বিশ্রাম না করে!

সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

বঙ্গভাষা বনাম আসামীভাষা।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে আসামপ্রবাসী মার্কিন্ পাদ্রী ব্রন্‌সন্‌সাহেব ও আসামের তাৎকালিক স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ রবিন্‌সন্‌সাহেবের সঙ্গে আসামের স্কুলসমূহে বাংলা এবং আসামী ভাষা ইহাদের কোন্‌টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এই লইয়া গুরুতর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বাদানুবাদের বিবরণ বঙ্গীয় গভর্মেণ্টের ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই আসামের স্কুলসমূহে বাংলা-ভাষা প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; পাদ্রীদল তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন না করিলে বাংলাভাষার অধিকার কখনই বিচ্যুত হইত না,—আসামে এতদিন বঙ্গসাহিত্য ঘরে ঘরে পঠিত হইত এবং এই দুই দেশের সহিত পরস্পরের সম্পর্ক ঘনীভূত হইয়া দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইত।

মার্কিন্ পাদ্রীদলের একটা স্বার্থ ছিল। তাঁহারা আসামবাসীদিগের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিবার জন্য প্রাদেশিকভাষায় কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া দুইটি ছাপাখানার ব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা আসামী-ভাষা শিখাইবার জন্য যে কয়েকটি স্কুল খুলিয়াছিলেন, গভর্মেণ্টের স্থাপিত বিদ্যালয়-সমূহে ও আফিসে বঙ্গভাষার প্রচলন থাকাতে প্রাদেশিকভাষাচর্চ্চা নিরর্থ বুঝিয়া, আসাম-বাসিগণ স্বতই সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে পাঠাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের আয়োজনপত্র সমস্ত পণ্ড হইয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিপদে পড়িয়া তাঁহারা বঙ্গদেশের তাৎকালিক ছোটলাট হ্যালিডেসাহেবের নিকট আসামে বঙ্গভাষার স্থলে আসামীভাষার প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন।

পাদ্রী ব্রন্‌সন্ তাঁহার প্রার্থিত বিষয়ের আনুকূল্যে যতপ্রকার যুক্তি স্বীয় কল্পনায় আসিয়াছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু, স্বীয় উদ্দেশ্য বিশেষরূপে পুষ্ট করিবার জন্য স্বদলস্থ ৫জন পাদ্রীর মন্তব্য আবেদনপত্রে জুড়িয়া দেন। এই পঞ্চ সহচর তারস্বরে তাঁহারই যুক্তিগুলির প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে ইঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তিগুলির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১) আসামীভাষা ও বাংলাভাষা, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা। বাংলাভাষায় লিখিত পুস্তক আসামের সাধারণ লোকেরা বুঝিতে পারে না, এমন কি, একজন বাঙালী ও একজন আসামবাসীকে পরস্পরের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত করিলে তাহারা একের কথা অপরে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

(২) সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রগণ বাংলায় লিখিত পুস্তক আসামীভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তৎপরে মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয়।

(৩) শিক্ষকগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমাদের মার্কিনের খৃষ্টীয় প্রচারসমিতি হইতে যে সকল আসামীভাষায় রচিত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা এতদ্দেশের অধিবাসিগণ অতি সহজেই বুঝিতে পারে, কিন্তু দুইতিনবৎসর রীতিমত না পড়িলে তাহারা বাংলাপুস্তক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

(৪) ইংরেজেরা যেরূপ ফরাসী বা ল্যাটিন পড়ে, আসামের ছাত্রগণও ঠিক সেইভাবে বাংলা পড়িয়া থাকে।

(৫) বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রগণ আসামীভাষায় কথোপকথন এবং চিন্তা করে,—তাহারা মোটেই বাংলাভাষার কোন ধার ধারে না। তাহারা গৃহে আসামীভাষায় কথোপকথন করে,—ধর্ম্মপুস্তকের ব্যাখ্যা শুনিয়া থাকে। নৌকা বাহিবার সময় মাঝিরা আসামীভাষায় গান গাহিয়া যায় এবং কৃষকেরা ফসল কাটিয়া গৃহে ফিরিবার সময় আনন্দে এই ভাষার গানে সান্ধ্যগগন প্লাবিত করে। মোট কথা, আসামীভাষাই তাহাদের মাতৃভাষা—বঙ্গভাষা নহে।

(৬) পরের ভাষায় তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা হইলে তাহারা কখনই জাতীয়জীবনের উন্নতিসাধন করিবার জন্য সমুচিত অনুপ্রাণনা পাইবে না, কৃত্রিম ভাষার দ্বারা শৃঙ্খলিত করিলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

(৭) পাদ্রীগণের মধ্যে সকলেই এবং আনন্দরাম ফোকন প্রভৃতি শিক্ষিত আসামবাসিগণের অধিকাংশ মনে করেন যে, বাংলা এবং আসামী ভাষা এক ভাষা নহে।

(৮) আসামীভাষা কোমল এবং শ্রুতিসুখকর, ইহা উচ্চসাহিত্যগঠনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

(৯) আসামের প্রান্তবর্ত্তী যে সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশ আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির ভাষাকে লিখিতভাষার প্রণালীতে প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব। ভুটিয়া, মিসমি, মিরি, খুম্‌প্তি সিংফো এবং নাগা প্রভৃতি জাতিকে সুসভ্য করিতে হইলে আসামীভাষার সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহারা আসামের সঙ্গে নানাপ্রকারে সংশ্লিষ্ট, এবং পার্ব্বত্য জাতিগণের মধ্যে অনেক লোকের আসামীভাষা জানা আছে। আসামীভাষা অবলম্বন করিলে এই সকল জাতিগণের সঙ্গে সভ্য জাতিগণের চিন্তার আদানপ্রদানের পন্থা সুগম হইবে।

আসামের স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর মিঃ উইলিয়াম্ রবিন্‌সন্‌সাহেব এই সকল যুক্তির অসারতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিগুলিও আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে সঙ্কলিত করিলাম।

(১) আসামের ভাষা ও বঙ্গদেশের ভাষা, দুই ভিন্ন ভাষা নহে। আসামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক অবয়বমাত্র।

(২) উভয় ভাষার প্রায় সমস্ত শব্দগুলি এক প্রকারের—তাহাদের মধ্যে শুধু উচ্চারণগত প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপ প্রভেদ নিজ বাংলার জেলায় জেলায় লক্ষিত হয়,—বিভক্তি এবং ক্রিয়ার প্রভেদের জন্য এক ভাষার শাখাগুলিকে কখনই বিভিন্ন মনে করা উচিত নহে। বাংলার প্রদেশে প্রদেশে

এইরূপ প্রভেদসত্ত্বেও তথাকার সর্ব্বত্র এক বঙ্গভাষাপ্রচলনে কোনপ্রকার উন্নতির ব্যাঘাত হয় নাই, বরং এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের সম্মিলিত চেষ্টার সুবিধা পাইয়া উন্নতির পথ দ্বিগুণিতরূপে সুপ্রসার লাভ করিয়াছে।

(৩) চট্টগ্রামের লোকের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের লোক স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় কথোপকথনের চেষ্টা করিলেও পরস্পরের ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না,—চট্টগ্রামের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের কথার যত প্রভেদ, আসামীভাষার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের কথার তদপেক্ষা বেশী প্রভেদ নাই। প্রাদেশিক চলিতকথার ভাষা (dialect) এবং লিখিতভাষার প্রভেদ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, এইজন্য কথিত প্রয়োগের উপর অতিরিক্তরূপ লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানভাষার দাবী অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। লিঙ্কনশায়ারের কৃষক যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে, তাহার অর্থ ইংরেজী কোন অভিধানে এবং তাহার কোন সূত্র ইংরেজী কোন ব্যাকরণে পাওয়া যাইবে না—অথচ লিঙ্কনশায়ারবাসী বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা পড়িয়া থাকে। তাহাদের কথিতভাষা এইরূপ, যথা—

"Th' okeawut uth Eggshee-bechun. Theyme sum uth granddist karpits has avur an clapt mee een on, an ondur heawfoke cud fo inde ethur harto fur to cet thur shune on um."

ওয়েল্‌স্‌ এবং স্কট্‌লণ্ডের অনেক স্থলের লোকের কথিতভাষা হঠাৎ শুনিলে ইংরেজীভাষার সঙ্গে যে তাহাদের কোনরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহাই বোধ হইবে না,—অথচ ইংরেজীভাষা সেই সেই দেশের বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে?

(৪) বাংলাভাষার সঙ্গে আসামীভাষার যতটা প্রভেদ পাদ্রীগণ কল্পনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ততটা প্রভেদ নাই। বঙ্গীয় লেখকগণ অনেকসময় গৌড়ীয় সাধুভাষায় পুস্তক লিখিয়া থাকেন—তাহা ঠিক সেই দেশের লোকেরাই অনেকস্থলে বুঝিয়া উঠেন না। এতৎসম্বন্ধে ডাক্তার বুকনন্‌ লিখিয়াছেন—"বাংলা-সাধুভাষায় রচিত পুস্তকের ভাষা বাংলার সাধারণ লোকের এক সহস্রের মধ্যে একজন বুঝিতে পারে কি না, সন্দেহ।" এরূপ অবস্থায় সেই ভাষার সঙ্গে কথিত আসামীভাষার তুলনা করিয়া প্রভেদনির্ণয় করা সঙ্গত নহে।

(৫) মার্কিন পাদ্রী ব্রাউন্‌সাহেব উচ্চারণপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আসামীশব্দের যেরূপ বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা কতকপরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুযায়ী হইলেও দেশের চিরাগত প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। পাদ্রীদিগের তালিকা হইতে কয়েকটি বাংলাশব্দ ও আসামীশব্দ উদ্ধৃত করিয়া তুলনার জন্য পাশাপাশি রাখিতেছি!

বাংলা।	আসামী।
কিছু ...	... কিস্যু।
ক্ষমা ...	... খেমা।
বুড়া ...	... বুর্হা।
ধর্ম্ম ...	... ধরম।
পরীক্ষা ...	... পরিখ্যা।
মর্য্যাদা ...	... মর্জ্জদা।
স্থির ...	... থির।

(৬) বাংলাভাষা ক্রমেই ঐশ্বর্য্য-শালিনী হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষিত বহুলোকের প্রযত্নে ইহা ক্রমশ নানাবিষয়ে শ্রীসম্পন্ন হইয়া সভ্যজগতের ভাষাগুলির সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে প্রয়াসী। আসামীভাষায় কোন পুস্তকই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না;—সুতরাং এই উন্নতিশীল সুপ্রসর বঙ্গভাষা শিখিবার সুবিধা হইতে আসামবাসীদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহারা অর্দ্ধশতাব্দীর জন্য পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবে, এবং আর কোনকালে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে কি না, বিশেষ সন্দেহের স্থল।

(৭) বাংলাভাষা বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত আছে। আমি নিজে বহুবার পরিদর্শন করিয়া দেখিয়াছি, আসামবাসী ছাত্রগণ ইহা পাঠ করিতে অণুমাত্রও অসুবিধা বোধ করে না। যে সকল অসুবিধার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাদ্রীমহাশয়গণের কল্পনাতেই বিশেষরূপে বিরাজিত। আফিসে বাংলাভাষা প্রচলিত আছে, সে স্থানেও অতি সহজেই সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহ হইয়া থাকে,—এবং এক আনন্দরাম ফোকন ভিন্ন বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষিত আসামবাসী অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ চলিত-কথার প্রভেদসত্বেও বঙ্গভাষাশিক্ষায় স্থানীয় লোক কোনই অসুবিধাবোধ করে না, এখানেও ঠিক তাহাই। কারণ, আসামীভাষা বঙ্গভাষারই একটি প্রাদেশিক শাখামাত্র, এ সম্বন্ধে কোনই সংশয় নাই। বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহেও ছাত্রগণ বাংলা-পুস্তক পড়িবার সময় স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করে। এখানেও ঠিক তাহাই করিয়া থাকে।

(৮) সমগ্র আসামে ১১,০০,০০০ লোকের বাস। নিম্নপ্রদেশের জনসংখ্যা বেশী,—অপরার্দ্ধের (শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার) লোকসংখ্যা সমগ্রের $\frac{1}{3}$ অংশের অধিক হইবে না। খুব বেশী ধরিয়া লইলেও ঐ দুই জেলার লোকসংখ্যা ৩,৭০,০০০এর বেশী কোনক্রমেই হইতে পারে না। ইহার মধ্যে অন্যূন ১,৪০,০০০ কাছাড়ী এবং অপরাপর পার্ব্বত্য অধিবাসী আছে। তাহাদিগকে বাদ দিলে মাত্র ২,৩০,০০০ লোক বাকি থাকে। যে ভাষায় মার্কিনের পাদ্রীগণ পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন, তাহা এই ২,৩০,০০০ লোকের মাতৃভাষা। অবশিষ্ট ৮,৯০,০০০ লোকের ইহা মাতৃভাষা নহে। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দিয়া অধিকাংশ আসামবাসীদিগকে উক্তরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত কেন করা হইবে? এই বহুসংখ্যক আসামবাসীদেরও তাহা হইলে স্বদেশীয়-ভাষা-শিক্ষার অভাবে সমস্ত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৯। আসল কথা, আসামভাষা বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করা অন্যায়। বাংলাভাষা সংস্কৃতের প্রভাবে নূতনরূপে গঠিত হইতেছে,—ইহাতে উচ্চসাহিত্যের উপযোগী মার্জ্জিত ও ললিত শব্দসমূহ প্রবেশলাভ করিয়া ইহাকে বিচিত্ররূপে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাষাই আসামবাসিগণের স্বাভাবিকনিয়মানুসারে মাতৃভাষা,—এবং ইহা শিক্ষা করিলে তাহারা সমগ্র জাতীয় উদ্যমের সমবেতচেষ্টার ফল

লাভ করিয়া উন্নত হইয়া উঠিবে—অন্যথা হইলে ইহাদের উন্নতির পথ চিররুদ্ধ হইয়া পড়িবে।

পাদ্রীগণের আবেদনপত্র ও রবিন্‌সন্‌সাহেবের প্রতিবাদ তাৎকালিক আসামের রেভেনিউ কমিশনর মিঃ ফ্রান্সিস্ জেঙ্কিন্‌স্ সাহেব বঙ্গের ছোটলাট হ্যালিডেসাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। উদারহৃদয় জেঙ্কিন্‌স্‌সাহেব বিস্তারিতভাবে স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া রবিন্‌সন্‌সাহেবের মতের সমর্থন করেন। তিনি প্রতিপন্ন করেন, আসামের শিক্ষাদীক্ষায় এ পর্য্যন্ত বাঙালীরাই নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। আসামের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী বঙ্গদেশ হইতে সমাগত এবং তাঁহাদের ভাষা বঙ্গভাষা হইতে অভিন্ন,—আদালতে বাংলাভাষায় কাজ চলিতেছে, তাহাতে কোনই অসুবিধা হইতেছে না। তিনি প্রাচীন এবং বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিয়া আসামের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(১) মোগলেরা যখন আসাম জয় করেন, তখন মোগলবিচারালয় বঙ্গের সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আসামবাসিগণ সর্ব্বদা রাজকার্য্যের জন্য সেখানে যাতায়াত করিয়া বাংলাভাষায় সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করিত। মোগলদিগের পূর্ব্বে কুচবিহারের কোচগণ আসামে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারাও রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রচলিত বাংলাই ব্যবহার করিত,—ইহাদের আধিপত্যকালেও বাংলাই আসামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

(২) আসামের আহোমি রাজাদিগের দ্বারা আনীত বহুসংখ্য কানোজী এবং শান্তিপুরী ব্রাহ্মণের উপর আসামের অধিবাসিগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। আসামের ৭০০ সাত শত দেবালয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহারাই নিযুক্ত ছিলেন। এই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বঙ্গভাষা আসামের সর্ব্বত্র প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।

(৩) ইংরেজগণকর্ত্তৃক আসামবিজয়ের পর তদ্দেশীয় প্রধান প্রধান বংশের সন্তানগণকে রীতিমত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। আদালতে বাঙালী কর্ম্মচারিগণের সংখ্যাই অধিক, কারণ আসামী লোক ততদূর শিক্ষিত নহে; এখন কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহারা বাংলা শিখিয়া উন্নতির চেষ্টা পাইতেছে ও বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক আসামীলোক রাজকার্য্যে প্রবেশলাভ করিতেছে।

(৪) আসামের পূর্ব্বাংশেরও বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘকাল বাংলাদেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন, সুতরাং বাংলা তাঁহাদের পক্ষেও অনায়াসসাধ্য হইয়াছে।

জেঙ্কিন্সসাহেব প্রমাণিত করেন—বাংলা আসামবাসিগণের নিত্যব্যবহৃত ভাষা,—ইহা শিক্ষা করিতে তাহারা কখন কোন অসুবিধাবোধ করে নাই। বাংলাভাষায় বঞ্চিত করিলে তাহাদিগের সমস্ত উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ওয়েল্‌সের বিদ্যালয়সমূহে একবার গভর্মেণ্ট ইংরেজীভাষার পরিবর্ত্তে ওয়েল্‌সের ভাষা প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তদ্দেশবাসীরা স্কুলে স্বীয় শিশুদিগকে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছিল। কেহ কেহ

অনুমান করেন, স্কচ্ ভাষার মধ্যে এরূপ একটি আবেগ ও শক্তি নিহিত আছে, যাহাতে ইহা গ্রীক্‌ভাষার সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারে; তাহাদের কবি বারনস্ সেই ভাষাতেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—তথাপি তদ্দেশবাসীরা ইংরেজীভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে।

এই প্রাদেশিক বিভিন্নতা সাধারণ ভাষাটিকে বহু বিচিত্র উপকরণ হইতে বলসঞ্চয় করিতে সুবিধা দেয়—সেই ভাষা ক্রমে সমাজের অধস্তন স্তর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া কথিতভাষাগুলিকে ধীরে ধীরে মার্জ্জিত করিয়া তোলে এবং বহুসংখ্যক লোকের সমবেতচেষ্টার ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশকে প্রদান করিয়া এক বৃহৎ জনপদের চিন্তাশক্তিকে উর্ব্বর করিয়া প্রবাহিত হয়।

জেঙ্কিন্স ও রবার্টসন্ সাহেবের এই সকল অকাট্যযুক্তি সত্ত্বেও আসাম হইতে বঙ্গভাষা বিতাড়িত হইয়াছে। ঐ আবেদনপত্রপ্রেরণের কিছুকাল পরে আসামের চিফ্ কমিশনরের পদ সৃষ্ট হইয়া উক্ত প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং পাদ্রীগণের মনোরথ ও স্বার্থ সিদ্ধ হইবার নানারূপ সুবিধা উপস্থিত হয়। জেঙ্কিন্সসাহেব আসামীভাষায় পুস্তকের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"আসামবাসিগণ যদি বাংলাপুস্তক পড়িতে না পায়, তবে এই পাদ্রীগণপ্রচারিত কয়েকখণ্ড পুস্তিকা তাহাদের সম্বল হইবে—তাহাদের ধর্ম্মকথা লোকেরা অতিশয় তিক্ত বলিয়া মনে করে, এবং ধর্ম্মকথা ছাড়া তাহাদের মুদ্রাযন্ত্র হইতে অপরাপর যে কয়খানি সামান্যসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিকেও খ্রীষ্টানী মনে করিয়া লোকেরা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে।"

কিন্তু পরিণামে যাহাদের জয়, তাহারাই প্রকৃত জয়ী,—পাদ্রীগণের চেষ্টাই সার্থক হইয়াছে। আসামবাসী ভ্রাতৃমণ্ডলী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের ততটা পর হইয়া যান নাই,—বাংলাভাষা হইতে বিচ্যুত হইয়া যতটা হইয়াছেন। আসামীভাষা ও বাংলাভাষা এক। যাঁহারা প্রাচীনসাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, আসামের শঙ্কর ও চট্টগ্রামের শ্রীকরনন্দীর কাব্য দুইই আধুনিক বাংলা হইতে তুল্যদূরে অবস্থিত, অথচ শ্রীকরনন্দীকে আমরা বাংলা কবিতার নির্ম্মাণকর্ত্তাদের আসনে বসাইয়াছি, শঙ্করকে পারি নাই। এখনও চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের কথিতভাষার সঙ্গে লিখিত বঙ্গভাষার তুল্যরূপই প্রভেদ, অথচ আসাম আমাদিগের ভাষার গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঢাকানিবাসী শাঁখারীদের কথা বোধ হয় কলিকাতার লোক কোনক্রমেই বুঝিবেন না,—এরূপ প্রাদেশিক শব্দ-উচ্চারণ-প্রভেদ বঙ্গের জেলায় জেলায় বিদ্যমান,—কিন্তু বাংলা লিখিবার সময় সমস্ত প্রভেদ কোথায় চলিয়া যায়—আমাদের প্রতি জেলার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ঘনিষ্ঠরূপে অনুমিত হয়। আমরা চট্টগ্রাম হইতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ঢাকা হইতে খ্যাতনামা কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীহট্ট হইতে বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র পালকে পাইয়াছি। বঙ্গভাষা দূর—সুদূর হইতে ভ্রাতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এক -সুখ

সম্মিলনের সংঘটন করিয়াছে। কিন্তু আসাম হইতে আমরা কোন কবি বা গ্রন্থকারকে পাই নাই। সমগ্র বঙ্গদেশের সমবেত চেষ্টার সঙ্গে আসাম স্বীয় চেষ্টা মিশাইতে পারিলে তাহার উন্নতি যে দ্রুততর হইত, তাহার সন্দেহ নাই। বিশাল জ্যোতিষ্কের এক ভগ্নখণ্ড যেন সুদূরে পড়িয়া আছে,—তাহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের আঁধার দূর করিতে পারিতেছে না—ইহা কি মুক্তি না অঙ্গহানি?

ব্যক্তিগত বা জাতিগত অভিমানের উদ্রেক হওয়া সহজ। কিন্তু এই অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্মিলিত না হইতে পারিলে, ঐক্যবল কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। কোন ক্ষুদ্রপ্রদেশের কথিতভাষার স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে গৌরব প্রদান করিতে যান, তবে তদ্দেশবাসিগণ মনে করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হইল। কিন্তু যদি ভ্রাতা রত্ন লইয়া সাধিতে আইসেন, তাহাকে বাহিরে রাখিয়া দ্বাররোধ করায় কি গৌরব আছে? ইহাতে প্রকৃত পরাজয় কার?

পৃথিবীতে যে-কোন ভাষা অপূর্ব্বরূপে শ্রীশালিনী হইয়াছে, তাহা বহুপ্রদেশের লিখিতভাষারূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া উন্নত হইতে পারিয়াছে। বহুসংখ্যক প্রতিভান্বিত ব্যক্তির সমবেতচেষ্টার ফল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে বিতরণ করিয়া সেই ভাষা নিজেকে সার্থক করিতে পারিয়াছে। বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা শক্তিশূন্য; যে পর্য্যন্ত আমরা সংযুক্ত, সেই পর্য্যন্ত আমরা বলশালী। বাংলাভাষা এখন চারিদিক্ হইতে শক্তিসংগ্রহ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ইহাকে যে শক্তি প্রদান করিতেছে, তাহার ফল ইহা সমস্ত বাংলাদেশের গৃহে গৃহে বাঁটিয়া দিতেছে—ইহারই নবদৃপ্ত গর্ব্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিবার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। আমরা এখনও বিচ্ছিন্ন হই নাই,—ভাবী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কায় আমরা প্রীতির বন্ধন দ্বিগুণিতরূপে উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের ইতিপূর্ব্বে ভ্রমেও মনে হয় নাই যে, হৃদয়রক্তে যাঁহাদের প্রীতি পুষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া এক ঘরে কোলাহল করিয়াছি, একত্র এক ভাষার আরাধনা করিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিরহ ঘটিবে—আমাদের বহুতপস্যাপ্রসূত বঙ্গভাষার পুনশ্চ খণ্ডবিখণ্ড হইবার আশঙ্কা হইবে। আসাম গিয়াছে,—আসামবাসীর সঙ্গে আমাদের এখন কতটা প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টের সঙ্গে তুলনা করিলে সেই অনৈক্য আমরা গাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হওয়ার সুযোগ পাইয়া সংস্কৃত এরূপ অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছিল,—ইহার সেবক নেপাল ও মহীশূর হইতে, কামরূপ ও পাঞ্জাব হইতে বিশাল ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই ভাষার শ্রীসাধনে তৎপর ছিল। ভাষার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করিলে তাহার সমস্ত ভবিষ্যতের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আসামের ভাগ্যে যেরূপ পাত্রীমহাশয়গণ অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, কালে পূর্ব্ববঙ্গের স্কন্ধে তদ্রূপ কোন হিতৈষী বন্ধু

আরূঢ় না হইলে বাঁচা যায়। পূর্ব্ববঙ্গ যদি সত্যই এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে আসামের উদাহরণে ভাষাচ্ছেদ না ঘটে —ইহাই বিশেষরূপে প্রার্থনীয় হইবে।

—

মল্‌ফুজাতি তাইমুরী।

মলফুজাতি তাইমুরী নামক পুস্তকে তাইমুরের আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তাইমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন,—সেই সময়ের মুসলমান সম্রাট্‌গণ কিরূপ ধর্ম্মের ভাবে মাতিয়া উঠিতেন, ধনলিপ্সা হইতে ধর্ম্মবিস্তারের প্রয়াসই তাঁহাদিগের সমস্ত উদ্যমকে কিরূপে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিত, তাহা তাইমুরের আত্মবিবরণীতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহ তাঁহাদিগকে পররাজ্যবিজয়ে প্রণোদিত করিত। যে সকল স্থানে বিপক্ষগণ মস্তক অবনত করিতেন, সে স্থলে সেই মস্তকের একটি কেশও তাঁহারা স্পর্শ করিতেন না— তাঁহাদের রত্নভাণ্ডারের উদ্‌ঘাটিত দ্বারও মুসলমান জেতাগণের লুব্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট করিত না। ধনের লোভে কৌশলে দেশজয় করা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্মব্রতে দীক্ষিত হইয়া নৃশংসের ন্যায় অস্ত্রচালনায়ও একটা পৌরুষ আছে,— কুসংস্কার মার্জ্জনীয়, যদি সেই সংস্কার অকপট হয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কখনই শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে পারে না।

রুষ ও জাপানের যুদ্ধে রুষের সঙ্গে আমাদের কস্মিন্ কালেও সহানুভূতি থাকিতে পারে না। মুসলমানগণের দেশজয়ের চেষ্টার মূলে ছিল দৃঢ় অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস, সেই বিশ্বাস অন্ধ হউক এবং তাঁহাদের সমস্ত অনুষ্ঠান নৃশংস হউক—তথাপি কৌশলে পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার অভিসন্ধিকে হৃদয়ের বেদীতে স্থাপন করিয়া হস্তপ্রসারণ অতি হেয়। মুসলমানগণের অন্ধতা ও বর্ব্বরতার মধ্যে শ্রদ্ধা করিবার অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়—কিন্তু শুধু অর্থান্বেষণবৃত্তির চেষ্টায় যে নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কোন উজ্জ্বল দিক্ নাই।

তাইমুরের আত্মকাহিনীতে হিন্দুগণের প্রতি একটিও প্রিয় কথা নাই,—উহার প্রতিপত্রে হিন্দু পৌত্তলিকের প্রতি গাঢ় অবজ্ঞা ও ঘৃণার কথা দৃষ্ট হয়; তথাপি উহা পড়িয়া মনে হয়, তাইমুর যে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন—সে স্থানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা অসম্ভব নহে। তিনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না, প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্মকথাও তাঁহার বিদিত ছিল না, তথাপি দেখা যায়, তিনি প্রবল ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ ছিলেন —বিশ্বাসই তাঁহার তরবারিকে শাণিত করিয়া দিয়াছিল। সেই তরবারির ঘা' খাইয়াও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, তাইমুর সরল অকপট যোদ্ধা—তিনি ভ্রান্ত বা উন্মত্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার একটা উচ্চ তপস্যার ভাব ছিল।

এস্থলে আমরা তাঁহার আত্মবিবরণী হইতে কতকাংশ নিম্নে সঙ্কলন করিলাম।

"এই সময়ে (অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে) কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া 'গাজি' হইবার জন্য আমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। আমি জানিলাম, কাফেরদিগকে যে হত্যা করিতে পারে, সেই 'গাজি'নাম পাইতে পারে এবং

যদি এইরূপ যুদ্ধ করিয়া কোন মুসলমান হত হয়, তবে সে বেহস্তে যায়। এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া আমি কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করিলাম, কিন্তু চীনবাসী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুস্থানবাসী কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, অনেকদিন তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এই বিষয়টি মীমাংসা করিবার জন্য আমি কোরাণ খুলিয়া খোদাতালার ইচ্ছা জানিতে লক্ষণ খুঁজিলাম। কোরাণের যে বয়েৎটি আমার প্রথম চক্ষে পড়িল, তাহা এই—'হে স্বর্গীয় দূত, তুমি নাস্তিক ও কাফেরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন কর।'

"আমার সচিবের মধ্যে অনেকে বলিল—'হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণ নাস্তিক ও কাফের।'

"সর্ব্বশক্তিমান্ খোদাতালার আদেশানুসারে আমি কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করা স্থির করিলাম। রাজ্যময় আদেশ প্রচার করিয়া দিলাম—যেন প্রধান আমিরবর্গ, জ্ঞানবৃদ্ধগণ এবং সেনাপতিগণ অগোণে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইলেন, তখন আমি বলিলাম, 'খোদাতালা ও মহম্মদের আদেশে আমাদিগের কাফেরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, এই ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য আমি প্রস্তুত,—এখন চীন কিংবা ভারতবর্ষ, এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন্‌টির বিরুদ্ধে যাত্রা করিব, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?'

"তাঁহারা অনেক জ্ঞানগর্ভ ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বলিলেন এবং শেষে জানাইলেন, 'ভারতবর্ষবিজয়ের চারিপ্রকার অন্তরায় আছে, তাহা আয়ত্ত না করিলে দেশাধিকারের সম্ভাবনা নাই।'

"'প্রথম অন্তরায়—পঞ্চনদ। এই স্বাভাবিক বাধা সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের পথে দাঁড়াইবে—উপযুক্তসংখ্যক নৌকা ও সেতুর ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নদী অতিক্রম করিবার উপায় নাই।

"'দ্বিতীয় অন্তরায়—ভারতবর্ষের অভেদ্য ও দুরতিক্রম্য বনরাজি, অনেকস্থলে পাহাড় ভেদ করিয়া যাইতে হইবে—তাহা বড়ই দুরূহ।

"'তৃতীয় অন্তরায়—প্রবলপরাক্রান্ত কাফের রাজা ও জমিদারগণ। তাহারা বন্যপশুর ন্যায় ভয়ানক ও অদম্য।

"'চতুর্থ অন্তরায়—অসংখ্য হস্তী। এই হস্তিবলই ভারতবর্ষীয় লোকের প্রধান সহায়। মেঘের ন্যায় বিরাট্ হস্তিযূথকে অগ্রে স্থাপন করিয়া তাহারা যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকে। এই হস্তিগণ এরূপ সুশিক্ষিত যে, অনেকসময় বিপক্ষদলের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে অশ্বের সহিত শুণ্ডদ্বারা শূন্যমার্গে উত্তোলন করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ করে,—অশ্ব ও অশ্বারোহী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়।'

"কোন কোন সচিব বলিলেন, 'সুলতান মহম্মদ সবক্তুগিন ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, আর আমাদের আমির (তাইমুরের উপাধি) কি সবক্তুগিন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন? ইচ্ছা করিবামাত্র একলক্ষ তাতারের অশ্বারোহী সৈন্য এই মুহূর্ত্তে তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে

দাঁড়াইবে। খোদাতালা এই ব্যাপারে অবশ্যই তাঁহাকে বিজয়ী করিবেন এবং তিনি অচিরে গাজি ও মুজাহিদের গৌরব প্রাপ্ত হইবেন।'

"কুমার শা'রুক্‌ বলিলেন—'ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য,—সেস্থান অধিকার করিতে পারিলে আমরা পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ সম্মান পাইব। আমি পারস্যদেশীয় সুলতানগণের ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের সম্রাট্‌গণ গর্ব্বিত 'দারাই'উপাধি গ্রহণ করেন। পারস্যের সুলতানের উপাধি—'কিশ্র', তাতারাধিপতিগণের উপাধি—'খাকন', চীনসম্রাটের উপাধি—'ফাগফুর' এবং ইরান ও তুরাণের অধিপতির উপাধি—'শাহানশা'। ভারতবর্ষীয় সম্রাট্‌গণ সর্ব্বদাই 'শাহানশা'র আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। আমরাই খোদাতালার ইচ্ছায় এখন ইরান ও তুরাণের 'শাহানশা'—সুতরাং ভারতবর্ষের রাজগণের উপর আমাদিগের প্রভুত্ব না থাকা বড়ই ক্ষোভের বিষয়।'

"কুমার মহম্মদ সুলতান বলিলেন—'যে দেশের অধিবাসিগণের অধিকাংশই কাফের, পৌত্তলিক এবং সূর্য্যের উপাসক, তাহাদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। আর শুনা যায় যে, ভারতবর্ষে হীরা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ১৭টি খনি আছে, সে দেশের তৃণগুল্ম চিরহরিৎ ও স্নিগ্ধবর্ণ, ফুল না থাকিলেও সেখানকার তরুরাজি সুগন্ধি, সেখানে অপর্য্যাপ্ত ইক্ষু জন্মে। এস্থান অধিকারভুক্ত রাখা প্রয়োজনীয়।'

"কিন্তু কোন কোন সচিব বলিলেন—'খোদাতালার প্রসাদে আমরা ভারতবর্ষ জয় করিতে পারি, কিন্তু সেখানে যাইয়া যদি বাসস্থাপন করি, তবে আমাদের সন্তানগণের সকল বিষয়ে অবনতি হইবে এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই আমরা তদ্দেশবাসিগণের ন্যায় বলবীর্য্যশূন্য ও ভীরু হইয়া পড়িব।' এই কথায় আমিরগণ ও সেনাপতিবর্গ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম—'আমার উদ্দেশ্য নয় যে, সেখানে যাইয়া বাস করা হইবে। এই ধর্ম্মযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি তদ্দেশবাসীদিগকে পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিব—সে দেশের ঘৃণিত পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরের উপাসনা এবং নাস্তিকতার ভিত্তি বিচলিত করিব—তাহাদের মন্দির ও বিগ্রহগুলা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং খোদাতালার নিকট গাজি ও মুজাহিদ্‌ বলিয়া প্রতিপন্ন হইব।'

"আমার কথায় সকলে যেন একটু অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতিপ্রদান করিল, কিন্তু এইসময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'যাঁহারা বিশ্বাস করেন, "খোদাতালা একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং মহম্মদ তাঁহার দূত", তাঁহাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বত্র ইস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা এবং যে-কোন স্থানে সত্যধর্ম্মের শত্রু থাকে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা—ইহা অপেক্ষা উন্নততর ব্রত ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীদিগের আর কিছু নাই।' এই উৎসাহপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যায় সমবেত সুধীমণ্ডলীর সমস্ত দ্বিধা ঘুচিয়া গেল, তাঁহারা জানু পাতিয়া বসিয়া খোদাতালার স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুস্থানযাত্রার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। গুরু হজরত

ষেক্ জৈহাদ্দিন সাহেবের নিকট আমি ধর্ম্মার্থ যুদ্ধসঙ্কল্পের কথা লিখিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার পত্রের একপার্শ্বে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন—'এতদ্দ্বারা আবুল গাজি তাইমুরকে (ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন) জানান যাইতেছে যে, এই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে ইহকালে ও পরকালে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিবেন, এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।' তিনি আমাকে একখানি বৃহৎ তরবারি পাঠাইলেন, আমি তাহাই আমার রাজদণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলাম।"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায়, তাইমুর রত্নলোভে দিগ্‌দেশ জয় করিয়া বেড়ান নাই,—তিনি প্রচারক ও ধর্ম্মযাজকের বেশে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তিনি ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডারের প্রতি গৃধ্রবৎ লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া এই দেশকে গ্রাস করিতে আইসেন নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস উন্মত্তকে শ্রদ্ধাস্পদ করে, বর্ব্বরের মস্তকে সম্ভ্রমের উষ্ণীষ বাঁধিয়া দেয়। আমাদের নিরীহদেশ অন্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণের হস্তে বারংবার বিড়ম্বিত হইয়াছে, তথাপি অকপট বিশ্বাসের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব না হইয়া যায় না।

রুষের পরদেশের প্রতি লোলুপদৃষ্টি ঘৃণার উদ্রেক করে। স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি শুষ্ক হয়,—কপটতা ন্যায়ের ছদ্মবেশ পরিয়া প্রতারণা করিয়া যায়, এবং কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখা অসম্ভব হয়। ধর্ম্মের অন্ধতা শুধু ফলাফলের হিসাবে তুল্য বা অধিকতর অনিষ্টকর হইলেও, উহাতে মানুষের উন্নত ভাবগুলিকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করিয়া আদর্শকে সমুজ্জ্বল করে এবং বর্ব্বরতাকে ত্যাগের ভাবে মহিমান্বিত করিয়া দেখায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

স্বীকার।

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
করিব হে!
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে!
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,

সেই-সন্ধ্যা-মাঝে তোমারে স্বীকার
করিব হে!
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

সকলি ত্যেয়াগি তোমারে স্বীকার
করিব হে!
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে
বরিব হে!
কেবলি তোমার স্তবে নয়
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে!
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার
করিব হে!
প্রিয়-অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার
করিব হে!
জানি বলে' নাথ তোমারে জীবনে
বরিব হে!
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে।
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার
করিব হে!
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে
বরিব হে!

"গুরুদক্ষিণা।" *

(সমালোচনা।)

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সঙ্কোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র—মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে যাবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান্ বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে মনোনিবেশের শক্তি, যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুরপরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুর-ষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানপ্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক শুদ্ধ-

* ৺ সতীশচন্দ্র রায় প্রণীত। বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা।

শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন, যাঁহারা অধ্যাপন-কার্য্যকে যথার্থ ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়—ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম—তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল—"আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনা-সম্পদ্ লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতরে বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়—সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্য্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্ম্মল ঈশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্প বয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্ব্বলতা-অপূর্ণতা—সমস্ত দীনতার মধ্যে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না, লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও আত্মনামঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয় তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপরিতৃপ্ত শক্তি।

বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্বন্ধেই সতীশকে আমি নিকটে পাইয়াছিলাম, তাহার অন্তরাত্মার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় ঘটিতেছিল। এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কি ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

"মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেম্নি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার-বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেম্নি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে,—যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক্, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত;—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক; কে আমাদের ষ্টেট্‌সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়—কে কোন্ আইন করিল, এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণে-গুল্মে ও ঋতুপর্য্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা এখানকার নিভৃতশান্তি ও

সরল সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোম-ধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীর-প্রাঙ্গণে, গৃহকার্য্যে শুচিস্মিত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীদের সহিত যোগ দেয়।

"জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও সয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি সয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়াম'র দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান ত নাই-ই, মাথা রাখিবার স্থানও প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্ব্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিক্‌দের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই—সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।"

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, "বর্ত্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।"

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না—ত্রিশকোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ্ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্ম্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের

মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হোক্, আমার সঙ্কল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক্ হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, কাজের দিক্ হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল,—কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের সৌম্যনির্ম্মল জ্যোতিঃপ্রভা? তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম্ম-আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখনো ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভকালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও সে অহঙ্কার অনুভব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্রমধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ—এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খর্ব্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুইএকটা কাঁটাগুল্ম এবং উয়ের-ঢিবিতে মিলিয়া একএকটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়ি-বিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহাগহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে—সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর-সহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীরা উলুখড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্ত্তশব্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃণ্ময়কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীর তলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্য্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্দ্ধদেশে

আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "গুরুদক্ষিণা"নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে—ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল—ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্ল নবীনহৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থের কথা অতি অল্পই বলিলাম, এমন অনেকে মনে করিতে পারেন। বস্তুত তাহা নহে। সতীশের জীবনের যে অংশটুকু আমি জানি, সেই অংশের পরিচয় এবং এই গ্রন্থের আলোচনা, একই কথা। এই বুঝিয়া পাঠকগণ যখন "গুরুদক্ষিণা" পাঠ করিবেন, তখনই তাঁহারা এই গদ্যকাব্যটির সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারিবেন। গ্রন্থে যাহা আছে, গ্রন্থই তাহার পরিচয় দিবে, গ্রন্থের বাহিরে যাহা ছিল, তাহাই আমি বিবৃত করিলাম।

সার সত্যের আলোচনা।

কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার।

বিগত প্রবন্ধে আমরা কাণ্টীয় দর্শনের অন্ধি-সন্ধি-প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বিষম এক সঙ্কটস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। এই প্রদেশটির আশপাশের গলিঘুঁজিতে ভয়ানক ডাইনামাইট্—সর্ব্বসংশয়—নিশ্ছিদ্র যুক্তি-পরিচ্ছদে চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে, তাহা আমি জানি। জানিয়াও তবু যে তাহাকে আমি ঘাঁটাইতে ভয় পাইতেছি না—সে কেবল দেশীয়শাস্ত্রের মন্থনসম্ভূত মৃত-সঞ্জীবনী সুধার মাহাত্ম্যগুণে। পাশ্চাত্য দর্শনের কিন্তু বড়ই দুর্দ্দশা! কাণ্টের সময়ের অনতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় ভট্টাচার্য্য-মহলে নানা শ্রেণীর নানা দর্শনকার নানা মতামতের মনোরাজ্য বাতাসে ফাঁদিয়া সেই সেই মনোরাজ্যের গন্ধর্ব্বনগরগুলাকে বাস্তবিক-

সত্যের ঢঙে সাজাইয়া আসিতেছিলেন সুনির্ভয়ে। কাণ্ট্ এক কথায় তাঁহাদের সুখস্বপ্ন জন্মের মতো ভাঙিয়া দিলেন। সে কথা এই যে, বাস্তবিক-সত্য মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত।

গোড়াতেই তো আমি বলিয়াছি, "আগে যুদ্ধ—পরে শান্তি!" হে যাত্রি-ভায়া'রা! শান্তিসদনে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বাহির হইতেছ বটে, কিন্তু মনে করিও না যে, বিনা যুদ্ধে অভীষ্ট-ফল-লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। ফণীর মস্তক হইতে মণি উৎপাটন করা সোজা কথা নহে! অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও! ধৈর্য্যের কবচ পরিধান কর! জ্ঞানের অস্ত্র শাণিত কর! ফলে, একটা দিক্ আছে—যে দিক্ দিয়া দেখিলে মনে হয় যে, কাণ্টের দর্শন আগাগোড়া একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড! এ কুরুক্ষেত্রের কুরু-পাণ্ডব হচ্চেন জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা। যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন দোঁহে দোঁহার ভ্রাতা ছিলেন কেবল জ্ঞাতি-সম্পর্কে; কিন্তু জ্ঞান এবং বাস্তবিক-সত্তা দোঁহে দোঁহার অর্দ্ধাঙ্গ—শিবদুর্গা বলিলেই হয়! স্ত্রীপুরুষের দাম্পত্য-কলহ সবাই জানে খড়ের আগুন; তা বই, তাহা যে এমনতরো একটা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' রকমের প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে—এ কথা পৃথিবীর আদিম-যুগ হইতে এ-কাল পর্য্যন্ত স্বপ্নেও কাহারো জানা ছিল না। বিবাদানল এত-দিন পর্য্যন্ত স্তূপাকার ভস্মরাশিতে আচ্ছাদিত ছিল, তাই লোকের তাহা চক্ষে পড়ে নাই। ভস্মরাশি আর-কিছু না—বাদাবাদের শব্দা-ড়ম্বর। সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিটাকে যুক্তি-তর্কের শুষ্ককাষ্ঠ দিয়া বিধিমতে খোঁচাইয়া-তুলিয়া কাণ্ট্-মহাসুধী কাণ্ড-এক বাধাইয়া-ছেন কম না! এখন সে অগ্নিটা'কে সাম্লানো দায়!

কাণ্টের খোঁচাখুঁচি।

কাণ্ট্ আপনার মন'কে সাম্‌নে ডাকিয়া-আনিয়া শুধাইলেন—"বল দেখি বৎস, কে আগে? বাস্তবিক-সত্তা আগে—না জ্ঞান আগে?" মন বলিল—"বাস্তবিক-সত্তা।" মনের এ কথায় কাণ্টের বুদ্ধি সায় দিল না। কাণ্ট্‌মুনি ধ্যানে বসিলেন। তাঁহার মনো-মধ্যে ভাবনা ঢেউ খেলিতে লাগিল এইরূপ:—

"মন তো বলিবেই 'আগে সত্তা—পরে জ্ঞান।' এটাও তো সে বলে যে, 'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ঘুরিতেছে।' বিজ্ঞান তো আর তাহা বলে না! জগৎশুদ্ধ লোক যখন ইন্দ্রিয়-মনের কথায় ভুলিয়া একবাক্যে বলিতেছিল—'পৃথিবী স্থির—সূর্য্য ভ্রাম্যমাণ,' তখন বিজ্ঞা-নের অমোঘ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া কোপর্নিকস্ একাকী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—'না, তাহা নহে! সূর্য্য স্থির—পৃথিবী ভ্রাম্য-মাণ!'* ইনি আমার গুরু। ইঁহার দৃষ্টান্তের মন্ত্রপূত অঞ্জনে চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া আমি

---

* We have here the same case as with the first thought of Copernicus, who, not being able to get on in the explanation of the movement of the heavenly bodies, as long as he assumed that all the stars turned round the spectator, tried, whether he could not succeed better by as-

দেখিতেছি এই যে, সংবিৎ স্থির রহিয়াছে ; আর, তাহারই সাক্ষিতাগুণে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের সত্তা সংসিদ্ধ হইতেছে ;—আগে জ্ঞান, পরে সত্তা, তাহাতে আর ভুল নাই।" এ তো পঞ্চদশীর কথা! পঞ্চদশীতে স্পষ্ট লেখা আছে—

"মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥"

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প অনেকধা গতায়াত করিতেছে—তার মাঝে উদয়ও হ'ন না, অস্তও যান না, একা কেবল সংবিৎ যিনি স্বয়ম্প্রভা।" তবে তো কাণ্ট্ প্রতীতিবাদী (Idealist)! কাণ্টের হস্ত হইতে "বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমালোচনা" প্রথম যখন বাহির হইয়াছিল, তখন তদ্দৃষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ভাবিয়াছিলেনও তাই। দ্বিতীয় সংস্করণে কাণ্ট্ তাঁহাদের ভুল ভাঙিয়া দিলেন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া।

সংশয়বাদের গোড়া'র সূত্র।

"দ্রষ্টার সাক্ষিতাগুণে বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়"—এই কথাটি কাণ্ট্ ইঙ্গিত-আভাসে জ্ঞাপন করিয়া অতবড় একটা লোকবিরুদ্ধ কথা'র তাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া শেষে তিনি এক-পা এক-পা করিয়া পিছাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অগ্রপশ্চাৎ ঠাহরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"কথাটা অযথা নহে—জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণেই বাস্তবিক-সত্তা সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে, জ্ঞানের সাক্ষিতাগুণে সে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা কেবল ভাব-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা, তা বই, তাহা সত্য-রাজ্যের বাস্তবিক-সত্তা নহে—প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে।" কাণ্টের এ কথা'র ভাব-টা বুঝিতে পারা গিয়াছে ; তাহা এই ;—

ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি (viceroy) সত্যসত্যই কিছু আর ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ নহেন ; সত্যসত্যই তাহা তিনি না হউন্, কিন্তু তথাপি ভারতবাসীর নিকটে তিনি ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ-মহারাজেরই সামিল। তেম্নি, ভাবরাজ্যের মনোময়ী বাস্তবিক-সত্তা প্রকৃত-প্রস্তাবে বাস্তবিক-সত্তা না হইলেও মনুষ্যজ্ঞানের নিকটে তাহা বাস্তবিক সত্তারই সামিল।

কাণ্টের এইপ্রকার দ্বৈধসূচক কথা শুনিয়া লোকের মনে সহজেই এইরূপ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের বলে সিদ্ধ-হয়-বলিতেছ সেই যে ভাবরূপী বাস্তবিক-সত্তা, তাহা যদি প্রকৃত বাস্তবিক-সত্তা নহে, তবে তাহা পদার্থটা কি? কাণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন এই যে, তাহা আর-কিছু না—সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য synthetic unity of consciousness। তিনি বলেন—

It is clear also that as we can only deal with the manifold in our representations, and as the *x* cor

---

suming the spectator to be turning round and the stars to be at rest. A similar experiment may be tried in metaphysic, so far as the intuition of objects is concerned. ইতি কাণ্ট্।

responding to them (অর্থাৎ বাস্তবিক-সত্তা) is really nothing to us, it is clear, I say, that the unity necessitated by the object cannot be anything but the formal unity of our consciousness in the synthesis of the manifold in our representations.

ইহার বাংলা—

এটা যখন স্পষ্ট যে, আমরা কেবল আমাদের বহুধা-বিচিত্র প্রতীতিসমূহের সঙ্গেই কারবার করি, * আর সেই সঙ্গে এটাও যখন স্পষ্ট যে, সেই প্রতীতি-সমূহের পৃষ্ঠের আড়ালে বস্তু যাহা সংগোপিত আছে, তাহার সহিত আমাদের কোনো কারবার চলিতে পারে না, তখন কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি বস্তুর একত্ব (বা বস্তুগত একত্ব objective unity), তাহা প্রকৃতপক্ষে বস্তুর একত্ব নহে ; তবে কি ? না, সংবিতের যে একপ্রকার ঔপাধিক (অর্থাৎ formal কিনা উপাধিগত) একত্ব আমাদের প্রতীতি-বৈচিত্র্যের সংযোজনা-ব্যাপারে অধ্যারোপিত হয় (অর্থাৎ চাপানো হয়)—সে একত্ব সেই একত্ব। এ যে একটি কথা কাণ্ট্ বলিতেছেন—কি বলিতেছেন, তাহা কি পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন? তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটা হ'চ্চে এই :—

সংশয়বাদের নিজমূর্ত্তিধারণ।

মনুষ্যের জ্ঞান একপ্রকার জেলখানার কয়েদী। বাহিরে যে-দিকে সে চক্ষু ফিরায়, সেই-দিকেই দেখে—সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—আকাশ ; আপনার দিকে যখন চক্ষু ফিরায়, তখন-আবার দেখে—হস্তপদ তাহার বাঁধা রহিয়াছে কালের অবিমোচ্য বন্ধন-রজ্জুতে। আকাশ-প্রাচীরের ও-পৃষ্ঠে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা ; কালরজ্জুর গোড়া বাঁধা

* প্রতীতি-শব্দের মুখ্য অর্থ representation। তার সাক্ষী—

(১) প্রতি = re।
(২) ইতি = presentation।
(৩) প্রতীতি = representation।

ইতি-শব্দের ধাত্বর্থ গতি। যাহা গতিসূত্রে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকেই আমরা 'ইতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করি; আবার, তাহাই যখন আমাদের মনে প্রত্যুপস্থিত হয়, তখন তাহাকে বলি—প্রতীতি। বেদান্তদর্শনে তিন-প্রকার সত্তা'র উল্লেখ আছে—

(১) পারমার্থিক।
(২) ব্যাবহারিক।
(৩) প্রাতীতিক।

প্রাতীতিক সত্তা কি ? না, প্রতীতিই (representationই) যাহার সর্ব্বস্ব, তা বই, বাস্তবিক-সত্তা'র সহিত যাহার দেখা-সাক্ষাৎ নাই—যেমন স্বপ্নের সত্তা। লোকমধ্যে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়)-শব্দ সচরাচর বিশ্বাস-অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; তাহা তো হইবারই কথা :—মনে যাহা প্রতীয়মান হয় (comes to be represented), তাহার ইতিত্বে (সাক্ষাৎ objective presenceএ) বিশ্বাস সহজ-জ্ঞানের পক্ষে অনিবার্য্য। এইজন্য সহজ-জ্ঞানের শাস্ত্রে অর্থাৎ লোকের শাস্ত্রে প্রতীতি-(বা প্রত্যয়)-শব্দের অর্থ শুধুই-কেবল বিশ্বাস। পক্ষান্তরে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে ঘটপ্রত্যয়-শব্দে বুঝায়—ঘটের জ্ঞানগত ভাব বা representation বা Idea।

রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তায়। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয় আকাশ ভেদ করিয়া—আকাশের ও-পৃষ্ঠে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না; তথৈব, অন্তরিন্দ্রিয় (বা অন্তঃকরণ) কালের গঙ্গাস্রোতের উজানে চলিয়া—গোমুখী ছাড়াইয়া মহোচ্চ কৈলাসধামে যেখানে রহিয়াছে জ্ঞাতার বাস্তবিক-সত্তা—সেখানে পৌঁছিতে পারে না।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্র।

কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে গন্তব্য-পথের ঠিকানা যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে যাত্রিগণের উদ্যমভঙ্গ হইবারই কথা; কিন্তু তথাপি তাহা উপেক্ষণীয় নহে; যেহেতু কাণ্ট্ পাশ্চাত্য-দর্শনের পথপর্য্যটকদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। কাণ্টের দার্শনিক মানচিত্রে মাঝপথের প্রধান-প্রধান কতিপয় প্রদেশ-খণ্ড পরিচিহ্নিত হইয়াছে এইরূপে:—

এপারে রহিয়াছে জ্ঞাতা'র বাস্তবিক-সত্তা। ওপারে রহিয়াছে জ্ঞেয়বস্তু-সকলের বাস্তবিক-সত্তা। দুই পারের মাঝখানে রহিয়াছে—

(১) সংবিতের একত্ব এপার ঘেঁষিয়া, (২) বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য ওপার ঘেঁষিয়া, (৩) অন্তরিন্দ্রিয়ের (বা অন্তঃকরণের) সংযোজনারূপী স্বাবর্ত্তের টান দুয়ের মধ্যস্থলে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, বাস্তবিক-সত্তার ঐ যে দুই দিকের দুই অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—এপার এবং ওপার, দুই পারই মনুষ্য-জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত অজ্ঞেয়-প্রদেশ। মানচিত্র-এ-যাহা আলেখ্যপটে লেখনী টানিয়া আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে, ইহার যাথার্থ্য ফলে কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা একবার পদব্রজে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্।

মানচিত্রের ফলপরীক্ষা।

গুরু বলিলেন—"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" গুরুর মুখবিনির্গত ঐ তেজোময় বাক্যটি শিষ্যের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শিষ্যের কর্ণকুহরে তাহা প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তত্রাচ শিষ্য তাহার একটি অক্ষরও শুনিতে পাইলেন না। শিষ্যের কর্ণকুহরে যে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই; কেন না, একটু পূর্ব্বে ক্লান্তির প্রাদুর্ভাবে শিষ্যের চক্ষুদুটি বুজিয়া আসিতে-ছিল ক্রমশই অধিকাধিক মাত্রা, ইতিমধ্যে "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই শব্দের ধমকে তাঁহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। তবেই হইতেছে যে, গুরুমুখোচ্চারিত ঐ শব্দটি শিষ্যের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিয়াছে;—না যদি প্রবেশ করিবে, তবে শিষ্যকে জাগাইয়া দিল কে? অত-বড় একটা জোরালো শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, অথচ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যে আসিল না—এটা হইল শুদ্ধকেবল মনো-যোগের অভাবে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় উপস্থিত হওয়া চাই বিশেষ-একটি দেশে (যেমন কর্ণকুহরে), আর, সেই সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ মনের) সংযোজনা-ক্রিয়া'র উদ্রেক হওয়া চাই বিশেষ-একটি কালে (যেমন জাগরণ-মুহূর্ত্তে); এই দুই ব্যাপারের সমবেত কার্য্য-কারিতা ব্যতিরেকে বিষয়ের উপলব্ধি সম্ভবে না। দুইটি বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গেল; একটি হচ্চে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য (যেমন ক, র, ত, ল ন্য, স্ত, আ, ম, ল, ক,

ব, ৎ—এতগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি); আর-একটি হ'চ্চে অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোজনা-ক্রিয়া (যেমন, ঐ পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনিগুলি একত্র সংযোজনা করিয়া "করতলন্যস্ত-আমলকবৎ" এই একটি সমগ্র শব্দ গড়িয়া তোলা)। পরে-পরে ঘটিল যাহা, তাহা এই :—

গুরু বলিলেন—"শুনিতেছ ? না, শুনিতেছ না ?" শিষ্য বলিলেন—"শুনিতেছি! আজ্ঞা করুন্!" গুরু বলিলেন —"করতলন্যস্ত-আমলকবৎ।" শিষ্য এবারে দিব্য সজাগ! ক-এর পরে যেম্নি শুনিলেন র, অম্নি তিনি পলায়নোন্মুখ ক-কে স্মরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে র জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ত, অম্নি তিনি পলায়নোন্মুখ কর-কে স্মরণে ধরিয়া-রাখিয়া তাহার সঙ্গে ত জুড়িয়া দিলেন; তাহার পরে যেম্নি শুনিলেন ল, অম্নি তিনি পলায়নোন্মুখ করত-কে স্মরণে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সঙ্গে ল জুড়িয়া দিলেন; ল জুড়িয়া-দিয়া পাইলেন করতল। ইহার নাম সংযোজনা। এইরূপ করিয়া শিষ্যটি ক, র, ত, ল, ন্য, স্ত, আ, ম, ল, ক, ব, ৎ—এতগুলি মুহূর্ত্তপরম্পরাগত ধ্বনির মোট বাঁধিয়া একটা বিদেশীসিক্কে ওজনের শব্দ অন্তঃকরণের মুষ্টির মধ্যে ধরিয়া পাইলেন—কি ? না, করতলন্যস্ত-আমলকবৎ। এ শব্দটি অনেকের যোগে এক, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ইহারি নাম যোগাত্মক ঐক্য (synthetic unity)। মোট ঘটনাটি এই :—

শিষ্যের কর্ণ যেমন রহিয়াছে অভ্যাগত ধ্বনিপরম্পরা'র প্রতি দ্বার খুলিয়া, তাঁহার চক্ষু তেম্নি রহিয়াছে গুরুমুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া। শিষ্যের কর্ণকুহরে ধ্বনিপরম্পরা যাহা প্রবেশ করিতেছে, তাহা গুরুমুখের সহিত কার্য্যকারণসূত্রে সম্বদ্ধ। শিষ্য দুই ভাবের দুইতরো সংযোজনা এক সঙ্গে চালাইতেছেন :—একদিকে তিনি সমষ্টি-ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া অনেক ধ্বনিকে এক করিয়া ফেলিতেছেন; আর-এক দিকে তিনি কার্য্যকারণ-ভাবের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া উচ্চরিত ধ্বনিপরম্পরাকে গুরুমুখের ওষ্ঠ-কম্পনের সহিত এক করিয়া ফেলিতেছেন। গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন হ'চ্চে প্রবর্ত্তক (active), বায়ুর শাব্দিক কম্পন হ'চ্চে অনুপ্রবৃত্ত (passive)। শিষ্যের কর্ণকুহর হইতে গুরুমুখের ওষ্ঠকম্পন পর্য্যন্ত ঐ-যে এক-প্রকার প্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তকের তরঙ্গমালা নাচিয়া চলিতেছে—শিষ্য ঐ অনেকাত্মক ব্যাপারটিকে কার্য্যকারণসূত্রে গাঁথিয়া অন্তঃকরণমধ্যে এক বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এই যে দুই ভাবের দুইতরো ঐক্যসূত্র দেখিতে পাওয়া গেল—(১) সমষ্টিভাবের ঐক্যসূত্র এবং (২) কার্য্যকারণ-ভাবের ঐক্যসূত্র, এ দুই ঐক্যসূত্র একই মৌলিক ঐক্যসূত্রের দুইটি শাখা বই নয়। সে যে মৌলিক ঐক্য-সূত্র, তাহা আর-কিছু না—ক্যাণ্ট্ যাহাকে বলেন, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। একই সংবিৎ-সেনাপতি পিছনে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেক সৈন্যবিভাগের মধ্যে, তথৈব, সমগ্র সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে, একত্বের বন্ধনসূত্র সঞ্চারিত করিতেছেন।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বনি-পংক্তির পরস্পরের সহিত এবং গুরুমুখের সহিত সেই যে যোগাত্মক ঐক্য—সে ঐক্য ভাসিতেছে শিষ্যের মানস-সরোবরে (অর্থাৎ অন্তঃকরণে); আর, সেই মানস-সরোবরের কূলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং। স্বয়ং সেই যে শিষ্য, তিনিই সংযোজনা-কার্য্যের মূলাধার। কূলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন তিনি আপনাকে—আপনারই সেই সংযোজনা-কার্য্যের ফলরূপে জলে প্রতিবিম্বিত; দেখিতেছেন আপনাকে—ধ্বনি-পংক্তির যোগাত্মক ঐক্যে সমষ্টিরূপে প্রতিবিম্বিত; আর-দেখিতেছেন আপনাকে—শ্রূয়মাণ শব্দের সহিত গুরুমুখের যোগাত্মক ঐক্যে কার্য্যকারণের বন্ধনগ্রন্থি-রূপে প্রতিবিম্বিত। গুরুর মুখমণ্ডলও শিষ্যের মানস-সরোবরে ভাসিতেছে। শিষ্যের মানস-সরোবরের এপারে যেমন রহিয়াছেন শিষ্য স্বয়ং; তেম্নি, সেই মানস-সরোবরের যে-স্থানটিতে ভাসিতেছে গুরুর মুখমণ্ডল, সেই-স্থানটির ওপারে রহিয়াছেন গুরু স্বয়ং। মনে কর, মানস-সরোবর বাঁধ ভাঙিয়া সুপ্তি-গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এপার হইতে ওপারে অনায়াসে হাঁটিয়া যাওয়া যাইতে পারে—যেহেতু মাঝখানে জলের ব্যবধান নাই। তবেই হইতেছে যে, এপার এবং ওপার, একই ডাঙাভূমির দুই শৃঙ্গ—এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন শিষ্য স্বয়ং, আর-এক শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া আছেন গুরু স্বয়ং। অতএব এটা স্থির যে, এপার এবং ওপার তলে-তলে একই ডাঙাভূমি। সেই যে একই ডাঙা-ভূমি, তাহাই বাস্তবিক-সত্তা। শিষ্য স্বয়ং এবং গুরু স্বয়ং উভয়েই একই ডাঙাভূমিতে—বাস্তবিক-সত্তাতে—ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ বাস্তবিক-সত্তাকে "জানি না" বলিয়া জ্ঞান হইতে উচ্ছেদ করিলে যে ডালে আমরা বসিয়া আছি, সেই ডালকে উচ্ছেদ করা হয়। কাণ্ট্ প্রকারান্তরে তাহাই করিয়া-ছেন। লোকে দেখিয়া অবাক্ যে, কাণ্টের দার্শনিক দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তা-রূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ যজ্ঞে শিব নাই—মঙ্গল নাই।

সংশয়বাদে জ্ঞানের অসম্মতি।

কাণ্টের কথাটা কি বাস্তবিক সত্য? আকাশ কি বাস্তবিকই জ্ঞানের পথাবরোধক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর? কাল কি বাস্তবিকই জ্ঞানের অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? বাস্তবিক-সত্তা কি বাস্তবিকই মনুষ্যজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত? তবে কি এ-যাবৎকাল মহা-মহা ঋষিতপস্বীরা বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইয়া আসিতেছেন? এ বৃথা পণ্ডশ্রম না করিলেই কি নয়? প্রকৃত কথা এই যে, বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো ইহাকে বলে না—ইহাকে বলে আর-এক পদার্থ; ইহাকে বলে—ক্ষুদ্র শিশু হইয়া মাতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত বাড়ানো। মাতাকে দেখিলে ক্ষুদ্রশিশুটিও হাত না বাড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; শিশুটি হাত বাড়াইলে মাতাও তাহাকে ক্রোড়ে না লইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না;—উভয়ত এইরূপ। বাস্তবিক-সত্যের প্রতি মনুষ্যজ্ঞানের যেমন প্রাণের টান—মনুষ্যজ্ঞানের প্রতিও বাস্তবিক-সত্যের তেম্নি প্রাণের টান্। ইহাতেই বুঝিতে

পারা যাইতেছে যে, শুভ অবসরে দোঁহার সম্মিলন ঘটিতে পারা কিছুই বিচিত্র নহে—বরং তাহা না ঘটিতে পারাই বিচিত্র। কাণ্ট্ কোথা হইতে পাইলেন যে, আকাশ অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর—কাল অবিমোচ্য বন্ধনরজ্জু? দুইই শূন্যবৎ অবস্তু, তাহা কি তিনি জানেন না? আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে আর-এক কথা। আমাদের দেশের শাস্ত্রে লেখে এই যে, আকাশও প্রাচীর নহে—কালও বন্ধন নহে। প্রাচীর হ'চ্চেন অবিদ্যা (অর্থাৎ জ্ঞানাভিমানিনী অজ্ঞতা); বন্ধনও তিনিই। প্রাচীর ভাঙিবার এবং বন্ধন খুলিবার কর্ত্রী উপরে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতী মঙ্গলেচ্ছা, নীচে জীবের প্রাণের ব্যাকুলতা এবং মনের একাগ্রতা, মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের সুনির্ম্মল আলোকের অভিব্যক্তি। কাণ্টীয় দর্শনের আলোচনা হইতে আমরা বহুমূল্য সত্য একটি পাইয়াছি—কিন্তু সে সত্য সংশয়বাদ নহে; তাহা যে কি, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

৪১

হঠাৎ বিবাহ ভাঙিয়া যাওয়াতে হেমনলিনী তাহাদের সমাজের লোকের কাছে অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সে তাহার বন্ধু-অবন্ধু, আত্মীয়-পর সকলেরই প্রশ্নের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ্যতা অনেকে ভালও বাসে—এমন কি, গুরুতর শোকদুঃখের উপলক্ষ্যেও নিজেকে দশজনের কাছে ফেরি করিয়া বেড়াইতে অনেকে কুণ্ঠিত হয় না—কিন্তু আত্মপ্রচারের স্বভাব হেমনলিনীর নহে। বাণ তাহার বুকের মধ্যে কিরূপ বাজিয়াছে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন—কিন্তু তাহার পরে যখন ক্ষতপরীক্ষার জন্য চারিদিক্ হইতে কৌতূহলী সম্প্রদায়ের সমাগম হইতে লাগিল, তখন সে কোথায় মুখ লুকাইবে, তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইল না। বেচারা স্বভাবত নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছিল, বিধাতা যে বাছিয়া বাছিয়া অকস্মাৎ তাহাকে উপন্যাসের নায়িকা করিয়া তুলিবেন, এজন্য সে কোনোদিন প্রস্তুত ছিল না।

হেমনলিনী বন্ধুত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একেবারে ছাদে উঠিয়া চিলের কোঠার দ্বার বন্ধ করিয়া দিত। সে নিশ্চয় জানিত, রমেশের ব্যবহার লইয়া তাহার সম্মুখে তীব্র সমালোচনা করিয়া যাইবার জন্য সুহৃদ্‌রা, বিশেষত স্ত্রীবন্ধুরা, অত্যন্ত

ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে—এমন স্থলে পলায়ন ছাড়া সে কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

ছাদের উপরে উঠিলে রমেশের রুদ্ধদ্বার পরিত্যক্ত বাসা, নূতন অন্ধ যেমন করিয়া আকাশের আলোর দিকে তাকায়, তেম্নি করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে হেমনলিনীর দিকে যেন তাকাইয়া থাকিত—অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে সমস্ত আকাশ, সমস্ত আলোক বিবর্ণ হইয়া যাইত—মুখের উপরে অঞ্চল ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িত—বলিত, "হে ঈশ্বর, আমি আর পারিতেছি না।"

দুঃখের কারণ ও ইতিবৃত্ত যদি অস্পষ্ট থাকে, তবে দুঃখের ভিতরেও যেটুকু আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, মানুষ তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। হেমনলিনী আপন আকস্মিক দুঃখঘটনার আগাগোড়া কিছুই জানে না—মন নানারকম কল্পনা করিতে যায়, মনকে সে জোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে;—রমেশকে অপরাধী করিবার জন্য তর্ক মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়—বারংবার সেই উদ্যত তর্ককে সে দলন করিয়া ফেলে। এইরূপে, নিজের দুঃখের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিবার অবকাশ সে পাইতেছে না। বাহিরে অদৃষ্টের কাছ হইতে এবং অন্তরে আপন চিন্তার কাছ হইতে কেবলি তাহাকে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হইতেছে।

এইরূপে ত্রস্ত হরিণীর মত হেমনলিনী যখন পলায়নপরা হইয়া ছিল, তখন অন্নদা-বাবুও তাহার নাগাল পাইতেছিলেন না। হেমনলিনীর সঙ্কোচশীল প্রকৃতি তাঁহার জানা ছিল—এইজন্য বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতির মুষলধারাবর্ষণ ঠেকাইবার ভার তিনিই লইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার মন কন্যার ক্ষতবেদনার উপর স্নেহসুধা ঢালিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছে, কিন্তু নিরালায় তাহাকে কাছে পাইবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না। আত্মীয়তাভিমানীরা একেবারে হেম-নলিনীর কাছে গিয়া পড়িতে চায়, অন্নদা তাহাদিগকে নানা উপায়ে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছেন। অন্নদা স্বভাবত কৌশলী মানুষ নহেন—তিনি যেটাকে সুচতুর কায়দা বলিয়া নিজের মনে বাহাদুরী লইতেন, অন্যের কাছে তাহার কিছুই অস্পষ্ট থাকিত না। সকলেই বুঝিতে পারিল, হেমনলিনীর সহিত সাক্ষাৎ-কারে অন্নদা বাধা দিতেছেন—ইহাতে লোকে রাগ করিতে লাগিল এবং রহস্য বাড়িয়া-উঠিয়া নানাবিধ নিষ্ঠুর অমূলক অপবাদে পল্লবিত হইতে থাকিল।

এইরূপে গোলেমালে কিছুকাল কাটিয়া গেল। যখন হেমনলিনীর দিকে একটু-খানি মনোযোগ দিবার অবকাশ ঘটিল, তখন একদিন অপরাহ্নে, অনেককাল পরে হেমনলিনীর সহিত একত্রে নিভৃতে চা খাইবার প্রত্যাশায় অন্নদাবাবু তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য দোতলায় আসিলেন—দোতলায় বসিবার ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া পাইলেন না, শুইবার ঘরেও সে নাই। বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হেম-নলিনী বাহিরে কোথাও যায় নাই। তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্নদা ছাদের উপরে উঠিলেন।

তখন কলিকাতা-সহরের নানা আকার

ও আয়তনের বহুদূরবিস্তৃত ছাদগুলির উপরে হেমন্তের অবসন্ন রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিয়াছে,—দিনান্তের লঘু হাওয়াটি থাকিয়া-থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া-ফিরিয়া যাইতেছে। হেমনলিনী চিলের ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। পাঠশালায় অকস্মাৎ ছুটি পাইলে ছেলের দল যেমন হো-হা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আজ হেমনলিনীর বুকের ভিতরে তাহার ভালবাসার দিনগুলির স্মৃতি তেম্‌নি করিয়া ছাড়া পাইয়াছে— কে যে কোথা হইতে কি লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই—তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার বক্ষতল আজ কম্পমান। কঠিন মীড়ের টানে সেতারের তার ছেঁড়ে-ছেঁড়ে করিয়াও তীব্রমধুর স্বরে কাঁদিয়া বাজিয়া উঠে—হেমনলিনীর প্রাণের ভিতরে আজ তেম্‌নি প্রবল পীড়নে সব তারগুলা ক্রন্দনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়াও মধুর হইয়া বাজিয়া উঠিতেছে। রমেশের স্মৃতি তাহাকে ঘিরিয়া-ঘিরিয়া তাহার মনের ভিতরকার সমস্ত-কিছু একেবারে এলোমেলো উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে—তাহার হৃদয়কে উদাস এবং সমস্ত জগৎসংসারকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিতেছে। আকাশে কাক ডাকিয়া চলিয়াছে, গলির প্রান্তে বড়রাস্তা হইতে নানাশব্দমিশ্র কলধ্বনি অপরাহ্ণের ছুটির বেলাকে মুখরিত করিতেছে, রাস্তার ধারে ব্যাণ্ডের দলের এক মুসলমান-যুবক কর্ণেট্‌যন্ত্রে সুর-অভ্যাসের উপলক্ষ্যে একটা করুণসুরের স্বচ্গান বাজাইতেছে; এই সমস্ত শব্দ, সুর ও স্মৃতির মাঝখানে নিভৃত ছাদের এক কোণে কার্ত্তিক-অপরাহ্ণের ঝিকিমিকি আলোতে হেমনলিনী আপনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছে।

অন্নদাবাবু কখন্ তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা সে টেরও পাইল না। অবশেষে অন্নদাবাবু যখন আস্তে আস্তে তাহার পাশে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন, তখন সে চম্‌কিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই অন্নদাবাবু তাহার পাশে বসিলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না!"

বৃদ্ধের মুখে এই করুণ উক্তি শুনিবামাত্র হেমনলিনী যেন একটি সুগভীর মূর্চ্ছার ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিল। তাহার বাপের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখের উপরে কি স্নেহ, কি করুণা, কি বেদনা! এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! সংসারে হেমনলিনীকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে, তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন—কন্যার আহত হৃদয়ের কাছে বারবার ফিরিয়া-ফিরিয়া আসিতেছেন—সান্ত্বনা দিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া আজ হেমনলিনীর মাকে তাঁহার মনে পড়িতেছে এবং আপন অক্ষম স্নেহের অন্তঃস্তর হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—হঠাৎ হেমনলিনীর কাছে আজ এ সমস্তই যেন বজ্রের আলোকে প্রকাশ পাইল। ধিক্কারের আঘাতে তাহাকে আপন

শোকের পরিবেষ্টন হইতে একমুহূর্ত্ত বাহির করিয়া আনিল। যে পৃথিবী তাহার কাছে ছায়ার মত বিলীন হইয়া আসিয়াছিল, তাহা এখনি সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল। "লজ্জা, লজ্জা, ছিছি, কি লজ্জা! আমি একজন যুবককে ভালবাসিয়াছি, আমার আজকালকার সমস্ত দিনরাত্রির ব্যবহারে এই কথাই আমি নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করিয়াছি! বাপ, ভাই, চাকরবাকর, যে আমাকে দেখিতেছে, সে এই কথাই ভাবিয়া যাইতেছে যে, হেমনলিনীকে এখন কোনো কথা বলা বৃথা, উহার কাছে কোনো কাজ প্রত্যাশা করা মিথ্যা, ও একজন যুবাপুরুষকে ভালবাসে, তাহার কথা লইয়াই আছে, সংসারে এখন আর-কেহ উহার কেহই নহে!"—হঠাৎ এই মুহূর্ত্তে হেমনলিনীর মনে অত্যন্ত লজ্জার উদয় হইল! যে সকল স্মৃতির মধ্যে সে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া ছিল, সে সমস্ত বলপূর্ব্বক আপনার চারিদিক্ হইতে ঝাড়িয়া-ফেলিয়া সে আপনাকে মুক্তি দিল। জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?"

শরীর! শরীরটা যে আলোচ্যবিষয়, তাহা অন্নদা এ কয়দিন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন—"আমার শরীর! আমার শরীর ত বেশ আছে মা। তোমার যে-রকম চেহারা হইয়া আসিয়াছে, এখন তোমার শরীরের জন্যই আমার ভাবনা। আমাদের শরীর এতবৎসর পর্য্যন্ত টি'কিয়া আছে, আমাদের সহজে কিছু হয় না—তোদের এই দেহটুকু যে সেদিনকার, ভয় হয় পাছে ঘা সহিতে না পারে।" এই বলিয়া আস্তে আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বাবা, মা যখন মারা যান, তখন আমি কতবড় ছিলাম?"

অন্নদা। তুই তখন তিন বছরের মেয়ে ছিলি, তখন তোর কথা ফুটিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি, 'মা কোথা?' আমি বলিলাম, 'মা তাঁর বাবার কাছে গেছেন।' তোর জন্মাবার পূর্ব্বেই তোর মার বাবার মৃত্যু হইয়াছিল, তুই তাঁকে জানিতিস্ না। আমার কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিলি। খানিকক্ষণ বাদে আমার হাত ধরিয়া তোর মার শূন্য শয়নঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিলি। তোর বিশ্বাস ছিল, আমি তোকে সেখানকার শূন্যতার ভিতর হইতে একটা সন্ধান বলিয়া দিতে পারিব। তুই জানিতিস্ তোর বাবা মস্ত লোক, এ কথা তোর মনেও হয় নাই যে, যেগুলো আসল কথা, সেগুলোর সম্বন্ধে তোর মস্ত বাবা শিশুরই মত অজ্ঞ ও অক্ষম। আজও সেই কথা মনে হয় যে, আমরা কত অক্ষম—ঈশ্বর বাপের মনে স্নেহ দিয়াছেন, কিন্তু কত অল্পই ক্ষমতা দিয়াছেন!

এই বলিয়া তিনি হেমনলিনীর মাথার উপরে একবার তাঁহার ডান হাত স্পর্শ করিলেন।

হেমনলিনী পিতার সেই কল্যাণবর্ষী কম্পিতহস্ত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া-লইয়া তাহার উপরে অন্য হাত

বুলাইতে লাগিল। কহিল, "মাকে আমার খুব অল্প একটুখানি মনে পড়ে। আমার মনে পড়ে—দুপুরবেলায় তিনি বিছানায় শুইয়া বই লইয়া পড়িতেন, আমার তাহা কিছুতেই ভাল লাগিত না, আমি বই কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতাম।"

ইহা হইতে আবার সেকালের কথা উঠিল। মা কেমন ছিলেন, কি করিতেন, তখন কি হইত, এই আলোচনা হইতে হইতে সূর্য্য অস্তমিত এবং আকাশ মলিন তাম্রবর্ণ হইয়া আসিল। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম্ম ও কোলাহল, তাহারি মাঝখানে একটি গলির বাড়ীর ছাদের কোণে এই বৃদ্ধ ও নবীনা, দুটিতে মিলিয়া, পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মাণ-ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

এমন-সময় সিঁড়িতে যোগেন্দ্রের পায়ের শব্দ শুনিয়া দুইজনের গুঞ্জনালাপ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল এবং চকিত হইয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া উভয়ের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল এবং কহিল, "হেমের সভা বুঝি আজকাল এই ছাদেই?"

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি এই যে একটা শোকের কালিমা লাগিয়াই আছে, ইহাতে তাহাকে প্রায় বাড়ীছাড়া করিয়াছে। অথচ বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে গেলে হেমনলিনীর বিবাহ লইয়া নানা জবাবদিহির মধ্যে পড়িতে হয় বলিয়া কোথাও যাওয়াও মুস্কিল। সে কেবলি বলিতেছে—"হেমনলিনী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েদের ইংরাজি গল্পের বই পড়িতে দিলে এইরূপ দুর্গতি ঘটে। হেম ভাবিতেছে, 'রমেশ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আমার হৃদয় ভাঙিয়া যাওয়া উচিত',—তাই সে আজ খুব সমারোহ করিয়া হৃদয় ভাঙিতে বসিয়াছে। নভেল-পড়া কয়জন মেয়ের ভাগ্যে ভাল-বাসার নৈরাশ্য সহিবার এমন চমৎকার সুযোগ ঘটে!"

যোগেন্দ্রের কঠিন বিদ্রূপ হইতে কন্যাকে বাঁচাইবার জন্য অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আমি হেমকে লইয়া একটুখানি গল্প করিতেছি।"—যেন তিনিই গল্প করিবার জন্য হেমকে ছাদে টানিয়া আনিয়াছেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "কেন, চায়ের টেবিলে কি আর গল্প হয় না? বাবা, তুমিসুদ্ধ হেমকে ক্ষ্যাপাইবার চেষ্টায় আছ! এমন করিলে ত বাড়ীতে টেঁকা দায় হয়!"

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "বাবা, এখনো কি তোমার চা খাওয়া হয় নাই?"

যোগেন্দ্র—"চা ত কবিকল্পনা নয় যে, সন্ধ্যাবেলাকার আকাশের সূর্য্যাস্ত-আভা হইতে আপনি ঝরিয়া পড়িবে। ছাদের কোণে বসিয়া থাকিলে চায়ের পেয়ালা ভরিয়া উঠে না, এ কথাও কি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে?"

অন্নদা হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"আমি যে আজ চা খাইব না বলিয়া ঠিক করিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। কেন বাবা, তোমরা সকলেই তপস্বী হইয়া উঠিবে নাকি? তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? বায়ু-আহারটা আমার সহ্য হয় না।

অন্নদা। না না, তপস্যার কথা হইতেছে না; কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নাই, তাই ভাবিতেছিলাম আজ চা না খাইয়া দেখা যাক্ কেমন থাকি!

বস্তুত হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিবার সময় পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্ত্তি অনেকবার অন্নদাবাবুকে প্রলুব্ধ করিয়া গেছে, কিন্তু আজ উঠিতে পারেন নাই। অনেকদিন পরে আজ হেম তাঁহার সঙ্গে সুস্থভাবে কথা কহিতেছে, এই নিভৃত ছাদে দুটিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর-নিবিড়-ভাবে আলাপ পূর্ব্বে ত তাঁহার কখনো মনে পড়ে না। এ আলাপ এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় তুলিয়া-লইয়া যাওয়া সহিবে না—নড়িবার চেষ্টা করিলেই ভীরু হরিণের মত সমস্ত জিনিষ ছুটিয়া পালাইবে। সেই-জন্যই অন্নদাবাবু আজ চা-পাত্রের মুহুর্মুহু আহ্বান উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবু যে চা-পান রহিত করিয়া অনিদ্রার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা হেমনলিনী বিশ্বাস করিল না—সে কহিল, "চল বাবা, চা খাইবে চল!" অন্নদাবাবু সেই মুহূর্ত্তেই অনিদ্রার আশঙ্কাটা বিস্মৃত হইয়া ব্যগ্রপদেই টেবিলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চা খাইবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই অন্নদাবাবু দেখিলেন, অক্ষয় সেখানে বসিয়া আছে। তাঁহার মনটা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, হেমের মন আজ একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, অক্ষয়কে দেখিলেই আবার বিকল হইয়া উঠিবে,—কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নাই। মুহূর্ত্তপরেই হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় তাহাকে দেখিয়াই উঠিয়া পড়িল, কহিল, "যোগেন্, আমি আজ তবে আসি!"

হেমনলিনী কহিল, "কেন অক্ষয়বাবু, আপনার কি কোনো কাজ আছে? এক-পেয়ালা চা খাইয়া যান্।"

হেমনলিনীর এই অভ্যর্থনায় ঘরের সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। অক্ষয় পুনর্ব্বার আসনগ্রহণ করিয়া কহিল, "আপনাদের অবর্ত্তমানেই আমি দু'পেয়ালা চা খাইয়াছি—পীড়াপীড়ি করিলে আরো দুপেয়ালা যে চলে না, তাহা বলিতে পারি না!"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "চায়ের পেয়ালা লইয়া আপনাকে কোনোদিন ত পীড়াপীড়ি করিতে হয় নাই।"

অক্ষয় কহিল—"না, ভাল জিনিষকে আমি কখনো প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরিতে দিই না, বিধাতা আমাকে ঐটুকু বুদ্ধি দিয়াছেন।"

যোগেন্দ্র কহিল—"সেই কথা স্মরণ করিয়া ভাল জিনিষও যেন তোমাকে কোনোদিন প্রয়োজন নাই বলিয়া ফিরাইয়া না দেয়, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি!"

অনেকদিন পরে অন্নদার চায়ের টেবিলে কথাবার্ত্তা বেশ সহজভাবে জমিয়া উঠিল। সচরাচর হেমনলিনী শান্তভাবে হাসিয়া থাকে, আজ তাহার হাসির ধ্বনি মাঝেমাঝে কথোপকথনের উপরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অন্নদাবাবুকে সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর অন্যায় দেখ—কয়দিন তোমার পিল্ না খাইয়াও উনি দিব্যি ভাল

আছেন! যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে অন্তত মাথাও ধরিত।"

যোগেন্দ্র। ইহাকেই বলে পিল্-হারামী!

অন্নদাবাবু অত্যন্ত খুসি হইয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেকদিন পরে আবার যে তাঁহার পিল্‌বাক্সের উপরে আত্মীয়স্বজনের কটাক্ষপাত আরম্ভ হইয়াছে, ইহা তিনি পারিবারিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিলেন—তাঁহার মন হইতে একটা ভার নামিয়া গেল!

তিনি কহিলেন, "এই বুঝি! লোকের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ! আমার পিলাহারী দলের মধ্যে ঐ একটিমাত্র অক্ষয় আছে—তাহাকেও ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা!"

অক্ষয় কহিল, "সে ভয় করিবেন না অন্নদাবাবু! অক্ষয়কে ভাঙাইয়া লওয়া শক্ত!"

যোগেন্দ্র। মেকিটাকার মত—ভাঙাইতে গেলে পুলিস্‌কেস্ হইবার সম্ভাবনা!

এইরূপে হাস্যালাপে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলের উপর হইতে যেন অনেকদিনের এক ভূত ছাড়িয়া গেল।

আজিকার এই চায়ের সভা শীঘ্র ভাঙিত না—কিন্তু আজ যথাসময়ে হেমনলিনীর চুলবাঁধা হয় নাই বলিয়া তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইল—তখন অক্ষয়েরও একটা বিশেষ কাজের কথা মনে পড়িল—সেও চলিয়া গেল।

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, আর বিলম্ব নয়—এইবেলা হেমের বিবাহের জোগাড় কর!"

অন্নদাবাবু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যোগেন্দ্র কহিল—"রমেশের সহিত বিবাহ ভাঙিয়া-যাওয়া লইয়া সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে—ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব। সকল কথা যদি খোলসা করিয়া বলিবার জো থাকিত, তাহা হইলে ঝগড়া করিতে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হেমের জন্য যে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারি না—কাজেই হাতাহাতি করিতে হয়। সেদিন অখিলকে চাবকাইয়া আসিতে হইয়াছিল—শুনিলাম, সে লোকটা যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়াছিল। শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত কথা চুকিয়া যায় এবং আমাকেও পৃথিবীসুদ্ধ লোককে দিনরাত্রি আস্তিন তুলিয়া শাসাইয়া বেড়াইতে হয় না! আমার কথা শোন, আর দেরি করিয়ো না।"

অন্নদা। বিবাহ কাহার সঙ্গে হইবে যোগেন্?

যোগেন্দ্র। একটিমাত্র লোক আছে। যে কাণ্ড হইয়া গেল এবং যে সমস্ত কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে, তাহাতে পাত্র পাওয়া অসম্ভব। কেবল বেচারা অক্ষয় রহিয়াছে—তাহাকে কিছুতেই দমাইতে পারে না! তাহাকে পিল্ খাইতে বল পিল্ খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে!

অন্নদা। পাগল হইয়াছ যোগেন্? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে!

যোগেন্দ্র। তুমি যদি গোল না কর ত আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"না যোগেন না, তুমি হেমকে কিছুই বোঝ না। তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কষ্ট দিয়া অস্থির

করিয়া তুলিবে। এখন তাহাকে কিছুদিন সুস্থ থাকিতে দাও—সে বেচারা অনেক কষ্ট পাইয়াছে। বিবাহের ঢের সময় আছে!”

যোগেন্দ্র কহিল, “আমি তাহাকে কিছুমাত্র পীড়ন করিব না. যতদূর সাবধানে ও মৃদুভাবে কাজ উদ্ধার করিতে হয়, তাহার ক্রটি হইবে না। তোমরা কি মনে কর, আমি ঝগড়া না করিয়া কথা কহিতে পারি না?”

যোগেন্দ্র অধীরপ্রকৃতির লোক। সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় চুলবাঁধা সারিয়া হেমনলিনী বাহির হইবামাত্র যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “হেম, একটা কথা আছে।”

কথা আছে শুনিয়া হেমের হৃৎকম্প হইল। যোগেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া আস্তে আস্তে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, “হেম, বাবার শরীরটা কি-রকম খারাপ হইয়াছে দেখিয়াছ!”

হেমনলিনীর মুখে একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইল; সে কোনো কথা কহিল না।

যোগেন্দ্র। আমি বলিতেছি, ইহার একটা প্রতিকার না করিলে উনি একটা শক্ত ব্যামোয় পড়িবেন।

হেমনলিনী বুঝিল, পিতার এই অস্বাস্থ্যের জন্ম অপরাধ তাহারই উপরে পড়িতেছে। সে মাথা নীচু করিয়া ম্লানমুখে কাপড়ের পাড় লইয়া টানিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র কহিল, “যা হইয়া গেছে, সে ত হইয়াই গেছে, তাহা লইয়া যতই আক্ষেপ করিতে থাকিব, ততই আমাদের লজ্জার কথা। এখন বাবার মনকে যদি সম্পূর্ণ সুস্থ করিতে চাও, তবে যত শীঘ্র পার, এই সমস্ত অপ্রিয় ব্যাপারের একেবারে গোড়া মারিয়া ফেলিতে হইবে!”

এই বলিয়া উত্তর প্রত্যাশা করিয়া যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হেম সলজ্জমুখে কহিল, “এ সমস্ত কথা লইয়া আমি যে কোনোদিন বাবাকে বিরক্ত করিব, এমন সম্ভাবনা নাই।”

যোগেন্দ্র। তুমি ত করিবে না জানি, কিন্তু তাহাতে ত অন্য লোকের মুখ বন্ধ হইবে না।

হেম কহিল, “তা আমি কি করিতে পারি বল।”

যোগেন্দ্র। চারিদিকে এই যে সব নানা কথা উঠিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার একটিমাত্র উপায় আছে।

যোগেন্দ্র যে উপায় মনে মনে ঠাওরাইয়াছে, হেমনলিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, “এখনকার মত কিছুদিন বাবাকে লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে গেলে ভাল হয় না? দুচার মাস কাটাইয়া আসিলে ততদিনে সমস্ত গোল থামিয়া যাইবে।”

যোগেন্দ্র কহিল, “তাহাতেও সম্পূর্ণ ফল হইবে না। তোমার মনে কোনো ক্ষোভ নাই, যতদিন বাবা এ কথা নিশ্চয় না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া থাকিবে—ততদিন তাঁহাকে কিছুতেই সুস্থ হইতে দিবে না।”

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া ফেলিল—কহিল, “আমাকে কি করিতে বল?”

যোগেন্দ্র কহিল, "তোমার কানে কঠোর শুনাইবে আমি জানি, কিন্তু সকল দিকের মঙ্গল যদি চাও, তোমাকে কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যোগেন্দ্র অধৈর্য্য সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "হেম, তোমরা কল্পনাদ্বারা ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলিতে ভালবাস। তোমার বিবাহসম্বন্ধে যেমন গোলমাল ঘটিয়াছে, এমন কত মেয়ের ঘটিয়া থাকে—আবার চুকিয়া-বুকিয়া পরিষ্কার হইয়া যায়—নহিলে, ঘরের মধ্যে কথায় কথায় নভেল তৈরি হইতে থাকিলে ত লোকের প্রাণ বাঁচে না। 'চিরজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া ছাদে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিব, সেই অপদার্থ মিথ্যাচারীটার স্মৃতি হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করিব'—পৃথিবীর লোকের সাম্‌নে এই সমস্ত কাব্য করিতে তোমার লজ্জা করিবে না,—কিন্তু আমরা যে লজ্জায় মরিয়া যাই! ভদ্র গৃহস্থঘরে বিবাহ করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্মীছাড়া কাব্য, যত শীঘ্র পার, চুকাইয়া ফেল।"

লোকের চোখের সাম্‌নে কাব্য হইয়া উঠিবার লজ্জা যে কতখানি, তাহা হেমনলিনী বিলক্ষণ জানে, এইজন্য যোগেন্দ্রের বিদ্রূপ-বাক্য তাহাকে ছুরির মত বিঁধিল। সে কহিল, "দাদা, আমি কি বলিতেছি সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকিব, বিবাহ করিব না!"

যোগেন্দ্র কহিল, "তাহা যদি না বলিতে চাও ত বিবাহ কর। অবশ্য, তুমি যদি বল, স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনী-ব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মত কটা জিনিষই বা মেলে—যাহা পাওয়া যায়, মনকে তাহারই মত করিয়া লইতে হয়। আমি ত বলি, ইহাতেই মানুষের যথার্থ মহত্ব।"

হেমনলিনী মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, "দাদা, তুমি আমাকে এমন করিয়া খোঁটা দিয়া কথা বলিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে পছন্দ লইয়া কোনো কথা বলিয়াছি?"

যোগেন্দ্র। বল নাই বটে, কিন্তু আমি দেখিয়াছি—অকারণে এবং অন্যায় কারণে তোমার কোনো কোনো হিতৈষী বন্ধুর উপরে তুমি স্পষ্ট বিদ্বেষপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না। কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এ জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন লোককে দেখা গেছে, যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে, তোমার সমস্ত দুর্ব্যবহার নতশিরে গ্রহণ করিয়াছে এবং যে তোমার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে। এই কারণে আমি তাহাকে মনে মনে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য জীবন দিতে পারে, এমন স্বামী যদি চাও, তবে সে লোককে খুঁজিতে হইবে না। আর যদি কাব্য করিতে চাও, তবে—

হেমনলিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এমন করিয়া তুমি আমাকে বলিয়ো না! বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, যাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন, আমি পালন করিব। যদি না করি, তখন তোমার কাব্যের কথা তুলিয়ো।"

যোগেন্দ্র তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া কহিল, "হেম, রাগ করিয়ো না বোন্‌। আমার মন খারাপ হইয়া গেলে মাথার ঠিক থাকে না জান ত—তখন যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিয়া বসি। আমি কি ছেলেবেলা হইতে তোমাকে দেখি নাই—আমি কি জানি না, লজ্জা তোমার পক্ষে কত স্বাভাবিক এবং বাবাকে তুমি কত ভালবাস।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। যোগেন্দ্র তাহার বোনের উপর না জানি কিরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহাই কল্পনা করিয়া অন্নদা তাঁহার ঘরে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া ছিলেন—ভাই-বোনের কথোপকথনের মাঝখানে গিয়া পড়িবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলেন, এমন-সময় যোগেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল—অন্নদা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, হেম বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি মনে করিতেছ, আমি বুঝি খুব বেশি জেদ করিয়া তাহাকে রাজি করাইয়াছি—তাহা মোটেই নয়। এখন, তুমি তাহাকে একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে অক্ষয়কে বিবাহ করিতে আপত্তি করিবে না।"

অন্নদা কহিলেন—"আমাকে বলিতে হইবে?"

যোগেন্দ্র। তুমি না বলিলে সে কি নিজে আসিয়া বলিবে 'আমি অক্ষয়কে বিবাহ করিব?' আচ্ছা, নিজের মুখে তোমার বলিতে যদি সঙ্কোচ হয়, তবে আমাকে অনুমতি কর, আমি তোমার আদেশ তাহাকে জানাই-গে।

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না না, আমার যাহা বলিবার, আমি নিজেই বলিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কি? আমার মতে আর কিছুদিন যাইতে দেওয়া উচিত।"

যোগেন্দ্র কহিল, "না বাবা, বিলম্বে নানা বিঘ্ন হইতে পারে—এরকম ভাবে বেশিদিন থাকা কিছু নয়।"

যোগেন্দ্রের জেদের কাছে বাড়ীর কাহারো পারিবার জো নাই—সে যাহা ধরিয়া বসে, তাহা সাধন না করিয়া ছাড়ে না। অন্নদা তাহাকে মনে মনে ভয় করেন। তিনি আপাতত কথাটাকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা আমি বলিব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, আজই বলিবার উপযুক্ত সময়। সে তোমার আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। আজই যা হয় একটা শেষ করিয়া ফেল!"

অন্নদা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি ভাবিলে চলিবে না—হেমের কাছে একবার চল।"

অন্নদা কহিলেন, "যোগেন্‌, তুমি থাক, আমি একলা তাহার কাছে যাইব।"

যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম।"

অন্নদা বসিবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার। তাড়াতাড়ি একটা কোচের উপর হইতে কে একজন ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এবং পরক্ষণেই একটি অশ্রু আর্দ্র কণ্ঠ কহিল, "বাবা, আলো নিবিয়া গেছে—বেহারাকে জ্বালিতে বলি।"

আলো নিবিবার কারণ অন্নদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন—তিনি বলিলেন, "থাক্‌ না

মা, আলোর দরকার কি।"—বলিয়া হাত্ড়াইয়া হেমনলিনীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

হেম কহিল, "বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না।"

অন্নদা কহিলেন, "তাহার বিশেষ কারণ আছে মা—শরীরটা বেশ ভাল আছে বলিয়াই যত্ন করি না। তোমার শরীরটার দিকে তুমি একটু তাকাইয়ো হেম!"

হেমনলিনী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা সকলেই ঐ একই কথা বলিতেছ—ভারি অন্যায় বাবা! আমি ত বেশ সহজ মানুষেরই মত আছি—শরীরের অযত্ন করিতে আমাকে কি দেখিলে বল ত! যদি তোমাদের মনে হয়, শরীরের জন্য আমার কিছু করা আবশ্যক, আমাকে বল না কেন? আমি কি কখনো তোমার কোনো কথায় 'না' বলিয়াছি বাবা?"—শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা দ্বিগুণ আর্দ্র শুনাইল।

অন্নদা ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন—"কখ্খনো না মা! তোমাকে কখনো কিছু বলিতেও হয় নাই—তুমি আমার মা কি না, তাই তুমি আমার অন্তরের কথা জান—তুমি আমার ইচ্ছা বুঝিয়া কাজ করিয়াছ। আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ যদি ব্যর্থ না হয়, তবে ঈশ্বর তোমাকে চিরসুখিনী করিবেন।"

হেম কহিল, "বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না?"

অন্নদা। কেন রাখিব না?

হেম। যতদিন না দাদার বৌ আসে, অন্তত ততদিন ত থাকিতে পারি! আমি না থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে?

অন্নদা। আমাকে দেখা! ও কথা বলিস্‌-নে মা! আমাকে দেখিবার জন্য তোদের লাগিয়া থাকিতে হইবে, আমার সে মূল্য নাই।

হেম কহিল, "বাবা, ঘর বড় অন্ধকার—আলো আনি।"—বলিয়া পাশের ঘর হইতে একটা হাতলণ্ঠন আনিয়া ঘরে রাখিল। কহিল, "কয়দিন গোলেমালে সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনানো হয় নাই। আজকে শোনাইব।"

অন্নদা উঠিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একটু বোস্ মা, আমি আসিয়া শুনিতেছি।"—বলিয়া, যোগেন্দ্রের কাছে গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বলিবেন, "আজ কথা হইতে পারিল না, আর একদিন হইবে।" কিন্তু যেই যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল বাবা? বিবাহের কথা বলিলে?"—অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন—"হাঁ বলিয়াছি।"—তাঁহার ভয় ছিল, পাছে যোগেন্দ্র নিজে গিয়া হেমনলিনীকে ব্যথিত করিয়া তোলে।

যোগেন্দ্র কহিল—"সে অবশ্য রাজি হইয়াছে?"

অন্নদা। হাঁ, একরকম রাজি বই কি?

যোগেন্দ্র কহিল—"তবে আমি অক্ষয়কে বলিয়া আসি-গে!"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না না, অক্ষয়কে এখন' কিছু বলিয়ো না। বুঝিয়াছ যোগেন, অত বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে। এখন কাহাকেও কিছু বলিবার দরকার নাই—আমরা বরঞ্চ একবার পশ্চিমে বেড়াইয়া আসি-গে, তার পরে সমস্ত ঠিক হইবে।"

যোগেন্দ্র সে কথার কোনো উত্তর না

করিয়া চলিয়া গেল। কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া একেবারে অক্ষয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। অক্ষয় তখন একখানা ইংরাজি মহাজনী হিসাবের বই লইয়া 'বুক্‌কীপিঙ্‌' শিখিতেছিল। যোগেন্দ্র তাহার খাতাপত্র টান দিয়া ফেলিয়া কহিল—"ও সব পরে হইবে, এখন তোমার বিবাহের দিন ঠিক কর।"

অক্ষয় কহিল—"বল কি!"

ক্রমশ।

কাছে
—সে যা
করিয়া

ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য।

যাপান।

[শেষ প্রস্তাব।]

যাপান উত্তরোত্তর অধিক ঘনিষ্ঠভাবে ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। একদা ইয়ুরোপ এইরূপে পুরাতন গ্রীস ও রোমের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সভ্যসমাজ যে সকল তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইতেছে, তাহাও যাপানকে ভারতবর্ষের দিকে আকর্ষণ করিবার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের সাহিত্যে তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইলে, তাহা আমাদিগকেও এশিয়াখণ্ডের নানাদেশের দিকে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে আকর্ষণ করিবার কারণ হইয়া উঠিবে।

সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ করিবার পর, গৃহকোটরনিবদ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল কেবল ক্ষুদ্রতা ও পরাধীনতার আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া, দিনদিন মলিন ও আশাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে 'বর্ত্তমান' অন্ধতমসাচ্ছন্ন দীর্ঘরজনীর ন্যায় নিরতিশয় অপ্রীতিকর: 'ভবিষ্যৎ' কতদূরে,—কোন্ কুটিল কুজ্ঝটিকার সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! এরূপ অবস্থায় 'অতীতের' আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়াই প্রতিভাত হইবার কথা!

তথাপি অতীতের আলোচনাকে একেবারে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় না। অতীত বর্ত্তমানকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে; বর্ত্তমান আবার ভবিষ্যৎকে গঠন করিয়া তুলিবে। ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান নিয়ত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। অতীতের আলোচনায় বর্ত্তমানের দুঃখদুর্গতির কারণ আবিষ্কার করিয়া, মানবসমাজ ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে শিক্ষালাভ করে। অতীতের আলোচনা অতীত-গৌরবের আত্মশ্লাঘায় মানবসমাজকে কিয়ৎপরিমাণে স্ফীত করিবে, এ আশঙ্কা থাকিলেও, সেই আত্মশ্লাঘার ভিতর দিয়াই নানা সুশিক্ষার বীজ বিতরণ

করিতে পারে। অতীতের আলোচনা বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে সেই সুশিক্ষার বীজ বিতরণ করিলে, প্রত্নতত্ত্বালোচনা অবশ্যই সফল হইবে। সেদিন এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে; এখনও তাহার শুভাগমন-জনিত উত্তেজনা অনুভূত হয় নাই। আত্ম-বোধ প্রবুদ্ধ না হইলে, সে উত্তেজনা কদাপি অনুভূত হয় না। আমাদের আত্মবোধ এখনও নিদ্রানিমগ্ন,— অচেতন, অথবা মৃত-কল্প! তজ্জন্যই আমাদের সাহিত্যে 'প্রত্নতত্ত্ব' পাঠকসমাজের নিকট বিভীষিকা বলিয়া পরিচিত; কেবল বিস্ময়াস্পদ কবিতা বা উপন্যাসই কর্ম্মক্লান্ত নিদ্রাতুর জনসমাজকে সুধীর-ব্যজনে নিয়ত নিদ্রানিমগ্ন করিতেছে!

সেদিন কত দূরে? সে সাহিত্য কোন্ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের লেখনীধারণের প্রতী-ক্ষায় চিরায়মাণ? যে সাহিত্য এই বিশ্ববিখ্যাত পুরাতন সভ্যসমাজকে পুনরায় আত্মবোধে সমুন্নত করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা এখনও বহুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার প্রয়োজন অনুভূত না হইলে, সে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে না। তাহার অভাবে আমরা ক্রমশ অতীতবিচ্যুত লক্ষ্য-ভ্রষ্ট কৃপাপাত্র জঘন্য জীবের ন্যায় কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি!

যাপানের সাহিত্যই যাপানকে নবজীবন দান করিয়া অল্পকালের মধ্যে সভ্যসমাজে যাপানের গৌরবঘোষণায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। সে সাহিত্য যাপানকে আত্মবোধ প্রদান করিয়া, আত্মনির্ভরের মূলমন্ত্রে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। যাপান বুঝিয়াছে,— যাপানের ইতিহাসের মধ্যেই যাপানের অভ্যু-দয়ের আশা! অভ্যুদয়ের আশা সকল জাতির পক্ষেই তাহাদের ইতিহাসের মধ্যে লুক্কায়িত। যে পারিয়াছে, সে আবার পারিবে;—ইতি-হাস নিয়ত এই মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া, পতিতজাতির উদ্ধারসাধনের পথ প্রদর্শন করে। কি কারণে পারিয়াছিল; কি কারণে একদিন পারিয়া, অন্যদিন অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—ইতিহাস ভিন্ন কে তাহার রহস্যভেদ করিবে? যাপানের ইতিহাস যাপানের অভ্যুদয়সাধনের জন্য এই অভ্যুদয়-সাধক ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রচার করিয়াই নূতন আশায়, নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যাপানের কাব্যের ভিতর দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, উপন্যাসের ভিতর দিয়া, সেই এক স্বর মধুরনিক্কণে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া যাপান চাহিয়া দেখিয়াছে,—তাহার পুরাতন অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ ভারতবর্ষ। তাই ভারতবর্ষকে "ভাবের মাতৃভূমি" বলিয়া যাপানের অভিনব সাহিত্য তাহার প্রতি ক্রমে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে!

যাপান ইতিহাস খুলিয়া দেখিয়াছে,— স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে নানা দেশের লোকে নানা সময়ে যাপানদ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করিয়া আসিতেছে। যে যখন যাপানে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই বস্ত্রাভ্যন্তরে বর্ম্মাচ্ছাদিত শাণিত অস্ত্র, মুখে শান্তি, প্রীতি ও সদ্ভাবকাহিনী! মুসলমান ও খৃষ্টানকে এই কারণে যাপানের ইতিহাস কেবল আক্রমণ-কারিদস্যুরূপে প্রতিভাত করিয়াছে। যে যাপান এইরূপে বিদেশের লোকের প্রত্যেক চরণবিক্ষেপে কোন-না-কোন সন্দেহ পোষণ

করিয়া, বিদেশের ধর্ম্মপ্রচারকগণকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়া, বিদেশের লোকের পক্ষে যাপানের অভ্যন্তরে বিচরণ করিবার স্বাধীন চেষ্টায় বাধাপ্রদান করিয়াছে; সেই যাপান তাহার ইতিহাসের ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে,—সমগ্র বিদেশের লোকের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষের লোকেই সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে যাপানে পদার্পণ করিয়াছিল। সেকালের বৌদ্ধসন্ন্যাসীর পবিত্র পীতবস্ত্রের অভ্যন্তরে নিঃস্বার্থ সদ্ভাবপূর্ণ সরলপ্রাণ স্পন্দিত হইয়া, যাপানের অভ্যুদয়সাধনের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ দান করিবার জন্য মুক্তহস্তে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া, যাপানের শিল্প, সাহিত্য ও সামাজিক জীবনের উপর জ্ঞানসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল; দানের ছলনা করিয়া অপহরণ করিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। প্রবুদ্ধ যাপান চাহিয়া দেখিয়াছে,—ভারতবর্ষই তাহাদের "ভাবের মাতৃভূমি"—মাতার ন্যায় স্তন্যদান করিয়া যাপানকে ইহ-পরকালের পুণ্যপথে বিচরণ করিবার জন্য শক্তিদান করিয়াছে; ডাকিনীর ন্যায় স্নেহের ছলনায় রক্তশোষণ করে নাই! যাপান এই "ভাবের মাতৃভূমি"র প্রতি আকৃষ্ট না হইবে কেন?

মানবসমাজের ইতিহাসে প্রত্যেক দেশেরই কিছু-না-কিছু প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন্ দেশের ইতিহাস মানবজাতির সমুন্নতিসাধনের কিরূপ চেষ্টার পরিচয় প্রদান করে, সভ্যসমাজ যেদিন তাহার আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবে, সেদিন ভারতবর্ষের পূর্ব্বগৌরব পুনরায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইবার সময় উপস্থিত হইবে। ইতিহাসের এই বিজয়বার্ত্তা অদ্যাপি সর্ব্বত্র সুপরিচিত হয় নাই। তজ্জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রকৃত মর্য্যাদা অনুভূত হইতেছে না। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ যেন অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, তর্জ্জনীহেলনে তারাবে চীৎকার করিয়া কহিতেছেন,—"ভারতবর্ষের ইতিহাসের আবার গৌরব কি? ভারতবর্ষ তাহার ক্ষুদ্রসীমার বাহিরে একপাদ ভূমিও অপহরণ করিতে পারে নাই! যাহা পাইয়াছিল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধীরে ধীরে অযোগ্যের ন্যায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া কাঙাল হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের ইতিহাসই ইহার অসারতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ!" দস্যুদলের বিচারে দস্যু ভিন্ন ধর্ম্মভীরু গৃহস্থের প্রশংসালাভের সম্ভাবনা নাই। তাই ভারতবর্ষ ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্কিত। এই কলঙ্কই ভারতবর্ষের শুভ্রললাটের সমুজ্জ্বল রত্নতিলক!

সেদিন ভারতবর্ষের বাহিরে, জলে-স্থলে ভারতবর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্যশক্তিশালী মানবসমাজ বর্ত্তমান থাকিলে, তাহার

* It might therefore be justly said that India has no place in the political history of the world. * * * * * * An expedition like that of Alexander could never have been conceived by an Indian king, and the ambition of native conquerors, in those few cases where it existed, never went beyond the limits of India itself—Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature, p. 31.

ভয়ে ভারতবর্ষ পররাষ্ট্রলুণ্ঠনে নিরস্ত থাকিতে পারিত। সেদিন কে ভারতবর্ষের আক্রমণের গতিরোধ করিতে পারিত? আজ অসভ্যসমাজ সভ্যসমাজের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে পারে না; সেদিনও অসভ্যসমাজের পক্ষে সুসভ্য ভারতবর্ষের আক্রমণবেগ সহ্য করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি ভারতবর্ষ অসহায় প্রতিবেশীর রাজ্যহরণের চেষ্টা করে নাই। তস্করবৃত্তি ভারতবর্ষের সমুন্নত রাজনীতিকে কলঙ্কিত করে নাই বলিয়াই ভারতবর্ষের কলঙ্ক হইতে পারে না। ভারতবর্ষ জ্ঞানসাম্রাজ্যসংস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা অতীতে সফল হইয়াছিল; বর্ত্তমানে আবার নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যসমাজ ক্রমে সংযত না হইয়া অসংযত হইয়া উঠিতেছে। মানব আবার পীড়িতকণ্ঠে শান্তিলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য পুনরায় বিস্তৃত না হইলে, সে আকুল আর্ত্তনাদ তিরোহিত হইবার আশা নাই!

এশিয়া এক। এশিয়া অখণ্ড মহাদেশ। এশিয়া ধর্ম্মে, ভাষায়, আচারব্যবহারে বহুধা বিভক্ত হইলেও, তাহার বিভিন্নতার মধ্যেই একতার গুপ্তস্রোত প্রবাহিত। সে স্রোত একদা ভারতবর্ষ হইতে প্রবাহিত হইয়া, সমগ্র এশিয়াখণ্ডকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। যাপান সেই পুরাতন স্রোতের সন্ধানলাভ করিয়া, অধঃপতিত এশিয়াখণ্ডের হৃৎপিণ্ডের ন্যায় নবস্পন্দনে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র এশিয়াখণ্ড যেন যাপানের প্রাণের স্পন্দনে মৃতকল্পশরীরে পুনরায় চেতনাসঞ্চারের সূত্রপাত লক্ষ্য করিতেছে।

এশিয়ার ধর্ম্ম মানব-ধর্ম্ম। এশিয়ার শাক্য, খৃষ্ট, মহম্মদ, ত্রাঁহাই পুনঃপুন প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ তাহার বহিরঙ্গের অনুষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিয়া, মূলসত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! ইউরোপ বাহুবলোন্মত্ত-পশুধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত হইয়া, এশিয়ার শ্রদ্ধা-আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াও, অশ্রদ্ধা লাভ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে। জ্ঞানসাম্রাজ্যের তুলনায় শক্তিসাম্রাজ্যের এইরূপ পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপ বিজয়লাভ করিয়াও পরাভূত; এশিয়া বিজিত হইয়াও, অপরাজিত পূর্ব্বগৌরবে মানবসমাজের অকপট ইতিহাসলেখকের প্রতীক্ষায় নীরবে দিনগণনা করিতেছে!

ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য সুদূর যাপানদ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইবার সময়ে, চীন ও কোরিয়া দেশের নানা কুসংস্কারের প্রভাবে যাপানে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশের ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধশ্রমণগণ তাহার পরিচয় পাইবামাত্র, ভারতবর্ষে আসিয়া প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে যাপানও সে সুসংস্কৃত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। প্রথমে কেবল শাক্যসিংহের জীবনকাহিনী ও উপদেশ, নানাভাবে বিকৃত হইয়া, যাপানে শাক্যপূজার প্রচলন করিয়াছিল। পরে শাক্যসিংহের ধর্ম্মমতের মূলতত্ত্ব শনৈঃশনৈ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যেই যাপান "ভাবের মাতৃভূমি"র প্রকৃত

সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে। সে শিক্ষা যাপানকে বাহাড়ম্বরে বীতশ্রদ্ধ করিয়া, মর্ম্মাস্বাদে মধুকরের ন্যায় উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। বসুবন্ধুর দার্শনিক শিক্ষাই তাহার মূল বলিয়া যাপানবাসীর নিকট সুপরিচিত।

আর্য্যসমাজের নবজীবনলাভের প্রথম প্রভাতে ভারতবর্ষের পুণ্যারণ্যে যে বেদমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই মানবজ্ঞানশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত "সূত্র"। অন্যান্য যুগের সমুন্নত সাহিত্য সেই সংক্ষিপ্ত সূত্রের বিস্তৃত "ভাষ্য" ভিন্ন আর-কিছু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। বেদমন্ত্র ভারতবর্ষকে যে সরল সত্যের শিক্ষাদান করিয়া মানবধর্ম্মে সমুন্নত করিবার সূত্রপাত করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাই নানাভাবে লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। স্থানকালপাত্রভেদে নানাভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইলেও, এশিয়াখণ্ডের সকল ধর্ম্মই আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে এশিয়ার গৌরব ঘোষণা করিয়াছে। সম্ভোগ পশুধর্ম্ম; ত্যাগ ভিন্ন মানবধর্ম্মের অন্য কোন মূলমন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আত্মত্যাগেই মানব সমাজ সমুন্নতিলাভ করিয়াছে;—আত্মত্যাগেই মানবসমাজ ক্রমোন্নতি লাভ করিবে। ত্যাগের মূলে সংযম বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। মানবসমাজ সুসংযত না হইলে আত্মত্যাগের সরলধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সংযম মানবসমাজকে বিচারপরায়ণ করে। না বুঝিলে, মানবসমাজ সংযত হইতে পারে না। বুঝিতে বসিলেই, ইহকালের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, সকল আস্ফালন নিরস্ত হইয়া পড়ে! ভারতবর্ষ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া, সংযত হইয়া, আত্মত্যাগে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার শিক্ষাদান করিয়াছিল। ইহাই ভারতীয়-জ্ঞানসাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রধান সহায়। ইহার নিকট শাণিত খরশাণ পরাভূত হইয়া যায়। শাক্যসিংহের উপদেশ এই মূলমন্ত্র প্রচার করিবার যে অভিনব কৌশলের উদ্ভাবনা করিয়াছিল, তাহারই নাম বৌদ্ধধর্ম্ম। তাহা নূতন নহে, চিরপুরাতন। কালে তাহা নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, পুনরায় বসুবন্ধু তাহার মূলতত্ত্বব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা কিছু বৃহৎ, তাহাই ভারতবর্ষের পুরাতন আদর্শ। বৃহৎ হিমালয় ভারতবর্ষের জনসমাজকে নিয়ত বৃহতের দিকেই আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। নদনদী সেই দিকেই লোকচিত্ত পরিচালিত করিয়া সকল ক্ষুদ্রতা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পুরাতন ভারতবর্ষ বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া কহিয়াছে—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

এই শিক্ষা ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, সসীম হইতে অসীমে বহন করিয়া লইয়া, ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া নিয়ত সেই মহাবস্তুলাভের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহার তুলনায় 'বর্ত্তমান' ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া 'ভবিষ্যতের' অনাগত বৃহৎ কলেবরে লুপ্ত হইয়া যায়; তাহার তুলনায় সংকীর্ণরেখানিবদ্ধ সসীম স্বরূপচিত্র তুচ্ছ হইয়া, ভাবব্যঞ্জক অনন্তসৌন্দর্য্যবিজ্ঞাপক কাল্পনিক চিত্রের অস্পষ্ট বর্ণসমাবেশ-

কৌশল প্রাধান্যলাভ করে; তাহার তুলনায় লোকচিত্ত ধূলি ঝাড়িয়া, ধরা ছাড়িয়া, নির্ম্মল নীলগগনের প্রশান্তসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের জ্ঞানসাম্রাজ্য যে দেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, সে দেশেই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাপানে সে পরিচয় অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। যাপানের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা, যাপানের ধারাবাহিক রাজবংশের যত্নসঞ্চিত দ্রব্যসম্ভার, যাপানের সাগরসুরক্ষিত স্বচ্ছন্দ সরলস্বভাব অতীতের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে দেশে গৃহসজ্জার অনাবশ্যক আড়ম্বর গৃহস্থকে অনর্থক ঋণগ্রস্ত করে না; আহারবিহারের ঘটাবৈচিত্র্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য মেঘাচ্ছন্ন করিয়া জনসমাজকে ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত করে না;—তাহারা ক্ষুদ্রতার সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, ক্রমে বৃহতের বিস্তৃতরাজ্যে বিচরণ করিয়া, মানবজীবনের প্রকৃত রসাস্বাদের জন্যই আগ্রহপ্রকাশ করিয়া থাকে। কখন-কখন আধুনিক কুসংসর্গ যাপানকে অতিমাত্রায় ইউরোপভক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; সে চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। যাপান ক্রমেই "ভাবের মাতৃভূমি"র দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

অন্ধ অনুকরণ দুর্ব্বলজাতিকে বলদান করিতে পারে না। ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হইয়া, ক্রমে নানা বাহ্যাড়ম্বরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। দীক্ষাগ্রহণের আড়ম্বর আছে, শ্রমণগণের পবিত্র পীতবস্ত্র ধারণ করিবার আড়ম্বর আছে; তাহাদের সমুন্নত সাধুজীবন ও সর্ব্বস্বত্যাগের সমুচ্চগৌরবের অনুকরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। যাপানে তাহাই প্রবল; বাহ্যাড়ম্বর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই মহামন্ত্র সে দেশের গৃহে গৃহে অদ্যাপি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আত্মসম্মানবোধ যাপানকে তাহার পূর্ব্বগৌরবরক্ষার্থ অমিতবলে বলশালী করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশ যেন এক হইয়া, এক চিন্তায় ও এক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে!

ইউরোপের ধারণা এইরূপ,—ইউরোপের শিক্ষাই যাপানকে নবজীবন দান করিয়া, এরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। যাপানের বিশ্বাস অন্যরূপ। কাকাসু ওকাকুরার গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐতিহাসিকের ন্যায় বিচারনিপুণ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া, প্রমাণপ্রয়োগে ইহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। যাপানের পুরাতন ইতিহাসই যাপানকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে; ইউরোপীয় সংসর্গ তাহাকে কেবল আত্মরক্ষার্থ সতর্ক করিয়া দিয়াছে! তাহা প্রথম কারণ নহে; তাহা দ্বিতীয় কারণ।*

যাপানের নবজীবনলাভের প্রথম কারণ যাপানের ইতিহাস। তাহা প্রথমে অলিখিত অবস্থায় জনশ্রুতিমাত্রে পরিণত হইবার উপ-

* The second cause of the national reawakening was undoubtedly that portentious danger with which Western encroachments on Asiatic soil threatened our national independence.—*Ideals of the East, p. 211.*

ক্রম হইয়াছিল। দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে ইতিহাসসঙ্কলনের প্রথম চেষ্টার সূত্রপাত হয়। রাজকুমার মিটো তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার উৎসাহে যে ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা যাপানের কাব্য, উপন্যাস ও সঙ্গীতের মধ্যেও পূর্ব্বগৌরবের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যাপানবাসী তাহাদের পুরাতত্ত্বের মধ্যে আত্মত্যাগের পুণ্য-কাহিনী প্রাপ্ত হইয়া, আত্মবিসর্জ্জনকে পরম পুণ্যব্রত বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছে। সে শিক্ষা যাপানের আবালবৃদ্ধবনিতাকে স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়া আসিতেছে।

পুরাতন ইতিহাসের মধ্যে যাপানের দ্বিবিধ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যাপানের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তী কালের সমালোচনা করিবামাত্র, যাপানকে "ভাবের মাতৃভূমি"র উদ্দেশে ভক্তিবিস্ময়ে প্রণিপাত করিতে হয়। এশিয়া এক এবং অখণ্ড মহাদেশ। এশিয়ার ধর্ম্ম মানব-ধর্ম্ম। এশিয়ার জ্ঞান ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে মানবপ্রাণকে আকর্ষণ করে। এশিয়া সম্ভোগ অপেক্ষা ত্যাগের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই সকল শিক্ষা পুরাতন ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষার প্রাধান্য লোকচিত্তে দৃঢ়মুদ্রিত হইবামাত্র, লোকে ইউরোপীয় শক্তিসাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বরতার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। এশিয়া গঠনশীল প্রতিভা লইয়া মানবসমাজে শান্তির পুণ্যসাম্রাজ্য গঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল। ইউরোপ ধ্বংসশীল প্রতিভা লইয়া বর্ব্বরের ন্যায় মানবসমাজের শান্তি-সৌধশিখরে নিরন্তর লৌহদণ্ডের আঘাত করিয়া আসিতেছে। একদা অসভ্য বর্ব্বর, পুরাতন সভ্যতার কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ সমুন্নত সৌধাবলী ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া বসুন্ধরা অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। আবার সুসভ্য বর্ব্বরগণ বর্ত্তমান সভ্যতার অতৃপ্ত দিগ্বিজয়লালসায় বসুন্ধরার শান্তিসাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। যাপান তাহার যে তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা ইতিহাসের প্রতিবাদ। তাহার প্রকৃত অর্থ—শান্ত হও; যথেষ্ট হইয়াছে! ভারতবর্ষ তর্কবলে যে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়া পৃথিবীকে প্রেমপুণ্যে সমুন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, যাপান বাহুবলে সেই পুরাতন শিক্ষাই অভিনব উপায়ে প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। এই জ্ঞানবিস্তারে অকুতোভয় যাপান সন্ন্যাসীর ন্যায় সহাস্যমুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া এশিয়ার বিজয়ঘোষণা করিতেছে। ইহার সহিত সামরিক জয়পরাজয়ের সংস্রব নাই। সমরক্ষেত্রে পরাজিত হইলেও মানবসমাজের ইতিহাস যাপানের বিজয়-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইবে। সে বিজয়ের মূলমন্ত্র ভারতবর্ষ হইতেই দিগ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের পুরাকালের জ্ঞানগৌরব যে যাপানকে সমুন্নত করিয়াছে, এ কথা ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গও অস্বীকার করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের আধুনিক দুঃখদুর্দ্দশা যাপানের

নবজীবনসঞ্চারের পক্ষে কতদূর উত্তেজক হইয়াছে, তাহা কিন্তু সভ্যসমাজে অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত। ওকাকুরা তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন,—যাপানের নবজীবনলাভের প্রবলচেষ্টা প্রবর্তিত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশার অবস্থাকেও একটি প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।* যাপান ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া এবং ইউরোপের দিকে চাহিয়া, আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাপান বুঝিয়াছে,—শান্তি ভিন্ন মানবসমাজের উন্নতিলাভের আশা নাই; তাই সে শান্তিরক্ষার্থ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছে! †

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* We saw India, the holy land of our most sacred memories, losing her independence through her political apathy, lack of organisation, and the petty jealousies of rival interests,—a sad lesson, which made us keenly alive to the necessity of unity at any cost —*Ideals of the East*, p. 212.

† We await the flashing sword of the lightening which shall cleave the darkness For the terrible husk must be broken, and the raindrops of a new vigour must refresh the earth before new flowers can spring up to cover it with their bloom. But it must be from Asia herself, along the ancient roadways of the race, that the Great voice shall be heard,—"victory from within, or a mighty death without."—*Ideals of the East*, p. 244.

গৌতমমুনি ও ন্যায়দর্শন। *

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক বিজ্ঞ বিষয়ী লোকের সঙ্গে আমার ন্যায়সংক্রান্ত কতিপয় কথার আলোচনা হয়। সেই আলোচনা লিপিবদ্ধ করায় এই প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাই পাঠ করিতে আমি অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে ইহার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের যৎকিঞ্চিৎ পরিতোষ জন্মিলেই আমি সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

প্রথম কথা, এতদ্দেশীয় ষড়্দর্শন। তন্মধ্যে যে মুনির যে দর্শন, তাহা একটি শ্লোকে গাঁথা আছে। যথা :—

"কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥"

কপিলের দর্শন, কণাদের দর্শন, গৌতমের দর্শন, পতঞ্জলির দর্শন, ব্যাসের দর্শন, ও জৈমিনির দর্শন, এই ষড়্দর্শন। তন্মধ্যে গৌতমের দর্শন—ন্যায়। ন্যায় বলিলে আমরা গৌতমের দর্শনই বুঝি সত্য, পরন্তু গৌতমের দর্শন ব্যতীত আরও অনেক ন্যায়নামের নামী আছে;—যেমন কাকতালীয়ন্যায়, সামান্য-বিশেষন্যায়, বীজাঙ্কুরন্যায়, অন্ধপঙ্গুন্যায়, স্থালীপুলাকন্যায়, বীচিতরঙ্গন্যায় ও কৈমুতিকন্যায় প্রভৃতি। এই সকল ন্যায়ের উল্লেখ ও প্রচার কাব্য-অলঙ্কার, স্মৃতি-পুরাণ ও সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন, সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এমন কি, লৌকিক আচারব্যবহারাদির মধ্যেও ন্যায়-অন্যায়-শব্দের সম্যগ্‌ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, কেবল গৌতমের দর্শনই যে ন্যায়পদবাচ্য, তাহা নহে। আরও অনেক ন্যায়পদবাচ্য আছে।

যে সকল ন্যায়ের উল্লেখ করা হইল, ঐ সকলের কতক স্বতঃসিদ্ধ লৌকিক ঘটনার উদাহরণমাত্র। কতক পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণকর্ত্তাদিগের প্রচারিত পরিভাষা, কতক বা ব্যাসজৈমিন্যাদি ঋষিদিগের অভি-হিত সিদ্ধান্তকথা। অতএব ন্যায় বলিলেই যে কেবল গৌতমের ন্যায় বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। তবে যদি ন্যায়শাস্ত্র, ন্যায়-বিদ্যা বা ন্যায়দর্শন বলা যায়, তাহা হইলে গৌতমের ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন ন্যায় বুদ্ধ্যারূঢ় হইবে না। কারণ এই যে, লৌকিক ন্যায়ের কোন শাস্ত্র নাই,—তাহা কোন বিদ্যা নহে, এবং ব্যাসজৈমিন্যাদির অভিহিত ন্যায়ও অধিকরণ ও মীমাংসা নামে সুপ্রসিদ্ধ। লৌকিক ন্যায়ের অনেকগুলি পুস্তক আছে বটে; পরন্তু সে সকল পুস্তক শাস্ত্রলক্ষণবর্জ্জিত। সে সকল কেবল দৃষ্ট-শ্রুতানুযায়ী সংগ্রহমাত্র। জৈমিনি ও ব্যাসের এক একটি বিচার ন্যায়নামের নামী হইলেও, সমগ্র শাস্ত্র ন্যায়নামের নামী নহে। কাজেই

* গত ৫ই আষাঢ় রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

আমরা ন্যায়শাস্ত্র বলিলে, গৌতমের দর্শন বুঝি, অন্য কিছু বুঝি না।

ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়দর্শন গৌতমপ্রণীত, এইটুকুমাত্র সর্ব্ববিদিত; কিন্তু তাহার বিষয় বহুলোকের অবিদিত। আজকাল বাঙ্‌লাভাষার এত উন্নতি যে, যে স্থানেই যাই, সেই স্থানেই সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শনের আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু কুত্রাপি ন্যায়-দর্শনের প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও শুনিতে পাই না। তাহাতেই বোধ হয়, ন্যায়দর্শনের বিষয়-সকল এখনও সাধারণসমাজে অন্ধকারসমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সাংখ্যপাতঞ্জলাদিও এইরূপ অন্ধকারমগ্ন ছিল; অল্পদিন হইল, চলিত-ভাষায় তৎসংক্রান্ত পুস্তকপ্রবন্ধাদি প্রচারিত হওয়ায় আজকাল কিছু প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যপাতঞ্জলাদিতে যাহা আছে, তাহা আজকাল অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু ন্যায়ে কি আছে, তাহা কোনও বিষয়ী লোক অদ্যাপি বিদিত হইতে পারেন নাই। কেবল শ্রাদ্ধসভার বিচার শুনিয়া তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, ন্যায়-শাস্ত্রে কেবল কতকগুলি ফক্কিকা আছে, আর ধূমবহ্নির কথা আছে, আর কিছুই নাই। তবে কোন কোন বিজ্ঞ বিষয়ী লোক আছেন,—পণ্ডিতমণ্ডলী যাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা গতিবিধি করেন,—যদিও তাঁহারা জানেন যে, ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র, তথাপি সে জানা ঠিক জানা নহে। তাঁহারা নব্য-নৈয়ায়িকদিগের মুখে-মাত্র শুনিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন। ফলত গৌতমের গ্রন্থে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। ঈশ্বর উপাস্য কি বিজ্ঞেয়, তাহা গৌতমের দর্শনেও বিচারিত হয় নাই। এতদীয় দর্শনের প্রথমেই প্রতিজ্ঞাসূত্র, তন্মধ্যে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোল পদার্থের উল্লেখ; ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। প্রমেয়বিভাগে যে আত্মার উল্লেখ আছে, লক্ষণ ও পরীক্ষাসূত্র দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হয়, সে কথা জীবাত্মপর। গৌতমের মতে জীবাত্ম-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষপ্রদ; ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান মোক্ষপ্রদ কি না, তাহা গৌতমের গ্রন্থ-দ্বারা জানা যায় না। তবে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় বটে, পরন্তু সে উল্লেখ উল্লেখমাত্র। তাই আমার বক্তব্য, নব্যনৈয়ায়িকগণ যে কিসে ন্যায়-দর্শনকে ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র বলেন, তাহা আমি বিদিত নহি। যাহাই হউক, ন্যায়শাস্ত্র ঈশ্বরানুমানের শাস্ত্র, এ কথাও বহুলোকে অবিদিত। সেই কারণে তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে ফক্কিকার শাস্ত্র বলিয়া জানেন। অনেক বিষয়ী লোকের মনে ঐরূপ একটা কুসংস্কার থাকায়, তাঁহাদিগকে আমি অনেকবার 'ন্যায়রত্ন' 'ন্যায়বাগীশ' প্রভৃতি ন্যায়শব্দঘটিত উপাধির অতি অদ্ভুত সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

একজন ব্যাকরণের পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়বাগীশ, আর একজন স্মৃতির পণ্ডিত, তাঁহার উপাধি ন্যায়রত্ন। যিনি ব্যাকরণের পণ্ডিত, তিনি যে ব্যাকরণোক্ত অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়বাগীশ, এবং যিনি স্মার্ত্তপণ্ডিত, তিনি জৈমিন্যুক্ত সংযোগপৃথক্-ত্বাদি ন্যায় পড়িয়া ন্যায়রত্ন, এ রহস্য বিষয়ী লোকে বিদিত নহে। প্রসিদ্ধি অনুসারে, বিষয়ী লোকে মনে করে, ইনি যখন ন্যায়-রত্ন, তখন ইনি অবশ্যই ন্যায় জানেন, অর্থাৎ

ন্যায়শাস্ত্র জানেন। অতএব, যাবৎ না ন্যায়-দর্শনের মর্ম্ম চলিতভাষায় পুস্তকপ্রবন্ধাদিতে প্রচারপ্রাপ্ত হইবে, তাবৎ বিষয়ী লোকের ঐ কুসংস্কার অপগত হইবে বলিয়া বিবেচিত হয় না। কখন-কখন এরূপ কথা উত্থাপিত হয় যে, সাংখ্যপাতঞ্জলাদিই বা চলিত-ভাষায় প্রচারপ্রাপ্ত হয় কেন? আর ন্যায়দর্শনই বা না হয় কেন? এ বিষয়েও আমি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত বিদিত হইয়াছি। কেহ বলেন, ন্যায় বড় কঠিন, অতি দুর্ব্বোধ্য, সেই কারণে তাহার, পণ্ডিতসমাজ ব্যতীত সাধারণ সমাজে, প্রচার তদ্রূপ হয় নাই, এবং হইবার অবসরও নাই। অন্যে বলেন, ন্যায়ের বিষয় বা উপদেশ্য পদার্থ তত কঠিন বা দুর্ব্বোধ্য নহে, তাহার ভাষাই নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। ন্যায়দর্শনের ভাষা এত দুষ্প্রতর্ক্য যে, বাঙ্‌লাভাষায় তদর্থপ্রকাশের উপযুক্ত শব্দ নাই বলিলেও বলা যায়। বোধ হয়, তাহাতেই বাঙ্‌লাভাষায় ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক-প্রবন্ধাদি লিখিত-পঠিত হয় না। এ বিষয়ে আমার মনে হয়, শেষোক্ত কথাই ঠিক। সত্য-সত্যই ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা যৎপরোনাস্তি দুর্ব্বোধ্য ও দুরনুবাদ্য। তদ্ভিন্ন, ন্যায়ের উপদেশ্য পদার্থ যে বেদান্তাদিশাস্ত্রের উপদেশ্য পদার্থ হইতে অধিক দুর্ব্বোধ্য, তাহা নহে। ভাবিয়া দেখুন, জগৎ পরমাণুসমূহের ক্রম-পুঞ্জনে সমুৎপন্ন, ইহা বুদ্ধ্যারূঢ় করা কঠিন; কি জগৎ একটা মিথ্যাপদার্থ, মায়িক প্রতিভাসমাত্র, ইহা বুদ্ধ্যারূঢ় করা কঠিন?

ন্যায়ের উপদেশ—আকাশ অজ পদার্থ; কিন্তু বেদান্ত বলেন—আকাশ জন্মবান্ পদার্থ। ন্যায় বলেন—যত শরীর, তত আত্মা, কিন্তু বেদান্ত বলেন—শরীর অসংখ্য, পরন্তু আত্মা এক। আমার মনে হয়, উক্ত দ্বিবিধ উপ-দেশের মধ্যে, বেদান্তের উপদেশই অধিক দুর্ব্বোধ্য। কাজেই আমি বাধ্য হইয়া বলি, ন্যায়ের উপদেশ্য বিষয় একটিও কঠিন নহে, উহার ভাষাই কঠিন, যৎপরোনাস্তি কঠিন।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষা 'ত্ব' ও 'তা' প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণ। তাঁহারা যখন ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি, অবচ্ছেদকতা-প্রতিযো-গিতা প্রভৃতি শব্দরাশি দ্রুতপ্রযত্নে উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন তাহা বুঝে কাহার সাধ্য! সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃতজ্ঞ কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রানভিজ্ঞ, এরূপ লোকেও তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন না।

'জনো ঘটমানয়তি' এই একটি সরল সংস্কৃতবাক্য। নৈয়ায়িক ঐ বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর যে অর্থ স্থির করেন, তাহা বলি, দেখুন বুঝিতে পারেন কি না—

"জনত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতসমবায়ত্বা-বচ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিতকৃতিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারত্বাভিন্নকৃতিত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূ-পিতানুকূলতাত্বাবচ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূ-পিতানয়নত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারত্বাভিন্নানয়নতা-ত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতনিরূপকত্বত্বাব-চ্ছিন্নসাংসর্গিকবিষয়তানিরূপিতকর্ম্মত্বত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতানিরূপিতাধেয়তাত্বাবচ্ছিন্নসাংসর্গিক-বিষয়তানিরূপিতঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতাশালী বোধঃ।" *

* সারমঞ্জরী নামে একখানি ব্যুৎপাদক গ্রন্থ আছে, তাহারই একজন নব্য টীকাকার উক্তরূপ ব্যাখ্যা বিন্যাস করিয়াছেন।

কী বুঝিলেন? 'অনো ঘটমানয়তি' এই কথার নৈয়ায়িককৃত অর্থ বুঝিলেন কি? ইহারই দ্বারা বুঝিবেন, নব্যনৈয়ায়িকদিগের দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি, বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

কোন এক ধনী লোকের ভবনে একদা এক হরবোলার ভাঁড়ামি হইতেছিল। হরবোলা পাদরিসাহেবের বাঙ্‌লা বক্তৃতা, ব্রাহ্মপুরোহিতের উপদেশ, শ্রাদ্ধসভায় আহূত পণ্ডিতগণের বিচার, সমস্তই একে একে নকল করিল। ব্যাকরণের বিচার ও স্মৃতির বিচার নকল করিয়া, ন্যায়শাস্ত্রের বিচার নকল করিবার সময়, কতকগুলা কড়ি একটা ঘটের ভিতর পূরিয়া সজোরে নাড়িতে লাগিল এবং বলিল, "শুনুন, ন্যায়ের বিচার শুনুন।" ন্যায়ের বিচারের সহিত বরাটকপূর্ণ ঘটের আন্দোলনের যে কি সৌসাদৃশ্য, তা শ্রোতৃবর্গ একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

ন্যায়শাস্ত্রের ভাষা অত কূট হইল কেন? এই প্রশ্নেরও দুইপ্রকার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া ঐরূপ কূটভাষা সৃজন করিতে হইয়াছে। অন্যে বলেন, কেবল বিচারের অনুরোধে নহে, ঐ বিষয়ে তাঁহাদের অনেকটা ইচ্ছার অনুরোধও আছে; অর্থাৎ বিচারের অনুরোধেও বটে, ইচ্ছা করিয়াও বটে। ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা সৃজন করিবার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। ইদানীন্তন কালেরও অনেক পণ্ডিতের এরূপ স্বভাব দেখা যায় যে, তাঁহারা অন্যকে বিদ্যাবুদ্ধি-বিষয়ে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া অতি দুর্বোধ্য কূটশ্লোকাদি রচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন, সরল ভাষায় কোন-কিছু লিখিলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের হানি হইবে। শ্রীহর্ষনামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, যিনি 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'নামক গ্রন্থের প্রণেতা, তিনিও ঐপ্রকার দুরভিসন্ধিদোষে লিপ্ত ছিলেন। তবে তাঁহার গুণ এই যে, তিনি নিজের মনোভাব গোপন না করিয়া উক্ত গ্রন্থের শেষে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিয়া এই গ্রন্থকে দুর্বোধ্য ও দুষ্পাঠ্য করিলাম। যথা—

> "গ্রন্থগ্রন্থিরিহ কচিৎ কচিদপি ন্যাসি প্রযত্নান্ময়া
> প্রাজ্ঞম্মন্যমনা হঠেন পঠিতী মাস্মিন্ খলঃ খেলতু।
> শ্রদ্ধারাধ্যগুরুঃ শ্লথীকৃতদৃঢ়গ্রন্থিঃ সমাসাদয়-
> ত্বেতত্তর্করসোর্মিমজ্জনসুখেষ্বাসঞ্জনং সজ্জনঃ॥"

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই গ্রন্থের অনেকস্থান গ্রন্থিবদ্ধ করিলাম। যাহারা খলস্বভাব, প্রজ্ঞাভিমানী, কাহাকেও গুরু বলিতে চাহে না, আপনা-আপনি পড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তাহারা এই গ্রন্থে ক্রীড়া করিতে পারিবে না। যাহারা সজ্জন, শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে গুরুসেবা করে, তাহারাই গুরুদ্বারা এই গ্রন্থের গ্রন্থিসকল খুলিয়া লইয়া, অত্রস্থ তর্করসের তরঙ্গে, মজ্জনের সুখ প্রাপ্ত হইবে। এ সকল কথা শুনিলে কে না বলিবে যে, ন্যায়াচার্য্যগণ ইচ্ছা করিয়া কূটভাষা সৃজন করিয়াছেন। যাহাই হউক, ন্যায়ের পদার্থগণ দুরূহ বা দুষ্প্রতর্ক্য হউক বা না হউক, তাহার ভাষা যে নিতান্ত দুরূহ, সে পক্ষে সংশয় নাই।

ন্যায়ের ভাষাকার্কশ্য প্রথমাবধি নহে। যেরূপ ভাষায় ন্যায়দর্শনের আবির্ভাব, সেই-

রূপ ভাষায় অন্যান্য দর্শনেরও আবির্ভাব। ন্যায়ের সূত্রসকল যেরূপ-পদ্ধতি-যুক্ত, অন্যান্য দর্শনের সূত্রগুলিও তদ্রূপ-পদ্ধতি-যুক্ত। ন্যায়ের ভাষাপ্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভাষা যেরূপ, অন্যান্য দর্শনের ভাষ্যপ্রভৃতি ব্যাখ্যা-গ্রন্থের ভাষাও সেইরূপ। বলিতে কি, ন্যায় বঙ্গদেশে আসিয়াই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, নচেৎ পূর্ব্বে সর্ব্বদেশে একই রূপে অবস্থিত ছিল।

ন্যায় কি? এ কথার প্রত্যুত্তর দিতে হইলে, বোধ হয় আপাতত এইরূপ বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, অনুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়, ও তদ্বোধক শাস্ত্রের নাম ন্যায়শাস্ত্র। 'অনু'শব্দের অর্থ পশ্চাৎ, আর 'মান'শব্দের অর্থ জানা। যে স্থলে কোন এক জ্ঞানের দ্বারা তৎসংসৃষ্ট অন্য এক পদার্থ জানা যায়, সে স্থলের সেই প্রথম জ্ঞান অনুমান ও দ্বিতীয় জ্ঞান অনুমিতি। যেমন ধূমজ্ঞানের পর বহ্নির জ্ঞান। প্রাচীন ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরাও অনুমানের লক্ষণপ্রসঙ্গে সরল সংস্কৃতভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, "জ্ঞানকরণকং জ্ঞান-মনুমানম্।" আমি অনুমানের নাম ন্যায়, এ কথা না বলিয়া, অনুমানপ্রণালীর নাম ন্যায়, এ কথা বলিলাম কেন, তাহা বলিতেছি। অনুমান স্বার্থ-পরার্থ-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যাহা স্বার্থ, তাহা ন্যায়সংজ্ঞার সংজ্ঞী নহে; যাহা পরার্থ, তাহাই ন্যায়সংজ্ঞার সংজ্ঞী। স্বার্থানুমান জীবহৃদয়ের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, সেজন্য তাহা পরাপেক্ষী নহে। পরাপেক্ষী অর্থাৎ শাস্ত্রমুখাপেক্ষী। পরাপেক্ষী নহে, অর্থাৎ আপনা-আপনি জন্মে। আপনা-আপনি জন্মে বলিয়াই তাদৃশ অনুমানের নাম স্বার্থানুমান। যে একবার ধূমমূলে বহ্নি দেখিয়াছে, সে সময়ান্তরে ধূম দেখিলেই তন্মূলে বহ্নি থাকা অবধারণ করিবে। তাহার সেই ধূমজ্ঞানজন্য বহ্নি-জ্ঞান আপনা-আপনি জন্মে, কাহাকেও জন্মাইয়া দিতে হয় না, সেইজন্য তাহা স্বার্থসংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। তাদৃশ স্বার্থানুমান শক্তিরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে স্বতঃসিদ্ধ-ভাবে বিদ্যমান থাকে। তাহারই প্রভাবে জীবগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান পদার্থে, দূর ও ব্যবহিত পদার্থে, জ্ঞানলাভ করিয়া নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাই বলা হইয়াছে, স্বার্থানুমান শাস্ত্রশিক্ষার অধীন নহে। এবংবিধ স্বার্থানুমানের আদর্শে পরার্থানুমান-নামক ন্যায় রচিত হইয়া থাকে; সেজন্য উক্ত স্বার্থানুমানকে পরা-র্থানুমানের মূল, বীজ, আদর্শ বা অনুবাদ বলা যায়। যে স্থলে কোন কারণবশত স্বতঃসিদ্ধ স্বার্থানুমানশক্তি সুপ্তকল্প হয়, সেই স্থলে পরার্থানুমানের উদয় বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। মনে করুন, আমি ও আমার ভৃত্য, আমরা উভয়েই দূর হইতে পর্ব্বতোপরি ধূমোদগমন হইতে দেখিলাম। দেখিয়া আমি বুঝিলাম, পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে। কিন্তু আমার ভৃত্য তাহা বুঝিল না, অথবা বহ্নিসত্তাবে অবিশ্বস্ত বা সন্দিহান হইল। কাজেই আমাকে তখন পরার্থা-নুমানপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইল। তাহা অন্য কিছু নহে, তাহা একপ্রকার বাক্-প্রপঞ্চ। সেই বাক্‌প্রপঞ্চ=একটি পাঁচ-বিভাগে বিভক্ত মহাবাক্য। প্রথম বিভাগের নাম প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় বিভাগের নাম হেতু,

তৃতীয় বিভাগের নাম উদাহরণ, চতুর্থ বিভাগের নাম উপনয় ও পঞ্চম বিভাগের নাম নিগমন। এই সকল বিভাগের অপর নাম অবয়ব। অবয়বপঞ্চকের ক্রমিক উল্লেখ এইরূপ –

১। নিশ্চয়ই পর্ব্বতোপরি বহ্নি আছে।

২। কেন না, ধূম দেখা যাইতেছে।

৩। ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকে, ইহা পাকশালা প্রভৃতি স্থলে দেখিয়াছ।

৪। পর্ব্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে।

৫। যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, সেই-হেতু ঐ স্থানে বহ্নিও আছে।

ইহারই নাম পরার্থানুমানপ্রণালী। ইহারই নাম পঞ্চাবয়ব ন্যায়, এবং ইহারই প্রপঞ্চ গৌতমের দর্শন।

পঞ্চাবয়ব ন্যায়, এই কথায় আর একটি ভাষ্যকারীয় কথা মনে পড়িল। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, গৌতমের পূর্ব্বে ন্যায়ের দশ অবয়ব প্রচলিত ছিল। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ অবয়বের অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংশয়-নিরাস, এই পাঁচ নামের আর পাঁচটি অবয়ব ব্যবহার করিতেন। এই সংবাদ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন যে, গৌতমের পূর্ব্বেও ন্যায়শাস্ত্র ছিল। কাজেই বলিতে হয়, ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাসে গৌতমকে আদি-সীমায় স্থাপন করিলে অবশ্যই তাহা ভ্রম-কলুষিত হইবে। অপর কথা এই যে, গৌতম যেমন দশাবয়ববাদীর মত মনোনীত করেন নাই, সেইরূপ বেদান্তিগণও, পঞ্চাবয়ববাদী গৌতমের মতও মনোনীত করেন নাই। বেদান্তীরা বলেন, তিন অবয়বেই অনুমান-প্রক্রিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সুতরাং আর দুই অবয়বের অঙ্গীকার বৃথা। যদি প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, এই তিন, অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, এই তিন অবয়বদ্বারা অনুমিতিকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহা হইলে অধিক অবয়বের কল্পনা অবশ্যই বৃথা হইবে। যাহাই হউক, কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, আমরা গৌতমের শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, ন্যায়বিজ্ঞানে বঞ্চিত আছি। গৌতমের শাস্ত্র না পড়ায় আমরা তৎপ্রকাশক বাক্-কৌশলে মাত্র বঞ্চিত আছি, ফলাংশে বঞ্চিত নহি। আমরা আবালবৃদ্ধযুবা সকলেই, অধিক কি, পশুপক্ষীরাও স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক।

প্রতিদিনই আমরা নানাপ্রকার ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকি, অথচ জিজ্ঞাসিত হইলে বলি, "আমরা ন্যায় পড়ি নাই, ন্যায় কি, তাহা আমরা জানি না।" এইমাত্র আমি এখানে আসিবার সময় পথিমধ্যে ক্রীড়মান বালকদিগের মুখ হইতে—"ঝড় উঠিবে; কেন না, ঝোড়োকোণে মেঘ হইয়াছে; ঝোড়ো-কোণে মেঘ হইলেই ঝড় হয়;"—এইরূপ এই-রূপ ন্যায়বাক্য কহিতে শুনিয়া আসিয়াছি। সুতরাং বলিতে হয়, মনুষ্য ন্যায় না পড়িলেও নৈয়ায়িক—স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বলিতে পারেন যে, তবে তাহার শাস্ত্র কেন? সে কথার প্রত্যুত্তর এই যে, বুদ্ধিপরিমার্জ্জন, উহশক্তির উদ্দীপন, ন্যায়াঙ্গের বিস্তৃতি, তাহার ব্যবহার অর্থাৎ শিখিবার ও শিখাইবার পদ্ধতিপ্রচার, এইরূপ এইরূপ প্রয়োজনসাধনের জন্যই শাস্ত্র, ন্যায়শক্তি সৃজন করিবার

জন্য নহে। ন্যায়শক্তি মনুষ্যসৃষ্ট নহে, তাহা প্রকৃতির সৃষ্ট। এইজন্যই বলিতে হয়, শাস্ত্র কেবল সংজ্ঞা, পরিভাষা ও তাহার প্রয়োগকৌশলাদি উপদেশ করে, অন্য কিছু করে না। আমরা এমন অনেক জিনিষ জানি, যাহার জ্ঞান থাকিতেও, আমরা নাম জানা না থাকায় লোককে বলিতে বা পরিচয় দিতে পারি না, এবং বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দাদি জানা না থাকায় তাহার বর্ণনা করিতে পারি না। যিনি জিনিষ চেনেন, অথচ নামাদি জানেন না, তিনি তাহা বুঝাইতে বা উপদেশ করিতে অশক্ত। যিনি সংজ্ঞা-পরিভাষাদি-ঘটিত শাস্ত্র জানেন, অথচ জিনিষ চেনেন না, তিনিও বস্তুতত্ত্ব-উপদেশের অযোগ্য। কেন না, তাদৃশ ব্যক্তির উপদেশ অনেক সময়ে বিপরীতই হইয়া থাকে।

একদা এক বেদান্তের ছাত্র "স গুরুম্ অভিসরেৎ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" এই শ্রুত্যংশ পড়িবার সময় প্রশ্ন করিল—"গুরুর বিশেষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ এই দুই কথা কেন? কেবল ব্রহ্মজ্ঞের অথবা কেবল শাস্ত্রজ্ঞের নিকট গেলেই ত শিষ্যের অভীষ্টলাভ হইতে পারে।" গুরু বলিলেন—"তাহা পারে না। কারণ এই যে, বুঝাইবার উপযুক্ত বাক্প্রপঞ্চ জানা না থাকিলে গুরু আপনার ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন না এবং বাক্প্রপঞ্চ জানা থাকিলেও ব্রহ্মসম্প্রত্যয়ের অভাবে তিনি হয় ত শিষ্যকে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অব্রহ্মই বুঝাইবেন।"

কেবল-শাস্ত্রজ্ঞের উপদেশ অনেক সময়ে মরুবাসী অধ্যাপকের উপদেশের অনুরূপ হইয়া থাকে। জনৈক মরুবাসী অধ্যাপক কোষগ্রন্থ পড়াইতেছিলেন। যে অংশে নারিকেলবৃক্ষের নাম-লিঙ্গাদি বর্ণিত আছে, সেই অংশ পড়াইবার সময় ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "নারিকেলগাছ কিরূপ?" অধ্যাপক শাস্ত্র ব্যতীত চক্ষে নারিকেলগাছ দেখেন নাই; কোন লোকের মুখে শুনিয়াছেন, নারিকেলগাছ পূর্ব্ববাঙ্গলায় জন্মে। তিনি বলিলেন—"স তু প্রাগ্দেশীয়লতাবিশেষঃ।" অতএব যে গুরু, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশাস্ত্র, উভয়ই বিদিত থাকেন, সেই গুরুই ব্রহ্ম-উপদেশের যোগ্যপাত্র। তাই আমার বক্তব্য, কেবল জ্ঞান স্বব্যবহার ব্যতীত অপরের ব্যবহারের অনুপযোগী। কাজেই মানিতে হইতেছে, আমরা স্বতঃসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইলেও শাস্ত্রশিক্ষিত নৈয়ায়িক নহি। তাহা নহি বলিয়াই আমরা জিজ্ঞাসিত হইলে বলি—"আমরা নৈয়ায়িক নহি, ন্যায় কি, তাহা জানি না।" আমাদের ন্যায় জানি না বলা, আর কোন স্বতঃসিদ্ধ দেশবাসী অভিনেতার গদ্য জানি না বলা প্রায় সমান। জনৈক বিদেশবাসী অভিনেতা রঙ্গস্থলে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি বিশবৎসর পর্য্যন্ত গদ্যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, অথচ গদ্য কি, তাহা জানিতাম না।" এই ব্যক্তি যেমন গদ্যপদ্য-বিভাগের নামলক্ষণাদিশিক্ষার পর আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সেইরূপ আমরাও ন্যায়শাস্ত্র পড়ার পর আশ্চর্য্য হইতে পারি।

এ বিষয়ে আর অধিক প্রসক্তানুপ্রসক্ত কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের পুনরালোচনা করা যাউক।

পরার্থানুমানপ্রণালীর নাম 'ন্যায়'। এ কথা আমার কল্পিত কথা নহে; ইহা ভাষ্য-

কারীর কথার অনুবাদ। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—"প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ। প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানম্। সা অন্বীক্ষা; তয়া প্রবর্ত্তত ইতি আন্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্।" কতকগুলি প্রমাণদ্বারা, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পাঁচ প্রমাণতুল্য প্রয়োগের দ্বারা পদার্থনির্ণয় করার নাম ন্যায়; তাহাই অনুমান ও অন্বীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য যে, অবিরুদ্ধ অনুমানই ন্যায়, অন্যথা তাহা ন্যায়াভাস। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" এই ভাষ্যোক্ত কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—প্রতিজ্ঞা =শব্দপ্রমাণতুল্য, হেতু=অনুমানপ্রমাণতুল্য, উদাহরণ=প্রত্যক্ষতুল্য এবং উপনয়= উপমানপ্রমাণের সদৃশ। অবশেষে বলিয়াছেন, নিগমননামক পঞ্চম অবয়বে ঐ সকলের একত্র সমাহার বা সমাবেশ দেখান হয়। এবংবিধ ন্যায় যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইলে জ্ঞাতব্য-পদার্থের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে নির্ণীত ও তদ্বিষয়ক ভ্রমপ্রমাদসংশয়াদি নিবারিত হয়। কি ঐহিক কৃষিবাণিজ্যাদি, কি পারলৌকিক স্বর্গ, অপূর্ব্ব ও দেবতাদি, কি অপবর্গপ্রদ আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি, সমস্ত তত্ত্বই এই ন্যায়বিদ্যার বিষয়। অতএব ন্যায়বিদ্যা বা ন্যায়ের শাস্ত্র যে কেবল ফক্কিকার শাস্ত্র, তাহা নহে। যে মহামুনি তাদৃশ মহোপকারী শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইহলোকে কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সেই মহামুনি যে এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের কোন্ অংশের লোক, তাহা ঠিক বিদিত হইবার উপায় নাই। অনুসন্ধান আরম্ভ করিলে দেখা যায় বা পাওয়া যায়, গৌতমের নামে গোত্র, স্মৃতিসংহিতা ও ন্যায়দর্শন প্রভৃতি প্রচারিত আছে। রামায়ণাদি-গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, অহল্যাপতি গৌতম। আবার আধুনিক-বহুগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, বুদ্ধ গৌতম ছিলেন। এই সকল গৌতম এক ব্যক্তি কি বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেবল বৌদ্ধ-গৌতমকেই পৃথক্ বলিয়া স্থির করা যায়; অবশিষ্ট গৌতম সন্দেহদোলায় দোলায়িত হইতে থাকেন। যাহাই হউক, ন্যায়দর্শনলেখক গৌতমের বিষয় অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা এতৎস্থলে কথিত হইতেছে।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও তদ্বার্ত্তিক-কার উদ্দ্যোতকরমিশ্র ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমকে অক্ষপাদ ও ঋষি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

"যোঽক্ষপাদমৃষিং ন্যায়ঃ প্রত্যভাৎ বদতাং বরম্।
তস্য বাৎস্যায়ন ইদং ভাষ্যজাতমবর্ত্তয়ৎ॥"

বাৎস্যায়ন।

"যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং
শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতোঃ
করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ॥"

কোন কোন পুরাণেও ন্যায়দর্শনকার গৌতমকে অক্ষপাদ বলিতে দেখা যায়। যথা—

"অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ॥" ইত্যাদি।

এখন বিবেচনা করুন, যেমন দর্শনকার গৌতম অক্ষপাদসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন, এরূপ, গোত্রকার ও স্মৃতিকার গৌতম কুত্রাপি অক্ষপাদবিশেষণে বিশেষিত হন নাই। তাহা না হওয়ায়, নিষ্প্রতিবন্ধকে এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, স্মৃতিকার ও গোত্রকার

গৌতম হইতে দর্শনকার গৌতম ভিন্ন ব্যক্তি।

গৌতমের অক্ষপাদ নাম কেন? এ সম্বন্ধে জনবাদ এই যে, ইনি কোন এক শিষ্যের প্রতি কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—এ চক্ষে আর তোকে দেখিব না।" শিষ্য গুরুকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া গুরুতর মনস্তাপে কষ্ট পাইতে লাগিল। পরে বহু আরাধনার পর তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে তিনি বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না; পরন্তু আজ হইতে তোকে আমি পদদ্বারা দর্শন করিব।" এতদুপলক্ষ্যেই তাঁহার পাদপ্রদেশে অক্ষি অর্থাৎ চক্ষু আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাতেই তিনি তদবধি অক্ষপাদ আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এ জনবাদের কোন মূল আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বোধ হয়, আমরা এখন যেমন কোন অতিসতর্ক লোক দেখিলে বলি, লোকটার পিছুদিকেও সাতটা চোখ; বোধ হয়, পূর্ব্বকালের মুনিঋষিরা ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি বুদ্ধিমান্ দেখিয়া 'পায়েও চক্ষু অর্থাৎ দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়', এতদর্থে অক্ষপাদনাম প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, গোত্রকার, স্মৃতিকার ও দর্শনকার গৌতম যে একই ব্যক্তি, তাহা নহে।

এই অক্ষপাদ যে দেশে বাস করিতেন, সে দেশ নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হয় না। বর্ত্তমান ছাপরাজেলার মধ্যে গোতমাশ্রম নামে এক অরণ্যকল্প স্থান আছে। সে দেশের প্রবাদ এই যে, মহর্ষি গৌতম উক্ত স্থানে থাকিয়া ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে বৎসর বৎসর গৌতমের নামে একটি মেলা হইয়া থাকে। অনধিক ৪০ বৎসর হইল, অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্র হইয়া উক্ত স্থানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে জনৈক নৈয়ায়িক ও কতিপয় ছাত্র বৃত্তিপ্রাপ্তে বাস করিতেছেন। ঐ স্থান যদি সত্যসত্যই অক্ষপাদ-গৌতমের জন্মস্থান বা বাসস্থান হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, অহল্যাপতি গৌতমই অক্ষপাদ। কেন না, রামায়ণের ও মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্থান অহল্যাপতি গৌতমের বাসস্থান বলিয়া অনুভূত হয়।

গৌতম ও তৎপ্রণীত ন্যায়দর্শন কত পুরাতন, তাহা অস্মদাদির দুর্জ্ঞেয়। ইঁহার আবির্ভাবকালসম্বন্ধে যিনি যেপ্রকার অনুমান করেন করুন, অব্যভিচরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। একদিকে দেখা যায়, মনু যে অত পুরাতন, তাঁহার গ্রন্থেও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উল্লেখ আছে। আবার অপরদিকে দেখুন, ক্ষণভঙ্গবাদ প্রভৃতি অধস্তন অনার্য্যমতেরও আভাস গৌতমের গ্রন্থে রহিয়াছে। অতএব গৌতমের কালনির্ণয়ের জন্য প্রয়াসবাহুল্য স্বীকার করা বৃথা। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কপিলের ও কণাদের দর্শনের পর গৌতমের দর্শন। বোধ হয়, দর্শনগুলির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমনিয়মে প্রাগুক্ত "কপিলস্য কণাদস্য গৌতমস্য পতঞ্জলেঃ" শ্লোকটি রচিত হইয়াছে। অবশেষে বক্তব্য এই যে, কপিলের পর গৌতম, এ কথা অসন্দিগ্ধ, পরন্তু কণাদের পর গৌতম, এ কথা সন্দিগ্ধ।

গৌতমদর্শনের ভাষ্যলেখক বাৎস্যায়ন। বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে আর কেহ ন্যায়ভাষ্য লিখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বিদিত নহি। যে মহাপুরুষ এতদ্দেশে চাণক্য-পণ্ডিত নামে পরিচিত, সেই মহাপুরুষেরই অন্য নাম বাৎস্যায়ন। ইঁহার আরও সাতটি নাম আছে ; যথা—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যচণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥"

অতএব এই চাণক্যপণ্ডিতই নীতিশাস্ত্রের বিষ্ণুগুপ্ত বা বিষ্ণুশর্ম্মা, শব্দশাস্ত্রের কৌটিল্য এবং ন্যায়ভাষ্যের বাৎস্যায়ন। প্রাচীন মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের প্রায় সকল নামই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পক্ষিলস্বামী নামটি নানাশাস্ত্রলেখক বাচস্পতিমিশ্রই ব্যবহার করিয়াছেন। চাণক্যাপরনামা বাৎস্যায়ন অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ-দেশ অলঙ্কৃত করিয়া জীবিত ছিলেন।

ইনিই প্রাচীন নন্দবংশের ধ্বংসকর্ত্তা ও মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই চন্দ্রগুপ্ত-নামক মৌর্য্যপুত্রকে নন্দবংশীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় করান। ইঁহার কালনির্ণয়সম্বন্ধে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যাহা বলেন বলুন, এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে ইনি অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহার কৃত ন্যায়ভাষ্যের বার্ত্তিকলেখক উদ্যোতকর-মিশ্র। উদ্যোতকর মিথিলাবাসী ছিলেন। ইঁহার বার্ত্তিকপাঠে জানা যায়, তৎপূর্ব্বে ন্যায়ভাষ্যের উপর অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। উদ্যোতকরের বার্ত্তিক-আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল ভাষ্যব্যাখ্যাকার বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ব্যাখ্যা-কার দিঙ্‌নাগাচার্য্য। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন যে, দিঙ্‌নাগের দুষ্টব্যাখ্যা প্রচারিত দেখিয়াই উদ্যোতকর তৎশোধনার্থ বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন। কালি-দাসের মেঘদূতকাব্যের টীকায় এক দিঙ্‌-নাগের উল্লেখ দেখা যায়, সে দিঙ্‌নাগ ন্যায়ভাষ্যব্যাখ্যাকার কি না, আমরা নিশ্চয় করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, দিঙ্‌নাগ এক বৌদ্ধপণ্ডিত। তিনি বিক্রমাদিত্যের সম-কালিক। অন্যে বলেন, তিনি ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন এবং তিনিই ন্যায়-ভাষ্যের ব্যাখ্যালেখক। এই শেষোক্ত মত সত্য হইলে বলিতে পারা যায়, মৈথিল উদ্যোতকর ১৭০০ বৎসরের কিছুকাল পরে মিথিলাজনপদে প্রাদুর্ভূত হন। দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধ ছিলেন, সেজন্য তাঁহার ব্যাখ্যা বৌদ্ধমতানুযায়ী হইয়াছিল ; কাজেই উদ্যোত-করের নিকট তিনি কুতার্কিক ও তাঁহার ব্যাখ্যাও কুব্যাখ্যা। তাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতোঃ
করিষ্যতে তত্র ময়া নিবন্ধঃ।"

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতিমিশ্র উদ্যোত-করকৃত বার্ত্তিকের উপর তাৎপর্য্যনাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। ইনিও মৈথিল এবং ইঁহার স্থিতিকাল আনুমানিক ৮০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার পরে ইঁহারই কৃত ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকার উপর তাৎপর্য্যনাম্নী টীকা মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যকর্ত্তৃক লিখিত হয়। ইহার পরে আর কেহ সমগ্র ন্যায়দর্শনের বিস্তৃতিচেষ্টা করেন নাই। মিথিলাবাসী গঙ্গেশ এবং পক্ষধর-

মিশ্র প্রভৃতি এবং বঙ্গবাসী রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ ও মথুরেশ প্রভৃতি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিকদর্শনের সমধিক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হইয়াছে। গৌতম-দর্শনের উন্নতি হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না, তবে প্রসঙ্গসিদ্ধিন্যায়ে গৌতম-দর্শনেরও কোন কোন অংশ উন্নত ও বিস্তৃত হইয়াছে। বৈশেষিকশাস্ত্রের সহিত গৌতমোক্ত শাস্ত্রের বহু অংশে মিল বা ঐক্য থাকায় বৈশেষিকের বিস্তারে গৌতমোক্ত শাস্ত্রের বিস্তার প্রসঙ্গসিদ্ধ।

গৌতমদর্শন ষোলপ্রকার পদার্থের উপর অবতরিত। সে সকলের নাম এই—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই সকল পদার্থের আবার অবান্তর বিভাগ আছে। উপরোক্ত মহামহোপাধ্যায়দিগের দ্বারা প্রায় সকল বিভাগই উন্নত হইয়াছে।

কেবল বাদ, জল্প, জাতি, শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মান্তর, এই কয় বিভাগ কিছু অবিস্তৃত রহিয়াছে। বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, এই তিন বিভাগের মধ্যে বিতণ্ডা-বিভাগ এত বিবৃদ্ধ হইয়াছে যে, সে বৃদ্ধি বোধ হয় চূড়ান্তসীমা অতিক্রম করিয়াছে।

গৌতমের দর্শন অতি গম্ভীর ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও সূত্রের দ্বারা প্রণীত হওয়ায়, প্রথমত বোধ হয় গৌতমের দর্শন অতি সংক্ষিপ্ত। পরন্তু সে সকল সূত্র সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে গেলে তখন আর সংক্ষিপ্ততা থাকে না। যতই চিন্তা করা যায়, ততই তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। তাদৃশ ৫২১ সূত্রের দ্বারা বিশাল ন্যায়দর্শন প্রস্তুত করিয়া মহর্ষি অক্ষপাদ যার পর নাই ক্ষমতাধিক্য দেখাইয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভাবধি কোথাও তিনচার সূত্রে, কোথাও বা তদধিক সূত্রে এক এক প্রস্তাব সমাপ্ত করিতে দেখা যায়। প্রস্তাবগুলির অপর নাম প্রকরণ। তাদৃশ প্রকরণের কতিপয় কতিপয় প্রকরণে এক এক আহ্নিক। তাদৃশ আহ্নিকের দুই দুই আহ্নিকে এক এক অধ্যায় এবং তাদৃশ অধ্যায়ের পাঁচ অধ্যায়ে গৌতমের দর্শন সমাপ্ত।

উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে অন্যূন অশীতিসংখ্যক প্রকরণ বা প্রস্তাব আছে। সেগুলি এই—শাস্ত্রের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রমাণলক্ষণ, প্রমেয়তত্ত্ব, ন্যায়ের পূর্ব্বাঙ্গ, ন্যায়াশ্রিত সিদ্ধান্তের আকার, ন্যায়ের লক্ষণ, ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ, ন্যায়ানুগত কথা, যেপ্রকার হেতুতে সাধনীয় বিষয় সিদ্ধ হয় না সেই সকল হেতুর বিবরণ (ইহারই শাস্ত্রীয়নাম হেত্বাভাস), ছল, অশক্তিমূলক দোষ অর্থাৎ আপত্তিনিরাস ও অন্যের উদ্ভাবিত তর্কের দোষ দেখাইতে না পারা, সংশয়, প্রমাণ-সামান্য, প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অবয়বী, অনুমান-প্রমাণ, বর্ত্তমানভাব, উপমানপ্রামাণ্য, শব্দসামান্যপরীক্ষা, চক্ষুরিন্দ্রিয় এক, মন ও আত্মা বিভিন্ন, আত্মা অনাদিনিধন, শরীরোৎপত্তি ও ইন্দ্রিয়পরীক্ষা, ইন্দ্রিয় অনেক, ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা প্রচারস্থান, বুদ্ধি বা জ্ঞান নিত্যপদার্থ নহে পরন্তু অনিত্য-পদার্থ, ক্ষণভঙ্গবাদ, বুদ্ধি ও আত্মার গুণ, বুদ্ধি উৎপন্নপ্রধ্বংসিনী, বুদ্ধি শরীরের ধর্ম্ম নহে, মনঃপরীক্ষা, শরীর অদৃষ্টানুসারে

উৎপন্ন হয়, প্রবৃত্তি ও দোষসামান্য, দোষপরীক্ষা, জন্মান্তর, শূন্যবাদনিরাস, ঈশ্বর জগতের অনুপাদান, জগৎ আকস্মিক নহে, সমস্ত বস্তু অনিত্য নহে, সমস্ত বস্তু নানাত্মক নহে, সর্ব্বশূন্যবাদনিরাস, ফলপরীক্ষা, দুঃখ-বৃত্তান্ত, মুক্তি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, অবয়ব ও অবয়বী, নিরবয়ব বস্তু, বাহ্যবস্তু, তত্ত্বজ্ঞান-বৃদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানপালন, কেহ কোন হেতু প্রদর্শন করিলে তদ্বিরুদ্ধে হেত্বন্তর উদ্ভাবন করা (ইহার শাস্ত্রীয় নাম সৎপ্রতিপক্ষ), ২৪প্রকার জাতি অর্থাৎ বাদীর উক্তিতে যে দোষ থাকে সেই দোষ বাদীকে দেখান, অভিমত বাক্যার্থের অপ্রতিপাদক পদার্থ, এবং ২২প্রকার নিগ্রহস্থান অর্থাৎ পরাজয়ের স্থান। গৌতমের গ্রন্থে এই সকল প্রস্তাব আছে এবং প্রস্তাবসকল অতি সুপ্রণালীতে নিবদ্ধ হইতে দেখা যায়।

এই সকল প্রকরণে যে যে বিষয় গৌতম-কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে, সে সকল এরূপ স্বল্পকায় প্রবন্ধে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সেই-জন্য আমি এইস্থানেই অদ্যকার পাঠ সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

পাগল।

পশ্চিমের একটি ছোট সহর। সম্মুখে বড়রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মত আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ীর ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার, সবুজ মেঘের মত, স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই ছোট সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন্ আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা ত আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে এক-দিনের জ্যোতির্ম্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্র-মেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করি-লাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করি-

লাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম!

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'খেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-নিয়ম এবং বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়ই মুস্কিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়দিন;—এই অনিয়মের দিন, এই ভুলের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর, একএকটা দিন পূরা পাগ্‌লামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগলশব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্ষ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্ষ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্ষ্যাপামির এক-প্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌পালট্‌ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ্‌ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া দিনের মত হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে—কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে!

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপ্‌ছাড়া! সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্ত্তি এই কর্ম্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!—সুন্দর শান্তচ্ছবি!

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত! জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অতি অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছ! একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ্‌ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভৃঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ অবয়বী, 'ফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা, উপমানপ্রনা—ইহাতেই আমার নেশা বিন্দ্রিয় ..., সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

'আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে 'আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া' চুরমার করিয়া

দেয়,—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেণ্ট্রিফ্যুগল্"—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরোত্তর বৃহদায়মান পাকওয়ালা কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই, তাহারি জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে, পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারি কীর্ত্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবান্ও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান্ দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া-আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার জলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ

দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়! সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! তাহারই ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক্!

আমাদের এই ক্ষ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয়-মূল্যবান্ করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্ত্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল-দেওয়া মুদীর দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই কটা জিনিষের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভাল করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্‌নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাঁহার মত দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিষ কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালরূপ জানি

মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কখন্ একমুহূর্ত্তে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্ব্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুরসঙ্গত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক্ হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না— আশ্চর্য্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর-দিকে অনন্তের, যে একদিকে কাজের, সে আর একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর-একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত— যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়ঙ্কর খাপ্ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে অতিপরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা —আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্ব্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়সাহেবের মত অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়সাহেবের চেয়ে যিনি বড়, সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল! আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম— তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক্!

নমস্কার।

যে কেহ মোরে দিয়েছে সুখ,
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে কেহ মোরে দিয়েছে দুখ
দিয়েছে তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।

যে কেহ মোরে বেসেছে ভালো,
জ্বেলেছে ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি!

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

দেশের কথা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত "দেশের কথা" নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন :—

"এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন, তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"কোন সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয়

শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্কর-মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস্ ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্ম্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়,—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া-তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।”

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন :—

“দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গভর্মেণ্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।”

শিক্ষাটা কি এই হইল? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্ব্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবল জাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্‌ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়? ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন—তা ছাড়া আর কি করিব? একটা ত কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় ত ঐ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কি দেখিলে? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে, ইংরাজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক্ হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল—বিলাতী সভ্যতার মত সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কি, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ঐ নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিষটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই—যদি কোনো বাংলাশব্দই চালাইতে হয়, তবে “স্বাদেশিকতা” কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্দ্ধে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না,

সেইখানেই ধর্ম্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্ম্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনই ধর্ম্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ কখনই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসী-সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি;—নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধা-মাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসীও নেহাৎ ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কি জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনসুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এস্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূতপ্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোল-যুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্ম্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্ম্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলি পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে-সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী Sven Hedrinএর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller States appears precarious. A small State which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself,' 'Thou shalt not steal,' 'Thou shalt do no murder' 'Peace on earth and goodwill towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ সকল কথার তাৎপর্য্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেল-

গাড়ি ও বড় বড় ইস্কুলবই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চ্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্ম্মই বা কোথায়? আদর্শরক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধচর্চ্চার স্থল কোথায়? কাজেই সেজন্যে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুদ্ধ ইংরাজি-ভাষায় রেজোল্যুশন্ পাস্ না করিলে চলেই না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এম্নি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন্—অর্থাৎ পোলিটিকাল্-স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায়—বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরমলাভ। তাহার উপরেও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে,—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড় বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া—মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দ্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সঙ্কীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ারযুদ্ধে ইংরাজের তরফে রসদের মধ্যে রাশিরাশি ভ্যাজাল্। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে—ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্ম্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড় কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি "দেশের কথা"র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—

"গভর্মেণ্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাহার আর একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।"

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে

ন্যায়দণ্ড কতকটা সীধা থাকিত। কিন্তু দেউস্করমহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে!

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশান্ বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্য্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্করমহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

পুরুষসিংহ।

[হাস্যরসব্যতিরিক্ত নবরসের কবিতা]

অদ্ভুত।

অক্ষক্রীড়াঘটায় ব্রীড়া কি যে তা বোলো না,
দিন্‌টাভোর করিয়া শোর সতের পোলো না!

বীভৎস।

মেজাজ্ গেল বিগ্‌ড়ে তাহে মুস্‌ড়ে গেল প্রাণ;
ভঙ্গ খেলা; সিংহবাবু গৃহেতে ফিরে যান।

রৌদ্র।

প্রবেশি গেহ কহিল—"কেহ দিবে না কি গো ভাত?"
"এসেছ ঘুরে?"—গিন্নি তাঁরে কহিল দৈবাৎ;
"খেলিলে পাশা ক্ষুধাপিপাসা থাকে কি কাহারো?"
আর কে তাখে? দাঁড়াল বেঁকে সিংহ বেতরো।

ভয়ানক।

কহিল রাগি'—"দেশ-তেয়াগী হইব এখনি।"
হাসিল শুধু মৃদুল মধু গোপনে গৃহিণী।

বস্ত্রগুলি গুছিয়ে তুলি' বাঁধিয়া পোঁটলা,
বল্লে—"ওরে, দেশ্‌টা ছেড়ে চলিনু একেলা !"

আদি।

এগিয়ে এসে গিন্নী হেসে ধল্লে সেগুলি,
একটি হাত প্রসারি নাথে রাখিল আগুলি।

বীর।

ক্রোধে অধীর হেল বীর, কথা না মানিল ;
বেজায় জোরে আঁক্‌ড়ে ধোরে বোঁচ্‌কা টানিল।
হ্যাচ্‌কা টানে বোঁচ্‌কা নিতে মচ্‌কে গেল হাত ;
ছট্‌কে পড়ে' সিংহ যে রে ভূমিতে চিৎপাৎ।

করুণ।

অঙ্গে ব্যথা ! সিংহ কথা কহিছে কাতরে—
"হলেম খুন্ হলুদ্‌চুন্ আন্‌তে যা ত রে !"
দুচারি-ঘটি জলের ছিটা, পাখার বাতাসে ;
হলুদ-চুন্-পটির গুণে তুলিল মাথা সে।

বাৎসল্য।

ঝাড়িয়া দিল গায়ের ধুলো হস্ত বুলায়ে,
রহিল তবু সিংহবাবু ওষ্ঠ ফুলায়ে।

শান্ত।

থালায় কোরে পথ্য তাঁরে দিলেন গৃহিণী।
যতেক খান্ আবার চান্, ক্ষুধাটা এমনি।
হাঁড়িটি বেশ করিয়া শেষ, গুড়াকু ফুঁকিয়া,
ধূমে ও ঘুমে সকল গোল গেল রে চুকিয়া।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমি সে জানি।

তুমি যে আমারে চাও
　　আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও
　　আমি সে জানি।

এ আলোকে এ আঁধারে
কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও
আমি সে জানি।

সারাদিন নানাকাজে
কেন তুমি নানাসাজে
কত সুরে ডাক দাও
আমি সে জানি।

সারা হ'লে দেয়া-নেয়া
দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্-দিক্-পানে যাও
আমি সে জানি।

বংশীধ্বনি।

কি সুর বাজে আমার প্রাণে
আমিই জানি মনই জানে!
কিসের লাগি সদাই জাগি,
কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে,
আমিই জানি মনই জানে!

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে
সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,
বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে
আমিই জানি মনই জানে!

বঙ্গদর্শন।

গীতার দর্শন।

ভগবদ্গীতার একদিকে যেমন ধর্ম্মতত্ত্ব, অন্যদিকে সেইরূপ দর্শনশাস্ত্র—তত্ত্ববিদ্যা। ধর্ম্মতত্ত্বে নিষ্কাম কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, সমদর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তিসমন্বিত উপদেশমালায় সাংখ্য, যোগ, বেদান্ততত্ত্বসকল গ্রথিত রহিয়াছে। সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, ত্রৈগুণ্যবিচার; যোগের শম-দম-ধ্যান-সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ প্রকরণ; বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ, এ সকলই গীতার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনত্রয় যেন পরস্পর প্রাধান্যলাভের জন্য উন্মুখ রহিয়াছে। ভগবান্‌ও তাহাদের দ্বন্দ্ব মিটাইবার জন্য তেমনি যত্নশীল। গীতোক্ত দর্শন সাংখ্যপ্রধান অথবা যোগপ্রধান, এই বিষয়ে অনেকসময় সন্দেহ উপস্থিত হয়; সে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিয়া রাখিলেন যে, উহারা উভয়েই এক, সাংখ্যও যা, যোগ্‌ও তা, বালকেরা উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া বলে। তিনি চা'ন যে, সাংখ্য ও যোগের, জ্ঞান ও কর্ম্মের বিবাদ মিটিয়া যায়। জ্ঞানবাদী ও কর্ম্মবাদী, ইহাদের পরস্পর পার্থক্য যত অনর্থের মূল; জ্ঞান কর্ম্ম বিনা নিরর্থক —কর্ম্মও জ্ঞান বিনা নিষ্ফল ও অমঙ্গলকর।

গীতায় বেদান্ততত্ত্বেরও বিলক্ষণ প্রতিপত্তি। বেদান্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ অনুরাগ; এমন কি, একস্থানে তিনি 'বেদান্তকৃৎ', বেদান্তকর্ত্তা বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদ তাঁহার উপদেশের সারতত্ত্ব। জীবব্রহ্মে অভেদজ্ঞানই তাঁহার মতে সাত্ত্বিক জ্ঞান—প্রভেদজ্ঞান রাজসিক জ্ঞান।

> সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
> অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
> পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
> বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ $\frac{১৮}{২০-২১}$

কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেই যে আত্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ আছে, আত্মা-পরমাত্মার অভেদভাব না দেখিলে তাহার অর্থ হয় না। সে সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সুতরাং অবিনাশী। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর। যদি তাহা হয়, তবে মৃতের জন্য বৃথা

শোক করিতেছ কেন? যুদ্ধে কেনই বা বিমুখ?

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ২/১৭.১৮

সেই যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহ বিনাশ করিতে সক্ষম নহে। নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২/২০

ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ, শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান্ স্পষ্টই বলিতেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭

এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ। ইনি প্রকৃতিবিলীন পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করেন।

কি আত্মজ্ঞান, কি ব্রহ্মজ্ঞান, গীতার উপদেশসকল বেদান্তভাবে অনুবিদ্ধ; যে সমস্ত বচন পূর্ব্বাপর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এ কথা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। 'বিশ্বরূপদর্শন' অধ্যায়ে এই একাত্মভাব অপূর্ব্ব কবিত্বমাধুরীতে প্রস্ফুটিত। বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে সাংখ্য ও যোগতত্ত্বসকল উপদিষ্ট হইতেছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে যোগশাস্ত্রের অনুশাসিত কর্ম্মযোগ—শেষ ছয় অধ্যায়ের অধিকাংশ সাংখ্যোক্ত উপদেশে পূর্ণ, মধ্যাংশ ও অন্যান্য স্থানে বেদান্ত;—গীতার রচনা-প্রণালী এইরূপ বিমিশ্র। কিন্তু এই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের কি কোন বন্ধনসূত্র নাই? অবশ্য আছে এবং তাহা সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ দেখিতে পান। ফলত, এ কথা সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়েই গীতার প্রধান গৌরব। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, সকল শাস্ত্রের শিক্ষা—সর্ব্বপ্রকার সাধনার একই লক্ষ্য—যিনি যে পথ দিয়া গমন করুন, সেই একই স্থানে গিয়া তাঁহাকে পৌঁছিতে হইবে।—

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ। ১৩/২৪-২৫

কেহ কেহ ধ্যানযোগে, কেহ সাংখ্য-যোগে, কেহ বা কর্ম্মযোগে আত্মাতে পর-মাত্মাকে উপলব্ধি করেন। অন্যেরা তাঁহাকে এইরূপে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সেই শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পন্থীর লক্ষ্য ও গতি একই। এইহেতু গীতার প্রণয়নকালে যে সমস্ত দর্শনতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তাহার কোনটিকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই—সকলকেই আপনার মতের সঙ্গে মিলাইয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। এই সার্ব্বভৌমতা গীতার একটি বিশেষত্ব। "গীতায় সাম্প্রদায়িকতা বা 'সঙ্কীর্ণতার লেশ-মাত্র নাই'। সেইজন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান

আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষে গীতা তুল্য উপাদেয়।" এই কথাগুলি আমি হীরেন্দ্রবাবুর "গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার প্রবন্ধগুলি সারবান্, যুক্তিগর্ভ, অতি সুপাঠ্য হইয়াছে—গীতানুরাগিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষরূপ দ্বৈতবাদ, বেদান্তের জীবব্রহ্মে অভেদরূপ অদ্বৈতবাদ—এ উভয়ই গীতাশাস্ত্রে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রকৃতি কোথাও অনাদি মূলতত্ত্ব, কোথাও বা ঐশ্বরী মায়ায় অবগুণ্ঠিতা। কখন স্বপ্রধান, কখনও ঈশ্বরের অধীনে কার্য্য করিতেছে। আপাতত মনে হইতে পারে, এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্যসাধন একপ্রকার অসম্ভব। অথচ গীতার মধ্যে এই সমস্ত তত্ত্বের একটি সমন্বয়চেষ্টা পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়; ইহাদের মধ্যে একটি বন্ধনসূত্র আছে। সেই বন্ধন হচ্চে গীতোপদিষ্ট ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরবাদ। হীরেন্দ্রবাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে এই ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হয় যে, তাহাদের মধ্যে কি একটা অসম্পূর্ণতা, কি একটা অভাব রহিয়া গিয়াছে; আর গীতা ঈশ্বরবাদের অবতারণা করিয়া সেই অভাবের পূরণ করিয়াছেন, সেই অসম্পূর্ণতার মোচন করিয়াছেন। এই একটি রাসায়নিক বস্তুর সংযোগে দর্শনশাস্ত্রকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।" যদি তাহার প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে গীতার তূলিকায় সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তদর্শনের চিত্রে যে রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা দেখিতে হয়, এবং হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি যে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া গীতোক্ত ব্রহ্মবাদে প্রবেশ করা সহজ।

গীতা সাংখ্যমত অনুসরণ করিয়া যে ভাবে প্রকৃতিপুরুষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে আমি তাহা দেখাইব। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে—

"প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে; দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও সুখদুঃখাদি গুণসকল প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া জানিবে।" ২০ সবিকার প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিয়া সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে এইরূপ :—

১। অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি।

২। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্ব।

৩। অহঙ্কার।

৪—৮। পঞ্চতন্মাত্র। ৯—১৯। একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০—২৪। পঞ্চ মহাভূত।

২৫। পুরুষ।

পঞ্চতন্মাত্র কিনা ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চবিষয়=শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

একাদশ ইন্দ্রিয়=পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়)।

পঞ্চ মহাভূত=ক্ষিতি, অপ্ (জল), তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

এই পর্য্যায় হইতে সৃষ্টির ক্রম উপলব্ধ হইবে। যথা—

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও

একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত।

পুরুষ=আত্মা, অনাদি, ইনি প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন।

কোন কোন সাংখ্যকার (তত্ত্বসমাস) অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার, এই দুই শ্রেণীতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিভক্ত করেন।

অষ্ট প্রকৃতি কিনা মূলপ্রকৃতি এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই শেষোক্ত সপ্তক যদিও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয় ও মহাভূতাদির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গৌণভাবে প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতির ষোড়শ বিকার হচ্চে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫।৬ শ্লোকে এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, বুদ্ধি অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দাদি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়-পঞ্চ, একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চমহাভূত। ইহাদের নাম সবিকার ক্ষেত্র। ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি ক্ষেত্রধর্ম্ম পরের শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সঙ্ঘাত অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টি, চেতনা ও ধৃতি, এই দেহ ও মনোবৃত্তিসমুদায় ক্ষেত্রান্তঃপাতী। ইহারা সর্ব্বসমেত সবিকার ক্ষেত্র।

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূতময় জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল? সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ এই—

প্রকৃতি গুণময়ী; সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণত্রয় প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে—এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই বিপ্লবে প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম, তাহাই মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার; অহঙ্কারের বিকারে তমোগুণ প্রবল হইলে পঞ্চতন্মাত্র, এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্রের বিকারে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি। এই পঞ্চমহাভূত স্থূলবিষয়রূপে ও জীবদেহরূপে আমাদের উপভোগ্য হয়।

সত্ত্বাদিগুণের সাম্যভঙ্গজনিত অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে বুদ্ধি, তাহা কি? বুদ্ধির অর্থ প্রকাশ, আলোক, চিৎপ্রভার প্রথম বিকাশ। যাহা সুপ্তাবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ করে, তাহাই বুদ্ধি। বুদ্ধির অপর নাম মহৎতত্ত্ব। এই মহৎতত্ত্বকে অন্যান্য শাস্ত্রেও জ্ঞানস্থানীয় বলা হইয়াছে। মহতের পরিণাম অহঙ্কার। আগে বুদ্ধির উদয়, পরে তদ্বিষয়ে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি, আমার, এই বিশিষ্টজ্ঞান জন্মে। বিষয় ও বিষয়ীর পরস্পর প্রতিঘাত না হইলে এই জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হয় না। জ্ঞানের এই যে নিশ্চয়াত্মক বিকাশ, তাহাই অহঙ্কারের কার্য্য। অতএব বলা যাইতে পারে যে, অহঙ্কার হইতে জ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হয়। অহঙ্কার তাহার জ্ঞেয়বিষয় কোথা হইতে পায়? ইন্দ্রিয়সকল হইতে; ইন্দ্রিয়ের বিষয় কি? আদৌ, পঞ্চতন্মাত্র=শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ ; ইহারাই আবার পঞ্চমহাভূতের উপাদান। "অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ" অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতসকল হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি। এই নিয়মে, শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, এবং আকাশ হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভূত পর-পর ভূতের কারণ, সেজন্য পর-পর ভূতে একএকটি অধিক গুণ বিদ্যমান আছে। আকাশের এক গুণ শব্দ; বায়ু দ্বিগুণ-বিশিষ্ট; তেজে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ত্রিগুণ, জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং পৃথিবীতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অবস্থিত আছে। এই সূক্ষ্মভূত ও স্থূলভূত ইন্দ্রিয়গণের যাবতীয় বিষয়। মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই গণ্য;—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়াত্মক অন্তরিন্দ্রিয়। মনের ধর্ম্ম কি ?

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি-র্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি।"

সঙ্কল্প, বিকল্প, কামনা ইত্যাদি মনোধর্ম্ম।

এখন কতকটা জানা গেল, আমরা যে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান লাভ করি, সেই জ্ঞান-ক্রিয়া সাংখ্যমতে কিরূপে সম্পন্ন হয় ? ইহা আরো একটুকু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই জ্ঞানক্রিয়ার প্রণালী দুই বিভিন্নপ্রকার বলা যাইতে পারে। এক এই যে, বিষয়জ্ঞান প্রথমে মনোরাজ্যে প্রবেশ করে। মন স্বোপার্জ্জিত বিত্ত অহঙ্কারের নিকট আনিয়া দেয়। অহঙ্কার তাহা বাছিয়া-লইয়া বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করে। বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান পরিণতিলাভ করিলে তবে তাহা পুরুষের বোধগম্য হয়। এইরূপে ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বিষয়গ্রহণ, পরক্ষণে তাহা মনের নিকট অর্পণ ; সঙ্কল্পাত্মক মন হইতে অহঙ্কারে, অহঙ্কার হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পৌঁছিয়া জ্ঞানের উত্তরোত্তর বিকাশ হয়। প্রকৃতির চিত্রপটে জগৎচিত্রের এই যে ক্রমবিকাশ, তাহা আরোহী প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার এই এক দৃষ্টান্ত আছে (৩৬)—

"গ্রামাধ্যক্ষগণ প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া যেমন বিভাগের কর্ত্তৃ-পুরুষের হস্তে আনিয়া দেয়, ইনি আবার কোষাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করেন, কোষাধ্যক্ষ তাহা রাজার কাছে লইয়া যান ; সেইরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়গণ কোন বিষয় পাইবা-মাত্র মনের নিকট লইয়া যায়, মন তাহা দেখিয়া-লইয়া অহঙ্কারের হস্তে প্রদান করে, অহঙ্কার তাহা গণিয়া-গাঁথিয়া আত্মসাৎ করিয়া বুদ্ধির নিকট লইয়া উপস্থিত করে। বুদ্ধিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভাবনা বা প্রজ্ঞারূপে পরিণত হয়।"

এই গেল আরোহী প্রণালী। অবরোহী প্রণালীতে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়-জ্ঞান অহঙ্কারে সঞ্চারিত হয়—সামান্য হইতে বিশেষে, ব্যাপক হইতে সঙ্কীর্ণে, সর্ব্বগত হইতে বস্তুগত ক্ষেত্রে অবতরণ করে। বুদ্ধি সারসত্যের আলোক ধারণ করে, অহঙ্কার তাহা আপনার গণ্ডীর ভিতর আনিয়া স্বায়ত্ত করে। বস্তুগত (objective) চৈতন্যকে ব্যক্তিগত (subjective) করা অহঙ্কারের কার্য্য। বুদ্ধিতে জ্ঞানের উদ্রেক, অহঙ্কারে জ্ঞানের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়, ইনি দ্বারপালের কার্য্য করেন ; এই প্রহরীর

কাছে আসিয়া প্রথমে জ্ঞেয়বস্তুকে আত্ম-পরিচয় দিয়া উপর-উপর ধাপে আরোহণ করিতে হয়, ইঁহার সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানের বিষয় বুদ্ধি কিংবা অহঙ্কারের কাছে পৌঁছিতেই পারে না।

"মহদাখ্যমাদ্যকার্য্যম্", "চরমোঽহঙ্কারঃ"—এই দুই কপিলসূত্রে উক্তরূপ অবরোহী প্রণালী লক্ষিত হইবে।

এইরূপে মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ অন্তর্জগতে জ্ঞানের কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছে, পুরুষ কিন্তু এই সকল কার্য্যের সহিত লিপ্ত থাকেন না। ঘড়ির যন্ত্রের ন্যায় প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে—পুরুষ উদাসীনভাবে সকল দেখিতেছেন; কখনও বা মোহবশতঃ "অহং কর্ত্তা" ভাবিয়া আত্মাভিমানে মগ্ন হইতেছেন।

গীতায় অনেকস্থানে "অব্যক্ত"শব্দ প্রকৃতি অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি", "অব্যক্তনিধনানি"—অব্যক্ত হইতে জগতের উৎপত্তি, প্রলয়কালে জগতের অব্যক্তে তিরোভাব।

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ৮/১৮

প্রলয়ের অবসানে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়, এবং সৃষ্টির অবসানে উহা অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়।

গীতায় মহতের পরিবর্ত্তে বুদ্ধিশব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এই বুদ্ধিশব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত। বুদ্ধির একটি অর্থ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে। সাংখ্যদর্শনেও নিশ্চয়বৃত্তিমতী বুদ্ধির কথা আছে। মূল মহত্তত্ত্ব যখন শরীরে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যষ্টিভাব ধারণ করে, তখন তাহা দেহীর অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির রূপে আবির্ভূত হয়। গীতোক্ত এই ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অর্থ ভগবানে একাগ্রবুদ্ধি = একনিষ্ঠা।

গীতায় 'পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার', এই অষ্টধা প্রকৃতি ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা পরে দেখান যাইবে।

গীতায় যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তাহা উপরে বলা হইয়াছে; ত্রৈগুণ্য-বিচারেও সাংখ্যই গীতার আদর্শ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে আছে

সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ প্রকৃতিসম্ভূত জানিবে। এই গুণত্রয় দেহীকে দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

ত্রিগুণলক্ষণ—

সত্ত্বগুণ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত প্রকাশক ও অনাময়; এই নিমিত্ত উহা দেহীকে 'সুখসঙ্গে' ও 'জ্ঞানসঙ্গে' বাঁধিয়া রাখে।

রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে সমুদ্ভূত; উহা দেহীকে কর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া রাখে।

তমোগুণ অজ্ঞান ও মোহজনক; উহা প্রাণীদিগকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাতে অভিভূত করিয়া রাখে।

সত্ত্বগুণ প্রাণীদিগকে সুখে মগ্ন, রজোগুণ কর্ম্মে সংসক্ত, এবং তমোগুণ জ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া প্রমাদে আচ্ছন্ন করে। ১৪/৬—৯

গীতা বলেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ। ১৮/৪০

নাহি এই পৃথিবীতে হেন কোন জন,
ত্রিদিবেও নাহি কোন দেবতা এমন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কোথাও না পাইবে দেখিতে,
মুক্ত যেই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ হইতে।

গীতা দেখাইতেছেন, এই বিশ্বসংসারে ত্রৈগুণ্যের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত। যজ্ঞ-দান-তপস্যা, আহার, কর্ত্তাকর্ম্মজ্ঞান, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি-ধৃতি-সুখ, এমন কোন গুণ নাই, কোন কর্ম্ম নাই, যাহা ত্রিগুণের সংস্রব-রহিত। গুণভেদে ত্রিধা ভিন্ন হইয়া কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি রূপান্তর ঘটে, তাহা ১৭।১৮শ অধ্যায়ে তন্ন তন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিতে এই তিন বিরোধী গুণের সততই সংগ্রাম চলিতেছে, "একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উদ্যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ, বা সুখ, বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখনও রজ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি, বা দুঃখ, বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; আবার কখনও বা তম উৎকট হইয়া নিয়ম (প্রতিবন্ধ,) বা মোহ, বা গুরুত্ব উৎপন্ন করিতেছে।"

গীতাও ইহার অনুমোদন করিতেছেন:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১৪/১০

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমকে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমকে, তমোগুণ রজ ও সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া রাখে।

যখন সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন জ্ঞানের প্রকাশ। রজোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভস্পৃহা, অশান্তি জন্মে; তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ সঞ্জাত হয়। ১১—১৩। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান আবির্ভূত হয়। ১৭

প্রকৃতি-পুরুষের গুণাগুণ—

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্ত্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি এবং সুখদুঃখভোগবিষয়ে পুরুষই কারণ। ১৩/২০

যিনি প্রকৃতিকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা এবং আপনাকে অকর্ত্তারূপে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। ১৩/২৯

প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সকল কর্ম্ম কৃত হয়, কিন্তু অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ৩/২৭

গীতা বলেন যে, শরীর, অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর বিবিধ চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই পঞ্চকারণ সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ১৮/১৪। পুরুষ অকর্ত্তা। ১৬

পুরুষের লক্ষণ—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ১৩/৩১

হে কৌন্তেয়! এই অব্যয় পরমাত্মা অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বপ্রযুক্ত শরীরস্থ হইয়াও কোন কর্ম্ম করেন না ও কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২১

পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া প্রকৃতিজ সুখদুঃখ ভোগ করেন। এই

গুণসঙ্গই তাহার সদসদ্যোনিতে জন্মগ্রহণের একমাত্র কারণ।

এই সমস্ত তত্ত্ব সামান্যত কাপিলসাংখ্যের অনুযায়ী। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই নিত্য, অনাদি ও অপরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন; প্রকৃতি সবিকার, পুরুষ কূটস্থ নির্ব্বিকার; প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ নির্গুণ; প্রকৃতি ভোগ্য, পুরুষ ভোক্তা। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়—সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য; পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন, সাক্ষিস্বরূপ। প্রকৃতি হইতে সত্ত্বরজস্তমোগুণ উৎপন্ন, পুরুষ তজ্জনিত-সুখদুঃখভোগী। এই গুণানুবন্ধেই পুরুষ দেহে নিবদ্ধ থাকে।

প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকে। সেইজন্য প্রকৃতির গুণ পুরুষে এবং পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে উপচরিত হয়। সেইজন্য বস্তুত অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে সচেতন বলিয়া মনে হয়, এবং বস্তুত কর্ত্তা না হইলেও পুরুষকে কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধ; পুরুষ অকর্ত্তা, অতএব খঞ্জ + চলৎশক্তিরহিত। প্রকৃতি ব্যতিরেকে পুরুষ খঞ্জ, পুরুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ে সংযুক্ত থাকিয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করে। তাহাদের সংযোগের ফলেই সৃষ্টি। প্রকৃতির সৃষ্টি নিজের জন্য নহে—পরের জন্য। পুরুষ দর্শক হইয়া উপস্থিত না থাকিলে প্রকৃতি কোন কার্য্য করে না। সৃষ্টির উদ্দেশ্য—পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বরশাস্ত্র। সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গই নাই। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে স্পষ্টত ঈশ্বরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। উহার প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্র হচ্চে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইজন্য সেশ্বর পাতঞ্জলদর্শনের বিপরীতপক্ষে কাপিলদর্শনকে নিরীশ্বরসাংখ্য বলা হয়। সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ—প্রকৃতি পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না; অন্য কথায়, প্রকৃতি স্বতই জগৎসৃষ্টি করে, কোন স্বতন্ত্র চেতন কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন হস্ত নাই।

গীতায় অপর পক্ষে ঈশ্বরবাদ সমুজ্জ্বল। গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব ঈশ্বরবাদপ্রভাবে অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ বিশ্বের চরম দ্বৈত—এই মহা-দ্বৈতে সাংখ্যশাস্ত্রের পর্য্যবসান। "এই উভয়ের সমন্বয়ে যে চরম একত্বে উপনীত হওয়া যায়, সাংখ্যদর্শনে তাহার আভাস নাই। গীতা কিন্তু সে চরম একত্বের সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন।" গীতার মতে ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ—"সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ।" ৭/১০। এই পঞ্চভূতময় জড়জগৎ ও জীবভূত জগৎ, তাঁহার দুই অংশ—দুই প্রকৃতি—এক অপরা প্রকৃতি, অন্য পরা প্রকৃতি।

ভগবান্ বলিতেছেন—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭/৪-৫

"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্টপ্রকার

প্রকৃতি। ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; ইহা ভিন্ন আমার উৎকৃষ্টা বা পরা প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ভূত চরাচর তাঁহার অপরা প্রকৃতি। ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা—"যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ" এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি।

আবার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥৩—৪

প্রকৃতি (মহদ্‌ব্রহ্ম) মহদ্‌যোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা; আমি এই প্রকৃতিরূপ যোনিতে সমস্ত জগতের যে বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়।

পুনশ্চ -

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯/১০

প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতানিবন্ধন এই বিশ্বচরাচর প্রসব করিতেছে, এইহেতু জগৎ পরিচালিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গীতা সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ প্রকৃতিসম্ভূত বলিয়া সাংখ্যমতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু এই গুণত্রয় আপনা হইতেই প্রকৃতিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তিনি এ কথা বলেন না। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি এই—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি, ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি। ৭/১২

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভাবসকল আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন, কিন্তু আমি এ সকলে আবদ্ধ নহি।

গুণই সর্ব্বেসর্ব্বা নহে, গুণের উপরেও পরমাত্মা আছেন, তাহা পরের শ্লোকে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৪/১৯

গুণই কর্ত্তা, গুণ ভিন্ন কর্ত্তা নাই, ইহা জানিয়া যিনি গুণের অতীত পরমাত্মাকেও দেখেন, তিনি আমার সারূপ্যলাভ করেন।

এই সকল শ্লোক একত্র করিয়া ভাবার্থ কি পাওয়া যায়? এই যে, প্রকৃতি চরম তত্ত্ব নহে, ঈশ্বরই জগতের মূলকারণ। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি ধারণ করিয়া বিশ্বচরাচর সৃজন করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বর সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার অধ্যক্ষতায়, তাঁহার শাসনে প্রকৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। প্রকৃতিস্থ সত্ত্বরজস্তমোগুণ তাঁহা হইতেই প্রসূত, কিন্তু তিনি এই ত্রিগুণে আবদ্ধ নহেন। যে সাধক এই ত্রিগুণের মধ্য দিয়া ত্রিগুণাতীত পরমাত্মাকে দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন।

প্রকৃতির ন্যায় গীতায় পুরুষতত্ত্বও ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত। গীতোক্ত পুরুষবাদ সাংখ্যপুরুষতত্ত্ব হইতে অনেক ভিন্ন। গীতা বলিতেছেন, "এই দেহে বর্ত্তমান পরম পুরুষ সাক্ষী, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর। ইনি পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হয়েন।" ১৩/২২

পূর্ব্বোক্ত ৩১শ শ্লোকে "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ" ইত্যাদি বিশেষণে পুরুষ পরমাত্মারূপে

কথিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাবই গীতার সারতত্ত্ব। অন্যত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে।" এই পরমাত্মা যদিও জীবাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে কোথাও নির্দ্দিষ্ট হন নাই, তথাপি "উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর" এই শব্দগুলি, কোনটি পরমাত্মায়, কোন শব্দ বা জীবাত্মায় প্রযোজ্য, যেন জীবাত্মা-পরমাত্মা দুটি পুরুষ দেহমধ্যে একত্রে বাস করিতেছেন।

উপনিষদে এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
মুণ্ডক ৩।১।১ ; শ্বেতাশ্বতর ৪।৬

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—উভয়ে পরস্পরের সখা। ইহাদের একজন ফলভোক্তা, অন্যজন অনাহারী থাকিয়া সাক্ষিরূপে বিদ্যমান (গীতায় যিনি অন্তর্যামী এবং ফলদাতা)।

পুরুষ এক কি অনেক? এই প্রশ্নের উত্তর বেদান্তে একপ্রকার, সাংখ্যে অন্যপ্রকার। সাংখ্যমতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু। জন্মমৃত্যুর কালভেদ, প্রকৃতি ও গুণভেদ, বর্ণাশ্রমভেদ ইত্যাদি কারণে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পুরুষ যদি বহু হয়, তবে পুরুষ অর্থে পরিমিত জীবাত্মা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অথচ সাংখ্যেরা ইহাও বলেন যে, পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড়্‌বিকারবর্জ্জিত। পুরুষের বহুত্ব এবং তাহার সর্ব্বব্যাপী অনাদি নির্ব্বিকার স্বরূপ যে পরস্পর বিরোধী, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। সে যাহা হউক, গীতা এ বিষয়ে বেদান্তের পথবর্ত্তী হইয়া বহু হইতে একে পৌঁছিয়াছেন। গীতোপদেশে অদ্বৈততত্ত্বের কিরূপ প্রাধান্য, তাহা জ্ঞানযোগব্যাখ্যানে যথেষ্ট সমালোচিত হইয়াছে, এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। গীতায় প্রকৃতি-পুরুষের অন্য নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান। "যেমন এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ একই পুরুষ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।" ১৩/৩৩, "যেমন সর্ব্বত্রগামী মহাবায়ু আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে (পরমাত্মাতে) অবস্থিত।" ৯/৬

আমা হ'তে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর
সবে আমা ওতপ্রোত, গাঁথা যথা সূত্রে মণিহার। ৭/৭

গীতোক্ত পুরুষ সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ,—অনন্যভক্তি দ্বারা যাঁহাকে লাভ করা যায়। ৮/২২

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুষ তিনপ্রকার—ক্ষর অর্থাৎ জড়জগৎ; অক্ষর কিনা জীবাত্মা; এবং ক্ষরাক্ষরের অতীত বিশ্বভুবনভর্ত্তা পরমাত্মা যিনি, তিনি পুরুষোত্তম। এইস্থলে সাংখ্যপুরুষের ঊর্দ্ধে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় পরমপুরুষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বে ঈশ্বরবাদ সমারোপিত করিয়া গীতা তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে কি সৃষ্টি, কি মুক্তি, কিছুতে ঈশ্বরের কোন সম্পর্কই নাই, সাংখ্যের লক্ষ্য যে কৈবল্যমুক্তি, তাহা লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়—জ্ঞান। কিসের জ্ঞান? সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহার মুক্তি সুনিশ্চিত। এই জ্ঞানদ্বারা পুরুষ যখন আপনাকে আপনি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে, তখন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর লীলাখেলা থামিয়া যায়, সৃষ্টির বিরাম হয়, তখনই জীব দুঃখের অধিকার ছাড়াইয়া কৈবল্যধামে উপনীত হয়। ইহাই সাংখ্যপ্রদর্শিত মুক্তিপথ। গীতানির্দ্দিষ্ট মুক্তিপথ স্বতন্ত্র। ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সে পথে বিচরণ করিতে হয়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া জীবের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কর্সিকাদ্বীপের একটি গল্প।

[অনুবাদ]

পর্টোভেক্কিয়োসহর হইতে কর্সিকাদ্বীপের ভিতরের দিকে উত্তরপশ্চিম মুখে চলিতে থাকিলে দেখিবে যে, জমি ক্রমেই চড়্‌তি। বড় বড় পাথরের ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ ধরিয়া, মাঝে মাঝে নালা পার হইয়া, ঘণ্টা-তিনেক চলিলে মাকীনামক জঙ্গলের ধারে আসিয়া পড়িবে। এই মাকীজঙ্গল কর্সিকার ছাগপালকদের ও যাহারা কোনরকম বে-আইনী কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাদের আড্ডা।

কর্সিকার চাষীরা জমিতে সার দেওয়া বাঁচাইবার জন্য জঙ্গলের এক জায়গায় আগুন লাগাইয়া দেয়। আগুন যদি দরকারের চেয়ে বেশীরকম ছড়াইয়া পড়ে, তাহার আর উপায় নাই; কিন্তু সে যেমনই হৌক, এই ছাই-পড়া জমিতে বুনানী করিলে চাষীর ফসলের আর মার থাকে না। ক্ষেত উঠিয়া গেলে, আগেকার গাছের যে গোড়াগুলি পুড়িয়া যায় নাই, তাহা হইতে তাজা ডালপালা গজায়; এইগুলি বৎসরকতকের মধ্যে পাঁচছয়হাতপরিমাণ ঠেলিয়া উঠে। এই-প্রকার ঘন গাছড়ার জঙ্গলকে মাকী কহে। ইহাতে পাঁচরকমের গাছ যেমন-তেমন জড়া-জড়ি করিয়া বাড়িতে থাকে। কুড়ুলহাতে না গেলে ইহার মধ্যে মানুষের যাতায়াতের সাধ্য নাই। জায়গায় জায়গায় এই মাকী এত ঘন ও ঘেঁষাঘেষি যে, বুনো ছাগলগুলাও ভেদ করিতে পারে না।

যদি মানুষ খুন করিয়া থাক, তবে এই পর্টোভেক্কিয়োর মাকীর আশ্রয় লইয়ো। সেখানে একটি ভাল বন্দুক ও কিছু বারুদগুলি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারিবে। একটি মোটাগোচের গায়ের কাপড় লইতে ভুলিয়ো না, তাহা পাতাও চলিবে, গায়ে দেওয়াও চলিবে। ছাগপালকেরা তোমাকে দুধ-ছানা-বাদাম জোগাইবে এবং আইন-আদালত বা মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হইতে তোমার কোনই ভয় থাকিবে না,—যতক্ষণ না বারুদাদি কিনিবার জন্য আবার সহরে যাইতে বাধ্য হইবে।

আমি যখন ১৮——সালে কর্সিকায় গিয়াছিলাম, তখন মাটিয়ো মাকী হইতে ক্রোশখানেক দূরে বাড়ী করিয়াছিল। সে স্থানের মধ্যে মাটিয়ো কিছু অবস্থাপন্ন লোক। সেখানকার বুনোরা তাহার ছাগলের পাল পাহাড়ের উপর এখানে-ওখানে চরাইয়া বেড়াইত, ইহারই আয় হইতে মাটিয়ো রাজার হালে থাকিত, অর্থাৎ তাহাকে আর খাটিয়া খাইতে হইত না।

আমি যে ঘটনার কথা আজ বলিব, তাহার বৎসর-দুই পরে আমার যখন মাটিয়োর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাহার বয়স পঞ্চাশের বেশী দেখায় নাই। কল্পনা কর—মজবুত্ গড়নের বেঁটেখাটো মানুষটি, মিশ্‌মিশে কালো কোঁকড়া চুল, টিকল নাক্, বড় বড় জ্বল্‌জ্বলে চোখ, পোড়া-পোড়া রং।

তাহাদের দেশে, প্রায় সকলেই যেখানে বন্দুক ভাল ছুঁড়িতে পারে, সেখানেও মাটিয়োর নিশানা করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য খুব খোষনাম ছিল। ধর না কেন, সে কখনো ছর্‌রা দিয়া বুনো ছাগল মারিত না, তিনরশি তফাৎ হইতে ইচ্ছামত মাথায় কি কাঁধে এক গুলি লাগাইয়া তাহাদিগকে পাড়িয়া ফেলিত। লোকে আমার কাছে তাহার হাতসাফাইয়ের এক গল্প করিল,—যাহা কর্সিকার বাহিরের লোকের হঠাৎ বিশ্বাসই হইবে না। হাতপঞ্চাশেক দূরে এক বাতি বসাইয়া তাহার সাম্‌নে এক পাতলা কাগজ ধরা হইল। এই কাগজের দিকে সে নিশানা ঠিক করিবার পর বাতি নিবান হইল। মিনিটখানেক পরে আওয়াজ করিতে আরম্ভ করিয়া সে চারবারের মধ্যে তিনবার কাগজ ফুটো করিল।

[illegible]প্রকাশিত [illegible] নৈপুণ্য থাকায় মাটিয়োর [illegible] ওয়া গিয়াছিল। লোকে বলিত [illegible]। শত্রুহিসাবে যেমন ভয়ঙ্কর, বন্ধুরূপে তেম্‌নি বিশ্বাসী। সে সর্ব্বদাই লোকের কাজকর্ম্ম উদ্ধার করিয়া দিত, গরীবের প্রতি মুক্তহস্ত ছিল, এবং সে জেলার সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখিয়া চলিত। তবে তাহার নামে এ গল্পও ছিল যে, কর্টেজেলায় যেখানে সে বিয়ে করে, সেখানে যে মেয়েকে তার পছন্দ হয়, তার আর-এক উপস্থিত পাত্রকে সে কিছু সংক্ষেপে সরাইয়া ফেলিয়াছিল; অন্তত সে ব্যক্তি একদিন কামাইতে বসিলে, তাহাকে আচম্‌কা যে গুলিটি লাগে, সেটি লোকে মাটিয়োর নামেই জমা করিয়া রাখিয়াছিল।

এই ব্যাপার চাপা পড়িয়া গেলে, মাটিয়ো বিবাহকার্য্য সমাধা করে। তাহার স্ত্রী গীসেপা প্রথমে তাহাকে একটির পর একটি তিন কন্যা জোগান্ দেওয়াতে সে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিল। পরে এক ছেলে হইল, মাটিয়ো তাহার নাম রাখিল ফর্টুনাটো (ভাগ্যবান্)। সে-ই ইহাদের একমাত্র বংশধর এবং পরিবারের আশাভরসা। মেয়েগুলির সৎপাত্রে বিবাহ হইয়াছিল। সময়ে-অসময়ে তাহাদের বাপ নিঃসঙ্কোচে জামাইদের বন্দুক ও ছোরার উপর নির্ভর করিতে পারিত। ছেলেটি সে সময়ে দশবৎসরের মাত্র, কিন্তু তার মধ্যেই উপযুক্ত হইয়া উঠিবার বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছিল।

একদিন শরৎকালে মাটিয়ো স্ত্রীকে লইয়া মাকীর মধ্যে এক আবাদে তাহার ছাগলের পাল তত্ত্বাবধান করিবার জন্ম সকাল-সকাল বাড়ী হইতে বাহির হইল। ফর্টুনাটোর ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যায়, কিন্তু সে আবাদ অনেকদূর, তা ছাড়া বাড়ী-খবরদারী করার জন্যও একজনের থাকা দরকার, তাই বাপ বারণ করিল। ইহার জন্য তাহাকে পস্তাইতে হইয়াছিল কি না, পরে দেখা যাইবে।

মাটিয়ো ঘণ্টাকতক গিয়াছে। ফর্টুনাটো প্রশান্তভাবে রোদে শুইয়া দূরের নীল পাহাড়গুলি দেখিতেছে, আর আগামী রবিবারে সুবেদার-খুড়ার ওখানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবে, সে কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক বন্দুকের আওয়াজে তাহার চিন্তার স্রোত হঠাৎ বাধা পাইল। সে উঠিয়া, মাঠের যে দিক্ হইতে আওয়াজ আসিল, সে দিকে ফিরিয়া তাকাইল। আওয়াজের পর আওয়াজ কখনো অল্প, কখনো বেশী সময় অন্তর হইতে হইতে ক্রমেই কাছে আসিতে লাগিল। শেষে মাঠ হইতে মাটিয়োর বাড়ীর দিকে আসিবার রাস্তার মাথায় এক লোক দেখা গেল। তাহার লম্বা দাড়ী, পরনে ছেঁড়া কাপড় ও পাহাড়ী টুপী; বন্দুকের উপর লাঠির মত ভর দিয়া কোনরকমে শরীরটাকে টানিয়া আনিতেছে। তাহার উরুতে গুলির চোট্ লাগিয়াছে।

এই লোকটি দস্যু—অর্থাৎ আইনের হাত এড়াইবার জন্য পালাইয়া বেড়াইতেছে। সে রাতারাতি সহরে বারুদ আনিতে গিয়া রাস্তায় একদল সিপাহীর হাতে পড়িয়া গিয়াছিল। খুব একপত্তন লড়িয়া, সে কোনগতিকে পাথরের আড়ালে আড়ালে ফিরিয়া দৌড় দিতে পারিয়াছিল। তাহারাও ফাঁকে পাইলেই গুলি চালাইতে চালাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাড়া করিয়াছিল। সে সিপাহীদের অল্পমাত্র আগিয়ে ছিল, এমন অবস্থায় খোঁড়া পা লইয়া ধরা পড়িবার আগে তাহার পক্ষে মাকীতে পৌঁছন অসম্ভব। সে ফর্টুনাটোর নিকটে আসিয়া কহিল—"তুই কি মাটিয়োর ছেলে?"

"হঁ।"

"আমি গ্যানেটো। আমাকে লাল পাগড়ীতে তাড়া করেছে। আর চল্‌তে পার্‌ছি নে, আমাকে লুকো।"

"বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে' তোমাকে লুকোলে তিনি কি বল্‌বেন?"

"তিনি বল্‌বেন্—'বেশ করেছিস্।'"

"কে জানে?"

"শীঘ্র লুকো, তারা এল বলে'।"

"বাবার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর না।"

"আরে মর্! অপেক্ষা কর্‌ব কি? তারা আর পাঁচমিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

আমায় লুকো। বল্‌ছি, নয় ত তোকে মেরেই ফেল্‌ব।"

ফর্টুনাটো অতি ঠাণ্ডাভাবে উত্তর করিল—"তোমার বন্দুক ত' দেখ্‌ছি খালি, আর থলেতেও আর টোটা নেই।"

"আমার ছোরাটা ত আছে।"

"আমার সঙ্গে দৌড়ে পার্‌বে ?"

এই বলিয়া বালক এক লাফে দস্যুর আয়ত্তের বাহিরে গেল।

"তুই দেখ্‌ছি বাপের বেটা ন'স্‌। আমাকে শেষে বাড়ীর সাম্‌নে ধরিয়ে দিবি ?" এই কথা বালকের মনে লাগিল। সে একটু কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমাকে লুকোলে কি দেবে ?"

দস্যু জেব ঘাঁটিয়া একটি মুদ্রা বাহির করিল। বোধ হয় ইহা সে বারুদখরিদের জন্য রাখিয়াছিল। রূপা দেখিয়া ফর্টুনাটোর মুখে হাসি দেখা দিল। সে মুদ্রাটি থাব্‌লাইয়া ধরিয়া গ্যানেটোকে বলিল—"কিছু ভয় নেই।"

তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী খড়ের গাদায় সে এক মস্ত গর্ত্ত করিল। গ্যানেটো গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া গেলে বালক তাহাকে এমন করিয়া খড়চাপা দিল যে, দমও বন্ধ না হয়, অথচ ভিতরে লোক আছে, তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝা সম্ভব না হয়। সে আর এক প্যাঁচাও ফন্দি ঠাওরাইল। এক বিড়াল সবে বাচ্ছা দিয়াছিল, সেগুলিসুদ্ধ তাহাকে গাদার উপর রাখিল,—যাহাতে দেখায় যেন সম্প্রতি খড় নাড়াচাড়া করা হয় নাই। পরে বাড়ীর ধারের রাস্তায় রক্তের দাগ দেখিয়া সেগুলি বেশ করিয়া ধুলাচাপা দিয়া সে আবার আগেকার মত প্রশান্তভাবে রোদে শুইয়া পড়িল।

মিনিটকতক পরে এক জমাদারের অধীনে ছয়জন খাকীপোষাক লালপগ্‌গ্‌ধারী সিপাহী মাটিয়োর দুয়ারের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল জমাদার মাটিয়োদের কুটুম্ব হইত, তাহার নাম গম্বা। সে খুব তুখোড় সিপাহী, অনেক দস্যু গেরেফ্‌তার করিয়াছে বলিয়া তাহারা উহাকে যমের মত ভয় করিত। ফর্টুনাটো যেখানে শুইয়া ছিল, সে দিকে হাঁটিয়া গিয়া সে কহিল—"কিরে ভায়া! তুই যে মস্ত হয়ে' উঠেছিস্‌! এখান দিয়ে এইমাত্র কাওকে যেতে দেখেছিস্‌ ?"

বালক ন্যাকা সাজিয়া উত্তর করিল—"আমি কিন্তু তোমার মত ঢ্যাঙা এখনো হ'তে পারি নি জমাদারদাদা।"

"সময়ে সবই হবে। কিন্তু বল্‌ দেখি, কোন লোক যেতে দেখিস্‌নি কি ?"

"লোক যেতে দেখেছি কি না ?"

"হাঁ। একটা লোক, মাথায় কালো মখ্‌মলের পাহাড়ী টুপি, গায়ে হল্‌দে-কাজ-করা লাল কোর্ত্তা।"

"মাথায় পাহাড়ী টুপি, গায়ে হল্‌দে-কাজ-করা লাল কোর্ত্তা ?"

"হাঁ। চট্‌ করে' উত্তর দে না, আমার কথাগুলো অমন করে' আওড়াস্‌ নে।"

"আজ সকালে পাদরীসাহেব আমাদের দুয়োর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে' গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'বাবা কেমন আছেন ?' আমি বল্লেম—"

"কিরে বদমাইস্‌! আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে নাকি ? ধাঁ করে বলে' ফেল্‌, গ্যানেটো

কোন্‌দিকে গেল। আমরা তাকেই খুঁজ্‌ছি। আমি বেশ জানি, সে এই রাস্তা ধরে' গেছে।"

"কে জানে?"

"কে জানে কিরে? আমি জানি, তুই তাকে দেখেছিস্‌।

"ঘুমিয়ে থাক্‌লে কি মানুষ দেখা যায়?"

"তুই কখনই ঘুমিয়ে ছিলি নে হতভাগা! বন্দুকের আওয়াজে নিশ্চয়ই তোকে জাগিয়ে দিয়েছিল।"

"তোমার বন্দুকের এতই আওয়াজ নাকি জমাদারদাদা? আমার বাবার বন্দুকটায় ওর্ চেয়ে ঢের বেশী হয়।"

"মর্ পাজা ছোঁড়া! আমি ঠিক বুঝেছি, তুই গ্যানেটোকে দেখেছিস্‌—হয় ত লুকিয়েও থাক্‌তে পারিস্‌। দেখ ত বাবারা, বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ ত, বেটা আছে কি না। তার এক পা বই চল্‌ছিল না,—সে কাঁচা ছেলে ত নয় যে, ঐরকম চালে মাকী পর্য্যন্ত ঠেলে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। তা ছাড়া রক্তের দাগও এখানে এসে থেমে গেছে।"

ফর্টু'নাটো একটু ফচ্‌কে হাসি হাসিয়া বলিল—"বাবা কি বল্‌বেন? তিনি না থাক্‌তে তোমরা বাড়ী চড়াও হয়েছ জান্‌লে কি বল্‌বেন?"

গম্বা-জমাদার বালকের কান ধরিয়া কহিতে লাগিল—"আরে লক্ষীছাড়া! তুই জানিস্‌, আমি মনে কর্‌লে তোর সুর বদ্‌লে দিতে পারি! দশবিশ ঘা কসালে বোধ হয় তোর কথা বেরোবে।"

কিন্তু ফর্টু'নাটোর আহ্লাদেপনা ঘুচিল না—সে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—"আমার বাবা মাটিয়ো!"

"জানিস্‌ পাজী ছোঁড়া, আমি তোকে গারদে পূর্‌তে পারি, তোকে হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে অন্ধকূপে ফেলে রাখ্‌তে পারি? গ্যানেটো কোথা আছে যদি না বলিস্‌, তোকে ফাঁসিকাঠে চড়াব।"

এই ফাঁকা লম্বাই-চওড়াই শুনিয়া ছেলে ত হাসিয়া কুটিকুটি। সে আবার বলিল—"মাটিয়ো আমার বাবা!"

এক সিপাহী কানে কানে কহিল—"জমাদারজী, মাটিয়োকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।"

গম্বা মুস্কিলে পড়িল। সিপাহীদের বাড়ীর ভিতরটা দেখিয়া আসিতে বেশী সময় লাগে নাই—কর্সিকায় গৃহস্থের বাড়ী বলিতে একটিমাত্র চৌকাঘর, বসিবার, খাইবার ও শিকার করিবার যাহা-কিছু জিনিষপত্র, সব তাহারই মধ্যে। সিপাহীরা ফিরিলে গম্বা তাহাদের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করিতে লাগিল। দুষ্ট ফর্টু'নাটোটা তাহার দাদা ও সিপাহীরা গোলে পড়িয়াছে দেখিয়া খড়ের গাদায় হেলান দিয়া বিড়ালের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মজা দেখিতে লাগিল।

এক সিপাহী খড়ের গাদার নিকট গেল, বিড়াল দেখিল; আল্‌গোচে একবার খড়ের গায়ে সঙীনের খোঁচা মারিল; আবার—'এমন জায়গায় কি মানুষ থাক্‌তে পারে, দেখ্‌তে হয়, বলে' দেখা'—এইভাবে মাথা নাড়িয়া ফিরিয়া আসিল। খড়ের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, বালকের মুখেও কিছু চাঞ্চল্য দেখা দিল না।

জমাদার ও তাহার দল কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায় না। কেহ কেহ যেন 'গেলে

হয়' ভাবে এক আধবার মাঠের দিকে তাকাইতে লাগিল। এমন সময়ে কর্ত্তা, শাসনে কিছু হইবার নহে সাব্যস্ত করিয়া, মিষ্ট কথায় গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ-উদ্ধারের শেষ-চেষ্টা দেখা স্থির করিল। সে বলিল—"ভায়া খুব হুঁসিয়ার ছেলে। এর পর একজন হ'য়ে উঠ্‌বি দেখ্‌ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ব্যবহারটা কি বড় সুবিধের হ'ল? মাটিয়ো-খুড়ো যদি মনে কষ্ট না পেত, আমি তোকে সঙ্গে ধরে' না নিয়ে যেতাম ত কি বলেছি।"

"ইস্!"

"খুড়ো কিন্তু ফিরে এলে আমি সব বলে' দেব। তুই মিথ্যেকথা বলেছিস্ শুন্‌লে সে মারের চোটে তোর চামড়া ফাটিয়ে দেবে।"

"তার পর?"

"তুই দেখে নিস্। কিন্তু দেখ্, ভাল ছেলে হ'লে আমি তোকে একটা জিনিষ দেব।"

"জমাদারদাদা, আমিও তোমাকে একটু উপদেশ দেব। তুমি যদি এখানে আর দেরী কর, তা হ'লে গ্যানেটো মাকীতে পৌঁছে যাবে, তখন তোমার মত দশটা শেয়ানা জুট্‌লেও তাকে আর ধর্‌তে পার্‌বে না।"

জমাদার জেব হইতে রূপার ঘড়ি বাহির করিল, দাম আন্দাজ বিশপঁচিশ টাকা হইবে। লোভে ফর্টুনাটোর চোখ জ্বলিতেছে দেখিয়া, সে চেনের আগা ধরিয়া ঘড়িটি তাহার মুখের সাম্‌নে লট্‌কাইয়া বলিতে লাগিল—"কিরে বদ্‌মাইস্! এরকম ঘড়ি গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌বে কেমন? সহরের মধ্যে দিয়ে যাবি যেন ময়ূর প্যাকম তুলে' চলেছে। আর সবাই 'কটা বেজেছে, কটা বেজেছে' করে' চারদিকে ঘির্‌বে, আর তুই বল্‌বি—'আমার ঘড়িটা দেখে নাও না গা!'"

"আমি বড় হ'লে সুবেদার-খুড়ো আমায় ঘড়ি দেবে।"

"তা ত দেবে, কিন্তু সুবেদারের ছেলের যে এখনই ঘড়ি রয়েছে—সেটা এত ভাল নয় বটে, তবে তার বয়সও তোর চেয়ে কম।"

বালক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

"আচ্ছা ভায়া, আমার এ ঘড়িটা চাস্ কি না, বল্ দেখি?"

হঠাৎ আস্তমাছ সাম্‌নে ধরিয়া দিলে বিড়ালের যেমন হয়, ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ফর্টুনাটোরও সেইরকম চেহারা হইল। বিড়াল সন্দেহ করে, বুঝি-বা তামাসা করা হইতেছে; একবার করিয়া থাবা বাড়ায়, অথচ ছুঁইতে সাহস পায় না; মাঝে মাঝে চোখ ফিরায়,—পাছে অতি লোভে বিপদ্ ঘটে; আবার ঠোঁট চাটে, যেন মনিবকে বলিতেছে—'এমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা কেন?'

গম্বা-জমাদারের চেহারায় ফাঁকির ভাব কিছু না থাকিলেও ফর্টুনাটো হাত না বাড়াইয়া, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"আমাকে নিয়ে মজা পেয়েছ নাকি?"

"মাইরি! আমি ঠাট্টা কর্‌ছি নে। গ্যানেটো কোথায়, আমাকে বল্লেই এই ঘড়ি তোরই হবে।"

অবিশ্বাসের ভাবে মুচ্‌কে হেসে ফর্টুনাটো তার বড়-বড় কালো-কালো চোখ দিয়া জমাদারের মুখের দিকে প্যাট্‌প্যাট্ করিয়া চাহিয়া তাহার কথায় কতদূর বিশ্বাস করা চলে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। জমাদার বলিয়া উঠিল—"যা বল্‌ছি, তা কর্‌লে ঘড়ি তোকে যদি না দিই, তবে আমি জমাদারই নই। আমার এই লোকজন সব সাক্ষী রইল, আমার কথা খেলাপ হবার জো নেই।"

এইরূপ বলিতে বলিতে গম্বা ঘড়িটা ক্রমেই বালকের মুখের কাছাকাছি আনিতে লাগিল, শেষে প্রায় তাহার গালে আসিয়া ঠেকিল। মুখ দেখিয়াই বুঝা যাইতে লাগিল, তাহার মনের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করিতেছে—'বিশ্বাস ভাঙি, কি ঘড়ি ছাড়ি।' তাহার খোলা বুক সজোরে উঠিতে-পড়িতে লাগিল, আর একটু হইলে যেন দম আট্‌কাইয়া আসিবে। ততক্ষণ ঘড়ি সম্মুখে দুলিতেছে, কখনো ঘুরিয়া নাকেও ঠেকিতেছে। অবশেষে একটু একটু করিয়া ডানহাতটা ঘড়ির দিকে উঠিতে লাগিল; আঙুলের ডগা তাহাতে গিয়া ঠেকিল: ঘড়ির পূরো বোঝাটা হাতের উপর পড়িল। কিন্তু জমাদার তাহাতেও চেনের আগাটা ছাড়িল না। কাচের ভিতরটার আকাশের মত নীল রং, বাহিরের রূপাটা টাট্‌কা পালিশ করা, রোদে আগুনের মত ঝল্‌কাচ্ছে। লোভ আর কিছুতেই সাম্‌লাইয়া রাখা গেল না।

ফর্টুনাটো বাঁ-হাতটাও তুলিয়া কাঁধের উপর দিয়া বুড়া আঙুলের ইঙ্গিতে পিছনের খড়ের গাদাটা দেখাইয়া দিল। জমাদার তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল; চেনটা ছাড়িয়া দিল। ফর্টুনাটো ঘড়িটা এখন নিজস্ব সম্পত্তি জানিয়া হরিণের মত একলাফে খড়ের কাছ হইতে হাতদশেক তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল। সিপাহীরাও তদ্দণ্ডে খড় নাবাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে খড় নড়িয়া উঠিল এবং এক রক্তমাখা লোক ছোরাহাতে বাহির হইল। কিন্তু সে উঠিতে গিয়া দেখে, পায়ের জখমটা আড়ষ্ট হওয়ায় তাহার খাড়া হইবার উপায় নাই। সে সেখানেই পড়িল। জমাদার তাহার ঘাড়ের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া ছোরা ছিনাইয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার ধড়্‌ফড়ানিসত্ত্বেও সে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়িল।

গ্যানেটো দড়িবাঁধা কাঠের বোঝার মত মাটিতে পড়িয়া নিকটে আগত ফর্টুনাটোর দিকে ফিরিয়া, যত-না রাগে, ততোধিক ঘৃণায় বলিল,"——র বাচ্ছা!"

বালক তাহার নিকট যে মুদ্রাটি পাইয়াছিল, তাহাতে আর অধিকার নাই বোধে তাহা গ্যানেটোর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। কিন্তু সে কার্য্যের প্রতি দস্যু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। সে জমাদারকে অতি প্রশান্তভাবে বলিল—"গম্বাভাই, আমি ত হাঁট্‌তে পার্‌ব না, আমাকে সহর পর্য্যন্ত ব'য়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

বিজয়োৎফুল্ল জমাদার কহিল—"এইমাত্র ত তুমি ছাগলের বাচ্ছার মত লাফাতে লাফাতে এলে। আচ্ছা ভয় নেই, আমি তোমায় ধর্‌তে পেরে এত খুসী আছি যে, পিঠে করে' নিয়ে একক্রোশ হাঁট্‌লেও হায়রান্ হব না। যা হোক, ডালপালার উপর তোমার গায়ের কাপড়টা পেতে একটা ডুলির মত করে' দিচ্ছি, একটু আগে গিয়ে ঘোড়া পাওয়া যাবে এখন।"

বন্দী কহিল—"সেই ভাল, ডুলির উপর দুটি খড়ও বিছিয়ে দিও,—যাতে একটু আরামে যেতে পারি।"

সিপাহীরা কেহ ডালপালা জুটাইয়া ডুলি গড়িতে, কেহ বা গ্যানেটোর ঘাটায় কাপড় বাঁধিতে ব্যস্ত, এমন সময়ে হঠাৎ সস্ত্রীক মাটিয়োকে মাকীর রাস্তার বাঁকের উপর দেখা গেল। স্ত্রীটি মস্ত এক বাদামভরা থলের ভারে কষ্টে ঝুঁকিয়া চলিতেছে, স্বামীটি কেবল হাতে এক বন্দুক, পিঠে ঝোলান এক বন্দুক লইয়া খাতিরনদারৎভাবে আসিতেছে—কারণ পুরুষমানুষের অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য কোন বোঝা বহিতে নাই।

বাড়ীতে সিপাহী দেখিয়া মাটিয়ো প্রথমেই ভাবিল, বুঝি তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। তাহার এমন খট্‌কা লাগে কেন? সে কি কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে কিছু বাদাবাদী করিয়াছিল? তাহা নহে—মাটিয়োর ত সরকারের বাধ্য বলিয়া সুখ্যাতিই ছিল। তবে হাজার হোক কর্সিকাবাসী, তাহার উপর পাহাড়ী। ও জাতের এমন প্রায় কেহই নাই, যাহার পূর্ব্বকথা ভাবিতে বসিলে একটা-না-একটা গলদ মনে না পড়ে হয় বন্দুকের গুলি, নয় ছোরার খোঁচা, নয় ত ঐরকম ছোটখাটো কিছু একটা। অন্যদের অপেক্ষা এ সম্বন্ধে মাটিয়োর মনটা কিছু পরিষ্কারই ছিল, কারণ বছরদশেক হইল, সে কোন মানুষের দিকে বন্দুক তাগ্ করে নাই। তবু সাবধানের মার নাই, সুতরাং সে বাঁচিবার একচোট্ ভালরকম চেষ্টা করিতে পারিবার মত ব্যবস্থা করিল। স্ত্রীকে কহিল—"ওগো! বোঁচ্‌কা রেখে তৈরী হও।"

গীসেপা তৎক্ষণাৎ হুকুমমত কাজ করিল। পাছে কাজের সময় বাধে বলিয়া কাঁধে-ঝোলান বন্দুকটা সে স্ত্রীর হাতে দিল। হাতের টার ঘোড়া তুলিয়া ধীরে ধীরে গাছের সারের ধার দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল, যাহাতে গোলযোগ দেখিলেই সে একলাফে বড় একটা গাছের পিছনে নিজের শরীর আড়াল করিয়া বন্দুক ছাড়িতে পারে। স্ত্রী ফাল্‌তু বন্দুকটা আর টোটার বাক্‌স লইয়া পিছনে পিছনে লাগিয়া রহিল। যুদ্ধের সময় সুগৃহিণীর কার্য্য স্বামীর অস্ত্র জোগান।

ওদিকে জমাদার মাটিয়োকে এভাবে পা টিপিয়া টিপিয়া বন্দুক তুলিয়া আসিতে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল—"কি জানি যদি এই গ্যানেটোর সঙ্গে মাটিয়োর কোন আত্মীয়তা থাকে, কিংবা যদি বন্ধুই হ'য়ে ওকে খালাস কর্‌তে চায়, তা হ'লে চিঠি ডাকে দিলে যেমন নির্ঘাত ঠিকানায় পৌঁছয়, ওর দুই বন্দুকের দুই গুলি দু'জনকে পাবেই পাবে। আর কুটুম্বিতা ভুলে যদি আমারই উপর বন্দুকের মাছিটা ফেলে বসে?"

এই সমস্যার অবস্থায় সে এক অতি সাহসিক মতলব আঁটিল। সে কুটুম্বোচিত সম্ভাষণ করিয়া একাই মাটিয়োর দিকে অগ্রসর হইয়া ঘটনাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে চলিল। যে অল্প পথটুকু তাহাকে এইভাবে যাইতে হইল, সেটা ভয়ঙ্কর লম্বা বোধ হইতে লাগিল। নিকটে গিয়াই হাঁকিল—"কিগো

খুড়োমশায়! তোমার খবরটবর কি? আমি তোমার কুটুম্ব, গম্বা!"

মাটিয়ো উত্তরে কথাটি না কহিয়া থামিয়া গেল, এবং গম্বা যতক্ষণ কথা বলিতেছে, ততক্ষণ বন্দুক আস্তে আস্তে উঠাইয়া, জমাদার পৌঁছিতে পৌঁছিতে নল আকাশের দিকে করিল। জমাদার আবার বলিল—"ভাল ত খুড়ো, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

"কি খবর?"

"এ দিক্ দিয়ে যেতে যেতে ভাবলুম, তোমার বাড়ীতে ঢুঁ মেরে খবরটা নিয়ে যাই। আমাদের আজ আচ্ছা লম্বা পাল্লা হয়েছে, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই, এক মস্ত শিকার পাওয়া গেছে। গ্যানেটোটা ধরা পড়েছে।"

গীসেপা বলিয়া উঠিল—"বাঁচা গেল! সবে সেদিন ও আমাদের একটা ছাগল চুরি করেছে।"

এই কথায় গম্বার ধড়ে প্রাণ এল।

মাটিয়ো কহিল—"বেটা কি সাধে করেছে—খিদের চোটে বেচারা করে কি?"

জমাদার কিছু দমিয়া গিয়া কহিতে লাগিল—"হতভাগাটা বাঘের মত লড়েছিল। আমার এক সেপাইকে ত মেরেই ফেল্লে—শুধু তা নয়, আবার চার্দন্-সরদারের হাত ভেঙে দিলে—তবে তাতে বড় লোক্সান হয় নি, সে বেটা ফরাসী বৈ ত নয়। তার পর এম্নি গা ঢাকা দিলে যে, সয়তানেরও সাধ্যি নেই, খুঁজে বার করে। আমার ফর্টুনাটো-ভায়া অনুগ্রহ না করলে ওকে কিছুতেই পাকড়াও করা যেত না।"

মাটিয়ো বলিয়া উঠিল—"ফর্টুনাটো?"

প্রতিধ্বনির মত গীসেপা কহিল—"ফর্টুনাটো?"

"হাঁ। গ্যানেটো তোমার ঐ খড়ের গাদাটার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, কিন্তু ভায়া আমার তার বিদ্যে ফাঁস করে' দিলে। আমি সুবেদার-খুড়োকে বোল্‌বো, যাতে ওর বাহাদুরীর জন্যে ভালরকম পুরস্কার পাঠিয়ে দেয়। আর ফর্টুনাটোর সঙ্গে তোমারও নাম আমি জেনেরাল্‌সাহেবের কাছে জানাব।"

দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিয়া মাটিয়ো বলিল—"মরণ আর কি!"

এতক্ষণে তাহারা সিপাহীদলের নিকটে পৌঁছিল। গ্যানেটো রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ডুলিতে শুইয়াছিল। গম্বার সঙ্গে মাটিয়োকে দেখিয়া একটু বাঁকা-হাসি হাসিল। পরে বাড়ীর দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া থুথু ফেলিয়া বলিল—"ঘুষখোরের বাড়ী!"

মরিবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া মাটিয়ো-সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে কেহ সাহস পাইত না। ছোরার এক ঘায়ে—এক বৈ দুয়ের দরকারই হইত না—এ অপমানের হাতে-হাতে শোধ হইত। কিন্তু মাটিয়ো শিরে করাঘাত ছাড়া আর কোনরকম নড়াচড়া করিল না, তাহার যা' হইবার, যেন হইয়া গেছে।

বাবাকে আসিতে দেখিয়া ফর্টুনাটো বাড়ী ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। একটু পরেই সে একপাত্র দুধ হাতে বাহিরে আসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তাহা গ্যানেটোকে দিতে গেল। দস্যু তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"দূর হ!"

পরে একজন সিপাহীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"ভাই হে, একটু জল দাও ত।"

সিপাহী নিজের জলের চোংটা তার হাতে ধরিয়া দিলে, দস্যু যাহার সঙ্গে সবে মাত্র সমানে লড়িয়াছিল, তাহার হাতে অনায়াসে জল খাইল। তাহার পর সে দরবার করিল,—যাহাতে তাহার হাতদুইটা পিঠের দিকে না বাঁধিয়া বুকের উপর রাখিয়া বাঁধা হয়। সে বলিল—"আমি আরামে শুতে ভালবাসি।"

তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে দস্যুর ইচ্ছা পূর্ণ করিল। পরে জমাদার নিরুত্তর মাটিয়োর নিকট বিদায় চাহিয়া চলিবার ইঙ্গিত করিল এবং হন্‌হন্‌শব্দে মাঠের দিকে নাবিয়া গেল।

মিনিটদশেক মাটিয়োর বাক্য সরিল না। বালক একবার মার দিকে, একবার বাবার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল; বাপ রাগে গুম্‌ হইয়া তাহার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। খানিক পরে চাপা, অথচ যাহারা জানে তাহাদের পক্ষে ভয়ানক স্বরে মাটিয়ো বলিল—"আরম্ভ করেছ ভাল!"

"বাবা!"—বলিয়া বালক ছল্‌ছল্‌ চোখে যেন বাপের পায়ে পড়িবার জন্য এক পা বাড়াইল।

কিন্তু মাটিয়ো গর্জ্জিয়া উঠিল—"আমার কাছ থেকে দূর হ!"

বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের নিকট হইতে দুইচার পা তফাতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

গীসেপা কাছে আসিল। ফর্টুনাটোর পিরাণের ফাঁক হইতে চেনের আগাটা বাহির হইয়াছিল, সেটা তাহার চোখে পড়িল। সে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"ঘড়িটা তোকে কে দিলে?"

"জমাদারদাদা।"

মাটিয়ো এক হ্যাঁচ্‌কায় ঘড়ি টান দিয়া পাথরের উপর আছড়াইয়া চুরমার করিল। সে বলিল—"দেখ্‌ মাগি! এ ছেলে কি আমার?"

গীসেপার রোদে-পোড়া গালদুটা ইটের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

"তুমি কি যে বল, তার ঠিক নেই,—কার্‌ সঙ্গে কথা ক'চ্ছ, ভুলে গেছ নাকি?"

"যা হোক্‌, এ বংশের এই প্রথম ছেলে, যে ভুলেও বিশ্বাসের কাজ করেছে।"

ফর্টুনাটোর কাঁদুনী-ফোঁপানী দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু মাটিয়োর বাঘের চাহনী তাহার মুখ হইতে সরিল না। অবশেষে সে বাঁটটা একবার মাটিতে ঠুকিয়া বন্দুক আবার ঘাড়ে তুলিয়া লইল এবং ফর্টুনাটোকে সঙ্গে আসিতে হাঁকিয়া মাকীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বালক তাহাই করিল।

গীসেপা মাটিয়োর পিছনে ধাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং কালোচোখে স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যেন তাহার মনের কথাটা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তোমার ছেলে যে গো!"

মাটিয়ো বলিল—"আমায় ছাড়, আমি ওর বাপ।"

গীসেপা ছেলেকে একবার বুকে আঁকড়া-

ইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া বিশুমাতা মারীর মূর্ত্তির সাম্‌নে পড়িয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে মাটিয়ো মাকীর রাস্তা ধরিয়া রশিচারপাঁচ তফাতে এক নালা পাইয়া তাহার মধ্যে নাবিয়া পড়িল। বন্দুকের বাঁট দিয়া ঠুকিয়া দেখিল, মাটি নরম, খোঁড়া সহজ। এ স্থান সে নিজের অভিপ্রায়ের উপযোগী বোধ করিল।

"ফর্টুনাটো! ঐ বড় পাথরের ধারে গিয়া দাঁড়াও।" বালক বাপের কথামত সেখানে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া পড়িল।

"তুমি স্তবস্তোত্র যা জান, তা বল।"

"বাবা! বাবা! আমাকে মেরো না।"

মাটিয়ো পুনরায় ভীষণস্বরে বলিল—"স্তোত্র বল!"

বালক ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে থতিয়ে-মতিয়ে দুইএকটি স্তোত্র আওড়াইল। পিতা প্রত্যেকটির পর উচ্চকণ্ঠে শান্তিপাঠ করিল।

"এ ছাড়া আর কিছু জান?"

"মারীস্তোত্র জানি বাবা, আর পিসিমা যে বন্দনাটা শিখিয়েছিলেন।"

"সেটা মস্ত লম্বা, যা হোক্‌, তা-ও বল।"

বালক ক্ষীণকণ্ঠে বন্দনা সাঙ্গ করিল।

"শেষ হইয়াছে?"

"দোহাই বাবা! আমাকে মাপ কর, আমি আর কখনো কর্‌ব না। আমি সুবে-দার-খুড়োর হাতে-পায়ে ধরে' গ্যানেটোর সাজা মাপ করিয়ে দেব।"

সে কাঁদাকাটি করিতে থাকিল। মাটিয়ো বন্দুকের ঘোড়া তুলিয়া লইয়াছিল, এক্ষণে নিশানা ঠিক করিয়া কহিল—"ভগবান্‌ তোমায় ক্ষমা করুন!"

বালক উঠিয়া বাপের পা জড়াইয়া ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু সময় পাইল না। মাটিয়ো বন্দুক ছাড়িল, ফর্টুনাটো কাঠের মত মরিয়া পড়িল।

মড়ার দিকে একটিবারও না চাহিয়া মাটিয়ো ছেলেকে গোর দিবার জন্য কোদাল আনিতে বাড়ী ফিরিল। দুই পা যাইতেই, গীসেপা বন্দুকের আওয়াজে ভয়ে অস্থির হইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, তাহার সঙ্গে দেখা হইল। সে কাঁদিয়া উঠিল—"কি করলে?"

"সুবিচার!"

"সে কোথায়?"

"নালায়। আমি তাকে গোর দিতে চলিলাম। সে উপযুক্ত খৃষ্টানের মত মরেছে, আমি তার ভালরকম সৎকার করাব। বড়-জামাইবাড়ী খবর পাঠিয়ে দাও, সে আমাদের সঙ্গে এসে থাকুক।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সমাজ।

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইয়াছে—গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জ্জন্‌সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রুযুল্‌-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্ত্তি করিতে থাকুন্; এবং এই চায়ের চেয়েও যে আলাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্‌দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিষ! ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌ আসিবার পূর্ব্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে এজন্য শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণীখনন চলিতেছে, গুরুমশায় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে

পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গল-কর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্ত-চলাচলের জন্য যেমন টৌন্‌হল্‌মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেম্‌নি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচকবাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকারবাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিকভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না, তাহা নহে—

কিন্তু কেবল আংশিকভাবে—বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেম্নি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত বড় বড় কর্ত্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্মেণ্ট্‌কে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট

হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিংক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য!

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন্, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানাজাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমাদের মাথা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূক্ত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই-আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ্, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদ্‌শাহের দরবারে রায়-রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লি তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও

বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকার-দত্ত রাজামহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লি হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনোদিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লিতে পল্লিতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজশরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—বৈদ্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট্ দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

কে বলে, জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্ম্ম সাধন করিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিল্টনের আড়গড়া, ডাইকের গাড়িখানা, ল্যাজারসের আস্বাব্‌শালা, হার্মান্‌কোম্পানির দর্জ্জির দোকানকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে! স্বদেশের শুষ্কতালুতে জলবিন্দু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

ভিক্টোরিয়া.মেমোরিয়ালে, লেডিডফ্‌রিন্ ফণ্ডে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের ঘোড়দৌড়ে, লাটসাহেবের অভ্যর্থনায় টাকা ঝরিয়া পড়িতেছে কখন্? যখন, সেই-টাকা-জোগান্‌কারী প্রজার দল দীপ্তমধ্যাহ্নে পানীয়জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, যখন ম্যালেরিয়ায় তাহারা উৎসন্ন হইয়া গেল, যখন তাহাদের গরুবাছুর চরিবার একছটাক জমি নাই, যখন তাহাদের নিম্নভূমির উপর হইতে বর্ষার পর তিনচারমাস ধরিয়া জলনিকাসের কোনো উপায় থাকে না!

আর যাঁহারা পল্লী হইতে বাহির হইয়া সামান্য অবস্থা হইতে ধনি-অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—তাঁহাদেরও ধনের আড়ম্বর করিবার স্থান সদরে এবং আড়ম্বরের উপায়ও বারো-আনা বিলাতী। ইহাতে যে টাকাগুলাই কেবল বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা নহে, হৃদয়ও দেশে থাকে না। রুচির দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, আচরণের দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে যাহাকে অবজ্ঞা করি, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে কেবল আর্থিকশক্তির অভাব ঘটে, তাহা নহে—চিত্তশক্তিও থাকে না। সুতরাং তখন দেশহিতৈষিতার সর্ব্বপ্রধান বুলি এই হইয়া দাঁড়ায় যে, "আমরা নিজে কিছুই করিতে পারিব না, কারণ

আমরা গাড়িজুড়ি কোট্‌বুট লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি! হে সরকার, আমরা 'লয়াল্', অতএব তুমিই সমস্ত করিয়া দাও—যদি না কর, তবে গালি দিব!"

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, সকলেই আপন আপন পল্লীর মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া থাক্, বিদ্যা ও ধনমান অর্জ্জনের জন্য বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্ম্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জ্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

> "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
> পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।"

এইজন্য কবিকথিত "স্রোতের সেঁওলি"র মত ভাসিয়াই চলিয়াছি।

এরূপ অবস্থা কোনোমতেই চিরকাল থাকিতে পারে না। এইজন্য আপাতত স্রোতের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখিলেও মনকে হতাশ হইতে দিই না। ইহাও ত দেখা গেছে, একসময় ইংরাজিরচনার চর্চ্চা দেশে অত্যন্ত প্রবল ছিল—তখনকার শিক্ষিত যুবকেরা বাংলাভাষাকে একান্তমনে ঘৃণা করিতেন। তখন কি কেহ কল্পনাও করিতে পারিত যে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষায় আধুনিক কাব্যসাহিত্যের প্রথম অবতারণা করিবেন এবং রিচার্ড্‌সনের প্রিয়ছাত্র বাংলাভাষায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা লিখিতে অগৌরব বোধ করিবেন না।

যেমন সাহিত্যে, তেম্‌নি সকল দিকেই স্রোত ফিরিবে—ঘরে আসিতেই হইবে। চারিদিকে তাহার লক্ষণ দেখা দিতেছে।

বাঙালীর সাহিত্যপ্রিয়তা একবার বাহিরে ফিরিয়া আসিবার ফলে আমরা দেখিতেছি, বঙ্গসাহিত্য আজ তাহার পৈতৃকসীমানা অনেকদূর পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া গেছে। তাহার বিচিত্রশক্তি আজ নানাদিকে নানা আকারে আপনাকে নানাপথে ধাবিত করিয়াছে। তেম্‌নি যাহাদের হৃদয় একবার বাহিরে ঘুরিয়া অবশেষে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহারা ঘরকে বড় করিয়া তুলিবে।

বিধাতা এইজন্যই আমাদিগকে এমন করিয়া সকল দিক্ দিয়া ঘর হইতে খেদাইতেছেন—বাহিরটাকে এমন জবরদস্তি করিয়া বারংবার আমাদের রুদ্ধদ্বারের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে ঘর-বাহিরের একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য করিবেন। যেখানে পল্লিজীবনযাত্রার আয়োজন ছিল, সেখানে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিচিত্র উপকরণ আহরণ ও সঞ্চয় করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন;—যেখানে

আমরা ক্ষুদ্রভাবে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, সেখানে বৃহত্তরভাবে আমরা স্বাধীন হইব। এখন আমাদের সমাজ নির্জ্জীবভাবে সকলের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিবে না, সজীব হইয়া সকলের সহিত যোগস্থাপন করিবে,—পল্লির সহিত পল্লি, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়, দেশের সহিত দেশ গাঁথিয়া এক হইয়া যাইবে।

বিচ্ছেদে প্রেমকে প্রবল, মিলনকে ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে, এ কথা পুরাতন। একবার হারাণোর ভিতর দিয়া পাওয়া প্রকৃষ্টরূপে পাইবার উপায়। আমরা যে মাঝে একবার আপনাকে হারাইয়াছিলাম, সে কেবল আপনাকে প্রবলভাবে, বৃহৎভাবে ফিরিয়া পাইবার জন্য। আধুনিক ভারতবর্ষ আপনার পল্লির প্রান্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—এককালে যাহা বৃহৎ ছিল তাহা সঙ্কীর্ণ, যাহা সমগ্র ছিল তাহা খণ্ডিত, যাহা সজীব ছিল তাহা জড়, যাহা জ্ঞানগত ছিল তাহা প্রথাগত, অভ্যাসগত হইয়া আসিয়াছিল। এইবার পশ্চিমের আঘাতে জাগিয়া-উঠিয়া ভারতবর্ষ কি একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধার-করা জীবন আরম্ভ করিবে?—তাহা নহে। সে আপনাকে উজ্জ্বলভাবে, প্রবলভাবে ফিরিয়া পাইবে—যাহা বদ্ধ ছিল তাহাই মুক্তি পাইবে, যাহা স্তব্ধ ছিল তাহাই চারিদিকে আপন কাজে প্রবৃত্ত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে,—নানা দিক্ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে, স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্য যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমরা স্বদেশী লোকের কাছেই প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং সম্প্রতি বর্দ্ধমান প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্সের সভাপতি আমাদের সুদীর্ঘকালের পোলিটিক্যাল্ উদ্যমকে জাতীয় আত্মনির্ভরতাচর্চ্চায় খাটাইবার জন্য শ্রোতাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভুত অসঙ্গতি আমাদের চোখে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্শ্যাল্ কন্ফারেন্স্ই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কন্ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরাজিশিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামরসাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে-অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি।

আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয়হরণের জন্য ছলবলকৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই--কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই ;—তাই আমাদের হাব-ভাববিলাসের চর্চা সমস্তই পুরারকমে বিলাতিধরণের হইয়াছে। কিন্তু বিলাতের মন ত ভুলাইতে পারিলাম না—বারংবার ত মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া-দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি? কারণ, পোলিটিক্যাল্ সাধনার উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের হৃদয়ের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া, দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবল-মাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্ত বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল্ শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরমলাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্য্য-কলাপে যে সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যা-বশ্যক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে সমস্তকে দূরে রাখিয়া দেশের যথার্থ কাছে যাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে কর, প্রোভিন্‌শ্যাল্ কন্‌ফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতিধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশীধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রাগান-আমোদ-আহ্লাদে দেশের লোক দূরদূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক্-লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা-কিছু সুখদুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলাভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লিবাসী। এই পল্লি মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎজগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লি আপনার সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিস্মৃত হয়,—তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেম্‌নি বিশ্বের ভাবে পল্লির হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর — মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভা-বিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে—কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা

একত্র হয়, তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে—সুতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লিগুলি যেদিন হাললাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই, যেখানে নানাস্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে—প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিতসম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন,—কোনোপ্রকার নিষ্ফল পলিটিক্সের সংস্রব না রাখিয়া বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতিসম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থ ই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানাস্থানে মেলা করিবার জন্ম একদল লোক প্রস্তুত হন; তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা, কীর্ত্তন, কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ, ম্যাজিক্‌লণ্ঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ম তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্ম জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারদের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন—তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থাদ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্য্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে—ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার সহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদিব্যাপারে যাহা-কিছু আমোদ-আহ্লাদ, সমস্তই কেবল সহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্ম্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না—সেস্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইয়া থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না—ভোগ করেন "বান্ধবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া

পড়িতেছে এবং যে সাহিত্যে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণলোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলাসম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লিদ্বারে আর একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড় বড় জলাশয় আমাদিগকে জলদান, স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দূষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে, তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে—তেমনি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্ম্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দূষিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে, তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন—এ কথা না বলিয়া বসেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেণ্টের অত্যন্ত ঔদাসীন্য দেখা যাইতেছে—অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিখিয়া প্রবল বেগে গবর্মেণ্টের সাঁকো নাড়াইতে সুরু করিয়া দিই—মেলাগুলার মাথার উপরে দলবল-আইন-কানুন-সমেত পুলিস-কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক—সমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক্। ধৈর্য্য ধরিতে হইবে,—বিলম্ব হয়, বাধা পাই, সেও স্বীকার, কিন্তু এ সমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন,—ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জ্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ কথা আমরা যেন না ভুলি।

আমাদের দিশী লোকের সঙ্গে দিশী ধারায় মিলিবার যে কি উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারি একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র—এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কি করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

এইখানে সবিনয়ে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমি যে একটা নূতন-পন্থা-উদ্ভাবনকারী দলের মধ্যে একজন, এরূপ স্পর্দ্ধার লেশমাত্র আমার মনে নাই। জাহ্নবী অনেকটা পথ পূর্ব্বমুখে চলিয়া অবশেষে এক-সময়ে দক্ষিণগামিনী হইয়া সমুদ্রলাভ করিয়াছেন, এজন্য দক্ষিণের পথ অহঙ্কার করিবার অধিকারী নহে, বস্তুত তাহা পূর্ব্বপথেরই অনুবৃত্তিমাত্র। দেশ যখন একদা জাগ্রত হইয়া "কনষ্টিট্যুশনাল্ আ্যাজিটেশনে"র রেখা ধরিয়া রাজ্যেশ্বরের দ্বারের মুখে ছুটিয়াছিল, তখন সমস্ত শিক্ষিতসমাজের বুদ্ধিবেগ তাহার মধ্যে ছিল। আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সেই স্রোতের পথ বাঁক লইবার উপক্রম করিতেছে। আশা করি, এজন্য যেন কোনো

ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ বাহাদুরি লইবার চেষ্টা না করেন। যাঁহারা সাধনাদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, ধীশক্তি দ্বারা ইংরাজিশিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্য্যে চালিত করিয়াছেন,—স্বদেশের কার্য্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না। তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃতকণার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন সে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে—এখন সে আত্মশক্তি-আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতালাভের দিকে অনিবার্য্যবেগে চলিবে—কোনো একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদলাভের দিকে নহে। এই যে পথের দিক্‌পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিতেছে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কৃতকর্ম্ম নহে—যে চিত্তস্রোত প্রথমে একদিকে পথ লইয়াছিল, ইহা তাহারি কাজ—ইহা নূতন স্রোত নহে। যে অঙ্কুর প্রথম মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অজ্ঞাত আলোকের দিকে মাথা তুলিয়াছিল, পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা যেন নিজেকে "ওরিজিন্যাল্‌" জ্ঞান করিয়া সেই অঙ্কুরকে সেকেলে বলিয়া উপহাস না করে।

গতবারে এ প্রবন্ধ যখন আমি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমার উক্ত কথাটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয় নাই। প্রতিবাদে এই কথা উঠিয়াছিল যে, দেশে নানা শক্তি নানা-লোককে, নানাদলকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিবে, ইহাই দেশের স্বাস্থ্যের ও উন্নতির লক্ষণ। অতএব কেবলমাত্র সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না।

প্রবন্ধপাঠের শেষে এমন কথা যখন উঠিল, তখন বুঝিলাম, আমার সমস্ত প্রবন্ধই ব্যর্থ হইয়াছে। আমি এই কথাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, বিলাতে যেমনই হৌক্‌, আমাদের দেশে সমাজ একটা ক্ষুদ্রব্যাপার নহে—যুদ্ধবিগ্রহ, কিয়ৎপরিমাণে পাহারার কাজ ও কিঞ্চিৎপরিমাণে বিচারের কাজ ছাড়া দেশের আর সমস্ত মঙ্গলকার্য্যই আমাদের সমাজ নিজের হাতে রাখিয়াছিল—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব। এইজন্য এই সমাজব্যবস্থার উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব—আমাদের সভ্যতা স্থাপিত, এবং এইজন্য এই সমাজকে আমরা চিরদিন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় রাখিতে একান্ত সচেষ্ট ছিলাম। অতএব কে বলিল, সমাজের কাজ বলিতে কেবল একটিমাত্র কাজ বুঝাইতেছে?

আমি যদি বলি শরীরের সমস্ত কাজ শরীরেরই করা উচিত, তবে কি কেহ এই বলিবেন, আমি তাহার কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে বলিতেছি? শরীরের কাজ বিবিধ, শরীরের কর্ম্মস্থানও বিপুল, সে সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ নাই—কিন্তু শারীরিক ক্রিয়া শরীরের নিজের জিনিষ, এ কথা

চিরদিন ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। আমি যদি পরকে বলি তুমি আমার হইয়া হজম করিয়া দাও—এবং সেরূপ হজম করা যদি পরের দ্বারা সম্ভবপর হয়, তবে তাহাতে মঙ্গল নাই। ব্যবহারের অভাবে নিজের পাকস্থলীটিকে সম্পূর্ণ খোয়াইয়া পরাশ্রিত-শ্রেণীয় জীবের ন্যায় চিরকাল পরের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া দিব্য পরিপুষ্ট ভাবে চোখ বুজিয়া থাকাকে গৌরবের বিষয় বলা চলে না। ইংরাজের পাকস্থলী তাহার ষ্টেটের মধ্যে থাকিতে পারে, কিন্তু ষ্টেট্ তাহার সমাজের বহির্ভূত নহে—ইংরাজ সর্ব্বদাই রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যাপৃত থাকে, কারণ রাজনীতি তাহার স্বকীয় কলেবরের মধ্যেই। আমরা তাহার নকল করিয়া পরের পাকস্থলীতে নিয়তই যদি আন্দোলন উপস্থিত করিতে যাই, তাহাতে কি আমাদের হজমের কোনো সহায়তা করিবে? যাহারা জাবর কাটে, তাহাদের হজম করিবার বিধি একরূপ; যাহারা জাবর কাটে না, তাহাদের হজম করিবার বিধি অন্যরূপ। জাবরকাটা হজম করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া যদি প্রমাণিত হয়, তথাপি তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা রাজদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর বলেন না, তাঁহাদিগকে অন্যপক্ষে "পেসিমিষ্ট্" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার সিংহদ্বার হইতে খেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরূপ দুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছ-লুব্ধ হতভাগ্য শৃগালের সান্ত্বনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেসিমিষ্ট্" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ কথা আমি কোনোমতেই বলিব না—আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হৌক্, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্য উৎসুক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্ত্তনশীল প্রসন্নতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কি, আমাদিগকে চারিদিক্ হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থানির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষুক, ভূস্বামি-প্রজাভৃত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাঁধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্ত্রবিহিত

নৈতিক সম্বন্ধ নহে—এগুলি হৃদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্য। আমরা যে-কোনো মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি। এইজন্য কোনো অবস্থায় মানুষকে আমরা আমাদের কার্য্য-সাধনের কল বা কলের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালমন্দ দুই দিক্ই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়, ইহা প্রাচ্য।

জাপানযুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি একটা কলের জিনিষ, সন্দেহ নাই—সৈন্য-দিগকে কলের মত হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্য সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে;—তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই সূত্রে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্য আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত—রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্চখেলার দাবাবোড়ের মত মরিত না—মানুষের মত হৃদয়ের সম্বন্ধ লইয়া, ধর্ম্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট্ আত্মহত্যার মত হইয়া দাঁড়াইত—এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন—"ইহা চমৎকার—কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে!" জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক্, এইরূপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ-দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং অনাবশ্যক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সঙ্কীর্ণ;—আপিসের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভৃত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো প্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে পুত্রকন্যার বিবাহ এবং শ্রাদ্ধশান্তি পর্য্যন্ত টানিয়া-লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন্। আমি রাজশাহী ও ঢাকার প্রোভিন্-শ্যাল কন্ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্ফারেন্স্-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই—কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই সুপরিস্ফুট। যেন বরযাত্রীর দল গিয়াছি—আহার-বিহার-আরাম-আমোদের জন্য দাবী ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বান-কর্ত্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাঁহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই—এত চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়,

এত শয়নাসন, এত লেমনেড্‌-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রসদের দায় আমাদের 'পরে কেন—তবে কথাটা অন্যায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ঙ্কর কেজো হইয়া উঠি না কেন, তবু আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্‌ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই,—আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্‌ফারেন্স্‌ তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহূতবর্গকে অতিথিভাবে, আত্মীয়ভাবে সংবর্দ্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কি-পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্‌গ্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথ্য, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে—যে অংশ কেজো, তিনদিন-মাত্র তাহার কাজ, বাকি বৎসরটা তাহার সাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে সেবার সম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথ্য গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ-পরিতৃপ্তি দিবার জন্য পুরাকালে বড় বড় যজ্ঞানুষ্ঠান হইত—এখন বহুদিন হইতে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া যেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অব্যবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাণ্ডারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এম্‌নি করিয়া কন্‌গ্রেস্‌-কন্‌ফারেন্সের মাঝখানে খুব যখন বিলাতী বক্তৃতার ধুম ও চট্‌পটা করতালি—সেখানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাগিয়া, বাঁটিয়া, খাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কি করা হইতেছে, তাহা তিনি ভাল বুঝিতেই পারেন না। মা'র মুখের হাসি আরো একটুখানি ফুটিত,—যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের ন্যায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়—আহূত-অনাহূত আপামরসাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত—কিন্তু আনন্দে-মঙ্গলে ও মাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহাই হউক্, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানব-সম্বন্ধের মাধুর্য্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে।

আমরা এই সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে-পরে, উচ্চে-নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল, পাঠশালা, জলাশয়, অতিথিশালা, দেবালয়, অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান, জলদান, আশ্রয়দান, স্বাস্থ্যদান, বিদ্যাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্ত্তব্য ছিন্নসমাজ হইতে স্খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্রসম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রাত্যহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়সা বা তদপেক্ষা অল্প—একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি তণ্ডুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই—এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্যার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষসম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না? স্বদেশের সহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ,—সে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না? আমরা কি স্বদেশকে, জলদান-বিদ্যাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্ম্মগুলিকে পরের হাতে বিদায়দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য পঞ্চাশহাজার টাকা দিতেছেন—মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না—তাহার ফল কি হইল? তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের সূত্রে, দেশের যে হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে, সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি—কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গবর্মেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, তবে সেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্প আক্ষেপের বিষয় হইবে? এইজন্যই কি আমরা সভা করি, দরখাস্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না!

ইহা কখনই চিরদিন এদেশে প্রশ্রয় পাইবে না —কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে! আমরা আমাদের অতি দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়-দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই—তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট অর্জ্জিত অন্নও বহুদূর কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই—আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিদ্যা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্ত্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মত না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে—কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকে এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম্ম! এইবার সময় আসিয়াছে,—যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে,—যখন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি,—আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না!

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধদ্বারা খুব বড় জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোট পল্লিকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি—কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়—দেশকে আমরা কখনই পল্লির মত করিয়া দেখিতে পারি না —এইজন্য অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না—কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিষটা আমাদের ছিল না, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানাঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকানুন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসঙ্গত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশীই হৌক্ না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না —যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতালাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতেই হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্ব্বে যখন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তখন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘকাল

হইতে বাধ্য হইয়া পল্লিসমাজই খণ্ডখণ্ডভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে—স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্ত্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজো আমাদের মনুষ্যত্ব আছে—কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্য, যাহা ভাঙিয়াছে, তাহার জন্য আমরা শোক করিব না—যাহা গড়িতে হইবে, তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহাই ঘটিতে দেওয়া কখনই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে, আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পার্ষদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনিই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে। আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ কর, তবে কেমন করিয়া করিব, কোথায় করিব, কাহার কাছে কি করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকই আপনার কর্ত্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা। এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দ্দিষ্টপথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য একটি কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজে কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাক্কায় তাহা যদি-বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না। তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ—আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অনুভব ও রক্ষা করিতে পারে না—শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্খলিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরূপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উদ্যতশক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা ঐক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়—তাহা আমাদের বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া সর্ব্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলসূক্ষ্ম সর্ব্ব আকারেই প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়—একজন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা—সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা—তাঁহার সম্পূর্ণশাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করা।

এই সমাজপতি কখনো ভাল, কখনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না।

আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষস্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইঁহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবে। সমাজের সমস্ত-অভাব-মোচন, মঙ্গলকর্ম্ম-চালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইঁহারা করিবেন এবং সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পপরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশীসমাজের একটি প্রাপ্য আদায় দুরূহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড় বড় মঠ-মন্দির চলিতেছে, এ দেশে কি সমাজ ইচ্ছা-পূর্ব্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যখন অন্নে জলে-স্বাস্থ্যে-বিদ্যায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তখন কৃতজ্ঞতা কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোখের সাম্‌নে রাখিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগও আমাদের অনুবর্ত্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম একস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে—কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্তূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কি করিয়া কলের সহিত হৃদয়ের সামঞ্জস্য-বিধান করিতে হয়, কি করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্য একইকালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব—আমরা স্বদেশকে একটি মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশীসমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষস্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষস্থানে উপলব্ধি করা, সেই বিশেষস্থান হইতে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা আমাদের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে, একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের সুবিধা অথবা যে কারণেই হৌক্, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন—আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি এই কান্নাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল? দেশকে খণ্ডিত করিলে যে সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য দেশের

মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভাল—কিন্তু তবু যদি প্রবেশ করিয়া বসে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? সেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে সুদৃঢ়-সুস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে আঘাত করিয়া বাংলাকে নির্জ্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্চ্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্ম্মের পুরস্কারস্বরূপ আমাদিগকে উপাধি-বিতরণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সৎকর্ম্মের সাধুবাদ ও আশীর্ব্বাদ আমরা স্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্য হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মত আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামান্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, সেই বিরোধ মিটাইয়া-দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তি-স্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে সমাজকে বারে-বারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয় ত সাধারণভাবে আমার এ কথা স্বীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অসাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—নির্ব্বাচন করিব কি করিয়া, সবাই নির্ব্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে সমস্ত ব্যবস্থাতন্ত্র স্থাপন করিয়া তবে ত সমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্ব্বক বিচারবিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনোকালে কাজে নাবা সম্ভব হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত,—দেশের কোনো লোক বা কোনো দল যাঁহার সম্বন্ধে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ মিটাইয়া-লইয়া লোককে নির্ব্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হৌক্, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকট বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া-তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্যলোককে

দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে একদল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে—পূর্ব্বে হইতে হিসাব করিয়া, কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব—সমাজের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান্ ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে। যে শক্তি আপাতত যোগ্যলোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে সে সমাজ ফুটা-কলসের মত শূন্য হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্যলোক না হইলেও, সমাজের শক্তি—সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিধৃত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্ব্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে যখন যোগ্যতার যোগ হইবে, তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্য্যবলে আপনাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানীর মত সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই—কিন্তু বড় ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক একটা বড়দিন আসে, সেইদিন বড়লোকের তলবে দেশের সমস্ত শালতামামি নিকাস বড়খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ—দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, সেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না—দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শূন্য নাই।

সমাজের সকলের চেয়ে যাঁহাকে বড় করিব, এত বড় লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার সকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়, তাহা নহে। কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড় করে। জাপানের মিকাডো জাপানের সমস্ত সুধী, সমস্ত সাধক, সমস্ত শূরবীরদের দ্বারাই বড়। আমাদের সমাজপতিও সমাজের মহত্ত্বেই মহৎ হইতে থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড় লোকই তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি-বা অনেকে অনুকূলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক দোষ, ত্রুটি ও স্খলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অদ্যকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ কথা বলিলেও পাছে অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়, এজন্য আমি কুণ্ঠিত আছি। আমি অদ্য

যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উদ্যত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে—তাহা আমার সৃষ্টি নহে, তাহা আমাকর্ত্তৃক উচ্চারিতমাত্র। আপনারা এ শঙ্কামাত্র করিবেন না, আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার সীমা বিস্মৃত হইয়া স্বদেশীসমাজগঠনকার্য্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব—আসুন্, আমরা মনকে প্রস্তুত করি,—ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবুদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অদ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া, কর্ম্মের প্রতি অনুকূল করিয়া, সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতিসূক্ষ্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগূঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র-রক্তভৃষার্ত্ত-শিকড়সমেত হৃদয়ের অন্ধকার-গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শূন্য আসনে বিনম্রবিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি- আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি—শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি—শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্রগন্ধ উদ্গত হইতে থাক্—দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অনুভব করুক্!

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কি ভাবে সমাজের কার্য্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, যেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে—স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নূতনকে যথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্ব্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্য করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে—সমস্ত কলরবকোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গম্ভীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে। কাল যদি তাঁহার অভিষেক হয়, তবে তাহার পরদিন হইতেই আমরা অনেকেই অবোধ বাচালের ন্যায় ক্রমাগত প্রশ্ন তুলিতে থাকিব—কি করা হইল, এ কাজগুলা শেষ হইল না কেন, এবার বৈশাখে বারো-আনা আম ঝড়ে পড়িয়া গেল কেন, আমার প্রতিবেশীর ভাগিনেয় 'গুণনিধি'উপাধি পাইল, আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি অপরাধ করিয়াছে? কোনো অনাবশ্যক কৈফিয়তের চেষ্টা না করিয়া এই সমস্ত প্রশ্নবৃষ্টি তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে।

অতএব তাঁহাকে আমরা সমাজের সর্ব্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে একদিনের জন্যও আমরা সুখস্বচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের

সূচিমুখ-কণ্টক-খচিত ঈর্ষাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুরপরিমাণে বল ও সহিষ্ণুতা প্রদান করেন—তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্ম্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

এইস্থলে, বর্ত্তমানে কে আমাদের সমাজপতি হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের একজনেরও নাম যদি না করি, তবে আমার পক্ষে অত্যন্ত ভীরুতা প্রকাশ পাইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, নাম করিলে আমার প্রস্তাবটি আরো, সকলের কাছে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। অতএব এই ক্ষণে—এই স্থানেই তাঁহার নামোল্লেখ করিবার জন্যও আমি প্রস্তুত হইতেছি।

যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে;—যিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্ম্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশবিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন, কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচারবিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব, দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি। আপনারা সকলেও সমস্ত ক্ষুদ্রতর্ক ও কার্য্যহানিকর দ্বিধা, সমস্ত ব্যক্তিগত, সংস্কারগত পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিয়া অদ্য সমস্বরে আমার সমর্থন করুন, অধিনায়ককে স্বেচ্ছাক্রমে বরণ করিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন করুন, এবং অদ্য হইতে ভিক্ষার ঝুলি-কাঁথা সমস্ত ছাই করিয়া পুড়াইয়া দেশের কার্য্যে দেশকে যথার্থভাবে প্রবৃত্ত করুন্!

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূলব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে; তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনি এই মুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে

নূতনকালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি!

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নূতন নহে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্য্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্য্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্য্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান্ বা আমেরিকগণের মত উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য্য উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য্যসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর একবার সুদীর্ঘকাল বিশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংস্রবের চেয়ে এই মিলনের সংস্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে—মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই এসিয়াব্যাপী ধর্ম্মপ্লাবনের সময় ভারতবর্ষে নানাজাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ-উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ সুবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল। পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্ব্বত্রই সে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, নানা স্বতোবিরোধ-আত্মখণ্ডনসঙ্কুল এই হিন্দুধর্ম্মের, এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্‌খানে? সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। সুবৃহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন—কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলত্ব বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহারা খণ্ডখণ্ড করিয়া দেখে, তাহারা ইহাকে চ্যাপ্টা বলিয়াই অনুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসঙ্গত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যসূত্র নিগূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ষেই মুসলমানের সংঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জস্যসাধনের প্রক্রিয়া সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানসমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল, যেখানে উভয়

সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী, কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানাস্থানে ধর্ম্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে, শিক্ষিতসম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন ত দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্যসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই।

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম্ম, আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎসমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মিলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড় রাসায়নিক কারখানাঘর খুলিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধপ্রাদুর্ভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্য্যস্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তনমাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবস্তও রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—তাহা একপ্রকার জীবন্মৃত্যু।

বৌদ্ধপরবর্ত্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্য, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকলদিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশ-সকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্‌ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্য সমাজে যে ভীরু স্ত্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ স্ত্রৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া

পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া-উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ্ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে!

বস্তুত এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বরত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্রূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যখন হইতে আচারপালন-মাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ করিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব তপস্যার ফল, নব নব ঐশ্বর্য্যবিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের দ্বারদেশে নামিয়া-আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভারগ্রহণ করিল—তখন হইতে আমরা অন্যকেও কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তখন হইতেই সে বিরাট্মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বরূপে বিরাজ করে। বস্তুত কেবল টিঁকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উত্তেজিত করিয়া ফিরে নাই—সর্ব্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্ত্তিত্বের চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যখন আপনার সমস্ত পুঁটুলি-পাট্লা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজের প্রবল আঘাতে এই ভীরু পলাতক সমাজের ক্ষুদ্রবেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দূরে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়্মুড়্ করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকায়

কাহার সাধ্য! এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই,—যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্বত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল "গেল গেল" বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের রুচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে যাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপসেরা তপস্যাদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হৌক্, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ষের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে,—লজ্জা দূর হইবে,—ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে, তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে

যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মত গ্রহণ করিব, তাহা নহে,—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন—তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীষী ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ব, উদ্ভিদতত্ব ও জন্তুতত্বের ক্ষেত্রকে একসীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন—মনস্তত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না, তাহা বলিতে পারি না। এই ঐক্যসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে - ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট্ একের মধ্যে সকলেরই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সেই সুমহৎ দিন আসিবার পূর্ব্বে—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" যে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্ম নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরসঞ্চিত জ্ঞানধর্ম্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অশ্রান্তভাবে সঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্রে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন —মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষুশালার প্রান্তে তাঁহার একটুখানি স্থান করিয়া দিবার জন্ম প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর! আমরা কি এই জননীর জীর্ণগৃহ সংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ীর বিল্ চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা-আস্বাব্-আড়ম্বরে কম্‌তি পড়ে, এইজন্যই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন, পরের পাকশালার দ্বারে তাঁহারি অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ ত একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত,—একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল—আজ আমরা কি টাকার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্ম্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা সেই শুচিশুদ্ধ, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পোপকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া ত কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেষণ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্ম নিজের কোনো আরাম, কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল, তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে?—কখনই নহে! নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ডপ্রভাব ধীরভাবে, নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুঃ-

চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থবিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার কর, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্ম অদ্য আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার কর যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা কর, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া-দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

নৌকাডুবি।

৪২

পরদিন হেমনলিনী প্রত্যুষে উঠিয়া যখন প্রস্তুত হইয়া বাহির হইল, তখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাঁহার শোবার ঘরের জানলার কাছে একটা ক্যাম্বিশের কেদারা টানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ঘরে আস্‌বাব্ অধিক নাই। একটি খাট আছে, এক কোণে একটি আল্‌মারি—একটি দেয়ালে অন্নদাবাবুর পরলোকগতা স্ত্রীর একটি ছায়াপ্রায় বিলীয়মান বাঁধানো ফোটোগ্রাফ্—এবং তাহারি সম্মুখের দেয়ালে সেই তাঁহার পত্নীর স্বহস্তরচিত একখণ্ড পশমের কারুকার্য্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আল্‌মারিতে যে সমস্ত টুকিটাকি সৌখীন জিনিষ যেমনভাবে সজ্জিত ছিল, আজো তাহারা তেম্নি রহিয়াছে।

হেমনলিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"বাবা, আজ এমন চুপ করিয়া বসিয়া আছ যে! বেড়াতে যাও নাই কেন?"

অন্নদাবাবু ধরাপড়া অপরাধীর ন্যায় অপ্রস্তুতভাবে কহিলেন, "আজকাল হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে—কার্ত্তিকমাসের হিমটা লাগানো ভাল কি না, তাই ভাবিতেছি!"

কতকাল হইতে অন্নদাবাবু প্রতিদিন সকালবেলায় নিয়মিত বেড়াইয়া আসিতেছেন, হিমে-বৃষ্টিতে কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। তিনি বলিতেন, "সাধনা না করিলে ভাল জিনিষ মেলে না—যাহারা সকালবেলায় খুব একচক্র বেড়াইয়া না আসে, তাহারা চায়ের পেয়ালার ঠিক মর্য্যাদাটি বোঝে না।" লোককে পিল্ খাওয়ানো সম্বন্ধে তাঁহার যেমন আগ্রহ দেখা গেছে—সকালবেলায় ভ্রমণের উপদেশ

দেওয়া সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ অশ্রান্ত উৎসাহ ছিল। সেই অন্নদাবাবু আজ কার্ত্তিকমাসের হিমের ওজর করিলে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে।

হেমন্তকালের ভোরের আলোতে এই বিষণ্ণমুখ বৃদ্ধকে তাঁহার নির্জ্জন শয়নঘরের বাতায়নে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আজ হঠাৎ অন্নদাবাবুর জীবনের শূন্যময়তা হেমনলিনীর কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সন্তানেরা স্বভাবতই আপনাদের নবীন-জীবনের সুখদুঃখ লইয়াই ব্যাপৃত; এই বৃদ্ধের কাছে যেদিন সংসার বিমর্ষ-বিকল হইয়া দেখা দেয়, সেদিন হৃদয় অবারিত করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে কেহই নাই; কেবল যে কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেছে, যে হস্তের স্পর্শ তাহার সমস্ত সান্ত্বনা-সম্পদ্ লইয়া কোন্ লোকান্তরে অন্তর্হিত—সেই কণ্ঠের নির্ব্বাক্ স্মৃতি, সেই স্পর্শের বিরহানুভূতি পুরাতন গৃহদ্বারকে, চিরপরিচিত শয্যাসনকে পরিপূর্ণ করিয়া জাগিয়া উঠে, ইহা কে জানিতে পায়!

যে ছেলে তাহার বিছানার প্রান্তে শান্ত-ধৈর্য্যের সঙ্গে আপন রোগের বেদনা সহ্য করিতেছে, তাহাকে দেখিলে মায়ের প্রাণ যেমন করিয়া উঠে, আজ স্তব্ধভাবে আসীন অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেমনলিনীর প্রাণ তেম্‌নি করিয়া উঠিল। তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পাকাচুল বাছিবার ছলে মাথায় কোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করিয়া হেম বলিল—"বাবা, চল না, আমরা দুজনে ছাদে বেড়াইতে যাই!"

দুইজনে ছাদে গেলেন। তখন আকাশের লঘু শিশিরবাষ্প নবপ্রভাতের আবির্ভাবকে আর গোপন করিতে পারিতেছে না আবরণ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইতেছে। হঠাৎ চোখের সম্মুখে মাথার উপরে এই শুভ্রের সহিত সুবর্ণের দীপ্যমান সম্মিলন দেখিয়া অন্নদাবাবু মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, একবার চোখ বুজিলেন এবং ধীরে ধীরে নমস্কার করিলেন। পরক্ষণে হেমনলিনীর মাথার উপরে হাত রাখিয়া কহিলেন—"মা, প্রতিদিন যাহা বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা সুন্দরভাবে, শান্তভাবে শিরোধার্য্য করিয়া লইব।"

হেমনলিনী দৃঢ়স্বরে কহিল, "বাবা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদের সহিত যাহা আদেশ করিবে, তাহা আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব। তুমি আমাকে কিছু বল না কেন বাবা? তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়ো না। আমি স্বভাবত চুপচাপ করিয়া থাকি, ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারি না, সেইজন্য ভাবিয়ো না যে, আমি কেবল অসুখী হইয়াই আছি। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই পালন করিতে পারিলে আমি ভাল থাকি। আমাকে নিজের খেয়ালে ফেলিয়া রাখিয়ো না—আমাকে আদেশ কর!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"মা, আদেশ করা কি খুব সহজ কাজ মনে করিস্? সংসারে ক'টা লোক তাহা পারে! আমার মত দুর্ব্বলমানুষ কাহাকেও চালনা করিবার জন্য হয় নাই, সে আমি নিশ্চয় জানি।"

দুর্ব্বলতার জন্য অন্নদাকে কতবার কত লোকের কাছে প্রতারিত হইতে হইয়াছে, এবং সেজন্য হেমনলিনীর মার কাছ হইতে

তিনি কত ভর্ৎসনা ও উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা গল্প করিতে লাগিলেন। হেমনলিনীর মা যে কিরূপ শান্ত অথচ দৃঢ় ছিলেন, তিনি যে কিরূপ লোক চিনিতেন, সংসারবুদ্ধি যে অন্নদার চেয়ে তাঁহার কত বেশি ছিল, বৃদ্ধ তাহারই নানা দৃষ্টান্ত দিতে লাগিলেন।

এ সব কথা হেমনলিনীর কাছে ইতিপূর্ব্বে কখনো হয় নাই—এবং এ সব কথা যাহার কাছে মন খুলিয়া বলিতে পারেন, এমন লোকও অন্নদার কেহ ছিল না। আজ দুঃখের আঘাতে পিতা ও কন্যার মধ্যে একটা যেন ব্যবধান ছিন্ন হইয়া গেছে—বেদনার টানে পরস্পর যেন খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বদিগন্তের সৌধশিখরশ্রেণীর উপরে সূর্য্য রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কহিল, "বাবা, চল, আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া লইবে। তার পরে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সেকালের গল্প শুনিব এ সব কথা আমার কত ভাল লাগে, বলিতে পারি না।"

হেমনলিনীসম্বন্ধে অন্নদাবাবুর বোধশক্তি আজকাল এম্নি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, এই চা খাইতে তাড়া দিবার কারণ বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। আর কিছু পরেই অক্ষয় চায়ের টেবিলে আসিয়া উপস্থিত হইবে—তাহারি সঙ্গ এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি চা খাওয়া সারিয়া-লইয়া হেম পিতার কক্ষে নিভৃতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছে, ইহা তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন। ব্যাধভয়ে ভীত হরিণীর মত তাঁহার কন্যা যে সর্ব্বদা ত্রস্ত হইয়া আছে, ইহা তাঁহার মনে অত্যন্ত বাজিল।

নীচে গিয়া দেখিলেন, চাকর এখনো চায়ের জল তৈরি করে নাই। তাহার উপরে হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠিলেন—সে বৃথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে, আজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই চায়ের তলব হইয়াছে। "চাকররা সব বাবু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইবার জন্য আবার অন্য লোক রাখা দরকার হইয়াছে"—এইরূপ মত তিনি অত্যন্ত নিঃসংশয়ে প্রচার করিলেন।

চাকর ত তাড়াতাড়ি চায়ের জল আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্নদাবাবু অন্যদিন যেরূপ গল্প করিতে করিতে ধীরে-সুস্থে-আরামে চা-রস উপভোগ করিতেন, আজ তাহা না করিয়া অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত পেয়ালা নিঃশেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হেমনলিনী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বাবা, আজ কি তোমার কোথাও বাহির হইবার তাড়া আছে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন "কিছু না, কিছু না। ঠাণ্ডার দিনে গরম চা-টা এক চুমুকে খাইয়া লইলে বেশ ঘামিয়া শরীরটা হাল্কা হইয়া যায়।"

কিন্তু অন্নদাবাবুর শরীরে ঘর্ম্ম নির্গত হইবার পূর্ব্বেই যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আজ অক্ষয়ের বেশ-ভূষায় একটু বিশেষ পারিপাট্য ছিল। হাতে রূপা-বাঁধানো ছড়ি—বুকের কাছে ঘড়ির চেন ঝুলিতেছে—বামহাতে একটা ব্রাউন্ কাগজে মোড়া কেতাব। অন্যদিন অক্ষয় টেবিলের যে অংশে বসে, আজ সেখানে না

বসিয়া হেমনলিনীর অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইল—হাসিমুখে কহিল, "আপনাদের ঘড়ি আজ দ্রুত চলিতেছে!"

হেমনলিনী অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল না, তাহার কথার উত্তরমাত্র দিল না। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চল ত মা উপরে। আমার গরম কাপড়গুলা একবার রৌদ্রে দেওয়া দরকার।"

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, রৌদ্র ত পালাইতেছে না—এত তাড়াতাড়ি কেন? হেম, অক্ষয়কে একপেয়ালা চা ঢালিয়া দাও। আমারো চায়ের দরকার আছে—কিন্তু অতিথি আগে।"

অক্ষয় হাসিয়া হেমনলিনীকে কহিল—"কর্ত্তব্যের খাতিরে এতবড় আত্মত্যাগ দেখিয়াছেন? দ্বিতীয় সার্ ফিলিপ্ সিড্নি!"

হেমনলিনী অক্ষয়ের কথার লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া দুইপেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া একপেয়ালা যোগেন্দ্রকে দিল ও অপর পেয়ালাটি অক্ষয়ের অভিমুখে ঈষৎ-একটু ঠেলিয়া দিয়া অন্নদাবাবুর মুখের দিকে তাকাইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "রৌদ্র বাড়িয়া উঠিলে কষ্ট হইবে—চল, এইবেলা চল!"

যোগেন্দ্র কহিল—"আজ কাপড় রৌদ্রে দেওয়া থাক্ না! অক্ষয় আসিয়াছে—"

অন্নদা হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমাদের কেবলি জবরদস্তি! তোমরা কেবল জেদ্ করিয়া অন্যলোকের মর্ম্মান্তিক বেদনার উপর দিয়া নিজের ইচ্ছাকে জারি করিতে চাও! আমি অনেকদিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না! মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।"

এই বলিয়া হেমকে লইয়া অন্নদা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেম শান্তস্বরে কহিল, "বাবা আর একটু বোস! আজ তোমার ভাল করিয়া চা খাওয়া হইল না! অক্ষয়বাবু, কাগজে-মোড়া এই রহস্যটি কি, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

অক্ষয় কহিল, "শুধু জিজ্ঞাসা কেন, এ রহস্য উদ্ঘাটন করিতেও পারেন!"—এই বলিয়া মোড়কটি হেমনলিনীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

হেম খুলিয়া দেখিল, একখানি মরক্কো-বাঁধানো টেনিসন্। হঠাৎ চম্‌কিয়া-উঠিয়া তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠিক এই টেনিসন্, এইরূপ বাঁধানো, সে পূর্ব্বে উপহার পাইয়াছে এবং সেই বইখানি আজও তাহার শোবার ঘরের দেরাজের মধ্যে গোপন সমাদরে রক্ষিত আছে।

যোগেন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "রহস্য এখনো সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই।"—এই বলিয়া বইয়ের প্রথম শূন্যপাতাটি খুলিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল। সেই পাতায় লেখা আছে—"শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়শ্রদ্ধার উপহার।"

তৎক্ষণাৎ বইখানা হেমের হাত হইতে একেবারে ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎপ্রতি সে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া কহিল—"বাবা, চল।"

উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যোগেন্দ্রের চোখদুটা আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। সে কহিল—"না, আমার

আর এখানে থাকা পোষাইল না। আমি যেখানে হোক্ একটা ইস্কুলমাষ্টারি লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

অক্ষয় কহিল, "ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ। আমি ত তখনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। তুমি আমাকে বারম্বার আশ্বাস দেওয়াতেই আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনোদিন অনুকূল হইবে না। অতএব সে আশা ছাড়িয়া দাও! কিন্তু আসল কথা এই যে, উনি যাহাতে রমেশকে ভুলিতে পারেন, সেটা তোমাদের করা কর্ত্তব্য।"

যোগেন্দ্র কহিল "তুমি ত বলিলে কর্ত্তব্য —উপায়টা কি শুনি!"

অক্ষয় কহিল—"আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি! আমি দেখিতেছি, তুমি যদি তোমার বোন্ হইতে, তবে আমার আইবড় নাম ঘোচাইবার জন্য পিতৃপুরুষদিগকে হতাশভাবে দিন গণনা করিতে হইত না। যেমন করিয়া হোক্, একটি ভাল পাত্র জোগাড় করা চাই,—যাহার প্রতি তাকাইবামাত্র অবিলম্বে কাপড় রৌদ্রে দিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া না ওঠে।"

যোগেন্দ্র। পাত্র ত ফরমাস দিয়া মেলে না!

অক্ষয়। তুমি একেবারে এত অল্পেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বোস কেন? পাত্রের সন্ধান আমি বলিতে পারি, কিন্তু তাড়াহুড়া যদি কর, তবে সমস্ত মাটি হইয়া যাইবে। প্রথমেই বিবাহের কথা পাড়িয়া দুই পক্ষকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিলে চলিবে না। আস্তে আস্তে আলাপপরিচয় জমিতে দাও, তাহার পরে সময় বুঝিয়া দিনস্থির করিয়ো।

যোগেন্দ্র। প্রণালীটি অতি উত্তম, কিন্তু লোকটি কে শুনি!

অক্ষয়। তুমি তাহাকে তেমন ভাল করিয়া জান না, কিন্তু দেখিয়াছ। নলিনাক্ষ-ডাক্তার।

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ!

অক্ষয়। চম্‌কাও কেন! তাহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজে গোলমাল চলিতেছে, চলুক্ না। তা বলিয়া অমন পাত্রটিকে হাতছাড়া করিবে?

যোগেন্দ্র। আমি হাত তুলিয়া লইলেই অমনি পাত্র যদি হাতছাড়া হইত, তা হইলে ভাবনা কি ছিল? কিন্তু নলিনাক্ষ বিবাহ করিতে কি রাজি হইবেন?

অক্ষয়। আজই হইবেন, এমন কথা বলিতে পারি না কিন্তু সময়ে কি না হইতে পারে! যোগেন, আমার কথা শোন। কাল নলিনাক্ষের বক্তৃতার দিন আছে—সেই বক্তৃতায় হেমনলিনীকে লইয়া যাও। লোকটার বলিবার ক্ষমতা আছে। স্ত্রীলোকের চিত্ত-আকর্ষণের পক্ষে ঐ ক্ষমতাটা অকিঞ্চিৎকর নয়! হায়, অবোধ অবলারা এ কথা বোঝে না যে, বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভাল।

যোগেন্দ্র। কিন্তু নলিনাক্ষের ইতিহাসটা কি, ভাল করিয়া বল দেখি, শোনা যাক্।

অক্ষয়। দেখ যোগেন্, ইতিহাসে যদি কিছু খুঁৎ থাকে, তাহা লইয়া বেশি ব্যস্ত হইয়ো না। অল্প একটুখানি খুঁতে দুর্লভ জিনিষ সুলভ হয়—আমি ত সেটাকে লাভ মনে করি।

অক্ষয় নলিনাক্ষের ইতিহাস যাহা বলিল, তাহা সংক্ষেপে এই : নলিনাক্ষের পিতা রাজবল্লভ ফরিদপুর-অঞ্চলের একটি ছোট-খাটো জমিদার ছিলেন। তাঁহার বছর ত্রিশ বয়সে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কোনোমতেই স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না এবং আচারবিচারসম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্বামীর সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন বলা বাহুল্য, ইহা রাজবল্লভের পক্ষে সুখকর হয় নাই। তাঁহার ছেলে নলিনাক্ষ ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে ও বক্তৃতাশক্তিদ্বারা উপযুক্তবয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি সরকারী ডাক্তারের কাজে বাংলার নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া চরিত্রের নির্ম্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎকর্ম্মের উদ্যোগে সর্ব্বত্র খ্যাতিবিস্তার করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিল। বৃদ্ধবয়সে রাজবল্লভ একটি বিধবাকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ উদ্যত হইয়া উঠিলেন। কেহই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। রাজবল্লভ বলিতে লাগিলেন,"আমার বর্ত্তমান স্ত্রী আমার যথার্থ সহধর্ম্মিণী নহে—যাহার সঙ্গে ধর্ম্মে, মতে, ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে, তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।" এই বলিয়া রাজবল্লভ সর্ব্বসাধারণের ধিক্কারের মধ্যে সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতানুসারে বিবাহ করিলেন।

ইহার পরে নলিনাক্ষের মা গৃহত্যাগ করিয়া কাশী যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নলিনাক্ষ রংপুরের ডাক্তারি ছাড়িয়া-আসিয়া কহিলেন —"মা, আমিও তোমার সঙ্গে কাশী যাইব।"

মা কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, আমার সঙ্গে তোদের ত কিছুই মেলে না, কেন মিছামিছি কষ্ট পাইবি?"

নলিনাক্ষ কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার কিছুই অমিল হইবে না।"

নলিনাক্ষ তাহার এই স্বামিপরিত্যক্ত অবমানিত মাতাকে সুখী করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইল। তাঁহার সঙ্গে কাশী গেল। মা কহিলেন "বাবা, ঘরে কি বৌ আসিবে না?"

নলিনাক্ষ বিপদে পড়িল, কহিল, "কাজ কি মা, বেশ আছি।"

মা বুঝিলেন, নলিন অনেকটা ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মপরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। ব্যথিত হইয়া তিনি কহিলেন, "বাছা, আমার জন্যে তুই চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, এ ত কোনোমতেই হইতে পারে না। তোর যেখানে রুচি, তুই বিবাহ কর্ বাবা, আমি কখনো আপত্তি করিব না।"

নলিন দুইএকদিন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "তুমি যেমন চাও, আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনই ঘরে আনিব না।"

এই বলিয়া নলিন পাত্রীর সন্ধানে বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়াছিল। তাহার পরে মাঝখানে ইতিহাসে একটুখানি বিচ্ছেদ আছে। কেহ বলে, গোপনে সে এক পল্লিতে গিয়া কোন্ এক অনাথাকে বিবাহ করিয়া-

ছিল এবং বিবাহের পরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। কেহ বা তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। অক্ষয়ের বিশ্বাস এই যে, বিবাহ করিতে আসিয়া শেষমুহূর্ত্তে সে পিছাইয়াছিল।

যাহাই হউক্, অক্ষয়ের মতে, এখন নিশ্চয়ই নলিনাক্ষ যাহাকেই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার মা তাহাতে আপত্তি না করিয়া খুসিই হইবেন। হেমনলিনীর মত অমন মেয়ে নলিনাক্ষ কোথায় পাইবে! আর যাই হোক্, হেমের যেরূপ মধুর স্বভাব, তাহাতে সে যে তাহার শাশুড়িকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া চলিবে, কোনোমতেই তাঁহাকে কষ্ট দিবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। নলিনাক্ষ ছদিন ভাল করিয়া হেমকে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। অতএব, অক্ষয়ের পরামর্শ এই যে, কোনো-মতে দুজনের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হউক্!

৪৩

অক্ষয় চলিয়া যাইবামাত্র যোগেন্দ্র দোতলায় উঠিয়া গেল। দেখিল, উপরের বসিবার ঘরে হেমনলিনীকে কাছে বসাইয়া অন্নদাবাবু গল্প করিতেছেন। যোগেন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদা একটু লজ্জিত হইলেন। আজ চায়ের টেবিলে তাঁহার স্বাভাবিক শান্তভাব নষ্ট হইয়া হঠাৎ তাঁহার রোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাতেও তাঁহার মনে মনে ক্ষোভ ছিল। তাই তাড়াতাড়ি বিশেষ সমাদরের স্বরে কহিলেন, "এস যোগেন্দ্র, বোস।"

যোগেন্দ্র কহিলেন, "বাবা, তোমরা যে কোনোখানে বাহির হওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছ! ক্রমে দিনরাত্রি ঘরে বসিয়া থাকা কি ভাল?"

অন্নদা কহিল "ঐ শোন! আমরা ত চিরকাল এইরকম কোণে বসিয়াই কাটাইয়া দিয়াছি। হেমকে ত কোথাও বাহির করিতে হইলে মাথাখোঁড়াখুঁড়ি করিতে হইত।"

হেম কহিল "কেন বাবা আমার দোষ দাও? তুমি কোথায় আমাকে লইয়া যাইতে চাও, চল না!"

হেমনলিনী আপনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়াও সবলে প্রমাণ করিতে চায় যে, সে মনের মধ্যে একটা শোক চাপিয়া ধরিয়া ঘরের মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া নাই! তাহার চারিদিকে যেখানে যাহা-কিছু হইতেছে, সব বিষয়েই যেন তাহার ঔৎসুক্য অত্যন্ত সজীব হইয়া আছে।

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, কাল একটা মীটিং আছে, সেখানে হেমকে লইয়া চল না!"

অন্নদা জানিতেন, মীটিঙের ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হেমনলিনী চিরদিনই একান্ত অনিচ্ছা ও সঙ্কোচ অনুভব করে। তাই তিনি কিছু না বলিয়া একবার হেমের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেম হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিল—"মীটিং? সেখানে কে বক্তৃতা দিবে দাদা?"

যোগেন্দ্র। নলিনাক্ষ-ডাক্তার।

অন্নদা। নলিনাক্ষ!

যোগেন্দ্র। ভারি চমৎকার বলিতে পারেন। তা ছাড়া, লোকটার জীবনের ইতিহাস শুনিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। এমন ত্যাগস্বীকার! এমন দৃঢ়তা! এরকম মানুষের মত মানুষ পাওয়া দুর্লভ!

আর ঘণ্টা-দুই আগে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি ছাড়া নলিনাক্ষসম্বন্ধে যোগেন্দ্র কিছুই জানিত না।

হেম একটা আগ্রহ দেখাইয়া কহিল, "বেশ ত বাবা, চল না, তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইব!"

হেমনলিনীর এইরূপ উৎসাহের ভাবটাকে অন্নদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন না—তথাপি তিনি মনে মনে একটু খুসি হইলেন। তিনি ভাবিলেন, হেম যদি জোর করিয়াও এইরূপ মেলামেশা যাওয়া-আসা করিতে থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র উহার মন সুস্থ হইবে। মানুষের সহবাসই মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনোবৈকল্যের প্রধান ঔষধ। তিনি কহিলেন, "তা বেশ ত যোগেন্দ্র, কাল যথাসময়ে আমাদের মীটিঙে লইয়া যাইয়ো। কিন্তু নলিনাক্ষসম্বন্ধে কি জান, বল ত! অনেক লোকে ত অনেক কথা কয়!"

যে অনেক লোকে অনেক কথা বলিয়া থাকে, প্রথমত যোগেন্দ্র তাহাদিগকে খুব একচোট গালি দিয়া লইল। বলিল "ধর্ম্ম লইয়া যাহারা ভড়ং করে, তাহারা মনে করে, কথায় কথায় পরের প্রতি অবিচার ও পরনিন্দা করিবার জন্য তাহারা ভগবানের স্বাক্ষরিত দলিল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—ধর্ম্মব্যবসায়ীদের মত এতবড় সঙ্কীর্ণচিত্ত বিশ্বনিন্দুক আর জগতে নাই!"—বলিতে বলিতে যোগেন্দ্র অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

অন্নদা যোগেন্দ্রকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বারবার বলিতে লাগিলেন—"সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক! পরের দোষত্রুটি লইয়া কেবলি আলোচনা করিতে থাকিলে মন ছোট হইয়া যায়, স্বভাব সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে, হৃদয়ের সরসতা থাকে না।"

যোগেন্দ্র কহিল—"বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছ! কিন্তু ধার্ম্মিকের মত আমার স্বভাব নয়—আমি মন্দ বলিতেও জানি, ভাল বলিতেও জানি—এবং মুখের উপরে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া হাতে-হাতেই সব কথা চুকাইয়া ফেলি।"

অন্নদা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"যোগেন্, তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিব কেন? আমি কি তোমাকে চিনি না?"

তখন ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া যোগেন্দ্র নলিনাক্ষের বৃত্তান্ত বিবরিত করিল। কহিল, "মাতাকে সুখী করিবার জন্য নলিনাক্ষ আচারসম্বন্ধে সংযত হইয়া কাশীতে বাস করিতেছে, এইজন্যই, বাবা, তুমি যাহাদিগকে অনেক লোক বল, তাহারা অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি ত এজন্য নলিনাক্ষকে ভালই বলি! হেম, তুমি কি বল!"

হেমনলিনী কহিল—"আমিও ত তাই বলি!"

যোগেন্দ্র কহিল—"হেম যে ভালই বলিবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। বাবাকে সুখী করিবার জন্য হেম একটা-কিছু ত্যাগস্বীকার করিবার উপলক্ষ্য পাইলে যেন বাঁচে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি!"

অন্নদা স্নেহকোমলহাস্যে হেমের মুখের দিকে চাহিলেন—হেমনলিনী লজ্জায় রক্তিম মুখখানি নত করিল।

ক্রমশ।

বঙ্গদর্শন।

তপস্যা।*

বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি প্রথমত একজন বলদৃপ্ত, লোভপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ক্ষত্রিয় নরপতি। তাঁহার মধ্যে রজোগুণ পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। বসিষ্ঠাশ্রমে তিনি অতিথি, মহর্ষি বসিষ্ঠ পরম-প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। তাহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বসিষ্ঠের কামধেনুটি দেখিয়া বিশ্বামিত্রের দুর্জ্জয় লোভ জন্মিল। ঋষি তাঁহাকে সে কামধেনু প্রদান করিলেন না, সেজন্য তাঁহার দারুণ অভিমান ও ক্রোধের উদয় হইল। ক্রোধের পরই বল-প্রয়োগস্পৃহা এবং যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার অভিমান দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধ ত ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞতপস্যা। সেই ব্রাহ্মণের হস্তে বিশ্বামিত্র পরাস্ত হইলেন, ব্রহ্মতেজে তাঁহার ক্ষত্রিয়তেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে? তাই বিশ্বামিত্র শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সে কিজন্য? নিজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নহে, সে কেবল পর-পীড়নের জন্য, শত্রুদমনের জন্য, বসিষ্ঠকে জব্দ করিবার জন্য। বিশ্বামিত্রের চিত্তে জিঘাংসাপ্রবৃত্তি বড়ই প্রবল, তিনি তখনও রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়। তপস্যার ফলে তিনি শিবের নিকট বরলাভ করিয়া মনে করিলেন—"এবার আর আমাকে পায় কে? আমি এখনই বসিষ্ঠকে সবংশে নিধন করিব।" কিন্তু তাঁহার সকল দর্প চূর্ণ হইল—বসিষ্ঠের ব্রহ্মতেজে তাঁহার ক্ষাত্রতেজ নির্ব্বাপিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি যত-বড় রাজাই হউন, ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহার বাড়াবাড়ি খাটিবে না। ব্রাহ্মণ না হইতে পারিলে ব্রাহ্মণের নিকট জয়ের আশা নাই। তাই তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার জীবননাটকের এক নূতন অঙ্ক উদ্ঘাটিত হইল। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত তম ও রজোগুণ-নির্ম্মুক্ত হইয়া যতই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাপন্ন

* গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সাবিত্রী লাইব্রেরির চতুর্বিংশতিতম সাংবৎসরিক অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

হইতে লাগিল, তিনি ততই এক একটি উচ্চ-স্তরে উঠিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখেন, তিনি আর সেই ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র নাই, তিনি তপস্যার ফলে হইয়াছেন 'রাজর্ষি'—অর্থাৎ অর্দ্ধেক রাজা, অর্দ্ধেক ঋষি। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে আরও উচ্চ উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই ত্রিশঙ্কুর ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইল। ইহাও বিশ্বামিত্রের একটি বিশেষ পরীক্ষা। সেই ত্রিভুবনবিস্ময়কারী ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বামিত্র তপস্যায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে একজন ঋষি বলিয়া গণ্য করিতেছেন। এমন কি, সকলেই তাঁহার তপোভয়ে ভীত। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কু স্বর্গলোক পর্য্যন্ত উঠিতে পারিলেন। এমন কি, তপোবলে তিনি আর একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যার দুর্দ্দমনীয় তেজে সুরাসুরগণ কম্পিত হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু তপস্যায় এতদূর অগ্রসর হইলেও বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখনও রজোগুণ রহিয়াছে। তখনও তিনি ক্রোধ, জিগীষা, জিঘাংসার বশীভূত, তখনও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবার অম্বরীষ রাজার পালা। ইহাও বিশ্বামিত্রের পরীক্ষার জন্য। এবার তপঃপ্রভাবে তাঁহার চিত্ত আরও প্রশস্ত ও প্রশান্ত হইয়াছে। তিনি একটি গরুর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বসিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবার তিনি শিশু শুনঃশেফের প্রাণরক্ষার্থ নিজের পুত্রদিগকে অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার এতদূর চিত্তোন্নতি দেখিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"বিশ্বামিত্র, তুমি ঋষি হইয়াছ।"

কিন্তু ঋষি হইয়াও তিনি সন্তুষ্ট নহেন, তাই আবার ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। আবার তাঁহার পরীক্ষা হইল। এবারকার পরীক্ষায় তিনি পরাস্ত হইলেন। মেনকার রূপের মোহে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। এইরূপ ক্ষণস্থায়ী চিত্তবিভ্রংশ অনেকেরই ঘটিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল আবার জাগিয়া উঠিল। কামরিপুর পরাভব ঘটিল। তখন অনুতাপের বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্ত আবার নির্ম্মলভাব ধারণ করিল। এবার ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে আর এক-গ্রেড্ উপরে প্রোমোশন্ দিলেন। এবার তিনি 'মহর্ষি' হইলেন। তিনি এখন লোভকে জয় করিয়াছেন, কামকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন না। তাই তিনি আবার অধিকতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আবার পরীক্ষা হইল। ইন্দ্র তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রম্ভা তাঁহাকে রূপের মোহে মজাইতে পারিল না—সে নিজে মজিল। তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া বিশ্বামিত্রও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন না। তিনি লোভজয় করিয়াছেন, কামজয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ক্রোধ-জয় করিতে পারেন নাই। তিনি অনুতপ্ত

হইলেন, তিনি আবার তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনেকদিন পরে ইন্দ্র তাঁহার পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া ক্ষুধার সময় তাঁহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইলেন। বিশ্বামিত্র কিন্তু এবার ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি এতদিনে ক্রোধকেও জয় করিয়াছেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্বেজিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এখন তিনি তপঃসিদ্ধ। এখন তাঁহার মধ্যে পাপের লেশমাত্রও নাই। এখন তাঁহার চিত্ত রজোগুণবিমুক্ত হইয়াছে, এখন দয়া, ক্ষমা, জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সত্বগুণ তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন। বিশ্বামিত্র কৃতার্থ হইলেন।

এইরূপে বিশ্বামিত্রচরিত্রের বিশ্লেষণদ্বারা আমরা দেখিতেছি, একজন কামক্রোধলোভাদি-রিপুপরায়ণ ক্ষত্রিয়নরপতি কিপ্রকার সাধনবলে সত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা আরও পাইতেছি, আর্য্যজাতির শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ও মহত্ব কতদূর গৌরবান্বিত, কত কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ। এবং ব্রাহ্মণগণ তপস্যাদ্বারা এই ভারতভূমিতে যে আর্য্যসভ্যতা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ কত উচ্চ! যে ব্রাহ্মণের গৌরবান্বিত পদ একদিন রাজর্ষি, ঋষি, মহর্ষি পদ অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় ছিল, আজ সেই ব্রাহ্মণবংশের কি শোচনীয় দুর্গতি!

এই বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে আমরা আরও একটি তত্ত্বের মীমাংসা পাইতেছি। আমাদের অনেকের বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুরুষকার অপেক্ষা দৈববল শ্রেষ্ঠ, আমাদের অদৃষ্টের শাসন অকাট্য। কিন্তু এখানে আমরা তাহার অন্যবিধ মীমাংসা পাইতেছি। ত্রিশঙ্কু—বসিষ্ঠ এবং তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন—

"হে মুনিবর! আমি যথাবিধি ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়াছি, শতশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সদাচার ও সদ্গুণ দ্বারা গুরুজনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি, কিন্তু কৈ, কেহই ত আমার প্রতি সদয় হইলেন না। অতএব আমার স্থির বিশ্বাস, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ। এইরূপে দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত হইয়া আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুরুষকারদ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন—

'দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হসি।'"

পুরুষকারের সাক্ষাৎ জলন্তমূর্ত্তি মহাত্মা বিশ্বামিত্র স্বীয় পুরুষকারপ্রভাবে দৈবের নিয়তিবন্ধন ছিন্ন ও দেবগণকে পরাস্ত করিয়া কিপ্রকারে ত্রিশঙ্কুর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পুরুষকারদ্বারা কিপ্রকারে দৈবকে অতিক্রম করা যায়, বিশ্বামিত্র তাঁহার নিজজীবনের কার্য্যকলাপদ্বারাও তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং দৈববল অনতিক্রমণীয়, পুরুষকার দৈবশক্তির নিকট পরাভূত, এ কথা হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় নহে। আমাদের পূর্ব্বতন আর্য্যপুরুষগণ যেরূপ কঠোর তপস্যাদ্বারা দৈববলকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের

নিজ নিজ অভীষ্টপথে সিদ্ধিলাভ করিতেন, পুরাণেতিহাসে তাহার বহু উদাহরণ বিদ্যমান। তপস্যা যে কেবল ব্রহ্মত্বলাভের উপায়, তাহা নহে; তপস্যা যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা, ইহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা যখন যাহা লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইতেন, তখন তাহা লাভের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া, অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে না গিয়া, পুরুষকার অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাই আমরা দেখিতে পাই—হিরণ্যকশিপু অমরবরলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ধ্রুব পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠপদলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, ভগীরথ গঙ্গা আনয়নের জন্য তপস্যা করিতেছেন, হৈমবতী উমা পতিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, অর্জ্জুন পাশুপতাস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, সুরথ রাজা তাঁহার ভ্রষ্টরাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতেছেন, সমাধিবৈশ্য নির্ব্বাণমোক্ষলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন, মহারাজ অশ্বপতি একটি অলোকসামান্য-সন্ততি লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন। পুরাণেতিহাসে এরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। বস্তুত বসিষ্ঠধেনু শবলার ন্যায় তপ যে সর্ব্বকামপ্রদ, ইহা পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। অথবা সেই কামধেনুই শরীরিণী তপস্যা। তাই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন—

> "শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্ত্তিরাত্মবতো যথা।
> অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ॥
> আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলিহোমস্তথৈব চ।
> স্বাহাকারবষট্‌কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা।
> আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্ব্বমেতন্ন সংশয়ঃ।
> সর্ব্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা॥"

অর্থাৎ আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায় শবলা আমার চিরসহচরী; আমার হব্যকব্য, জীবনযাত্রা, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধ বিদ্যা এ সমস্তই ইহার আয়ত্ত।

এই বসিষ্ঠের শরীরিণী তপস্যা কামধেনু যেমন ক্ষুধায় প্রচুরপরিমাণে অন্নপ্রদান করিতে পারে, তেমন শত্রুবিনাশের জন্য অপ্রতিহত শৌর্য্যবীর্য্য ও অগণন সৈন্যসম্পদ্ প্রদান করিতে পারে, আবার দুর্জ্জয়-ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রশমনের দ্বারা সাধককে ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত উন্নয়ন করিতে পারে। তপস্যা কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বকামদা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিতে সমর্থ। তাই ভগবান্ মনু বলেন—

> "তপোমূলমিদং সর্ব্বং দৈবমানুষকং সুখম্।
> তপোমধ্যং বুধৈঃ প্রোক্তং তপোঽন্তং বেদদর্শিভিঃ॥
> ব্রাহ্মণস্য তপো জ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
> বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥
> ঋষয়ঃ সংযতাত্মানঃ ফলমূলানিলাশনাঃ।
> তপসৈব প্রপশ্যন্তি ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥
> ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
> তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্॥
> যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
> সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্॥
>
> মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২৩৫—২৩৯

ইহার ভাবার্থ এই—দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে যতপ্রকার সুখ আছে, তপস্যাই সে সকলের আদি, তপস্যাই তাহাদের স্থিতি, তপস্যাই তাহাদের শেষ। ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপস্যা প্রজারক্ষণ (যুদ্ধাদি),

বৈশ্যের তপস্যা কৃষিবাণিজ্যাদি, শূদ্রের তপস্যা সেবা;—অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিজ নিজ বর্ণধর্ম্ম পালন করিতে হইলে তপস্যার প্রয়োজন। সেইরূপ সংসারত্যাগী ঋষিগণ আত্মসংযম এবং ফলমূলবায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক যে উৎকট তপস্যা করেন, তদ্দ্বারাই তাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নখ-দর্পণের ন্যায় দর্শন করিতে পারেন। ঔষধবল, বিদ্যাবল, নীরোগিতা এবং বিবিধ স্বর্গাদিতে স্থিতি, অর্থাৎ স্বাস্থ্যজন্য সুখ, বিদ্যাজন্য সুখ এবং স্বর্গাদিপ্রাপ্তিজন্য সুখ, এই সর্ব্বপ্রকার সুখের একমাত্র তপস্যাই সাধন। যাহা-কিছু দুস্তর, যাহা-কিছু দুর্লভ, যাহা-কিছু দুর্গম, যাহা-কিছু দুষ্কর, তৎসমস্তই তপোবলে সাধন করা যায়—তপস্যার শক্তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

বিশ্বামিত্র এই তপোবলকে আশ্রয় করিয়া একটি নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মাও তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন। যে তপস্যার বলে বিশ্বামিত্রের ন্যায় মানব স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, সে তপস্যার বল ত সামান্য নহে। সে তপস্যার বল কোথা হইতে আসে? সে তপস্যা কি? বিশ্বামিত্রের তপস্যা কি?

তপস্যার অর্থ সাধনবলে আত্মশক্তির বিকাশ। আমাদের মানবাত্মায় অতি উচ্চতম শক্তিসকল নিহিত রহিয়াছে। কেন না, মানবাত্মা'ত আর কিছু নহে, মানবাত্মাই ঈশ্বরাত্মা—আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু। যে কামক্রোধাদি রিপুগণের উত্তেজনায় আমি আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যে মায়ামোহের আবরণে আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, যদি একবার সাধনাদ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারি, যদি একবার কঠোর আত্মসংযমদ্বারা সেই মায়ামোহের আবরণ অপসারিত করিতে পারি, তবে আমার আত্মার শক্তিসকল পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আমার আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপে জাগিয়া উঠিবে। তাই বসিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইয়া বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন—"ইন্দ্রিয়মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ তপস্যাই ব্রহ্মত্বলাভের কারণ।" বিশ্বামিত্র কি সাধনপ্রণালী অবলম্বনে কামক্রোধ-লোভমোহাদি রিপুদিগকে দমন করিয়া তাঁহার আত্মায় গূঢ়ভাবে নিহিত বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান, শম-দম-তিতিক্ষাদি গুণ বিকশিত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু তপঃসাধনের জন্য সংসারত্যাগপূর্ব্বক বনগমন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ হয় না। ভগবান্ মনু বলেন -"ব্রাহ্মণের জ্ঞানোপার্জ্জন তপস্যা, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষণ তপস্যা, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্যাদি তপস্যা, শূদ্রের সেবাবৃত্তি তপস্যা। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি সেই পথে থাকিয়াও তপস্যা করিতে পারেন। তপঃসাধনকে গীতায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—শারীর তপ, বাঙ্ময় তপ এবং মানস তপ।

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥"

১৭শ অধ্যায়, ১৪—১৬।

'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং সাধুব্যক্তির পূজা, শৌচাচার, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, ইহাকে শারীর তপ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিত বাক্য কথন, এবং বেদাধ্যয়ন করাকে বাঙ্ময় তপ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা (সর্ব্বলোকহিতৈষিতা), মৌন (নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা না করা), আত্মবিনিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, ইহাকে মানস তপ বলে।'

এই গীতোক্ত তপঃসাধন গার্হস্থ্যাশ্রমের সম্পূর্ণ উপযোগী। ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, দেবদ্বিজগুরুভক্তি, শাস্ত্রাভ্যাস, চিত্তশুদ্ধি, আত্মনিগ্রহ—এই সকল সাধনই তপস্যা। এই সকল সাধনদ্বারা আত্মার অতি উচ্চতম শক্তিসকলের স্ফুরণ হইয়া থাকে, এবং ক্রমশ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়। তবে যে সকল পূর্ব্বতন মনীষী কেবল মনুষ্যত্বলাভে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন, তাঁহারা সহস্রবাধাবিঘ্নসঙ্কুল সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা যেমন অতি উচ্চ ছিল, তেমনি তাঁহাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভরও খুব বেশী ছিল। তাঁহারা আত্মজ্ঞানলাভের জন্য কোন দেবতার উপাসনা করিতেন না, "তুমি আমাকে ত্রাণ কর" বলিয়া কোন দেবতার কৃপাকটাক্ষলাভের জন্য তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতেন না। সে যুগের সাধনা ছিল জোরজবরদস্তীমূলক। "তুমি দেবতা, আমাকে অভীষ্টবর প্রদান করিবে না? আচ্ছা দেখিব আমি, তুমি কোথাকার কেমন দেবতা। আমি এই তপস্যায় বসিলাম।" তাঁহারা ঘোরতর কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাই তাঁহাদের সাধনায় এতদূর জোরজবরদস্তী ছিল। তাঁহাদের এইরূপ দুর্দ্দমনীয় আত্মবল ছিল বলিয়াই তাঁহাদের তপস্যায় ইন্দ্র ভীত হইতেন, ধরাতল কম্পিত হইত, ব্রহ্মা স্বয়ং বরপ্রদানের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতেন। এইরূপে তাঁহারা তপোবলে আত্মবিজয়ী হইয়া পরে বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল—কিন্তু তাহা পাশববলের দ্বারা নহে,—maxim gun কিংবা torpedo boat এর দ্বারা নহে, তাহা তাঁহাদের তপোলব্ধ বিশ্বগ্রাসী হৃদয়ের প্রীতিপ্রবাহদ্বারা। তাঁহারা তপঃসাধনাদ্বারা "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার ফলে একদিন ভারতবর্ষে যে অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে "সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা।" যে "সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা"র দোহাই দিয়া একদিন ফরাসীজাতি নরশোণিতে ধরাতল প্লাবিত করিয়াছিল; আমি সে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতেছি না। যে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদিন দৈত্যকুমার প্রহ্লাদ দৈত্যশিশুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ! সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্থ ।"

'হে দৈত্যশিশুগণ, তোমরা সাম্য অবলম্বন কর—সাম্যই বিষ্ণুর প্রকৃত আরাধনা', আমি সেই সাম্যের কথা কহিতেছি। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া প্রত্যাগত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ?"

'রাজা মিত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন, আর শত্রুর সঙ্গেই বা কিরূপ ব্যবহার করিবেন ?'

তদুত্তরে দৈত্যকুমার বলিলেন—

"সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥"

'হে পিতঃ, জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দ যখন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র আর শত্রু, এরূপ কথা কেন ? ভগবান্ বিষ্ণু তোমাতে আছেন, আমাতে আছেন, অন্যত্রও আছেন। সুতরাং ইনি মিত্র, উনি শত্রু, এরূপ ভেদ-জ্ঞান থাকিবে কেন ?'

যে সাম্য জগন্ময়ের জগতে শত্রুমিত্রের ভেদ দেখিতে পায় না, তাহাই প্রকৃত সাম্য। ফরাসীজাতি যে সাম্যের সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অহঙ্কারমূলক—তাহার মূলমন্ত্র হইতেছে, "তুমি যে মানুষ, আমিও সেই মানুষ; তোমার যে অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার থাকা উচিত।" আর এই ঋষিগণের তপস্যালব্ধ সাম্য অহঙ্কারবিনাশের ফল; "তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময়, তোমা হইতে আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই"—এইরূপ ধারণামূলক। এইপ্রকার সাম্যসাধনা দ্বারাই মৈত্রীর রাজ্য, প্রীতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্র সকলেই স্বাধীনতালাভ করে, কেহ কাহাকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে না। তখন সকলেই সকলকে এক বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে দর্শন করে। এইরূপে সাম্য হইতে মৈত্রীর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, মৈত্রী হইতে স্বাধীনতার বিকাশ হয়। আজ maxim gun ও torpedo boatএর যুগে যে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা কবির স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা এবং William Stead, Count Tolstoy প্রমুখ লোকহিতব্রত মহাত্মাদিগের হৃদয়ের শুভ আশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু, একদিন ব্রাহ্মণগণের তপোবলে ভারতবর্ষে সেই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাস্তববিকাশ (realisation) হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই বিশ্বব্যাপী প্রীতির অনুশীলনে এদেশে কখনও patriotismশ্রেণীর জাতীয়ভাবের বিকাশ হইতে পারে নাই। বিশ্বব্যাপী ভাস্করের করে খদ্যোতিকার উদ্ভব কখনও সম্ভবপর নহে। যিনি বিশ্বের মিত্র—যিনি বিশ্বামিত্র—তাঁহার হৃদয়ে আমার এইটুকু সীমানাসহরঙ্গচিহ্নিত ভারতবর্ষ, আমার এইটুকু সীমানাসহরঙ্গ-চিহ্নিত ইংলণ্ড, আমার এইটুকু সীমানাসহ-রঙ্গচিহ্নিত ফ্রান্স, ইত্যাকার সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। Patriot-

ism সেই সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ধারণার ফল। Patriotismএর মূলে স্বার্থপরতা ও পরহিংসা। বিশ্বহিতব্রত হিন্দুর হৃদয়ে তাই কখনও Patriotism স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, সংস্কৃতসাহিত্যে Patriotism-শব্দের একটি প্রতিশব্দও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে সমগ্র বিশ্ব—স্থাবরজঙ্গম-কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষি-মনুষ্যাদি-সংবলিত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড—এক পবিত্র প্রীতির দিব্যদ্যুতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাই আদর্শব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্রের বিশ্বব্যাপী হৃদয়ে শব্দব্রহ্মের স্ফুরন্ত তেজ—ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার মূলমন্ত্র সাবিত্রীমন্ত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

সেই মহামহিমমণ্ডিত মহাত্মাদিগের বংশধরগণ আমরা—আজ আমাদের সে তপোবল নাই, সে তেজোবীর্য্য নাই, সে জ্ঞানৈশ্বর্য্য নাই—আমরা এখন অধঃপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত। যে সাধনবলে তাঁহারা মনুষ্যত্ব হইতে ঋষিত্বে, ঋষিত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদের সে সাধনা ভুলিয়া গিয়াছি। দেবত্ব, ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ত অতি দূরের কথা, আমরা এখন মনুষ্যত্ব হারাইয়া বসিয়াছি। তাই আজ সেই মনীষিগণের সাধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও আমরা সামান্য পার্থিব সুখসুবিধার জন্য পরমুখাপেক্ষী, অন্যের কৃপাভিখারী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বরং ত্রিশঙ্কুর সহিত আমাদিগকে তুলনা করা যাইতে পারে।

ইংরেজজাতি আমাদের রাজা, ইংরেজ বিজেতা, আমরা বিজিত। কিন্তু কোন কোন সদাশয় ইংরেজ সে ভাব ভুলিয়া গিয়া আমাদের সুশিক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশ্ববিশ্রুত শিল্প-সাহিত্য, দর্শনবিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমরা ইংরেজের সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে নানাপ্রকার খেয়াল জাগিয়া উঠিল। ইংরেজজাতি তাঁহাদের মহাগৌরবান্বিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (Political independence) কতশতাব্দীব্যাপী আন্দোলন, যুদ্ধবিগ্রহ ও শোণিতপাতের ফলে পাইয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া, ত্রিশঙ্কু যেমন সশরীরে স্বর্গলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরা তদ্রূপ ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া British citizenship লাভের জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বসিষ্ঠঋষি এবং তাঁহার পুত্রগণ অর্থাৎ ইংরেজরাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার অধীনস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমরা তখন কয়েকজন মহামনস্বী উদারচেতা ইংরেজবিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহারা আমাদের সশরীরে স্বর্গগমনের জন্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহা হইতেছে Indian National Congress—জাতীয় মহাসমিতি। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ লইয়া যেমন ঋষিদের মধ্যে একটা দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছিল, এই যজ্ঞ লইয়াও আমাদের রাজর্ষিগণের মধ্যে তেমনি একটা দলাদলি আরম্ভ হইল। সেই দলাদলির ঢেউ আধুনিক স্বর্গধাম বিলাতভূমি পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। সেখানেও ইহা লইয়া দেবতাদের মধ্যে একটা দলাদলি উৎপন্ন হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন

লাভ হয় নাই। বিশ্বামিত্রের দল এপর্য্যন্ত পরাজিত হইয়াই আছেন। কলির বিশ্বামিত্রের ততদূর তপোবল নাই যে, ত্রিশঙ্কুগণের জন্য একটি নূতন স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিবেন। তবে তাঁহাদের ক্ষমতা যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। ত্রেতার বিশ্বামিত্র তপোবলে যেমন কতকগুলি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ত্রিশঙ্কুকে সেই-কৃত্রিম-নক্ষত্ররাজি-পরিবৃত হইয়া মনে মনে স্বর্গসুখ কল্পনা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কলির বিশ্বামিত্রদের প্রভাবেও আমাদের ত্রিশঙ্কুগণের মনস্তুষ্টির জন্য কয়েকটি নক্ষত্রভূষণ প্রদত্ত হইয়াছে— যথা C. S. I., C. I. E, Hon'ble, Rai Bahadur &c. &c.। আমাদের ত্রিশঙ্কুগণ এই সকল কৃত্রিম নক্ষত্রালোকে তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অন্ধকার কতকটা দূর করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু যাহাদের স্বর্গগমনের জন্য, যে জনসাধারণের হিতকামনায়, এই মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে "যে তিমিরে" ছিল, এখনও "সেই তিমিরে" ডুবিয়া রহিয়াছে। বরং সম্প্রতি এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে জনসাধারণের অজ্ঞানতিমির আরও ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জাতীয়-মহাসমিতি-সমধিষ্ঠিত আবেদনকারিগণের সক্রোধ প্রার্থনায় ইংরেজরাজ কিছুমাত্র কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, ইহার মধ্যে আর-এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। সে কি? না, কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে লাঠিখেলার ব্যবস্থা। অর্থাৎ জাতীয় মহাসমিতির বাগ্মিগণের বক্তৃতার তেজে আমাদের নির্জ্জীবপ্রাণে জাতীয়তার তড়িচ্ছটাস্ফুরণ হইবার যেটুকু বাকী থাকিবে, তাহা নিশ্চয়ই লাঠির ঠুকাঠুকীশব্দে পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিবে। আর সেই লাঠিধারী বীরবৃন্দের শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমবার্ত্তা ডেলিগেট্‌দিগের মুখে দেশবিদেশে প্রচারিত হইলে অতি অল্পকালমধ্যেই ভারতব্যাপী একটি অভিনব জাতীয়তা সৃষ্ট হইবে। যাহা হউক, ভিক্ষার্থিগণের সঙ্গে লাঠিয়াল দেখিয়া গৃহস্বামী ভয়ে ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে পাছে ভিক্ষালাভের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কাতেই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক, সেই লাঠিখেলার প্রস্তাবটি মহাসমিতিতে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইয়া থাকিলেও, শরীরস্থ বলদ্বারা হৃদয়স্থ সাহসের অভাবপূরণ হইতে পারে, এই আশ্বাসে ও বিশ্বাসে, এখনও স্থানে স্থানে সেই বীরত্বস্ফুরণকারী মহামন্ত্রের সাধনা পূরাদমে চলিয়াছে;—বোধ হয় এই আশায় যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইংরেজ সেই লাঠির ভয়ে bag and baggage এবং গোলাগুলি লইয়া রণতরি-আরোহণে ভারতবর্ষ হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে! সে যাহা হউক, আপাতত এই লাঠিধারী বীরগণ হইতে ইংরেজ অপেক্ষা দেশীয় নিরীহ ভদ্রলোকদিগেরই ভয়ের কারণ বেশী। এই সকল বীরগণের সুপ্ত-শৌর্য্য উত্তেজিত হইলে যখন তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন রেলের গাড়িতে কিংবা গড়ের মাঠে তাঁহাদের উপযুক্ত দুর্বিনীত ইংরেজশীকার না মিলিলে, তাঁহাদের তৈলাক্ত লাঠি ও বজ্রকঠোর ঘুসি যে অতি

সামান্য কারণে অনেকানেক দেশীয় নিরীহ ভালমানুষের প্লীহাবিদারণ কিংবা মস্তক চূর্ণ করিতে অগ্রসর হইবে না, তাহার একরার-নামা কোথায়?

বর্ত্তমান সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক কিংবা লাঠিখেলার পক্ষপাতী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর মাতৃভূমির হিতকামনায় এই সকল আন্তরিক উদ্যমকে আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। কোন্ শিক্ষিত ভারতসন্তানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নয় যে, ভারতবাসিগণের আবার জাতীয় অভ্যুদয় হউক, আবার ভারত প্রবুদ্ধ হউক? কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের এই জাতীয়জীবনের মুমূর্ষুদশায় তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহাকে বাঁচাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যে বিকারগ্রস্ত রোগীর নাড়ী দমিয়া যাইতেছে—pulse sink করিতেছে,—তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যদি তাড়িতযন্ত্র (battery) লাগান হয়, তবে যে অঙ্গে সেই তড়িৎপ্রবাহ সংযোজিত হইবে, কেবল সেই অঙ্গই ক্ষণকালের জন্য নড়িয়া উঠিবে, তাহাতে রোগী জীবনী শক্তি লাভ করিয়া আবার দাঁড়াইয়া উঠিবে না। মৃত ভেকের পায়ে তড়িৎপ্রবাহ স্ফুরিত হওয়াতে, সেই পা'টা কেবল ক্ষণকালের জন্য নাচিয়া উঠিয়াছিল. কিন্তু তাহাতে সে ভেক ত আর বাঁচে নাই। আমাদের জাতীয়জীবনের পুনর্গঠন করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে, তাহার pulse কোন্‌খানে; পরে সেই pulse ধরিয়া, রোগীর ধাতুর অনুকূলে, উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে—সেই pulse যাহাতে rise করে—আবার যাহাতে ধাত আসে—সেজন্য আবশ্যক হইলে উত্তেজক ঔষধ (stimulant) দিতে হইবে।

এই বিশাল ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু-মুসলমান-শিখ্-পারসী প্রভৃতি নানাজাতি বাস করিতেছি—আমরা সকলেই একদেশ-বাসী এবং একপ্রকারের শাসনাধীনে থাকিয়া পরস্পরের সুখদুঃখভাগী। ইহাই আমাদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবন্ধনের প্রকৃষ্ট সূত্র, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় এই সূত্রে জাতীয়তা-বন্ধনের কোন সম্ভাবনা দেখি না। ইংরেজশাসনের দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য ভিন্নজাতীয় এবং ভিন্নদেশীয় লোকমণ্ডলী সমবেত হইলেই যে তাহাদের মধ্য হইতে একটা জাতীয়তা জমাট বাঁধিয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা বৃথা। আমরা কেবল শাসনকর্ত্তৃগণের দোষপর্য্যা-লোচনাদ্বারাই আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের পর্য্যবসান হইল মনে করি,—জাতীয়তাসৃষ্টির জন্য আমাদের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা অর্জ্জন ও অনুশীলন করিবার চেষ্টা করি কই? যাহাদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে একতা নাই, স্বগ্রামবাসিগণের মধ্যে একতা নাই, সজাতীয় লোকের মধ্যে একতা নাই—যাহাদের মধ্যে গ্রাম্যস্কুল লইয়া দলাদলি, সহরের মিউনিসিপালিটি লইয়া দলাদলি, ডাক্তারখানা লইয়া দলাদলি, সাহিত্য-

সমিতি লইয়া দলাদলি—যাহারা সুশিক্ষিত হইয়াও বারোয়ারির আমোদপ্রমোদের জন্য সহস্র সহস্র টাকা উড়াইয়া দিতেছে, অথচ সাধারণহিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কিংবা ডাক্তারখানার চাঁদা স্বাক্ষর করিয়া দিতে অনিচ্ছুক—এইপ্রকার লোকমণ্ডলীর মধ্যে শুদ্ধ এক বিশালদেশবাসী ও এক ইংরেজ সম্রাটের শাসনাধীনে থাকিয়া একপ্রকারসুখভাগী এবং একপ্রকারদুঃখভোগী বলিয়া কি কখনও একতাবন্ধন হইতে পারে, না জাতীয়তার গঠন হইতে পারে? বস্তুত আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কখনও স্বদেশপ্রীতিমূলক জাতীয়বন্ধন ঘটে নাই। "আমরা একজাতি"—"আমাদের এক দেশ" বলিয়া সর্ব্বজনীন জাতীয়ভাব কখনও হিন্দুজাতির মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং এইরূপ জাতীয়তাসৃষ্টির পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব গঠিত হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি এবং জাতীয় উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সাধুতা (honesty), ঐকান্তিকতা (sincerity), কর্ত্তব্যনিষ্ঠা (devotion to duty), সৎসাহস (moral courage), একতা (unity), স্বার্থত্যাগ (self-sacrifice) ইত্যাদি মনুষ্যোচিত গুণগ্রাম আমাদের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাশক্তি জমাট বাঁধিবে। কিন্তু এই সকল গুণ লাভ করিতে হইলে সাধনা চাই, তপস্যা চাই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যেকঠোর সাধনাবলে তাঁহার আত্মার অন্তস্তলে লুক্কায়িত উচ্চতম শক্তিসকলের বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও সেইরূপ কঠোর সাধনা, কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আমাদের বর্ত্তমান যুগের আদর্শ;—তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর আত্মসংযমই আমাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। তাঁহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া আজ আমাদিগকে আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরমোদার বিশ্বপ্রীতির আদর্শে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ধর্ম্মগত ভেদ ভুলিয়া-গিয়া এই হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান, শিখ-খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জাতি মিলিয়া এক অভিনব বিশাল মহাজাতি গঠন করিতে হইবে। এইরূপে তপস্যাদ্বারা আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং জাতীয়তাশক্তির স্ফুরণ হইলে—লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেমন একদিন বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ্যপদবীতে বরণ করিবার জন্য স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গুণগ্রাহী ইংরেজজাতিও তদ্রূপ আমাদিগকে সসম্ভ্রমে উচ্চতম রাজনৈতিক স্বাধীনতার মাল্যচন্দন পরাইবার জন্য অগ্রসর হইবেন—তখন আর আমাদিগকে বিলাত পর্য্যন্ত গিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় ইংরেজের দ্বারে দ্বারে ভারতের দুঃখকাহিনী কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

বঙ্গের মুখশ্রী যাঁহা হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে, সেই মহাকবি দীপকরাগে গাহিয়াছেন—

"ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,

আপনি আসিয়া ভক্তরণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
"এখন সেদিন না হবে রে আর
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন ॥"

তরবার খুলিলেই যদি ভারত-উদ্ধার হইত, তবে এতদিন যাত্রাগানের ভীমার্জ্জুন কিংবা থিয়েটারের প্রতাপাদিত্যগণের দ্বারা কবে ভারতবাসী স্বাধীন হইত। যদি বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে কিংবা কবিত্বের উদ্দীপনায় ভারত-উদ্ধার হইত, তবে দেশে এত বাগ্মী ও বক্তা থাকিতে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? আমরা কতকাল ধরিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বীরগণের ঐতিহাসিক কাহিনী আলোচনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের মনে বীরত্ব জাগিয়া উঠে না কেন? ভারত-উদ্ধার এখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়া আমার বিবেচনায় আমাদিগকে একবার আত্ম-উদ্ধারে মনোনিবেশ করিতে হইবে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, পূর্ব্বতন আর্য্যগণের তপস্যার ফলে এখনও আমাদের মধ্যে সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেই আত্ম-উদ্ধারের বীজ কোথায়? হিন্দু-জাতির ধর্ম্মপ্রবণ চিত্তে। ধর্ম্মের উৎকর্ষদ্বারাই একদিন আমাদের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব, সামাজিক একতা এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, আবার সেই ধর্ম্মের অপকর্ষদ্বারাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ধর্ম্মই হিন্দুর জীবনবায়ু, ধর্ম্মই হিন্দুর জাতীয়জীবনের pulse। তাই এই নিদারুণ অধঃপাতের দিনেও এক ধর্ম্মের নামে সমগ্র হিন্দুজাতির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, একমাত্র ধর্ম্মের নামে প্রত্যেক হিন্দুর ধমনীতে ধমনীতে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া থাকে, একমাত্র ধর্ম্মচুম্বকের আকর্ষণবলে সমাজের বহুধাবিচ্ছিন্ন চির-মরিচা-পড়া লৌহকণাগুলি ছুটিয়া আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয়। এই ধর্ম্মের আকর্ষণে সেদিন বিহার-অঞ্চলে হিন্দুজন-সাধারণ গোহত্যানিবারণের জন্য মুসলমানের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এই জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে এখনও সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী একমাস-দুইমাসের পথ হাঁটিয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুর্গম তীর্থসকল দর্শনের জন্য ছুটিয়া যায় এবং পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত ও কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় অম্লানচিত্তে প্রাণবিসর্জ্জন দেয়। এক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন্ বস্তুর জন্য হিন্দুজাতি এ-ভাবে জীবন দিতে প্রস্তুত? হিন্দুজাতি কোন্ মহাপুরুষকে সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করিবে? তাঁহাকে নহে,—যিনি মর্ম্ম-স্পর্শিনী জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশহিতৈষণা-সমুদ্দীপক বক্তৃতা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি অগাধজ্ঞান, প্রখরবুদ্ধি ও সর্ব্বদশিভূয়োদর্শনবলে কূট রাজনৈতিক সমস্যাসকলের মীমাংসা করিতে পারেন। তাঁহাকে নহে,—যিনি শাণিত-কৃপাণ-করে অগণন-শত্রুদল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে জীবনবিসর্জ্জন দিতে পারেন। আজ যদি যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতাপ্রবর্ত্তক মহাবীর ওয়াশিংটন্ কিংবা ইটালীর দেশহিতৈষী বীরশ্রেষ্ঠ ম্যাট্‌সিনি, কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর

গৌরবরবি মহাত্মা গ্লাড্‌ষ্টোন্ আসিয়া আমাদের দেশে উপস্থিত হন, তবে হিন্দুজাতি তাঁহাদিগকে চিনিবে না। হিন্দুজাতির নেতা ছিলেন তপস্বিরাজ শ্রীরামচন্দ্র, ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক শুদ্ধোদন, পরমযোগী জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য। এরূপ কোন তপঃপরায়ণ মহাপুরুষ ভিন্ন কেহ কখনও হিন্দুজাতির নেতা হইতে পারেন নাই, এবং বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় যদি কখনও আবার হিন্দুজাতির অভ্যুত্থান ঘটে, তবে সে এইরূপ কোন তপস্বী মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবেই ঘটিবে। আজ হিন্দুজাতি একজন প্রকৃত নেতার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া হাহাকার করিতেছে! সে শুভদিন কবে আসিবে,—যেদিন সেই মহাপুরুষের শুভাবির্ভাবে বহুযুগব্যাপী জীর্ণসংস্কারাভাবে হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অগ্নিময় করসংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে? কবে এই বিশাল ধর্ম্মবিটপীর গাত্রে কালাতায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন-সাম্প্রদায়িক-মতভেদ-বশত যে সকল স্বল্প-আলোকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার অঙ্গবিচ্ছুরিত-দিব্যজ্যোতিঃ-সঞ্চারে পূর্ণমধ্যাহ্নদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইবে, এবং এই জীর্ণশীর্ণ ধর্ম্মতরু নবজীবন লাভ করিয়া জাতীয়তার সজীবস্নিগ্ধ পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইবে?

কিন্তু এইরূপ কোন ধর্ম্মবীরকে আবাহন ও আকর্ষণ করিয়া আনিতে হইলে, আমাদেরও সাধনা চাই, তপস্যা চাই। বহু তপস্যার ফলে মর্ত্ত্যধামে তাঁহাদের শুভাগমন হয়। আমাদের এই দুর্গতির দিনে আমরা যেমন ওয়াশিংটন্, ম্যাট্‌সিনি, গ্লাড্‌ষ্টোন্‌কে চিনিব না, সেইরূপ রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করকেও চিনিব না। বহু সাধনাদ্বারা আমাদিগকে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী স্তরে উন্নীত করিতে পারিলে, তবে আমরা তাঁহাদের মহিমা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব। কঠোর তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে পারিলে, আমরা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিব। মেঘমালায় সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎশিখা কেবল তখনই সনিনাদে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, যখন ভূপৃষ্ঠস্থ তড়িৎশক্তি সমানতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাকে আকর্ষণ করে। সুতরাং মনুষ্যত্বলাভ করিতে হইলে,—জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইলে,—হিন্দুজাতির নেতাকে অভিনন্দন করিতে হইলে, আমাদের হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবীজকে তপস্যাদ্বারা, সংযমদ্বারা, আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। কঠোর তপস্যা ভিন্ন এ জাতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা নাই।

তপস্যাদ্বারা পূর্ব্বকালে কার্য্যসিদ্ধি হইত, এখন কি হয় না? ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখি, আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যেখানে যেখানে তপঃপ্রভাব কিছুমাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই এক একটি জাতীয় অভ্যুত্থানের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন কোন স্থানে বিন্দুমাত্র মিষ্টরস পাইলে পিপীলিকাশ্রেণী তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইয়া সেই মিষ্টরসের আস্বাদে মজিয়া যায়, এমন কি, সেই মিষ্টরসে পুঞ্জীকৃত হইয়া

ডুবিয়া তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করে, সেইরূপ তপস্যা হিন্দুজাতির এতই প্রিয়, ধর্ম্ম হিন্দুজাতির জীবনের অন্তরসের সহিত এতদূর গূঢ় ও গাঢ়রূপে সম্বদ্ধ যে, এই বর্ত্তমান সময়েও যিনি যিনি নিজের জীবনে কিছুমাত্র তপোমাহাত্ম্য বিকশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের একএকটি নেতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া একএকটি সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বর্ত্তমান সময়ে মহাবীর শিবাজীর বৈরাগ্য-দ্যোতক-গৈরিকপতাকা-তলে মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক মহাজাতীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে সন্ন্যাসব্রত শিখগুরুর অধিনায়কতায় ভারতগৌরব শিখজাতির এক বিরাট্ অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। এইরূপে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসসাধন-বলে বঙ্গদেশে এক তুমুল প্রেমতরঙ্গপ্রবাহ ছুটিয়াছিল। এইরূপে তপস্বিপ্রবর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপঃসাধনার দৃষ্টান্তে বর্ত্তমান সময়েও আর্য্যধর্ম্মের এক বিশাল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। শুদ্ধ তপস্যাদ্বারা মানবজীবন কতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহা এই শেষোক্ত মহাপুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। Mr. William Digby তাঁহার "Prosperous British India" নামক গ্রন্থে বলেন—,

"During the last Century the finest fruit of British intellectual culture was probably to be found in Robert Browning, and John Ruskin. Yet they were mere gropers in the dark compared with the uncultured and illiterate Ram Krishna of Bengal, who knowing naught of what we term learning, spake as no other man of his age spoke and revealed God to weary mortals"—(Chap. II.—p. 99).

সেই ত্রেতাযুগে আমরা দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র এক তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মর্ষিপদবীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই ঘোর কলিযুগেও আমরা দেখিতেছি, সেই বলে তপস্যার বলে একটি অশিক্ষিত বিষয়বুদ্ধিহীন শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সামান্য পূজারী ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বলতম প্রদীপ Robert Browning ও John Ruskinকেও দিব্যজ্ঞানের আলোকে নিষ্প্রভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের বাঙালীসমাজেও তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। আজ ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙালীজাতি বুদ্ধিবলে, বিদ্যাবলে এতদূর উন্নত কিসে? এই জাতীয় অধঃপাতের দিনেও আর কোন্ প্রদেশ স্বল্পকালমধ্যে রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমগ্র ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এতগুলি রত্ন (আমি কোন জীবিত মহাত্মার নামোল্লেখ করিতেছি না) প্রসব করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইহার কারণ—এই সকল মহাত্মাদিগের পিতৃপিতামহগণের তপস্যা। বর্ত্তমান

সময়ে অনেক উদ্দামগতি সমাজসংস্কারক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনকে তাঁহাদের সংস্কারপথের বিষদিগ্ধ কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করেন। বাজিকরগণ যেমন তাহাদের ভোজবাজি দেখাইবার পূর্ব্বে আত্মারাম সরকারকে একবার গালি না দিলে তাহাদের ভেল্কিবিদ্যা সিদ্ধ হইল না মনে করে, আমাদের সমাজসংস্কারকগণও রঘুনন্দনকে একবার গালি না দিলে তাঁহাদের সংস্কারচেষ্টা বিফল হইল মনে করেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বাঙালীসমাজ এই মহাত্মার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। উক্ত মহাত্মা মন্বাদিস্মৃতিসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বসঙ্কলনদ্বারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মচর্য্যার পথ সুগম করিয়া-দিয়া হিন্দুসমাজের যে মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীসন্ধ্যাবর্জ্জিত হইয়া এখনও পর্য্যন্ত যে দরোয়ান ও পাচকশ্রেণীতে পরিণত হন নাই,—এখনও যে উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে ক্রমাগত সহস্র সহস্র graduate ও under-graduate বাহির হইতেছেন,—তাহার একমাত্র কারণ রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র। বিগত সহস্রাধিক বর্ষের পরাধীনতার প্রচণ্ড নিষ্পেষণে বাঙালীজাতির মানসিক বৃত্তিনিচয় যে একেবারে ভগ্ন ও দলিত হইয়া যায় নাই, তাহার কারণ রঘুনন্দনের সংগৃহীত বিশুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান-নিয়ম-সংযমের পালনদ্বারা উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মনে পুণ্য ও পবিত্রতার বল সঞ্চিত হইয়া তাহাকে elastic (স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট) করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল কঠোর তপোনিয়ম এতদিন এ জাতিকে জীবিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার স্রোতে এখন সেই সকল সামাজিকস্বাস্থ্যপ্রদ আচার-অনুষ্ঠান ভাসিয়া যাইতেছে। এখন বাঙালীসমাজে আহার-বিহারে, আচার-অনুষ্ঠানে সংযম-সহিষ্ণুতা-শীলতার অভাব ক্রমেই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে সমাজে এক উদ্দাম-উন্মুক্ত স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তাই এখন বাঙালীর মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষের সংখ্যা দিনদিনই বিরল হইতেছে। বাঙালীসমাজ এখন ক্রমেই নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

খুড়া-মহাশয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরতের সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বড় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গগন চক্রবর্ত্তী তামাক খাইতেছেন। ঘরের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পীড়িত, এখনি ডাক্তার আসিবার কথা আছে।

ইঁহারা দুই ভাই, নবীন ও গগন। গ্রামটি নৈহাটির নিকট চন্দ্রদেবপুর। ইঁহারা এখানকার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কিন্তু শুনা যায় নাকি,বৃদ্ধ নবীনের হাতে নগদ দশহাজার টাকা আছে। কেহ বলে ইহা বাজে গুজব, কেহ বলে ইহা সত্য কথা। কিন্তু কেহই সে টাকা স্বচক্ষে দেখে নাই। সে টাকা যে লোহার সিন্দুকটিতে আছে অথবা নাই, সেই সিন্দুকটি-মাত্র সকলে দেখিয়াছে। সেটি বৃদ্ধের শয়ন-কক্ষে অবস্থিত। বৃদ্ধ সর্ব্বদা সেই ঘরে থাকিয়া সিন্দুকটি আগ্‌লাইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র নবকুমার পশ্চিমে চাকরি করে, সে অনেকবার পিতাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধ কখনও যান নাই। সকলে বলে, তিনি সিন্দুকটি ফেলিয়া যাইতে পারেন না।

গগন চক্রবর্ত্তী বসিয়া-বসিয়া নীরবে তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে ডাক্তার-বাবুর লণ্ঠনের আলো উঠানে পড়িল। ডাক্তারবাবু আসিয়া বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশাই, খবর-কি?"

চক্রবর্ত্তী হুঁকাটি নামাইয়া বলিলেন—"ডাক্তারবাবু? এস। খবর ভাল। এখনও বেহুঁস রয়েছেন,—বড্ড জরটা রয়েছে কিনা। কিন্তু নাড়ী বেশ চল্‌ছে এখনও। উঠে এস—একবার দেখ না।"

ডাক্তারবাবু উঠিয়া আসিলেন। চক্র-বর্ত্তী হুঁকাটি সযত্নে দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া দুয়ার খুলিয়া রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। পিল্‌সুজের উপর একটি মাটীর প্রদীপ ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। একখানি লম্বা ও চওড়া তক্তাপোষের উপর মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধরোগী নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পুত্রবধূ সাবিত্রী পায়ে হাত বুলাইতেছে।

ইঁহাদের প্রবেশ করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। গগন চক্রবর্ত্তী প্রদীপটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। ডাক্তার বৃদ্ধের নাড়িপরীক্ষা করিলেন,—থার্ম্মিটার্ দিয়া উষ্ণতা লইলেন। পরী-ক্ষান্তে বলিলেন—"এখনও খুব জ্বর। সে ফিবার্-মিক্‌শ্চার্‌টা খাওয়ান হচ্চে?"

সাবিত্রী তাহার ঘোম্‌টাবৃত মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, হইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন—"আজ সারারাত্রি ওটা দেওয়া হোক্। ভোরের দিকে রিমিশন্ হবার সম্ভাবনা।"

বলিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিলেন। গগনচন্দ্রও তাঁহার সহিত দরজা অবধি যাইলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবুকে খবর দিয়েছেন ?"

"নাঃ, দিই নি। কিছু ভাবনা নেই, দাদা ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন। ওরকম ত হয়ই ওঁর মাঝে মাঝে। নবুকে খবর দিলেই এখনই খরচপত্র করে' বাড়ী আস্‌বে তাই খবর দিই নি।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন "গতিক বড় ভাল বোধ হচ্চে না কিন্তু। আজ পাঁচ-পাঁচ দিন জরটা ছাড়্‌ল না,—ভারি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন। জ্বর ছাড়্‌বার সময় সাম্‌লাতে পার্‌লে হয়।"

গগন বলিলেন—"আরে না না। আমি এতকাল দেখ্‌ছি। কিছু ভয় নেই।"

"দেখা যাক্‌। অনেক বয়সটা হয়েছে কিনা, তাই ভয় হয়।" বলিয়া ডাক্তারবাবু মৃদুমন্দপদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবুর কথাই সত্য হইল,—ভোর-বেলায় প্রাণবায়ু বৃদ্ধের দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইএক মিনিটের জন্য মাত্র তাঁহার চেতনা হইয়াছিল। তখন তিনি শুধু বলিয়াছিলেন—"নবু—নবু এসেছে ?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিলে, পাড়ার লোক দুইট-একটি করিয়া আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই বলিল—"তা বেশ গেছেন, খুব গেছেন। বয়স হয়েছিল, তোমাদের সব রেখে গেছেন,—এ ত ওঁর সৌভাগ্য। তবে নবু কাছে থাক্‌লেই ভাল হ'ত।"

সৎকারের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। সেখানে সত্যচরণ নামে একটি যুবক দাঁড়াইয়া ছিল,—সে নবকুমারের একজন বিশেষ বন্ধু। তাহার হাতটি ধরিয়া গগনচন্দ্র বলিলেন—"তুমি বাবা গিয়ে নবুকে একখানি টেলিগ্রাপ্‌ করে' দাও। আমার আর হাত-পা আস্‌ছে না।"

সত্যচরণ বলিল "আচ্ছা, আমি আপিস্‌ যাবার সময় ষ্টেশন্‌ থেকে টেলিগ্রাপ্‌ করে' দেব এখন।" সত্যচরণ কলিকাতায় চাকরি করে—রোজ নয়টার ট্রেণে আপিস্‌ যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিনটি শোকের মধ্যে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে সকলে দুগ্ধাদি পান করিয়া সকালে সকালে শয়ন করিল। গগনচন্দ্র বিপত্নীক। তিনি একা একঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেক রাত্রি হইল,—গৃহের কুত্রাপি আর কোন সাড়াশব্দ নাই—কেবল গগনচন্দ্র তাঁহার শয্যায় এপাশ-ওপাশ করিতেছেন। শোকটা ইঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিয়াছে বুঝি ? ইহা শোক, না আতঙ্ক ? দুইটি নিকটসম্পর্কীয় বৃদ্ধের মধ্যে একটি মরিলে, অপরটির সহজেই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয় ;—তাঁহার মনে হয়, এই-বার আমার পালা ত আসিল।

যাহা হউক, ক্রমে রাত্রি গভীর হইল। গগনচন্দ্র তখন ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে, অতি সন্তর্পণে, নিজের ঘরের খিলটি খুলিয়া, নগ্নপদে বাহিরে আসিয়া

দণ্ডায়মান হইলেন। জমাট অন্ধকার,—তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়াছে। মাঠের প্রান্তে শৃগাল একটা ডাকিয়া উঠিল। গগনচন্দ্র ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া-থাকিয়া, ধীরে ধীরে বড় ঘরের বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যে ঘরে গতরাত্রে বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে,—সে ঘরটি আজ তালা-বন্ধ। গগনচন্দ্র নিঃশব্দে তালাটা খুলিয়া সেই অন্ধকারঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার বুকটা ছুরুছুরু করিয়া উঠিল। হায় ভ্রাতৃ-স্নেহ!—এতরাত্রে নিদ্রাহীনচক্ষে ভ্রাতা বুঝি ভ্রাতার মৃত্যুশয্যাটি একবার দেখিবার জন্য ও অশ্রুপাত করিবার জন্য আসিয়াছেন!

গগনচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সাবধানতার সহিত ঘরের দুয়ারটি প্রথমে বন্ধ করিয়া-দিয়া একটি দিয়াশালাই জ্বালিলেন। প্রদীপটি জ্বালিয়া, পূর্ব্বকথিত লোহার সিন্ধুকটির নিকট অগ্রসর হইলেন। সিন্ধুকটির উপর হইতে একটি ভাঙা কাঠের হাতবাক্স, একখানি ছিন্ন মহা-ভারত ও কয়েকটি খালি ঔষধের শিশি নামা-ইয়া, সিন্ধুকটি খুলিয়া ফেলিলেন। কয়েকটি কাপড়ের পুঁটুলি তাহা হইতে নামাইবার পর, নীচের দিক্ হইতে পুরাতন-লালচেলী-বাঁধা একটি ছোট পুঁটুলি বাহির হইল। সেইটি খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে তাড়া-বন্দি অনেক নোট্ রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র, সেই ক্ষীণালোকে, সেই মৃত্যুকক্ষে গগনচন্দ্রের মসীকৃষ্ণ মুখমণ্ডলে শুভ্র দন্ত-পংক্তির ছটা ক্ষণকালের জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ত্বরিতহস্তে পুঁটুলিগুলি যথাস্থানে পুনঃ-সন্নিবিষ্ট করিয়া, গগনচন্দ্র সিন্ধুকটি বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাভারত ও ভাঙা-বাক্স ও ঔষধের শিশিগুলি তাহার উপর পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া-রাখিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, দুয়ারে তালা বন্ধ করিয়া, নিজ শয্যাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুয়ারটি বন্ধ করিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া, গগনচন্দ্র শয্যার উপর উপবেশন করিলেন। বালিশের নিম্নে তাঁহার চশ্‌মার খোলটি ছিল। চশ্‌মাটি চক্ষে লাগাইয়া, নোটের তাড়াগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।—কেবল দশটাকার নোট্,—একখানিও নম্বরওয়ারি নোট্ তাহাতে ছিল না। একটি তাড়া খুলিয়া নোট্‌গুলি সাবধানে গণনা করিয়া দেখিলেন,—একশতখানি আছে,—হাজার টাকা। প্রত্যেক তাড়াটি খুলিয়া একে একে গণনা করিলেন, প্রত্যেক-টিতেই হাজার টাকা করিয়া। এরূপ দশটি তাড়া ছিল—দশহাজার টাকা।

একবার গণিয়া তৃপ্তি হইল না,—গগনচন্দ্র নোট্‌গুলি বারংবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে ভোর হইয়া পড়িল। তখন তিনি পুঁটুলিটি নিজের সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া, প্রদীপ নিবাইয়া, ঘরের বাহিরে আসিলেন।

দুইএকটা কাক ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—অল্প অল্প আলো হইয়াছে। গাড়ুটি হাতে করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া, আম-বাগানের ভিতর দিয়া গগনচন্দ্র পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তখনও কোথাও জনমনুষ্যের দেখা নাই। প্রণমেই গগনচন্দ্র, দাদার লোহার সিন্ধুকের চাবিটি, জোরে ছুড়িয়া পুষ্করিণীর মধ্যস্থানে নিক্ষেপ করি-

লেন। তাহার পর হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া গাড়ুতে জল ভরিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইদিন বেলা নয়টার সময় প্রবাস হইতে সদ্যঃপিতৃহীন নবকুমার বাটী আসিয়া পৌঁছিল। সে ইতিমধ্যেই নিজের সাধারণ বেশ পরিত্যাগ করিয়া কাচা পরিয়াছে, পদ নগ্ন করিয়া আসিয়াছে।

নবকুমারের বাড়ী পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল। তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সকলে বলিল—"নবু, কেঁদ না বাবা, চুপ কর। বাপ-মা কি আর লোকের চিরদিন থাকে? এই তোমার খুড়োমশায় রয়েছেন, ইনিই এখন তোমার বাপ হলেন। চুপ কর বাবা।"

প্রতিবেশীরা গৃহ ত্যাগ করিবার সময় পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—"আহা,—গগনচক্রবর্ত্তী বুড়োর চেহারাটা কি হ'য়ে গেছে দেখেছ একদিনে! চোখটোখ সব একবারে ব'সে' গেছে।"

একজন বলিল "আহা, ভাইয়ের শোকটা বড় লেগেছে বামুনের।"—চক্ষু-বসার আসল কারণ যে সারারাত্রি জাগরণ ও মনের অঙ্গনে শয়তানের তাণ্ডবনৃত্য, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না।

যথাসময়ে নবকুমার খুড়ামহাশয়ের সহিত বসিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিল। ভোজনান্তে গগনচন্দ্র মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন, নবকুমার তাঁহার কাছে বসিয়া ছিল। খুড়ামহাশয় বলিলেন—"শ্রাদ্ধশান্তির ত আয়োজন এইবেলা থেকে করতে হবে! টাকাকড়ি কিছু এনেছ?"

নবকুমার বলিল—"টাকাকড়ি আমি কোথায় পাব? বাবার সিন্ধুক থেকে কিছু বেরুতে পারে বোধ হয়।"

"তা দেখ যদি কিছু থাকে।"

"চাবিটা?"

"চাবি? চাবি কোথায়, তা ত বলতে পারি নে।—হয় ত বউমাকে দিয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা কর দেখি।"

নবকুমার গিয়া সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল। সাবিত্রী বলিল—"আমাকে ত দিয়ে যান নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোমরের ঘুনসীতে ছিল দেখেছি। খুড়োমশায় হয় ত খুলে নিয়ে থাকবেন।"

"না,—উনি ত বল্লেন—চাবি কোথায়, কিছুই জানেন না।"

নবকুমার ফিরিয়া-আসিয়া খুড়ামহাশয়কে এই কথা বলিল। তিনি বলিলেন—"তাঁর কোমরে ছিল! তা ত লক্ষ্য করি নি। তবে হয় ত তাঁর সঙ্গে চিতায় উঠেছে।"

নবকুমার একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—"ওটা আপনি লক্ষ্য করলেন না?"

খুড়ামহাশয় হুঁকা নামাইয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন—"আরে বাবা—সে সময় কি আমার চাবি-সিন্ধুক-টাকাকড়ি ভাববার মত মনের অবস্থা ছিল? সে সব তোমরা যার।"

নবকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল। খুড়ামহাশয় ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে নবকুমার বলিল—"তবে এখন উপায়?"

"উপায় আর কি? কামার ডাকিয়ে সিন্ধুক খোলাতে হবে।"

কামার ডাকাইয়া সিন্ধুক খোলান হইল। তাহা হইতে কেবল গুটিত্রিশেক নগদ টাকা আর নবকুমারের পরলোকগতা জননীর খানকয়েক সোনা ও রূপার পুরাতন অলঙ্কার বাহির হইল।

ইহা দেখিয়া নবকুমার ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারও বরাবর মনে বিশ্বাস ছিল যে, তাহার পিতার সিন্ধুকে নগদ দশহাজার টাকা আছে। তাহার মনে বিশ্বাস হইল, খুড়ামহাশয়ই সে টাকা সরাইয়াছেন। অথচ তাহার সাক্ষিসাবুদ কিছুই নাই।

খোলা সিন্ধুকের সম্মুখে নবকুমার বসিয়া ভাবিতেছিল, এমনসময় খুড়ামহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু পেলে?"

সিন্ধুক হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, নবকুমার তাহা দেখাইল। পরে জিজ্ঞাসা করিল—"দশহাজার টাকা ছিল যে, কোথা গেল?"

গগনচন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কত টাকা?"

"দশহাজার।"

খুড়ামহাশয়ের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন—"দশহাজার টাকা! পাগল! কোথা পাবেন তিনি?"

নবকুমার বলিল—"কেন, সকলেই ত বল্‌ত, এই সিন্ধুকে তাঁর দশহাজার টাকা আছে।"

"সকলে ত সব জানে। কেন, দাদা ত সর্ব্বদাই বল্‌তেন, তাঁর এক পয়সাও নেই। তুমি পশ্চিম থেকে যা টাকাকড়ি পাঠাতে, মাঝে মাঝে তাই খরচপত্র কর্‌তেন, আর দু-পাঁচ টাকা জমিয়েছিলেন। হঁাঃ—দশহাজার টাকা! দশহাজার টাকা কি সাধারণ কথা রে বাবা!"

নবকুমার আর কি করিবে। নীরবে মনের সন্দেহ ও রাগ হজম করিয়া, যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অল্পদিন পরেই তাহার ছুটি ফুরাইল,—ভগ্নহৃদয় লইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এতদিন তাহার পিতার সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়াছিল। এবার সাবিত্রীকে সে পশ্চিমে লইয়া নিজের কাছে রাখিবে। স্ত্রীকে বলিয়া গেল, পূজার ছুটি হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে একটা বাড়ী ঠিক করিয়া, পূজার সময় আসিয়া, তাহাকে লইয়া যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার কলিকাতায় আসিল। পুরাতন গহনাগুলি বিক্রয় করিবে, কিছু কাপড়চোপড়ও কিনিবার প্রয়োজন আছে। সারাদিন বউবাজার ও বড়বাজারে ঘুরিয়া আড়াইশত টাকায় গহনাগুলি বিক্রয় করিল। বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে বসিয়া কিছু কাপড় খরিদ করিল। তাহার পকেট্‌-বুকে নোট ছিল, টাকা দিবার জন্য পকেট্‌-বুক্ বাহির করিতে যাইয়া দেখে,—পকেট্‌-বুক্ নাই—জুয়াচোরে কখন্ চুরি করিয়াছে, জানিতে পারে নাই।

বিপদের উপর বিপদ্! সেই পকেট্‌-বুকে তাহার রিটারন্ টিকিটখানি পর্য্যন্ত ছিল,

—আড়াইশত টাকার নোট্‌ ছিল,—খানকতক পুরাতন চিঠিপত্র ছিল - সব গিয়াছে!

দোকানের কাপড় দোকানে রাখিয়া, নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল। আজ পঞ্জাব-মেলে সে কর্ম্মস্থানে ফিরিবে ভাবিয়াছিল,—এমন টাকা নাই যে, নূতন টিকিট কিনিয়া ফিরিয়া যায়।

ভাবিল, পরদিন সত্যচরণ আসিলে, আপিসে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কিছু টাকা ধার লইয়া যাইবে। দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কোনরকমে নবকুমার বাসায় রাত্রিযাপন করিল।

প্রভাতে, তখনও নবকুমার শয্যাত্যাগ করে নাই,—বাসার একটি মোটা বাবু একখানি সংবাদপত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—"নবকুমারবাবু, দেখুন, ঈশ্বর যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। কাল যে আপনার পকেট্‌বুক্‌ চুরি হয়েছিল, সেটা একটা খুব মঙ্গল বল্‌তে হবে।"

নবকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিল -"কেন, ব্যাপারটা কি?"

স্থূলকলেবর যুবকটি সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিলেন—"গতরাত্রে পঞ্জাব-মেল্‌ আশান্‌শোলের নিকট পৌঁছিলে একটি মাল গাড়ির সঙ্গে ভীষণ কলিশন্‌ হইয়া যায়। দুইতিনখানি যাত্রিগাড়ি চূর্ণ হইয়াছে। ড্রাইভার্‌ অত্যন্ত আহত হইয়া হাঁসপাতালে আছে। যাত্রিগণের মধ্যে ছয়জন মৃত ও বাইশজন সাংঘাতিকরকম আহত। মৃতের তালিকা—"

মৃতের তালিকার মধ্যে "নবকুমার চক্রবর্ত্তী"র নামও পাওয়া গেল।

স্থূলবাবুটি বলিলেন—"কিরকম? আপনিও মরেছেন নাকি?"

নবকুমার বলিল—"বোধ হয় আমার নামের অন্য কেউ?"

যুবকটি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি নবকুমারবাবুর ভূত নন ত? কি জানি মশাই, বিশ্বাস নেই।" বলিয়া বাবুটি চলিয়া গেলেন।

এ কথা শুনিয়া নবকুমারের মস্তিষ্কে দুই-একটা কথার উদয় হইল। সে সকাল-সকাল আহার সারিয়া, সত্যচরণের নিকট টাকা ধার করিয়া, আশান্‌শোলে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া পুলিস্‌-আফিসে সন্ধান লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"একজন নবকুমার চক্রবর্ত্তী বলে' যে মরেছে—আপনারা তাঁর নাম জান্‌লেন কি করে'?"

দারোগা বলিল—"তার পকেট্‌ থেকে এই পকেট্‌বুক্‌টি বেরিয়েছে।"

নবকুমার দেখিল, তাহারই পকেট্‌বুক্‌—তাহাতে তাহার নোট্‌, চিঠি, রিটারন্‌টিকিট, সবই রহিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই;—সেই জুয়াচোরই তবে মারা পড়িয়াছে। পাপের এরূপ হাতে হাতে প্রতিফল আজকাল প্রায়ই দেখা যায় না।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

"আমি নবকুমারবাবুর একজন বন্ধু।"

"লাশের কি হবে? অ্যাক্‌সিডেণ্টের পর আমরা খবরের কাগজে টেলিগ্রাফ করেছি। লাশের আত্মীয়রা এসে কেউ জ্বালাবার বন্দোবস্ত করে ত কর্‌বে, নইলে আমরা পুঁতে ফেল্‌ব।"

নবকুমার একবার ভাবিল,—পুঁতিয়াই ফেলুক। তাহার মস্তকে এই সময়ে একটা মৎলব পাকা হইয়া আসিতেছিল। ভাবিল, যদি সংবাদ পাইয়া খুড়ামহাশয় আসেন, ত লাশ দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, আমি নহি।

দারোগার নিকট লাশ জ্বালাইবার অনুমতি চাহিল। দারোগা বলিল—"আর এ টাকাকড়ি? লাশের ওয়ারিশান্ কে?"

"লাশের এক স্ত্রী আছে, খুড়া আছে। স্ত্রী ওয়ারিশ। খুড়াকে খবর দিলে আসিয়া টাকা লইয়া যাইবে।"

দারোগা খুড়ার ঠিকানাদি নোট্ করিয়া লইল। লাশ জ্বালাইয়া নবকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। স্কুলবাবুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশাই? খবর কি?"

নবকুমার গম্ভীরভাবে বলিল—"গিয়ে দেখ্লাম,—আমি নই,—আর একজনই মরেছে বটে!"

বাবুটি বলিলেন—"তবু ভাল।"

পরদিন সত্যচরণের আপিসে গিয়া নবকুমার তাহার সঙ্গে দেখা করিল। শুনিল, যদিও পল্লিগ্রামে দৈনিক কাগজ যায় না, তথাপি লোকমুখে বাটীর লোক তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছে। সত্যচরণের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন-পরামর্শ করিয়া নবকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যাকাল,—গগনচন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতেছেন। পাড়ার দুইচারিজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। গতকল্য নবকুমারের শ্রাদ্ধ হইয়া গেছে। বৃদ্ধের শ্রাদ্ধ যেমন ঘটা করিয়া হয়, যুবকের শ্রাদ্ধ সেরূপ হয় না। গগনচন্দ্র আশানশোল হইতে নবকুমারের যে আড়াইশত টাকার নোট্ আনিয়াছিলেন,—তাহারই মধ্যে হইতে কেবল পঞ্চাশটি টাকা খরচ করিয়া শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। বাকী দুইশত টাকা নবকুমারের বিধবাকে দিয়াছেন।

সাবিত্রী যখন সধবা ছিল, তখন সর্ব্বত্র তাহার যে একটা সুনাম ছিল,—তাহাতে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। যেদিন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসে, সেইদিনমাত্র সে অত্যন্ত কাঁদাকাটি করিয়াছিল। রাত্রে সত্যচরণের স্ত্রী আসিয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। পরদিন হইতে সে মুখখানি বিমর্ষ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সদ্যোবিধবার যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুই দেখা যায় না। প্রায় রোজই দ্বিপ্রহরে সত্যচরণের স্ত্রীর কাছে যায়। এ অবস্থায় এরূপ করিয়া পাড়া-বেড়ানো কি তাহার উচিত? এরূপ অস্বাভাবিক বালবিধবা ত হিন্দুগৃহে প্রায় দেখা যায় না।

সমবেত বৃদ্ধগণের মধ্যে হুঁকাটি নিয়মিতরূপে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। এ সভাটি অদ্য প্রায় নীরব, কেবল মাঝে কেহ কেহ বলিয়া উঠিতেছেন—"সংসার অনিত্য, সকলই মায়া!"—কেহ বা বলিতেছেন, "আহা নবকুমার বড় ভাল ছেলে ছিল;—আজকালকার দিনে ওরকম প্রায় দেখা যায় না।"

একটু পরে বাহিরে দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত পরে, বাড়ীর চাকর চিনিবাস, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া, বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ

করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু দুইবার বলিল—"কত্তা কত্তা।" তাহার মুখে আর কোন বাক্যনিঃসরণ হইল না,—লোকটা সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হইয়া, প্রচলিত উপায়ে তাহার মুখে জল দিয়া, তাহাকে পাখা করিয়া, ক্রমে তাহার চেতনা-সম্পাদন করিলেন। ক্রমে লোকটা সুস্থ হইতে লাগিল। সকলে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে চিনিবাস, অমন কর্‌লি কেন?"

চিনিবাস তখন ভয়ে শিহরিয়া বলিল—"রাম রাম রাম! ভূত কত্তা।"

উহার মধ্যে যে বৃদ্ধটি বাল্যকালে কিঞ্চিৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"দের বেটা চাষা—ভূত কি? ভূত আছে নাকি?"

চিনিবাস চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল "ভূত নাই! ঐ পুকুরধারে বাঁশতলায় দেখগা ঠাকুর।"

অনেক প্রশ্নাদির পর ক্রমে ক্রমে চিনিবাস বলিল, কিছু পূর্ব্বে যখন সে পুকুরে বাসন মাজিয়া ফিরিতেছিল, তখন সেই পুকুরের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের তলায় অন্ধকারে দেখিল—আপাদমস্তক শাদা কাপড়ে ঢাকা একটা-কি বেড়াইতেছে। নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পদার্থটা কাছে আসিল,—ঠিক ৺নবকুমারের মত চেহারা,—আর বলিল "ওরে চিনে,—একবার খুড়োমশায়কে ডেকে দিতে পারিস্?"—তাহা শুনিবামাত্র চিনিবাস সমস্ত বাসন ও পাথরবাটী সেখানে ফেলিয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়াই খুড়ামহাশয় রামনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"ঠিক দেখেছিস্?"

"ঠিক না ত কি বেঠিক দেখেছি কত্তা। ওরে বাবারে, আর আমি সন্ধেবেলা বাসন মাজ্‌তে যাব না।"

পূর্ব্বোক্ত নাস্তিকপ্রকৃতির বৃদ্ধটি বলিলেন—"চক্রবর্ত্তিমশায়, ঐ কথা আপনি বিশ্বাস কর্‌ছেন? বেটা অসাবধানে বাসনগুলো ভেঙে ফেলেছে—তাই এসে ঐ একটা ওজর কর্‌ছে।"—কিন্তু বক্তার হৃদয়ের ভিতরটা গোপনে দুর্‌দুর্ করিতে লাগিল।

সে সন্ধ্যা ত কাটিল। তাহার পর, তিন-চারিদিন ধরিয়া, পাড়ার ভদ্রলোকেরা আসিয়া গগনচক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ দিলেন, কেহ দীঘির ধারে, কেহ ভাঙা শিবমন্দিরের নিকট, কেহ অন্য কোথাও, "নবকুমারকে" দেখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক বৃদ্ধটিকে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইতে দেখা যায় না।—অন্যান্য বৃদ্ধেরা গগনচক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন "শাস্ত্র ত মিথ্যে হবার নয়। অপঘাতমৃত্যুটো হ'ল কিনা,—ও-রকম ত হবারই কথা। বছরটা পূরুক, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ডি দিইয়ে দাও, উদ্ধার হ'য়ে যাবেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর খুড়ামহাশয় পুষ্করিণীর তীর হইতে মুখ ধুইয়া, জলভরা গাড়ুটি হাতে করিয়া, আমবাগানের ভিতর দিয়া ফিরিতেছিলেন। সহসা এক শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখটি ছাড়া সমস্ত গাত্র বস্ত্রে আবৃত ছিল। আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র

সে বলিল—"খুঁড়োমশায়,—সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা—"

আর শুনিবার পূর্ব্বে, খুড়ামহাশয় সেই-খানে গাড়ু আছাড়িয়া-ফেলিয়া "রাম রাম" শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালাইলেন।

পরদিন অমাবস্যা,—সন্ধ্যার পর খুড়া-মহাশয় আর বাটীর বাহির হইলেন না। রাত্রি নয়টার সময় আহার করিয়া শয়ন করিলেন। যখন তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন,—রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়ামহাশয়ের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন—"কে - ও ?"

অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল—"আমি নঁবকুঁমার।"

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

ভূত বলিল—"সেঁ দঁশহাঁজার টাঁকা আমার বঁউকে যঁতদিন না দিঁচ্চ—তঁতদিন রোঁজ আঁস্‌ব তাঁগাদা কঁর্‌তে—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব—রোঁজ আঁস্‌ব।"

বলিয়া নবকুমার চুপ করিল ভূতটি যে কে, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই অবশ্য বুঝিয়াছেন। খুড়ামহাশয়ের নিশ্বাস তখন ঘনঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। নবকুমার তখন খোলা জানালার কাছে গিয়া, তাহার একটি গরাদে কৌশলে সরাইয়া, নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহিরে কিয়দ্দূরে সত্যচরণ অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সত্যচরণ আপিস হইতে ফিরিয়া-আসিয়া নবকুমারকে সংবাদ দিল,—খুড়ামহাশয় তাহারই ট্রেণে কলিকাতায় গিয়াছিলেন,—সাবিত্রীর নামে দশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ কিনিয়া আনিয়াছেন। সত্যচরণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "এ টাকা কোথা থেকে এল ?"

গগনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"টাকাটা ছিল আমার দাদার। সকলে যে বল্‌ত, তাঁর দশ-হাজার টাকা আছে তা দেখ্‌ছি মিথ্যে নয়। কিন্তু তাঁর লোহার সিন্দুক থেকে বেরোয় নি। কাল্‌কে রাত্রে হঠাৎ তাঁর একটা পুরোণো টিনের বাক্স খুলে দেখি, একটুক্‌রো লাল চেলীতে মোড়া দশহাজার টাকার নোট্। দেখে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'ল আর কি! আহা, আজ যদি নবু বেঁচে থাক্‌ত!—পিতৃধন! যা হোক, বিধবাটার উপায় হ'ল।"

ইহার পর নবকুমার কলিকাতায় গিয়া খুড়ামহাশয়কে এক চিঠি লিখিল। লিখিল, সে শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যুর একটা গুজব উঠিয়াছে এবং শ্রাদ্ধশান্তিও হইয়া গেছে—কিন্তু বাস্তবিক সে বাঁচিয়া আছে এবং একটু কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছিল। অমুক তারিখে সে বাড়ী আসিবে এবং একদিন থাকিয়া স্ত্রীকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিবে।

নবকুমার বাটী আসিয়া শুনিল, খুড়া-মহাশয় কি-একটা জরুরি কার্য্য উপলক্ষ্যে গ্রামান্তরে গিয়াছেন। স্ত্রীকে লইয়া সে পশ্চিম চলিয়া গেল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জীবক।*

[বুদ্ধের চিকিৎসক]

পালি বিনয়পিটকের প্রথম ও অষ্টম খন্ধকে এবং তিব্বতীয় ক্যাঙ্গুর গ্রন্থের দুল্-ব অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে জীবকের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। মগধসাম্রাজ্যের রাজগৃহনগরে জীবকের জন্ম হয়। কোন কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবক, অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্টি কলা, ইহার কোন একটি শিখিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, এরূপ কল্পনা করিলেন। তদনুসারে তিনি তক্ষশিলায় † যাইয়া তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদের অধ্যাপকের নিকট স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। এই অধ্যাপকের নাম আত্রেয়। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে?" জীবক বলিলেন—"মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি; সুতরাং আমি আপনাকে উপযুক্ত বেতন দিতে পারিব না; শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব।"

* জীবকের বৃত্তান্তে কোন ঔপাখ্যানিক বৈচিত্র্য নাই। আড়াইহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে চিকিৎসাবিদ্যার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহার কতক আভাস ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

† জীবকের জন্মভূমি রাজগৃহ (Patna), কিন্তু তাঁহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে তক্ষশিলায় (Punjab) যাইতে হইয়াছিল। ইহা দ্বারা অনুমান হয়, তখন তক্ষশিলা বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। বস্তুত বৌদ্ধগ্রন্থে তক্ষশিলা সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পাণিনি ও চাণক্য এই বিদ্যালয়ের ছাত্র। তক্ষশিলা গান্ধারদেশের রাজধানী। ইহা ভারত ও পারস্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। পারসীক সম্রাট্ দরায়ুস্ প্রভৃতির অভ্যুদয়ের সময়ে তক্ষশিলা পারস্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রীক্‌বীর আলেক্‌জান্দর তক্ষশিলা অধিকার করেন। গ্রীক্‌গণের অধঃপতনের সময়ে ইহা শকরাজগণের হস্তগত হয়। তক্ষশিলা-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশীয় সংস্কৃতচতুষ্পাঠীর শিক্ষাপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তক্ষশিলা-বিদ্যালয়ে অষ্টাদশবিদ্যার আলোচনা হইত। প্রত্যেক বিদ্যা শিখাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত থাকিতেন। অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগের নিকট হইতে উপযুক্ত মাসিক বেতন অথবা একযোগে বহু অর্থ গ্রহণ করিতেন। মনু বলিয়াছেন—

গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা পুষ্কলেন ধনেন বা।
অথবা বিদ্যয়া বিদ্যা চতুর্থী নোপপদ্যতে॥

আমাদের দেশে গুরুশুশ্রূষাদ্বারা বিদ্যালাভ হইত। কিন্তু তক্ষশিলায় "পুষ্কল ধন" (বহু অর্থ) না দিয়া কেহই কিছু শিখিতে পারিতেন না। তক্ষশিলায় সেমিটিক্ সভ্যতার প্রভাব ছিল।

আত্রেয় * জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাতবৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র সমাপন করিলেন। তখন অধ্যাপক তাঁহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন—"এই বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে ১৬মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহাদের মধ্যে চিকিৎসায় যেগুলির প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন।" চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন—"মহাশয়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না।" অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। জীবক মগধে প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদিন সাকেত-(অযোধ্যা)-রাজ্যে অবস্থিতি করেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপীড়া হইয়াছিল। জীবক চিকিৎসাদ্বারা তাঁহার রোগবিমুক্তি করেন। তিনি একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া একটি ঔষধ উহার সহিত মিশাইয়া দেন এবং মিশ্রিত দ্রব্য উক্ত রমণীকে নস্য করিতে বলেন। রমণী ঐ দ্রব্যটি নাসিকাদ্বারা মস্তিষ্কে ও কণ্ঠে আকর্ষণ করিলেন। এইরূপ গ্রহণ করিবার পর তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরঃপীড়ার শান্তি হইল।

রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিম্বিসারকে ভগন্দররোগ হইতে বিমুক্ত করেন। একটি ঔষধের মালিষে এই রোগের উপশম হয়। বিম্বিসার সন্তুষ্ট হইয়া জীবককে অপরিমিত অর্থ + প্রদান করেন।

---

* আমরা দেখিলাম, জীবক যে সময়ে তক্ষশিলায় গমন করেন, তখন আত্রেয় তত্রত্য বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। হিন্দুচিকিৎসাগ্রন্থে অত্রিপুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাঙ্গহৃদয়ে লিখিত আছে—

ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজীগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিপুত্রাদিকান্ মুনীন্॥

ব্রহ্মা চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তদনন্তর দক্ষপ্রজাপতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র ও অত্রিপুত্র প্রভৃতি এই শাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে যে অত্রিপুত্রের উল্লেখ আছে, তিনি বৌদ্ধগ্রন্থের আত্রেয় ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিব্বতীয় গ্রন্থে (দুল্-ব, তপঃ) আত্রেয়ের নাম গ্যুন্-সেস্-ক্যি-বু। ইহার আবয়বিক অর্থ "অত্রির পুত্র" বা "অত্রিপুত্র"। অতএব অত্রিপুত্র, আত্রেয় ও গ্যুন্-সেস্-ক্যি-বু একই ব্যক্তির নাম। এক্ষণে আত্রেয়ের আবির্ভাবকালনির্ণয়-সম্বন্ধে আমাদের কোনপ্রকার কষ্ট পাইতে হইবে না। ইহা প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলা যায়, তিনি খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ, আত্রেয় জীবকের অধ্যাপক। জীবক বুদ্ধের চিকিৎসক। বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দের লোক।

আত্রেয়ের সময়ে তক্ষশিলায় চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়। ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থনিচয় তক্ষশিলা ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে যে সকল লতা ও ওষধির উল্লেখ আছে, উহা কাম্বোজ প্রভৃতি হিমবৎপ্রদেশে জন্মে। দাক্ষিণাত্য বা মধ্যভারতের কোন লতাপত্রের উল্লেখ প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থে নাই।

\+ প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে চিকিৎসাবিদ্যা অত্যন্ত সমাদৃত হইত। মীশরে অস্ত্রচিকিৎসার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। চিকিৎসক ডিমোকিডিস্ ইজিনার কোন ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিয়া এক বৎসরে ৬০০০, ছয়-হাজার টাকা ফি পাইয়াছিলেন। স্যামোসের পোলিক্রেটিস্ উক্ত চিকিৎসককে এক বৎসরে ১২০০০, বারহাজার

রাজগৃহে এই সময়ে একজন ধনী বাস করিতেন। তাঁহার মস্তকে অসহ্য বেদনা হইয়াছিল। তাঁহার বোধ হইত, কেহ যেন মস্তকে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছে। জীবক একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র * দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে দুইটি কীট বাহির করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। রোগীকে সাতমাস পৃষ্ঠে, সাতমাস দক্ষিণপার্শ্বে ও সাতমাস বামপার্শ্বের উপর ভর দিয়া শুইয়া † থাকিতে হইয়াছিল।

তদনন্তর জীবক বারাণসী, উজ্জয়িনী ও কৌশাম্বীতে গমন করিয়া বহু লোকের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর তাৎকালিক রাজা চন্দ্রপ্রদ্যোত পাণ্ডুরোগে (jaundice) কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জীবক মগধরাজ বিম্বিসারের গৃহচিকিৎসক। তদনুসারে তিনি বিম্বিসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ‡ জীবককে উজ্জয়িনীতে আনয়ন করেন। জীবক একটি ঔষধ তৈলদ্বারা § মিশ্রিত করিয়া চন্দ্রপ্রদ্যোতকে খাইতে বলেন। উহাতেই তাঁহার রোগমুক্তি হয়।

ইহার পরেই জীবক বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে জীবক ধন্য। যেহেতু তিনি জগদ্ব্যাধিপ্রমোচক বুদ্ধের ব্যাধিবিমোচন করিয়াছিলেন। এক সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ অসুস্থ হয়। আনন্দ জীবকের নিকট যাইয়া এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করেন। জীবক রাজগৃহের বিহারে আসিয়া বুদ্ধের চিকিৎসা করেন। তিনি তিনটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রক্ষেপ করিয়া ঐ তিনটি পুষ্প তিন সময়ে বুদ্ধকে আঘ্রাণ করিতে বলেন। পুষ্প তিনবার আঘ্রাণ ¶ করিয়াই বুদ্ধের দশবার বিরেচন হয়। ইহাতেই তাঁহার দেহ সবল হয় ও তিনি রোগমুক্ত হন।

টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ দয়ায়ুস্‌কে রোগমুক্ত করিয়া ডিমোক্রিডিস্ অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। (হেরোডোটাস্, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) আমাদের দেশে শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিয়াছেন, চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিবে না। জীবক তক্ষশিলায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া প্রাচীন পারসীক ও মীশরীয় জাতির প্রথা অনুসারে রোগীর নিকট হইতে টাকা লইতেন।

* নানাসূত্রে জানা যায়, অস্ত্রচিকিৎসা সর্ব্বপ্রথমে মীশরে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। পম্পাইনগরে কোন গৃহে কতকগুলি অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। উহা অবিকল বর্ত্তমানকালে ব্যবহৃত ডাক্তারী অস্ত্রের অনুরূপ।

† পৃষ্ঠে, বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শোয়াইয়া রাখা প্রাচীন চিকিৎসার একটি রীতি। য়ীহুদিজাতির মধ্যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। পরমেশ্বর ইষেকিল্‌কে আদেশ করিয়াছিলেন, বামপার্শ্বে ভর দিয়া ৩৯০ দিন ও দক্ষিণপার্শ্বে ভর দিয়া ৪০ দিন শুইয়া থাক। (Ezekiel IV. 5)

‡ রাজার বাড়ীর কোন চিকিৎসককে আনিতে হইলে রাজার নিকট আবেদন করিতে হইত। ওল্ড টেষ্টেমেণ্টে দেখা যায়, নেয়াম নিজের চিকিৎসার জন্য ভিষগ্বর এলিষাকে কিছু না বলিয়া, এলিষার প্রভু ইজ্‌রেলের রাজার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। (2 Kings V. 5)

§ তৈল পাণ্ডুরোগের মহৌষধ।

¶ প্রাচীন ভিষগ্‌গণের মতে নাসিকাদ্বারা গন্ধগ্রহণ করা একপ্রকার রোগপ্রতিকারের উপায়। গন্ধগ্রহণে সকল রোগেরই উপশম হইতে পারে। ডিমোক্রিটস্ মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া ভাবিয়াছিলেন—"আর ৪ দিন বাঁচিলেই আমি কৃষিমহোৎসবটি দেখিয়া মরিতে পারি।" কিন্তু তখন তাঁহার কিছু আহার করিবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি গরম রুটি নাকে শুঁকিয়া ৪ দিন জীবিত ছিলেন।

তথাগতের বুদ্ধত্বলাভের বিংশতিবর্ষ পরে জীবক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি বুদ্ধকে প্রত্যহ তিনবার দেখিতে পাইবেন, এই আশয়ে রাজগৃহনগরে নিজের উদ্যানভূমিতে একটি বিহার নির্ম্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে প্রদান করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর জীবক অজাতশত্রুর গৃহচিকিৎসক হন। তিনি বালচিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "জীবক কোমারভচ্ছ" বলিত। জীবকের কথা অনুসারে একদিন অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিবার জন্ম উৎসুক হন। তিনি জীবকের বিহারে গমন করিয়া বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

মগধে একসময়ে কুষ্ঠ, শোষ, ধবল, যক্ষ্মা ও অপস্মার, এই পঞ্চবিধ রোগের উপদ্রব হইয়াছিল। ঐ সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবকের নিকটে গিয়া বলিয়াছিল—"মহাশয়, আমাদিগকে রোগমুক্ত করুন।" জীবক উত্তর দেন—"মহাশয়গণ, আমাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। আমি রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক। রাজার অন্তঃপুরে আমি চিকিৎসা করি। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘেরও চিকিৎসক আমি। আমার সময় নাই, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ জীবককে পুনরায় বলিল—"মহাশয়, আমাদের যাহাকিছু সম্পত্তি আছে, আপনাকে দিতেছি; আমরা চিরকাল আপনার দাস হইয়া থাকিব; আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, আপনি আমাদিগকে রোগমুক্ত করুন।" জীবক পুনরায় উত্তর করিলেন—"মহাশয়গণ, আমার অনেক কার্য্য আছে, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" তখন রোগাক্রান্ত লোকেরা মনে করিল—"বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সুখে বাস, সুখে ভোজন, সুখে শয়ন করেন। আমরাও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীমধ্যে প্রবেশ করি। তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের শুশ্রূষা এবং জীবক আমাদের চিকিৎসা করিবেন।" এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক ভিক্ষুসংঘের নিকটে গিয়া প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিল। ভিক্ষুগণ উহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। জীবকও চিকিৎসাদ্বারা উহাদের রোগবিমুক্তি করিলেন। কিন্তু উহারা রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ভিক্ষুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। জীবক উহাদের অবস্থান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা ধর্ম্মজীবন ত্যাগ করিলেন কেন?" উহারা উত্তর করিল—"আমরা এক্ষণে রোগমুক্ত হইয়াছি, আর আমাদের ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই।" জীবক এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তথাগতের সমীপে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তথাগত ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আপনারা কুষ্ঠ, শোষ, ধবল, যক্ষ্মা ও অপস্মার, এই সকল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন, কিন্তু কখনও উহাদিগকে প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা প্রদান করিবেন না, অর্থাৎ ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইবেন না।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

সার সত্যের আলোচনা।

পুরাণ-কাহিনী।

বিগত প্রবন্ধে এই একটি কথা রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছিল যে, কাণ্টের দক্ষযজ্ঞে বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। এ কথা সত্য—কিন্তু তথাপি বাস্তবিক-সত্তা সেই যজ্ঞের সভামণ্ডপে অনাহূতা উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাঁহার স্বামীকে ছাড়িয়া একাকিনী। বাস্তবিক-সত্তা'র স্বামী কে? না, কাণ্ট্ যাহাকে বলেন—thing-in-itself স্বয়ংবস্তু। বাস্তবিক-সত্তা স্বয়ংবস্তুকে ছাড়িয়া সংবিতের যোগাত্মক-একতা-বেশে যজ্ঞভবনে প্রবেশ করিলেন। এই যে বস্তুবিরহিতা বাস্তবিক-সত্তা, ইনি আপনাতে আপনি নাই। সভার মাঝখানে বাস্তবিক-সত্তা'র প্রাণসংশয় উপস্থিত,—কাজেই কাণ্ট্ সংশয়বাদী। মৌলিক পদার্থসকলের মাঝখান হইতে কাণ্ট্ স্বয়ংবস্তুকে সরাইয়া দিয়াছেন - তাহা তিনি দি'ন্—কিন্তু আপনার মন হইতে একতিলও সরাইয়া দিতে পারেন নাই। কাণ্ট্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, স্বয়ংবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না এইজন্য, যেহেতু তাহা করিলে এইরূপ একটা শিরো-নাস্তি-শিরঃপীড়া-রকমের অসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে। তার সাক্ষী—This proves no doubt that all speculative knowledge is limited to objects of experience; but it should be carefully borne in mind that this leaves it perfectly open to us to *think* the same objects as things by themselves, though we cannot *know* them For otherwise we should arrive at the absurd conclusion that there is phenomenal appearance without something that appears.

ইহার বাংলা।

"এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আমাদের চিন্তাসম্ভূত সমস্ত জ্ঞানই পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের গণ্ডি'র মধ্যে আবদ্ধ; এটা কিন্তু সাবধানে মনে রাখা চাই যে, সে-সব বস্তু'র বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানে জানিতে পারা আমাদের সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাহা মনে ভাবিতে পারিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। কেন না, পরীক্ষাধীন বস্তুসকলের উপলব্ধিকালে যদি তাহাদের বাস্তবিক-সত্তা মনেও ভাবা না যায়, তবে তাহাতে ফলে দাঁড়ায় এইরূপ একটা অসঙ্গত কথা যে, অস্তি নাই অথচ ভাতি আছে—বস্তু নাই অথচ প্রকাশ আছে।" কাণ্ট্ এই যে একটি কথা বলিতেছেন যে, বাস্তবিক-সত্তা জ্ঞানের অগম্য হইলেও তাহাকে মনে না ভাবিলেই নয়—এ কথাটার মধ্যে প্রধান একটি দোষ প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে এই যে, যেন জ্ঞানের অগম্য পদার্থকেও মনে ভাবিতে পারা সম্ভবে। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তাকে কাণ্ট্ ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন; অথচ, জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা'র প্রতি তিনি পরাঙ্মুখ। জ্ঞানে-জানা বাস্তবিক-সত্তা হ'চ্ছেন সেই বাস্তবিক-সত্তা, যিনি স্বয়ংবস্তুর সহিত (thing in-itselfএর সহিত) একাসনে উপবিষ্টা। রূপকটিকে ভাল করিয়া গুছাইয়া বলি—তাহা হইলেই কাণ্টের সংশয়বাদের প্রকৃত বৃত্তান্তটি আপামর সাধারণের বোধগম্য হইতে পারিবে। কাণ্ট্ ছিলেন সর্ব্বপ্রকারে স্বকার্য্যে দক্ষ। মনে-ভাবা বাস্তবিক-সত্তা তাঁহার চিন্তার উদ্ভাবনা—একপ্রকার মানসকন্যা। বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সেই যে মানসকন্যা সতী, তাঁহার পতি হ'চ্চেন স্বয়ংবস্তু। তাঁহার পিতার নিকটে (কাণ্টের নিকটে) তিনি মনে-ভাবা; পতির নিকটে (স্বয়ংবস্তুর নিকটে) জ্ঞানে-জানা। সেই বাস্তবিক-সত্তারূপিণী সতী সংবিতের একতা-বেশে পদার্থসভার মাঝখানে (category-দিগের মাঝখানে) অনাহূতা আসিয়া উপস্থিত; পুষ্পকে দূরে ফেলিয়া রাখিয়া সৌরভ যেন চলিয়া আসিল আপনি একাকী। কাণ্ট্ বলেন, সংবিতের একতা বস্তু-শূন্যা হইলেও—যোগাত্মিকা; তাঁহার ত্রিনেত্র রহিয়াছে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে উন্মীলিত। পক্ষান্তরে, স্বয়ংবস্তু (thing-in-itself) নিতান্তই দিগ্‌বিদিক্‌শূন্য ভোলা। ঢুলঢুলুচক্ষে আছেন্ তিনি ভালো জনশূন্য শ্মশানে বা অগম্য কৈলাসশিখরে—সেইখানেই থাকুন্। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভার মাঝখানে বসানো হইতে পারে না। কাণ্টের পুরাণ-কাহিনী এ-যেমন একটি—এই-তেম্নি আর-একটি:—কালী (অর্থাৎ কালের মুহূর্ত্তপরম্পরা) নৃত্য করিতেছেন (কিনা ভাঙিতেছেন-গড়িতেছেন) যোগিনী সমভিব্যাহারে [কিনা যোজনা-শক্তিকে (Synthesisকে) সঙ্গে করিয়া]। কালীর স্বামী যিনি (অর্থাৎ কালের ভিত্তিমূল যিনি) শঙ্কর মহাকাল (Eternity), তিনি মৃতবৎ পড়িয়া আছেন সটান। কালীর বিচিত্রলীলা'র সহিত মহাকালের যেন কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ দোঁহে দোঁহার অর্দ্ধাঙ্গ। কাণ্টের পুরাণে, যোজনাশক্তি-সমভিব্যাহারিণী সংবিতের সহিত স্বয়ংবস্তু'র (thing-in-itselfএর) কোনো সম্পর্কই নাই—অথচ উভয়ে পরস্পরের এপিট-ওপিট।

পূর্ণাঙ্গ সত্য।

এই সকল ভেদবুদ্ধি সংশয়বাদের গোড়া'র কথা। প্রকৃত সত্য যাহা, তাহা আমরা বহু-পূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; পাঠককে তাহা আরেকবার স্মরণ করাইয়া দিই:—

সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ (বা জ্ঞান), এ তিনটি মৌলিক পদার্থ এরূপ হরিহরব্রহ্মা যে, তিনের কোনোটি অপর-দুইটির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালও একাকী থাকিতে পারে না—যেমন কাগজের এপিট-ওপিট এবং স্থূলতা। 'এপিট যেমন ওপিটের সহিত একেবারেই সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, ভাতি তেমনি অস্তি'র সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না।' স্থূলতা যেমন 'এপিট-ওপিটের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ

করিয়া একাকী থাকিতে পারে না, শক্তি তেমনি অস্তি-ভাতির সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া একাকী থাকিতে পারে না। শুধুই কেবল সত্তা নহে, শুধুই কেবল শক্তি নহে, শুধুই কেবল প্রকাশ নহে; পরন্তু অনুলোম-ক্রমে সত্তা হইতে শক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পর্য্যন্ত এবং প্রতিলোম-ক্রমে প্রকাশ হইতে শক্তির মধ্য দিয়া সত্তা পর্য্যন্ত—সবটা লইয়া এক অদ্বিতীয় অখণ্ডসত্য নিত্য-বর্ত্তমান। সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, এই তিনটি মৌলিক-পদার্থের একাত্মভাবের কথা এ যাহা বলিতেছি, এ কথার যাথার্থ্য একদিকে আমরা বিস্পষ্টভাবে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাই, আর-এক দিকে সংক্ষিপ্তভাবে হাতের কাছে দেখিতে পাই। বিস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে, সংক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে। এখনকার কালের নূতন নূতন বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র উভয় ব্রহ্মাণ্ডের অনেকানেক নিগূঢ় তত্ত্ব অনেকে জানিতে পারিয়াছেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এখনো চক্ষু ফোটে নাই—যদিচ পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের এই দীন-হীন-মলিন হতশ্রীক দেশের ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সেই বিষয়টির রীতিমত পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহারি মধ্যে কতকগুলি অভাবিতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছেন। সে বিষয়টি সংক্ষেপে এই:—যাহা বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে; যাহা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে—তাহাই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহে দোঁহার পর নহে—পরন্তু একেরই এপিট-ওপিট। খুব সংক্ষেপে বলিলাম;—শুনিবা-মাত্রই অনেকে অনেকপ্রকার ভুল বুঝিতে পারেন। অতএব তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রতিলোমক্রম কিরূপ; (২) বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞানের অনুলোমক্রম এবং প্রতিলোমক্রম কিরূপ; (৩) উভয়ের মধ্যে একাত্মভাব কিরূপ এই তিনটি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আর-কিছু না—জীবাত্মা। জীবাত্মা এক বটে, কিন্তু তিন লইয়া এক—(১) আত্মসত্তা, (২) আত্মশক্তি এবং (৩) আত্মজ্ঞান, এই তিন লইয়া এক। পাশ্চাত্য দর্শনের আদিগুরু বলিয়াছেন—"আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি।" দেকর্ত্তার এই মূলবচনটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে, যেমন দূর হইতে তরঙ্গক্রীড়া দেখিলে সমুদ্রের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, তেমনি চিন্তা'র প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করিলে আত্মার অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। তা বই, উহার অর্থ কেহ যদি এরূপ বোঝেন যে, চিন্তার উপরেই আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। তরঙ্গক্রীড়ার উপরেও সমুদ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে না—চিন্তার উপরেও আত্মার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোনো মনুষ্যই চিন্তা করিয়া পৃথিবীতে আসেন

নাই, চিন্তা করিয়া বাঁচিয়া থাকেন না, চিন্তা করিয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হ'ন না। "আমি চিন্তা করিতেছি, অতএব আমি আছি" —এ কথাটির অর্থ শুদ্ধকেবল এই যে, চিন্তাতে আত্মশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং আত্মশক্তির স্ফূর্ত্তিতে আত্মসত্তা অভিব্যক্ত হয়। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মপ্রকাশ, এই তিনের কোনোটি অপর দুইটিকে ছাড়িয়া একাকী থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনকারেরা সাক্ষাৎ-উপলব্ধিকে খাটো করিয়া চিন্তাকে বেশীমাত্রা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন—ইহা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার ভাবে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কাণ্ট্ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ উপলব্ধি ব্যতিরেকে চিন্তা ফাঁকা। কিন্তু হইলে কি হয়—তিনিও ইউরোপীয় ভেদদৃষ্টির কঠিন বন্ধন কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনিও ভাবিতেছি'র মুলুকেই আটক পড়িয়া-রহিয়া সংশয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছেন—জানিতেছি'র মুলুকে পৌঁছিতে পারেন নাই। দেকর্ত্তা যে জায়গায় বলিয়াছেন যে, "আমি ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি", আমাদের দেশের একজন গ্রন্থকার সেই জায়গায় বলিয়াছেন— "আমি জানিতেছি, অতএব আমি আছি।"

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

চিন্তা, জিজ্ঞাসা, সংশয়, জ্ঞানসাধনের প্রথম সোপান, তাহাতে আর ভুল নাই—কিন্তু তাহাই কিছু আর জ্ঞানের সারসর্ব্বস্ব নহে। সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে মনে হয় যে, সমুদ্র তরঙ্গেরই ক্রীড়াক্ষেত্র; কিন্তু সমুদ্রে ডুব দিলে সে ভুল অচিরে ঘুচিয়া যায়; তখন মনে হয় যে, সমুদ্র প্রশান্তির আলয়। "আমি আছি"—এই প্রশান্ত জ্ঞানটি আত্মার গভীরে নিরন্তর জাগিতেছে—তাহাই আত্মার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষপ্রমাণ; তদ্ব্যতীত, আত্মার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য ভাবিতেছি'কে সাক্ষী মান্য করা নিতান্তই বাড়া'র ভাগ। এ এক-প্রকার—সোনার গাত্রে সোনালি রঙ্ মাখানো—প্রস্ফুটিত গোলাপফুলের গাত্রে গোলাপজল মাখানো। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আত্মাকে ধ্রুবরূপে জ্ঞানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার তরঙ্গক্রীড়া থামানো আবশ্যক—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা আবশ্যক। আর, আমাদের দেশের যোগশাস্ত্রের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল তাহারই প্রণালীপদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'চ্চে সাধনরূপী জ্ঞানের (অর্থাৎ চিন্তা'র) মূলে যেখানে সিদ্ধরূপী জ্ঞান (অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান) রহিয়াছে, সেইখানে মনকে লইয়া যাওয়া।

ইউরোপীয় দর্শনকারেরা "অসীম অসীম" করিয়া ক্রমাগতই গণ্ডগোল করেন। শেষে কলরবে ক্ষান্ত দিয়া বলেন যে, অসীমকে চিন্তা দিয়া নাগাল পাওয়া যায় না। তাঁহাদের জানা উচিত যে, যে-অসীমকে তাঁহারা চিন্তাদ্বারা বন্ধন করিয়া ঘরে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাঁহাদের চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই ঘরে রহিয়াছে ষোল-আনা মজুদ্।

তোমার আত্মার অস্তিত্ব তো আর, তোমার চিন্তার ফল নহে—তাহা তোমার চিন্তার মূল। যাহার দৌলতে তুমি চিন্তা করিতে পারিতেছ—তাহাকে তুমি চিন্তাদ্বারা ফলাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছ;—এ তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না তো আর কি?

এ বিষয়ে আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা বলেন, তাহা অতীব পরিষ্কার। তাঁহাদের কথা এই যে—

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে জাগাইয়া তুলিতেছে যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ-জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন—সেই সকল মহা-পণ্ডিতেরা প্রজ্বলিত ইন্ধনকাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যে অগ্নি ইন্ধনকে দগ্ধ করিতেছে, সেই অগ্নিকে তাঁহারা ইন্ধন দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।

আমাদের বক্তব্য কথা সংক্ষেপে এই :—আত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান গোড়াতেই একীভূত রহিয়াছে। গোড়াতে আত্মা যেরূপ প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাই তিনি আপনি; আর, আপনার সত্তা এবং প্রকাশের মাঝখানে ইচ্ছা এবং শক্তি যাহা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহাও তিনি আপনি। আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্মজ্ঞান, সমস্ত লইয়া এক আত্মা। আত্মসত্তা চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—আত্মজ্ঞান চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশমান—আত্মশক্তি চিন্তার পূর্ব্ব হইতেই স্ফূর্ত্তিমান্। যাহা চিন্তার মূলে আছে, তাহাই যদি চিন্তার ফলে দাঁড়ায়, তবেই চিন্তা সার্থক চিন্তা হয়। পক্ষান্তরে, এরূপ যদি হয় যে, চিন্তার মূলে আছে একরূপ ফলে দাঁড়াইতেছে আর-একরূপ তবে তাহা চিন্তার একপ্রকার কৃত্রিম কারীকরি—তাহা যথার্থভাবের চিন্তা নহে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের ক্রম দুইরূপ—(১) অনুলোম এবং (২) প্রতিলোম। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে অনুলোম-ক্রম এইরূপ :—

প্রথমে আত্মসত্তা; তাহার পরে চিচ্ছক্তির স্ফূর্ত্তি বা চিন্তা; তাহার পরে আত্মার প্রকাশ বা আত্মজ্ঞান।

প্রতিলোমক্রমে এইরূপ :—

প্রথমে আত্মপ্রকাশের উপলব্ধি—তাহার পরে চিচ্ছক্তির উপলব্ধি, তাহার পরে আত্ম-সত্তার উপলব্ধি।

অনুলোম-পদ্ধতি'র পর-পর সিঁড়ি'র ধাপ হচ্চে—কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম্ম; প্রতিলোম-পদ্ধতির পর-পর সিঁড়ির ধাপ হ'চ্চে—জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা। আত্মা শুদ্ধকেবল একটা ফাঁকা একত্ব নহে—পরন্তু জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়া, সমস্তেরই সমাধিস্থান বা কেন্দ্র-স্থান; অথবা যাহা একই কথা আত্মা—সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনেরই একাধারে।

ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু, সমস্তই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, এটা যখন স্থির; এটা যখন স্থির যে, আমরা চিন্তা খাটাইয়া আপনার সত্তাকেও আনয়ন করি নাই, আপনার শক্তিকেও আনয়ন করি নাই, আপনার প্রকাশকেও আনয়ন করি নাই, তখন তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আত্মসত্তা, আত্মশক্তি এবং আত্ম-প্রকাশ, তিনেরই মূলাধার বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সার-সর্ব্বস্ব যেমন জীবাত্মা—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের (অর্থাৎ সর্ব্বজগতের) সারসর্ব্বস্ব তেমনি পরমাত্মা। অতএব এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনেরই মূলাধার পরমাত্মা।

এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, আমি যখন আমার সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি, তখন আমি যেমন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমার চিন্তার বলে আমি তাহা দেখিতেছি—তেমনি, আমি যখন আমার আত্মাকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি, তখন এ কথা বলিতে পারি না যে, আমি আমার চিন্তার বলে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি। সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা আত্মাকেই উপলব্ধি করি, আর বহির্বস্তকেই উপলব্ধি করি—সাক্ষাৎ-জ্ঞানে আমরা যে বস্তুকেই যখনই উপলব্ধি করি, তাহা ঐশ্বরিক শক্তির বলেই উপলব্ধি করি, নিজের বলে নহে। পুনশ্চ, ঐশ্বরিক শক্তির বলে যাহা-কিছু আমরা সাক্ষাৎ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি—তাহা জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করি; পক্ষান্তরে, চিন্তাদ্বারা যাহা-কিছু উপলব্ধি করি, তাহা সেই মূলগ্রন্থের এক-প্রকার যৎসামান্য অনুবাদ; তাহাও আবার অনেক সময়ে প্রকৃত অনুবাদ নহে—পরন্তু অপভ্রংশ। আত্মাকে যিনি যখন সাক্ষাৎ-জ্ঞানে জাগ্রত-জীবন্ত-ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি তখন পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের যোগে জীবাত্মার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ উপলব্ধি করেন। এরূপ সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধুকেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে—কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে—যেহেতু উভয়ে পরস্পরের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত। এবারে এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—বারান্তরে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।*

ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যাভিমুখে।

এখন সন্ধ্যা। এই সময়ে সূর্য্যাস্তের পরেই সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি ও মধুর শৈত্য কোথা হইতে যেন সহসা আবির্ভূত হয়। কিয়ৎকালের জন্য এই ক্ষুদ্র অনাদৃত পলঙ্কটা-গ্রামে আমি বিশ্রাম করিতেছি। এইখানেই আজ রাত্রি-যাপন করিতে হইবে।

এই দিবাবসানসময়ে, এই তরুতলে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি আজ সর্ব্বপ্রথমে বাস্তবিকই দূরদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি ফ্রান্স্ হইতে ডাক-জাহাজে করিয়া, হরিৎশ্যামল আর্দ্রভূমি সিংহলদ্বীপে

* পিয়ের-লোটি-কৃত।

প্রথম উপনীত হই। সেইখানে সপ্তাহকাল থাকিয়া, পরে উপকূলগামী একটা জঘন্য জাহাজে উঠিয়া, গতরাত্রে ম্যানার-উপসাগর পার হইয়াছি। সেইখানকার সমুদ্র যেন অষ্টপ্রহর টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। তাহার পর, সমস্তদিন শকটে আরোহণ করিয়া, খুব শীঘ্র এই গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ত্রিবঙ্কুরাধিপতি আমার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমার জন্য, সুনিবিড় তরুপল্লবের ছায়াতলে একটি ছোট শাদা বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছেন—সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন।

আগামী কল্য গরুর গাড়ি করিয়া ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যের অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশে উপনীত হইব। সেইখান হইতে আমার যাত্রা আরম্ভ হইবে। লোকে এই প্রদেশটিকে "থয়রাৎ-মহল"ও বলিয়া থাকে। আমার এই প্রদেশটিকে সুখশান্তির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানশতাব্দীসুলভ বিলাস-বিভবের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই; -পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, লোকবিরল, তাল-নারিকেল প্রভৃতি তরুমণ্ডপের ছায়াতলে অবস্থিত।

রাত্রি হইয়া আসিতেছে; গ্রীষ্মকালের অতি সুন্দর রাত্রি, কিন্তু চন্দ্রহীন। সেই লোকটি ব্রাহ্মণমন্দিরের দীপালোক দেখাইবার জন্য আমাকে শকটে করিয়া লইয়া গেল। এই মন্দিরটি "তৃণবল্লী"-নামক পার্শ্ববর্ত্তী নগরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শকটের বাহকেরা সহজ দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। আমরা রহস্যময় তরুপুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; আমাদের মস্তকোপরি শ্যামল পল্লবজাল প্রসারিত; সেই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে শিকড় বিস্তৃত হইয়া আবার তাহাদের সহিত যেন মিলিবার চেষ্টা করিতেছে। তরঙ্গিত শিকড়জাল সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পল্লবপুঞ্জের উপরে, পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের অযুত তারা, এবং নিম্নতলে—এমন কি, তৃণভূমির উপরেও—অসংখ্য জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, প্রতি সন্ধ্যায়, আতসবাজির স্ফুলিঙ্গবৎ এই কীটগুলি জ্বলিতে থাকে। তারা ও জোনাকির স্ফুলিঙ্গজ্যোতি এরূপ পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্যোতিষ্ক ও কোন্‌টি জ্যোতিরিঙ্গণ, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

সিংহলের অবসাদজনক আর্দ্রবায়ু ত্যাগ করিয়া, এইখানে আবার স্বাস্থ্যকর শুষ্কবায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ফ্রান্সের গ্রীষ্মকালীন সুন্দর রাত্রির মত, এখানে আবার সেইরূপ সুখদ অনিল, নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি; এবং জুন্‌মাসে ফ্রান্সের পল্লীগ্রামে যেরূপ শুনা যায়, এখানেও সেইরূপ ঝিল্লীসঙ্গীত চারিদিক্ হইতে শুনিতেছি। কিন্তু এই সকল পথে যে পথিকলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহারা আমাদের চক্ষে অদ্ভুত;—এই সকল তাম্রমূর্ত্তি পথিকেরা নিঃশব্দে খালি-পায়ে চলিয়াছে। তাহাদের স্কন্ধের উপর মল্‌মলের উত্তরীয়। মধ্যে-মধ্যে, দূর হইতে যখন ঢাক্-ঢোলের শব্দ অথবা শানাইযন্ত্রসমুত্থিত

আর্ত্তনাদের আলাপ শুনিতে পাই, তখনি ঠিক বুঝিতে পারি, এটি পৃথিবীর কোন্ বিভাগ; তখনি ইহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া, ব্রাহ্মণের দেশ বলিয়া চিনিতে পারি; আর তখনি বুঝিতে পারি, আমাদের দেশ হইতে এই স্থানটি কতটা দূর।

তরুতিমিরের মধ্যে, ছোট ছোট শাদা বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী পথের দুইধারে দেখা দিতে সুরু করিয়াছে; যেখানে আমাদের যাইবার কথা, সেই "তৃণবল্লী"-নগরে ইহারই মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পথের দুইধারে তালজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী;—ভঙ্গুর বৃন্তের উপর ভর করিয়া আকাশে যেন কালো-কালো পাখা বিস্তার করিয়া আছে। এই তরুপথটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছায়াচিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। এই ছায়াচিত্রটি একটু বিশেষ-ধরণের, অতীব নয়নাকর্ষক। ইহা একটি প্রকাণ্ড মন্দির। ভারতবর্ষে যে কখনো আসে নাই, সে-ও ইহাকে মন্দির বলিয়া চিনিতে পারে; কেন না, চিত্র-প্রতিমূর্ত্তি-আদি দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই উহাদের আকারসম্বন্ধে সকলেরই কিছু-না-কিছু অস্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ঈদৃশ প্রকাণ্ড মন্দির সহসা নৈশগগনে সমুত্থিত দেখিব, ইহা কখন কল্পনা বা প্রত্যাশা করি নাই। ইহা যেন রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির একটা প্রকাণ্ড স্তূপ; ইহার চূড়াদেশও বিকটাকার মূর্ত্তিতে আকীর্ণ। অসংখ্যতারকাদীপ্ত আকাশপটের উপর এই ছায়াচিত্রের কৃষ্ণবর্ণ-রেখাপাত হইয়াছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ি একটি প্রস্তরময় খিলানমণ্ডপের মধ্য দিয়া, সেকেলে-ধরণের গুরুভার সমচতুষ্কোণ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরের এই অগ্রবর্ত্তী প্রদেশটি অতিক্রম করিয়া, আবার যখন আমাদের মস্তকোপরি তারকা-মণিখচিত গগনাম্বর প্রসারিত হইল, তখন দেখিলাম, একটা বিপুল ঘেরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার সীমা লঙ্ঘন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সেই প্রকাণ্ড মন্দিরস্তূপটি একেবারে আমাদের সম্মুখে—খুব নিকটে। সেই বিসদৃশপরিমাণযুক্ত মহাভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার নিম্ন দিয়া একটি পথ গিয়াছে—তাহার মধ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু সেই প্রবেশপথের মুখটি এত বড় যে, সেখান হইতে অভ্যন্তরস্থ দেবমণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই পবিত্র অন্ধকারের মধ্যে, মন্দিরমণ্ডপের দুই ধারে অসংখ্য রহস্যময় দীপাবলী সারি-সারি সজ্জিত। সেইখান হইতে দেখিতে নিষেধ নাই; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণের জন্য কিংবা খুব নিকটে গিয়া দেখা নিষিদ্ধ।

এই সুদূরপ্রসারিত প্রবেশপথের প্রত্যেক দিকে, মণ্ডলাকারে-বিন্যস্ত স্তম্ভশ্রেণীর নিম্নে, ছোট-ছোট মশালের আলোকে, দেবতাদের ব্যবহারের জন্য ফুলের দোকান, মালার দোকান, মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই মশালের আলোকে, দোকানদারদিগকে এবং মন্দিরের প্রস্তরময় তলদেশটি বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই প্রস্তরে বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি, অদ্ভুতাকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত, কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্তমুখশ্রী। ঐ সকল দোকানদারেরাও দেবমূর্ত্তিবৎ অচল।

উহাদের শ্যামল নগ্নগাত্র ঐ সকল লাল পাথরের উপর ঠেস দিয়া রহিয়াছে; নেত্রগুলি জল্‌জল্‌ করিতেছে; এবং উহাদের রমণীসুলভ সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ স্কন্ধের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। উপরে থামগুলির মাথায়, খিলানমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী স্থানে, অন্ধকার একাধিপত্য করিতেছে।

মণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমি অলক্ষিতভাবে এখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। অফুরন্ত সারি-সারি স্তম্ভ অস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষীণপ্রভ দীপাবলী ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সুদূর প্রান্তে শুভ্রবসন মনুষ্যমূর্ত্তিসকল বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। এবং ঐ স্থানটি স্তুতিপাঠে ও গানকীর্ত্তনে মুহুর্মুহু অনুরণিত হইতেছে।

যে নিষিদ্ধ দ্বার দিয়া আমি লুকাইয়া দেখিতেছি, তাহার গঠন অতি অপূর্ব্ব; একেবারেই বাস্তুবিদ্যার অপরিজ্ঞাত। দ্বারের প্রকোষ্ঠটি খুব বড়। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী চূড়ার তুলনায়, মন্দিরের দ্বারটি বড়ই নীচু, এমন কি, গুপ্তপথ বলিয়াও মনে হইতে পারে; মনে হয়, উহা যেন সুরঙ্গপথের দ্বার—রহস্যরাজ্যের প্রবেশপথ!

জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগের একটি মন্দির দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি এমন একটা-কিছু দেখিলাম, যাহা পৌত্তলিকতার বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন;—ভীষণ বৈরভাবাপন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ। আমি এইরূপ দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই; আর ইহাও ভাবি নাই, মন্দিরে আমার প্রবেশনিষেধ হইবে। আমি কতকটা আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে গিয়া, মহাপূর্ব্বপুরুষগণ-অবলম্বিত ধর্ম্মের অন্তস্তলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এখন আমার সেই চিরপোষিত আশা অতীব শূন্যগর্ভ ও নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলিয়া মনে হইতেছে।

আহা! খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কেমন একটি মন-ভুলানিয়া মধুময় শান্তির ভাব বিরাজিত—সেই ধর্ম্ম, যাহার দ্বার সকলেরই নিকট অবারিত এবং যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদিগেরও হিতসাধনে সতত নিযুক্ত।...

এখন আমাকে সকলে এইরূপ আশ্বাস দিতেছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে, দেবালয়ের মধ্যে এতটা দারুণ কঠোরতা লক্ষিত হইবে না, এমন কি সেখানকার দেবালয়ে হয় তো আমি প্রবেশ করিতেও অনুমতি পাইব। যাহা হউক, এইবার এইখান হইতে সরিয়া পড়া ভাল—বেশিক্ষণ থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু যদি ইচ্ছা করি, গাড়িতে থাকিয়া আস্তে-আস্তে এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে পারি—তাহাতে কোন বাধা নাই।

মন্দিরের ঘেরটা সমচতুষ্কোণ,—এত বৃহৎ যে, ইহার মধ্যে একটা নগরের সমাবেশ হইতে পারে। ইহার চতুঃসীমার মধ্যস্থল হইতে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সমুত্থিত—উহার নিম্নদেশে একটি দ্বার ফুটানো আছে। এই সকল মূক প্রাচীর, যাহার ধার দিয়া আমরা নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে চলিয়াছি,—উহা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় কঠোরভাবে খাড়া হইয়া আছে। যে বিজন পথটি আমরা অনুসরণ করিতেছি, উহা সেই পবিত্র গণ্ডিরই সামিল,—যাহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকের

প্রবেশ নিষিদ্ধ। এইখানে আর-একপ্রকার প্রকাণ্ড স্তূপের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—উহা দৈবক্রমে ঐস্থলে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। উহাও দেখিতে দেবমন্দিরের ন্যায়,—কতকগুলি বিরাট্‌ চাকার উপর স্থাপিত; পর্ব্ব-উৎসবের দিনে দেবতাদিগকে হাওয়া-খাওয়াইবার জন্য সহস্র-সহস্র লোক এই রথগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়; রথের চাকা বসিয়া গিয়াছে, তাই আজ রাত্রে দেবতারা মর্ত্ত্যদিগেরই ন্যায় এইখানেই নিদ্রা যাইবেন।

আমাদের দুই ধারে সারি-সারি তাল-জাতীয় উচ্চবৃক্ষ—উহাদের কালো-কালো পাখা ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; যে সময়ে আমরা এই তরুবীথির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, সেই সময়ে ভক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ত উল্লাস চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল,—সেই সময় ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলিতেছিল। এই প্রশান্ত সুন্দর রাত্রিতে, গহ্বর-গভীর ঢাকের শব্দ, তুরীর পৈশাচিক নিনাদ আমাদের পশ্চাতে শুনা যাইতেছে; সে এরূপ বিকট শব্দ যে, শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এখনো আমরা পলঙ্কটাগ্রামে। মশক-পতঙ্গাদি তাড়াইবার জন্য তাম্রমূর্ত্তি ভৃত্যগণ সমস্ত রাত বড়-বড় হাতপাখায় আমাকে বাতাস করিয়াছে।

এক্ষণে এই বহুপুরাতন সৌধধবল ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অরুণ-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে; হাস্যময়ী উষার প্রভায় গৃহটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যের দীপ্যমান মহিমার মধ্যে আমি জাগ্রত হইলাম।

শিশিরসিক্ত বারণ্ডাটি এখনো বেশ ঠাণ্ডা। এটি সুন্দর বসিবার স্থান। বারণ্ডাটি সৌধপ্রলেপে তুষারশুভ্র। উহার মোটা-মোটা খাটো-খাটো অসমান (অনিচ্ছাকৃত) থামগুলি চামেলি-লতায় ঘেরা।

চতুর্দ্দিকে মাঠ-ময়দান, গ্রাম্য নিস্তব্ধতা, বিমল প্রাভাতিক শান্তি। যদিও অত্রস্থ প্রকৃতিসুন্দরী একটু তাপদগ্ধা, শরতের প্রভাবে শুষ্কতানিবন্ধন একটু অবসাদক্লিষ্টা, তথাপি এখানকার আলোকরশ্মি দক্ষিণ-ফ্রান্সের সুন্দরতম প্রভাতকিরণের ন্যায় দিব্য প্রশান্ত। এখানে বড়-বড় তালজাতীয় বৃক্ষ নাই; অথবা সিংহলের ন্যায় উদ্দাম উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য নাই। অস্মদ্দেশীয় অরণ্যের ন্যায় এখানকার বৃক্ষগুলি অনতি-উচ্চ ও বিরলপল্লব। ছিন্নতৃণ মাঠ-ময়দান, ফলের বাগান, ছাঁটা-ঘাসের উপর অঙ্কিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়ে-চলা পথ, দূরে বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চূন্‌কামকরা ছোট-ছোট প্রাচীর, সুধাধবল ছোট-ছোট বাড়ী—এই সকল আমি অবলোকন করিতেছি, এবং আমার শৈশবের সুপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার আমার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

যে চড়াইপাখী আমাদের গৃহছাদে নীড় নির্ম্মাণ করে, সেই নিতান্ত গ্রাম্য পাখীগুলা এখানেও আছে দেখিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ, ভারতের জীবজন্তু-মাত্রেরই মানুষের উপর যেরূপ অগাধ বিশ্বাস, ইহাদেরও তদ্রূপ;—মানুষ নিকটে গেলে উহারা পলায় না।

আমি দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশসাদৃশ্য-জনিত বিস্ময় যেন আমার জন্য স্থানে স্থানে

এদেশে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই পূর্ণ শীতের সময়ে, আমাদের গ্রীষ্মশেষের শোভাসৌন্দর্য্য এখানে সম্ভোগ করিতেছি।...

আমি যে ভারতবর্ষে আছি, এই জ্ঞানটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে জাগরূক থাকিলেও, যখনি আমি এখানকার কোন অনাদৃত জনবিরল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনি একপ্রকার মধুর বিস্ময়সহকারে, জন্মভূমিসম্বন্ধীয় বিবিধ বিভ্রমের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিই।

এই সকল ছোট-ছোট শাদা প্রাচীর, চামেলি-লতা, হল্‌দে-রং-ধরা ঘাস, শরৎঋতুসুলভ বিচিত্র রং—এই সবে স্বদেশকে স্মরণ হইয়া, মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সেই Aunis,—সেই La Saintonge-র মাঠ-ময়দান, আঙুর পাকিবার সময়ে, সেই কনকোজ্জ্বল-ঋতুকালীন Pleron-দ্বীপের সেই শান্তিময় বাড়াগুলি, আমার মনে পড়ে।

কিন্তু আবার, মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটোখাটো জিনিষ পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার এই স্বপ্নের ব্যাঘাত করে। ঐ দেখ, ছয়বৎসরবয়স্কা একটি ছোট বালিকা, আমাকে একটা সংবাদ দিবার জন্য, নিজগ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। ইহার কালো রহস্যময় চোখদুটি দীর্ঘায়ত; ইহার নাক্ ফুঁড়িয়া চুনি-বসানো একটি সোনার মাকড়ি আছে; চুনিগুলি দেখিতে শোণিতবিন্দুর ন্যায়।

দূরে, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে উদ্বেজিত করিয়া কি-একটা অদ্ভুত জিনিষ গাছের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে;—ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের একটি কোণ,—দেবতা ও রাক্ষসাদির মন্দিরস্থ একটি কোণ। মন্দিরটি বিষ্ণুদেবের—গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

তরুগণের ছায়াসত্ত্বেও, মধ্যাহ্নের সূর্য্য আমাদের এই শাদা বাড়ীটির উপর বাস্তবিকই একটু অতিরিক্ত-পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ বর্ষণ করিতেছে।

ছোট-ছোট ফলবাগানের উপর, অবসাদ-ম্রিয়মাণ তৃণভূমির উপর আলো পড়িয়াছে—খুব উজ্জ্বল আলো পড়িয়াছে। আমাদের সেপ্টেম্বরমাসের দীপ্ততম মধ্যাহ্নও এখানে হার মানে।

চারিদিক্ই নিস্তব্ধ। মেঠো-ঘাসের পথে আর কোন পথিক নাই। বড়-বড় হাতপাখাগুলা এখন ঘুমাইতেছে; যে সকল ভারতীয় ভৃত্য ঐ সকল পাখা ব্যজন করিয়া থাকে, তাহারাও ঘুমাইতেছে। সব চুপ্‌চাপ্। কোথাও টুঁশব্দ নাই। কেবল কতকগুলা দাঁড়কাক—যাহাদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ—তাহারাই আমার কাম্‌রায় প্রবেশ করিয়া আমার চারিদিকে কা-কা-শব্দ করিতেছে। এই সকল নিস্পন্দ পদার্থের মধ্যে, উহাদেরি নাচুনি-চালের পদশব্দ এবং উড়িবার পক্ষসঞ্চালনশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।...

হঠাৎ মনে পড়িল—খৃষ্টজন্মোৎসবের দিন আসন্ন; অমনি এখানকার এই চিরনির্ম্মল আকাশ—চিরগ্রীষ্মঋতু আমার কল্পনার উপর যেন ঘনঘোর বিষাদ ঢালিয়া দিল।

এইবার একে-একে আমার যাত্রার গাড়িদুটি আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ত্রিবস্কুরে যাইতে প্রায় দুইদিন লাগিবে।

সেইখানে যাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশীয় শকটগুলি সুদীর্ঘ "কফিনে"র (শবাধার) ন্যায়; পিছন দিক্ দিয়া উহাতে ঢুকিতে হয়; এবং পর্য্যটন-কালে বাধ্য হইয়া উহার মধ্যে শুইয়া থাকিতে হয়। উহাদের বৃষবাহনেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে নাচিতে চলে। আমার গাড়ির বৃষযুগল শাদা; উহাদের শিং নীলরঙে রঞ্জিত। ভৃত্যদের গাড়ির বৃষদুটি কপিশ-রঙের; এবং উহাদের শিং তাঁবা দিয়া বাঁধানো।

এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। ইত্যবসরে, আমাদের চারিটি নিরীহ শান্ত অলস বৃষ তৃণভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। *

"স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জ্জন্ রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, † তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত-কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

কিন্তু প্রশ্নোত্তরের মত লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়াল-জবাবের মত হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ খাপ্‌ছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্য সংক্ষিপ্ত-প্রবন্ধ-আকারে আমার কথাটা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনি তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়াছিল; অর্জ্জুন যখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনি তিনি সামান্য দস্যুর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের সর্ব্বাঙ্গে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

য়ুরোপের যেখানে বল, আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে

* ইহা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে বাহির হইয়া গেছে। কিন্তু "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেজন্য অনেকের আগ্রহে ও অনুরোধে এবং ইহার স্থায়িত্বসঙ্কল্পে উক্ত "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইল।—(সহঃ সঃ)

† গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার মিনার্ভারঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধটি প্রথম পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর পরিবর্দ্ধিত আকারে ১৬ই শ্রাবণ রবিবার কর্জ্জন্‌রঙ্গমঞ্চে ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে পুনঃপঠিত হয়।

উদ্যম প্রয়োগ করে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যমপ্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার ষ্টেট্ অর্থাৎ সরকার। সেই ষ্টেট্ দেশের সমস্ত হিতকর কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে;—ষ্টেট্ই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেট্ই বিদ্যাদান করে, ধর্ম্মরক্ষার ভারও ষ্টেটের উপর। অতএব এই ষ্টেটের শাসনকে সর্ব্বপ্রকারে সবল, কর্ম্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্ম্মরূপে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্ম্মকে, সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্ম্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা দুর্ব্বিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মূঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরাজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে—সমাজটাকে নিতান্ত উপ্‌রিপাওনার মত লইতেছে—"ফাউ" বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনামূল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখ। ইংরাজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয় ত যথার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই বুঝিয়া খুসি থাকিলে চলিবে না। পূর্ব্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত, তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক্ হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তখন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া টিঁকিয়া থাকা সহজ ছিল না। সুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত, সে উদ্ধতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তিসম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্‌পন্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক্ হয়, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরাজের আইন কোন্‌টা হিন্দু, কোন্‌টা অহিন্দু, তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে—রফা করিবার ভার ইংরাজের হাতে নাই; সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক্ হওয়ার দরুণ কাহারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইংরাজরচিত স্বতন্ত্র

আইনের আশ্রয়ে কাহারো কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আক্কেলদাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন সে উঠিয়া পড়ে, তখন শরীর তাহাকে সুস্থভাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে, তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভাল নহে,—বুঝিব, তাহার শক্তি-হীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরূপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নূতন অভ্যুদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জ্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে। এবং, এই বর্জ্জন করিবার জন্য ইংরাজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

যেখানেই সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে, সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোট করিতেছে, তাহা নহে—ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তরথীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলি খোওয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয়, তবে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমস্ত রক্ষা করিয়াছি—ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া, আমরা ইংরাজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারো অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্য পুলিস্‌ম্যান্‌ ডাকিতে হয়, সেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন? সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং খৃষ্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মত ধাক্কা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্যাটা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই সকল পর-সমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন—এমন ভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ্ব—অশান্তি, অব্যবস্থা ও দুর্ব্বলতার কারণ।

যেখানে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বাধিতেছে না, সেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের সঙ্গে আপনার সীমানানির্ণয়সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্ত্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে, তাহাই হইতেছে;—যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পরিস্ফুট হইতেছে, তখন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া

বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিলাপে কেহ বন্যাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে, আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখনি ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে—সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্ব্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্রশক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া?

এইরূপে বিদেশীশিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিতলোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহসনে পরিহাস করে। কিন্তু শান্তভাবে কেন বিচার করে না যে,—কেন এমনটা ঘটিতেছে?

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যখন সবল ও সক্রিয় থাকে, তখন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দ্দিকাশি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতিসভ্যতার প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে সকল জিনিষই ভাল, অস্থানে পতিত ভাল জিনিষও জঞ্জাল। চোখের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ৎ।

যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ-সক্রিয় থাকিত, তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজ যখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞানদর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্যা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদূর পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্ব্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে, সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়!

যাহাই হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট-নিষ্ক্রিয়, সেই সময়ে একটা সচেষ্ট-শক্তি, শুষ্ক জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায় তাহার বজ্রবিদ্যুৎ, বায়ুবেগ ও বারিবর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্‌দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন!

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া-বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের

গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যখন সমাজের সর্ব্বত্র আমরা উপলব্ধি করিব, তখনি নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল, তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী-সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে যে প্রখর আলোক চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়, তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে, সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে, প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কি করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপন্থানুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেম্নি বসিয়া থাকিলেই যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন দুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মৎলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোনো কোনো লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব! যদি এমন মৎলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্পসৃষ্টির মৎলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করে, এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না, ভারতবর্ষ ষ্টীম্‌রোলার্ বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্র্যকে সমভূম, সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দূর করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে, ভারতবর্ষ পরকে আপন করাই আত্ম-সার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার করা নহে, পরন্তু পরস্পরের অধিকার সুস্পষ্ট-রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, এ কথা কি আমাদের দেশেও চীৎকার করিয়া বলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি—আমরাও যদি পদশব্দটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই অমনি হাঁহাঃশব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে বুঝিব, পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিমৃত

কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে—ইহার রক্ষাদেবতা,—যিনি সহাস্যমুখে সকলকে ডাকিয়া-আনিয়া সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া অতি নিঃশব্দে, অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন,—তিনি কখন্ ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন, তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামিমহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সেস্থলে "নূতন" কথাটার তাৎপর্য্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন?

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্ত-বাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত ছয়কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নূতন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিতগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো একটি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা, সাধু, পিতা, গুরু, ভাই, ভৃত্যের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাঁহাদের জন্য কতদূর ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে, ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না; যদি করি, তবে হিন্দু-ধর্ম্মানুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না?

এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম্ম বলি না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথাকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্ত্তৃত্বগ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে সেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন্ কিরূপ হইবে, আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রসঙ্গক্রমে আমি দুচারিটা কথা যাহা বলিয়াছি, অতিশয় সূক্ষ্মভাবে তাহার বিচার করিতে বসা মিথ্যা। আমি যদি সুপ্ত জহরীকে ডাকিয়া বলি—"ভাই, তোমার হীরামুক্তার দোকান সাম্‌লাও", তখন কি সে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণরচনার গঠনসম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণপাতের যোগ্য নহে? তোমার কঙ্কণ তুমি যেমন খুসি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে-আমাতে হয় ত চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধৌত কর, তোমার

হীরামুক্তার পসরা সাম্‌লাও—দস্যুর সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যখন অসাড়-অচেতন হইয়া দ্বার জুড়িয়া পড়িয়া আছ, তখন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাটি একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিতেছে না।

শিবাজি-উৎসব।

১

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে'—
হে রাজা শিবাজি,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিল নামি'—
"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি!"

২

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী'
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি'।

৩

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্বহ্নিতে
মহামন্ত্রশিখা!

মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা!

৪

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা!
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা!

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ-চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী,
রাজদণ্ডরূপে!

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি!
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম!
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে!

৭

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ !
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন-’পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী !
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি !

৮

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে,
সে সত্যসাধন
কে জানিত হ’য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন !

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি’ দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
—বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি’
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
‘যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ’য়ে
কোথা ছিল ঢাকা !’

১০

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি !
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ’তে
তব জয়ভেরি ?

তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি'
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি'
উদিল আবার ?

১১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে !
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে !

১২

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্‌
হেরিছে কে জানে !
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ !

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর, —
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর !
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ !

১৪

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে!
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত!

১৫

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি, ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে!
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে!

১৬

মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি,—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে!
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!

১৭

সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব!
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!

ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী'বসন
দরিদ্রের বল!
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল!

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজি!
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে!

নৌকাডুবি।

৪৪

সভাভঙ্গের পর অন্নদা হেমনলিনীকে লইয়া যখন ঘরে ফিরিলেন, তখনো সন্ধ্যা হয় নাই। চা খাইতে বসিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আজ বড় আনন্দলাভ করিয়াছি!" ইহার অধিক আর তিনি কথা কহিলেন না;—তাঁহার মনের ভিতরের দিকে একটা ভাবের স্রোত বহিতেছিল।

আজ চা খাওয়ার পরেই হেমনলিনী আস্তে আস্তে উপরে চলিয়া গেল, অন্নদাবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন না।

আজ সভাস্থলে—নলিনাক্ষ— যিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে আশ্চর্য্য তরুণ এবং সুকুমার; যুবাবয়সেও যেন শৈশবের অম্লানলাবণ্য তাঁহার মুখশ্রীকে পরিত্যাগ করে নাই; অথচ তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে যেন একটি ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার দুই চক্ষু অন্তর্দৃষ্টির সুদূরগামিতার মধ্যে নিমগ্ন। তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিয়ম-সংযমের দ্বারা তিনি নিয়ত সাধনশীল, অথচ তাঁহার মুখের ভাব একটি সহজ প্রসন্নতার দ্বারা দীপ্যমান।

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ক্ষতি"। তিনি বলিয়াছিলেন, সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই, সে কিছু পায় নাই। অমনি

যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনি যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে। যাহা-কিছু আমাদের প্রকৃত সম্পদ্, তাহা সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেই যে ব্যক্তি হারাইয়া ফেলে, সে লোক দুর্ভাগা; বরঞ্চ তাহাকে ত্যাগ করিয়াই তাহাকে বেশি করিয়া পাইবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। যাহা আমার যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি আমি নত হইয়া করজোড় করিয়া বলিতে পারি, "আমি দিলাম, আমার ত্যাগের দান, আমার দুঃখের দান, আমার অশ্রুর দান"—তবে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইয়া উঠে, অনিত্য নিত্য হয় এবং যাহা আমাদের ব্যবহারের উপকরণমাত্র ছিল, তাহা পূজার উপকরণ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের দেবমন্দিরের রত্নভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি আজ হেমনলিনীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বাজিতেছে। ছাদের উপরে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলে সে আজ স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার সমস্ত মন আজ পূর্ণ সমস্ত আকাশ, সমস্ত জগৎসংসার তাহার কাছে আজ পরিপূর্ণ।

বক্তৃতাসভা হইতে ফিরিবার সময় যোগেন্দ্র কহিল, "অক্ষয়, তুমি বেশ পাত্রটি সন্ধান করিয়াছ যা হোক্! এ ত সন্ন্যাসী! এর অর্দ্ধেক কথা ত আমি বুঝিতেই পারিলাম না!"

অক্ষয় কহিল, "রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন—সে ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মত সহজ লোকে ভাঙাইতে পারিবে না। যখন বক্তৃতা চলিতেছিল, তখন তুমি কি হেমের মুখ লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই?"

যোগেন্দ্র। দেখিয়াছি বই কি। ভাল লাগিতেছিল, তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু বক্তৃতা ভাল লাগিলেই যে বক্তাকে বরমাল্য দেওয়া সহজ হয়, তাহার কোনো হেতু দেখি না।

অক্ষয়। ঐ বক্তৃতা কি আমাদের মত কাহারো মুখে শুনিলে ভাল লাগিত? তুমি জান না যোগেন্দ্র, তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে। সন্ন্যাসীর জন্য উমা তপস্যা করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা কাব্যে লিখিয়া গেছেন। আমি তোমাকে বলিতেছি, আর যে-কোনো পাত্র তুমি খাড়া করিবে, হেমনলিনী রমেশের সঙ্গে মনে মনে তাহার তুলনা করিবে—সে তুলনায় কেহ টিঁকিতে পারিবে না। নলিনাক্ষ মানুষটি সাধারণ লোকের মতই নয়—ইহার সঙ্গে তুলনার কথা মনেই উদয় হইবে না। অন্য কোনো যুবককে হেমনলিনীর সম্মুখে আনিলেই তোমাদের উদ্দেশ্য সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে এবং তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। কিন্তু নলিনাক্ষকে বেশ একটু কৌশল করিয়া যদি এখানে আনিতে পার, তাহা হইলে হেমের মনে কোনো সন্দেহ উঠিবে না,—তাহার পরে ক্রমে শ্রদ্ধা হইতে মাল্যদান পর্য্যন্ত কোনোপ্রকারে চালনা করিয়া লইয়া যাওয়া নিতান্ত শক্ত হইবে না।

যোগেন্দ্র। কৌশলটা আমার দ্বারা ভাল

ঘটিয়া উঠে না—বলটাই আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু যাই বল, পাত্রটি আমার পছন্দ হইতেছে না।

অক্ষয়। দেখ যোগেন, তুমি নিজের জেদ লইয়া সমস্ত মাটি করিয়ো না! সকল সুবিধা একত্রে পাওয়া যায় না। যেমন করিয়া হোক্, রমেশের চিন্তা হেমনলিনীর মন হইতে না তাড়াইতে পারিলে আমি ত ভাল বুঝি না। তুমি যে গায়ের জোরে সেটা করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা মনেও করিয়ো না। আমার পরামর্শ অনুসারে যদি ঠিকমত চল, তাহা হইলে তোমাদের একটা সদ্গতি হইতেও পারে!

যোগেন্দ্র। আসল কথা, নলিনাক্ষ আমার পক্ষে একটু বেশি দুর্ব্বোধ। এরকম লোকদের লইয়া কারবার করিতে আমি ভয় করি। একটা দায় হইতে উদ্ধার হইতে গিয়া ফের আর-একটা দায়ের মধ্যে জড়াইয়া পড়িব!

অক্ষয়। ভাই, তোমরা নিজের দোষে পুড়িয়াছ—আজকে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া আতঙ্ক লাগিতেছে! রমেশসম্বন্ধে তোমরা যে গোড়াগুড়ি একেবারে অন্ধ ছিলে! এমন ছেলে আর হয় না—ছলনা কাহাকে বলে, রমেশ তাহা জানে না—দর্শনশাস্ত্রে রমেশ দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য্য বলিলেই হয়, আর সাহিত্যে স্বয়ং সরস্বতীর উনবিংশশতাব্দীর পুরুষ-সংস্করণ! রমেশকে প্রথম হইতেই আমার ভাল লাগে নাই—ঐরকম অত্যুচ্চ-আদর্শ-ওয়ালা লোক আমার বয়সে আমি ঢের-ঢের দেখিয়াছি! কিন্তু আমার কথাটি কহিবার জো ছিল না—তোমরা জানিতে, আমার মত অযোগ্য অভাজন কেবল মাহাত্মা-লোকদের ঈর্ষা করিতেই জানে, আমাদের আর-কোনো ক্ষমতা নাই। যা হোক্, এতদিন পরে বুঝিয়াছ, মহাপুরুষদের দূরে হইতে ভক্তি করা চলে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহের সম্বন্ধ করা নিরাপদ্ নহে। কিন্তু 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্!' যখন এই একটিমাত্র উপায় আছে, তখন আর এ লইয়া খুঁৎখুঁৎ করিতে বসিয়ো না!

যোগেন্দ্র। দেখ অক্ষয়, তুমি যে আমাদের সকলের আগে রমেশকে চিনিতে পারিয়াছিলে, এ কথা হাজার বলিলেও আমি বিশ্বাস করিব না। তখন নিতান্ত গায়ের জ্বালায় তুমি রমেশকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতে না—সেটা যে তোমার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয়, তাহা আমি মানিব না। যাই হোক্, কলকৌশলের যদি প্রয়োজন থাকে, তবে তুমি লাগো, আমার দ্বারা হইবে না। মোটের উপরে নলিনাক্ষকে আমার ভালই লাগিতেছে না।

যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় উভয়ে যখন অন্নদার চা খাইবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, হেমনলিনী ঘরের অন্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। অক্ষয় বুঝিল, হেমনলিনী তাহাদিগকে জান্লা দিয়া পথেই দেখিতে পাইয়াছিল। ঈষৎ একটু হাসিয়া সে অন্নদার কাছে আসিয়া বসিল। চায়ের পেয়ালা ভর্ত্তি করিয়া লইয়া কহিল—"নলিনাক্ষবাবু যাহা বলেন, একেবারে প্রাণের ভিতর হইতে বলেন, সেইজন্য তাঁহার কথাগুলা এত সহজে প্রাণের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"লোকটির ক্ষমতা আছে।"

অক্ষয় কহিল—"শুধু ক্ষমতা! এমন সাধু-চরিত্রের লোক দেখা যায় না!"

যোগেন্দ্র যদিও উক্রান্তের মধ্যে ছিল, তবু সে থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"আঃ, সাধুচরিত্রের কথা আর বলিয়ো না—সাধুসঙ্গ হইতে ভগবান্ আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্!"

যোগেন্দ্র কাল এই নলিনাক্ষের সাধুতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিল—এবং যাহারা নলিনাক্ষের বিরুদ্ধে কথা কহে, তাহাদিগকে নিন্দুক বলিয়া গালি দিয়াছিল!

অন্নদা কহিলেন, "ছি যোগেন্দ্র, অমন কথা বলিয়ো না! বাহির হইতে যাঁহাদিগকে ভাল বলিয়া মনে হয়, অন্তরেও তাঁহারা ভাল, এ কথা বিশ্বাস করিয়া বরং আমি ঠকিতে রাজি আছি, তবু নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তার গৌরবরক্ষার জন্য সাধুতাকে সন্দেহ করিতে আমি প্রস্তুত নই। নলিনাক্ষবাবু যে সব কথা বলিয়াছেন, এ সমস্ত পরের মুখের কথা নহে;—তাঁহার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর হইতে তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার পক্ষে আজ তাহা নূতন লাভ বলিয়া মনে হইয়াছে। যে ব্যক্তি কপট, সে ব্যক্তি সত্যকার জিনিষ দিবে কোথা হইতে? সোনা যেমন বানানো যায় না, এ সব কথাও তেম্‌নি বানানো যায় না! আমার ইচ্ছা হইয়াছে, নলিনাক্ষবাবুকে আমি নিজে গিয়া সাধুবাদ দিয়া আসিব।"

অক্ষয় কহিল—"আমার ভয় হয়, ইঁহার শরীর টেঁকে কি না?"

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "কেন, ইঁহার শরীর কি ভাল নয়?"

অক্ষয়। ভাল থাকিবার ত কথা নয়—দিনরাত্রি আপনার সাধনা এবং শাস্ত্রালোচনা লইয়াই আছেন, শরীরের প্রতি ত আর দৃষ্টি নাই।

অন্নদা কহিলেন—"এটা ভারি অন্যায়! শরীর নষ্ট করিবার অধিকার আমাদের নাই—আমরা আমাদের শরীর সৃষ্টি করি নাই। আমি যদি উঁহাকে কাছে পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই অল্পদিনেই আমি উঁহার স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। আসলে স্বাস্থ্যরক্ষার গুটিকতক সহজ নিয়ম আছে, তাহার মধ্যে প্রথম হচ্চে—"

যোগেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া কহিল—"বাবা, বৃথা কেন তোমরা ভাবিয়া মরিতেছ! নলিনাক্ষবাবুর শরীর ত দিব্য দেখিলাম,—তাঁহাকে দেখিয়া আজ আমার বেশ বোধ হইল, সাধুত্ব-জিনিষটা স্বাস্থ্যকর। আমার নিজেরই মনে হইতেছে, ওটা চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয়!"

অন্নদা কহিলেন—"না যোগেন্দ্র, অক্ষয় যাহা বলিতেছে, তাহা হইতেও পারে। আমাদের দেশে বড় বড় লোকেরা প্রায় অল্পবয়সেই মারা যান—ইঁহারা নিজের শরীরকে উপেক্ষা করিয়া দেশের লোকসান করিয়া থাকেন। এটা কিছুতে ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। যোগেন্দ্র, তুমি নলিনাক্ষবাবুকে যাহা মনে করিতেছ, তাহা নয়, উঁহার মধ্যে আসল জিনিষ আছে। উঁহাকে এখন হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার।"

অক্ষয়। আমি উঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিব। আপনি যদি উঁহাকে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন ত

ভাল হয়। আর, আমার মনে হয়, আপনি সেই যে শিকড়ের রসটা আমাকে পরীক্ষার সময় দিয়াছিলেন, সেটা আশ্চর্য্য বলকারক! যে কোনো লোক সর্ব্বদা মনকে খাটাইতেছে, তাহার পক্ষে এমন মহৌষধ আর নাই। আপনি যদি একবার নলিনাক্ষবাবুকে—

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া-পড়িয়া কহিল—"আঃ, অক্ষয়, তুমি জ্বালাইলে! বড় বাড়াবাড়ি করিতেছ! আমি চলিলাম!

৪৫

অপরাহ্নের দিকে দোতলায় বসিবার ঘরে অন্নদাবাবু একটা কেদারার উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—পাশে একটি ছোট চৌকিতে বসিয়া হেমনলিনী তাহার পিতার জন্য নূতন বালিশের ওয়াড় তৈরি করিতেছে। মাঝে মাঝে একএকবার উদ্বিগ্নচিত্তে নিদ্রিত অন্নদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। খোলা জান্‌লা দিয়া তাঁহার মুখের উপর যে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোতে আজ অন্নদাবাবুর মুখ স্পষ্টই হল্‌দে দেখাইতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মুখে জরার চিহ্নগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজকাল প্রত্যহ বেলা দুটো-তিনটের পর তাঁহাকে ঘুমে অভিভূত করিয়া ফেলে; হাজার কাজ থাকিলেও তিনি আপনাকে জাগাইয়া রাখিতে পারেন না;—হেমনলিনীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতেও তাঁহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসে। এমন কি, সকালবেলাতেও প্রায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, চৌকিতে বসিয়া একখানা বই হাতে করিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যহ নিয়মিত বেড়াইতে যাইতেন, এখন আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই—এখন ঘর হইতে বাহির হইতে ক্লান্তি ও অনিচ্ছা বোধ হয়। পূর্ব্বে যখন তাঁহার শরীর ভাল ছিল, তখন তিনি ডাক্তারি ও কবিরাজি নানাপ্রকার বটিকাদি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন—এখন আর ওষুধ খাইবারও উৎসাহ নাই—এবং নিজের অস্বাস্থ্য লইয়া আজকাল তিনি আর আলোচনামাত্রও করেন না, বরঞ্চ তাহা গোপন করিতেই চেষ্টা করেন।

হেমনলিনী আজকাল আর তাঁহার কাছছাড়া হয় না। তাঁহারি কাজে তাহার দিন কাটিয়া যায়। অন্নদাবাবু তাঁহার শয়নঘরে গিয়া দেখেন, প্রায় প্রত্যহই তাঁহার ঘরের ছোটখাট পরিবর্ত্তন হইতেছে। একদিন দেখিলেন, চোখে আলো লাগে বলিয়া তাঁহার জান্‌লাগুলিতে সবুজ ছিটের ছোট ছোট পরদা খাটানো হইয়াছে। একদিন দেখিলেন, তাঁহার বসিবার কেদারায়, যে জায়গাটাতে মাথার তেল লাগিয়া কালো হইয়া গিয়াছিল, সেখানে ফুলের কাজ-করা কাপড়ের আবরণ পড়িয়াছে। তাঁহার চিরকেলে টিপাইটার উপর একটা পশমের টিপাইঢাকা কোথা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে! তাঁহার শোবার ঘরের প্রবেশদ্বারের জন্য একটা নানারঙের পুঁথির পরদাও যে তৈরি হইতেছে, তাহারও সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। পূর্ব্বে বাহির হইবার সময় অন্নদাবাবু তাঁহার জামাচাদরের ছিদ্রপ্রভৃতিসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না—এখন এ সকল বিষয়ে তাঁহার নিজের স্বাধীনতা আর চলিতেছে না। অন্নদাবাবু বলেন, "মা হেম আমাকে আমার

এই শেষবয়সে সৌখীন করিয়া তুলিতেছে—লোকে দেখিলে হাসিবে যে!"

আজ তাহার পিতা যখন কেদারায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী কোল হইতে শেলাইয়ের সামগ্রী নামাইয়া তাহার দাদাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য দ্বারের কাছে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দাদার সঙ্গে সঙ্গে নলিনাক্ষবাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে পালাইবার উপক্রম করিতেই যোগেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া কহিল—"হেম, নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে তোমার পরিচয় করাইয়া দিই।"

হেম থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং নলিনাক্ষ তাহার সম্মুখে আসিতেই তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া নমস্কার করিল। অন্নদাবাবু জাগিয়া-উঠিয়া ডাকিলেন—"হেম।" হেম তাঁহার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন।"

যোগেন্দ্রের সহিত নলিনাক্ষ ঘরে প্রবেশ করিতেই অন্নদাবাবু ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া নলিনাক্ষকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। কহিলেন, "আজ আমার বড় সৌভাগ্য,—আপনি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। হেম, কোথায় যাইতেছ মা, এইখানে বোস। নলিনাক্ষবাবু, এটি আমার কন্যা হেম,—আমরা দুজনেই সেদিন আপনার বক্তৃতা শুনিতে গিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছি। আপনি ঐ যে একটি কথা বলিয়াছেন, আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা কখনোই হারাইতে পারি না, যাহা যথার্থ পাই নাই তাহাই হারাই—এ কথাটির অর্থ বড় গভীর—কি বল মা হেম? বাস্তবিক কোন্ জিনিষটিকে যে আমার করিতে পারিয়াছি, আর কোন্‌টিকে পারি নাই, তাহার পরীক্ষা হয় তখনি, যখনি তাহা আমাদের হাতের কাছ হইতে সরিয়া যায়। নলিনাক্ষবাবু, আপনার কাছে আমাদের একটি অনুরোধ আছে। মাঝে মাঝে আপনি আসিয়া যদি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যান, তবে আমাদের বড় উপকার হয়। আমরা বড় কোথাও বাহির হই না—আপনি যখনি আসিবেন, আমাকে আর আমার মেয়েটিকে এই ঘরেই দেখিতে পাইবেন।"

নলিনাক্ষ আলজ্জিত হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিল—"আমি বক্তৃতাসভায় বড় বড় কথা বলিয়া আসিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে মস্ত একটা গম্ভীরলোক মনে করিবেন না। আমি লোকজনের সঙ্গে মিশিতে খুব ভালবাসি, গল্পগুজব করিয়া বেড়াই—অন্নদাবাবু যে আলোচনার কথা বলিতেছেন, আমার যদি সে সমস্ত অভ্যাস থাকিত, তবে লোকে আমার কাছে ঘেঁষিত না। সেদিন ছাত্ররা নিতান্ত ধরিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলাম—অনুরোধ এড়াইবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নাই—কিন্তু এমন করিয়া বলিয়া আসিয়াছি যে, দ্বিতীয়বার অনুরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা আমার নাই। ছাত্ররা স্পষ্টই বলিতেছে, আমার বক্তৃতা বারো-আনা বোঝাই যায় নাই। যোগেনবাবু, আপনিও ত সেদিন উপস্থিত ছিলেন—আপনাকে সতৃষ্ণনয়নে ঘড়ির দিকে তাকাইতে দেখিয়া আমার হৃদয় যে বিচলিত হয় নাই, এ কথা মনে করিবেন না!"

যোগেন্দ্র কহিল—"আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, সেটা আমার বুদ্ধির দোষ হইতে পারে, সেজন্য আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবেন না।"

অন্নদা। যোগেন, সব কথা বুঝিবার বয়স সব নয়।

নলিনাক্ষ। সব কথা বুঝিবার দরকারও সব সময়ে দেখি না। যাহার জলের এখনো দরকার পড়ে নাই, এমন সহস্র উদাসীন লোকের সম্মুখ দিয়া নদীর ধারা অবশেষে একজন তৃষার্ত্তের জলপাত্রের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেজন্য নদী কখনো খেদ করে না। কার কাজে লাগি, আর কার কাজে লাগি না, সে কথা লইয়া আন্দোলন করিয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি? নিজের গরজে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, তাহার সার্থকতা লইয়া কাহারো সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্নদা। কিন্তু নলিনবাবু, আপনাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে। ঈশ্বর আপনাদিগকে কাজ করাইয়া লইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, তাই বলিয়া শরীরকে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা দাতা, তাঁহাদের এ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ করাইতে হয় যে, মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলিবেন না, তাহা হইলে দান করিবার শক্তি চলিয়া যাইবে।

নলিনাক্ষ। আপনি যদি আমাকে কখনো ভাল করিয়া জানিবার অবসর পান, তবে দেখিবেন, আমি সংসারে কোনো-কিছুকেই অবহেলা করি না। জগতে নিতান্তই ভিক্ষুকের মত আসিয়াছিলাম, বহুকষ্টে বহু লোকের আনুকূল্যে শরীরমন অল্পে অল্পে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। আমার পক্ষে এ নবাবী শোভা পায় না যে, আমি কিছুকেই অবহেলা করিয়া নষ্ট করিব। যে ব্যক্তি গড়িতে পারে না, সে ব্যক্তি ভাঙিবার অধিকারী ত নয়!

অন্নদা। বড় ঠিক কথা বলিয়াছেন। আপনি কতকটা এইভাবের কথাই সেদিন-কার প্রবন্ধেও বলিয়াছিলেন।

নলিনাক্ষ। আমি বলিয়াছিলাম—সংসারের জিনিষগুলিও আমার জন্য বসিয়া থাকে না, সময়ও আমার জন্য অপেক্ষা করে না। এমন অবস্থায় কেবল ক্ষতির উপরেই সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকিলে তার চেয়ে অনেক বৃহৎ জিনিষ হইতে আপ-নাকে বঞ্চিত করা হয়—আমরা এত বড় ধনী নই যে, এই সংসারের ঐশ্বর্য্য আমরা এম্নি করিয়াই অগ্রাহ্য করিতে পারি! অন্নদাবাবু, আমি আনন্দকেই ঈশ্বরের পূজা বলিয়া জানি। খেদ-আক্ষেপ-পরিতাপ লইয়া যেদিন বিশ্ব-দেবালয়কে মলিন করিয়া ফেলি, সেদিন আর-যাহা-কিছু হারাইয়াছে, সেই সঙ্গে ভগ-বান্‌কেও হারাই। আমি নিরানন্দ লইয়া অধিকক্ষণ কারবার করিতে সাহস করি না।

যোগেন্দ্র। আপনারা বসুন্, আমি চলিলাম—একটু কাজ আছে!

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন। নিশ্চয় জানিবেন, লোককে অতিষ্ঠ-করা আমার স্বভাব নয়! আজ অন্নদাবাবু নিতান্ত উত্তেজিত করিয়া আমাকে লোকসমাজের পক্ষে অসহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আজ না হয় আমি উঠি! চলুন্, খানিকটা রাস্তা আপনার সঙ্গে যাওয়া যাক্!

যোগেন্দ্র। না না, আপনি বসুন্। আমার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। আমি কোথাও বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু, যোগেনের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। যোগেন এম্নি, যখন খুসি আসে, যখন খুসি যায়, উহাকে ধরিয়া রাখা শক্ত।

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিনবাবু, আপনি এখন কোথায় আছেন ?"

নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল—"আমি যে বিশেষ কোথাও আছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার জানাশুনা লোক অনেক আছেন, তাঁহারা আমাকে টানাটানি করিয়া লইয়া বেড়ান। আমার সে মন্দ লাগে না—কিন্তু মানুষের চুপ করিয়া থাকারও প্রয়োজন আছে। তাই যোগেনবাবু আমার জন্য আপনাদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতেই স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ গলিটি বেশ নিভৃত বটে।"

এই সংবাদে অন্নদাবাবু বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনি যদি লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন ত দেখিতে পাইতেন যে, কথাটা শুনিবামাত্র হেমনলিনীর মুখ ক্ষণকালের জন্য বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। ঐ পাশের বাসাতেই রমেশ ছিল।

ইতিমধ্যে চা তৈরির খবর পাইয়া সকলে মিলিয়া নীচে চা খাইবার ঘরে গেলেন। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, নলিনবাবুকে একপেয়ালা চা দাও!"

নলিনাক্ষ কহিল, "না অন্নদাবাবু, আমি চা খাইব না!"

অন্নদা। সে কি কথা নলিনবাবু! এক-পেয়ালা চা—না হয় ত কিছু মিষ্টি খান্!

নলিনাক্ষ। আমাকে মাপ করিবেন।

অন্নদা। আপনি ডাক্তার, আপনাকে আর কি বলিব! মধ্যাহ্নভোজনের তিন-চার-ঘণ্টা পরে চায়ের উপলক্ষ্যে খানিকটা গরমজল খাওয়া হজমের পক্ষে যে নিতান্ত উপকারী। অভ্যাস না থাকে যদি, আপনাকে না হয় খুব পাৎলা করিয়া চা তৈরি করিয়া দিই!

নলিনাক্ষ চকিতের মধ্যে হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল যে, হেমনলিনী নলিনাক্ষের চা খাইতে সঙ্কোচসম্বন্ধে একটা কি আন্দাজ করিয়াছে এবং তাহাই লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া নলিনাক্ষ কহিল—"আপনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আপনাদের এই চায়ের টেবিল্‌কে আমি ঘৃণা করিতেছি বলিয়া মনেও করিবেন না। পূর্ব্বে আমি যথেষ্ট চা খাইয়াছি—চায়ের গন্ধে এখনো আমার মনটা উৎসুক হয়—আপনাদের চা খাইতে দেখিয়া আমি আনন্দবোধ করিতেছি। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমার মা অত্যন্ত আচারপরায়ণী—আমি ছাড়া তাঁহার যথার্থ আপনার কেহ নাই—সেই মার কাছে আমি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারিব না। এইজন্য আমি চা খাই না। কিন্তু আপনারা চা খাইয়া যে সুখটুকু পাইতেছেন, আমি তাহার ভাগ পাইতেছি। আপনাদের আতিথ্য হইতে আমি বঞ্চিত নহি।"

ইতিপূর্ব্বে নলিনাক্ষের কথাবার্ত্তায় হেমনলিনী মনে মনে একটু যেন আঘাত পাইতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, নলিনাক্ষ নিজেকে তাহাদের কাছে ঠিকভাবে প্রকাশ করিতেছিল না। সে কেবলি বেশি কথা কহিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিবারই চেষ্টা করিতেছিল। হেমনলিনী জানিত না, প্রথম পরিচয়ে নলিনাক্ষ একটা একান্ত সঙ্কোচের ভাব কিছুতেই তাড়াইতে পারে না। এইজন্য নূতন লোকের কাছে অনেকস্থলেই সে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করিয়া প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে। নিজের অকৃত্রিম মনের কথা বলিতে গেলেও তাহার মধ্যে একটা বেসুর লাগাইয়া বসে। সেটা নিজের কানেও ঠেকে। সেইজন্যই আজ যোগেন্দ্র যখন অধীর হইয়া উঠিয়া পড়িল, তখন নলিনাক্ষ মনের মধ্যে একটা ধিক্কার অনুভব করিয়া তাহার সঙ্গে পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু নলিনাক্ষ যখন মার কথা বলিল, তখন হেমনলিনী শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার মুখের দিকে-না চাহিয়া থাকিতে পারিল না, এবং মাতার উল্লেখমাত্রে সেই মুহূর্ত্তেই নলিনাক্ষের মুখে যে একটি সরস ভক্তির গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া হেমনলিনীর মন আর্দ্র হইয়া গেল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নলিনাক্ষের মাতার সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আলোচনা করে, কিন্তু সঙ্কোচে তাহা পারিল না।

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলক্ষণ! এ কথা পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই আপনাকে চা খাইতে অনুরোধ করিতাম না। মাপ করিবেন!"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "চা লইতে পারিলাম না বলিয়া আপনাদের স্নেহের অনুরোধ হইতে কেন বঞ্চিত হইব?"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে হেমনলিনী তাহার পিতাকে লইয়া দোতলার ঘরে গিয়া বসিল এবং বাংলা মাসিকপত্রিকা হইতে প্রবন্ধ বাছিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে অন্নদাবাবু অনতিবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুদিন হইতে অন্নদাবাবুর শরীরে এইরূপ অবসাদের লক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

অন্নদাবাবু ঘুমাইয়া পড়িতেই আজ হেমনলিনী নিঃশব্দপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া ছাদের উপর উঠিল। হেমন্তের সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে আজ বর্ণচ্ছটা নাই। কলিকাতার ধূলিমিশ্রিত ঘনধূম্র বাষ্পের ভিতর দিয়া অত্যন্ত মলিন তাম্রবর্ণ সূর্য্যাস্তের আভা অভিভূত হইতেছে।

ছাদের প্রান্তপ্রাচীরে ভর দিয়া হেমনলিনী পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। আজ ঘরের জান্‌লাগুলি খোলা; এতদিনের রুদ্ধঘরে বায়ুচালনার চেষ্টা করা হইতেছে। ঘরগুলি যেন এতকাল যে পুরাতনের বদ্ধস্মৃতিকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া বাহিরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সেই স্মৃতিকে আজ অনন্ত আকাশ, বাতাস ও আলোকের মধ্যে বিদায় দিবার জন্য বক্ষঃকপাট উন্মুক্ত করিয়াছে। হেমনলিনী সেই মুক্তবাতায়ন ঘরগুলির শূন্যতা ও অন্ধকারের মধ্যে, অস্তকার এই সায়ন্তনকালের বাষ্পস্তরভেদী ম্লানকরুণ রশ্মিরেখার ন্যায়, তাহার ব্যাকুলদৃষ্টি প্রেরণ করিল।

দিনান্তের শেষ আলোটুকু যখন অবসন্ন হইয়া গেল, তখন সেই অন্ধকারে হঠাৎ পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া হেমনলিনী চকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, তুমি একলা ছাদে আসিয়াছ? আজ আমার কেমন-একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, কিছু টের পাই নাই।"

প্রত্যহই যে তাঁহার তন্দ্রা আসে, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিরুদ্ধেও তাহা অন্নদাবাবু অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন—হেমনলিনীও এমন চুপ করিয়া থাকে, যেন সে তাঁহার ঘুম লক্ষ্যই করে নাই।

অন্নদাবাবুকে দেখিয়া হেম আজ অত্যন্ত লজ্জিত হইল। অন্নদাবাবুরও মনের মধ্যে একটা ঘা লাগিল। রমেশের ব্যাপারটা ক্রমে হেমনলিনীর জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, এই আশা করিয়া কয়দিন তাঁহার হৃদয়টা লঘু হইয়া আসিয়াছিল—আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে হেমকে একলা ছাদের উপর দেখিয়া আবার তাঁহার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। হেম তাহা শুনিতে পাইল। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে এই বৃদ্ধের যে একটি ক্লান্তি ও পরাভবের নৈরাশ্য বাজিয়া উঠিল, তাহা সেই মুহূর্ত্তেই হেমনলিনীর নয়নপল্লব আর্দ্র করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ সে পিতার কাছে আসিয়া কহিল, "বাবা, চল আমাদের বসিবার ঘরে যাই—এখানে হিম পড়িতেছে।"

অন্নদাবাবু কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন ও চুপ করিয়া অত্যন্ত কেদারাটির উপরে বসিলেন। হেমনলিনী তাঁহার পাশে একটি চৌকি টানিয়া-আনিয়া বসিল ও তাড়াতাড়ি একটা-কোনো কথোপকথনের প্রসঙ্গ তুলিবার জন্য বলিল—"বাবা, নলিনাক্ষবাবু কেমন চমৎকার লোক!"

নলিনাক্ষবাবুকে হেমনলিনীর ঠিক এতটা চমৎকার ঠেকে নাই—কিন্তু নিজের মনের বিষণ্ণতা অপ্রমাণ করিবার জন্য কথাটাতে কিছু অতিরিক্ত উত্তম প্রয়োগ করিয়া বসিল। এ কথা যেন কেহ না বলে যে, পৃথিবীতে সকল লোক এবং সকল জিনিষের উপরেই হেমনলিনীর ঔদাসীন্য জন্মিয়া গেছে।

অন্নদাবাবুও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ছেলেটিকে আমারও বড় ভাল লাগিয়াছে। বয়সে বোধ করি আমার যোগেনেরই সমান হইবে, কিন্তু মুখ দেখিলে যেন বালক বোধ হয়। অথচ চোখদুটো দেখিয়াছ হেম! আমি ত এমন চোখ দেখি নাই। তাহার চোখে তাকাইয়া আমার কি-একটা মনে হইতে লাগিল বলিতে পারি না। তুমি লক্ষ্য কর নাই?"

হেম কহিল—"না বাবা, আমি ঠিক তাঁর চোখের দিকে তেমন করিয়া চাহি নাই, কিন্তু তাঁহার হাসিটি বড় প্রসন্ন।"

অন্নদা। ঠিক বলিয়াছ, তাঁহার হাসির একটা বিশেষত্ব আছে বটে! মনে হয় যেন, যাহা-কিছু দেখিতেছেন, সকল হইতেই একটা প্রসন্নতা প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার মুখের উপরে আসিয়া পড়িতেছে।

হেম কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কোনো লোকেরই সম্বন্ধে অন্নদাবাবু এ-পরিমাণ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করেন নাই।

এমন কি, হেমনলিনীর মনে ঈষৎ-একটু ঈর্ষার সঞ্চার হইল—সে ঈর্ষা নিজেকে লইয়া, কি রমেশকে লইয়া, তাহা বলা শক্ত। রমেশের প্রতি অন্নদাবাবুর শ্রদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু এমনতর মুগ্ধভাবের স্নেহ ছিল না। রমেশ যে তাঁহার অন্তঃকরণকে তেমন গভীরতর স্থানে স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল, তাহা নহে।

অন্নদা। নলিনাক্ষবাবু যে আমাদের পাশের বাড়ীটি লইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় খুসি হইয়াছি।

হেমনলিনী। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে বড় বেশি বিরক্ত করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ত তিনি টি'কিতে পারিবেন না। তিনি নির্জ্জন মনে করিয়াই এই গলির মধ্যে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছেন।

অন্নদা। দেখ হেম, নলিনাক্ষবাবুদের মত লোক নিজেরা যাহা চান, তাহাই যে নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পাইবেন, বিধাতা তাঁহাদের ললাটে এমনটা লেখেন নাই। তাঁহার কাছ হইতে আমরা যাহা চাই, তাহা তাঁহার এড়াইবার জো নাই। আমরা তাঁহাকে বিরক্ত যদি করি, তবে সে তাঁহাকে সহিতেই হইবে। এরকম লোক বাড়ীর কর্ত্রীর মত আগে সকলের আহার শেষ হইলে তবে নিজের আহারে বসিতে পারেন—বেলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া অতিথিকে ফিরাইতে পারেন না।

যখন-তখন যাহাকে-তাহাকে লইয়া অন্নদাবাবুকে এরূপ কেহ মাতিয়া উঠিতে দেখে নাই—বরঞ্চ তিনি সাধারণত খ্যাত লোকদিগকেও যথেষ্ট খ্যাতি দিতে কৃপণতা করেন। এইজন্য তাঁহার এই ভক্তির সহজ উচ্ছ্বাস হেমনলিনীকে স্পর্শ করিল। তখন হেমনলিনী নলিনাক্ষকে সাধারণ মনুষ্যশ্রেণী হইতে তফাত করিয়া আপনার অঙ্কুরিত ঈর্ষাকে দলন করিয়া ফেলিল ও ক্রমশই কথাপ্রসঙ্গে অন্নদাবাবুর উৎসাহ বিনা বিরোধে তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা, চল একবার ও বাড়ীটা দেখিয়া আসি। কাল নলিনবাবু ওখানে আসিবেন, দেখি, সমস্ত পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না।"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে কহিল, "এখন অন্ধকার হইয়া গেছে, এখন কি ভাল দেখা যাইবে?"

হেমের অনিচ্ছা দেখিয়া অন্নদাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা থাক্, কাল সকালে গিয়া দেখিয়া আসিব।"

ইহার পরে ক্ষণকাল কোনো কথা হইল না। হঠাৎ হেম উঠিয়া কহিল, "চল বাবা, বাড়ীটা দেখিয়া আসি গে।"

এই বলিয়া, যেখানে বেদনা, সেইখানেই হেম অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত আঘাত করিতে প্রস্তুত হইল।

ক্রমশ।

শুভযাত্রা।

শুভ্র হেমন্তের রাত্রি অবসানপ্রায়,
হিমক্লিষ্ট চাঁদখানি অস্তে যায় যায়।
সুখময়-শারদীয়-অবসর-শেষে
শুভযাত্রা করি' পুন ফিরিব বিদেশে।

অবিশ্রান্ত কলস্বরে গাহি নিরবধি,
ধৌত করি সৌধমূল বহে পূর্ণা নদী।
তরণী প্রস্তুত ঘাটে,—প্রস্তুত সকলি;
মাঝিগণ দিল সাড়া দুর্গা দুর্গা বলি'।
বরষাসঞ্চিত গর্ব্বে পূর্ণ কূলে কূলে
দুলায়ে দুলায়ে তরি স্রোতস্বিনী দুলে।
বহিল বিভাতবায়ু হিমকণা হানি'।
শীতাঙ্কিত-তনু-'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
শয্যালীন পুরবাসী তন্দ্রাতুর সুখে;
অশান্তি জাগিছে শুধু দুইখানি বুকে।
'সূর্য্য-অভ্যুদয়ে যাত্রা'—তার পর নাকি
পড়িবে 'অদিন';—আর আধঘণ্টা বাকি।
ভৃত্য আসি কহে দ্বারে—"প্রস্তুত সকলি;"
তাড়াতাড়ি উঠিলাম সুখশয্যা ভুলি'।
—সকলি প্রস্তুত? কিন্তু বিদায় যে বাকি!
কম্পান্বিত হাতখানি প্রিয়াহস্তে রাখি'
রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম, "তবে আমি আসি।"
—অমনি নয়ন গেল অশ্রুজলে ভাসি';
বহিয়া কপোল বক্ষ তিতিয়া বসন
বিগলিত প্রণয়ের সুধাপ্রস্রবণ!
নারিনু যাইতে ছাড়ি'—বসিনু আবার;
অশ্রুসিক্ত আঁখি দুটি চুম্বি' বারবার,
কত-না সান্ত্বনাবাণী কহিনু কাতরে,
ভৃত্য ডাকি' কহে পুন উচ্চকণ্ঠস্বরে—
"কর্ত্তা পাঠালেন বলি'—'আর দেরি নাই'"—
"এই আসি বল্ গিয়ে"—"প্রিয়ে তবে যাই?"
আবার সে কণ্ঠখানি আসিল জড়ায়ে;
বাষ্পাকুল নেত্র হ'তে আর্দ্রপক্ষ্মচ্ছায়ে
আবার জাগিল অশ্রু আকুল উচ্ছ্বাসে।
—দোয়েল উঠিল ডাকি' বাতায়নপাশে।
"বিদায় বিদায় তবে।" মৃদুকণ্ঠস্বরে,
শুনিলাম "এস তবে" কম্পিত মর্ম্মরে।
এবার বাজিল কর্ণে দৃঢ় রুক্ষরবে—
"কিসের বিলম্ব এত, কতক্ষণ হবে?"
সূর্য্যোদয়ে 'মহাদণ্ডা'-দোষের সঞ্চার;
সমাজদেবের আজ্ঞা—"যাত্রা নাহি আর।"
হৃদয়দেবতা হাসি' কহিল উত্তরে,
"প্রসন্ন বিদায়দৃষ্টি সর্ব্বদোষ হরে।"

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি' নৌকা দিনু খুলি';
অশুভযাত্রার কথা ত্বরা গেনু ভুলি'।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৪৬

অন্নদাবাবুর পাশের বাসার দ্বারের সম্মুখে কিছু কিছু জিনিষপত্র লইয়া গোরুর গাড়ি এবং মুটে আনাগোনা করিতে লাগিল। ঝাড়পোঁছ এবং দরজাজান্‌লা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শোনা যাইতেছে। রান্নাঘরের দিক্‌টা হইতে বহুকাল পরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিয়াছে। একতলায় উঠানের কোণে খোলা কলের মুখ হইতে জলপড়ার শব্দ এ বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

সেই তার বহুপরিচিত এতদিনের শূন্য-বাসায় লোকবসতির এই সকল শব্দে ও দৃশ্যে হেমনলিনীর মনটাকে আজ অত্যন্ত উতলা করিয়া তুলিল। নূতন অগ্রাণের সকাল-বেলাকার রৌদ্রে সমস্ত কলিকাতা বিচিত্র কাজে জাগিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই প্রভাত, এই রৌদ্র হেমনলিনীর চারিদিকের আকাশে কি সুর, কি কথা জাগাইয়া তুলিতেছে! হেম যেদিকে যায়, যেদিকে তাকায়, সকল দিক্ হইতেই তাহাকে কোন্ অশরীর আবির্ভাব বেষ্টন করে—যাহা ফুরাইয়া গেছে, যাহা ফিরিবার নহে, যাহা সর্ব্বপ্রকারেই অসম্ভব, তাহাই পথহারা পিতৃহীন শিশুর মত আজিকার এই আলোকে, এই বাতাসে কোথা হইতে কেবলি ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছে! এই সময়টাতে অন্নদাবাবু তাঁহার কাজের চিঠিপত্র ও হিসাব লেখার কাজে নিযুক্ত থাকেন। হেমনলিনী তাঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, কোনো কথা আছে!"

হেমনলিনী কহিল—"না বাবা, একবার কেবল দেখিতে আসিলাম,—তুমি কি করিতেছ!"

অন্নদাবাবু তাঁহার চসমা খুলিয়া খাতা বন্ধ করিয়া কহিলেন—"এই যে এখানে চৌকি আছে, একটু বোসো না।"

হেমনলিনী কহিল, "না বাবা, আমি বসিব না। তুমি কাজ কর!"

সেখান হইতে গিয়া হেমনলিনী আল্‌মারিতে তাহার বইগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু গোছানো বড় বেশি অগ্রসর হয় না। হঠাৎ একএকটা বই হাতে পড়ে, অমনি তাহা খুলিয়া তাহার পাতাগুলি

উল্টাইয়া যায়,—এই বইগুলির পাতায় গ্রন্থকাররচিত যে সকল কথা ছাপা আছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে কতদিনের কত অরচিত কথা কত অদৃশ্য অক্ষরে জড়িত হইয়া আছে, তাহারা হেমনলিনীর বুকের মধ্যে—পোড়োবাড়ীর শূন্যঘরগুলার ভিতর দিয়া যেমন করিয়া সন্ধ্যাবেলাকার পাখী কেবলি অকারণে আনাগোনা করিতে থাকে, তেম্‌নি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার বইসাজানো শেষ হইল না। আল্‌মারি বন্ধ করিয়া আবার তাহার পিতার শয়নঘরে গিয়া কহিল, "যাও বাবা, তুমি নাইতে যাও, আমি তোমার ঘর একটু গুছাইয়া ফেলি!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"ঘর ত বেশ গোছানো আছে, আবার কি গুছাইবে! হেম, আমার এই ছোট ঘরটাকে লইয়া আর কি করিবে বল দেখি! যে-রকম করিয়া তুলিয়াছ, এখানে আমার বিছানা না রাখিয়া দিল্লির ময়ূরতক্ত রাখিলে শোভা পাইত।"

হেমনলিনী কহিল—"না বাবা, তুমি যাও—সমস্ত পরিষ্কার করিতে হইবে।"

বাধ্য সন্তানটির মত অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেলে পর সমস্ত বিছানাপত্র তুলিয়া, জিনিষপত্র ঝাড়িয়া, যেটা যেখানে ছিল সেটাকে আবার আর-এক জায়গায় রাখিয়া, ঘরটাকে হেমনলিনী আবার নূতনরকম করিয়া সাজাইয়া দিল। ইহাতে অনেকটা সময় গেল—কিন্তু সমস্ত কাজের মধ্যে রুদ্ধবেদনা তাহার হৃদয়কে একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম দিল না।

আহারান্তে অন্নদাবাবু তাঁহার চৌকিতে ঘুমাইয়া পড়িলে আজ হেমনলিনী নিজের শোবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বিবাহব্যাপারঘটিত গোলমালের পর হইতে অন্নদাবাবু, বোধ করি, কন্যাকে পরিচিত লোকের কৌতূহলদৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপাসনাগৃহে যান নাই। আজ হেম মেজের কার্পেটের উপর বসিয়া অভ্যস্ত রীতি অনুসারে উপাসনা করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মনকে কিছুতেই ঠেকাইতে পারিল না, অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামীকে ধরিতে পারিল না। অন্যসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্যে সে প্রথাপালনস্বরূপ যোগ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছে—উপদেশ ও গান শুনিয়া তাহার মনে যে একটা ভাবোদয় হইয়াছে, তাহাকেই সে কৃতার্থতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত আবশ্যকের সময়। আজ সে ধ্রুব একটা-কিছুকে দৃঢ়নিশ্চিতভাবে ধরিতে চায়; আজ কেবল প্রথাপালন, কেবল ভাবের তৃপ্তি নয়,—আজ ডাঙার মাছ যেমন করিয়া জল চায়, তেম্‌নি করিয়া সে শান্তি ও সান্ত্বনা চাহিতেছে। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন হেমনলিনী কাঁদিয়া-উঠিয়া কহিল—"এতদিন তবে আমি কি করিলাম! দুঃখের দিনের জন্যে আমি কিছুই অন্তরের মধ্যে সঞ্চয় করিতে পারি নাই!" অনেকদিন পরে তাহার হার্ম্মোনিয়মের ধূলা ঝাড়িয়া ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিতে বসিল। কিন্তু এ হার্ম্মোনিয়মে ব্রহ্মসঙ্গীতের রাগিণী ভেদ করিয়া ও কি সুর বাজে! অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ও কি সুর!

দ্বারে আঘাতের সঙ্গে ডাক পড়িল "হেম!"

হেমনলিনী দ্বার খুলিয়া দিয়া কহিল—"কি বাবা!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"তোমার গান শুনিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। অনেকদিন তোমার গানবাজনা শুনি নাই।"

এই বলিয়া তিনি বসিলেন। হেমনলিনী কহিল—"বাবা, কি গান গাহিব?"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"তোমার যে গান মনে আসে গাও!"

হেমনলিনী। আমার ত কোনো গানই মনে আসে না—তুমি যাহা বলিবে, তাহাই গাহিব।

হেমনলিনীর কাছ হইতে যে সব গান শোনা তাঁহার অভ্যাস, তাহারই মধ্যে বাছিয়া অন্নদাবাবু ফরমাস করিলেন। সেই পুরাতন গানের খানিকটা গাহিয়াই হেমনলিনী হার্ম্মোনিয়ম বন্ধ করিয়া দিল, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল হেম? গলা ভাল নাই বুঝি!"

হেম সংক্ষেপে কহিল—"না।"—বলিয়াই সে উঠিয়া পড়িল, এবং ঘরের কোণে তাহার কাপড়ের আল্‌মারিটা খুলিয়া মিছামিছি কাপড় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার দুই চোখ দিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—মনে করিলেন, হঠাৎ বুঝি কাপড়সম্বন্ধে একটা কোনো কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। কহিলেন, "চল, তবে ও ঘরে যাই!"

হেমনলিনী কহিল—"যাইতেছি।"

অন্নদাবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে হেমনলিনী তাহার বিছানায় শুইয়া বালিশে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া লইল। তাহার পরে ভাল করিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া তাহার পিতার কাছে গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"ও বাড়ীতে আজ নলিনাক্ষবাবু আসিয়াছেন, আমি গিয়া তাঁহাকে এখানে ডাকিয়া নিয়া আসি।"

হেম কহিল—"তিনি নিশ্চয় আজ ব্যস্ত আছেন, আজ তাঁহাকে নাই বা ডাকিলে! তা ছাড়া একটু অপেক্ষা করিয়া দেখ না বাবা,—তিনি যদি লোকের সঙ্গ ভাল না বাসেন, তবে আমরা যেন জোর করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া না তুলি!"

অন্নদাবাবু অনিচ্ছাক্রমে হেমের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার পরে যোগেন্দ্র উঠিয়া গেলে হেম অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ তুমি আমাকে লইয়া একবারটি উপাসনা কর না!"

শুনিয়া অন্নদাবাবু ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, একবার চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পরে ধীরস্বরে কহিলেন, "মা হেম, আমি সত্যকথা বলিতেছি, ইচ্ছা করিলেই আমি উপাসনা করিতে পারি না। এমন কি, যখন একলা নিভৃতে চেষ্টা করি, তখনো অনেকসময় হৃদয়ের মধ্যে শুষ্কতা-শূন্যতা অনুভব করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। অন্য কাহাকেও লইয়া কথা উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করিতে গেলে সেই শব্দগুলা এবং শ্রোতার প্রতি আমার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। আমি সাধক নই মা।

আর কেহ যখন উপাসনা করেন, তখন তাঁহার উপদেশে ও গানে যেটুকু লাভ করি, সেই আমার সম্বল।"

হেমনলিনী কহিল—"কাল রবিবার আছে, কাল আমরা সমাজে যাইব। কি বল বাবা?"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"বেশ ত!"

পরদিন সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই হেমনলিনী ছাদে উঠিল। তাহার ইচ্ছা ছিল, প্রশান্ত প্রত্যুষে উপাসনাদ্বারা সে আর-একবার মনকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ছাদে উঠিয়া দেখিল, হেমনলিনীর বাড়ীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া নলিনাক্ষ পূর্ব্বমুখ হইয়া জোড়হস্তে নিশ্চলমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে। এই শীতের প্রভাতে তাহার পিঠ হইতে স্খলিত-প্রায় একখানি তসরের চাদর ভূমিপর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়াছে। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছুকাল পরে হেম আবার ছাদে উঠিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ ছাদের মেজের উপরে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া পদ্মাসনে বসিয়া আছে। এবারে সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া দেখিল—পশ্চাৎ হইতেও বুঝিতে পারিল, নলিনাক্ষ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা একএকবার একএকটি নাসারন্ধ্র রোধ করিয়া শ্বাসক্রিয়া লইয়া কি-একটা অভ্যাস করিতেছে। হেমনলিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবার ছাদ হইতে নীচের তলায় নামিয়া গেল।

অন্নদাবাবু মনে করিয়াছিলেন, নলিনাক্ষ আজ কোনো একসময়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে। হেম তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, নলিনাক্ষ যদি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনীয় মনে করে, তবে আপনি দেখা করিতে আসিবে—অন্নদাবাবু তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নলিনাক্ষকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর একটি আশ্চর্য্য আকর্ষণ হইয়াছিল। তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাঁহার মধ্যে যে গভীরতম অভাব আছে, নলিনাক্ষের দ্বারাতেই তাহার পূরণ হইবে। তিনি হেমনলিনীকে বলিয়াছিলেন, শুদ্ধমাত্র নলিনাক্ষবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আমি জানি না কেমন করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহার সমস্ত কথা একটা পূর্ণতার মধ্য হইতে উঠিতেছে।

আজও নলিনাক্ষের দেখা না পাইয়া অন্নদাবাবু নিরাশমনে সন্ধ্যার সময় হেমনলিনীকে লইয়া উপাসনাগৃহে গেলেন। পূর্ব্বে হেম যে ভাবে উপাসনালয়ে প্রবেশ করিত, আজ সে ভাবে গেল না—কিছু-একটা শুনিয়া আসিবে, করিয়া আসিবে, ভাবিয়া আসিবে বলিয়া নয়, কিছু-একটা লইয়া আসিবে বলিয়াই সে কম্পিত আগ্রহে সভাস্থলে প্রবেশ করিল। কথার উপর কথা, কথার উপর কথা, অনেক কথা সে শুনিল—কিন্তু কোথায় সেই কথা, কোথায় তাহার অন্তরের অভাব, কোথায় তাহার তৃষাতুর মন। যখন হেমনলিনী কোনো মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন না লইয়া এখানে আসিয়াছে, তখন সেই কথাপ্রবাহের অনর্গল আঘাতে মনের মধ্যে সে বিচিত্র আন্দোলন অনুভব করিয়া সুখ পাইয়াছে। আজ সে তাহার চেয়ে অনেক-বেশি চাহিয়াছিল বলিয়া কিছুই পাইল না। তাহার

পক্ষে অনাবশ্যক কথার ধারা তাহাকে শ্রান্ত করিতে লাগিল।

ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় অন্নদাবাবু গলির মোড়ের কাছেই নলিনাক্ষকে দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি গাড়ি দাঁড় করাইয়া নামিয়া পড়িলেন—কহিলেন, "কই নলিনাক্ষবাবু, ঘরের পাশে আসিয়া অবধি আপনাকে যে আর দেখিতে পাই না।"

নলিনাক্ষ কহিল—"প্রয়োজন হইলেই ডাক দিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।"

অন্নদা। কোনো কাজ যদি না থাকে, তবে একবার আমাদের ওদিকে চলুন্। অধিক রাত হয় নাই। আপনার আহার হইয়াছে কি?

নলিনাক্ষ কহিল, "আমি রাত্রে আহার করি না।"

অন্নদা। তবে দয়া করিয়া আমাদের আহারস্থলে সাক্ষী হইয়া বসিবেন।

সেদিন বাড়ী লইয়া গিয়া নলিনাক্ষকে অন্নদাবাবু নানা গভীর বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রবিবারে বন্ধুবাড়ীতে যোগেন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল। নিভৃতঘরে পিতা ও কন্যা নিস্তব্ধ হইয়া নলিনাক্ষের মুখ হইতে তত্ত্বকথা শুনিতে লাগিল। রাত প্রায় দুই-প্রহর হইয়া গেলে যোগেন্দ্র আসিতেই তাঁহাদের সভা ভাঙিয়া গেল।

৪৭

কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের সহিত অন্নদাবাবুদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল। প্রথমে হেমনলিনী মনে করিয়াছিল, নলিনাক্ষের মত লোকের কাছে কেবল বড় বড় আধ্যাত্মিক বিষয়েই বুঝি উপদেশ পাওয়া যাইবে—এমন মানুষের সঙ্গে যে সাধারণ বিষয়ে সহজ লোকের মত আলাপ চলিতে পারে, তাহা মনেও করিতে পারে নাই। অথচ সমস্ত হাস্যালাপের মধ্যে নলিনাক্ষের একটা কেমন দূরত্বও ছিল।

একদিন অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এমন সময়ে যোগেন্দ্র কিছু উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল, "জান বাবা, আজকাল আমাদিগকে সমাজের লোকে নলিনাক্ষবাবুর চেলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই লইয়া এইমাত্র পরেশের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমি ত লজ্জার কথা কিছু দেখি না। যেখানে সকলেই গুরু, কেহই চেলা নয়, সেই দলে মিশিতেই আমার লজ্জাবোধ হয়;—সেখানে শিক্ষা দিবার হুড়োমুড়িতে শিক্ষা পাইবার অবকাশ থাকে না।"

নলিনাক্ষ। অন্নদাবাবু, আমিও আপনার দলে—আমরা চেলার দল। যেখানে আমাদের কিছু শিখিবার সম্ভাবনা আছে, সেইখানেই আমরা তল্পি বহিয়া বেড়াইব।

যোগেন্দ্র অধীর হইয়া কহিল—"না না, কথাটা ভাল নয়। নলিনবাবু, কেহই যে আপনার বন্ধু বা আত্মীয় হইতে পারিবে না—যাহারা আপনার কাছে আসিবে, তাহারাই আপনার চেলা বলিয়া খ্যাত হইয়া যাইবে, এমন বদ্‌নামটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। আপনি কি-সব কাণ্ড করেন, ওগুলা ছাড়িয়া দিন্।"

নলিনাক্ষ। কি করিয়া থাকি বলুন্।

যোগেন্দ্র। ঐ যে শুনিয়াছি প্রাণায়াম করেন, ভোরের বেলায় সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, খাওয়াদাওয়া লইয়া নানাপ্রকার আচারবিচার করিতে ছাড়েন না, ইহাতে দশের মধ্যে আপনি খাপ্ছাড়া হইয়া পড়েন।

যোগেন্দ্রের এই রূঢ়বাক্যে ব্যথিত হইয়া হেমনলিনী মাথা নীচু করিল। নলিনাক্ষ হাসিয়া কহিল—"যোগেনবাবু, দশের মধ্যে খাপ্ছাড়া হওয়াটা দোষের। কিন্তু তলোয়ারেরই কি, আর মানুষেরই কি, তাহার সবটাই কি খাপের মধ্যে থাকে? খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে অংশটা থাকিতে বাধ্য, সেটাতে সকল তলোয়ারেরই ঐক্য আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য অনুসারে কারিগরি নানারকমের হইয়া থাকে। মানুষেরও দশের খাপের বাহিরে নিজের বিশেষ কারিগরির একটা জায়গা আছে, সেটাও কি আপনারা বেদখল করিতে চান? আর, আমার কাছে এও আশ্চর্য্য লাগে, আমি সকলের অগোচরে ঘরে বসিয়া যে সকল নিরীহ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা লোকের চোখেই বা পড়ে কি করিয়া, আর তাহা লইয়া আলোচনাই বা হয় কেন?"

যোগেন্দ্র। আপনি তা জানেন না বুঝি, যাহারা জগতের উন্নতির ভার সম্পূর্ণ নিজের স্কন্ধে লইয়াছে, তাহারা পরের ঘরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে। যেটুকু খবর না পায়, সেটুকু পূরণ করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের আছে। এ নহিলে বিশ্বের সংশোধনকার্য্য চলিবে কি করিয়া? তা ছাড়া নলিনবাবু, পাঁচজনে যাহা না করে, তাহা চোখের আড়ালে করিলেও চোখে পড়িয়া যায়—যাহা সকলেই করে, তাহাতে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। এই দেখুন না কেন, আপনি ছাদে বসিয়া কি-সব কাণ্ড করেন, তাহা আমাদের হেমের চোখেও পড়িয়া গেছে—হেম সে কথা বাবাকে বলিতেছিল অথচ হেম ত আপনার সংশোধনের ভার গ্রহণ করে নাই!

হেমনলিনীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ব্যথিত হইয়া একটা-কি বলিবার উপক্রম করিবামাত্র নলিনাক্ষ কহিল, "আপনি কিছুমাত্র লজ্জা পাইবেন না; ছাদে বেড়াইতে উঠিয়া সকালে-সন্ধ্যায় আপনি যদি আমার আহ্নিককৃত্য দেখিয়া থাকেন, সেজন্য আপনাকে কে দোষী করিবে? আপনার দুটি চক্ষু আছে বলিয়া আপনি লজ্জিত হইবেন না; ও দোষটা আমাদেরও আছে।"

অন্নদা। তা ছাড়া হেম আপনার আহ্নিকসম্বন্ধে আমার কাছে কোনো আপত্তি প্রকাশ করে নাই। সে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপনার সাধনপ্রণালীসম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতেছিল।

যোগেন্দ্র। আমি কিন্তু ও সব কিছু বুঝি না। আমরা সাধারণে সংসারে সহজরকমে যেভাবে চলিয়া যাইতেছি, তাহাতে কোনো বিশেষ অসুবিধা দেখিতেছি না,—গোপনে অদ্ভুতকাণ্ড করিয়া, বিশেষ-কিছু যে লাভ হয়, আমার তাহা মনে হয় না—বরং উহাতে মনের যেন একটা সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া মানুষকে একঝোঁকা করিয়া দেয়। কিন্তু আপনি আমার কথায় রাগ করিবেন না—আমি নিতান্তই সাধারণমানুষ; পৃথিবীর মধ্যে

আমি নেহাৎ মাঝারিরকম জায়গাটাতেই থাকি; যাঁহারা কোনোপ্রকার উচ্চমঞ্চে চড়িয়া বসেন, আমার পক্ষে ঢেলা না মারিয়া তাঁহাদের নাগাল পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমার মত এমন অসংখ্য লোক আছে, অতএব আপনি যদি সকলকে ছাড়িয়া কোনো অদ্ভুতলোকে উধাও হইয়া যান, তবে আপনাকে অসংখ্য ঢেলা খাইতে হইবে।

নলিনাক্ষ। ঢেলা যে নানারকমের আছে! কোনোটা বা স্পর্শ করে, কোনোটা বা চিহ্নিত করিয়া যায়। যদি কেহ বলে, লোকটা পাগ্‌লামি করিতেছে, ছেলেমানুষি করিতেছে, তাহাতে কোনো ক্ষতি করে না—কিন্তু যখন বলে, লোকটা সাধুগিরি-সাধকগিরি করিতেছেন, গুরু হইয়া উঠিয়া চেলাসংগ্রহের চেষ্টায় আছেন, তখন সে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে যে-পরিমাণ হাসির দরকার হয়, সে-পরিমাণ অপর্য্যাপ্ত হাসি জোগায় না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আবার বলিতেছি, আমার উপরে রাগ করিবেন না নলিনবাবু। আপনি ছাদে উঠিয়া যাহা খুসি করুন, আমি তাহাতে আপত্তি করিবার কে? আমার বক্তব্য কেবল এই যে, সাধারণের সীমানার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিলে কোনো কথা থাকে না। সকলের যে-রকম চলিতেছে, আমার তেম্‌নি চলিয়া গেলেই যথেষ্ট;—তাহার বেশি চলিতে গেলেই লোকের ভিড় জমিয়া যায়। তাহারা গালি দিক্ বা ভক্তি করুক্, তাহাতে কিছু আসে-যায় না—কিন্তু জীবনটা এইরকম ভিড়ের মধ্যে কাটানো কি আরামের?

নলিনাক্ষ। যোগেনবাবু, যান্ কোথায়? আমাকে আমার ছাদের উপর হইতে একেবারে সর্ব্বসাধারণের সার্‌-বাঁধানো একতলার মেঝের উপর সবলে হঠাৎ উত্তীর্ণ করিয়া-দিয়া পালাইলে চলিবে কেন?

যোগেন্দ্র। আজকের মত আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে—আর নয়! একটু ঘুরিয়া আসি গে!

যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে পর হেমনলিনী মুখ নত করিয়া টেবিল্‌ঢাকার ঝালরগুলির প্রতি অকারণে উপদ্রব করিতে লাগিল। সে সময়ে অনুসন্ধান করিলে তাহার চক্ষুপল্লবের প্রান্তে একটা আর্দ্রতার লক্ষণও দেখা যাইত।

অন্নদা কহিলেন—"নলিনবাবু, আপনার সাধনভজনের কি প্রণালী, নিশ্চয় জানি না—বোধ করি আমাদের হইতে স্বতন্ত্র। যদি গোপনীয় না হয়, তবে—"

নলিনাক্ষ। কিছুই গোপনীয় নয়। আমার সাধনা অত্যন্ত প্রকাশ্য। আমি প্রাণায়াম করি, সে কথা সত্য—আমি প্রভাতের জ্যোতি দৃষ্টির দ্বারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি, এ কথাও সত্য—আমি নদীর জলের মধ্যে বুক পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উপাসনা করি, ইহাও মিথ্যা নয়—আমি অনেকসময় রাত্রে মাঠের মধ্যে ধূলার উপর লুটাইয়া স্তব্ধ হইয়া ধরণীর স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া আসি ইহাও অস্বীকার করিব না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, উত্তাপ-জ্যোতির দ্বারা নিখিলের সহিত আমি সম্বন্ধযুক্ত—আমি সেই বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধসূত্রকে যদি নিজের মধ্যে সজীবভাবে, আধ্যাত্মিকভাবে অনুভব করিতে পারি—তবে জগতের মধ্যে

যে পরমরহস্তময় আছেন, তাঁহাকে অব্যবহিত-ভাবে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিব। দেখুন্ না কেন, আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি, কাব্য তাহারই চরমোৎকর্ষ, সেই উৎকর্ষ তাহাকে এমন শক্তিদান করে, যাহাতে সে বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে। আমরা সচরাচর কথাবার্ত্তার মধ্যেই ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্ম যে সুরের আভাস লাগাইয়া থাকি, তাহারই চরমোৎকর্ষ সঙ্গীত—সেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া সঙ্গীত অনির্ব্বচনীয়কে আমাদের চিত্তের মধ্যে সঞ্চার করিয়া দেয়। তেম্নি আমরা নিশ্বাসপ্রশ্বাস, দর্শনস্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা সাধারণভাবে নিয়তই বিশ্বকে উপলব্ধি করিতেছি—কিন্তু সেই ক্রিয়াগুলির বিশেষভাবে যদি উৎকর্ষসাধন করিয়া তুলি, তবে নিখিল ব্যাপ্ত করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আছেন, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের অন্তরে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমি মনে করি, ইহাই প্রত্যক্ষলাভ। যে বাণী জলে-স্থলে-আকাশে, অগ্নিতে-বায়ুতে, খাদ্যে-পানীয়ে আছে, আমি আমার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-রসনা-ত্বক্‌কে, আমার বুদ্ধিকে সর্ব্বাঙ্গে-মনে সেই বাণী, সেই মন্ত্র গ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছি—ইহাতে যাঁহারা দলের লোককে হারাইলেন বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে,—সকলকেই লাভ করিব, এই আমার সাধনা; কাহাকেই হারাইব, এমন আমার অভিপ্রায় নহে।

হেমনলিনী একাগ্রমনে নলিনাক্ষের কথা শুনিতেছিল। নলিনাক্ষ চুপ করিবামাত্র সে অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল- "আপনার বিশেষ ক্ষমতা থাকিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের এই বাণী কি সকলেই শুনিতে পারিবে ?"

নলিনাক্ষ কহিল—"দেখুন, আমরা সকলে অত্যন্ত বেশি শিক্ষিত হইয়াছি— এটা মাটি, ওটা জল, এটা তুচ্ছ, ওটা নির্জ্জীব, এই বলিয়া প্রায় সমস্ত বিশ্বকেই আমরা দূরে ফেলিয়াছি। তাই এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের উপর চিত্তকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিয়া ইহা হইতে যাহা গ্রহণ করিবার, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না—তাই একমাত্র মানুষের বাক্যের দাস হইয়া পড়িয়াছি। এ কথা ভাবি না, বাক্য ত একটা প্রতিফলিত পদার্থমাত্র—সেই বাক্য সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে—কিন্তু যে বিশ্ব সত্যেরই নির্ঝরধারা, একেবারে সেই বিশ্বের মধ্যেই করপুট ডুবাইবা অমৃতরস গ্রহণ করিলে প্রবঞ্চিত হইব না। আমরা যে শৈশব হইতে কেবল মানুষের বাক্য শোনাকেই শিক্ষা মনে করিতে অভ্যাস করিয়াছি—ঈশ্বরের পাঠশালায়, এই সুবিপুল জল-স্থল-আকাশের কাছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত যাই না, ইহাতেই আমাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়াছে।"

হেমনলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "এই পূর্ব্বশিক্ষার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করা কি কঠিন ?"

নলিনাক্ষ। কঠিন বটে। প্রকৃতিভেদে কাহারো কাছে বেশি কঠিন, কাহারো কাছে অল্প কঠিন। বাক্যের খাঁচায় যে মানুষপক্ষী আবদ্ধ থাকিয়া পরের দত্ত খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া আছে, বিশ্বের আলোকধৌত আকাশে উড়িয়া নিজের খাদ্য আনন্দে

অন্বেষণ করার প্রস্তাব সে অসম্ভব মনে করিয়া ভীত হইয়া উঠে। অল্প অল্প করিয়া তাহার ভয় ভাঙিতে হয়, তাহার ডানায় বলসঞ্চার করিতে হয়।

হেমনলিনী জান্‌লার বাহিরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল। সে নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া অনুভব করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত অনেক উপদেশবাক্য শুনিয়াও তাহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হয় নাই। মাঝে মাঝে তাহার ভাবোদ্রেক হইয়াছে, চোখে জল আসিয়াছে, হৃদয় উত্তেজিত হইয়াছে—মনে করিয়াছে, বুঝি ইহাকেই বলে পাওয়া। কিন্তু হাতের মধ্যে কিছুই পায় না, মনের মধ্যে নিশ্চয়রূপে, ধ্রুবরূপে কিছুই থাকে না। তবু এতদিন সে জানিত না, উপাসনার ফল কেবলমাত্র ভাবানুভূতি নহে, জানিত না, ধর্ম্মের সত্য করতলন্যস্ত আমলকের মতই সুনিশ্চিত তাহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ, তাহা রূপে-রসে-শব্দে-স্পর্শে আবির্ভূত। নলিনাক্ষের কথা শুনিয়া হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, তাহার মন একেবারেই রিক্ত—তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী বিশ্বের মধ্যেও তাহার কোনো অধিকার নাই। সে কাজকর্ম্ম করিতেছে, সুখদুঃখ ভোগ করিয়া চলিতেছে, কিন্তু সে একেবারেই শূন্য—সে এমনভাবে আছে, যেন সে এই অসীম বিশ্বসংসারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই—যেন কেবল সে এই কলিকাতার গলিতে, এই বাসার মধ্যেই আছে। দিনে দিনে নলিনাক্ষের সহিত আলাপ করিতে করিতে সে আপনার অন্তরের দৈন্য দেখিতে পাইল এবং নলিনাক্ষের পথ অনুসরণ করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অত্যন্ত দুঃখের সময় যখন সে অন্তরে-বাহিরে কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া পাইতেছিল না, তখনই নলিনাক্ষ বিশ্বকে তাহার সম্মুখে যেন নূতন করিয়া উদ্ঘাটিত করিল। হেমনলিনীর পূর্ব্বজীবন চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা গুরুতর আঘাত পাইয়া একজায়গায় ভাঙিয়াচুরিয়া পথ হইতে বিক্ষিপ্ত ও অচল হইয়া পড়িয়া ছিল। তাহার উপর দিয়া দিনের পর দিন বৃথা যাইতেছিল—তাহার জীবনের সম্মুখে কোনো লক্ষ্য ছিল না - কেমন করিয়া, কি লইয়া সে যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা প্রতিদিনই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না—এমন দুঃসময়ে নলিনাক্ষ তাহাকে চলিবার পথ ও বাঁচিবার উৎসাহ দান করিল। ব্রহ্মচারিণীর মত একটা নিয়মপালনের জন্য তাহার মন কিছুদিন হইতে উৎসুক ছিল—কারণ, নিয়ম মনের পক্ষে একটা দৃঢ় অবলম্বন;—শুধু তাহাই নহে, শোক কেবলমাত্র মনের ভাব-আকারে টিঁকিতে চায় না, সে বাহিরেও একটা-কোনো কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে আপনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এপর্য্যন্ত হেমনলিনী সেরূপ কিছুই করিতে পারে নাই,—লোকচক্ষুপাতের সঙ্কোচে বেদনাকে সে অত্যন্ত গোপনে আপনার মনের মধ্যেই পালন করিয়া আসিয়াছে। নলিনাক্ষের সাধনপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া আজ যখন সে শুচি আচার ও নিরামিষ আহার গ্রহণ করিল, তখন তাহার মন বড় তৃপ্তিলাভ করিল। নিজের শয়নঘরের মেজে হইতে মাদুর ও কার্পেট্‌ তুলিয়া-ফেলিয়া বিছানাটি একধারে পর্দ্দার দ্বারা আড়াল করিল—সে

ঘরে আর-কোনো জিনিষ রাখিল না। সেই মেজে প্রত্যহ হেমনলিনী স্বহস্তে জল ঢালিয়া পরিষ্কার করিত—একটি রেকাবিতে কয়েকটি ফুল থাকিত; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্র পরিয়া সেই খানে মেজের উপরে হেমনলিনী বসিত—সমস্ত মুক্তবাতায়ন দিয়া ঘরের মধ্যে অবারিত আলোক প্রবেশ করিত, এবং সেই আলোকের দ্বারা, আকাশের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা সে আপনার অন্তঃকরণকে অভিষিক্ত করিয়া লইত। অন্নদাবাবু সম্পূর্ণভাবে হেমনলিনীর সহিত যোগ দিতে পারিতেন না—কিন্তু নিয়মপালনের দ্বারা হেমনলিনীর মুখে যে একটি পবিত্র পরিতৃপ্তির দীপ্তি প্রকাশ পাইত, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধের মন স্নিগ্ধ হইয়া যাইত। এখন হইতে নলিনাক্ষ আসিলে হেমনলিনীর এই ঘরেই মেজের উপরে বসিয়া তাঁহাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিত।

যোগেন্দ্র একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—"এ সমস্ত কি হইতেছে! তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়ীটাকে ভয়ঙ্কর পবিত্র করিয়া তুলিলে—আমার মত লোকের এখানে পা ফেলিবার জায়গা নাই।"

আগে হইলে যোগেন্দ্রের বিদ্রূপে হেমনলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত;- এখন অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রের কথায় মাঝে মাঝে রাগ করিয়া উঠেন, কিন্তু হেমনলিনী নলিনাক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়া শান্তস্নিগ্ধভাবে হাস্য করে। এখন সে একটি দ্বিধাহীন নিশ্চিত নির্ভর অবলম্বন করিয়াছে—এ সম্বন্ধে লজ্জা করাকেও সে দুর্ব্বলতা বলিয়া জ্ঞান করে। লোকে তাহার এখনকার সমস্ত আচরণকে অদ্ভুত মনে করিয়া পরিহাস করিতেছে, তাহা সে জানিত কিন্তু নলিনাক্ষের প্রতি তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস সমস্ত লোককে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে—এইজন্য লোকের সম্মুখে সে আর সঙ্কুচিত হইত না।

একদিন হেমনলিনী প্রাতঃস্নানের পর উপাসনা শেষ করিয়া তাহার সেই নিভৃত ঘরটিতে বাতায়নের সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে, এমনসময় হঠাৎ অন্নদাবাবু নলিনাক্ষকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হেমনলিনীর হৃদয় তখন পরিপূর্ণ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রথমে নলিনাক্ষকে ও পরে তাহার পিতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "ব্যস্ত হইবেন না নলিনবাবু, হেম আপনার কর্ত্তব্য করিয়াছে।"

অন্যদিন এত সকালে নলিনাক্ষ এখানে আসে না। তাই বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত হেমনলিনী তাহার মুখের দিকে চাহিল। নলিনাক্ষ কহিল, "কাশী হইতে মার খবর পাওয়া গেল, তাঁহার শরীর তেমন ভাল নাই, তাই আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কাশীতে যাইব স্থির করিয়াছি। দিনের বেলায় যথাসম্ভব আমার সমস্ত কাজ সারিয়া লইতে হইবে, তাই এখন আপনাদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"কি আর বলিব, আপনার মার অসুখ, ভগবান্ করুন্ তিনি শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠুন্। এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে উপকার পাইয়াছি,

তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল “নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন যত্নসাহায্য করিতে হয়, তাহা ত করিয়াইছেন—তা ছাড়া যে সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরো দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য মানুষের হৃদয়ের সহযোগিতায় সার্থকতালাভ যে কত সহজ হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি।”

অন্নদা কহিলেন, “আমি আশ্চর্য্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কি, আমরা জানিতাম না—ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম, এবং দেখিলাম, আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না। আমরা অত্যন্ত কুণো, লোকজনের কাছে যাতায়াত আমাদের বড় বেশি নাই—কোনো সভায় গিয়া বক্তৃতা শুনিবার বাতিক আমাদের একেবারে নাই বলিলেই হয়—যদি-বা আমি যাই, কিন্তু হেমকে নড়াইতে পারা বড় শক্ত। কিন্তু সেদিন এ কি আশ্চর্য্য বলুন্ দেখি—যেম্নি যোগেনের কাছে শুনিলাম আপনি বক্তৃতা করিবেন, আমরা দুজনেই কোনো আপত্তি প্রকাশ না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম—এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। এ সব কথা মনে রাখিবেন নলিনবাবু! ইহা হইতে বুঝিবেন, আপনাকে আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ প্রয়োজন আছে, নহিলে এমনটি ঘটিতে পারিত না। আমরা আপনার দায়স্বরূপ!”

নলিনাক্ষ। আপনারাও এ কথা মনে রাখিবেন, আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাহারো কাছে আমি আমার জীবনের গূঢ়কথা প্রকাশ করি নাই। সত্যকে প্রকাশ করিতে পারাই সত্যসম্বন্ধে চরমশিক্ষা। সেই প্রকাশ করিবার গভীর প্রয়োজন আপনাদের দ্বারাই মিটাইতে পারিয়াছি। অতএব আপনাদিগকে আমার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, সে কথাও আপনারা কখনো ভুলিবেন না।

হেমনলিনী কোনো কথা কহে নাই; বাতায়নের ভিতর দিয়া রৌদ্র আসিয়া মেজের উপরে পড়িয়াছিল, তাহারই দিকে তাকাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নলিনাক্ষের যখন উঠিবার সময় হইল, তখন সে কহিল—“আপনার মা কেমন থাকেন, সে খবর আমরা যেন জানিতে পাই।”

নলিনাক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইতেই হেমনলিনী পুনর্ব্বার তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

৪৮

এ কয়দিন অক্ষয় দেখা দেয় নাই। নলিনাক্ষ কাশীতে চলিয়া গেলে আজ সে যোগেন্দ্রের সঙ্গে অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে দেখা দিয়াছে। অক্ষয় মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, রমেশের স্মৃতি হেমনলিনীর মনে কতখানি জাগিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিবার সহজ উপায় অক্ষয়ের প্রতি তাহার বিরাগ-

প্রকাশ। আজ দেখিল, হেমনলিনীর মুখ প্রশান্ত—অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার মুখের ভাব কিছুমাত্র বিকৃত হইল না—সহজ প্রসন্নতার সহিত হেমনলিনী কহিল—"আপনাকে যে এতদিন দেখি নাই ?"

অক্ষয় কহিল, "আমরা কি প্রত্যহ দেখিবার যোগ্য ?"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "সে যোগ্যতা না থাকিলে যদি দেখাশোনা বন্ধ করা উচিত বোধ করেন, তবে আমাদের অনেককেই নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিতে হয়।"

যোগেন্দ্র। অক্ষয় মনে করিয়াছিল, একলা বিনয় করিয়া বাহাদুরি লইবে, হেম তাহার উপরেও টেক্কা দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির হইয়া বিনয় করিয়া লইল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটুখানি বলিবার কথা আছে। আমাদের মত সাধারণ লোকই প্রত্যহ দেখাশোনার যোগ্য—আর যাঁরা অসাধারণ, তাঁহাদিগকে কদাচ্-কখনো দেখাই ভাল, তাহার বেশি সহ্য করা শক্ত। এই-জন্যই ত অরণ্যে-পর্ব্বতে-গহ্বরেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়ান—লোকালয়ে তাঁহারা স্থায়িভাবে বসতি আরম্ভ করিয়া দিলে অক্ষয়-যোগেন্দ্রপ্রভৃতি নিতান্তই সামান্য লোকদের পক্ষে ভারি মুস্কিল।

যোগেন্দ্রের কথাটার মধ্যে যে খোঁচা ছিল, হেমনলিনীকে তাহা বিঁধিল। কোনো উত্তর না দিয়া তিনপেয়ালা চা তৈরি করিয়া সে অন্নদা, অক্ষয় ও যোগেন্দ্রের সম্মুখে স্থাপন করিল। যোগেন্দ্র কহিল, "তুমি বুঝি চা খাইবে না ?"

হেমনলিনী জানিত, এবার যোগেন্দ্রের কাছে কঠিন কথা শুনিতে হইবে; তবু সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিল,—"না, আমি চা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

যোগেন্দ্র। এবারে রীতিমত তপস্যা আরম্ভ হইল বুঝি! চায়ের পাতার মধ্যে বুঝি আধ্যাত্মিক তেজ যথেষ্ট নাই, যা কিছু আছে, সমস্তই হর্ত্তুকির মধ্যে ? কি বিপদেই পড়া গেল। হেম, ও সমস্ত রাখিয়া দাও! একপেয়ালা চা খাইলেই যদি তোমার যোগ-যাগ ভাঙিয়া যায়, তবে যাক্ না—এ সংসারে খুব মজবুত জিনিষও টেঁকে না, অমন পল্‌কা ব্যাপার লইয়া পাঁচজনের মধ্যে চলা অসম্ভব।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র উঠিয়া স্বহস্তে আর-এক-পেয়ালা চা তৈরি করিয়া হেমনলিনীর সম্মুখে রাখিল। সে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্নদাবাবুকে কহিল, "বাবা, আজ যে তুমি শুধু চা খাইলে! আর কিছু খাইবে না ?"

অন্নদাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং হাত কাঁপিতে লাগিল,—"মা আমি সত্য বলিতেছি, এ টেবিলে কিছু খাইতে আমার মুখে রোচে না। যোগেনের কথাগুলো আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি। জানি, আমার শরীরমনের এ অবস্থায় কথা বলিতে গেলেই আমি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলি—শেষকালে অনুতাপ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী তাহার পিতার চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না! দাদা আমাকে চা খাওয়াইতে চান, সে'ত ভালই আমি'ত কিছু তাহাতে মনে করি নাই। না বাবা,

তোমাকে খাইতে হইবে—খালিপেটে চা খাইলে তোমার অসুখ করে আমি জানি।"

এই বলিয়া হেম আহার্য্যের পাত্র তাহার বাপের সম্মুখে টানিয়া আনিল। অন্নদা ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন।

হেমনলিনী নিজের চৌকিতে ফিরিয়া-আসিয়া যোগেন্দ্রের প্রস্তুত চায়ের পেয়ালা হইতে চা খাইতে উদ্যত হইল। অক্ষয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল—"মাপ করিবেন, ও পেয়ালাটি আমাকে দিতে হইবে, আমার পেয়ালা ফুরাইয়া গেছে।"

যোগেন্দ্র উঠিয়া-আসিয়া হেমনলিনীর হাত হইতে পেয়ালাটা টানিয়া লইল এবং অন্নদাকে কহিল, "আমার অন্যায় হইয়াছে, আমাকে মাপ কর।"

অন্নদা তাহার কোনো উত্তর করিতে পারিলেন না, দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র অক্ষয়কে লইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে সরিয়া গেল। অন্নদাবাবু আহার সারিয়া উঠিয়া হেমনলিনীর হাত ধরিয়া কম্পমানচরণে উপরের ঘরে গেলেন।

সেই রাত্রেই অন্নদাবাবুর শূলবেদনার মত হইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "তাঁহার যকৃতের বিকার উপস্থিত হইয়াছে—এখনো রোগ অগ্রসর হয় নাই, এইবেলা পশ্চিমে কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বৎসরখানেক কিংবা ছয়মাস বাস করিয়া আসিলে শরীর নির্দ্দোষ হইতে পারিবে।"

বেদনা উপশম হইলে ও ডাক্তার চলিয়া গেলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেম, চল মা, আমরা কিছুদিন না হয় কাশীতে গিয়াই থাকি।"

ঠিক একই সময়ে হেমনলিনীর মনেও সে কথা উদয় হইয়াছিল। নলিনাক্ষ চলিয়া যাইবামাত্র হেম আপন সাধনসম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নলিনাক্ষের উপস্থিতিমাত্রই হেমনলিনীর সমস্ত আহ্নিকক্রিয়াকে যেন দৃঢ় অবলম্বন দিত। নলিনাক্ষের মুখশ্রীতেই যে একটা স্থির নিষ্ঠা ও প্রশান্ত প্রসন্নতার দীপ্তি ছিল, তাহাই হেমনলিনীর বিশ্বাসকে সর্ব্বদাই যেন বিকশিত করিয়া রাখিয়াছিল; নলিনাক্ষের অবর্ত্তমানে তাহার উৎসাহের মধ্যে যেন একটা ম্লানচ্ছায়া আসিয়া পড়িল। তাই আজ সমস্তদিন হেমনলিনী নলিনাক্ষের উপদিষ্ট সমস্ত অনুষ্ঠান অনেক জোর করিয়া এবং বেশি করিয়া পালন করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রান্তি আসিয়া এমনি নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। চায়ের টেবিলে দৃঢ়তার সহিত সে আতিথ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা ভার চাপিয়াছিল। আবার তাহাকে তাহার সেই পূর্ব্বস্মৃতির বেদনা দ্বিগুণবেগে আক্রমণ করিয়াছে—আবার তাহার মন যেন গৃহহীন, আশ্রয়হীনের মত হাহা করিয়া বেড়াইতে উদ্যত হইয়াছে। তাই যখন সে কাশী যাইবার প্রস্তাব শুনিল, তখন ব্যগ্র হইয়া কহিল, "বাবা, সেই বেশ হইবে!"

পরদিন একটা আয়োজনের উদ্যোগ দেখিয়া যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"কি, ব্যাপারটা কি?"

অন্নদা কহিলেন—"আমরা পশ্চিমে যাইতেছি।"

যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"পশ্চিমে কোথায়?"

অন্নদা কহিলেন—"ঘুরিতে ঘুরিতে একটা-কোনো জায়গা পছন্দ করিয়া লইব।"—তিনি যে কাশীতে যাইতেছেন, এ কথা একদমে যোগেন্দ্রের কাছে বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন।

যোগেন্দ্র কহিল—"আমি কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। আমি সেই হেড্‌মাষ্টারির জন্য দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়াছি, তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

ক্রমশ।

যাত্রা ও থিয়েটার।

যাত্রা একটা ভয়ানক ভিড়—এখানে নিয়ম ও শৃঙ্খলার কোন চিহ্ন নাই। খেলোয়াড়গণের সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গী, এমন কি, পাদক্ষেপ পর্য্যন্ত সকলই কতকটা অদ্ভুতরকমের। যিনি দ্রৌপদী সাজিয়াছেন, তাঁহার ভাল করিয়া গোঁফ কামান হয় নাই, আবার বেশভূষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া হয় ত তিনি কুন্তীর অভিনয় জুড়িয়া দিলেন। অধিকারিমহাশয়ের শিক্ষকের ভাবে ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ, এবং সময়বিশেষে সঙ্গীতকারী কোন বালকের সহসি কর্ণপীড়ন; এই নারদ বৃন্দাবনে যশোদাকে প্রবোধ দিতেছেন, আবার তখনই উদ্ভটরূপে পাদক্ষেপপূর্ব্বক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অনুনাসিকস্বরে "এই ত মথুরায় আগমন কল্লুম" বলিয়া এক স্থানেই অন্য দৃশ্যের অবতারণা,—এ সকল অপার হাস্যরসের বিষয়। বালকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ সাবিত্রী সাজিয়াছে, কেহ বা তাঁহার সখী সাজিয়াছে; অধিকারিমহাশয় একটা গানে টান দিলেন, সেই সুযোগে সাবিত্রী তাহার সখীর হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া প্রাণপণে একবার তামাক টানিয়া লইল সেই ধূমপটল অনুকূলপবনে দর্শকমণ্ডলীর মুখের উপর লইয়া-আসিয়া সাবিত্রীর চিত্র মানসপটে ক্ষণকাল আঁধার করিয়া ফেলিল। রাগরাগিণী-আলাপকারী বালকের প্রাণান্ত চীৎকারের সময় মুখভঙ্গী—যাহা তাহার সঙ্গীত-অভ্যাসকালীন কানমলাকে দর্শকদের কল্পনায় সম্মুখে উপস্থিত করে—ঋষিগণের শণপাটনির্ম্মিত দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজি, যাহার প্রান্তস্থিত সূত্রের সঙ্গে কর্ণের বন্ধন সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ—নিজের বক্তব্য-সমাপ্তি-অন্তেই তৎক্ষণাৎ ঋষিমহাশয়-কর্ত্তৃক বেহালার কর্ণপীড়ন, কিংবা বায়া-তাড়ন,—আর সেই "নীরদবরণ, পীতবসন, ভবভয়ভঞ্জন, কংসদমন, লীলাময়" প্রভৃতি বাঁধা বিশেষণরাশির অজস্র উদ্গিরণ কিংবা কোন দৃশ্যবর্ণনোপলক্ষে "কুঞ্জপল্লব কি শোভাই ধারণ করেছে, কুসুমকুল ফুটিয়া

আছে, ডালে ডালে বিহগগণ গান কর্‌ছে, ভ্রমরনিকর গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি তুলেছে, আহা কি মনোরম, কোকিলকোকিলা”—ইত্যাদি-প্রকারের একঘেয়ে বিস্তৃত আবৃত্তি—এ সমস্তই এখন নাটকদর্শনাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের রসভঙ্গ না করিয়া যায় না। ইহার পর জুড়িবৃন্দ “রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা” বলিয়া যখন সমকণ্ঠে অপূর্ব্বভাবে মুখভঙ্গী ও হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক গাহিতে থাকে এবং অনেক সময়ে তান দেওয়ার উপলক্ষে সঙ্গীতকে হ্রেষারবে পরিণত করে, তখন রুমাল মাথায় বাঁধিয়া শিরঃপীড়া নিবারণ করিতে হয়। শুনিয়াছি, এইরূপ এক জুড়ীর দলের চীৎকার অসহ্য হওয়াতে বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বেল্‌সাহেব ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন—“মোক্তারলোগকো বৈঠ্‌নে কহো।”

ইহার তুলনায় থিয়েটার স্বর্গ। রাজস্থানের আর্ব্বলিপর্ব্বতই হউক কিংবা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর মন্দিরই হউক, সুন্দর দৃশ্যপটগুলি বর্ণিত স্থানসমূহের আভাস দিতে সচেষ্ট; অভিনেতৃগণ স্বাভাবিকভাবে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি যাহার সাজে উপস্থিত হয়, পরিচ্ছদ ও ভঙ্গীতে তাহারই বিভ্রম জন্মাইয়া থাকে। যদি একজন অভিনেতাকেই জগৎ-সিংহ ও বীরসিংহের অভিনয় করিতে হয়, তবে এমনভাবে মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন করিয়া আসে যে, কে আর তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া চিনিতে পারিবে? এদিকে কথাগুলি সব ছোটখাট—যাত্রার সেই অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার তুলনায় তাহা কি আরামদায়ক! এখানে ভীম গদা ঘাড়ে করিয়া উদ্ভট গুম্ফ উৎক্ষেপপূর্ব্বক একঘণ্টাকাল দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে থাকে না। এখানে অনেক দৃশ্যপট এমন সুন্দর হয় যে, অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদের বর্ণের সঙ্গে ঐক্য রাখিয়া পশ্চাৎস্থিত প্রাসাদাবলী কিংবা তরুপল্লবাদি চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করে। এখানে দুই বীরবর যুদ্ধের পূর্ব্বে বাগ্‌যুদ্ধেই একদণ্ড কাটাইয়া দেন না ও তাঁহাদের মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবন-কণা শ্রোতার গাত্র সিক্ত করে না। এই সকল নানা কারণে যাত্রা দেখার পর থিয়েটার দেখায় কি আরাম!

কিন্তু তবু বলিব, থিয়েটার চিত্রের হিসাবেই সুশ্রী। আমাদের দেশীহৃদয়ের খাঁটি ও বিচিত্র ভাবরাশি সর্ব্বপ্রকারশৃঙ্খলাবর্জ্জিত যাত্রার মধ্যে যেরূপ বিকাশ পাইত, থিয়েটারে তাহা পায় নাই। ইহা ছাড়া থিয়েটারে যে সকল পুস্তক অভিনীত হয়, তাহার অনেকগুলিই অতিমাত্রায় কৃত্রিম ও পরানুকরণ-দোষদুষ্ট; সেগুলি ইংরেজীধরণের বক্তৃতায় উদগ্র, অথচ ইংরেজীনাটকের আখ্যানভাগ যেরূপ ঘটনা ও কর্ম্মের বিচিত্রতায় চিত্ত আকৃষ্ট করে, এগুলি তাহা করে না। ইংরেজী-নাটকের নকল করিয়া আমরা নাটক রচনা করিতে যাই, কিন্তু তাহা প্রহসন হইয়া পড়ে। লেডিম্যাক্‌বেথ্‌ ক্ষিপ্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেন, এই দৃষ্টান্তে বা অপর কোন দৃষ্টান্তে প্রায়শই রঙ্গমঞ্চের শেষকাণ্ডটা ক্ষিপ্ততার অভিনয়ে অসহনীয় হইয়া উঠে; বড় বড় ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের শেষ অঙ্কে প্রায়ই দেখা যায়, কোন স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ ঊর্দ্ধচক্ষে দুই হাত প্রসারণ করিয়া আসিয়া বলিয়া থাকেন—“ও কি দেখ্‌ছি, ঐ যে অন্ধকারপূর্ণ ছায়ায় তার

মূর্ত্তি।" এইভাবে ক্ষণে ভয়ে জড়সড় হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়া নতুবা স্বর্গদর্শনে স্মিতমুখে অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক ন্যাকামি করা—আজকাল নাটকগুলির একটা ফ্যাশান্ দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীতে অনেকে ভীষণ পাপ করে, অনেকে শোকদুঃখ সহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে না। পাপ বা শোকতাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে ক্ষিপ্ততা, এই ধারণা নাটককারগণের মস্তক হইতে কবে দূর হইবে এবং ঊর্দ্ধমুখ, ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি,—শেষাঙ্কের অপরিহার্য্য এই মূর্ত্তিটা হইতে রঙ্গমঞ্চগুলি কবে নিস্তার পাইবে? তার পর অগাধজলে সাঁতারও যেন আজকাল অনেক নাটকের ফ্যাশনের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। জলের মধ্যে নায়কনায়িকার ভ্রূক্ষেপ ও হাঁফাইতে হাঁফাইতে প্রেমের বক্তৃতা আজকাল প্রতাপ ও শৈবলিনীর দেখাদেখি অপরাপর নায়কনায়িকাগণ অনুকরণ করিতেছেন। স্বভাবের প্রবর্ত্তনায় যে ছবিটি আপনি সুন্দর হয়,—অনুকরণে তাহা সেরূপ হয় না। পৌরাণিক নাটকগুলিতে প্রায়ই দৈবশক্তির উপর বড় বেশী নির্ভর—দেবদেবীগণ এত ঘনঘন আসিতেছেন যে, মানুষের যতগুলি সংকল্প, তাঁহারাই যেন হাতে ধরিয়া করাইয়া দিতেছেন, সুতরাং তাহা হৃদয় স্পর্শ করে না। পৌরাণিক বিষয়ের কারুণ্যের অংশ সঙ্গীত দিয়া জাগাইলে সুন্দর হয়, এ বিষয়ে যাত্রার যে সফলতা হইত—নাটকে তাহা কিছুমাত্র হয় না। প্রাচীন যাত্রায় যখন প্রভাসযজ্ঞের চিত্র, কি শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় প্রয়াণ, নানা বিচিত্ররাগিণী ও করুণ কান্নার ছন্দে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া শ্রোতাদের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিত, তখন সেই উচ্ছৃঙ্খল জনস্রোতের কলকল্লোল একেবারে থামিয়া যাইত। দৃশ্যপটের অভাব, রাধা কি যশোদার অযত্নকৃত সাজসজ্জা—এ সকল শত শত ত্রুটি তখন আর অণুমাত্রও রসভঙ্গ করিতে পারিত না;—যাত্রার অধ্যক্ষগণ দর্শকের জন্য যে সকল অনুষ্ঠানে ত্রুটি করিতেন, কল্পনাদেবী আসিয়া প্রচুররূপে নিজহস্তে তাহা পূরণ করিয়া যাইতেন। কথা অপেক্ষা গানই সাধারণের চিত্তে ভাব উদ্রেক করিতে বেশী সমর্থ; থিয়েটারের যথাসর্ব্বস্ব কথা, কিন্তু যাত্রার যথাসর্ব্বস্ব গান। যাত্রাগুলি যে এখন এরূপ হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, থিয়েটারের অনুকরণে কথার অবতারণা। যাহার যে অস্ত্র, তাহাকে তাহাই মানায়;—নারদ যদি বীণা ছাড়িয়া গাণ্ডীব ধরেন কিংবা অর্জ্জুন গাণ্ডীব ছাড়িয়া বীণা ধরেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যে দুর্দ্দশা হয়, থিয়েটারের অনুকরণ করিতে গিয়া আজকালকার যাত্রার তাহাই হইয়াছে। ভরতমিলন, রামবনবাস কিংবা কৃষ্ণলীলা শুনিয়া পূর্ব্বে যে আনন্দ, যে নৈতিক শিক্ষা হইত, এখন থিয়েটারে সেরূপ হয় না। যাত্রার হট্টগোলে আমোদ আসিয়া জীবন দিয়া যাইত, হৃদয় করুণা কিংবা পরপ্রীতিতে সিক্ত করিয়া দিত, কিন্তু থিয়েটারের আমোদ বিচিত্র বাজির ন্যায় চক্ষের সম্মুখে পুড়িয়া তখনই ছাই হইয়া যায়; যাত্রা যাহা বিদায়কালে দিয়া যাইত, রঙ্গভূমি তাহা দেয় না। যাত্রা চক্ষুর সম্মুখে অল্প দেখাইত, কিন্তু চক্ষু হইতে দূরে ঢের বেশী দেখাইত;—যে সব দৃশ্য যাত্রাওয়ালারা আঁকিয়া দেখাইত না, দর্শকের কল্পনা

তাহা সুন্দর করিয়া আঁকিতে প্রবৃত্ত হইত। কল্পনা ও ভাবের রাজ্যে সকল কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলে দর্শক কি শ্রোতার মনের চক্ষু ও মনের কর্ণের জন্য আর কি রাখা হইল? সহস্র চেষ্টায় বৈকুণ্ঠ-ধামকে দৃশ্যপটে আঁকিতে চেষ্টা করিলেও দর্শকের চক্ষে আদর্শ খর্ব্ব হইয়া যাইবে, কিন্তু দর্শককে কথার ইঙ্গিত দিয়া যদি তাঁহার কল্পনাকে সজাগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে কল্পনাদেবী যাহা আঁকিবেন, ইটালীর চিত্রকরও তাহা কখনই পারিবে না। যাত্রার গানগুলি শ্রোতার মনের ভিতর দিয়া নবসৃষ্ট নানা বিচিত্রছন্দ ও রাগিণীতে চিত্ত ভরিয়া ফেলিত। গানটি যেমন স্মৃতিতে গাঁথিয়া-আনিয়া কল্পনার দ্বারা তাহা পল্লবিত করা যায়, কথাগুলিকে সেরূপ করা যায় না। রঙ্গালয়ে গান না আছে, তাহা নহে কিন্তু গান সেস্থানে কথার আড়ালে পড়ে। আমি অপেরার কথা বলিতেছি না, আমাদের রঙ্গালয়ে অপেরা এখনও সেরূপ প্রাধান্যলাভ করে নাই।

এই যাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাসমিলনের সেই দ্বারীর নিকট রাণীর অনুনয়ের দৃশ্য মনে পড়ে। কোথায় দ্বার, কোথায় দ্বারী, কোথায় মথুরা! কোন দৃশ্য নাই, রাণী বালকবৃন্দের সঙ্গে একত্রে মিলিয়া গান গাহিতেছেন, কিন্তু শ্রোতা সেই যাত্রার বাহ্য দৃশ্যপটাদির অভাবের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, গানের করুণ ছন্দ তাঁহাকে সত্যসত্যই মথুরাপুরীতে লইয়া-গিয়া দুঃখিনী যশোদাকে জীবন্ত করিয়া দেখাইতেছে। সেই বিলাপ, সেই আর্ত্তির উত্তরে যখন দ্বারী কঠোর ভাষায় তাঁহাকে সরাইয়া দিতেছে, সমস্ত মাতৃহৃদয় ব্যাকুল-ভাবে লুটাইয়া পড়িতেছে, তখন যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহসা মাতাকে মনে পড়িল—বোধ হয়, মাতৃহৃদয়ের এই ঘোর দুঃখ কোন অলক্ষিত তন্ত্রীস্পর্শে মাতার শোকমুহ্যমান চিত্রটি মনে জাগাইয়াছিল। যজ্ঞস্থলে আর এক দৃশ্য উপস্থিত হইল; মথুরার মহারাজের হস্ত হইতে যজ্ঞের বারিপূর্ণ ভৃঙ্গারটি খসিয়া পড়িয়াছে, তিনি কাঁদিয়া বলরামের হাত ধরিয়া গাহিতে লাগিলেন, "দাদা বল বল, আমার দুখিনী মা কোথায় রৈল" সেই মনোহর রাগিণীর সকরুণ আর্ত্তিময় উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃকুল আকুল হইতেন; অভিনেতা, দর্শক, একসঙ্গে চক্ষুজলে সকলের মুখ ভাসিয়া যাইত বাৎসল্য সজাগ হইয়া উঠিত; পর্দ্দার অন্তরালে স্ত্রীলোকগণের হৃদয়ে শিশুর জন্য করুণ ব্যথা উথলিয়া উঠিত; মৃত মাতা-দিগকে মনে করিয়া যুবকগণের মুখ জলভরা মেঘের মত হইত; যাত্রাভঙ্গের বহুদিন, বহু-বৎসর পরেও শ্রোতা স্মরণ করিত—"আমার দুখিনী মা কোথায় গেল?" কই, সেরূপ ভাব ত থিয়েটারে হয় না। থিয়েটার নিষ্ঠুরতা বা বর্ব্বরতার চিত্র দেখাইয়া ক্ষণিক উত্তেজনার উদ্রেক করে, কিন্তু পবিত্র করুণাকে এরূপ মূর্ত্তি-মতী করিতে পারে না। দেশের খাঁটিভাবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের বাহুল্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের রঙ্গভূমিগুলি আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকে। যাত্রার এখন আর সে সরলতার নাই।—স্বদেশ-হিতৈষামূলক বক্তৃতা এখন যাত্রায় ঢুকিয়াছে, গার্হস্থ্য সুখদুঃখের চিত্র জীবন্ত করা এখন তাহারা হেয় মনে করে;—ভারত-ইতিহাসের

কোন কোন ঘটনা লইয়া তাহারা পালা-লেখা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, নিজের যেখানে নিপুণতা, তাহা ছাড়িয়া পরানুকরণচেষ্টা আরম্ভ করা অবধি যাত্রাগুলি একান্ত হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও সেই রাখালবালকের ছবিগুলি মনে জাগিয়া আছে। ক্রীড়াকৌতুকের হাট ভাঙিয়া রাখালরাজ চলিয়া গিয়াছেন,—গাভীগুলি নিস্পন্দ, বৃন্দাবনের তরুরাজি ধূসর, শ্রীদাম ব্যাকুলকণ্ঠে গাহিতেছে—"তাই ভেবে কি ভাইরে সুবল ছেড়ে গেছে প্রাণের কানাই। আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই।" সেই গানে সরল রাখালহৃদয়ের পবিত্র সখ্য ও দুঃখ কোন চিরন্তন প্রিয়বিরহের স্মারকগাথাস্বরূপ আমাদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এলায়িতকেশা বিরহিণী রাধার সাশ্রুকণ্ঠের—"ছিলাম নিদ্রাবশে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে, বঁধু অভাগিনীর বাসে এসেছিল"—কিংবা মেঘদর্শনে "বঁধূ আমার হৃদয়কমলে রাখিয়া শ্রীপদ, তিল-আধ বোস বোস হে শ্রীপাদ" প্রভৃতি গানের রেশ্ এখনও আমাদের কর্ণে বাজিতেছে। প্রাচীন যাত্রার প্রধান অস্ত্র ছিল মনোহরসাই রাগিণী—এই রাগিণী বঙ্গদেশের স্বীয় সম্পত্তি, ইহার মধুরাক্ষরা করুণা হৃদয়ে কোমল ভাবরাশির যেরূপ উদ্রেক করিতে পারে, অন্য কোন রাগরাগিণী তাহা পারে না। এখনকার যাত্রা এই রাগিণীকে বহু-পরিমাণে ত্যাগ করিয়া থিয়েটারের অনুকরণে মিশ্র বা জঙ্‌লা রাগিণীতে গান বাঁধিয়া থাকে।

কিন্তু প্রাচীন যাত্রার ভাঁড় হইতে আধুনিক প্রহসনের ভাঁড় অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ এবং রঙ্গালয়ের যদি কিছু খাঁটি জিনিষ থাকে, তাহা প্রহসনগুলির অপূর্ব্ব অভিনয়। এখন বাংলাদেশের জীবনটা প্রহসনের উপাদান যথেষ্টপরিমাণে জোগাইতেছে। আমাদের কৃষ্ণ গ্রীবার উপর শুভ্র নেকটাই, অশুদ্ধ ইংরেজী-উচ্চারণ, সভাসমিতিতে হঠাৎ গ্যারিবল্ডীর মত গা-ঝাড়া দিয়া উঠা, বক্তৃতায় অকাতরে প্রাণ-ত্যাগের জন্য উদ্যত হওয়া, কিন্তু গৃহে স্ত্রীলোকেঁচ-বলের ভয়ে বিনিদ্রনিশিকর্ত্তন প্রভৃতি শত শত বিষয়ে বঙ্গীয় প্রহসনগুলিকে পুষ্ট করিতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

রামায়ণের রচনাকাল।

বিচারপদ্ধতি।

"যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্।
অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্॥"

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গ হইতে রামায়ণের আখ্যানবস্তুর আরম্ভ। তাহার বক্তা বা গায়কযুগলের নাম কুশীলব। তাঁহারা প্রথমে তপস্বিসমাজে ও তাহার পর রামচন্দ্রের রাজসভায় সুললিতস্বরসংযোগে রামায়ণকথা গান করিয়া, তাহার অপূর্ব্ব

রচনাকৌশলের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

কুশীলবোক্ত আখ্যানবস্তু সংস্কৃতসাহিত্যে মহর্ষি-বাল্মীকি-বিরচিত "আদিকাব্য" নামে সুপরিচিত। মানবসমাজে কাব্যশাস্ত্রের মাহাত্ম্য অনুভূত হইবার পর, সকল দেশের লোকেই তাহাদের আদিকবির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কে কোন্ দেশের আদিকবি, তাহার প্রধান প্রমাণ—জনশ্রুতি। ভারতবর্ষের জনশ্রুতি বাল্মীকিকে আদিকবি বলিয়া অদ্যাপি ঘোষণা করিয়া আসিতেছে।

কোন দেশের আদিকবি কৃষক;—গ্রাম্যভাষার সরল সঙ্গীতে কাব্যকীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন! কোন দেশের আদিকবি ভিক্ষান্নজীবী;—জীবিকার্জ্জনের জন্য পথে পথে কাব্যকীর্ত্তন করিয়া কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন! ভারতবর্ষের আদিকবি তপস্বী;—শান্তরসাস্পদ পুণ্যাশ্রমের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া, লোকশিক্ষার্থ কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, রচনাগৌরবে অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের নিকট অদ্যাপি দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন!

কোন্ পুরাকালে এই আদিকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য প্রবল কৌতূহল বিদ্যমান থাকিতেও, সে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব অতীতের স্বপ্নসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু সকল চেষ্টাই তর্ককোলাহলে অভিভূত হইয়া, ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে!

তথাপি নূতন চেষ্টার প্রয়োজন পুনঃপুন অনুভূত হইয়া থাকে। রামায়ণ কোন্ সময়ের গ্রন্থ, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে রামায়ণপাঠের ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু রামায়ণোক্ত সকল কথা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার ব্যাঘাত হয়। যে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে কোন্ অতীত গৌরবের পুণ্যযুগ,—তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, সংস্কৃত-সাহিত্যালোচনায় আন্তরিক আগ্রহ উপস্থিত হয় না।* রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা পুনঃপুন ব্যর্থ হইলেও, পুনঃপুন অভিনব চেষ্টার আরম্ভ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা রচনাকাল নির্ণীত না হইলেও, রামায়ণের অতিপ্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হয়।

পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, পুরাতন গ্রন্থের আলোচনা পরিত্যাগ করা যায় না। সে আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিবামাত্র, রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সে পথ নিতান্ত দুর্গম হইলেও,

* It has been a standing reproach against our studies that it is impossible to find anything historical in Indian literature. To a certain extent this reproach is well-founded; and this accounts no doubt for the indifference with which Sanskrita literature is regarded by the public at large.—Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature, p. 63.

তাহাই একমাত্র পথ। তাহাতে অগ্রসর হইবার উপায়,—বিচারপদ্ধতি। বিচার-পদ্ধতির দোষে অনেক সময়ে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। রামায়ণের রচনা-কালনির্ণয়ের জন্য কিরূপ বিচারপদ্ধতির আশ্রয়গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

"তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্ ॥"

রামায়ণের আরম্ভ এইরূপ। কাব্যা-রম্ভেই একটি প্রশ্ন। তপস্বী বাল্মীকি তপঃ-স্বাধ্যায়নিরত বাগ্‌বেত্তাদের বরণীয় মুনিপুঙ্গব নারদকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভূমণ্ডলে ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্, দৃঢ়ব্রত, বীর্য্যবান্ ও গুণবান্ এখন কে? ইহাই বাল্মীকির প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তদুত্তরে মহর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস হইতে রাবণবধান্তে রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিলে, সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া, কবিগুরু 'পৌলস্ত্যবধ'নামক এক মহাকাব্য রচনা করেন। তাহাই "রামায়ণ" নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে।

গ্রন্থগত এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় অনুসারে, রামরাজ্য বর্ত্তমান থাকিতেই, রামায়ণ রচিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামচন্দ্রের সম্মুখে কুশীলবের রামায়ণ গান করিবার কথাও তাহার পক্ষসমর্থন করে। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ কবিকল্পিত বলিতে বাধা কি? গ্রন্থগৌরব বর্দ্ধন করিবার জন্য বাল্মীকির পক্ষে এরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করা কি নিতান্ত অসম্ভব? এই তর্ক উপস্থিত করা নিতান্ত সহজ। ইহার উত্তরপ্রদান করা সহজ নহে। একমাত্র উত্তর এই,—বাল্মীকি যে কোনরূপ অলীক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু বাল্মীকির এই উক্তি সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তদ্দ্বারা রামায়ণের রচনাকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

কবে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, গ্রন্থগত-আখ্যায়িকা-অবলম্বনে রামায়ণের রচনাকাল নির্ণীত হইতে পারিত। কিন্তু ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের তিরোভাবের পর কতকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? পুরাণ তাহার প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিয়া, স্বয়ং অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িয়াছেন! এরূপ অবস্থায় রামায়ণ যে ভাষার গ্রন্থ, সেই-ভাষা-নিবদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস অবলম্বন করিয়াই রামায়ণের রচনা-কাল নির্ণয় করিতে হইবে।

'সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস' নামধেয় নানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তথাপি তাহার উপর নির্ভয়ে নির্ভর করিবার উপায় নাই। তাহা ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর জল্পনা-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের অধ্যবসায় ও অধ্যয়নানুরাগ সর্ব্বথা প্রশংসার্হ; কিন্তু তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ নিরপেক্ষ বিচারকার্য্যের প্রবল অন্তরায়! তাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের অতিপ্রাচীনত্বে আস্থা-স্থাপন করিতে অসম্মত!

এই সকল ইউরোপীয় অধ্যাপকের মধ্যে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলরের নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তাঁহার "প্রাচীন সংস্কৃত সাহি-

ত্যের ইতিহাস" বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ অনেকের নিকট প্রামাণিক ইতিহাসের সমাদর লাভ করিয়াছে। সে ইতিহাসের সিদ্ধান্ত নিরতিশয় কৌতুকাবহ। তাহাতে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্র নামক চারিটি রচনাযুগ পরিকল্পিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির ন্যায় একটির পর একটি সাহিত্যযুগ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছিল; তাহার প্রথম যুগে ছন্দ, দ্বিতীয় যুগে মন্ত্র, তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ ও চতুর্থ যুগে সূত্রগ্রন্থ রচিত হইয়া যুগচতুষ্টয়ের রচনাকার্য্য পরিসমাপ্ত হয়! এই যুগচতুষ্টয়ের পরমায়ু সহস্রবৎসর; খৃষ্টপূর্ব্ব ১২০০ বর্ষে আরম্ভ, খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ বর্ষে শেষ! তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

যে দেশের লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে কেহ কিছু সাহস করিয়া লিখিয়া বসিলে, তাহাই ক্রমে ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া লয়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর সাহস করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের জন্মকাল নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলে, প্রমাণপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। যিনি কালনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রমাণ কি,—সে কথা অল্প লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। যিনি তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত, তাঁহাকেই প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে। অগত্যা একটি প্রমাণের অবতারণা করিতে হইল। মোক্ষমূলরের ইতিহাস রচিত হইবার পূর্ব্বে, সংস্কৃতজ্ঞ কোল্‌ব্রুক্‌সাহেব একটি জ্যোতিষী গণনার অবতারণা করিয়া, খৃষ্টাবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদবিভাগের প্রমাণ আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।* প্রমাণটি সংস্কৃতজ্ঞগণের নিকট সুপরিচিত; তাহা ঐতিহাসিকতথ্যরূপে বহুবার স্বীকৃত হইয়াছে। মোক্ষমূলরের মতে খৃষ্টাবির্ভাবের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদবিভাগ সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, তৎকালে বেদের জন্ম পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই! যিনি এরূপ নূতন কথা শুনাইতে বসিয়াছেন, তিনি কোল্‌ব্রুকের ভ্রান্তিপ্রদর্শন করিলে, তাঁহার কথায় আস্থাস্থাপন করা সহজ হইত। কোল্‌ব্রুকের ভ্রান্তিপ্রদর্শন করা দূরে থাকুক, মোক্ষমূলর স্বকৃত সুবৃহৎ গ্রন্থের কোনস্থানে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। সুপণ্ডিত উইল্‌সন্‌, লাসেন্‌ প্রভৃতি সুধীগণ কোল্‌ব্রুকের গণনালব্ধ ফল শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তাহার উল্লেখ করিতে হইলে, পূর্ব্বাচার্য্যগণের ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইত, নচেৎ মোক্ষমূলরের গ্রন্থ পাঠকসমাজে উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিত। মোক্ষমূলর স্বপক্ষরক্ষার্থ কোল্‌ব্রুকের গণনার কথা একেবারে চাপা দিয়া চলিয়া গিয়াছেন! ইহার জন্য অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর্‌ সমালোচনাচ্ছলে মোক্ষমূলরকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই।†

* Colebrooke's Miscellaneous Essays, Vol. I. p. 110--201.

† He has not only not invalidated the passage I have quoted, but he has not even made mention of it.—Goldstucker's Panini, p. 75.

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের গ্রন্থের ন্যায় সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক আরও একখানি গ্রন্থ সভ্যসমাজে সুপরিচিত। তাহা অধ্যাপক ওয়েবরের লেখনীপ্রসূত। তাহাতে কোল্‌ব্রুকের বিখ্যাত জ্যোতিষী গণনার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার ভ্রম প্রদর্শন না করিয়াই, অধ্যাপক ওয়েবর্ তাহার প্রতি আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত।* সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? মূলগ্রন্থঅধ্যয়নের ক্লেশস্বীকার না করিয়া, এই সকল পাশ্চাত্য মতের মায়াজালে জড়িত হইয়া, আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত হইতেছি। ইহাকে প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইলে, অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। তজ্জন্য সংস্কৃতভাষার মূলপ্রকৃতিরও আলোচনা করিতে হইবে। উত্তরকালে সংস্কৃতভাষা সর্ব্ববিষয়ে সুসংযত হইয়া যে বিশ্ববিখ্যাত রচনাগৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহা সহসা সংঘটিত হয় নাই। একদা সংস্কারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল ভাষা কোনরূপ সংযম স্বীকার করিত না। তখন তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তাহার পর, ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইয়া, 'সংস্কৃত' ভাষা গঠিত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে এই সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু কিরূপে অসংযত ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।"

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি এই বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, ভাষাসংস্কারের প্রণালীর পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সক্তুর ন্যায় ভাষাও ঝাড়িতে ঝাড়িতে সংস্কৃত হইয়াছিল; ক্রমে ক্রমে অপভাষা বিতাড়িত হইয়া সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংস্কারসম্পন্ন সারাংশের নামই "সংস্কৃত ভাষা"।

অসংস্কৃতাবস্থায় কোনও সাহিত্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। এক্ষণে যে সকল সাহিত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সমস্তই সংস্কৃতাবস্থার সাহিত্য। তাহা ব্যাকরণশৃঙ্খলে সুসংযত। সুতরাং সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-আলোচনার প্রধান সহায় সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ। কোন্ সময়ে ব্যাকরণরচনার সূত্রপাত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনির ব্যাকরণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া পরিচিত। তাহাতেও পূর্ব্বতন নানা ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের সাহিত্য যে বহু পুরাতন, তাহাতে সংশয় নাই। পাণিনিসূত্রে সেই পুরাতন সাহিত্যের কিরূপ অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? পাণিনিসূত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে,

* Indische Studein, Vol. I. p. 85.

সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, এমন সুসংযত যথাবিন্যস্ত ব্যাকরণসূত্র কোনও ভাষার শৈশবদশায় সঙ্কলিত হইতে পারে না। অন্য কোন সভ্যদেশেই এরূপ ব্যাকরণ বর্ত্তমান নাই। পাণিনির পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাঁহার ব্যাকরণসূত্রে তাহারই আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কত সাহিত্য ও কত ব্যাকরণ, না জানি কতকাল ধরিয়া, সংস্কৃতভাষাকে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ-রচনার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই পুরাতন ব্যাকরণের যে অনুমানমূলক রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে নানা অসঙ্গতির অবতারণা করিতে হয়।

পাণিনিসূত্রের আলোচনা নিতান্ত নীরস বলিয়া পরিচিত। সেই আশঙ্কায়, কোন কোন লেখক অন্যান্য প্রমাণের অবতারণা করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সঙ্কলন করিতে হইলে, পাণিনিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধকাম হইবার সম্ভাবনা কোথায়? নীরস হইলেও পাণিনিসূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কদাপি নীরস বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। পাণিনিসূত্রে সংস্কৃতভাষার যে অবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত উত্তরকালের সংস্কৃতভাষার তুলনা করিলে, পাণিনিসূত্রের আলোচনা কাব্যের ন্যায় মধুময় ও বিজ্ঞানের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হয়।

যে ব্যাকরণসূত্র সঙ্কলন করিয়া পাণিনি এইরূপ বিশ্ববিখ্যাত অমরকীর্ত্তিতে সভ্যসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন প্রদর্শনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সূত্র রচিত হইয়াছিল। সে সূত্রটি এই :—

"অথ শব্দানুশাসনম্।"

এই সূত্রে 'শব্দের' অনুশাসন করাই ব্যাকরণরচনার প্রয়োজন বলিয়া উল্লিখিত। কোন্ 'শব্দের' অনুশাসনের জন্য এই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল? সমগ্র সূত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, 'শব্দ'-শব্দে 'অপশব্দ' পরিত্যক্ত হইয়া, সাধু-'শব্দই' গৃহীত হইয়াছে। পাণিনির সময়ে জনসমাজে যাহা সাধুশব্দ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই অনুশাসন-সম্পাদনার্থ পাণিনিসূত্রের অবতারণা। মহাভাষ্যকার এই সূত্রের বিচারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন :—

"কেষাং শব্দানাম্? লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ।"

লৌকিক ও বৈদিক, এই দুই শ্রেণীতে সাধুশব্দ বিভক্ত; উভয় শ্রেণীর সাধুশব্দের অনুশাসনের জন্যই পাণিনিসূত্র রচিত হইয়াছিল। পাণিনি কিন্তু লৌকিক ও বৈদিক নামক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি সাধু-শব্দকে 'ছন্দস্' ও ভাষা নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দুই শ্রেণীর সাহিত্যে দুই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহৃত হইত; উভয় শ্রেণীর জন্যই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল। পাণিনি যাহাকে 'ছন্দস্' ও 'ভাষা' বলিয়া পাথক্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পতঞ্জলি তাহাকেই যথাক্রমে 'বৈদিক' ও 'লৌকিক' নাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যাহা 'লৌকিক' বা 'বৈদিক' উভয়শ্রেণীর বহির্ভূত, পতঞ্জলি তাহাকেই 'অপশব্দ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

'শব্দ' অর্থাৎ সাধুশব্দ প্রয়োগভেদে তিনপ্রকার :—(১) কেবল ছন্দে ব্যবহৃত শব্দ, (২) কেবল ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ, (৩) ভাষায় ও ছন্দে তুল্যরূপে ব্যবহৃত শব্দ। পাণিনির সময়ে যে শব্দ কেবল ভাষায় ব্যবহৃত হইত, ছন্দে হইত না; অথবা কেবল ছন্দে হইত, ভাষায় হইত না; সূত্রমধ্যে তাহা সেইভাবে উল্লিখিত আছে। যেখানে সেরূপ উল্লেখ নাই, সেখানে ভাষা ও ছন্দে তুল্যরূপে ব্যবহারের নিয়ম থাকা বুঝিতে হয়। সূত্রবিভাগের এই পদ্ধতি স্মরণ থাকিলে, পাণিনিসূত্রের আলোচনায় নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাণিনি যাহাকে 'ছন্দস্' বলিয়া গিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? তিনি কোনস্থলে তাহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার সময়ে 'ছন্দস্'শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, সেই অর্থেই 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। এক্ষণে 'ছন্দস্'শব্দের নানা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিন্নার্থ প্রচলিত ছিল কি না, তাহাতে সংশয় আছে। 'ছন্দস্'শব্দের নানা অর্থ—

"ইচ্ছাসংহিতয়োরাযে ছন্দো বেদে চ ছন্দসি।"

'ছন্দস্'শব্দের এক অর্থ ইচ্ছা; এই অর্থে "স্বচ্ছন্দ" কথা উৎপন্ন হইয়াছে। এই অর্থে পাণিনিসূত্রে 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। 'ছন্দস্'শব্দের আর এক অর্থ,—পদ্যবন্ধের নিয়ম। এই অর্থে পাণিনি 'ছন্দস্'শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকিলে, যাহা গদ্য তাহা 'ছন্দস্' নহে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, গদ্যনিবদ্ধ বৈদিক সাহিত্যকে ভাষাসাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এবং পাণিনির সময়ে ভাষাসাহিত্যে পদ্য প্রচলিত না থাকাও সিদ্ধান্ত করিতে হয়। পাণিনি কি অর্থে 'ছন্দস্'শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার ব্যাকরণে ছন্দস্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্পের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—ব্রাহ্মণাদি পাণিনির মতে বেদমধ্যে পরিগণিত ছিল না। এরূপ তর্ক নিতান্ত একদেশদর্শী। সমগ্র সূত্র আলোচনা করিলে, এই শ্রেণীর তর্কের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পাণিনি কেবল শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ প্রদর্শনের জন্যই ছন্দস্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, সূত্র ইত্যাদি কথার ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তদ্দ্বারা সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পাণিনিসূত্রের সকল স্থানে 'ছন্দস্'-শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার সাধারণ অর্থ 'বেদ'; কোনস্থলে তাহার বিশেষ অর্থ 'মন্ত্র'; কোনস্থলে বিশেষ অর্থ 'ব্রাহ্মণ'। বেদার্থে সাধারণভাবে যে সকল সূত্রে 'ছন্দস্'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১।২।৬১ সূত্র উল্লেখযোগ্য। ১।২।৩৬ সূত্রে ব্রাহ্মণার্থে ও ৪।২।৬৬ সূত্রে মন্ত্রার্থে 'ছন্দস্'-শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। 'ছন্দস্' ও 'ভাষা' শব্দের ব্যবহারে পাণিনি দুই শ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত থাকা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা 'ছন্দস্' নামে অভিহিত, তাহা ছন্দ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা কল্পের অন্তর্গত হইলেও, 'ভাষা' নহে। তাহারই সাধারণ নাম, "বৈদিক সাহিত্য"। 'ভাষাসাহিত্য' তাহা হইতে পৃথক্।

'ছন্দস্' ও 'ভাষা'-সাহিত্যের প্রভেদ-প্রদর্শনার্থ পাণিনিসূত্রে সমস্ত সাহিত্য 'দৃষ্ট,' 'প্রোক্ত' ও 'কৃত' নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত। বৈদিকসাহিত্য 'দৃষ্ট' বা 'প্রোক্ত'; ভাষা-সাহিত্য 'কৃত'। কৃতগ্রন্থ কর্ত্তার নামে, প্রোক্ত প্রোক্তার নামে ও দৃষ্ট দ্রষ্টার নামে পরিচিত ছিল। পাণিনির সময়ে মনুষ্যকৃত ভাষাসাহিত্যে যে নানাশ্রেণীর গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহার পরিচয় পাইলেও, সেই সকল গ্রন্থের অন্য কোন পরিচয় পাইবার উপায় নাই। দৃষ্ট ও প্রোক্ত নামক যে বৈদিক-সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনির সময়ে রামায়ণ প্রচলিত থাকিবার কোন আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তৎকালে যে সাহিত্য বিশেষ-ভাবে শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত ছিল, তাহার অধিকাংশই বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। সে সাহিত্যের দ্রষ্টা বা প্রোক্তা ঋষি-গণের নাম ও পরিচয় পাণিনিসূত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক্ষণে যাহা পাণিনি-ব্যাকরণ নামে মুদ্রিত, অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ত্রিমুনি-ব্যাকরণ। পাণিনির সূত্র, কাত্যায়নের বার্ত্তিক ও পতঞ্জলির ভাষ্য মিলিত হইয়া "ত্রিমুনি-ব্যাকরণ" নামে প্রচলিত হইয়াছে। মুনিত্রয়কে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথমে পাণিনি, তাহার পর কাত্যায়ন, তাহার পর পতঞ্জলি। ইঁহাদের মধ্যে কাহার কতকাল পরে কে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

পাণিনিসূত্রের সহিত কি উদ্দেশ্যে কাত্যায়নের বার্ত্তিক সংযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বার্ত্তিক ভিন্ন সূত্রের অসম্পূর্ণতা দূর হইত না। কিন্তু পাণিনির সময়ে পাণিনিসূত্রে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা ছিল কি না, তাহার প্রমাণাভাব। কাত্যায়নের সময়ে সংস্কৃতভাষার যে অবস্থা বর্ত্তমান ছিল, তাহার পক্ষে পাণিনিসূত্রের নানা অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়াছিল। সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্যই বার্ত্তিকের অবতারণা। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টু কর্ তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গণনা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন,—পাণিনিকৃত ৩৯৯৩ সূত্রের মধ্যে প্রায় ১৫০০ সূত্রে কাত্যায়ন বার্ত্তিক যোগ করেন; অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ সূত্র কাত্যায়নের বিচারে অসম্পূর্ণ ছিল। পাণিনি এতগুলি সূত্র অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিলেন কেন? ইহা কি তাঁহার অনবধানতা, না অজ্ঞতার নিদর্শন? পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার না করিলে, পাণিনির এরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার করা চলে না। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাঁহার ব্যাকরণসূত্র সেই সাহিত্যের সমগ্র শব্দানুশাসনে অসমর্থ, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, তাঁহার অনবধানতা বা অজ্ঞতা স্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু সে সাহিত্য কোথায়? সেকালের লৌকিকসাহিত্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেকালের বৈদিকসাহিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও, কোন্ কোন্ গ্রন্থ পাণিনির সময়ের, কোন্ কোন্ গ্রন্থ তাঁহার পরবর্ত্তী কালের, তদ্বিষয়ে মতভেদের অভাব নাই।

পাণিনির সময়ে যে সকল শব্দ কেবল বৈদিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, ভাষায় ব্যবহৃত হইত না, উত্তরকালে সেরূপ অনেক শব্দ ভাষাসাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য যেমন সংস্কৃত হইতে শব্দ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, ভাষাসাহিত্যও সেইরূপ বৈদিকসাহিত্য হইতে শব্দ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কোন্ সময়ে কত বৈদিকশব্দ ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছিল, অভিধান থাকিলে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু অমরকোষের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অভিধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অগত্যা অমরকোষ ধরিয়াই বিচার করা আবশ্যক। অমরকোষ লৌকিক শব্দকোষ; যাহা লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না, এরূপ শব্দ অমরকোষে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তরকালে 'অমরকোষের' অতিরিক্ত নানাশব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে; পরবর্ত্তী অভিধানে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য 'অমরকোষের' পরিশিষ্টস্বরূপ 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। সঙ্কলনকর্ত্তা পুরুষোত্তম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোশে ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তৈরপ্যধুনা প্রচারময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমস্য॥"

এই শ্লোকে বুঝিতে পারা যায়,—অমরসিংহের সময়ে লৌকিকসাহিত্যে অপরিচিত শব্দ উত্তরকালে লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল। "ত্রিকাণ্ডশেষে" এই সকল শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

পাণিনির সময়ে যে শব্দ লৌকিকসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না, রামায়ণে সেরূপ শব্দের ব্যবহার দেখিলে, রামায়ণকে পাণিনির পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ বলিতে ইতস্তত থাকে না। পাণিনির সময়ে যে শব্দের যে অর্থ প্রচলিত ছিল, উত্তরকালে তাহারও কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তদ্দ্বারা রামায়ণের রচনাকালনির্দ্দেশের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। সুতরাং রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে, পাণিনিসূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক।

পাণিনিসূত্রে কোন ব্যাখ্যা বা উদাহরণ সংযুক্ত ছিল না। তাহা শিষ্যগণ উপদেশক্রমে জ্ঞাত হইতেন। কাত্যায়ন বার্ত্তিক সংযোগ করিবার সময়ে উদাহরণের অবতারণা করেন। ভাষ্যকার তাহার সহিত অনেক নূতন উদাহরণ সংযুক্ত করিয়া দেন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি আপন আপন সময়ের প্রচলিত সাহিত্য হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বার্ত্তিকসূত্রসংযোগের সময়ে বার্ত্তিকসূত্রসংযোগের প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইবার জন্য কাত্যায়নকে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইয়াছিল,—বার্ত্তিক সংযোগ না করিলে, উদাহরণোক্ত শব্দ পাণিনিসূত্রের দ্বারা শাসন করা যায় না। এই সকল উদাহরণের বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়, পাণিনির পুরাতন সূত্রকে অভিনব সাহিত্যের উপযোগী করিয়া লইবার জন্যই অধিকাংশ বার্ত্তিকের অবতারণা। অন্যথা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা কি সমসাময়িক?

"কথাসরিৎসাগরের" একটি আখ্যায়িকায় পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম-

সাময়িক বৈয়াকরণ বলিয়া উল্লিখিত। "কথা-সরিৎসাগর" খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর গল্পপুস্তক। "ভোজপ্রবন্ধ"নামক গল্পপুস্তকে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত। "কথাসরিৎসাগরের" আখ্যায়িকাও সেইরূপ। অথচ তাহাকে প্রামাণিক ইতিহাস মনে করিয়া, অনেক ইউরোপীয় অধ্যাপক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "কথা-সরিৎসাগরের" আখ্যায়িকা সত্য হইলে, পাণিনি অপেক্ষা কাত্যায়নকেই অধিকতর ব্যুৎপন্ন বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। মোক্ষমূলর তাহাই করিয়া গিয়াছেন! *

কাত্যায়ন কিন্তু পাণিনির প্রতি এরূপ অসমাদর প্রদর্শন করেন নাই। মোক্ষমূলরের মতে পাণিনি অসমগ্রব্যাকরণরচয়িতা! অস্মদ্দেশে কাত্যায়নবিরচিত পাণিনি-নমস্কার-শ্লোক বলিয়া যে শ্লোক অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহাতে কাত্যায়ন পাণিনিকে সমগ্র-ব্যাকরণরচয়িতা বলিয়াই নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

পাণিনি যে চতুর্দ্দশ "প্রত্যাহারসূত্র" অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে "অক্ষরসমাম্নায়" অর্থাৎ অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ, ও ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণ পাঠের সিদ্ধ ও সনাতন ক্রম পরিত্যক্ত হইয়া নূতন ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা পাণিনিবিরচিত বলিয়া পরিচিত নহে। তিনি অবশ্যই কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের গ্রন্থ হইতে এই চতুর্দ্দশ সূত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ও অব্যবহিত পরে সে কথা লোকে জানিত; কালে তাহা বিস্মৃত হইয়া জনসাধারণ এক অলৌকিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছিল। লোকে বলিত, পাণিনি ইহা ভূতভাবন ভবানীপতি মহেশ্বরের ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাত্যায়ন বহুপরবর্ত্তী কালের বৈয়াকরণ না হইলে, তিনি নমস্কার-শ্লোকে এই অলৌকিক জনশ্রুতির উল্লেখ করিতেন না। অন্য প্রমাণ না থাকিলে, এই নমস্কারশ্লোক ধরিয়াই কাত্যায়নকে পাণিনির বহুপরকালবর্ত্তী বলা চলিত। কিন্তু অন্য প্রমাণেরও অভাব নাই।

সূত্র ও বার্ত্তিক তুলনায় সমালোচনা করিলে, পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিবার উপায় থাকে না। বরং বলিতে হয়,—কাত্যায়ন তাঁহার সময়ের প্রচলিত সাহিত্যের সমগ্র শব্দানুশাসনকার্য্যে পাণিনি-সূত্রের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব সাহিত্যের উপযোগী করিবার জন্যই বার্ত্তিক সংযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক বার্ত্তিক যে বিনা প্রয়োজনেও সংযুক্ত হইয়াছিল, উত্তর-কালে ভাষ্যকার তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অধিকাংশস্থলে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রামায়ণোক্ত শব্দানুশাসনের জন্য পাণিনি-

* His Varttikas are supplementary rules, which show a more extensive and accurate knowledge of Sanskrita than even the work of Panini, ——Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature, p. 241.

সূত্র সমর্থ কি না, তাহার বিচারে অগ্রসর হইলেই, রামায়ণের রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট বিচারপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবে। তৎপূর্ব্বে কাত্যায়ন পাণিনির পরবর্ত্তী কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সংযম।*

বড় আশা ছিল, নবোদ্ভূত বঙ্গসাহিত্য-দ্বারা বঙ্গসমাজ আবার সুসংস্কৃত হইয়া পুণ্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে। সাহিত্য-সেবিগণের প্রথম উদ্যমে এইরূপ আশা-সঞ্চারের যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ অপকার সাধিত হইতেছে। যে সাহিত্য জনসমাজকে পুণ্য ও পবিত্রতার পথে আকর্ষণ করিয়া এক মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চতম আদর্শের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাহিত্যদ্বারাই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু যে সাহিত্য জাতীয়জীবনের উচ্চতম আদর্শ ভুলিয়া গিয়া সমাজের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতাচার ও অসংযমরূপ লেলায়মান বহ্নিকে পুষ্ট করিবার জন্য তাহাতে আপাত-মনোরম মাদকতাময় মোহময় শ্রেয়স্বরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করে, সে সাহিত্যদ্বারা সমাজ অধিকতর কলুষিত হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইব, বর্ত্তমান সময়েও তাহাই হইতেছে।

মানবহৃদয়ে যতপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও দুর্দ্দমনীয়। প্রেমের ন্যায় আবেগময়, আবেশময়, মোহময়, মধুময়, মদিরাময় বৃত্তি আর নাই। প্রেমই আমাদের সমাজবন্ধনের রজ্জু এবং কাব্যকলার উপাদান। এই প্রেমের উদ্দাম উদ্দীপনাদ্বারা সমাজের যে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ঋষিগণ বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যুবকযুবতীর প্রেমলীলাময় গান্ধর্ব্ববিবাহ সমাজ হইতে তুলিয়া দিয়া এবং বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া হিন্দুসমাজে দাম্পত্যপ্রীতিকে একটি শান্তিময় সুস্নিগ্ধ স্তিমিতপ্রবাহ দেবখাতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পাশ্চাত্য-আদর্শ-প্রিয় কবিগণ দেখিলেন, প্রেমকে এরূপ গার্হস্থ্যজীবনখাতে মৃদুমন্দগতিতে একঘেয়েভাবে প্রবাহিত হইতে দিলে সেই অদ্ভুতরসসেকহীন—romanceশূন্য—জীবনের সার্থকতা কি, আর কাব্যকলারই বা উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? সেজন্য কাব্যকলায় নবনব

* ইহা সুবিত্রীলাইব্রেরির এবারকার বার্ষিক অধিবেশনে লেখককর্ত্তৃক পঠিত "বিশ্বামিত্রের তপ স্যা" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ।

রসসৃষ্টির*) অভিপ্রায়ে এবং সমাজমধ্যে স্বাধীন প্রেমের উন্মুক্ত তরঙ্গ ছুটাইবার জন্য তাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্যরচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয়, যে সকল গ্রন্থকারের উজ্জ্বল প্রতিভায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত, তাঁহারাই এই সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার পথপ্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অবাধপ্রেমের বিচিত্র-লীলা প্রদর্শন করিতে না পারিলে উপন্যাস জমে না স্বীকার করি, কিন্তু তাহারও একটা সুসংযত সীমা থাকা কর্ত্তব্য। সমাজে নর-নারীচরিত্রের উপর আপাতমধুর সাহিত্যের কতদূর প্রভাব, ইহা গ্রন্থকারদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ঔপন্যাসিক প্রেমচিত্র দ্বারা স্বাধীনপ্রেমের লীলাভূমি পাশ্চাত্য-সমাজে যে কত গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা আজকাল কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন। এই প্রসঙ্গে Marie Corelli প্রণীত "Sorrows of Satan" এবং Mrs. Henry Wood প্রণীত "East Lynne" উপন্যাস বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যসমাজে প্রেমকে অতিমাত্র স্বাধীনতা দিতে দিতে এখন তাহার পাখা হইয়াছে ; সে এখন সুদূর সূক্ষ্মতম আকাশে—Ethereal regionএ—উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সে এখন আর সাধারণ-ঘরকন্না-রূপ খুঁটিনাটির মধ্যে অবরুদ্ধ ও আবদ্ধ থাকিয়া নিজকে ধূলিমলিন করিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। পাশ্চাত্যসমাজে স্বামী এখন স্ত্রীর নিকট হইতে আদর-অনুরাগ-স্নেহ সবই পাইতেছেন, কেবল পান না সেই অদ্ভুতরহস্যময় বস্তুটি অর্থাৎ love বা ভাল-বাসা। স্ত্রীর নিকট হইতে সেই সূক্ষ্মতম পদার্থটি লাভ করা কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। কারণ love বড় ethereal—আকাশশরীরী, তাহা কাহাকেও ধরাছোঁয়া দেয় না—তাহা নর-নারীর ইচ্ছাধীন নহে—তাহা নরনারীর ইচ্ছা-শক্তির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে ;—"It is a capricious passion and generally comes without the knowledge and against the will." অবাধ উন্মুক্ত স্বাধীনপ্রেমের কি অদ্ভুত পরিণাম!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেমবৃত্তিটি বড় দুর্দ্দম-নীয়। একবার রাশ ছাড়িয়া দিলে সেই দুষ্ট অশ্বকে সংযত করিতে পারে, এরূপ সারথি কে আছে ? সেই অসংযত দুষ্ট অশ্ব প্রবলবেগে ছুট পাইয়া পাশ্চাত্যসমাজে নর-নারীকে অনবরত সংসারের খাতে ফেলিতেছে। কত কত মূল্যবান্ জীবন প্রেমবিপাকে পড়িয়া বিফল হইয়া যাইতেছে। আবার দাম্পত্যপ্রেম অত্যধিকমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া নরনারীর হৃদয় একচেটিয়া দখল করিয়া বসিয়াছে। ঈশ্বরে ভক্তি ত অতিদূরের কথা, এমন কি, পিতামাতা-ভাইভগিনীর জন্যও পাশ্চাত্যহৃদয়ে একটুকু স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন। স্ত্রী আসিয়া স্বামীর হৃদয় একেবারে পূর্ণমাত্রায় দখল করিয়া বসিলেন, তাহাতে আর কাহারও স্থান হইবার সম্ভাবনা রহিল না। একটি সুসংযত হৃদয়ে একই সময়ে ঈশ্বরে প্রীতি, পিতামাতার ভক্তি, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, ভাইভগিনী ও অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি স্নেহ,- এবং একই পরিবারে ইঁহাদের সকলের একত্র অবস্থান, এই নেত্র-

প্রীতিকর দৃশ্য কেবল ঋষিদিগের তপঃপূত সুসংস্কৃত সুনিয়ন্ত্রিত হিন্দুপরিবারেই দেখা যায়। হিন্দুপরিবার বিশ্বপ্রীতিশিক্ষার নিলয়, তাই এখানে প্রীতির বহুমূর্ত্তিতে—বিবিধ ভাবে পরিণতি। তুমি সহধর্ম্মিণী—বিবাহ করিয়া আনিয়া তোমাকে আমার আত্মার অর্দ্ধাংশ দান করিয়াছি সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমাকে আত্মসমর্পণ করি নাই—এই যুক্ত পরিবারে আমার আর পাঁচজন যেমন আমার আত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া আছে, তুমিও তাহাদের মধ্যে মিলিয়া থাক—আমার আর পাঁচজনকে পরিত্যাগ করিয়া, একলা তোমাকে লইয়া আমি কি করিব? হিন্দুহৃদয়ে সহধর্ম্মিণীর ইহাই ন্যায্য অধিকার। হিন্দুপত্নী ইহাতেই সন্তুষ্টা। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন লোকসানও নাই। তিনি স্বামিহৃদয়ের একমাত্র প্রেমনায়িকা না হইতে পারিয়া পাশ্চাত্যপত্নীর তুলনায় যেটুকু আদর ও সোহাগ কম পাইতেছেন, সন্তানগণের জননীরূপে, ভ্রাতার ভগিনীরূপে, পিতামাতার কন্যারূপে এবং একপরিবারস্থ অন্যান্য সকলের আনন্দদায়িনী সহচরী বা আত্মীয়ার রূপে সেই আদর ও সোহাগের শতগুণ সুদসমেত লাভ করিতেছেন। ইহাই হিন্দুগৃহিণীর বিশেষ গৌরব। কিন্তু এই গৌরবান্বিত পদ লাভ করিবার জন্য হিন্দুপত্নীকে দ্রৌপদীর ন্যায় তপস্বিনী হইতে হইবে। তাই বড়ই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয়-সাহিত্যরথিগণের পাশ্চাত্যাদর্শবহুল-নাটক-নবেল-পাঠের ফলে হিন্দুপরিবারে এইরূপ আদর্শগৃহিণীর সংখ্যা দিনদিন হ্রাস হইতেছে। সংযম, সহিষ্ণুতা, শীলতা প্রভৃতি শোভনীয় গুণসকল হিন্দুপরিবার হইতে দিনদিন অন্তর্হিত হইতেছে। সাহিত্যরথিগণ হিন্দুর সুসংযত চিত্তে নিত্য নব ভোগলালসা জাগরিত করিয়া সমাজের বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

হয় ত কেহ বলিবেন, কঠোর ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে হিন্দুজাতির মানসিক শক্তিসমূহ নিষ্পেষিত ও দলিত হইয়া গিয়া সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। সে সকল কঠোর শাসনের ব্যবস্থা আর কেন? এখন অন্যান্য সুসভ্য জাতিসকল যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীন আচারব্যবহার, স্বাধীন কর্ম্মপন্থাসকল অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, শুদ্ধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যথেচ্ছ ব্যবহারদ্বারা কখন কোন জাতি উন্নতিলাভ করিতে পারে না। যে জাতি যত বড় হইয়াছে, সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির নিকট তত অধিক মস্তক অবনত করিতে বাধ্য। মুখের কথা,—প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন; কিন্তু কার্য্যত প্রত্যেক ব্যক্তি জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির অধীন। ইংরেজ, রুষ, জাপান জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব জাতির হিতাকাঙ্ক্ষায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প বলিয়াই এই সকল জাতি এতদূর রাষ্ট্রীয় সমুন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে। জাপানজাতীয় প্রত্যেক পুরুষ কতক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতে বাধ্য। আজ জাপানীর শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রম দেখিয়া সমগ্র পৃথিবী স্তম্ভিত, কিন্তু জাপানীদিগের এই

সকল গুণ কত কঠোর সাধনাবলে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আমরা কয়জনে অনুসন্ধান করি? সম্প্রতি জাপানপ্রবাসী একজন বাঙালী কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় জাপানী-দিগের, স্বদেশের হিতকল্পে, কঠোর সাধনার কথাপ্রসঙ্গে বলেন—

"জাপানের ক্ষত্রিয়সমাজ 'সামুরাই' নামে পরিচিত। ইহাদের শৌর্য্যসাহসের পরিচয়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সামরিক জাতির অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালের স্পার্টান্‌দিগের অনুরূপ; বরং অনেকবিষয়ে তাহাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর। অতি বাল্যকাল হইতে সামুরাইকে সহিষ্ণুতার আধার করিয়া তুলিবার জন্য পিতামাতারা বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়া থাকে। সহিষ্ণুতা-শিক্ষার জন্য বালকবালিকাদিগকে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া নগ্নপদে বহুদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হয়। শীতকালে এই-রূপ খালিপায়ে বরফের উপর দিয়া গুরুগৃহে যাইতে হয়। তাহাদের যাহাতে রাত্রিজাগ-রণের অভ্যাস হয়, সে বিষয়েও অভিভাব-কেরা যত্নের ত্রুটি করেন না। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুইদিন সমস্তরাত্রি জাগিয়া বালক-বালিকাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তি করিতে হয়। ক্ষুধাবিজয় জাপানী ক্ষত্রিয়-বালকদিগের শিক্ষার তৃতীয় অঙ্গ। দীর্ঘকাল অক্লেশে অনশনে যাপন করিতে অসমর্থ হওয়া সামুরাইবালকের পক্ষে ঘোর লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সকল শিক্ষায় বালকবালিকাদিগের দেহ সুদৃঢ় হইলে সামুরাই-জনকজননী তাহা-দিগকে নির্ভীক করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। যে সকল স্থানে ভূতের উপদ্রবের ভয়ে সাধারণ লোকে যাইতে সাহসী হয় না, সেই সকল স্থানে ও ভীষণ শ্মশানভূমিতে অতি অল্পবয়স্ক সামুরাই-বালককে পুনঃপুনঃ গমন করিতে বাধ্য করা হয়। কোন ব্যক্তির শিরশ্ছেদের দণ্ড হইলে রাত্রিকালে একাকী বালকদিগকে বধ্যভূমিতে গমনপূর্ব্বক নিহত ব্যক্তির দেহস্পর্শ ও ছিন্ন-মস্তকে কোনপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিতে হয়।" ইত্যাদি।

'হিতবাদী'—৮ই মাঘ, ১৩১০।

জাপানীদিগের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির চরণতলে এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বলি-দানকে কি বলিব? ইহাই ত তপস্যা। জাপানীজাতি পাশ্চাত্যসভ্যতার ভোগ-বিলাসতরঙ্গে গা ছাড়িয়া না দিয়া, তাহার মধ্য হইতে যতটুকু স্বকীয় জাতি ও স্বকীয় সমাজের হিতকল্পে উপযোগী, তাহাই ছাঁকিয়া লইয়াছে। আর আমরা? আমরা সেই বাহ্যচাকচিক্যময় সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভুলিয়া সেই সভ্যতার ভোগবিলাসপ্রবাহে কাষ্ঠতৃণবৎ ভাসিয়া যাইতেছি।

পাশ্চাত্যজাতি আমাদিগকে অহরহ ইহাই বলিয়া টিটকারি দেন যে, আমরা অসভ্য, আমাদের—standard of comfort নিতান্ত low—অর্থাৎ আমাদের বাহ্যিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার মাপকাঠিটা নিতান্ত ক্ষুদ্র। তাঁহা-দের তুলনায় আমরা শারীরিক ও মানসিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি অধিক লক্ষ্য করি না, নিত্য নূতন সুখের জিনিষ ও সখের জিনিষের

জন্ত আমরা অধিক অর্থব্যয় করিতে পারি না। তাঁহাদের এই তিরস্কারে ভীত হইয়া এবং পাশ্চাত্যসভ্যতার বাহ্যিক জাঁকজমকে মুগ্ধ হইয়া আজ আমরা ক্রমাগতই তাঁহাদের অনুকরণে নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টিপূর্ব্বক তাহাদের পরিপূরণের জন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি। কিন্তু ইহার যে কি ভীষণ পরিণাম, তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। এই standard of comfort বৃদ্ধি করিতে গিয়া পাশ্চাত্যজাতিসকল কি ঘোরতর অশান্তিতে কালযাপন করিতেছে, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এখন পাশ্চাত্যসভ্যতাবিস্তারের অর্থ এই —তোমরা তোমাদের ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নিত্য নূতন বস্তুর আবিষ্কার কর, সেই সেই বস্তু প্রাপ্তির জন্য সদুপায়ে হউক, অসদুপায়ে হউক, অর্থসংগ্রহ কর, সেই অর্থ স্বদেশে না মিলিলে তাহা লাভের জন্য অন্যদেশ অধিকার কর, অন্তজাতির সর্ব্বস্ব অপহরণ কর, অন্ত জাতিকে যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ কর। যদি অন্ত কোন ক্ষমতাশালী জাতি সেই ক্ষেত্রে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তবে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সে জাতি যদি দশলক্ষ সৈন্ত, দশহাজার কামান সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে তোমরা বিশলক্ষ সৈন্য এবং বিশহাজার কামান সংগ্রহ কর। যদি সেই জাতি পাঁচখানা রণতরি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তবে তোমরা দশখানা প্রস্তুত কর। এইরূপে সুসভ্যজাতিবৃন্দের দুর্দ্দমনীয় ভোগলালসা হইতে পৃথিবীতে রাবণের চিতাবহ্নির ন্যায় প্রতিনিয়ত সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই কি মহাগৌরবান্বিত পাশ্চাত্যসভ্যতার পরিণাম? পরমেশ্বর কি এইরূপ পাশবপ্রবৃত্তিসকল চরিতার্থ করিবার জন্য মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন? জগতে শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতার রাজত্ব কি কখনও প্রতিষ্ঠিত হইবে না? জগতে কি কখনও সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার পবিত্রবন্ধনে মানবমণ্ডলী সংবদ্ধ হইবে না?

আমাদের দেশে আজ যাঁহারা জাপানের সুখসমৃদ্ধিশৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া সেদিকে সতৃষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি —যে তপস্যাবলে জাপান আজ বহুকালব্যাপী সুষুপ্তির ক্রোড় হইতে জাগ্রত হইয়া জগতের সমক্ষে গৌরব[illegible] অবনত উন্নত করিয়াছে, আমাদিগকেও [illegible]গকেও তপস্যা করিতে হইবে। পাশ্চাত্যের [illegible] ভোগবিলাসে মজিলে কখন এ জাতির উন্নতি হইবে না। একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, পাশ্চাত্যজাতিরা সভ্যতার যে মাপকাঠি বাহির করিয়াছে, তাহাই জগতে একমাত্র মাপকাঠি নহে। তাহারা যে standard of comfort আমাদিগকে দেখাইতেছে, তাহাই একমাত্র standard of comfort নহে। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের তপোবনে প্রাচীন ভারতে যে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—যাহার প্রভাব এখনও চীন-জাপানে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াখণ্ডে অল্পমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা সেই মহাগৌরবান্বিত আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী। পাশ্চাত্যসভ্যতার যেমন একটা standard of comfort আছে, সেই আর্য্যসভ্যতারও তেমনি একটা standard of comfort ছিল।

পাশ্চাত্যসভ্যতার standard হইতেছে শরীর ও মনের তৃপ্তি। আর্যসভ্যতার standard ছিল আত্মার তৃপ্তি। পাশ্চাত্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই তত উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত, যিনি যত অধিকপরিমাণে অর্থ শুষিয়া-লইয়া নিজের ব্যাঙ্ক্ পূরণ করিবেন—যিনি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিবেন,—যিনি অধিকপরিমাণে অর্থব্যয় করিয়া নিজের ও পরিজনবর্গের উত্তম বেশভূষা, আহার-বিহার ও আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করিবেন—যিনি সর্ব্বসাধারণকে নিজের প্রভুত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন। আর আর্যসভ্যতার নিরিখে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও পূজিত, যাঁহার এ সংসারে আপনার বলিবার কপর্দ্দকও নাই, অথচ যাঁহার কিছুমাত্র অর্থলিপ্সা নাই—যাঁহার বাস করিবার জন্য একখানি গৃহও নাই, অথচ যিনি তাহার কিছুমাত্র অভাববোধ করেন না—যিনি আহারবিহারবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বীতস্পৃহ—যিনি পরের অনিষ্ট করিবার জন্য কিছুমাত্র ক্ষমতা চাহেন না,—যিনি বসনভূষণসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, মান-অপমান যাঁহার নিকট তুল্য—যাঁহার নিকট শত্রুমিত্রের ভেদ নাই—যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মারাম। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্যসভ্যতার আদর্শ-পুরুষ আমেরিকার সেই ধনকুবের Peirpont Morgan, আর্যসভ্যতার আদর্শপুরুষ সেই কাশীধামের ত্রৈলিঙ্গস্বামী। শুদ্ধ আত্মার তৃপ্তির জন্য ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে ধনমান, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সুখ-সম্পদ্ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ইহার বহু উদাহরণ রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন রাজকুমার কিংবা বড়লোকের ছেলে তীর্থদর্শনে গমন করেন, তবে তাঁহার বেশভূষা-চাকরখানসামা প্রভৃতির ষোল-আনা ঘটা দেখিয়া চক্ষু স্থির হয়। কিন্তু একদিন অযোধ্যার—এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্ দশরথের দুইটি কিশোর-বয়স্ক কুমার তাড়কাবধের নিমিত্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত নানাদিগ্‌দেশপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহারা কি বেশে কতজন ভৃত্য লইয়া বাহির হইয়াছিলেন? আমরা দেখিতে পাই, রাম-লক্ষ্মণ তাঁহাদের রাজোচিত বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সেই তপস্বীর সঙ্গে তপস্বিবেশে বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় কখন ফলমূলাশনে, কখন বা অনশনে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। রামলক্ষ্মণ ছিলেন অসভ্য, কারণ তাঁহাদের standard of comfort নিতান্ত ছোট ছিল। আর আমরা মহাসভ্য, কারণ আমাদের standard of comfort তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ!

পাশ্চাত্যসভ্যতার ঐন্দ্রজালিক মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়াতে আমাদের নৈতিক অবস্থাও দিনদিন শোচনীয় হইতেছে, আমরা মনুষ্যত্ব হারাইতেছি। যতই আমাদের অট্টালিকা-আস্‌বাব্, পোষাকপরিচ্ছদ, আদবকায়দার ঘটা বাড়িতেছে, ততই আমাদের আত্মার বল কমিয়া আসিতেছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে চা-পান-করাটা কেবল সাহেবিয়ানা-গ্রস্ত উচ্চশ্রেণীর বড়লোকদিগেরই রীতি ছিল, কিন্তু এই ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহা প্রত্যেক মধ্য-

বিত্ত, এমন কি, অনেক দরিদ্র পরিবারের নিত্যক্রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। এতাবৎকাল শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার কঠিন পরীক্ষা করা হইয়াছে, নচেৎ আমি আর অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতে পারিতাম, শুদ্ধ পাশ্চাত্যসভ্যতার খাতিরে আমরা আরও কতপ্রকার অভাব উদ্ভাবন করিয়া আমাদের দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি। আমরা মুখে "ভারতের দরিদ্রতা" বলিয়া কত আন্দোলন করি, কত রিজোলিউশন্ পাস্ করি, কত হাহুতাশ করি,—কিন্তু দেশের দরিদ্রতা আমরা কতটা নিজেরাই বৃদ্ধি করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদের পিতৃপিতামহগণ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সারা দিনরাত্রি খালি গায় কাটাইতেন, অথচ তাঁহারা দীর্ঘজীবী ও নীরোগ ছিলেন। আমাদের কিন্তু অষ্টপ্রহর গঞ্জী কিংবা শার্ট গায় না দিয়া থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। অথচ আমাদের রোগ চিরদিন একটা-না-একটা লাগিয়াই আছে, এবং আমাদের আয়ু প্রায় পঞ্চাশ পার হয় না। যাহা হউক, আমার অর্থ আছে, আমি যেন এরূপ জামাকাপড় ব্যবহার করিতে পারিলাম। কিন্তু আমার অনুকরণে পরাণমাঝির পুত্র যে আট আনা দিয়া ঐ কালোডোরাযুক্ত বিলাতী গঞ্জী কিনিয়া নৌকা বাহিবার সময় গায় দিয়াছে, ও কি আর উহার পিতার মত শীতকালের রাত্রে হিমের মধ্যে জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিতে পারিবে? কখনই না। দেশের ভদ্রলোকদিগের অনুকরণে, গরিবশ্রেণীও বিলাসিতার পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বে কলিমদ্দী শেখ যখন তাহার ক্ষেত্রে চাষ করিতে যাইত, তখন মাটির বাসনে ও পিতলের ঘটীতে তাহার প্রাতরাশের জন্য ভাত ও জল আসিত। কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এখন enamelled plate, enamelled cups, enamelled glass না হইলে তাহার সেই ভাত ও জল আসে না। এইরূপ আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

আমরা এইরূপে নিজেদের বিলাসপ্রিয়তাদ্বারা দেশের অভাববৃদ্ধি ও দরিদ্রতার বৃদ্ধি করিতেছি, অথচ আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সকল উপায়ে দরিদ্রদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন, আমরা সেগুলি একে একে পরিত্যাগ করিতেছি। আমাদের দেশে গৃহস্থমাত্রেরই অতিথিসংকার একটি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা যেমন অনেক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি গৃহস্থের আলয়ে আশ্রয় পাইত, তেমন গৃহস্থও সর্ব্বজনপ্রীতির অনুশীলনদ্বারা হৃদয়ের প্রশস্ততা লাভ করিতেন। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই অতিথিসংকার এখন হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। এখন আমরা আমাদের কতশত কৃত্রিম অভাব পূরণ করিতেই ব্যস্ত, অতিথিসেবার ব্যয় বহন করিতে পারিব কেন? আমাদের ভারতসম্রাট্ মহামতি এড্‌ওয়ার্ডের শুভ-অভিষেকোপলক্ষে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের শুভ আকাঙ্ক্ষায় অনেকগুলি দরিদ্রলোক এক বেলা আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, সেজন্য বিলাতে এক মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। কারণ, এরূপ অনুষ্ঠান সে দেশে

অশ্রুতপূর্ব্ব। কিন্তু আমাদের দেশে যে নিতান্ত গরিব, তাহারও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে কিংবা পূজাপার্ব্বণে অনেক প্রতিবেশী নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। হিন্দুর কোন শুভকর্ম্ম যাগ-যজ্ঞ এইরূপ সর্ব্বসাধারণের প্রীতিভোজ ব্যতিরেকে সফল ও সুসিদ্ধ হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই—হিন্দু জানেন যে, এই সকল পূজাপর্ব্বাদিতে যে দেবতার অর্চ্চনা করা হয়, এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বৈশ্বানর—বিরাট্—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তাই বিশ্বজনের তৃপ্তিতে তাঁহার তৃপ্তি,—বিশ্বজনের প্রীতিতে তাঁহার প্রীতি,—বিশ্বজনের সন্তোষে তাঁহার সন্তোষ। তাই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অন্তঃকরণ যেমন উদার ছিল, তাঁহাদের নিমন্ত্রিতমণ্ডলীও তেমনই ব্যাপক ছিল। আমরা সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্যের "পদ"-সংখ্যা ও রসমাধুর্য্য ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছি বটে, কিন্তু নিমন্ত্রিতের সীমাটা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে এখন মাত্র ৫।৭টি select friendsএ—বাছাই করা অন্তরঙ্গে—পরিণত হইয়াছে। এইরূপে আমরা মুখে যতই দরিদ্রের বন্ধু বলিয়া আত্মগুণ ঘোষণা করিতেছি, ততই যে সকল দ্বার দিয়া আমাদের উপার্জ্জিত অর্থ অতি অল্পপরিমাণেও দরিদ্রের হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল আটঘাট খুব airtight, নিশ্ছিদ্র—করিয়া বন্ধ করিতেছি। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কলকারখানা-শিল্পবাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রপোষণের ব্যবস্থা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। এবং এই-শুভ-উদ্দেশ্য-সাধনার্থে সম্প্রতি যে চারি আনা করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের আয়োজন হইতেছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের দরিদ্রতানিবারণের জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত আয়ত্তাধীন রহিয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠান না করা যে গুরুতর সামাজিক ও নৈতিক পাপ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পাপ ক্ষালনের জন্য এখন আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। দীর্ঘকালব্যাপী বহুবিধ সামাজিক দুর্গতির জন্য আমাদের যে অধোগতি হইয়াছে, তাহা হইতে পুনরুত্থানের জন্য আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। বাহ্যচাক্‌চিক্যময়ী পাশ্চাত্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের যে সকল মানসিক ও সামাজিক দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমরা যে মনুষ্যত্ব হইতে দিনদিন স্খলিত হইতেছি, তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি লইয়া একটা বিশাল জাতীয়তাসৃষ্টি অনেক দূরের কথা, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে কেবল নানাদেশবাসী বিভিন্নবর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-সমাজ লইয়া একটা জাতীয়বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, যাহাতে আমাদের মধ্যে একটা সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান—জাতীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, যাহাতে আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, প্রীতি ও দাক্ষিণ্যাদি গুণের বিকাশ করিতে সমর্থ হই, সেজন্য

আমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, এখন কালের স্রোত ফিরান অসম্ভব—কালের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই বিশ্বরাজ্যের একজন স্রষ্টা, পাতা ও বিধাতা আছেন। তিনি কালের কর্ত্তা এবং কালের নিয়ামক। তাঁহারই ভয়ে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহনক্ষত্র—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। আমরা যদি তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যসাধন করিয়া যাইতে পারি, তবে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে। তাঁহার প্রীতির জন্য হৃদয়ের একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতা চাই। তিনি আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার পুনরাদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই শেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

> ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
> তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহাদিগকে চালাইতেছেন। অতএব হে অর্জ্জুন, একমাত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হও,—তাঁহার প্রসাদে তুমি শান্তি ও অবিনশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে। ঋষিকল্প এমার্সন্ বলিয়াছেন—

"A little consideration of what takes place around us every day would show us, that a higher law than our will, regulates events; that our painful labours are un. necessary and fruitless; that only in our easy, simple, spontaneous action are we strong, and by contenting ourselves with obedience we become divine. Belief and love—a believing love will relieve us of a vast bond of care. O my brothers, God exists. There is a soul at the centre of nature, and over the will of every man, so that none of us can wrong the universe....We need only obey. There is a Guidance for each of us, and by lowly listening we shall hear the right word."
—*Spiritual Laws.*

সেই সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিশ্ববিধাতার প্রীতির জন্য আমাদিগকে তপস্যা করিতে হইবে। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রকৃতিবৈচিত্র্য সেই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির এক গূঢ়রহস্য। পৃথিবীর সকল জাতি একই পন্থা অবলম্বন করিয়া সমুন্নত হইবে, ইহা যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি সকল জাতিকেই একই উপাদানে সৃষ্টি করিয়া একইপ্রকার প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে স্থাপন করিতেন। কে জানে, এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলবিধানের বীজ নিহিত নাই? যখন সমগ্রদেশ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়, তখন কৃষক তাহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট শস্যের বীজ একটু অল্পপরিসর উচ্চভূমিতে

বপন করিয়া রাখে, এবং পরে বন্যা ছাড়িয়া গেলে সেই বীজোৎপন্ন অঙ্কুর তাহার সমস্ত ক্ষেত্রে লাগাইয়া দেয়। আজ যখন সমগ্র পৃথিবী সুসভ্যজাতিগণের আসুরিক-বল-প্রসূত ভীষণ বিদ্বেষ, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা ও শোণিতপিপাসার বহ্নিতে সমাবৃত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কে জানে, বিধাতার মঙ্গল-বিধানে এই ক্ষুদ্রদেশে, হিন্দুজাতির মধ্যে, প্রাচীনসভ্যতাপ্রসূত শান্তি, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণনিচয়ের বীজ জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্য রক্ষিত হইতেছে না? কে জানে, এই সকল দুৰ্দ্ধর্ষজাতি যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহদ্বারা ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, যখন অবিরত ভোগলালসার চরিতার্থতাদ্বারা তাহাদের হৃদয়ে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা এই ঋষিপ্রবর্ত্তিত প্রাচীনসভ্যতার শান্তিপ্রীতি-পবিত্রতাময়ী সুধা পানের জন্য কাতরকণ্ঠে লালায়িত না হইবে?

তাই আমার মনে হয়, আমাদের জাতীয়-জীবনের এই মহাপরিবর্ত্তনসময়ে, transition periodএ—আজ যখন আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যস্থলে, ভোগসংযম ও ভোগ-পিপাসার সঙ্গমস্থলে—নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তি-মার্গের সন্ধিস্থলে—দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, তখন আমাদের জাতীয় ইতিহাস রামায়ণরূপ অভ্রভেদী শৈলশিখরে, সেই আদর্শব্রাহ্মণ, সাবিত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টা, শ্রীরাম-চন্দ্রের শিক্ষাগুরু ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন—"হে আর্য্যবংশধরগণ, তোমরা কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইও না, আমারই মত সংযমমার্গের অনুসরণ কর। দেখ, আমি যে তপস্যাবলে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে রাজর্ষিত্বে, রাজর্ষিত্ব হইতে ঋষিত্বে, ঋষিত্ব হইতে মহর্ষিত্বে, মহর্ষিত্ব হইতে ব্রহ্মর্ষিত্বে উন্নীত হইয়াছি, তোমরাও সেই তপস্যার আশ্রয় কর। আমি যেরূপ দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অপ্রতিহত অধ্যব-সায়কে আশ্রয় করিয়া পুরুষকারের শাণিত কৃপাণে দৈবের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম, তোমরাও সেই দুর্জ্জয় সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়কে আশ্রয় কর। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমরা বর্ত্তমান ভীষণ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া এই সিদ্ধর্ষিসেবিত পুণ্যভূমির মুখোজ্জ্বল কর।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

২

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

তিনঘটিকার সময় এখান হইতে যাত্রা করিলাম। এখন সূর্য্যের তাপ আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। শকটের ভিতরে মাদুর ও শতরঞ্জি পাতা। ছাদ এত নীচু যে, সিধা হইয়া বসিবার জো নাই; কাজেই, আহত ব্যক্তির ন্যায় পা ছড়াইয়া শুইয়া রহিলাম। গাড়ির বলদেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে-নাচিতে চলিতে লাগিল। এইভাবে দুইরাত্রি অবিরাম চলিয়া আমার নিদ্রার বিলক্ষণ ব্যাঘাত করিবে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আমার বাহন ও বাহক বদ্‌লি হইবে। সমস্ত পথটায় ডাকের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। এখন যেখানে আমি আছি—এই পূর্ব্বভারত, আর যেখানে যাইতেছি—সেই ত্রিবঙ্কুররাজ্য, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এই যে যাতায়াতের পথ—এটি দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সুখের "খয়রাৎ-মহলে" এখনও রেলপথ হয় নাই যে, তদ্দ্বারা পরপুষ্টদিগের আমদানি হইবে, কিংবা ইহার ধনধান্য বিদেশে চলিয়া যাইবে। উত্তর দিক্ দিয়া, খালপথে নৌকাযোগে, ক্ষুদ্ররাজ্য কোচিনের সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। এই খাল-বিল অনেকগুলি। তা ছাড়া, আত্মরক্ষণ-উপযোগী ইহার কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা আছে,—তদ্দ্বারা বাহিরের সংস্পর্শ হইতে ইহা সুরক্ষিত।

ইহার পশ্চিমে বন্দরহীন সমুদ্র, দুরধিগম্য সৈকতবেলাভূমি—যাহার উপর ফেনময় তরঙ্গরাজি অবিরাম ভাঙিয়া পড়িতেছে। "ঘাটে"র গিরিমালা—ভারতের একপ্রকার মেরুদণ্ড বলিলেও হয়—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত;—উহার শৈলচূড়া, উহার অরণ্য, উহার ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু কতকটা প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

আমার গাড়ির বলদদুটি কখন দুল্‌কি-চালে, কখন বা ছুটিয়া চলিতেছে। যেই একটা গ্রাম পার হইতেছি, অমনি আবার দীর্ঘপথ আরম্ভ হইতেছে—বৈচিত্র্যহীন, অফুরন্ত। সূর্য্য জলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে। পথের দুইধারে যে বৃক্ষগুলি সারি-সারি চলিয়াছে, উহা দেখিতে কতকটা আমাদের আখ্‌রোট্ ও "অ্যাশ্"-গাছের মত। যেগুলিকে আখ্‌রোট্-গাছের মত বলিতেছি, উহা আসলে তরুণ বটবৃক্ষ,—কাল-সহকারে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে। শিকড়ের জটা স্থানে-স্থানে বাহির হইতে সুরু করিয়াছে; উহার ঝ্যাঁকড়াগুলি মাটির দিকে নামিতেছে; তাহা হইতে আবার নূতন ঝ্যাঁকড়া বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইবে।

এই দুই-সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া, আমরা সুবিস্তৃত কান্তারভূমি অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে বিরলসন্নিবেশ তাল-নারিকেল দৃষ্ট হইতেছে।

দেখিবার জন্য ও নিশ্বাস ফেলিবার জন্য গাড়ির পার্শ্বদেশে ছোট-ছোট রন্ধ্র-জান্‌লা আছে। পশ্চাদ্ভাগে ছোট একটি গোল দরজা, তাহার মধ্য দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই সচক্র শবাধারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।

আমার গাড়ির প্রায় গা ঘেঁষিয়া, ঠিক পিছনে, আমার চাকরবাকরদিগের ও জিনিযপত্রের গাড়িটি চলিয়াছে। যে দুইটি দীর্ঘকায় নিরীহ বলদ ঐ গাড়ি টানিতেছে, উহারা আমার খুব নিকটবর্ত্তী; আমি গাড়ির মধ্যে শুইয়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বলদ-দুটি যেন আমার পা ছুঁইয়া রহিয়াছে। উহারা কি নিরীহ জানোয়ার! বাহক উহাদের শুধু নাকে দড়ি দিয়া চালাইতেছে; পাছে অনিচ্ছা-ক্রমেও কাহারো অনিষ্ট হয়, তাই যেন উহা-দের শিং-দুটিও পিছনদিকে পিঠের দাঁড়ার উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছে। গাড়ির বাহক নগ্নপ্রায়, তাম্রবর্ণ; আশ্চর্য্যরূপে দেহভার রক্ষা করিয়া, সঙ্কীর্ণ যুগকাষ্ঠের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, বাহুদুটি হাঁটুর উপর রাখিয়াছে; আর, একটা বেতের চাবুক দিয়া বলদদিগকে প্রহার করিতেছে; কিংবা বানরগুলা রাগিলে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ মুখর শব্দ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

কান্তারভূমি, একটার-পর-একটা ক্রমা-গত আসিতেছে; যতই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন কষ্টকর—এমন কি—অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দূর-দূরান্তরে, কোথাও বা ছোটখাটো ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ছোটখাটো কার্পাসের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; নতুবা আর সমস্তই মরু—কেবলই মরু—সায়াহ্নসূর্য্যের বিষাদ-ম্লান কিরণচ্ছটায় আলোকিত।

দিগন্তগগনে "ঘাটে"র গিরিমালা অঙ্কিত; উহা যেন ত্রিবঙ্কুররাজ্যের প্রাকারাবলী। আজ আমরা রাত্রে, একটি যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ দিয়া ঐ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।

সিংহলের বৃষ্টিবর্ষা ও হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্রাদি দেখিয়া-আসিয়া তাহার পর এই সকল শুষ্কভূমি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—উহাতে একটি তৃণ পর্য্যন্ত জন্মায় না। শাদাটে রঙের গুঁড়ি এইরূপ কতকগুলি অদ্ভুত তাল-জাতীয় বৃক্ষ ইতস্তত একাকী দণ্ডায়মান;—উহাদিগকে উদ্ভিজ্জরাজ্যের সামিল বলিয়াই মনে হয় না। সোজা, মসৃণ, প্রকাণ্ড-উচ্চ খোঁটার মত, তলদেশ স্ফীত, তাহার পরেই চরকা-কাঠির ন্যায় হঠাৎ সরু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদের অতি দীর্ঘ কাণ্ডের অগ্রভাগে, জ্বালাময় গগনের উচ্চদেশে, শুষ্ক-কঠোর ছোট ছোট একএকগুচ্ছ তালপত্র রহিয়াছে। এই শুষ্কশীর্ণ তরুদিগের ছায়া-চিত্রগুলি, বরাবর রাস্তার দুই ধারে, বিষাদ-ম্লান দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত—স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-সারি তরুণ বটবৃক্ষের মধ্য দিয়া এই যে পথটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে জন-মানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয়, যেন এই পথটি ধরিয়া চলিলে আমরা কোথাও গিয়া উপনীত হইব না। অবসাদজনক উত্তাপ, তালে-তালে অল্প-অল্প ঝাঁকানি, ক্রমাগত গাড়ির একঘেয়ে ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ।

এই সবে আমার তন্দ্রা আসিল—আমার চিন্তাপ্রবাহ ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রায় ৫ ঘটিকার সময় রাস্তার উপর দিয়া অদ্ভুত-ধরণের চারিজন পথিক চলিয়া গেল। আমার চক্ষু এখনো তন্দ্রাবেশে প্রায় অর্দ্ধনিমীলিত; তা ছাড়া, এই একঘেয়ে পথে কিছুই বিশেষ দেখিতে পাই না—তাই হঠাৎ যখন চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন ইহাই একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইল। ইহারা খুব দীর্ঘকায়—লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে; নগ্ন গাত্র, একটা শাদা ও লাল-রঙের ধুতি-পরা, মাথায় একটা লাল পাগ্‌ড়ি। এই বিজন কান্তারের মধ্য দিয়া এই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ, এইরূপ উজ্জ্বলবেশে, এত দ্রুতপদে, না জানি কোথায় যাইতেছে?

পরে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, এই "ঘুপ্‌সি" দম্‌-আট্‌কানিয়া শয্যাকক্ষের মধ্যে নিদ্রাদেবী আবির্ভূত হইয়া আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন—চারিদিকে কি হইতেছে, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

একঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার সময়, জাগিয়া-উঠিয়া মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম ছবিটি দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, "ঘাটের" গিরিমালা হঠাৎ যেন আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে—যেন এক লম্ফে ৪॥০ ক্রোশ পথ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমদিকের সমস্ত সমভূমি এই গিরিমালায় অবরুদ্ধ।

অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণে দিগন্ত-পট এখনো অনুরঞ্জিত। ঐ লোহিত দিগন্ত-পটের উপর, এই সুনীল গিরিকায় কেমন পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত। উহার শৈলচূড়া-গুলির আকার ভারতবর্ষীয় ধরণের; দেখিতে কতকটা মন্দিরাদির চূড়া ও গম্বুজের মত।

সরু-সরু খুঁটির মত তালগাছ, আর কঠোরদর্শন মুসব্বর-তরু—এখানকার একমাত্র বৃক্ষ—মৃত্তিকা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; যাহা-কিছু আলো এখনো অবশিষ্ট আছে, সেই আলোকে, ম্লান সোনালি রঙের আকাশের গায়ে, তাহাদের কালো-কালো কাঠিগুলা সর্ব্বত্র প্রসারিত।

হঠাৎ অন্ধকার হইয়া পড়িল। এই অন্ধকার একটু বিষাদরঞ্জিত, কেন না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠিবে না।

প্রভাত পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণ শবাধারের মধ্যে ঝাঁথানি খাইতে খাইতে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই; চক্ষের সমক্ষে সবই যেন বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিভাত হইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে, অন্য গরুর গাড়ি যখনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখনি গোকণ্ঠের ঘণ্টিকাধ্বনি ও লোকজনের কি ভয়ানক চীৎকারই শুনিতে পাওয়া যায়! সেই গাড়িগুলা এত মন্থরগতি যে, আমাদের পথ হইতে সরিয়া যাইতেও তাহাদের অনেক বিলম্ব হয়। মধ্যে মধ্যে বাহন ও বাহক বদ্‌লি করিবার জন্য, কোন গ্রামের নিকট আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিতেছে। গ্রাম-গুলি রাস্তার ধারে অবস্থিত। গাড়ি হইতে অস্পষ্টরূপে, নিদ্রিত ব্রাহ্মণদিগের আবাস-কুটীর দেখা যাইতেছে; সম্মুখে, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য, ছোট-ছোট নারিকেল-তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে।

ভৃত্যেরা আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাগাইয়া দিল। এখন প্রভাত; শীতল শান্ত উষার ইহাই মধুরতম মুহূর্ত্ত। আমরা এখন নাগরকৈল-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আজ সমস্তদিন এইখানে থাকিয়া, সূর্য্যাস্ত-সময়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করিব। যে পর্ব্বত-মালা গতকল্য আমাদের সম্মুখে, অস্তমান সূর্য্যের কিরণ-উদ্ভাসিত লোহিতগগনে অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। এখন দিগন্তদেশ ম্লান-পাটলবর্ণে রঞ্জিত। রাত্রিতে আমরা এই পর্ব্বতমালা পার হইয়া আসিয়াছি,—এখন আমরা ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে। এই বারাণ্ডা-ওয়ালা বাড়ীটি একটি পান্থশালা; ইহার সম্মুখে আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিল। শুভ্রবসনধারী একজন ভারত-বাসী দুই হস্তে স্বকীয় ললাট স্পর্শ করিয়া আমার সম্মুখে নতশির হইলেন। ইনি পান্থ-শালার অধ্যক্ষ। মহারাজের আদেশানুসারে, ইনি আমার বাসের জন্য এই বাড়ীটি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতীয় অন্যান্য গ্রামের পান্থশালার ন্যায়, এ পান্থশালাটিও সাদাসিধা একতলা গৃহ। তিন-চারিটি শাদা-ধব্‌ধবে চূনকাম-করা কামরা-—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় খালি, শুইবার জন্য শুধু কতকগুলি বেতে-ছাওয়া খাট পাতা। সূর্য্যের প্রখর-উত্তাপ-প্রযুক্ত গৃহের ছাদ গৃহ হইতে চারিদিকে খানিকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর কতকগুলো মোটা-মোটা খাটো থাম ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

তাহার পর স্নান; স্নানের পর প্রাতরাশ। এই সময়ে ব্যগ্রতা-বিরহিত ভৃত্যেরা তালপত্রের পাখা দিয়া আমাকে অলসভাবে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যাহ্নের বিষণ্ণতা; আলোক-উদ্ভাসিত মহা-নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে কাকেরা আমার কক্ষ-কুট্টিমের তক্তার উপর আসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পূজার পোষাক।

১

আষাঢ়মাসের প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ভার্য্যা সুলোচনাকে যে রেজেষ্টারিপত্র লিখিয়া-ছিলেন, তাহার ভিতর একখানি ৫০০৲টাকার চেক ও একখানি পত্র ছিল। চিঠিখানা নিতান্ত সাদাসিধারকম, লুকাইয়া পড়িবার মত একটা কথাও ছিল না। বোধ হয় অনেকদিন দূর করিতে করিতে ঐরকম হইয়া যায়, ভাসা ভাসা সমস্ত ভাব তলাইয়া যেন মূলবদ্ধ হয়। বোধ হয় সুলোচনার মনেও একটা কিছু ঐরকম অস্পষ্টভাব উদয় হইয়াছিল। চেকখানি তখনি বাক্সে তুলি-লেন, কিন্তু সেই সহজ কথায় সোজা ভাষায় লেখা প্রেমসম্ভাষণশূন্য পত্রখানি বারবার

পড়িলেন—সেই লেখার ভিতর কিংবা সেই স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষরের ছাঁদের মধ্যে হয় ত অপরের চক্ষের অগোচর কোন ইঙ্গিত ছিল, তাহা তিনিই বুঝিলেন। চিঠির মর্ম্ম এই—"এই যে টাকা পাঠাইলাম, ইহার মধ্যে দেড়শত টাকা তোমার একছড়া হারের। সেই যে সরু হার আমি পসন্দ করিয়াছিলাম, সেই রকম একছড়া গড়াইবে। বেশী দামী জিনিষ দিলে হয় ত তুমি অসন্তুষ্ট হইবে। পঞ্চাশ টাকা দিয়া নিজের মনোমত একখানি শাড়ী প্রস্তুত করাইবে। বাকী তিনশত টাকায় ছেলেমেয়েদের যাহা আবশ্যক, হইবে।"

নরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। ছেলেদুইটি বড়, দুইটিই স্কুলে পড়ে, মেয়েদুইটি ছোট, একটি বিবাহের উপযুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য সুলোচনা ছেলেমেয়ে লইয়া কয়েকমাস হইতে দেশে ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পশ্চিমে বড় উকীল। পূজার সময় আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্বে পূজার কাপড়চোপড় কিনিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সুলোচনা প্রথমে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজার সময় তোমাদের কি চাই? উনি টাকা পাঠিয়েছেন।"

বড় ছেলে কলেজে পড়ে, সে বলে, "কোথায় পূজো, এখন থেকেই কাপড়ের তাড়া! আমার একটা জরির পোষাক, জরির পাগ্‌ড়ি, আর জরির জুতা চাই।"

সুলোচনা অল্প অল্প হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তোর কি পরিবার বয়স নেই নাকি?"

"হাঁ, খুব আছে! আমি সেজেগুজে রাস্তায় বেরুব, রাস্তার লোকে হাততালি দেবে, ক্লাসের ছেলেরা ছয়মাস ধোরে ক্ষেপাবে, আর তোমার খুব আহ্লাদ হবে।"

সুলোচনা হাসিমুখে কহিলেন, "ছেলের আক্কেল দেখ! আমি কি তোকে জরির পোষাক পর্‌তে বল্‌চি নাকি?

"তবে কি চাই, তার আবার জিজ্ঞাসা করা কি! তুমি যা দেবে, তাই ভাল। এমন জননী কি কারুর আছে!" বলিয়া বড় ছেলে, দেবেন্দ্র, হাত ঘুরাইয়া মাতাকে বরণ করিবার ভাণ করিল।

ছোট ছেলে, সুরেন্দ্রও কোন ফরমায়েশ করিতে স্বীকার করিল না। মেয়েরা শাড়ী জ্যাকেট কোন্ রঙের চায়, তাহা বলিল।

পাশে দাঁড়াইয়া একটি বিধবা সব কথা শুনিতেছিল। বয়স তেমন অধিক নয়, বড় ঠাণ্ডা স্বভাব, মুখের ভাব বড় মধুর। ইটি নরেন্দ্রনাথের খুড়তাত ভগিনী, নাম মনোরমা। এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহে নাই। ছেলেমেয়েদের পূজার পোষাকের কথা শেষ হইলে বলিল, "হ্যাঁ বউ, পূজায় দাদা তোমায় কিছু দেন নি?"

অমনি সুলোচনার মুখ বিয়ের কনের মত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। বলিলেন, "দিয়েছেন বই কি! শাড়ী আর হারের জন্য দুশো টাকা পাঠিয়েছেন।"

"সেইরকম সরু হার বুঝি?"

"হাঁ।"

"দাদার যেমন পসন্দ!" মনোরমা হাসিয়া কথাটা বলিল।

দেবেন্দ্র কহিল, "হাঁ মা, তুমি কেমন কাপড় নেবে? বেশ টুক্‌টুকে রাঙা

বেনারসী শাড়ী, আর বেশ চওড়া জরির আঁচলা ?”

সুলোচনা কহিলেন, “যা যা! তোর যখন টাকা হবে, তখন কিনে দিস্।”

মনোরমা কহিল, “সেই কথা ভাল। দেবিনের বউয়ের যেমন সাজ হবে, তার খাশুড়ীরও সেইরকম হবে।”

তখন খুব একটা হাসির ঘটা পড়িয়া গেল।

২

দুইচারদিন যায়। একদিন মধ্যাহ্নের পর সুলোচনা ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন, মেয়েদুইটি এক পাশে বসিয়া পুঁতুলখেলা করিতেছিল ও মৃদুস্বরে আগাগোড়া খেলা আবৃত্তি করিতেছিল। এমনসময় পাশের বাড়ীর গৃহিণী আসিলেন। মোটাসোটা মানুষ, সিঁড়ীতে উঠিয়া একটু হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। হাঁপ ছাড়িয়া কহিলেন, “যেন বসানু দুর্গাঠাকুরুণ। বউ, তোমাকে দেখ্‌লেই আমার লক্ষ্মীঠাকুরুণ মনে পড়ে।”

সুলোচনা কহিলেন, “এস এস, বস!”

এদিক্ ওদিক্ খানিক কথাবার্ত্তার পর পাশের বাড়ীর গৃহিণী মেয়েদের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “দেখ বউ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বল্‌তে এসেছিলাম, কারুর সাক্ষাতে বল্‌বার নয়।”

সুলোচনা মেয়েদের বলিলেন, “তোরা নিজের খেলাঘরে গিয়ে খেলা কর্।” মেয়েরা উঠিয়া গেল।

পাশের বাড়ীর গৃহিণী তখন মুখ কাঁদ-কাঁদ করিয়া, চক্ষু ভিজা-ভিজা করিয়া কহিলেন, “বউ, তোমায় বল্‌ব কি, আমার ভারি বিপদ্!”

অমনি সুলোচনার মুখ সহানুভূতিতে কোমল হইল। বলিলেন, “কি হয়েচে ?”

“এই আমার বিপিন ষাটটি টাকা মাইনে পায়, তাইতে কষ্টেসৃষ্টে চলে। আমার ত দুচারখানা যা গহনা ছিল, তা গিয়েচে, দেশের বাড়ীখানিও বাঁধা। এদিকে পূজা এল, কিছু না কর্‌লেও পাঁচসাতদশ টাকা খরচ আছে। এমনসময় সাহেব বল্‌চে কিনা, পঞ্চাশটাকা না দিলে বিপিনের চাকরী থাক্‌বে না।”

“সে কেমন কথা ? আর বিপিনবাবুই সাহেবকে টাকা দিতে গেলেন কেন ?”

“তা ভাই, তোমরা কি জান্‌বে বল ? তোমরা হলে উকীলমানুষ, বড়মানুষ, কারুর তোয়াক্কা রাখ না। কথায় বলে, পরের চাকর। এই পূজার পর বিপিনের পাঁচটাকা মাইনে বাড়্‌বার কথা আছে, যদি সাহেব ওর নামে মিথ্যে কোরে একটা কিছু লিখে দেয়, তা হলে মাইনে বাড়া মাথায় থাকুক, হয় ত চাকরী নিয়েই টানাটানি হবে। সাহেবের টাকার দরকার, সে পঞ্চাশটাকার কম কিছুতেই ছাড়্‌বে না। এখন উপায় ?”

সুলোচনা চুপ করিয়া রহিলেন।

“শুন্‌লেম, এই পূজার জন্য তোমার কাছে নাকি হাজারটাকা এসেছে—”

“অত টাকা নয়, অত টাকার ত কোন দরকার নেই।”

“না, তাই বল্‌চি, কানে শোনা কথা বই ত নয়। তা তুমি রাজরাণী হও, আমার তেমন স্বভাব নয় যে, আমার তাতে চোক

টাটাবে। তোমার দয়ার শরীর, তোমার কাছে টাকা থাক্‌লেই লোকের উপকার। ঐ পঞ্চাশটি টাকা আমাকে দিতেই হবে। শুধু-হাতে না দাও, এই তাগাজোড়া রেখে দাও। ভাদ্রমাস পড়্‌তেই আমি যেমন কোরে পারি দেব।" গৃহিণী অঞ্চল হইতে নিতান্ত মরা-সোনার গালাভরা একজোড়া তাগা বাহির করিলেন। বিক্রয় করিলে পঞ্চাশ-টাকা হয় কি না, সন্দেহ।

সুলোচনা কহিলেন, "বন্ধক রেখে আমি ত কিছু কখন দি নি, তুমি তাগা তুলে রাখ। পূজার টাকা ত সব আমার কাছে নেই, ছেলেদের টাকা ঠাকুরঝিকে দিয়েচি। ওর বেশ পসন্দ, জিনিষপত্র তৈরি করিয়ে দেবে। আর সে টাকায় আমি হাত দিতে পার্‌ব না। আমার টাকারও হিসেব দিতে হবে, তা তোমার যখন এত দরকার, আর ভাদ্রমাসের গোড়াতেই ফিরে দেবে বল্‌চ, তখন—" কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া, বাক্স খুলিয়া পাঁচখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণী আর বিলম্ব করিলেন না। নোট আর তাগা একসঙ্গে আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিলেন। "তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হোক্, তুমি রাজরাজেশ্বরী হও!" মুখে ঐ কথা, কিন্তু পা দরজার দিকে, পাছে সুলোচনার মতের পরিবর্ত্তন হয়, কিংবা আবার সুদ-বন্ধকের কথা ওঠে। সুলোচনা কহিলেন, "এ কথা যেন ঠাকুরঝী না টের পায়, সে শুন্‌লে রাগ কোর্‌বে।"

"রাম, তাকে কেন বল্‌তে গেলাম!"

গৃহিণী সিঁড়ী নামিয়া যেমন যাইতেছেন, অমনি পড়্‌বি ত পড়্ একেবারে মনোরমার সম্মুখে!

মনোরমা কহিল, "ওমা, কি ভাগ্যি! এস এস!"

"না বাছা, আর আস্‌ব না, এখন যাচ্ছি।"

"তাই ত," অমনি অঞ্চলের প্রতি মনো-রমার নজর পড়িল। কহিল, "আঁচলে বাঁধা কি গা? বালা না তাগা?"

"তাগা।"

"ঈশ্, আবার উঁচুপানা কি? নোটের তাড়া নাকি?"

পাশের বাড়ীর গৃহিণীর তখন ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। কহিলেন, "তা বাছা, তুমি ত আর দাও নি, তোমার অত খোঁজে কাজ কি?"

মনোরমা ম্লানমুখে কহিল, "আমি কোথায় পাব?" তাহার পর মুখ ফিরাইয়া, মুখ টিপিয়া হাসিয়া, সরিয়া গেল। ভারি দুষ্ট!

সুলোচনা মনে করিতেছিলেন, মনোরমা কিছুই জানিতে পারে নাই!

৩

সুলোচনা মনে মনে একটা হিসাব করিতে-ছিলেন। হারছড়া গড়াইতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে, অতএব সে টাকাটা হাতে থাকা উচিত। কিন্তু শাড়ী নগদ কিনিতে পাওয়া যায়, কিংবা দুইদিনে তৈয়ারি করান যায়। পাশের বাড়ীর গৃহিণীকে যে টাকাটা দিয়াছিলেন, সেটা শাড়ীর হিসাবে ফেলিলেন। ভাদ্রমাসের গোড়ায় দিবে ত বলিয়াছে! তাহার পর শাড়ী করাইতে কতক্ষণ? এই-রকম হিসাবী দুইচারিটি গৃহিণী হইলে সংসারে বড় গোল বাধিত। সুলোচনার হিসাবের

কথা বাড়ীর লোকে জানিত, এবং সেইজন্য তিনি সকলকে কিছু ভয় করিতেন।

একসময় মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বউ, দাদা তোমায় টাকা পাঠালেন, আর তুমি বাক্সে তুলে রাখ্‌লে! হারছড়া কেন গড়াতে দাও না? স্যাক্‌রার কথার ঠিক জান ত, কাল বল্‌লে দশদিন কোর্‌বে।"

সুলোচনা কহিলেন, "হাঁ ঠাকুরঝি, স্যাক্‌রা ডাক্‌তে বল, হারছড়া গড়াতে দেব।"

"আর শাড়ীখানা?"

সুলোচনা একটু কৌতুক করিয়া কহিলেন, "শাড়ী ত আর স্যাক্‌রায় গড়্‌বে না, তার জন্য অত তাড়া কেন?"

"না, সেজন্য নয়, তবে পূজার বাজারে এর পর সব আক্রা হবে, মনের মতন জিনিষ না পাওয়া যেতে পারে, এখন হলে ধীরে-সুস্থে, দেখে-শুনে হত।"

"না না, এখন কাজ নেই।" কথাটা কিছু রুক্ষ হইল দেখিয়া সুলোচনা আবার কহিলেন, "তুমিও যেমন ঠাকুরঝি, আমার কি পূজার সময় সাজগোজ কর্‌বার বয়স? বুড়ো বয়সে ওঁর যেমন বাই! বুড়ো মাগী আমি, আমার আবার গহনা, আবার শাড়ী! লজ্জাও করে, হাসিও পায়!"

মনোরমা কহিল, "ও কেমন কথা হল? স্বামীর কাছে পূজার সামগ্রী পাবে, এ ত মেয়েমানুষের শুভলক্ষণ! আর দাদার চোকে কি তুমি বুড়ো হয়েচ?"

অমনি সুলোচনা থতমত খাইয়া বলিলেন, "সত্যি কথাই ত, আমার মত ভাগ্যবতী কে?"

মনোরমা তাড়াতাড়ি একখানা আরসি আনিয়া সুলোচনার মুখের সম্মুখে ধরিল, কহিল, "আমার দাদার চোকের দোষ হয়েচে, তিনি না হয় ভাল দেখ্‌তে পান না, কিন্তু তুমি ত আর চোকের মাথা খাও নি, কোন্‌খানটা বুড়ো বল দেখি!"

সুলোচনা হাসিয়া কহিলেন, "এত রঙ্গও জানিস্‌!"

ওদিকে স্যাক্‌রা ডাকাইবার পূর্ব্বে আর একজন বিনা ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুলোচনার পিত্রালয়ে তাঁহার মাসীর একজন পাতান সই ছিলেন। তাঁহাকেও সুলোচনা মাসী বলিতেন। আজ দশবিশ বৎসর তাঁহার কোন খবর পান নাই। হঠাৎ একদিন সকালবেলা রেলের গাড়ী হইতে নামিয়া ঠিকা-গাড়ীতে করিয়া তিনি উপস্থিত। সুলোচনা অত্যন্ত আহ্লাদ করিয়া মাসীর পায়ের ধূলা লইয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "নেয়ে আহ্নিক কর, আমি রান্নার উজ্জুগ কোরে দি গে।"

প্রাচীনা বিধবা সেকেলে লোক, রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা কহিতে বড় জানেন না, কাঁদিয়া কহিলেন, "আর বাছা, রাঁধ্‌ব-খাব কি, এইবার বুঝি পথে দাঁড়াতে হল!"

"কেন মাসি, কি হয়েচে?"

"আমার যা-কিছু ছিল, দেওরেরা ত ফাঁকি দিয়ে নিয়েচেন, তা তাঁদের ধর্ম্ম তাঁরা জানেন, আমি কোন কথা বলি নি। মেয়েটার এমন ব্যারাম গেল, তাঁরা একবার জিজ্ঞাসাও করেন নি কেমন আছে। আমার একখানি ঘর, তাই পঞ্চাশটাকায় বাঁধা

রেখে তার চিকিৎসাপত্র করি। এখন সুদে-আসলে একশো টাকা হয়েছে। আট-দিনের মধ্যে না দিতে পার্‌লে বিক্রী হয়ে যাবে। তখন পথে দাঁড়ান ছাড়া আর কি উপায় থাক্‌বে ?”

সুলোচনার চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল। চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, “সে কথা এর পরে হবে। এখন তুমি কাপড় ছেড়ে আহ্নিক কর।” অনেক পীড়াপীড়িতে মাসী স্নান করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। সুলোচনা গিয়া স্বহস্তে তাঁহার রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে মাসীকে গিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “মাসি, আমি টাকা দেব, তুমি ভেব না, কিন্তু এ বাড়ীর কাউকে কিছু বলো না।”

তখন আনন্দে মাসীর আর এক শোক উথলিয়া উঠিল, চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, “এমন রাজরাণী অন্নপূর্ণা মেয়েকে এখন কমলদিদি (সুলোচনার মাতা) দেখ্‌তে পেলে না!”

মার নাম হইতেই ছল্‌ছল্‌চক্ষে সুলোচনা উঠিয়া গেলেন।

মাসী সেদিন থাকিলেন। পরদিবস তাঁহার যাইবার সময় সুলোচনা তাঁহার হাতে পথখরচ বলিয়া পাঁচটাকা ও সেই একশো টাকা দিলেন।

এবার আর কোন হিসাব হইল না। প্রথম পঞ্চাশটাকা যেন ধার বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এ টাকা ত ফেরত পাইবার কথা নয়। হার গড়াইবার আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না। মনোরমা মাঝে মাঝে কথা পাড়িত, সুলোচনা কোনমতে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতেন। একদিন স্যাক্‌রা আসিয়া উপস্থিত। সুলোচনা কহিলেন, “আমি এখন গড়াইব না।”

মনোরমা কহিল, “তবে কবে গড়াইবে? ভাদ্রমাস যে আসিল।”

সুলোচনা কহিলেন, “আমি যদি নাই গড়াই ?”

মনোরমা কহিল, “তা হলে দাদা কি মনে কোর্‌বেন ? তিনি আহ্লাদ কোরে তোমায় একটা জিনিষ গড়াতে আগাম টাকা পাঠিয়ে দিলেন, আর তুমি গড়াবে না ?”

সুলোচনা শুষ্কমুখে একটু হাসিয়া কহিলেন, “[illegible] আমি টাকাটা জমাই করি! [illegible] এত খোঁটা কোর্‌ব এখন।”

কহিয়া [illegible] সেইদিন কুড়িটাকা দিয়া একখানা ভাল গরদ আনাইলেন। সেই গরদখানা হাতে করিয়া মনোরমার ঘরে গেলেন। সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, “ঠাকুরঝি, এইখানা তুমি নাও ত আমার বড় আহ্লাদ হয়।”

মনোরমা গরদ হাতে করিয়া দেখিয়া বলিল, “দাদা ত ফীবছর আমায় একখানা কোরে দেন।”

সুলোচনা কহিলেন, “কেন, আমার কি একখানা দিতে নাই ?”

“সে কি কথা, বউদিদি, তুমি দিলে আমি আহ্লাদ কোরে নেব না ?” মনোরমা সুলোচনার পায়ের ধূলি মাথায় লইল, বলিল, “বউদিদি, তুমি আমাদের ঘরের বউ, তোমার সাক্ষাতে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু তোমায় দেখ্‌লে যে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদর্শন হয়, এ কথা কে না জানে ?”

সুলোচনা তাহার মুখে হাত দিলেন, "চুপ চুপ, অমন কথা বল্‌তে নেই, পাপ হয়।"

যখন সুলোচনা ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন, তখন মনোরমা হাসিতে লাগিল, "ঠাক্‌রুণটি কম নন! ঘুষ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ কোর্‌বেন!" মনোরমা ভারি দুষ্ট!

৪

ভাদ্রমাস আসিল, মাসের কয়েকদিন গেল, কিন্তু পাশের বাড়ীর গৃহিণীর আর দেখা নাই! ভাদ্রমাসে বড় বৃষ্টি, ভারি বাত চাগিয়াছে, আর উত্থানশক্তি নাই বলিলেই চলে। শুনিয়া সুলোচনা তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। বোধ হয়, গৃহিণী সম্প্রতি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন, কেন না, এখন তিনি দাঁড়াইয়া খড়িকা খাইতেছিলেন। সুলোচনাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ও বাড়ীর বউ! তুমি বুঝি সেই টাকাটার জন্য এসেচ? তা বাছা, আমাকে মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, সে টাকা এখন আমি কোনমতেই দিতে পার্‌ব না।"

সুলোচনা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কহিলেন, "আমি সেজন্য আসি নাই, তোমার অসুখ শুনে দেখ্‌তে এলাম।"

"তা এস, এস! তোমরা না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌বে? অসুখ বলে অসুখ! সর্ব্বাঙ্গ বাতে যেন পঙ্গু, পঙ্গু। আজ এই একবার উঠে দাঁড়িয়েছি।" বাতের বেদনা-স্মৃতি সহসা জাগরিত হওয়াতে গৃহিণী কোমরে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। "কিছু খাবার জো নেই বাছা, কিছু খাবার জো নেই! কবিরাজের সব বারণ। আর এই পোড়া বর্ষায় কি বা পাওয়া যায়! আমড়া একেবারে বারণ। রাজ্যের জিনিষে অরুচি। আজ একটু ভাল আছি বলে দুটো আমড়া ছেঁচে পোস্তলঙ্কা দিয়ে চচ্চড়ি কোরে এক-মুঠো ভাত খাই।"

সুলোচনা কহিলেন, "বাতের পক্ষে বলে আমড়া বড় খারাপ। যদি আবার অসুখ হয়?"

"আর পারি নে বাছা! ডাক্তার-কবিরাজে আমার কি কোর্‌বে? এখন যেতে পার্‌লেই বাঁচি। আর এই বিপিনের জ্বালায় হাড় কালী হল।"

বিপিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহার সংসার লইয়াই গৃহিণীর সংসার। তাহার সম্বন্ধে এমন কথা শুনিয়া সুলোচনা কিছু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "বোলো না, বোলো না, তার কথা আর বোলো না। চাকরী যায় বলে তোমার কাছ থেকে টাকা এনে দিলুম, তার পর সে তাগা-দুগাছাও গেল। এ দিকে অর্দ্ধেকদিন রাত্রে ত বাড়ী থাকে না, বউটা ছেলেমানুষ, কেঁদে কেঁদে সারা হল। মাইনের টাকাও সব বাড়ীতে দেয় না। এমন কোর্‌লে কি চাকরী থাকে?"

এ সকল কথায় সুলোচনা কোন কথা কহিলেন না। গৃহিণীর কথা সমাপ্ত হইলে উঠিয়া আসিলেন।

ভাদ্রমাসও ফুরাইয়া আসিল। ছেলে-মেয়েদের পূজার পোষাক তৈয়ারি হইয়া গেল। তখন তাহারা সুলোচনাকে চাপিয়া ধরিল, "মা, তোমার পূজার শাড়ী আর হার কোথায়?"

সুলোচনা কহিলেন, "সে যা হয় হবে এখন। তোদের কাপড়চোপড় হয়েচে, তোরা আমোদ-আহ্লাদ কোর্‌বি, তাই দেখে আমার আহ্লাদ হবে। আমার না হয় নাই হল, আমি ত আর ছেলেমানুষটি নই।"

দেবেন্দ্র কহিল, "কেন, বাবা কি তোমার জন্য আলাদা টাকা পাঠান নি? এই যে পিসিমা স্যাক্‌রা ডাক্‌তে বলেছিলেন।"

মনোরমা কহিল, "স্যাক্‌রা ডাক্‌লে কি হবে? বউ টাকা পুঁজি কোরে রেখেচে, ওর কোন সাধ নেই।" মনোরমার ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসিটুকু সুলোচনা দেখিতে পাইলেন না।

সুলোচনা কহিলেন, "টাকা পুঁজি কোরে রাখা কি দোষের কথা নাকি? আমার কাপড়চোপড় গহনাগাঁটি অনেক আছে, এ বছর না হয় কিছু নাই করালাম।"

মনোরমা কহিল, "হাঁ, তা হলে দাদা খুব খুসী হবেন। তিনি জান্‌বেন, তোমার টাকায় খুব মায়া হয়েচে।"

সুলোচনা অন্য কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। ছেলেরা চলিয়া গেলে মনোরমাকে বলিলেন, "দেখ ঠাকুরঝি, উনি এলে পর আমার কাপড় কি গহনার কথা তুমি ওঁকে কিছু বোলো না। যা বল্‌বার, আমি বল্‌ব।"

মনোরমা কহিল, "আমি আর কিছু বল্‌ব্‌ না।"

শুনিয়া সুলোচনা কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। ছেলেদের ত মুখ বন্ধ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাদের কথা কোনমতে উড়াইয়া দেওয়া যায়। মনোরমা বলিলে কিছু গোল।

৫

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন। প্রসন্ন, প্রফুল্ল গৌরমূর্ত্তি, মুখে-চক্ষে প্রখর বুদ্ধির স্পষ্ট পরিচয়। সঙ্গে অনেক জিনিষপত্র, চাকরবাকর মিলিয়া নামাইয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলে বাড়ীর সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল। সুলোচনা গৃহিণীর মত মাথায় একটুখানি কাপড় দিয়া আনন্দপূর্ণমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ?"

সুলোচনা কহিলেন, "ভাল আছি।"

এই পর্য্যন্ত সম্ভাষণ হইল।

নরেন্দ্রনাথ বিশ্রাম করিয়া, হাতমুখ ধুইয়া, জলখাবার খাইতে বসিলেন। সুলোচনা একখানি ঝালর-দেওয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ছেলেরা তখন পূজার কাপড়ের কথা পাড়িল। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ও সব কথা আজ নয়, কাল সকালবেলা হবে।"

সুলোচনা সেখানকার বাড়ীর সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দাসদাসীরা সব কেমন আছে? গাইবাছুর সব কেমন আছে? বিছানাপত্র নিয়মিত রৌদ্রে দেওয়া হয় ত? শোবার ঘরের পাশে যে আর একখানি ঘর তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার কত বাকি? রামচরণবাবু, মধুসূদনবাবুর বাড়ীর সকলে কেমন আছেন? ছেলেরাও আগ্রহের সহিত সে কথায় যোগ দিল। হরিণটা এখন কত বড় হইয়াছে? বাড়ীতে যে ময়ূর আছে, সেটা পালাইয়া যায় নাই ত? দেবিনের

টাটুঘোড়াতে এখন কে চড়ে? খানিক পরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "মনোরমা যে বড় চুপ কোরে রয়েচ? তোমার কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার নেই?"

মনোরমা হাসিল, কহিল, "আছে বই কি! আমি যে সেই তুলসীগাছটি পুঁতিয়াছিলাম, সেটি আছে ত?"

"বিলক্ষণ! আছে না ত কি? তুলসীগাছের যত্ন সকলেই করে, কাউকে কিছু বল্‌তে হয় না।"

রাত্রে আর কোন কথা হইল না। পরদিবস প্রভাতে অভ্যাসমত নরেন্দ্রনাথ হাঁটিয়া একটু বেড়াইয়া আসিলেন। বাড়ীতে ফিরিয়া যখন চা খাইতে বসিলেন, আবার সকলে তাঁহাকে ঘিরিল। চা খাইয়া, নরেন্দ্রনাথ আল্‌বোলার নল মুখে লইয়া বসিলেন, কহিলেন, "এইবার পূজার জিনিষ। কাপড়-চোপড় কই সব দেখি?"

মনোরমা ছেলেদের কাপড়, জুতা, মেয়েদের শাড়ী, জ্যাকেট সমস্ত লইয়া আসিল। সুলোচনা তাহাকে যে গরদ দিয়াছিলেন, সেখানিও লইয়া আসিল, কহিল, "বউ আমাকে এখানি দিয়াছেন।"

সুলোচনা লজ্জিতভাবে মৃদুমৃদু কহিলেন, "ও বুঝি আবার দেখাতে হয়?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কেন দেখাবে না? ঠিক দেখান হয়েচে। তুমি ওকে পূজার জিনিষ দিয়েচ, ও দেখাবে না?"

সকলের সামগ্রী আসিল, তখন নরেন্দ্রনাথ সুলোচনাকে কহিলেন, "তোমার জিনিষ কই?"

সুলোচনা ধীরে ধীরে আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া মনোরমা নীরব বিস্ময়ের ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল। তিনি সে ইঙ্গিত বুঝিয়া অল্প হাসিলেন।

সুলোচনা ফিরিয়া আসিলে সকলে দেখিল, তাঁহার হাতে শাড়ী কি হার কিছু নাই, আছে সিমলার একখানি কোঁচান উৎকৃষ্ট ধুতি, আর একখানি সেইরকম কোঁচান চাদর। সেই ধুতিচাদর স্বামীর পদতলে রাখিয়া, গলায় বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, স্বামীর পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। আবার যখন সুলোচনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার সে সঙ্কোচলজ্জা যেন দূর হইয়া গেল, রূপলাবণ্য-সুখসৌভাগ্যের স্থির দেবীমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইলেন। সুলোচনা যখন তাঁহার পদানত, সেইসময় নরেন্দ্রনাথ একবার মনোরমার দিকে কটাক্ষপাত করিলেন, ইঙ্গিতে কহিলেন, "এ কথা ত তুমি আমায় বল নাই!" তাহার পর তাঁহার গম্ভীর মুখের দৃষ্টি বড় গভীরকোমল হইল। পত্নীপ্রদত্ত পূজার উপহারস্বরূপ ধুতিচাদর তুলিয়া লইলেন। তাহার পর সুলোচনার মুখের দিকে না চাহিয়া কহিলেন, "তোমার শাড়ী আর হার কোথায়?"

"তৈয়ারি হয় নাই।"

"কেন?"

"আমার আর-বছরের কাপড় বেশ আছে, বছর বছর শাড়ীর কি আবশ্যক? হার গড়ান হয় নি।" সুলোচনা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

তাহার পরে যে কথা হইল, নরেন্দ্রনাথের যেন একটু বাধবাধ ঠেকিতে লাগিল,

সুলোচনা স্পষ্ট উত্তর দিতে লাগিলেন। আর সকলে নীরব। কর্ত্তা-গৃহিণীতে বোঝাপড়া হইতেছে, তাহার মাঝে কে কথা কহিবে ?

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "কেন, আমি ত টাকা আলাদা পাঠাইয়াছিলাম। যদি টাকা কম পড়িয়াছিল, আমাকে লিখিলে আরও পাঠাইতাম।"

"সেজন্য নয়। আমি ইচ্ছা কোরে গড়াই নি।"

"টাকা কি হল ?"

"আমি খরচ কোরেচি।"

"সব ?"

"সব।"

নরেন্দ্রনাথ নিজের হাতের কাপড়চাদর তুলিয়া ধরিলেন, "এক খরচ ত এই, আর এক খরচ মনোরমার হাতে"—তাহার গরদ দেখাইয়া দিলেন—"বাকি ?"

"সে খরচের হিসেব তোমায় পরে দেব।"

"তা যেন দিলে, কিন্তু আজ ষষ্ঠী, আজ পর্‌বে কি ?"

"সিন্দুকে নতুন কাপড় আছে, বার কোরে পর্‌ব।"

"আর কিছু না ? পূজায় নিমন্ত্রণ যাবার সময়, বিজয়ার দিন ?"

"তুমি ত আমাকে অনেক কাপড় দিয়েচ, আমার কাপড়ের ভাবনা কি ?"

"আচ্ছা, তাও যেন হল, তুমি যে আমাকে এই ধুতিচাদর দিলে, তার বদল আমি কি দেব ?"

"ওর কি বদল দিতে হয় ?"

"হয় না ? তত্ত্ব কোর্‌লে পাল্টা তত্ত্ব করে না ?"

সুলোচনার মুখ বন্ধ হইল। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "দেবিন, বাইরে আমার টেবিলের উপর ব্যাগ আছে, নিয়ে আয়।"

ব্যাগ আসিল। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্যাগ খুলিলেন। ব্যাগের ভিতর হইতে কাগজে মোড়া একখানি বিচিত্র বহুমূল্য শাড়ী বাহির করিলেন। খুব ফিকে বাদামী রং, সেই রং সুলোচনা পসন্দ করিতেন। আঁচ্‌লায় খুব চওড়া সাঁচ্চা জরির কাজ, সাঁচ্চা কাজের সরু পাড়। শাড়ী দেখিয়া ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। সুলোচনা হর্ষ-আনন্দে লজ্জায় নতমুখী হইয়া কহিলেন, "এ আর কারুর কাজ নয়, ঠাকুরঝীর কাজ!"

মনোরমা কহিল, "হাঁ, আমার কাজ। কিন্তু আমি দাদাকে কোন কথা বলি নি, শুধু চিঠি লিখেছিলাম। পূজার সময় তুমি নিজের জন্য কিছু করালে না, সে খবর না দিলে তিনি কি মনে কোর্‌তেন ?"

নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ঠিক কথা।" তাহার পর ব্যাগে আবার হাত দিয়া উত্তম চামড়ার একটি ছোট বাক্স বাহির করিলেন। সেটি পাশে রাখিয়া, ব্যাগ হইতে একটি ছোট মখমলের কাজকরা থলি বাহির করিলেন। তাহার ভিতর একশত চক্‌চকে টাকা ছিল। কহিলেন, "মনোরমা আমাকে লিখিয়াছিল—তুমি হার গড়াও নি, শাড়ী তৈরি করাও নি, টাকা জমা কোরেছ। কিরকম জমা, সেটা আমাকে বুঝে নিতে বলেছিল। আমি তাই বুঝে এই সুদের টাকা নিয়ে এসেছি। আসল টাকাটা যেমন জমা কোরেচ, এই সুদটাও সেইরকম জমা কোরো। আর

এই পূজারই সময় যেমন টাকা জমাবার সুবিধা, এমন আর কোন সময় নয়।" থলিসুদ্ধ টাকা মনোরমার হাতে দিয়া চামড়ার বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে হার বাহির করিলেন। এবার আর দেড়শত টাকার সরু হার নয়। হীরামুক্তার হার ঝল্‌মল্ করিতেছে। হার-ছড়া দুই হাতে তুলিয়া-ধরিয়া সুলোচনাকে ডাকিলেন, "এ দিকে এস!"

ব্রীড়াবনতমুখী সাধ্বী পতির সমীপে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গলায় হার পরাইয়া দিয়া, চিবুক ধরিয়া সকলের সম্মুখে মুখ ফিরাইয়া ধরিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখাচ্চে?"

পুত্র-কন্যা-ননদ একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "ঠিক যেন দুর্গাঠাকুরুণ!"

দেবীষষ্ঠীর প্রভাতসূর্য্য উদয় হইতে-ছিল, পথে কলাবউকে স্নান করাইতে লইয়া যাইতেছিল, অগ্রে ঢুলী নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছিল। দ্বারে ভিক্ষুক আগমনী গাহিতেছিল—"ওমা ত্রিনয়না, অরুণচরণা, এস এস এস মা!"

অরুণলাঞ্ছিত পাদপদ্মে, স্নেহপ্রেম-প্রীতিপূর্ণ নয়নে, প্রসন্ন বদনে আনন্দ-ময়ী সেই আনন্দ-আলয়ে আগমন করিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

হিন্দুদর্শন।

বেদের মন্ত্রবর্ণ এবং উপনিষদ্ এবং তদনুসারে হিন্দুর দর্শনসমূহ, আর পুরাণ, স্মৃতি, গীতা, তন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র একবাক্যে কহেন, এই সৃষ্টির আদি-অন্ত নাই। ইহা নিদ্রা ও জাগরণের ন্যায় কখনও প্রলয়ে লীন, কখনও ব্যক্ত হয়। অতএব ইহা প্রবাহরূপে নিত্য। এমন সৃষ্টি হয় নাই, যাহাকে আদি বা প্রথম সৃষ্টি কহা যাইতে পারে; আর এমন প্রলয়ও হইবে না, যার পর আর সৃষ্টি হইবে না। সকলেই একবাক্যে কহেন যে, প্রত্যেক প্রলয়ে ভাবিসৃষ্টির দ্রব্য-বৃত্তিসম্পন্ন উপাদান ও সহকারী কারণসমূহ, জীবগণের সঙ্গ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকবার নবসৃষ্টি দেখা দেয়। কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে আছে—"জন্যানাধারঃ কালো মহাপ্রলয়ঃ"—মহাপ্রলয়ে জন্যপদার্থসকল থাকে না। "জন্য"শব্দে উৎপত্তিবিশিষ্ট। উৎপত্তি বিশিষ্ট ভেদজাত স্থূল পদার্থসকল থাকে না। কিন্তু পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা, এই পঞ্চপদার্থ নিত্য। মহাপ্রলয়ে এ সমস্ত থাকে। পরমাণুসকল চারিপ্রকার—পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস। এতদ্ভিন্ন আত্মার আশ্রয়ে বর্ত্তমান মন। এই সর্ব্বশুদ্ধ নয় পদার্থ নিত্য। এ সমস্ত দ্রব্যবৃত্তিসম্পন্ন

এবং ইহারাই সৃষ্টির সমবায়িকারণ। ইহাদের বিদ্যমানতায় সৃষ্টির বিদ্যমানতা হয়। অতএব ইহারা প্রত্যেক প্রলয়ে রক্ষিত ভাবি-সৃষ্টির অক্ষয়বীজস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তিকারণ। এই নয়প্রকার দ্রব্যপদার্থের নাম "বিশেষ পদার্থ"। সৃষ্টির ব্যক্তাবস্থায় ঘটপটাদি ও মনুষ্যপশ্বাদি অবয়বের যে পৃথক্ জ্ঞান হয়, তাহার নাম "ভেদ"। কিন্তু অবয়বরহিত উক্ত নববিধ নিত্যদ্রব্যের মধ্যে প্রলয়কালে যে পরস্পর অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে, তাহার নাম "বিশেষ"। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের কথিত এই "মহাপ্রলয়"শব্দ পুরাণ ও মন্বাদি শাস্ত্রের উক্ত "নৈমিত্তিক প্রলয়মাত্র"। তাহা প্রকৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত "প্রাকৃতিক প্রলয়" নহে। তাহা হইলে পরমাণুসকল অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতিতে লীন হইয়া যাইত। তাহাতে পরমাণু হইতে সর্গারম্ভ চলিত না। ফলত রঘুনাথ শিরোমণি "সিদ্ধান্ত-লক্ষণে" লেখেন—"মহাপ্রলয়ে মানাভাবাৎ"। মহাপ্রলয়ের অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়ের প্রমাণ নাই। অথবা এমন প্রলয় অপ্রমাণ, যাহার অন্তে আর সৃষ্টি হইবে না। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিকমতে পরমাণু-আদি "বিশেষ"পদার্থের প্রাকৃতিক লয় হয় না।

সাংখ্যদর্শন পরমাণু প্রভৃতি "বিশেষ পদার্থের" সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃতিতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রকৃতিকে তাবৎ সৃষ্টির বস্তুবীজ কহিয়াছেন। প্রত্যেক প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রকৃতি এবং পুরুষ (আত্মা) অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহারা উভয়েই নিত্য। "আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ" (সাং০ সূ০ ১।৭৪)—বৈশেষিকদর্শনে যেমন পারম্পর্য্যানুসারে পরমাণুকেই জগতের মূল উপাদান বলেন, সাংখ্যেরাও তদ্রূপ মহদাদিকে মধ্যে রাখিয়া, পরম্পরাসম্বন্ধে প্রকৃতিকেই মূল উপাদানকারণ কহেন। সেই উপাদান হইতে এই জগৎ বারবার সৃষ্ট এবং প্রত্যেক মহাপ্রলয়ে তাহাতে প্রলীন হয়।

বেদান্তদর্শনমতেও সৃষ্টি প্রবাহরূপে নিত্য। জীবাত্মা উৎপত্তিবিনাশরহিত। মায়াই প্রকৃতি। জীবাত্মা এবং মায়া উভয়েই ব্রহ্মের অংশ। মায়া ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি এবং ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্রা। পরব্রহ্ম ঈশ্বরসংজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক, স্বীয় মায়াশক্তির যোগে, জীবাত্মার ভোগার্থ আপনার সেই মহাশক্তির মধ্য হইতে এই সৃষ্টির বহিঃপ্রকটন এবং মহাপ্রলয়ে সেই শক্তিকোষের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিরূপ বিশাল কার্য্যের উপসংহার করেন। তখন ঐ শক্তি অন্তর্মুখতারূপে ব্রহ্মে লীন থাকেন এবং সৃষ্টিকালে জীবাত্মাকে সঙ্গে লইয়া জগৎরূপে পরিণত হন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ স্বীয়পূর্ব্বকারণ-রূপিণী ঐ ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াতে নামরূপবিহীন হইয়া সূক্ষ্মরূপে প্রলীন থাকে। নতুবা তৎকালে জগদ্বীজের অত্যন্তাভাব থাকে না। তবে যে কোন কোন স্থলে প্রলয়োপলক্ষে "অসৎ" অর্থাৎ কিছু ছিল না, এইরূপ উক্তি আছে, তাহার অর্থ "অব্যাকৃত সৎ"। যথা বেদান্তাধিকরণ-মালায়—

"যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং, নতু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ম্। অভাবস্য কারণত্বনিষেধাৎ। তাৎপর্য্যবিষয়ে তু জগৎস্রষ্টরি ব্রহ্মণি ন ক্কাপি বিবাদোঽস্তি।"

"অসৎ"শব্দের যাহা অর্থ, তাহা "অব্যাকৃত

সৎ”, “অপ্রকটিত সৎ”, ইহাই অভিপ্রায়; নতুবা “অত্যন্তাভাব” অভিপ্রেত নহে। কেন না, অভাবের কারণত্ব নিষিদ্ধ। তাৎপর্য্যত ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রকাশে কাহারো বিবাদ নাই। কেন না, তাঁহারই শক্তিতে জগৎ প্রলীন থাকে, তাঁহা হইতেই বহিঃপ্রসারিত হয়, তিনিই ইহা সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অংশত প্রবেশ ও ইহাকে পালন করেন।

এইরূপ জগতের প্রবাহরূপ নিত্যত্বশ্রুতি ও ব্রহ্মমীমাংসাসিদ্ধ। “সত্বাচ্চাবরস্য” (শাং সূং ২।১।১৬)—সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে সেই ব্রহ্মশক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক অতি সূক্ষ্মভাবে জগৎ থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টির সার অবয়বসকল ভাবিসৃষ্টির নিমিত্তে মায়াবীজরূপে অপেক্ষা করে। তাহাদের নামরূপ থাকে না। ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী মহামায়ার গর্ভে তাহারা বিলীন হইয়া থাকে। সৃষ্টিপ্রকাশার্থে উক্ত মায়া সৎস্বরূপ ব্রহ্মের একাংশব্যাপিনী সবীজস্বরূপিণী মহাশক্তি। কিন্তু সবীজ হইলেও তাঁহার বস্তুশক্তি মায়াধর্ম্মী—অর্থাৎ যেন কিছুই ছিল না এবং পরব্রহ্ম স্বীয়শক্তিবলে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। এ সব কথা বেদান্তপ্রকরণে পরে বুঝা যাইবে।

অতঃপর জীবের কৃতকর্ম্মরূপিণী অবিদ্যাশক্তি উক্ত মায়ার ত্রিভাগবিশেষ। তাহাও অনাদি। “ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” (শাং সূং ২।১।৩৫)—এই সৃষ্টি পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফলের অনুবর্ত্তী নহে, এমন আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়কালে, ভাবিসৃষ্টির হেতুস্বরূপ সুকৃতিদুষ্কৃতিরূপ অদৃষ্ট বিভাগক্রমে অপেক্ষা করে। সৃষ্টি, জীবাত্মা ও তাঁহার কর্ম্মফলের আদি নাই। বীজবৃক্ষবৎ সে সমস্ত অনাদি।

তথাচ মন্ত্রবর্ণে—

“অভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।” ‘অভি’ সর্ব্বতোভাবেন, ‘ইদ্ধাৎ’ লব্ধবৃত্তেঃ। প্রলয়সময়ে হি নিরুদ্ধবৃত্ত্যাদৃষ্টং ভবতি।”

প্রলয়ে লীন জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মসহিত মানসিক বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধভাবে ব্রহ্মশক্তিতে লীন হইয়া থাকে। তাহাই তাহাদের পূর্ব্বসৃষ্টির অনুসারী অদৃষ্ট। যথাকালে সেই অদৃষ্টসমষ্টির বলে (সহকারিতায়) দ্রষ্টাস্বরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার ঈক্ষণ বা তপস্যা হইয়াছিল।

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রলয়নিশাবসানে জীবগণের অদৃষ্ট কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বের অঙ্কুরোন্মুখতা সহ প্রকটিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিল। সেই অদৃষ্ট জীবের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও দ্রষ্টাস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টির অন্তর্গত। সেই মহাদৃষ্টি প্রয়োজনবিজ্ঞানবান্। তাহাই “ঈক্ষণ” বা “তপস্যা” শব্দের বাচ্য। জীবগণের অদৃষ্টের তাদৃশ ঋতুকালে দ্রষ্টার মায়াশক্তির বিকাশরূপ জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া দ্বারা ক্রমপূর্ব্বক সৃষ্টি বহির্গত হইল। “যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ”—ঠিক সেইপ্রকার, যেমন পূর্ব্বকল্পে ছিল।

এতাবতাঃদর্শনসমূহের মতে সৃষ্টির উপাদান ও অদৃষ্টরূপ হেতু অনাদি। সুতরাং সৃষ্টিও প্রবাহরূপে অনাদি ও নিত্য। কেবল যথাকালে, প্রলয়প্রান্ত হইতে ব্যক্তপ্রান্তে এবং ব্যক্তপ্রান্ত হইতে প্রলয়প্রান্তে—এইরূপ চিরকাল তাহার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের সদ্রূপ অস্তিত্ব, অন্তর্যামিত্ব, অধিদৈবত্ব, নিয়ন্তৃত্ব

এবং চিদাভাসত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের গমনাগমন হইতেছে।

অতঃপর আমরা সাংখ্যদর্শনের অন্ন-বিবরণে প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!

কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!
যার কেশ যার সাজ—
সে কোথা রহিল আজ—
সে কোথা জন্মের মত গিয়াছে চলিয়া?—
গেছে কি চলিয়া?

কে বলে চলিয়া গেছে—
কেশেতে মিশায়ে আছে;
এই সেই সেই এই
অথচ কিছুই নেই
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া!

দেখি দেখি সেই মন্ত্র বারেক জপিয়া!
যে মন্ত্রে দীক্ষিত করি
গেল মোরে পরিহরি,
মিলায়ে হৃদয়যন্ত্রে
উচ্চারিব মহামন্ত্রে,
দেখি দেখি কতক্ষণ থাকে সে ভুলিয়া!—

পারি কি না পারি তারে
আঁখিপথে আনিবারে
কৃতান্তের বজ্রদ্বার কৌশলে খুলিয়া!
যেমন কৃতান্তে তুষি
এনেছিল য়ুরিডিসি
অর্ফ্যুস্ বিনোদ বাদ্যযন্ত্রে বাজাইয়া।
আর কি সে আসিবে না—
শূন্যগৃহে পশিবে না—
আসে না কি পোষা পাখী পিঞ্জরে উড়িয়া?

গভীর আঁধার নিশি!— গগন-সাগরে
যেন শ্বেতপুষ্পপারা
ভাসিছে অসংখ্য তারা—
একটি শবদ নাহি বিশ্বচরাচরে!
সুদূর শূন্যেতে শুধু
শুনা যায় মুহুমুহু
নৈশ-বিহঙ্গম-রব যেতেছে চলিয়া!
যেন প্রাণ কায়া ছাড়ি

ভবসিন্ধু দেয় পাড়ি --
করিছে আনন্দরব থাকিয়া থাকিয়া !

বসি মুক্ত বাতায়নে
করে কেশ শূন্যমনে
হেনকালে জ্ঞান হ'ল যেন অকস্মাৎ
জীবন-মরণ তার
মাঝে যেই গুপ্তদ্বার,—
যেন কেহ সেই দ্বারে করে করাঘাত !
যথা সে প্রবাসী করে
আসি বহুদিন পরে
সহসা হেরিয়া রুদ্ধ ভবনের দ্বার ;
তেমনি কে জ্ঞানহারা
ব্যাকুল-প্রবাসি-পারা
আঘাত করিছে সেই দ্বারে বারম্বার !

যেন পদশব্দ কার্
আসে-যায় বারবার
লঙ্ঘিবারে চাহে সীমা লঙ্ঘিতে না পারে ;—
শুনিবারে যেই শব্দ
হৃৎপিণ্ড হ'ত স্তব্ধ—
টানিয়া জীবনপ্রান্তে ফেলিল আমারে !
ক্ষণে আসে ক্ষণে যায়
মুক্ত-বিহঙ্গিনী-প্রায়,
উপায় নাহিক পায় পশিতে পিঞ্জরে ;—
পিঞ্জরেতে পাখী যেই
পাখা বিস্তারিয়া সেই
প্রহারে পিঞ্জরগায় উড়িবার তরে !

দুই জন দুই স্থানে—
টানাটানি প্রাণে প্রাণে,
এমন সময়ে কার্ কণ্ঠ সুধাময়—
যেন স্বপ্ন-সমুদিত
চিরবিরহের গীত—
ভাসাইল স্মৃতিস্রোতে নিমগ্ন হৃদয় !

কার্ কণ্ঠ—পদশব্দ—কার্ করাঘাত ?—
এ হেন নিশিতে একা—
চোখেতে পাই নে দেখা—
জীবন-উপান্তে আসি করে যাতায়াত !
চিনি চিনি মনে করি,
কিন্তু চিনিবারে নারি,
যেন পথে পান্থবাসে
বাঁধা মন তার পাশে ;
যেন রে শুনেছি কোথা
সে কণ্ঠসুধার কথা,
আজিও জীবনস্রোত বহে তার পানে।

অনন্তব্যু সেই স্বর
উঠি শূন্যে মনোহর,
পশিয়া নক্ষত্রধাম

উচ্চারিল সেই নাম,
মিশাইয়া গেল শেষে অনন্ত গগনে!

করে যে কুন্তল ছিল
কর হ'তে পড়ে গেল,
লহরে লহরে কেশ ক্রমে বিস্তারিল!
তাহে সেই রূপরাশি
সে তনু শোভিল আসি,—
যেন পৌর্ণমাসী-শশী মেঘে দেখা দিল!
যেন বনরাজিশিরে
নির্জ্জন তটিনীতীরে
অকলঙ্ক চাঁদখানি হাসি সমুদিল!

*   *   *   *

*   *   *   *

কৈ সে কোথায় গেল আমারে ত্যজিয়া?
শূন্যগৃহ শূন্য আছে,
কেহ ত নাহিক কাছে,
সব শূন্য করে' গেছে শূন্যে মিশাইয়া!
অন্ধকার করি' হেথা
সে শশী উঠিল কোথা,
করিল আলোকময় কোন্ রাজ্যে গিয়া?
এত ভালবাসাবাসি,
এত প্রাণে মেশামিশি,
এত সাধ এত আশা,
এত যে প্রাণের তৃষা,—
সব কি জন্মের মত রহিল ভুলিয়া?

কারামুক্ত কারাবাসে
কে কবে ফিরিয়া আসে?
কে চাহে ভুঞ্জিতে দুঃখ নিগড় পরিয়া?
কোথাও দেখি না তারে!—
নাহি চিহ্ন এ সংসারে!—
কেবল কুন্তলমাত্র রয়েছে পড়িয়া।

গোপালকৃষ্ণ

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৪৮

রমেশ প্রত্যুষেই এলাহাবাদ হইতে গাজিপুরে ফিরিয়া আসিল। তখন রাস্তায় অধিক লোক ছিল না, এবং শীতের জড়িমায় রাস্তার ধারের গাছগুলা যেন পল্লবাবরণের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পাড়ার বস্তি-গুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া শাদা কুয়াশা ডিম্বগুলির উপরে নিস্তব্ধ-আসীন রাজহংসের মত স্থির হইয়া ছিল। সেই নির্জ্জন পথে গাড়ির মধ্যে একটা মস্ত মোটা ওভারকোটের নীচে রমেশের বক্ষস্থল চঞ্চল হৃৎপিণ্ডের আঘাতে কেবলি তরঙ্গিত হইতে-ছিল।

বাংলার বাহিরে গাড়ি দাঁড় করাইয়া রমেশ নামিল। ভাবিল, গাড়ির শব্দ নিশ্চয়ই কমলা শুনিয়াছে;—শব্দ শুনিয়া সে হয় ত বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। স্বহস্তে কমলার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য এলাহা-বাদ হইতে রমেশ একটি দামী নেক্‌লেস্ কিনিয়া আনিয়াছে—তাহারই বাক্সটা রমেশ তাহার ওভারকোটের বৃহৎ পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল।

বাংলার সম্মুখে আসিয়া রমেশ দেখিল, বিষণ-বেহারা বারান্দায় শুইয়া অকাতরে নিদ্রা দিতেছে—ঘরের দ্বারগুলি বন্ধ। বিমর্ষ-মুখে রমেশ একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একটু উচ্চস্বরে ডাকিল —"বিষণ!" ভাবিল, এই ডাকে ঘরের ভিতরকার নিদ্রাও ভাঙিবে। কিন্তু এমন করিয়া নিদ্রা ভাঙাইবার যে অপেক্ষা আছে, ইহাই তাহার মনে বাজিল; রমেশ ত অর্দ্ধেকরাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই!

দুই-তিন ডাকেও বিষণ উঠিল না—শেষ-কালে ঠেলিয়া তাহাকে উঠাইতে হইল। বিষণ উঠিয়া-বসিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া রহিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"বহুজি ঘরে আছেন?"

বিষণ প্রথমটা রমেশের কথা যেন বুঝি-তেই পারিল না—তাহার পরে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি ঘরেই আছেন।"—এই বলিয়া সে পুনর্ব্বার শুইয়া-পড়িয়া নিদ্রা দিবার উপক্রম করিল।

রমেশ দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই! তথাপি একবার উচ্চৈঃস্বরে

ডাকিল, "কমলা !"—কোথাও কোনো সাড়া পাইল না। বাহিরের বাগানে নিমগাছতলা পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে, আস্তাবলঘরে সন্ধান করিয়া আসিল, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইল না। তখন রৌদ্র উঠিয়া পড়িয়াছে—কাকগুলা ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বাংলার ইঁদারা হইতে জল লইবার জন্ত কলস মাথায় পাড়ার মেয়ে দুইএকজন দেখা দিতেছে। পথের ওপারে কুটীরপ্রাঙ্গণে কোনো পল্লীনারী বিচিত্র উচ্চস্বরে গান গাহিতে গাহিতে জাঁতায় গম ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রমেশ বাংলাঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বিষণ পুনরায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। তখন সে নত হইয়া দুই হাতে খুব করিয়া বিষণকে ঝাঁকানি দিতে লাগিল—দেখিল, তাহার নিশ্বাসে তাড়ির প্রবল গন্ধ ছুটিতেছে।

ঝাঁকানির বিষম বেগে বিষণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—"বহুজি কোথায় ?"

বিষণ কহিল—"বহুজি ত ঘরেই আছেন ?"

রমেশ। কই, ঘরে কোথায় ?

বিষণ। কাল ত এখানেই আসিয়াছেন ?

রমেশ। তাহার পরে কোথায় গেছেন ?

বিষণ হাঁ করিয়া রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

এমন সময়ে খুব চওড়াপাড়ের এক বাহারে ধুতি পরিয়া চাদর উড়াইয়া রক্তবর্ণ-চক্ষু উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তোর মা কোথায় ?"

উমেশ কহিল, "মা ত কাল হইতে এখানেই আছেন।"

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কোথায় ছিলি ?"

উমেশ কহিল—"আমাকে মা কাল বিকালে সিধুবাবুদের বাড়ী যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

গাড়োয়ান আসিয়া কহিল, "বাবু, আমার ভাড়া ?"

রমেশ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে চড়িয়া একেবারে খুড়ার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, বাড়ীসুদ্ধ সকলেই যেন চঞ্চল। রমেশের মনে হইল, কমলার বুঝি কোনো অসুখ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। কাল সন্ধ্যার কিছু পরেই উমা হঠাৎ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার মুখ নীল ও হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া পড়ায় সকলেই অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। তাহার চিকিৎসা লইয়া কাল বাড়ীসুদ্ধ সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। সমস্ত রাত কেহ ঘুমাইতে পায় নাই।

রমেশ মনে করিল, উমির অসুখ হওয়াতে নিশ্চয়ই কাল কমলাকে এখানে আনানো হইয়াছিল। বিপিনকে কহিল—"কমলা তা হইলে উমিকে লইয়া খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া আছে !"

কমলা কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিল কি না, বিপিন তাহা নিশ্চয় জানিত না—তাই রমেশের কথায় একপ্রকার সায় দিয়া কহিল, "হাঁ, তিনি উমিকে যেরকম ভালবাসেন, খুব

ভাবিতেছেন বই কি! কিন্তু ডাক্তার বলিয়াছে, ভাবনার কোনো কারণই নাই।"

যাহা হউক্, অত্যন্ত উল্লাসের মুখে কল্পনার পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বাধা পাইয়া রমেশের মনটা বিকল হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহাদের মিলনে যেন একটা দৈবের ব্যাঘাত আছে।

এমনসময় রমেশের বাংলা হইতে উমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানকার অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি ছিল। এই বালকটাকে শৈলজা স্নেহও করিত। বাড়ীর ভিতরে শৈলজার ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া উমির ঘুম ভাঙিবার আশঙ্কায় শৈল তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

উমেশ জিজ্ঞাসা করিল—"মা কোথায় মাসিমা!"

শৈল বিস্মিত হইয়া কহিল—"কেন রে, তুই-ত কাল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ও বাড়ীতে গেলি। সন্ধ্যার পর আমাদের লছ্‌মনিয়াকে ওখানে পাঠাইবার কথা ছিল, খুকির অসুখে তাহা পারি নাই।

উমেশ মুখ ম্লান করিয়া কহিল—"ও বাড়ীতে ত তাঁহাকে দেখিলাম না!"

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে কি কথা! কাল রাত্রে তুই কোথায় ছিলি?"

উমেশ। আমাকে ত মা থাকিতে দিলেন না। ও বাড়ীতে গিয়াই তিনি আমাকে সিধুবাবুদের ওখানে যাত্রা শুনিতে পাঠাইয়াছিলেন।

শৈল। তোরও ত বেশ আক্কেল দেখিতেছি! বিষণ কোথায় ছিল?

উমেশ। বিষণ ত কিছুই বলিতে পারে না। কাল সে খুব তাড়ি খাইয়াছিল।

শৈল। যা, যা, শীঘ্র বাবুকে ডাকিয়া আন্।

বিপিন আসিতেই শৈল কহিল—"ওগো, এ কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

বিপিনের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন, কি হইয়াছে?"

শৈল। কমল কাল ও বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে ত সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না!

বিপিন। তিনি কি কাল রাত্রে এখানে আসেন নাই?

শৈল। না গো। উমির অসুখে আনাইব মনে করিয়াছিলাম, লোক কোথায় ছিল? রমেশবাবু কি আসিয়াছেন?

বিপিন। বোধ হয়, ও বাংলায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ঠিক করিয়াছেন, কমলা এখানেই আছেন। তিনি ত আমাদের এখানেই আসিয়াছেন।

শৈল। যাও যাও, শীঘ্র যাও, তাঁহাকে লইয়া খোঁজ কর'গে! উমি এখন ঘুমাইতেছে—সে ভালই আছে।

বিপিন ও রমেশ আবার সেই গাড়িতে উঠিয়া বাংলায় ফিরিয়া গেল এবং বিষণকে লইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টায় জোড়াতাড়া দিয়া যেটুকু খবর বাহির হইল, তাহা এই:—কাল বৈকালে কমলা একলা গঙ্গার ধারের অভিমুখে চলিয়াছিল। বিষণ তাহার সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করে, কমলা তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া ফিরাইয়া দেয়।

সে পাহারা দিবার জন্ত বাগানের গেটের কাছে বসিয়া ছিল—এমন সময়ে গাছ হইতে সন্তঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করিয়া তাড়িওয়ালা তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহার পর হইতে বিশ্বসংসারে কি যে ঘটিয়াছে, তাহা বিষণের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নহে! যে পথ দিয়া কমলাকে গঙ্গার দিকে যাইতে দেখিয়াছিল, বিষণ তাহা দেখাইয়া দিল।

সেই পথ অবলম্বন করিয়া শিশিরসিক্ত শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া রমেশ, বিপিন ও উমেশ কমলার সন্ধানে চলিল। উমেশ হৃত-শাবক শিকারী জন্তুর মত চারিদিকে তীক্ষ্ণ ব্যাকুলদৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। গঙ্গার তটে আসিয়া তিনজনে একবার দাঁড়াইল। সেখানে চারিদিক্ উন্মুক্ত। ধূসর বালুকা প্রভাতরৌদ্রে ধুধু করিতেছে। কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না! উমেশ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল—"মা, মাগো, মা কোথায়?"—ও পারের সুদূর উচ্চতীর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল—কেহই সাড়া দিল না।

খুঁজিতে খুঁজিতে উমেশ হঠাৎ দূরে শাদা কি-একটা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া দেখিল, জলের একেবারে ধারেই একগোছা চাবি একটা রুমালে বাঁধা পড়িয়া আছে। "কিরে, ওটা কি?" বলিয়া রমেশও আসিয়া পড়িল। দেখিল, কমলারই চাবির গোছা।

যেখানে চাবি পড়িয়া ছিল, সেখানে বালুতটের প্রান্তভাগে পলিমাটি পড়িয়াছে। সেই কাঁচা মাটির উপর দিয়া গঙ্গার জল পর্য্যন্ত ছোট দুইটি পায়ের গভীর চিহ্ন পড়িয়া গেছে। খানিকটা জলের মধ্যে একটা-কি ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল, তাহা উমেশের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না—সে সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধরিতেই দেখা গেল, সোনার উপরে এনামেল্ করা একটি ছোটো ব্রোচ্—ইহা রমেশেরই উপহার।

এইরূপে সমস্ত সঙ্কেতই যখন গঙ্গার জলের দিকেই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিল, তখন উমেশ আর থাকিতে পারিল না—"মা, মাগো" —বলিয়া চীৎকার করিয়া জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। জল সেখানে অধিক ছিল না—উমেশ বারংবার পাগলের মত ডুব দিয়া দিয়া তলা হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল—জল ঘোলা করিয়া তুলিল।

রমেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিপিন কহিল—"উমেশ, তুই কি করিতেছিস্? উঠিয়া আয়।"

উমেশ মুখ দিয়া জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিল—"আমি উঠিব না—আমি উঠিব না! মাগো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না!"

বিপিন ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু উমেশ জলের মাছের মত সাঁতার দিতে পারে—তাহার পক্ষে জলে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সে অনেকটা হাঁপাইয়া-ঝাঁপাইয়া শ্রান্ত হইয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িল এবং বালুর উপরে লুটাইয়া-পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নিস্তব্ধ রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, চলুন! এখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি হইবে! একবার পুলিসকে

খবর দেওয়া যাক্, তাহারা সমস্ত সন্ধান করিয়া দেখুক্!"

শৈলজার ঘরে সেদিন আহারনিদ্রা বন্ধ হইয়া কান্নার রোল উঠিল। নদীতে জেলেরা নৌকা লইয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত জাল টানিয়া বেড়াইল। পুলিস্ চারিদিকে সন্ধান করিতে লাগিল। ষ্টেশনে গিয়া বিশেষ করিয়া খবর লইল, কমলার সহিত বর্ণনায় মেলে, এমন কোনো বাঙালীর মেয়ে রাত্রে রেল্‌গাড়িতে ওঠে নাই।

সেইদিনই বিকালে খুড়া আসিয়া পৌঁছিলেন। কয়দিন হইতে কমলার ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।

লছ্‌মনিয়া কহিল, "সেইজন্যই খুকি কাল রাত্রে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুতকাণ্ড করিল—উহাকে ভাল করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।"

রমেশের বুকের ভিতরটা যেন শুকাইয়া গেল—তাহার মধ্যে অশ্রুর বাষ্পটুকুও ছিল না। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"একদিন এই কমলা এই গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মত আর একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।"

সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন রমেশ আবার সেই গঙ্গার ধারে আসিল—যেখানে চাবির গোছা পড়িয়া ছিল, সেখানে দাঁড়াইয়া সেই পায়ের চিহ্ন ক'টি একদৃষ্টে দেখিল—তাহার পরে তীরে জুতা খুলিয়া ধুতি গুটাইয়া-লইয়া খানিকটা জল পর্য্যন্ত নামিয়া গেল এবং বাক্স হইতে সেই নূতন নেক্‌লেস্‌টি বাহির করিয়া দূরে জলের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

রমেশ কখন্ যে গাজিপুর হইতে চলিয়া গেল, খুড়ার বাড়ীতে তাহার খবর লইবার মত অবস্থা কাহারো রহিল না।

৪৯

এখন রমেশের সম্মুখে কোনো কাজ রহিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহজীবনে সে যেন কোনো কাজ করিবে না, কোথাও স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবে না। তাহার মনে হইল, তাহার জীবনের নাট্যলীলা একেবারে শেষ হইয়া গেছে—বাতি নিবিয়াছে, যবনিকা পড়িয়াছে, সমস্ত সঙ্গীত নিস্তব্ধ—এখন তাহার কোনো বন্ধন নাই, কর্ত্তব্য নাই, সুখও নাই। হেমনলিনীর কথা তাহার মনে একেবারেই যে উদয় হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে সরাইয়া দিয়াছে,—সে মনে মনে বলিয়াছে, "আমার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা আঘাত করিল, তাহাতে আমাকে চিরদিনের জন্য সংসারের অযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। বজ্রাহত গাছ প্রফুল্ল উপবনের মধ্যে স্থান পাইবার আশা কেন করিবে?"

রমেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবার জন্য বাহির হইল। এক জায়গায় কোথাও বেশিদিন রহিল না। সে নৌকায় চড়িয়া কাশীর ঘাটের শোভা দেখিল, সে দিল্লিতে কুতবমিনরের উপরে চড়িল, আগ্রায় জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখিয়া আসিল। অমৃতসরে গুরুদরবার দেখিয়া রাজপুতানায় আবুপর্ব্বতশিখরের মন্দির দেখিতে গেল—এম্নি করিয়া রমেশ নিজের শরীরমনকে আর বিশ্রাম দিল না।

কিন্তু দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ানো রমেশের স্বভাবসিদ্ধ নহে। সে নিতান্তই কুণো—এবং অন্যলোকের মুখাপেক্ষী। সে বাল্যকাল হইতে বইয়ের পাতার উপরে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া দৃষ্টি ক্ষীণ করিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় যখন 'মেসে' থাকিত, তখন তাহার দুইএকজন হিতৈষী বন্ধু বরাবর তাহার তত্বাবধান করিয়াছে। নিজের টাকাকড়ি, অশনবসনের ব্যবস্থাভার সে কোনোদিন নিজে লইতে পারে নাই। তাহার পিতার আমলের পুরাতন বিশ্বাসী লোকের হাতে তাহার বিষয়আশয়ের ভার থাকাতে জীবিকার জন্য তাহাকে ভাবিতে হইতেছে না। অন্য ছাত্রেরা খেলা, আমোদ, ব্যায়াম প্রভৃতিতে যখন উৎসাহপ্রকাশ করিত, তখন রমেশ মনে করিত, ইহা বর্ব্বরতামাত্র ও ইহাতে মানসিক উচ্চপ্রবৃত্তিগুলির সৌকুমার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। সেই রমেশ আজ নিজের সমস্ত ভার নিজে সম্পূর্ণ বহন করিয়া, টিকিট কিনিয়া, মুটে ডাকিয়া, গাড়ির ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির জোরে নিজের স্থান করিয়া লইয়া, নূতন নূতন স্থানে ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের নির্দ্দেশক্রমে বাসা ঠিক করিয়া এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেও যে ঠিক নিজের স্বভাবের উত্তেজনায়, তাহা নহে। সে অনেক গ্রন্থে পড়িয়াছে যে, জীবনে গুরুতর দুর্ঘটনার পরে ঢের লোকে এম্‌নি করিয়া দেশে-বিদেশে নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া নিজেকে সর্ব্বদাই সচল রাখিয়া সান্ত্বনালাভ করিয়া থাকে। তাই সেও সেই শোকাতুর লোকের শাস্ত্রসম্মত পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু এই উপায়ে অতি অল্পদিনের মধ্যেই রমেশ নিজেকে একেবারে পরিশ্রান্ত করিয়া ফেলিল। অপরিচিত দেশের অনাশ্রয় ও অপরিচিত লোকের অমমত্ব হইতে ছুটি লইয়া কোনো একটা নিভৃত জায়গায় আরামে স্থায়ী হইয়া বসিবার জন্য তাহার সমস্ত শরীরমন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। গোড়ায় যখন সে ভ্রমণে বাহির হয়, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, চিরদিনই তাহাকে এম্‌নি ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে—এখন রমেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, চিরদিন বলিতে অধিকদিন নহে—তাহাকে একটা বাসা করিতেই হইবে।

একদিন কানপুরের ডাকবাংলার নিকটবর্ত্তী পথে পায়চারি করিতে করিতে রমেশ এই সকল কথা আলোচনা করিতেছে;—লাইব্রেরি সাজাইয়া, চারিদিকে বাগান করিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ বাসাটির একটি মনোরম চিত্র গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার অধ্যয়নশীল শান্তিময় নিভৃত জীবনযাত্রার মধুর কল্পনায় আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অদূরে একটি সামান্য পথিককে দেখিয়া রমেশ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। "আরে জান্‌কিয়া—জান্‌কিয়া" করিয়া দ্রুতপদে রমেশ তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি রমেশকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেলাম করিল—কহিল, "বাবুজি এখানে যে!"

রমেশের সহিত অন্নদাবাবুদের যখন প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন এই জান্‌কিয়া তাঁহাদের বেহারা ছিল। অল্পকয়েকদিন পরেই পীড়িত হইয়া জান্‌কিয়া বাড়ী চলিয়া যায়, তাহার পরে আর সে ফেরে নাই।

এইটুকু দূরপরিচয়ের সম্পর্কমাত্রে

রমেশ এত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে, পথের মধ্যে এই জান্‌কিয়া-বেহারার সঙ্গ তাহার একটা লাভ বলিয়া মনে হইল। জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়াবাবু কেমন আছেন? দিদিঠাকরুণ ভাল আছেন ত? দাদাবাবু কি করিতেছেন?"

রমেশ কতকটা আন্দাজেই এ সকল কথার উত্তর দিল। জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিঠাকরুণের 'সাদি' হইয়া গেছে?"

রমেশের বুকটার ভিতরে একটা নাড়া খাইল, সে কহিল, "না, এখনো হয় নাই।"

জান্‌কিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে কি?"

রমেশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "কই, তাহা ত শুনি নাই।"

জান্‌কিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রমেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কি কর?"

সে কহিল, "আমার এখানে শ্বশুরবাড়ী—আমি এখানকার কলে কাজ করি।"

সে কত করিয়া পায়, তাহার কিরকম করিয়া চলে, তাহার ছেলেপুলে আছে কি না, সমস্ত রমেশ জিজ্ঞাসা করিল। জান্‌কিয়া মনে মনে কিছু বিস্মিত হইল। এই চসমা-পরা বাবুটি অন্নদাবাবুর বাড়ীতে কোনোদিন জান্‌কিয়ার কোন খবর লয় নাই। জান্‌কিয়ার বিদায়কালে রমেশ তাহার হাতে একটি টাকা দিল—সে পুনর্ব্বার কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরিবার সময় ডাকবাংলায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে আশ্বাস দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

রমেশ ডাকবাংলায় আরামকেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া অনেক কথা ভাবিল। এমন কি, তাহার মধ্যে এই জান্‌কিয়া-বেহারাটার প্রতি একটু ঈর্ষাও ছিল। ঐ যে জান্‌কিয়াটা কেমন স্বচ্ছন্দচিত্তে কাজ করিতে গেল,—উহার এখানে ঘর আছে—কাজ সারিয়া সন্ধ্যাবেলায় আপনার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে—সেখানে দীপ জ্বলিতেছে—অন্ন প্রস্তুত, এই কল্পনাটা রমেশের কাছে তুচ্ছ মনে হইল না। এই সঙ্গে, জান্‌কিয়া কলিকাতায় যে বাড়ীতে কাজ করিত, সেই বাড়ীর ছোটবড় নানা কথা তাহার মনে উঠিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশ ডাকবাংলায় একলা বসিয়া থাকিতে পারিল না। বেড়াইতে বাহির হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা বাংলাবাড়ীর সম্মুখে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সেখানে ঘরের মধ্যে হার্ম্মোনিয়ম বাজিতেছে এবং তাহার সঙ্গে স্ত্রীকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শোনা যাইতেছে। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য বিভ্রম হইল, যেন হেমনলিনীই গাহিতেছে। যখন বুঝিল, হেমনলিনী নয়, তখনো তাহার মনের সেই মোহ একেবারে ভাঙিয়া গেল না।

বাড়ীর একটি ভৃত্যের কাছ হইতে খবর পাইল, কোন্‌ো বাঙালী ভদ্রলোক সস্ত্রীক বেড়াইতে আসিয়া এখানে বাসা করিয়া আছেন। রাস্তা হইতে, এই সঙ্গীতমুখরিত দীপজ্বলিত ঘরের দিকে রমেশ সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। বাবুটির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য রমেশ পরদিন সকালে সেই বাংলার দিকে যাত্রা করিল। গেটের

কাছে আসিয়াই দেখিল, একটি যুবতী বাংলার সহিত সংলগ্ন ফুলবাগানে ধীরপদে বেড়াইতেছেন। রমেশ যে কয়দিন ঊর্দ্ধশ্বাসে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিল, সে কয়দিনের মধ্যে কোনো আধুনিক বাঙালী ভদ্রস্ত্রীলোককে সে দেখে নি;—আজ হঠাৎ এই বাঙালীর মেয়েটি যে তাহার চক্ষে এমন নূতন, এমন মধুর লাগিবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারিত না। এই কাপড় পরিবার ভঙ্গি, এই চুলবাঁধা, এই ধীর গতি দেখিয়া এই প্রবাসের প্রভাতে তাহার মনে কোথাকার কোন্ ছবি জাগিয়া উঠিল! রমেশের ইচ্ছা করিতে লাগিল, এই মেয়েটিকে কেবল একবার নমস্কার করিয়া আসে। আহা ইনি কোন্ ভাগ্যবানের ঘরটিকে স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সুধাময় করিয়া রাখিয়াছেন! এমন সময়ে হঠাৎ রমেশকে দেখিতে পাইয়া মেয়েটি বাগান হইতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ইহার পরে ক্রমে এম্নি হইল যে, যেখানে-সেখানে যাহা-তাহা কেবল হেমনলিনীর কথাই তাহাকে স্মরণ করাইতে লাগিল। লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলে সেই সকল বই চোখে পড়ে,—যাহাতে হেমনলিনীর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। কাপড়ের দোকানের সুমুখ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ এমন একটা রঙের কাপড় দেখিয়া তাহার মনটা চম্‌কিয়া উঠে,—যাহাতে হেমনলিনীর কোনো-একটা দিনের বিশেষ সাজ তাহার মনে পড়িয়া যায়। প্রত্যহ সকালে-বিকালে বেড়াইতে গিয়া একটা ফিরিঙ্গির বাড়ীর কাছ দিয়া যাইবার সময় যেমন দেখে, তাহারা দুটিদুই-তিন মেয়ে-পুরুষ টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া চা খাইতেছে—অম্‌নি তাহার মনের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠে।

এই ভ্রমণশ্রান্ত যুবকটির অন্তঃকরণ কেবল ঘর চাহিয়া হাহা করিতে লাগিল। তাহার মনে একটি শান্তিময় ঘরের অতীত স্মৃতি ও একটি সম্ভবপর ঘরের সুখময় কল্পনা কেবলি আঘাত দিতেছে! অবশেষে একদিন তাহার শোককালযাপনের ভ্রমণ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল এবং সে একটা মস্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কলিকাতার টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

৫০

কলিকাতায় পৌঁছিয়া রমেশ সেই কলুটোলার গলিটার ভিতরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিল না। সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই! মনের মধ্যে কেবলি একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, সেখানে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একদিন ত সে গলির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা রমেশ নিজেকে জোর করিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। দেখিল, বাড়ীর সমস্ত দরজাজান্‌লা বন্ধ—ভিতরে কোনো লোক আছে, এমন লক্ষণ নাই। তবু সেই সুখন্-বেহারাটা হয় ত শূন্যবাড়ী আগ্‌লাইতেছে মনে করিয়া রমেশ বেহারাকে ডাকিয়া দ্বারে বারকতক আঘাত করিল। কেহ সাড়া দিল না। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহন তাহার ঘরের বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতেছিল—সে কহিল, "কে ও! রমেশবাবু নাকি! ভাল আছেন ত? এ বাড়ীতে অন্নদাবাবুরা ত এখন কেহ নাই!"

রমেশ। তাঁহারা কোথায় গেছেন জানেন?

চন্দ্রমোহন। সে খবর ত বলিতে পারি না, পশ্চিমে গেছেন এই জানি।

রমেশ। কে কে গেছেন মশায়?

চন্দ্র। অন্নদাবাবু আর তাঁর মেয়ে।

রমেশ। ঠিক জানেন, তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহ যান নাই!

চন্দ্র। ঠিক জানি বই কি; যাইবার সময়ও আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে।

তখন রমেশ ধৈর্য্যরক্ষায় অক্ষম হইয়া কহিল "আমি একজনের কাছে খবর পাইয়াছি, নলিনবাবু বলিয়া একটি বাবু তাঁহাদের সঙ্গে গেছেন।"

চন্দ্র। ভুল খবর পাইয়াছেন। নলিনবাবু আপনার ঐ বাসাটাতেই দিনকয়েক ছিলেন। ইঁহারা যাত্রা করিবার দিনদুইচার পূর্ব্বেই তিনি কাশীতে গেছেন।

রমেশ তখন এই নলিনবাবুটির বিবরণ প্রশ্ন করিয়া করিয়া চন্দ্রমোহনের কাছ হইতে বাহির করিল। ইঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। শোনা গেছে, পূর্ব্বে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন, এখন মাকে লইয়া কাশীতেই আছেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল "যোগেন এখন কোথায় আছে বলিতে পারেন?"

চন্দ্রমোহন খবর দিল, যোগেন্দ্র ময়মনসিঙের একটি জমিদারের স্থাপিত হাই-স্কুলের হেডমাষ্টারপদে নিযুক্ত হইয়া বিশাইপুরে গিয়াছে।

চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিল "রমেশবাবু, আপনাকে ত অনেকদিন দেখি নাই—আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন?"

রমেশ আর গোপন করিবার কারণ দেখিল না—সে কহিল, "প্র্যাক্‌টিস্ করিতে গাজিপুরে গিয়াছিলাম।"

চন্দ্র। এখন তবে কি সেইখানেই থাকা হইবে?

রমেশ। না, সেখানে আমার থাকা হইল না—এখন কোথায় যাইব, ঠিক করি নাই।

রমেশ চলিয়া যাইবার অনতিকাল পরেই অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্র চলিয়া যাইবার সময়, মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ীর তত্ত্বাবধানের জন্য অক্ষয়ের উপর ভার দিয়া গিয়াছিল। অক্ষয় যে ভার গ্রহণ করে, তাহা রক্ষা করিতে কখনো শৈথিল্য করে না—তাই সে হঠাৎ যখন তখন আসিয়া দেখিয়া যায়, বাড়ীর বেহারা-দুজনের মধ্যে একজনও হাজির থাকিয়া খবরদারি করিতেছে কি না।

চন্দ্রমোহন তাহাকে কহিল, "রমেশবাবু এই খানিকক্ষণ হইল এখান হইতে চলিয়া গেলেন।"

অক্ষয় বলেন কি? কি করিতে আসিয়াছিলেন?

চন্দ্র। তাহা ত জানি না। আমার কাছে অন্নদাবাবুদের সমস্ত খবর জানিয়া লইলেন। এমন রোগা হইয়া গেছেন, হঠাৎ তাঁহাকে চেনাই কঠিন—যদি বেহারাকে না ডাকিতেন, আমি চিনিতে পারিতাম না।

অক্ষয়। এখন কোথায় থাকেন, খবর পাইলেন?

চন্দ্র। এতদিন গাজিপুরে ছিলেন—এখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন, কোথায় থাকিবেন, ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না।

অক্ষয় বলিল—"ওঃ!"—বলিয়া আপন কর্ম্মে মন দিল।

রমেশ বাসায় ফিরিয়া-আসিয়া ভাবিতে লাগিল—"অদৃষ্ট একি বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে! একদিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্যদিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই মিলন, এ যে একেবারে উপন্যাসের মত—সেও কুলিখিত উপন্যাস! এমনতর ঠিক উল্টাপাল্টা মিল করিয়া দেওয়া অদৃষ্টেরই মত বে-পরোয়া রচয়িতার পক্ষেই সম্ভব—সংসারে সে এমন অদ্ভুতকাণ্ড ঘটায়, যাহা ভীরু লেখক কাল্পনিক উপাখ্যানে লিখিতে সাহস করে না।" কিন্তু রমেশ ভাবিল, এবার সে যখন তাহার জীবনের সমস্যাজাল হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন খুব সম্ভব, অদৃষ্ট এই জটিল উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে রমেশের পক্ষে নিদারুণ উপসংহার লিখিবে না।

যোগেন্দ্র বিশাইপুর জমিদারবাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি একতলা বাড়ীতে বাসা পাইয়াছিল—সেখানে রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল, এমনসময় বাজারের একটি লোক তাহার হাতে একখানি চিঠি দিল। খামের উপরকার অক্ষর দেখিয়াই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, রমেশ লিখিয়াছে—সে বিশাইপুরের একটি দোকানে অপেক্ষা করিতেছে, বিশেষ কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

যোগেন্দ্র একেবারে চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। রমেশকে যদিও সে একদিন অপমান করিতে বাধ্য হইয়াছিল—তবু সেই বাল্যবন্ধুকে এই দূরদেশে এতদিন অদর্শনের পরে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এমন কি, তাহার মনের মধ্যে একটা আনন্দই হইল—কৌতূহলও কম হইল না। বিশেষত হেমনলিনী যখন কাছে নাই, তখন রমেশের দ্বারা কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায় না।

পত্রবাহকটিকে সঙ্গে করিয়া যোগেন্দ্র নিজেই রমেশের সন্ধানে চলিল। দেখিল, সে একটি মুদির দোকানে একটা শূন্য কেরোসিনের বাক্স খাড়া করিয়া তাহার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে;—মুদি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তাহাকে তামাক দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু চসমা-পরা বাবুটি তামাক খায় না শুনিয়া মুদি তাহাকে সহরজাত কোনো অদ্ভুতশ্রেণীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়াছিল। সেই অবধি পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকার আলাপপরিচয়ের চেষ্টা হয় নাই।

যোগেন্দ্র সবেগে আসিয়া একবারে রমেশের হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল কহিল, "তোমার সঙ্গে পারা গেল না! তুমি আপনার দ্বিধা লইয়াই গেলে! কোথায় একেবারে সোজা আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইবে, না পথের মধ্যে মুদির দোকানে গুড়ের বাতাসা ও মুড়ির চাকৃতির মাঝখানে অটল হইয়া বসিয়া আছ।"

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া একটুখানি হাসিল। যোগেন্দ্র পথের মধ্যে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, কহিল—"যিনিই যাই বলুন, বিধাতাকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই! তিনি আমাকে সহরের মধ্যে মানুষ করিয়া এতবড় সাহরিক করিয়া তুলিলেন, সে কি এই ঘোর পাড়াগাঁয়ের

মধ্যে আমার জীবাত্মাটাকে একেবারে মাঠে মারিবার জন্য ?”

রমেশ চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, “কেন, এ জায়গাটি ত মন্দ নয়।”

যোগেন্দ্র। অর্থাৎ ?

রমেশ। অর্থাৎ নির্জ্জন—

যোগেন্দ্র। সেইজন্য আমার মত আরো একটি জনকে বাদ দিয়া এই নির্জ্জনতা আর-একটু বাড়াইবার জন্য আমি অহরহ ব্যাকুল হইয়া আছি।

রমেশ। যাই বল, মনের শান্তির পক্ষে—

যোগেন্দ্র। ও সব কথা আমাকে বলিয়ো না,—কয়দিন প্রচুর মনের শান্তি লইয়া আমার প্রাণ একেবারে কণ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে! আমার সাধ্যমত এই শান্তি ভাঙিবার জন্য ত্রুটি করি নাই। ইতিমধ্যে সেক্রেটারির সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। জমিদারবাবুটিকেও আমার মেজাজের যেপ্রকার পরিচয় দিয়াছি, সহজে তিনি আমার উপরে আর হস্তক্ষেপ করিতে আসিবেন না! তিনি আমাকে দিয়া ইংরাজি খবরের কাগজে তাঁহার নকিবী করাইয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, সেটা আমি তাঁকে কিছু প্রবলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। তবু যে টিঁকিয়া আছি, সে আমার নিজগুণে নয়। আমার সঙ্গে অধিক ঘেঁষাঘেঁষি না থাকাতে এখানকার জয়েণ্ট-সাহেব আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছেন—জমিদারটি সেইজন্য ভয়ে আমাকে বিদায় করিতে পারিতেছেন না—যেদিন গেজেটে দেখিব, জয়েণ্ট বদ্‌লি হইতেছেন, সেইদিনই বুঝিব, আমার হেডমাষ্টারিসূর্য্য বিশাইপুরের আকাশ হইতে অস্তমিত হইল। ইতিমধ্যে এখানে আমার একটিমাত্র আলাপী আছে—আমার পাক্‌কুকুরটি! আর সকলেই আমার প্রতি যেরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, তাহাকে কোনোমতেই শুভদৃষ্টি বলা চলে না।

যোগেন্দ্রের বাসায় আসিয়া রমেশ একটা চৌকিতে বসিল। যোগেন্দ্র কহিল, “না, বসা নয়! আমি জানি, প্রাতঃস্নান নামে তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার আছে—সেটা সারিয়া এস। ইতিমধ্যে আর একবার গরম-জলের কাৎলিটা আগুনে চড়াইয়া দিই। আতিথ্যের দোহাই দিয়া আজ দ্বিতীয়বার চা খাইয়া লইব।”

এইরূপে আহার, আলাপ ও বিশ্রামে দিন কাটিয়া গেল! রমেশ যে বিশেষ কথাটা বলিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, যোগেন্দ্র সমস্তদিন তাহা কোনোমতেই বলিবার অবকাশ দিল না। সন্ধ্যার পরে আহারান্তে কেরোসিনের আলোকে দুইজনে দুই কেদারা টানিয়া-লইয়া বসিল। অদূরে শৃগাল ডাকিয়া গেল ও বাহিরে অন্ধকার-রাত্রি ঝিল্লীর শব্দে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “যোগেন্‌, তুমি ত জানই, তোমাকে কি কথা বলিতে আমি এখানে আসিয়াছি। একদিন তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে প্রশ্নের উত্তর করিবার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। আজ আর উত্তর দিবার কোনো বাধা নাই।”

এই বলিয়া রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সে

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠ কম্পিত হইল—মাঝে মাঝে কোনো কোনো জায়গায় সে দুইএকমিনিট চুপ করিয়া রহিল। যোগেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া স্থির হইয়া শুনিল।

যখন বলা হইয়া গেল, তখন যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"এই সকল কথা যদি সেদিন বলিতে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।"

রমেশ। বিশ্বাস করার হেতু তখনো যেটুকু ছিল, এখনো তাহাই আছে। সেজন্য তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি যে গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলাম, সে গ্রামে একবার তোমাকে যাইতে হইবে। তাহার পরে সেখান হইতে কমলার মাতুলালয়েও লইয়া যাইব।

যোগেন্দ্র। আমি কোনোখানে এক-পা নড়িব না—আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস;—জীবনে একবারমাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমার কাছে মাপ চাই।

এই বলিয়া যোগেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া রমেশের সম্মুখে আসিল—রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই দুই বাল্যবন্ধু একবার পরস্পর কোলাকুলি করিল। রমেশ রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আমি কোথা হইতে ভাগ্যরচিত এমন একটা দুশ্ছেদ্য মিথ্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহার মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা-দেওয়া ছাড়া আমি কোনোদিকেই কোনো উপায় দেখিতে পাই নাই। আজ যে আমি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছি, আর যে আমার কাহারো কাছে কিছুই গোপন করিবার নাই, ইহাতে আমি প্রাণ পাইয়াছি। কমলা কি জানিয়া, কি ভাবিয়া আত্মহত্যা করিল, তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আর বুঝিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই—কিন্তু ইহা নিশ্চয়, মৃত্যু যদি এমন করিয়া আমাদের দুই জীবনের এই কঠিন গ্রন্থি কাটিয়া না দিত, তবে শেষকালে আমরা দুজনে যে কোন্ দুর্গতির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইতাম, তাহা মনে করিলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়। মৃত্যুর গ্রাস হইতে একদিন যে সমস্যা অকস্মাৎ উঠিয়া আসিয়াছিল, মৃত্যুর গর্ভেই একদিন সেই সমস্যা তেম্‌নি অকস্মাৎ বিলীন হইয়া গেল!"

যোগেন্দ্র। কমলা যে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহা অসংশয়ে স্থির করিয়া বসিয়ো না। সে যাই হোক্, তোমার এদিক্‌টা ত পরিষ্কার হইয়া গেল, এখন নলিনাক্ষের কথা আমি ভাবিতেছি।

তাহার পরে যোগেন্দ্র নলিনাক্ষকে লইয়া পড়িল। কহিল, "আমি ওরকম লোকদের ভাল বুঝি না এবং যাহা বুঝি না, তাহা আমি পছন্দও করি না। কিন্তু অনেক লোকের অন্যরকম মতিই দেখি, তাহারা যাহা বোঝে না, তাহাই বেশি পছন্দ করে। তাই হেমের জন্য আমার যথেষ্ট ভয় আছে। যখন দেখিলাম, সে চা ছাড়িয়া দিয়াছে, মাছমাংসও খায় না, এমন কি, ঠাট্টা করিলে পূর্ব্বের মত তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া আসে না, বরং

মৃদুমন্দ হাসে, তখন বুঝিলাম, গতিক ভাল নয়। যাই হোক্, তোমাকে সহায় পাইলে তাহাকে উদ্ধার করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তাহাও আমি নিশ্চয় জানি— অতএব প্রস্তুত হও দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।”

রমেশ হাসিয়া কহিল—“আমি যদিও বীর-পুরুষ বলিয়া খ্যাত নই, তবু প্রস্তুত আছি।”

যোগেন্দ্র। রোস, আমার ক্রিষ্ট্মাসের ছুটিটা আসুক্।

রমেশ। সে ত দেরি আছে—ততক্ষণ আমি একলা অগ্রসর হই না কেন?

যোগেন্দ্র। না না, সেটি কোনোমতেই হইবে না। তোমাদের বিবাহটি আমিই ভাঙিয়াছিলাম, আমি নিজের হাতে তাহার প্রতিকার করিব। তুমি যে আগে-ভাগে গিয়, আমার এই শুভকার্য্যটি চুরি করিবে, সে আমি ঘটিতে দিব না। ছুটির ত আর দশদিন বাকি আছে।

রমেশ। “তবে ইতিমধ্যে আমি একবার—

যোগেন্দ্র। না না, সে সব আমি কিছু শুনিতে চাই না—এ দশদিন তুমি আমার এখানেই আছ! এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলা লোক ছিল, সব আমি একটি একটি করিয়া শেষ করিয়াছি—এখন মুখের তার বদ্লাইবার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই। এতদিন সন্ধ্যাবেলায় কেবলি শেয়ালের ডাক শুনিয়া আসিয়াছি—এখন, এমন কি, তোমার কণ্ঠস্বরও আমার কাছে বীণাবিনিন্দিত বলিয়া মনে হইতেছে, আমার অবস্থা এতই শোচনীয়!

ক্রমশ।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তসঙ্কলন।

আমাদের ধনীদিগের যে দেশহিতকর বিষয়ে রুচি নাই, নতুবা তাঁহাদের অবগতির জন্য আমি একটি প্রস্তাব করিতাম। সে প্রস্তাবটি এই—যেমন স্বর্গীয় জে. এন্. তাতা মহোদয় একটি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য অনেক-লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, যেমন তাঁহাদ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি ‘রিসার্চ স্কলার্শিপ’ স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি ধনিগণ কয়েকজনে সমবেত হইয়া একটা মহৎ কার্য্য করুন। ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের জন্য তিনটি রিসার্চ স্কলার্শিপ স্থাপন করুন। প্রথমটির বৃত্তি মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির বৃত্তি মাসিক একশত টাকা করিয়া। এই তিন ব্যক্তি কি করিবেন? দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি, প্রথম ব্যক্তির অধীন থাকিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক দেশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিবেন। ইঁহাদের তিন-জনেরই সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতে অভিজ্ঞ

এবং বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ভাবজ্ঞ ও রসজ্ঞ লোক হওয়া চাই। ইঁহারা প্রত্যেক পাঁচবৎসর অন্তর আপনাদের গবেষণার ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন। আশা হয়, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর এইরূপ কার্য্য করিলে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেকপরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে।

আমরা সচরাচর এই বলিয়া দুঃখ করি যে, এদেশে বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। অলৌকিকঘটনাপূর্ণ পুরাণসকল ইতিবৃত্তের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সে সকল গ্রন্থে সত্য ও কল্পনা এরূপ প্রচুরমাত্রায় মিশ্রিত যে, সেই সকল বর্ণনাস্তূপের মধ্য হইতে সত্য উদ্ধার করা, নদীস্রোতধৌত বালুকারাশির মধ্য হইতে স্বর্ণরেণুসংগ্রহ অপেক্ষাও ক্লেশকর। এই এক মহাপ্রশ্ন পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদিত হয়, এই প্রাচ্যদেশবাসী আর্য্যসন্তানগণ পুরাবৃত্তরচনায় বিমুখ ছিলেন কেন? যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় বৃহৎকায় গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়নে যাঁহাদের কিছুমাত্র আলস্য ছিল না, এক এক শাখাপ্রশাখাসমন্বিত দর্শনের জটিল সমস্যাসকলের মধ্যে প্রবেশের ধৈর্য্য যাঁহাদের ছিল, সেই প্রাচীন হিন্দুগণ কেন আপনাদের দেশের ইতিবৃত্তরচনায় বিমুখ ছিলেন? ইঁহাদের আচরণের সহিত পাশ্চাত্য জাতিসকলের আচরণের কি পার্থক্য লক্ষিত হয়! তত্তদ্দেশে সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বকার ঘটনাসকল কেমন যথাযথরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। সে সকল বর্ণনার উপরে কেমন অসঙ্কোচে নির্ভর করিতে পারা যায়। এরূপ ইতিবৃত্তরচনাপ্রবৃত্তি কেন আমাদের দেশে লক্ষিত হয় নাই?

ইহার কারণ বোধ হয় জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে অন্বেষণ করিতে হইবে। ভারতবাসী আর্য্যদিগের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ইতিবৃত্তরচনার অনুকূল নহে। তাহা না হইলে এখানকার সাহিত্যে ইতিবৃত্ত দেখা দিতই দিত। অপর দিকে ইউরোপ-বাসীদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহা ইতিবৃত্তরচনার অনুকূল। এই প্রশ্ন হৃদয়ে লইয়া উভয় দেশের জাতীয় প্রকৃতির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, অন্তর্মুখীনতা বা ধ্যাননিষ্ঠতা ভারতীয়দিগের জাতীয় প্রকৃতি। বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা আমাদের প্রকৃতি ও শিক্ষাগত সংস্কার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎপরে এখানে অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অনাসক্তিধর্ম্মের প্রচার হইয়া আসিতেছে। এখানকার জ্ঞানিগণ ও ধর্ম্মার্থিগণ চিরদিন বাহিরের জগৎকে ভুলিয়া ভিতরেই শ্রেয়ের পথ অন্বেষণ করিয়াছেন। আমাদের অস্থিমজ্জাতে এই কথা আছে যে, জ্ঞানরাজ্যই সত্য রাজ্য, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, বহির্বিষয় ক্ষণিক ছায়ামাত্র। এইভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বভাবত বহির্জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। জগতের ধনধান্য কে কি পরিমাণে অধিকার করিল? হিন্দু রাজা কি যবননরপতি কে রাজসিংহাসনে বসিলেন, তাহাতে কি আসে যায়? জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করিয়া আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা কে কাড়িয়া লইতে পারে? এবং তাহা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ অন্য বিষয় থাকিল বা না থাকিল, তাহাতে কি?—

ইঁহাদের এইপ্রকার ভাব,—আমাদের দেশে প্রজাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল। প্রাচীন গ্রীকৃজ্ঞানী ডাইওজিনিসের বিষয়ে এরূপ উক্ত আছে যে, দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্‌জাণ্ডার যখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন, তখন দেখিলেন যে, সুধীবর একটি টবে বসিয়া রোদ পোহাইতেছেন। আলেক্‌জাণ্ডার সদলে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন; জ্ঞানী পুরুষের সেদিকে দৃষ্টিই নাই। অবশেষে আলেক্‌জাণ্ডার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে আপনার সাহায্য করিতে পারি? আমি কি করিলে আপনি প্রীত হন?" উত্তর—রোদের আড়াল না করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেই সুখী হই।" আমাদের নবদ্বীপের বুনো রামনাথের বিষয়েও এরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। বুনো রামনাথ বনে বৃক্ষতলে বসিয়া শিষ্যদিগকে পড়াইতেন; তাঁহার সামান্য কুটীরে তাহাদের জন্য স্থানসমাবেশ হইত না। একবার নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নৌকারোহণে নবদ্বীপপথে যাইতে যাইতে, রামনাথের পাণ্ডিত্যখ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, পণ্ডিতবর পাঠনাকার্য্যে নিমগ্ন। তাঁহার অর্থসাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু অনুপপত্তি আছে?" পণ্ডিত বুঝিলেন—ন্যায়ের অনুপপত্তির কথা বলিতেছেন। উত্তর—"কিছুই অনুপপত্তি নাই।" তৎপরে প্রশ্ন—"অভাব আছে?"—আবার ন্যায়ের অভাব আসিল। শেষে রাজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংসার চলে কিরূপে?" পণ্ডিতবর নিকটস্থ তেঁতুলবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"গৃহিণী ঐ তেঁতুলপাতার বেশ ঝোল করেন, আমাদের সুখেই আহার চলে।" ভারতীয় সুধীগণের, বিষয়ে এইপ্রকার অনাস্থার ভাব ছিল। Plain living and high thinking—ইহা যদি কোনও দেশে কখনও কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই ভারতবর্ষে।

সে যাহা হউক, যেজন্য এত কথার অবতারণা করিয়াছি, তাহা এই যে, বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা আমাদের অস্থিমাংসে প্রবিষ্ট হইয়া থাকাতে আমরা ইতিবৃত্তরচনায় মনোনিবেশ করি নাই, অর্থাৎ আমরা ধ্যানদ্বারা পরমার্থতত্ত্ব অধিগত করিবার চেষ্টা করিয়াছি; সাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নপর হইয়াছি; আত্মানাত্মবিবেকে নিমগ্ন হইয়া লৌকিক সুখদুঃখ ভুলিয়াছি; কে কবে জন্মিল, কে কবে মরিল, কোন্ রাজা সিংহাসনে বসিল, কোন্ যুদ্ধে কোন্ রাজা হারিল বা জিতিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় হয় নাই, আবশ্যকতাও বোধ করি নাই।

বোধ হয় ইহারও পশ্চাতে আর এক কারণ বিদ্যমান, তাহা এদেশের জলবায়ুর সাম্যাবস্থা। প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ এখানে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় না। একজন যোগী অনাবৃতদেহে প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে পারেন; আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। সুতরাং তিনি অবাধে বহির্জগতের প্রতি উদাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। এইরূপেই বোধ হয়

আমাদের বহির্জগতের প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়াছে।

প্রতীচ্যদেশে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ বিদ্যমান। সেখানে প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। একটু অসাবধান হইলেই শাস্তিভোগ করিতে হয়। বাটীর বাহির হইতে গেলেই দেহের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ রাখিতে হয়, নতুবা গুরুতর শাস্তি আসিয়া পড়ে। এই কারণে সে সকল দেশের লোকের পরিদর্শনবৃত্তি (faculty of observation) স্বতই প্রস্ফুটিত হয়। তাহা হইতেই তাহাদের ইতিবৃত্তরচনার অভ্যাস। এই কারণেই দেখি, সে সকল দেশের অধিকাংশ লোকের দৈনিকলিপি (Diary) রাখিবার অভ্যাস। সর্ব্বদাই সংবাদপত্রে শুনিতে পাই, অমুকের অপঘাতমৃত্যু ঘটিয়াছে; মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, পকেটে তাহার দৈনিকলিপি রহিয়াছে, তাহাতে এই এই বিষয়ের উল্লেখ আছে, ইত্যাদি। John Morley মহামতি Gladstone এর জীবনচরিত লিখিয়াছেন,—তাহার কত পৃষ্ঠা গ্লাড্‌ষ্টোনের দৈনিকলিপিদ্বারা পরিপূরিত! গ্লাড্‌ষ্টোন্ হইতে সামান্য শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলকেই দৈনিকলিপি রাখিতে হইবে! অতএব দেখিতেছি, ইতিবৃত্তরচনা ঐ সকল দেশের জাতীয় বাতিকের মধ্যে।

সে সকল দেশের সাধারণ মানুষের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদের পরিদর্শনবৃত্তি (faculty of observation) দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় একজন ভারতবর্ষীয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হইত না, তাহাও তাহারা উল্লেখ করিতেছে; ঘটনাবিশেষের দিনতারিখ, প্রকার-প্রণালী আনুপূর্ব্বিক যথাযথ নির্দ্দেশ করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, ইউরোপীয় জাতিসকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা সেমিটিক্‌ধর্ম্মের প্রভাবজাত। য়িহুদীজাতি সেমিটিক্‌জাতি এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম য়িহুদীজাতি হইতে উৎপন্ন। য়িহুদীধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম, উভয় ধর্ম্মই ইতিবৃত্তমূলক। জগতের বিভিন্ন জাতি ধর্ম্মভাবকে বিভিন্নভাবে সাধন করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণ ঈশ্বরকে অন্তরাত্মার পরমাত্মারূপে দর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের সাধন অন্তর্মুখীন, ধ্যানপ্রধান, ভাব ও তন্ময়তাময় হইয়াছে। গ্রীকগণ ঈশ্বরকে সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের মধ্যে শিল্প, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের শত শত ভাব ফুটিয়াছে। য়িহুদীগণ ঈশ্বরকে ইতিবৃত্তের মধ্যে, মানবজগতের উত্থানপতনের মধ্যে বিধাতারূপে দেখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের ধর্ম্মে ও তজ্জাত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে ঈশ্বর পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তা এবং নীতির রক্ষকরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। পাশ্চাত্যধর্ম্ম যে ভাবে ও যতদূর ইতিবৃত্তকে ধর্ম্মের সহিত জড়িত করিয়াছে, তাহা ভারতীয় আর্য্যদিগের চক্ষে অজ্ঞজনোচিত বলিয়া গৃহীত হয়। এদেশে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা ও গভীরতাই তাহার প্রধান লক্ষণ। এই দ্বিতীয়শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মতে ধর্ম্মের এই ইতিবৃত্তমূলকতা হইতেই পাশ্চাত্যদেশসকলের ইতিবৃত্তপ্রিয়তা উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা এ বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এ কথা সকলে স্বীকার করি যে, পাশ্চাত্যরাজ্যে ইতিবৃত্ত রাখিবার যে প্রবৃত্তি দেখা গিয়াছে, আমাদের এই প্রাচ্যদেশে সে প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে কি আমরা এদেশে ইতিবৃত্তসঙ্কলনবিষয়ে একেবারে নিরাশ হইব? তাহা কেন? দেশের আসল ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের অনেক উপাদান আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। আসল ইতিবৃত্ত এইজন্য বলিতেছি যে, সচরাচর জগতে ইতিবৃত্তনামে যাহা পরিচিত, তাহার মধ্যে অল্পই আসল ইতিবৃত্ত আছে। অদ্য পর্য্যন্ত ইতিবৃত্তনামে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ রাজাদের উত্থান ও পতন, জাতিদ্বয়ের বিদ্রোহ বা অন্তর্বিপ্লব প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। তাহাদের অধিকাংশ পাঠ করিলে মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের গূঢ় নিয়মসকল ধরিতে পারা যায় না। অথচ যে ইতিবৃত্ত সেই সকল গূঢ়তত্ত্বের আভাস না দেয়, তাহা প্রকৃত ইতিবৃত্তের কাজ করে না। যেমন কোন বেগবতী স্রোতস্বতীর বক্ষে কখনও বা সিকতাময় পুলিন প্রকাশ পায়, কখনও বা আবার গ্রামজনপদ প্রভৃতি ভগ্ন হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যায়,—এই যে ভাঙা ও গড়া, ইহা কোন আকস্মিক কারণে ঘটে না, জলরাশির গতি অতি সূক্ষ্ম অথচ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মসকলের অধীন; তেমনি মানবসমাজের উত্থান ও পতন, জাতিসকলের গতি ও কার্য্য, এ সকলও অলক্ষিত অথচ অবিশ্রান্ত কার্য্যকারী নিয়মসকলের অধীন। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বিবর্ত্তনের ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনেও বিবর্ত্তন চলিতেছে। যে ইতিবৃত্ত সেই বিবর্ত্তন-ক্রিয়ার গতি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা emperlcism, কিন্তু science নহে; অর্থাৎ দাগরাজিমাত্র, গাঁথুনি নহে।

বর্ত্তমান সময়ে অগষ্ট কমট্, হার্বার্ট স্পেন্সার, বকল্ প্রভৃতি ইতিবৃত্তকে দাগরাজি হইতে তুলিয়া গাঁথুনিতে স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং আরও অনেক প্রতিভাশালী লেখক তাঁহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া ইতিবৃত্ত হইতে সমাজতত্ত্ব গাঁথিয়া তুলিতেছেন।

এই ত গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে ইতিবৃত্ত সমাজের বাহিরের জীবনে আবদ্ধ, সামাজিক জীবনের ভিতরের কথা আমাদের গোচর করে না, তাহা কি প্রকৃত ইতিবৃত্ত? দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, আমরা এক্ষণে প্রতিদিন সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি,—জাপানবাসিগণ রুশিয়ানদিগের উপরে জয়লাভ করিতেছে। যদি কেবল এই সকল যুদ্ধের তারিখ ও যুদ্ধের বিবরণ এবং হতাহতের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহাই কি জাপানের ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে? তাহা পাইয়াই কি আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইবে? কখনই না। কোন্ শক্তিতে জাপান এত অল্পকালের মধ্যে এত পৌরুষ লাভ করিল? কি কি সামাজিক কারণের সমাবেশ হইয়া এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল? কোন্ কোন্ ভাব, কোন্ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নরনারীর মনে কার্য্য করিতেছে? তাহাদের শিক্ষার প্রণালী কি? রাজনীতির প্রকার কি? সামাজিক

বিধিব্যবস্থা কি? এ সকল জানিবার জন্য কি আমাদের মন ব্যগ্র হয় না? যাহাতে সেই ভিতরকার জীবনের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বরং এ কথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না যে, বাহিরের জীবনের ঘটনাগুলি না বলিয়া যদি ভিতরের জীবনের বিষয়গুলি বলে, তাহা হইলে যেন প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলা হয়।

এখন আবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। ভারতবর্ষের যে ইতিবৃত্ত নাই, আমরা বলি, সে ঐ বাহিরের ইতিবৃত্ত। ভিতরের ইতিবৃত্ত স্তরে স্তরে গাঁথা রহিয়াছে। এখনও দেশের নানাস্থানে প্রস্তরফলকে, তাম্রশাসনে, বিলুপ্ত নগরসকলের ভগ্নাবশেষে ইতিবৃত্তের অনেক ঘটনা নিহিত রহিয়াছে, যাহা হইতে পুরাতত্ত্ববিদ্গণ গবেষণার দ্বারা প্রাচীন ইতিবৃত্তের অনেক কথা আবিষ্কার করিতেছেন। দগ্ধ, ভগ্ন, উৎসন্ন সারনাথতীর্থের সন্নিধানে কাশীর বিশ্বেশ্বরের তীর্থ, বুদ্ধগয়ার সন্নিকটে বিষ্ণুপদ, বহুসংখ্যক বৌদ্ধকীর্ত্তির মধ্যে জগন্নাথের শ্রীমন্দির, এ সকলে কি প্রকাশ করিতেছে? ইহাতে কি এই প্রকাশ করিতেছে না যে, এদেশে এমন যুগ আসিয়াছিল, যখন পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া হিন্দুকীর্ত্তি স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রধান হিন্দুতীর্থগুলি আর কিছুই নহে, বৌদ্ধধর্ম্মের উপরে হিন্দুধর্ম্মের জয়ঘোষণা মাত্র। আবার সেই কাশীতেই হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া তৎস্থানে মুসলমানমসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান। ইহাতে কি ইতিবৃত্তের কোনও ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে না?

এই যেমন একপ্রকারে ইতিবৃত্ত স্তরে স্তরে গাঁথা রহিয়াছে, তেমনি অপরদিকে প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন ইতিবৃত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাই উদ্ধার করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত রিসার্চ স্কলার্শিপের প্রস্তাব করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তি অতি প্রাচীনতম বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া, বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্যনাটকাদি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া প্রাচীন সামাজিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়সকল সংগ্রহ করিবেন; এবং প্রত্যেক পাঁচবৎসর পরে আপনাদের গবেষণার ফল সঙ্কলিত আকারে সাধারণের গোচর করিবেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ও অপরাপর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসকলও পাঠ করিতে হইবে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিপ্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিতেছি। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ নহি; এরূপ কোন প্রশ্ন লইয়া প্রাচীন সাহিত্য কখনও পাঠ করি নাই। যাঁহারা এইপ্রকার গবেষণায় এক্ষণে প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা আমি লইতে ইচ্ছুক নহি। আমি এসম্বন্ধে যাহা বলিব, তাহা দিঙ্মাত্রপ্রদর্শন বলিয়া জানিবেন; অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক পথ দেখাইয়া দেওয়া মাত্র,—যে পথে অগ্রসর হইলে যোগ্যতর ব্যক্তিরা প্রচুর ফললাভ করিতে পারেন।

আমি অগ্রেই বলিয়াছি, প্রাচীন-ইতিবৃত্তসংগ্রহার্থ বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি কিছুই বাদ দেওয়া হইবে না। প্রথম বেদ,—আমি বেদমন্ত্রসকলের বিস্তৃত

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি না, তবে এ কথা সকলেই জানেন যে, বেদমন্ত্রসকল যদিও দেবতাবিশেষের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল, তথাপি তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গবেষণার চক্ষে বিচার করিলে আদিম আর্য্যসমাজের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। সেই সকল বিষয়কে একত্র সম্বদ্ধ করিলে প্রাচীন সমাজের ভিতরকার অবস্থা অনেকপরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। তবে বেদমন্ত্রসম্বন্ধে এই একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগকে কোন এক বিশেষ যুগের লিখিত মনে করা যাইতে পারে না। তাহাতে অতি প্রাচীনতম কালের রচিত মন্ত্র আছে, আবার অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ের মন্ত্রও আছে। অর্থাৎ ঐ মন্ত্রসকলের সঙ্কলনকর্ত্তা সংগ্রহ করিবার সময় রচনাকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্কলন করেন নাই; কেবলমাত্র উপাস্যদেবতা ও মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছেন। তাহা হইলেও ভাষার তারতম্য ও ছন্দের রীতির বিভিন্নতা প্রভৃতির দ্বারা মন্ত্রসকলের কালের বিষয়েও কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, বেদমন্ত্রসকলের আলোচনাদ্বারা পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সে সমুদয়ের এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীনতম বেদ যে ঋগ্বেদ, তাহার মন্ত্রসকলের আলোচনাদ্বারা আমরা জানিতেছি যে, যে কালে এই সকল মন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতীয় আর্য্যসমাজে বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা, ধনার্জ্জন ও ধনের সুদ্‌গ্রহণ, যানবাহনাদির ব্যবহার, সমৃদ্ধিশালী নগরসকল স্থাপন ও বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি নাগরিক পাপের শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি সভ্যতার সকল লক্ষণ ফুটিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, এতটা জানিতে পারিলে কি সামাজিক ইতিবৃত্তের অনেকটা জানা হইল না? এইরূপে বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনার দ্বারাও অনেক সমাজতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে।

এমন কি, কাব্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া অনুসন্ধান করিলেও অনেক সামাজিক তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে। তাহারও দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাকবি কালিদাসের কালকে অবলম্বন করা যাউক। কিন্তু কালিদাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন?—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপ একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কালিদাস উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভাতে নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন। উক্ত নবরত্ন এই—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ ও মিহির। যাঁহার নামে সংবৎ প্রচলিত, সেই বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫৭বৎসরে মালবরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কালিদাস তাঁহার রাজ্যকালে রাজসভার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, কি বিক্রমাদিত্যনামধেয় অপর কোন রাজার রাজসভাতে ছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। কালিদাসের প্রাদুর্ভাবকালের বিষয়ে একটু চিন্তা করিবার কথা এইমাত্র আছে যে, পুরাতত্ত্ববিৎ কিল্‌হরন্

(Kielhorn) খ্রীষ্টীয় ৪৭২ সালে খোদিত কুমারগুপ্তনরপতির এক অনুশাসনপত্র হইতে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, কালিদাস তৎপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিবেন। কারণ ঐ অনুশাসনপত্রে ঋতুসংহারের একটি শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। তদ্ভিন্ন বুদ্ধগয়ার মহাশমনামক খোদিত পত্রে রঘুবংশের একটি শ্লোকের অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। ইহা যে খুব প্রত্যয়জনক প্রমাণ হইল, তাহা নহে। পরে দেখা যাইবে যে, যে কালে বৌদ্ধধর্ম্মের ম্লানতা হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কালিদাস সেই কালের মানুষ। তাহাও এই পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ঘটিয়াছিল।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' হইতে দেখাইতে যাইতেছি যে, এরূপ অনুমানের স্বপক্ষে কিছু যুক্তি আছে। পাঠক ভুলিবেন না, এ সকল দিঙ্মাত্রপ্রদর্শন মাত্র।

'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর প্রারম্ভেই দেখিতেছি, কবি শিবের আরাধনাপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় তিনচারি শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ম্লানতা হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইতে থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের এই ম্লানতার সমুদয় কারণ এখনও অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু এই কালের যে সকল বৌদ্ধ খোদিতলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বকার পালিভাষার পরিবর্ত্তে আবার সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে অবজ্ঞা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে আবার সমাদর প্রদর্শন করা হইতেছে। অপরদিকে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে যে, এই কালের মধ্যে কান্যকুব্জ প্রভৃতি প্রদেশে যে সকল নরপতি উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রাতে শিব ও শিবের বৃষ অঙ্কিত করিয়াছেন। শক, জাঠ, হূন প্রভৃতি জাতিসকল খ্রীষ্টাব্দের প্রথম হইতে ঐ অব্দের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের পশ্চিমপ্রদেশে রাজ্য করিয়াছিল। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ইহাদেরই বংশধরগণ বিস্তৃত হইয়া পঞ্জাব, দিল্লী, কান্যকুব্জ, রাজপুতানা, মালব প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সিন্ধুর পশ্চিমপারবর্ত্তী জাতিসকলের রাজগণ অগ্নি-উপাসনার সহিত শিবপূজাও অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নিজ নিজ মুদ্রাতে শিবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই শক, জাঠ, হূন প্রভৃতি জাতিগণ প্রকারান্তরিত শিবপূজা কি তাহাদের আদিভূমি সাইথিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আনিয়াছিল, অথবা ভারতবাসীদের সংস্পর্শ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল? এ বিচার পরিত্যাগ করিয়াও এ কথা অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর মধ্যে এদেশে হিন্দুধর্ম্মের যে পুনরভ্যুদয় হয়, শিবারাধনা তাহার প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং কান্যকুব্জ, দিল্লী, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ঐ পুনরভ্যুদিত হিন্দুধর্ম্মের ও তৎসম্বন্ধ শিবারাধনার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমন কি, এরূপ অনুমানও করা যায় যে, এই সকল প্রদেশের রাজগণ

সৈন্যদল প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বভাগস্থ দেশসকলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলোপ ও হিন্দুধর্ম্ম স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কালিদাস নিশ্চয় এই শিবারাধনার প্রবল প্রচারের সময় অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কালসম্বন্ধে পূর্ব্বকার অনুমানকে সমর্থন করিতেছে।

এই ত গেল শিবারাধনার সাক্ষ্য। তৎপরে 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'এর অপরাংশে অগ্রসর হওয়া যাক্। তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ পাইয়াছি শিবারাধনা; একটু অগ্রসর হইয়াই আর একটি লক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। সেটি নৈবেদ্যাদি লইয়া তীর্থে গিয়া দেবমন্দিরে ধরণা দেওয়া।

মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্ত যখন কণ্ব ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তখন কুলপতি কণ্বের শিষ্যদ্বয়ের সহিত তাঁহার দেখা হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কণ্ব আশ্রমে আছেন কি না?" তদুত্তরে শিষ্য বলিলেন—"তিনি স্বীয় কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার দিয়া শকুন্তলার বিঘ্নকারী দৈবের প্রশমন-উদ্দেশে সোমতীর্থে গমন করিয়াছেন।" শকুন্তলার কি বিঘ্ন, তাহা কবি খুলিয়া বলিতেছেন না। বোধ হয়, বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, যৌবন পূর্ণ হইতে চলিল, তথাপি অনুরূপ বর জুটিতেছে না, এই বিঘ্ন। এই বিঘ্ন দৈবের প্রতিকূলতাবশত উৎপন্ন হইতেছে; এবং সেই দৈবের প্রসন্নতাপাদনের জন্য সোমতীর্থে গিয়া ধরণা দেওয়া আবশ্যক। এ সোমতীর্থ বোধ হয় দ্বারকাপুরীস্থ সোমনাথতীর্থ হইবে। এই সকল উক্তিতে আমাদের চক্ষের সমক্ষে তৎকালপ্রচলিত যে ধর্ম্মের ছবি আনয়ন করিতেছে, তাহা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির ছবি নহে, কিন্তু এখনকার লৌকিক ধর্ম্মের অনুরূপ একটি ছবি। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, আমরা বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে যে আকারে দেখিতেছি, সে আকার ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালে তাহাতে বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

আর একটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ছবি আরও উজ্জ্বল হয়। দুষ্মন্তের জননী মৃগয়াবিহারী পুত্রের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, বিশেষ দিনে তাঁর উপবাসব্রতের পারণার দিন; তাঁহার ইচ্ছা যে, সেদিন পুত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকেন। দুষ্মন্তের পক্ষে ইহা শাপে বর হইল। তিনি নিজে না গিয়া জননীদের পুত্রস্থানীয় বিদূষককে পাঠাইলেন; তিনি নিরুদ্বেগে শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার সুবিধা পাইলেন।

এই যে উপবাসব্রত ও তাহার পারণা, ইহাও বর্ত্তমানপ্রচলিত ধর্ম্মকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এখনও হিন্দুমহিলাগণ ব্রত-উপবাস প্রভৃতি করিতেছেন।

তৎপরে ইহাও ভাবিতে হইবে যে, শাশ্বত ব্রহ্মচারী তপস্বী কণ্বের তপস্যাবলদ্বারাও শকুন্তলার বিঘ্ন দূর হইল না, তাঁহাকে দৈব প্রসন্ন করিবার জন্য সোমতীর্থে যাইতে হইল। কবির এ কথাটা মনে লাগে নাই, তাহাতেই প্রমাণ যে, দৈবের প্রতিকূলতানিবারণের জন্য তীর্থাদিতে ধরণা দিতে যাওয়া, তখন সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে এত প্রচলিত ছিল যে,

কবি কণ্বের আশ্রমে অনুপস্থিতির এই কারণটাকে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসযোগ্য কারণ মনে করিয়াছিলেন।

যাক্, তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মের ছবি ত এই। দেখা যাউক, সে সময়কার সামাজিক অবস্থার আর কি কি তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। শকুন্তলার বিঘ্নকারী দৈবের প্রশমনের জন্য কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিয়াছি, সেটা কি বিঘ্ন? অনুমান করিয়াছি যে, শকুন্তলা যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি অনুরূপ বর জুটিতেছে না, এই বিঘ্ন। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে, কবির বিবেচনায় কন্যার যৌবনপ্রাপ্তি হইয়াও বিবাহ না হওয়া এমন একটা দুঃখের কারণ যে, সেজন্য বিঘ্নকারী দৈবের আরোপ করিতে হয়! ইহাতেই প্রমাণ, কালিদাস যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে হিন্দুসমাজমধ্যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। আর এক ঘটনাদ্বারা ইহা সমর্থিত হইতেছে। দুষ্মন্ত যখন আশ্রমে গিয়া ঋষিকন্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন শকুন্তলার বিষয়ে অপর সখীদ্বয়কে এই প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কি চিরকৌমার্য্য ধারণ করিয়া ব্রতপরায়ণা থাকিবেন, অথবা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এই ব্রত ধারণ করিবেন?"—অর্থাৎ রাজার মনের ভাব এই—"ইনি যে এতদিন অবিবাহিতা আছেন, তাহার কারণ কি? ইঁহার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে কি না?" সখী উত্তর করিলেন, "মহাশয়, ধর্ম্মাচরণবিষয়েও ইঁহার স্বাধীনতা নাই; পিতার ইচ্ছা, ইঁহাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করা।" অর্থাৎ "এতদিন যে ইঁহার বিবাহ হয় নাই, তাহার উপরে ইঁহার হাত নাই, ধর্ম্মাচরণেও যখন ইঁহার স্বাধীনতা নাই, বিবাহবিষয়ে কি স্বাধীনতা থাকিবে? পিতার বিবাহ দিবার ইচ্ছা আছে, অনুরূপ বর জুটিলেই বিবাহ হইবে।"

এই উক্তিপ্রত্যুক্তির ভিতরে প্রবেশ করিলেও অনুভব করা যায় যে, নিশ্চয় সে সময়ে সমাজমধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, নতুবা বেচারি শকুন্তলার অবিবাহিতাবস্থা লইয়া এত কৈফিয়ৎতলব ও পক্ষসমর্থন চলিবে কেন?

ইহার পরেই আমরা আর একটি বিষয় দেখিতে পাইতেছি। কণ্বশিষ্য যখন সংবাদ দিলেন যে, কুলপতি আশ্রমে নাই, তিনি স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার দিয়া সোমতীর্থে গিয়াছেন, তখনি রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই দেখা করি?" এইটি একটু চিন্তা করিবার উপযুক্ত কথা। রাজা কিরূপে হঠাৎ একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন? ইহাতেই প্রমাণ, তখন নারীগণ অসঙ্কোচে পুরুষদিগের সহিত মিশিতে পারিতেন। সে বিষয়ে বাধা ছিল না। থাকিলে কবি রাজার মুখে আর এক উক্তি দিতেন; তাহা হইলে রাজা কণ্বশিষ্যকে বলিতেন,—"আচ্ছা, তবে আপনারা কুলপতিকে জানাইবেন যে, আমি আশ্রমের কুশল জানিতে আসিয়াছিলাম।" তৎপরে ঋষিকন্যারা রাজার সহিত প্রথম দর্শনের দিনেও একান্তে নিরুদ্বেগে বসিয়া যেরূপ সকল কথা ভাঙিয়া বলিতেছেন, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য। কেহ হয় ত বলিবেন,

তাঁহারা ঋষিকন্যা,—বনবাসিনী, তাঁহারা ভদ্র-সমাজের রীতি কি জানেন? অরণ্যচারী জনের অকপট সরলতা দেখাইবার জন্যই কবি এরূপ করিয়াছেন, এইখানেই ত কবির প্রতিভার বাহাদুরী। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কিন্তু এরূপ মনে করা যাইতে পারে না যে, কুলপতি কণ্বের শিক্ষার অধীনে থাকিয়াও তাঁহারা নারীধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞা ছিলেন। আগন্তুক পুরুষের সহিত কথা কহা যদি তৎকালে নারীধর্ম্মবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে কবি তাঁহাদের লাজুকতারক্ষার জন্য হয় ত আর একটু ঘুরাইয়া আবরণ দিয়া ও তাহা ভেদ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজসমীপে উপনীত করিতেন।

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সে সময়ে সে দেশে সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে নারীর অবরোধ ছিল না। অথচ রাজ-অবরোধের উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চম অঙ্কে যেখানে শকুন্তলা শার্ঙ্গরব ও গোতমীর সহিত দুষ্মন্তের সদনে উপস্থিত হইতেছেন, তখন অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া যাইতেছেন। এই সকলের একত্র যোগ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক নয় যে, সে সময়ে সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে নারীর অবরোধ ছিল না, নারীগণ অসঙ্কোচে পুরুষদিগের সহিত মিশিতেন; কিন্তু কোন প্রকাশ্যস্থানে যাইতে হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে অবগুণ্ঠনের দ্বারা আবৃত করিতেন। কিন্তু ধনিগৃহের নারীদের এ স্বাধীনতা ছিল না, সেখানে বহুবিবাহ ও নারীর অবরোধ, দু-ই বিরাজমান ছিল। ইহা মধ্যভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রথার কেমন অনুরূপ! ইহাতেই বোধ হয়, কালিদাসের উজ্জয়িনীর রাজসভার পারিষদ বলিয়া যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সত্য থাকিতে পারে।

নারীকুলের অবস্থাসূচক আরও কোন কোন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম—তৃতীয় অঙ্কে দেখিতেছি, বিরহকাতরা শকুন্তলা সখীদের পরামর্শে দুষ্মন্তকে প্রণয়পত্রী লিখিতে বসিতেছেন। ইহা কিছু নূতন নহে, আরও অনেক নাটকে নায়িকাদের প্রণয়লিপির উল্লেখ আছে। ইহাতেই প্রমাণ, সে সময়ে ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের অনেকে লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন। এখনও গুজরাটদেশে ও দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে লিখিবার ও পড়িবার রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের অনেকে পিতা বা শ্বশুর প্রভৃতির নিকট শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞা রমণীও পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ইংরাজিশিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। ইহা তাঁহাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। কালিদাসের উক্তিতেও তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

ইহার উপরে তখন সম্ভ্রান্তগৃহের রমণীগণ সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সুকুমার কলাতে শিক্ষিতা হইতেন। তাহার প্রমাণ, পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে দেখিতেছি, রাজা ও বিদূষক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুর হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি আসিতে লাগিল। তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিলেন যে, রাণী হংসপদিকা বর্ণপরিচয় করিতেছেন, অর্থাৎ সারেগামা সাধিতেছেন। রাণী এরূপ উচ্চস্বরে গাহিতেছেন যে, বাহির হইতে তাহা শোনা যাইতেছে!

ইহা রীতিবিরুদ্ধ হইলে কবি কখনই ইহা এরূপে সন্নিবেশিত করিতেন না।

তবে ত কালিদাসের কালের অনেক সামাজিক কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। প্রবন্ধটি বাড়িয়া চলিল; অতএব আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই অদ্যকার মত উপসংহার করিতেছি। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এইরূপ সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় রহিল। অবশিষ্ট বিষয়টি এই, ষষ্ঠ অঙ্কে যেখানে দুষ্মন্ত ধীবরের হস্তে অঙ্গুরীয়কটি পাইলেন, সেখানে দেখিতেছি যে, ধীবরকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্থ দিবামাত্র তাহার একজন বন্ধু প্রস্তাব করিতেছে—"চল ভাই, শুঁড়ির দোকানে যাই।" অথচ রাজার নানা অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, রাজসভার বর্ণনা রহিয়াছে, রাজপারিষদদিগের উল্লেখ রহিয়াছে, আমোদপ্রমোদের বর্ণনা রহিয়াছে, কোথাও সুরাপানের উল্লেখ নাই। ইহাতে এরূপ নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক নহে যে, কালিদাসের কালে সুরাপান কেবল নিম্ন-শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সম্ভ্রান্ত-সমাজে ছিল না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এপ্রকার আমোদকে ঘৃণা করিতেন। ইহাও বর্ত্তমান সময়ের সভ্যদেশসকলের প্রথার অনুরূপ।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

লক্ষ্মী-সরস্বতী।

অয়ি লক্ষ্মি! নিশারূপে ধীরে ধীরে আপনা বিকাশি'
উন্মুক্ত করিয়া রাখ অপরূপ তব রূপরাশি।
গগন-কুন্তলে তব তারকা জ্বলুক্ অগণন
শ্যামারণ্য-শাটীমাঝে খদ্যোতিকা দীপুক্ শোভন।
কৌমুদী-কন্দলী-নিভ-হস্তে শশী হৈম পদ্মফুল
বিশ্ব-হৃদি-কোকনদে রাখ লক্ষ্মি! চরণ রাতুল।
স্মিত-বিকশিত স্তব্ধ বিশ্ব তব করুক্ আরতি
রহুক্ জাগিয়া তব পূজামন্ত্রে প্রেমের ভারতী।

এ নিশা-লক্ষ্মীর পার্শ্বে দিবারূপে তুমি সরস্বতি!
বিকচ-প্রোচ্ছল তূর্ণ প্রকটিয়া তব পূর্ণজ্যোতি
এস মূর্ত্তিমতি এস! রবিদীপ্ত তব দিব্যভাল
ফুটাক্ নী-রব হতে রবাকীর্ণ বিশ্ব সুবিশাল।
রণঝনি' কর্ম্মতন্ত্রী তীব্র-কর-অঙ্গুলি-তাড়নে
মঞ্জুল গুঞ্জনে তব বিশ্ববীণা বাজুক্ সঘনে।
শুভ্র জ্ঞান-শতপত্র নিখিলহৃদয়ে হর্ষভরে
তব পদস্পর্শেস্পর্শে ফুটিত হউক থরে থরে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

দুই ঘটিকার সময় ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের দেওয়ানের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন :- আমার যাত্রাপথের ধারে, 'নৈজেতাবারে'-নামক একটি গ্রামে, আমার ব্যবহারের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি প্রস্তুত থাকিবে। সেখানে যাইতে হইলে, এখান হইতে ১১টা রাত্রে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আমি এখনি ছাড়িব বলিয়া স্থির করিলাম। আজ রাত্রেই সেইখানে গিয়া পৌঁছিব। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর যাত্রা করা -এবং প্রভাত পর্য্যন্ত গাড়িতেই নিদ্রা যাওয়া—ইহাই এখানকার প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না।

আমি যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ। পান্থশালার অধ্যক্ষ আমাকে দুই হাতে সেলাম করিতে লাগিল। নীরব যাচ্ঞা মুখে প্রকটিত করিয়া, তাম্রবর্ণ ভৃত্যবর্গ আমার গাড়ির সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে একটি নগ্নপ্রায় দরিদ্র বৃদ্ধা ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত পান্থশালাতেই, স্নানাগারের জলাধারে জল ভরিয়া রাখাই ইহাদের কাজ। ত্রিবঙ্কুরের রৌপ্যমুদ্রা, আজ এই সর্ব্বপ্রথম, এই সব লোকদিগকে আমি নিজহাতে বিতরণ করিলাম। এই ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি, মোটা-মোটা, ঝক্ঝকে গুটিকার মত। আমাদের বলদেরা, এই অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে, দুল্‌কি-চালে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, অপেক্ষাকৃত শাখাপল্লববহুল প্রদেশে—এমন কি, স্বকীয় উদ্ভিজ্জপ্রাচুর্য্যে সিংহলেরও সমকক্ষ—এরূপ একটি প্রদেশে উপনীত হইলাম। এই জঙ্গলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উচ্চ তালবৃক্ষের কাণ্ডগুলি গতকল্য পীতাভ ও শুষ্ক দেখিয়াছিলাম, আজ দেখি, এখানে প্রচুর পত্রভূষণে সুশোভিত। বড় বড় হরিৎ-শ্যামল শাখাপক্ষ বিস্তার করিয়া, নারিকেল-তরুপুঞ্জ আবার আবির্ভূত হইয়াছে। ভূতল পর্য্যন্ত শিকড়কুন্তল বিস্তার করিয়া, মার্গপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষগুলি আমাদের মাথার উপর ছত্রাকারে প্রসারিত। দেখিলে মনে হয়, এই প্রদেশটিতে তরুসমাচ্ছন্ন বিজনতা ও দুর্ভেদ্য জটিল অরণ্য ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু এখন এই ছায়াময় পথে অনেক লোকজন দেখা যাইতেছে। আমাদেরই মত, গরুর গাড়ি চড়িয়া কতকগুলি লোক যাইতেছে। গরুর পাল লইয়া রাখাল এবং দ্রব্যসামগ্রীভরা চুপ্‌ড়ি মাথায় করিয়া অগণ্য স্ত্রীলোক সারি-সারি চলিয়াছে।

ইতস্তত একএকটি ছোট্ট প্রস্তরমন্দির;—বহু পুরাতন—খিলান চ্যাপ্‌টা-পাথরে গঠিত;—ইহাদিগকে মিশরদেশীয় স্মৃতি-মন্দিরের ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হয়।

আবার, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে, মুসলমান ফকিরের একটি সমাধিস্তম্ভ; উহা শুধু বার্দ্ধক্যের বলে পূজাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। উহা টাট্‌কা ফুলের মালায় সজ্জিত। আর, একটি গজমুণ্ডধারী গণেশমূর্ত্তি দেখিলাম; সেঁউতি ও গোলাপের মালা গাঁথিয়া, কোন ভক্তজন উঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—অথবা আমার চক্ষেরই ভ্রম—রাস্তায় এতগুলি স্ত্রীলোক দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটিকেও দেখিতে ভাল নয়, অথচ পুরুষেরা অধিকাংশই দেখিতে সুন্দর। পুরুষের মুখে তাম্রবর্ণটি যেরূপ মানাইয়াছে, রমণীর মুখে সেরূপ মানায় নাই। পুরুষের ওষ্ঠস্থূলতা পুরুষের গোঁফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অনাবৃত ওষ্ঠের স্থূলতা আরও বেশি বলিয়া মনে হয়। যাহাদের দেহগঠন গ্রীশীয় রমণীমূর্ত্তির ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর—এরূপ কতকগুলি বালিকা ছাড়া প্রায় আর সকলেরই উদরদেশ অকালবৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, এমন কোন বস্ত্রাবরণও নাই, যাহাতে ঐ অধোলম্বিত উদর কোনপ্রকারে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে। উহারা নাক ফুঁড়িয়া সোনার নথ ও কান ফুঁড়িয়া কানবালা পরিয়া থাকে। কানবালাগুলি ওজনে এত ভারি যে, উহাতে কান একেবারে ঝুলিয়া পড়ে। তবে কিনা, উহারা 'পারিয়া'-রমণী; উচ্চশ্রেণীর মহিলারা মাল বোঝাই গরুর গাড়িতে কখনই যাতায়াত করে না। এই উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কিন্তু এখনও আমি দেখি নাই।

রাস্তায় এই মজুর-রমণীদিগের জন্য দূরান্তরে একএকটি বিরামস্থান স্থাপিত হইয়াছে। নিরেট পাথরের বেদী, উচ্চতায় এক-মানুষ-সমান,—এই বেদীর উপর উহারা নিজনিজ বোঝা নামাইয়া রাখে। তাহার পর, আবার যখন ঐ বোঝাগুলি মাথায় উঠাইয়া লয়, তখন তাহাদিগকে ভূমি পর্য্যন্ত আর মাথা নোয়াইতে হয় না।

চারিদিকে কি রমণীয় নিস্তব্ধতা! এই সকল বিহঙ্গনীড়বৎ তরুপ্রচ্ছন্ন বিরল গ্রামগুলির মধ্যে কি স্বর্গীয় প্রশান্তি!

একটি বটবৃক্ষের তলে, মহাদেবের একটি পুরাতন মূর্ত্তির সন্নিকটে, বেগ্‌নি-রঙের পরিচ্ছদ-পরা, শাদা লম্বাদাড়ি, ইরাণীর ন্যায় মুখশ্রী, একটি লোক শান্তভাবে বসিয়া কি-একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; ইনি একজন প্রধান-পাদ্রি—একজন সিরিয়াদেশীয় প্রধান-পাদ্রি! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণ্যের দেশে এ কি অদ্ভুত দৃশ্য!

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যে প্রায় পাঁচলক্ষ খৃষ্টানপ্রজার বসতি। এই সকল খৃষ্টানদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সময়ে এখানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করে, য়ুরোপ তখনও পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা 'সেণ্ট-টমাসে'র শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। সেণ্ট-টমাস্ প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ইহারা 'নেষ্টোরীয়'-সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, সিরিয়াদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবর এখানে পাদ্রি-প্রচারক পাঠাইয়া থাকে। অন্তত

ইহারা যে বহুপুরাতন, লোকপূজ্য মহৎ বংশ হইতে প্রসূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তা ছাড়া, রাজ্যের উত্তরপ্রদেশে কতকগুলি ইহুদিও আছে। 'জেরুসেলেমে'র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস হইবার পর, উহারা এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদিগকে কিংবা খৃষ্টানদিগকে কেহ কখন উৎপীড়ন করে নাই। কেন না, এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতসহিষ্ণুতা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান। এই স্থানটি মনুষ্যরক্তপাতে যে কখন কলুষিত হইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদের বলদেরা দুল্‌কি-চালে অনবরত চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সঙ্গে সিংহলের ন্যায় এখানকার বাতাসও গ্রীষ্মদেশসুলভ আর্দ্রতায় পূর্ণ হইল। কবোষ্ণ বৃষ্টিধারার পরমমিত্র নারিকেলবৃক্ষগুলি, অন্যান্য বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এখন, সুবৃহৎ-শাখাপক্ষ-বিস্তারিত অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলানমণ্ডপতলে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা পশ্চিমভারতের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের—মালাবার-উপকূলের শত-শত যোজন পর্য্যন্ত প্রসারিত। 'ঘাট'-পর্ব্বতমালার অনুবন্ধী ক্ষুদ্র গিরিসমূহের পাদদেশ দিয়া আমরা যতই চলিতেছি, ততই শৈলচূড়াসমূহে, শৈলবিলম্বিত অরণ্যে, ঝটিকাসঙ্কুল নিবিড় জলদজালে, অত্রত্য নভোমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

চারিঘণ্টা ধরিয়া অনবরত ঝাঁকানি খাইতেছি, তাহার সঙ্গে তালে-তালে বলদেরা দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। শুইয়া-শুইয়া আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন; আর সহ্য হয় না। কি করি, আমার এই শবাধারের সম্মুখস্থ রন্ধ্রপথ দিয়া গলিয়া বাহির হইলাম, এবং বাহকের পার্শ্বে, যুগকাষ্ঠ-আসনের উপর, বানরেরা যেভাবে বসে, সেইভাবে একটু বসিলাম। দিবালোক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এই সকল মেঘের মধ্যে, এই সকল তালগাছের মধ্যে, সন্ধ্যা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। মার্গস্থ বটবৃক্ষের হরিৎ-শ্যামল সুরঙ্গপথ আমাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, অরণ্যের মধ্যে, সন্ধ্যাছায়ায় কতকগুলি পদার্থ অতীব অদ্ভুত কিম্ভুত-কিমাকার বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন কতকগুলা শ্যমলকায় বিকটাকার গঠনহীন পশু, কখন বা একাকী নিঃসঙ্গ, কখন বা দলে দলে একত্র, অথবা পরস্পর উপর্য্যুপরি সমারূঢ় রহিয়াছে। এইগুলা শৈলস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু কি অদ্ভুত, বিচিত্র! এই শৈলস্তূপগুলি স্থূলচর্ম্মী পশুদিগের ন্যায় বর্ত্তুল ও তাহাদিগের চর্ম্মের ন্যায় মসৃণ ও চিক্‌চিকে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন কোনপ্রকার যোগবন্ধন নাই; প্রত্যেকেই যেন পৃথক্‌ভাবে এখানে অধিষ্ঠিত। কোন সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর, হতব্যক্তিদিগের দেহগুলি যেরূপ ভাবে থাকে, উহারা সেইরূপ নিষ্পেষিত, বিনিক্ষিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে, মোটামোটা গাছের ডাল, মোটামোটা গাছের শিকড়গুলা হস্তিশুণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।...যেন অত্রত্য প্রকৃতিদেবী স্বকীয় শৈশবদশায়, বিবিধ শৈশবচেষ্টার বিকাশকালে, নির্জ্জনে কোন জন্তুবিশেষের আকার

লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। যেন হস্তিমূর্ত্তির কল্পনা-অঙ্কুরটি বহুকাল হইতে এইখানে বিদ্যমান। এমন কি, বিধাতা যখন গোড়ায় এই শৈলগুলি নির্ম্মাণ করেন, তখনও বোধ হয় তাঁহার চিন্তার মধ্যে এই কল্পনাটি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল।

বাস্তবিকই মনে হয়, হস্তী কিংবা হস্তীর ভ্রূণনিচয় যেন এখানে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে, অরণ্যের অন্ধকার যতই ঘনাইয়া উঠিতেছে, ততই যেন এইরূপ সাদৃশ্য আমাদের মনে অধিকতররূপে প্রতিভাত হইতেছে;—আমাদের মনকে যেন একেবারে অধিকার করিয়া বসিতেছে।

এখন আটটা রাত্রি। ঝটিকা আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু জানি না, কি করিয়া সমস্ত আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। স্বচ্ছ আকাশ, তারাময়ী রজনী। ঝিল্লী ও শলভগণ উল্লাসভরে গান করিতেছে। কীটগণের হর্ষকোলাহলে সমস্ত তরুপল্লব অনুরণিত।

আমাদের সম্মুখে মশালের আলো দেখা যাইতেছে। তরুপল্লবের মধ্য দিয়া একদল লোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঢাকঢোল ও করতালের ধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত ঐকতান গান শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

ইহারা বরযাত্রীর দল;—বট ও তাল গাছের নীচে দিয়া মহাসমারোহে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন, রাজা কিংবা দেবতার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে:—সোনালি জরির লম্বা জামাজোড়া, মাথায় সোনার মুকুট।

ইহা একটি বিবাহের উৎসব; বর স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লইয়া, ধর্ম্মবিধি অনুসারে, রাস্তা দিয়া যাত্রা করিতেছে।

এখন এগারটা। আমার শকটের মধ্যেই আমি নিদ্রা গেলাম। আমার ভৃত্য শকটের একটা ক্ষুদ্র জান্‌লা খুলিয়া, হাত-লণ্ঠনের আলোয় একখানা পত্র আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল। সেই পত্রে ত্রিবঙ্কুররাজচিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত:—দুইটি হস্তী ও একটি সামুদ্রিক শঙ্খ। এক্ষণে আমরা 'নৈজতাবরে'-গ্রামে আছি। এই পত্রখানি দেওয়ানের নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি এই পত্রযোগে, মহারাজের পক্ষ হইতে, আমাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, আর গাড়ি প্রস্তুত আছে, এই কথা জানাইয়াছেন। দেশীয় শকট হইতে বাহির হইয়া, এই শোভন-সুন্দর ঝাঁকুনিহীন গাড়িতে উঠিলাম। আহ্লাদের বিষয়। দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাকে লইয়া দীর্ঘপদবিক্ষেপে দুল্‌কি-চালে চলিতেছে, ইহাতেই আমার আনন্দ। মহারাজের চিহ্নিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 'কোচোয়ান' স্বকীয় আসনে বসিয়া আছে;—তাহার দীর্ঘ চাপ্‌কান, জরির পাগ্‌ড়ি, অন্ধকারে ঝক্‌মক্ করিতেছে। পিছনের পায়দানে দুইজন চটুল সহিস্; উহারা গাড়ির আগে-আগে এইরূপ ভাবে দৌড়িয়া চলে, যেন উহাদের উড়িবার একজোড়া ডানা আছে। তা ছাড়া, পথের অগণ্য গরুর গাড়ি সরাইয়া দিবার জন্য উহারা কি ভয়ানক চীৎকার করে! একটা ছোট সিন্দুকের ভিতরে ক্রমাগত ঝাঁকানি খাইয়া, তাহার পর খোলা গাড়িতে তারা দেখিতে দেখিতে সারি-সারি তাল-

নারিকেলের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও দ্রুতগতি চলিতে কি উন্মাদক আনন্দ! রজনীর সুমধুর বায়ুরাশি ভেদ করিয়া, সমস্তক্ষণ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে আমরা যেন অফুরন্ত কোন একটি পরী-উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

আবার বাদ্যধ্বনি; আবার মশালের রক্তিম অনলশিখা। এত অধিক রাত্রি, আর এই ঘোর নিস্তব্ধ সময়, তবু এখনো আর এক-দল বরযাত্রী এই পথ দিয়া চলিয়াছে। এবার বরটি অশ্বারূঢ়। উহার জরির জামাজোড়া অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেশভূষায় বরটিকে রাজার মত দেখিতে হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় একটা। যে সকল তাল-বৃক্ষের পরস্পরবিজড়িত শাখাপক্ষপুঞ্জ আমাদের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ যেন তাহাদের গতিরোধ হইল। এটি অরণ্যের মধ্যস্থিত একটি ফাঁকা জমি। আমরা ক্রমে একটা পাকা-রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলাম।

মনে হইতেছে, যেন এই রাজপথটি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চন্দ্রহীন রাত্রে. গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, তারকারাজি যে শীতল-শান্ত ভস্মাভ আলোক বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আলোকে এই রাস্তাটি আলোকিত। যে সকল বাড়ী দিবসে ধব্‌ধবে শাদা দেখাইবার কথা, এই রাত্রিকালে তাহারা একটু যেন নীলাভ বলিয়া মনে হইতেছে। বারাণ্ডার উর্দ্ধে আর একটি তলা আছে, তাহাতে মিশ্রধরণের ছোট-ছোট থাম; এবং কৌণিক খিলানের আকারে, ত্রিপত্রের আকারে, ঝালোম্বের আকারে খুব ছোট-ছোট রন্ধ্র-গবাক্ষ। নীচে, রুদ্ধদ্বারের দুই পার্শ্বে, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেতের প্রবেশনিবারণার্থ সলিতা-বিশিষ্ট ছোট-ছোট প্রদীপ জোনাকির মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

কতকগুলি পরিচিত জীবজন্তু নিস্পন্দ-ভাবে সিঁড়ির ধাপের উপর শুইয়া আছে। উহাদের প্রতি কে-যেন-কি অনিষ্টাচরণ করিবে, এইরূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, উহারা যেন মানব-আবাসের যতদূর-সম্ভব নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।—গরু, ভ্যাড়া, ছাগল, ঘোড়া, এই সকল জীবজন্তু। আমাদের গমনকালে উহারা জাগিয়া উঠিল না। বালুকাময় রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ি চলিয়াছে। গাড়ির চাকার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এই সকল বাড়ী, নিদ্রিত পশুর পাল, নিস্পন্দ পদার্থসমূহ, যেন কোন দূরবর্ত্তী রং-মশাল-আলোকের আভার ন্যায়, একপ্রকার অস্পষ্ট নীল আলোকে পরিস্নাত।

আমাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঘের, একটা উত্তুঙ্গ তোরণ, শ্রেণীবদ্ধ লণ্ঠনের আলোকে দেখা যাইতেছে। এই তোরণের মধ্য দিয়া একটা বিস্তৃত জনশূন্য তরুবীথি সিধা চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উর্দ্ধে তাল-বৃক্ষাদি ও প্রাসাদের ছাদ, এবং দূরপ্রান্তে, তরুবীথির কেন্দ্রস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে, ব্রাহ্মণিক মন্দিরের চূড়াসকল দেখা যাইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইবার আমরা ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজধানী—প্রকৃত 'ত্রিবন্দ্রম'-নগরে প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে যেখানে নিদ্রিত-জীবজন্তু-সমাচ্ছন্ন নীলাভ রাজপথ দেখিয়াছিলাম, উহা ইহারই সংলগ্ন উপনগরমাত্র।...

আমি জানিতাম না, এই পুণ্য ঘেরের মধ্যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগেরই বাসাধিকার আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমার গাড়ি পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া, হঠাৎ ডানদিকে ফিরিল; আবার আমরা তরু-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলাম। আরো দূরে লইয়া-গিয়া, নানা রাস্তা অনুসরণ করিয়া, উপবনের অলিগলির মধ্য দিয়া, অবশেষে উদ্যানমধ্যস্থিত একটা সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু হায়! অট্টালিকার মুখশ্রীটি ভারতীয়-ধরণের নহে।

এইখানেই আমার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই, মহারাজার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যার-পর-নাই সাদর অভ্যর্থনা ও আতিথ্য বিতরিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার বাহ্য 'কাঠাম'টি—আতিথ্যের স্থানটি য়ুরোপীয়-ধরণের। বরাবর ইহাই আমার নিকট অসঙ্গত ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, এই পরমাশ্চর্য্য প্রাচীন হিন্দুস্থানের উদার হৃদয়ের ইহাই একটি মার্জ্জনীয় ত্রুটি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেডিয়ম্।

রন্‌জেন্-(Rontgen)-রশ্মির অদ্ভুত ধর্ম্মের কথা প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে হেন্‌রি বেকেরেল্ (Becquerel) ইউরেনিয়ম্ ও থরিয়ম্ নামক দুইটি মৌলিক ধাতবপদার্থের আরো বিস্ময়কর কার্য্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগৎকে চমকিত করিয়াছিলেন। সে আজ চারপাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ঐ-দু'টি ধাতুমিশ্র পদার্থ, কাষ্ঠ বা ধাতুময় কোন বাক্সের ভিতর আবদ্ধ করিয়া বেকেরেল্-সাহেব দেখাইয়াছিলেন,—রন্‌জেন্‌রশ্মি যেমন কতকগুলি অস্বচ্ছ পদার্থের বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হয়, থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়ম্‌ও সেই-প্রকার একজাতীয় রশ্মি বিকিরণ করিতে পারে। বাক্সের নাতিস্থূল কাষ্ঠ বা ধাতুফলক দ্বারা ঐ রশ্মি মোটেই অবরুদ্ধ হয় না।

রসায়নশাস্ত্রসম্মত ৭৫টি ভূতপদার্থের মধ্যে কেবল উপরোক্ত দু'টি-ধাতুমিশ্রিত পদার্থে ঐ বিশেষ ধর্ম্মের লক্ষণ দেখিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিলেন,—এই সর্ব্ববাধা-ভেদী অদ্ভুত রশ্মিবিকিরণশক্তি কেবল ঐ দু'টি ধাতুরই বিশেষ ধর্ম্ম। অবিমিশ্র থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়ম্ বড়ই দুর্ল্লভ সামগ্রী। আবিষ্কর্ত্তা বেকেরেল্‌সাহেব অনেক গবেষণার পর বলিলেন;- যদি কোন উপায়ে আমরা উক্ত ধাতুদ্বয়কে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করিতে পারি, তবে তাহাতে আমরা রন্‌জেন্-রশ্মিরই পূর্ণবিকাশ দেখিব। রশ্মিবিকিরণ-শক্তি থরিয়ম্ ও ইউরেনিয়মেরই বিশেষ ধর্ম্ম বটে।

এই আলোচনার কিছুদিন পরে পিচ্-

ব্লেণ্ডি-(Pitch-blende)-নামক ইউরেনিয়ম্‌মিশ্রিত একপ্রকার আকরিক পদার্থের রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য আবিষ্কৃত হওয়ায় অধ্যাপক বেকেরেলের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্লেষ করিলে পিচ্‌-ব্লেণ্ডিতে ইউরেনিয়ম্ তো অতি অল্পই পাওয়া যায়;—তবে পিচ্‌-ব্লেণ্ডি হইতে কিপ্রকারে বিশুদ্ধপ্রায় ইউরেনিয়ম্-বিচ্ছুরিত রশ্মি অপেক্ষাও প্রচুর রশ্মি বহির্গত হয়? রশ্মিনির্গমনকার্য্যে বিশুদ্ধপ্রায় ইউরেনিয়ম্ ও তাহারই যৌগিক পিচ্‌-ব্লেণ্ডির এই সামঞ্জস্য দেখিয়া, অধ্যাপক ক্যুরি (Curie) ও তাঁহার বিদুষী পত্নী পদার্থটি লইয়া কিছুদিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন; এবং শেষে ইউরেনিয়ম্ ব্যতীত আর কোন মৌলিকধাতুর মিশ্রণদ্বারা উহার রশ্মিবিকিরণশক্তির আধিক্য জন্মায় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। পিচ্‌-ব্লেণ্ডি-স্থিত ইউরেনিয়মে ক্যুরিদম্পতি এইপ্রকারে যে নূতন ধাতুর লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, এই সময়ে তাহাই রেডিয়ম্-(Radium)-নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ইহার পর এই নূতন ধাতুর বিষয় অধিক কিছু জানা যায় নাই। পদার্থটির গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, এবং তাহা হইতে রন্‌জেন্-রশ্মির অনুরূপ কোন একপ্রকার রশ্মি বিকিরিত হয়, কেবল ইহাই জানা ছিল। কিন্তু রসায়নবিদ্‌গণ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, পদার্থটির রশ্মিবিকিরণশক্তির মূলকারণ আবিষ্কারের জন্য অনেক পরীক্ষাদি চলিতেছিল। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ক্রুক্‌স্ (Crookes) দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে রেডিয়মের আরো কতকগুলি বিস্ময়কর ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছেন। এই সকল অদ্ভুতশক্তির মূলকারণ-আবিষ্কার দূরের কথা, পদার্থটির প্রত্যেক কার্য্যে পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অবাক্ হইয়া পড়িয়াছেন।

ক্রুক্‌স্‌সাহেব ব্যতীত অধ্যাপক রদার্‌ফোর্ড (Rutherford) ও সুপ্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ সার্ উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জে প্রমুখ আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আজকাল রেডিয়ম্ লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের সমবেত পরীক্ষায় জানা গিয়াছে,—এই অদ্ভুত পদার্থটি হইতে এত তাপ অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকে যে, তদ্দ্বারা তাহার সমান ওজনের বরফ অতি অল্পকালমধ্যে গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই অবিরাম তাপক্ষয়ের জন্য তাহার শক্তিভাণ্ডারের অণুমাত্র ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায় না। তা ছাড়া, কোন একটি বস্তুকে ক্ষণকালের জন্য রেডিয়মের সংস্পর্শে রাখিলে, সেটিকেও রেডিয়মের ন্যায় রশ্মিবিকিরণক্ষম হইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য এই রশ্মিবিকিরণক্ষমতা তাহার স্থায়ী ধর্ম্ম হয় না। এই রশ্মি ব্যতীত, রেডিয়মের আরো কয়েকটি রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিরই কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। কোনটি সেকেণ্ডে ১২০,০০০ মাইল বেগে এবং কেহ ঐ সময়ে ১৮০০০ হাজার মাইল ছুটিয়া পদার্থটি হইতে বাহির হইয়া পড়ে, স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ কোন বস্তুই রশ্মিপথ অবরুদ্ধ করিতে পারে না। ক্রুক্‌স্‌সাহেব অণুপ্রমাণ এককণা রেডিয়ম্ কিয়ৎকালের জন্য পকেটে রাখিয়াছিলেন,—তাহার কোন একপ্রকার

রশ্মি আমার স্থূলকাপড়ের বাধা ভেদ করিয়া গাত্রে ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছিল। রেডিয়ম্-রশ্মি ব্যাধিজীবাণুর (Bacilli) একটি প্রধান শত্রু। দুষ্টক্ষতে রশ্মিপাত করিলে যে রোগী শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে, কয়েকজন চিকিৎসক ইতোমধ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। যক্ষ্মারোগোৎপাদক জীবাণু রেডিয়ম্‌রশ্মিদ্বারা অতি সহজে বিনষ্ট হয় বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন এবং বিষয়টি লইয়া নাকি আজও পরীক্ষা চলিতেছে।

যাহা হউক, রেডিয়মের এই সকল বিশেষগুণ আলোচনার এখনও সময় আসে নাই বলিয়া মনে হয়; এখন ইহাদের সাধারণ ধর্ম্ম কি, দেখা যাউক। অধ্যাপক রদার্‌ফোর্ড ও সদির (Soddy) গবেষণায় এসম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গেছে। রদার্‌ফোর্ড বলেন, রেডিয়ম্ হইতে আমরা মোটামুটি যে তাপ ও বিদ্যুৎময় রশ্মির নির্গমন দেখি, সেটি প্রকৃতপক্ষে একজাতীয় রশ্মি নয়, উহা স্পষ্ট তিনজাতীয় রশ্মির সংমিশ্রণফল। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় রশ্মি রেডিয়মেরই সূক্ষ্মতম অংশের প্রক্ষেপ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। রদার্‌ফোর্ডসাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পদার্থটির অতিক্ষুদ্র অণুসকল কোন অজ্ঞাতকারণে বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়া মহাবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, এবং অণুর এই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই আমাদের নিকট একপ্রকার রশ্মি-আকারে প্রতিভাত হয়। রেডিয়মের এই আণবিক রশ্মির বেগ অত্যন্ত অধিক বটে, কিন্তু ইহা কোন বাধা ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারে না; যে-কোন পদার্থদ্বারা ইহার পথ রুদ্ধ করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়জাতীয় রশ্মিগুলিও প্রথমের ন্যায় রেডিয়ম্-কণাময় হইয়া বহির্গত হয়। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, দ্বিতীয়ের কণাগুলি প্রথমরশ্মিস্থ অণু অপেক্ষা অনেক ছোট। এইজন্য কোন জিনিষই এই দ্বিতীয় রশ্মিপথে বাধা উৎপাদন করিতে পারে না। এক-ইঞ্চি স্থূল লৌহ বা সীসফলক দ্বারা রশ্মিপথ অবরুদ্ধ কর, রেডিয়মের অতিসূক্ষ্ম দ্রুতগামী কণাসকল লৌহের মধ্য দিয়া অনায়াসে বাহির হইয়া চলিতে থাকিবে। গণনাদ্বারা জানা গিয়াছে, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে হাজারভাগ করিয়া তাহার এক ভাগ লইলে হাইড্রোজেন্-কণার আকার যত ক্ষুদ্র হয়, রেডিয়মের দ্বিতীয়রশ্মিস্থিত অণুগুলির আকার তাহা অপেক্ষা কোনক্রমে বৃহত্তর নয়।

তৃতীয়জাতীয় রেডিয়ম্‌রশ্মির বাধা-অতিক্রম-শক্তি আরো অদ্ভুত। প্রায় সাড়ে-তিন-ইঞ্চি স্থূল আলুমিনিয়ম্-ধাতুফলকের বাধা ভেদ করিয়া ইহারা অনায়াসে বহির্গত হইতে পারে। এই রশ্মিতে সম্ভবত রেডিয়ম্‌কণা নাই। সাধারণ আলোকরশ্মি যেমন ঈথরের কম্পনবিশেষদ্বারা উৎপন্ন হয়, এগুলিও সেইপ্রকার কোন ঈথর্‌কম্পনের ফল বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রন্‌জেন্‌রশ্মির সহিত ইহাদেরই কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

এই ত গেল তিনজাতীয় রেডিয়ম্-রশ্মি। এতদ্ব্যতীত পদার্থটি হইতে সর্ব্বদাই একপ্রকার বাষ্পীয় পদার্থ ও তাপের বিকিরণ হইয়া থাকে। এই অক্ষয় তাপ এবং পূর্ব্বোক্ত রশ্মিগুলির মূল কোথায়, আজও কোন পণ্ডিত নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন নাই। রেডিয়মের সকল কার্য্যই বৈজ্ঞানিকগণের

নিকট একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঠক অবশ্যই জানেন, রসায়নবিদ্‌গণ পরমাণুকে (Atoms) জড়পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন রেডিয়মের এক এক পরমাণু সহস্র সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া দুইজাতীর অদ্ভুত রশ্মি উৎপন্ন করিতেছে দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ মহা-গোলযোগে পড়িয়াছেন। অনেকে বলিতেছেন, আমরা জগতীস্থ সামগ্রীমাত্রকে যে কয়েকটি মৌলিক পদার্থে বিভাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছিলাম, এখন আর সে বিভাগ চলিবে না। মূলজিনিষ জগতে একটি। সেই এক মৌলিক পদার্থ হইতেই হাইড্রোজেন্‌-অক্সিজেন্‌ এবং লৌহস্বর্ণ প্রভৃতি তথা-কথিত মৌলিক পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল পদার্থমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া আবার সেই প্রাথমিক মৌলিক অবস্থায় উপনীত হইতেছে। রেডিয়ম্‌-রশ্মির সেই অতিসূক্ষ্ম অণু, পদার্থটির বিয়োগ-(Disintegration)-জাত উক্ত প্রাথমিক জড়োপাদান। সৃষ্টিকালীন যে এক মৌলিক উপাদান হইতে রেডিয়ম্‌ ও অপরাপর ভৌতিকপদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, এখন রেডিয়ম্‌ ধীরে ধীরে বিযুক্ত হইয়া সেই মৌলিক জড়শরীর পাইতেছে।

অধ্যাপক রদারফোর্ড ও সদির একটি আশ্চর্য্যজনক পরীক্ষার ফলে, জড়ের উৎপত্তি ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় উপরোক্ত অনুমানটির উপর আজকাল অনেকের আস্থা দেখা যাইতেছে। গত নবেম্বরমাসে অধ্যাপক সদি একটি কাচনলের ভিতর কিঞ্চিৎ রেডিয়ম্‌ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; পদার্থটির সূক্ষ্ম জড়-কণাময় রশ্মিগুলি জমাট বাঁধিয়া কিপ্রকার-গুণসম্পন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। রশ্মিস্থ পদার্থগুলি নলে জমিলে পর, সদিসাহেব রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে অণুমাত্র রেডিয়মের চিহ্ন দেখিতে পান নাই, তৎস্থলে হেলিয়ম্‌-(Helium)-নামক এক ভূতপদার্থের বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) দেখা গিয়াছিল। বর্ণচ্ছত্রপরীক্ষা পদার্থের গঠনোপাদান স্থির করিবার একটি অতি সূক্ষ্ম উপায়। স্তূপীকৃত কোন এক পদার্থে অপর পদার্থের অণুপ্রমাণ মিশ্রণ হইলে, ঐ যন্ত্রদ্বারা তাহার অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরা যায়। আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার প্রধান অবলম্বন সেই রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র দ্বারা রেডিয়ম্‌কণাকে অকস্মাৎ হেলিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আজ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় বিশ্বাস করিলে, ভূতপদার্থমাত্রেরই বিয়োগ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার ফল প্রচারিত হওয়ার পর, বৈজ্ঞানিকমহলে আর একটা কথা উঠিয়াছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, বিয়োগপ্রাপ্তিকালে কোন বিশেষ পদার্থের সকল অংশ একেবারে সেই মৌলিক জড়-কণায় পরিণত হয় না। প্রাথমিক জড়কণা ও তদ্গঠিত বিশেষ বিশেষ পদার্থের মধ্যে অনেকগুলি ক্রম আছে। তাই রেডিয়ম্‌ একবারে সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত না হইয়া, প্রথমে লঘুতর পদার্থ হেলিয়মে পরিণত হয়। তার পর ক্রমে সেই হেলিয়মই

আরো লঘুতর পদার্থপরম্পরার প্রাথমিক জড়কণায় চরমবিয়োগ লাভ করে। ভূতপদার্থের এই ক্রমিক পরিবর্ত্তনের কথা বড়ই অদ্ভুত। এখন মনে হইতেছে, অতিপ্রাচীন রসায়নবিৎ ও যাদুকরগণ (alchemists) লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য শত শত বৎসর বৃথা ব্যয় করেন নাই। স্পর্শমণির অস্তিত্ব এ জগতে অসম্ভব নয়।

এখন পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—পূর্ব্বে যে সকল পরীক্ষাদির কথা বলা হইয়াছে, সে ত কেবল রেডিয়ম্ লইয়া; কিন্তু ভূতপদার্থমাত্রই যে রেডিয়মের ন্যায় রূপান্তরগ্রহণক্ষম ও বিয়োগধর্ম্মী, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রুক্‌স্‌প্রমুখ রসায়নবিদ্‌গণ বলিতেছেন, বিয়োগ (Disintegration) কেবল রেডিয়মেরই একমাত্র ধর্ম্ম নয়। ইহার বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ, তাই ধরা পড়িয়া গেছে। অপর পদার্থের বিয়োগ অতি ধীরে ও নানা প্রাকৃতিক কার্য্যের জটিলতার ভিতর দিয়া হইতেছে, তাই আমরা সেগুলিকে হঠাৎ ধরিতে পারি না। কাচদণ্ডে যখন রেশমী বস্ত্র ঘষিয়া আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করি, তখন সেই কাচের উপাদানের ঠিক্ রেডিয়মের মতই বিয়োগ হয়, কিন্তু এই বিয়োগ খুব প্রত্যক্ষ নয়, তাই সেটা এ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। জলে-স্থলে, অগ্নিবিদ্যুতে, মেঘে-বৃষ্টিতে এই বিয়োগ নিয়তই চলিতেছে। তবে পরীক্ষাদ্বারা রেডিয়মের যে সকল অদ্ভুতধর্ম্মের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা পদার্থের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধীয় প্রচলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি যে কম্পিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যুগযুগান্তের সমবেত শ্রমে বৈজ্ঞানিকগণ যে ৭২টি মূলপদার্থের উপর আধুনিক বিশাল রসায়নশাস্ত্রকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান আবিষ্কার সেগুলিকে চূর্ণীকৃত করিয়া, শাস্ত্রটিকে শীঘ্রই একটি প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর বসাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।

আজকাল বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রমাত্রেই অবৈজ্ঞানিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় রেডিয়মের অনেক আজগুবি কথার আলোচনা দেখা যাইতেছে। যানপরিচালনকার্য্যে রেডিয়ম্‌কে কেহ কয়লার স্থানে বসাইতেছেন এবং কেহ বা আলোক-উৎপাদনব্যাপারে ইহাকে বিদ্যুতের স্থানে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ইঁহাদের এই সকল কল্পনার সাফল্য যে অসম্ভব, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে সেগুলি যে সুসাধ্য নয়, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ আমরা যেপ্রকার প্রতিদিনই সহস্রদিকে দেখিতে পাইতেছি, রেডিয়মের তাপ ও রশ্মিবিকিরণ সেইপ্রকার একটা শক্তির বিকাশ ব্যতীত তো আর কিছুই নয়। সৌরকিরণের বিপুল তাপ, বায়ুর প্রবল গতি প্রভৃতি প্রকৃতির সুলভ ও উদ্দাম শক্তিকে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান অতি অল্পই বশীভূত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই বৈজ্ঞানিকগণ রেডিয়মের শক্তিকে সুশৃঙ্খলিত করিয়া যে অনায়াসে ঘরের কাজ চালাইয়া লইবেন, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস হয় না।

অধ্যাপক রদারফোর্ড ও ক্রুক্‌স্‌সাহেবের গণনায় রেডিয়মের শক্তির পরিমাণ সম্প্রতি

জানা গিয়াছে। উক্ত অধ্যাপকদ্বয় দেখাইয়াছেন, কেবল একগ্রেন্-রেডিয়ম্-নিহিত শক্তিকে এক সঙ্গে কাজে লাগাইবার উপায় থাকিলে আমরা তদ্দ্বারা চৌদ্দহাজারমণ-ভারবিশিষ্ট কোন পদার্থকে অনায়াসে এক-মাইল উর্দ্ধে উঠাইতে পারিতাম। কণাপ্রমাণ রেডিয়মে এই বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে সত্য, কিন্তু উহাকে নিঃশেষে এককালীন কাজে লাগাইবার উপায় কই? গণনায় জানা গিয়াছে, রেডিয়মের বিয়োগ এত ধীরে হয় যে, উহার রতিপ্রমাণ-কণাস্থিত শক্তির বিকিরণ শেষ হইতে প্রায় ২০লক্ষ বৎসর লাগে। এই অতি ধীর শক্তিবিকিরণধর্ম্মকে কোন উপায়ে দ্রুত করিলেও পদার্থটির দুর্লভতা ইহার কার্য্যোপযোগিতার বিশেষ অন্তরায় হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। রেডিয়মের অস্তিত্ব এপর্য্যন্ত যে পিচ্-ব্লেণ্ডি-নামক আকরিক পদার্থে দেখা গিয়াছে, সেটা পৃথিবীতে খুব সুলভ নয়; বোহেমিয়া, করন্ওয়াল্ ও সাক্সনি প্রদেশের কেবল দুইএকটি স্থানে ইহার সামান্য সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। সুতরাং এই দুর্লভ সামগ্রী হইতে ততোধিক দুর্লভ রেডিয়মের উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা আমাদের গৃহকার্য্য সাধন করা কতদূর সহজ-সাধ্য হইবে, এখন পাঠক তাহা বিবেচনা করুন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রায় দেড়লক্ষমণ পিচ্-ব্লেণ্ডি হইতে কেবল অর্দ্ধ-সেরমাত্র রেডিয়মের উদ্ধার হয়, এবং প্রস্তুত করিতেও প্রায় এককোটি পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণোচিত চরিত্রগৌরবে লোকসমাজের সম্মুখে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজশিক্ষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তবে সেকালের ন্যায় একালেও তাঁহাকে ভারতবর্ষের লোকে বিনা বাক্যব্যয়ে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধাভরে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। তখন আর সভা করিয়া জনসমাজকে কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাড়না করিতে হইবে না।

সে দিন চলিয়া গিয়াছে। যে দিন, দারিদ্র্য নিরতিশয় লজ্জার ব্যাপার হইয়া ব্রাহ্মণকে জনসমাজে কুণ্ঠিত করিত না, সে দিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়া, একালের ব্রাহ্মণকেও অর্থোপার্জ্জনকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সংসারসংগ্রামে ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। এখন আর সহসা ব্রাহ্মণকেও তপস্যার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া প্রবুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা নাই। এখন বিদ্যা তাহার পুরাতন লক্ষ্মী বিস্মৃত হইয়াছে; সংযম তাহার পুরাতন বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; আত্মত্যাগ তাহার দীর্ঘ অনশনকে নির্ব্বাসিত করিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার

করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে! এখনও বিদ্যার অভাব হয় নাই; কিন্তু সে কেবল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যার অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর। এখনও সংযম সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই; কিন্তু সে কেবল পূর্ব্বসংস্কারলব্ধ সদ্বৃত্তিনিচয়কে কায়ক্লেশে সুসংযত করিয়া, আধুনিক আত্মম্ভরিতার অভিনব শিক্ষায় চক্ষুলজ্জাকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ততা। এখনও আত্মত্যাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই; কিন্তু সে কেবল ইহপরলোকের সম্পত্তির পরিবর্ত্তে ইহলোকের আত্মপ্রশংসালাভের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবার যত্নশীলতা। এখন আর সে দিন নাই। যে দিন নিজে বড় হইয়া, অপরকে বড় করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ জ্ঞানালোচনায় নিয়ত ব্যাপৃত ছিলেন; স্বয়ং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অপরকে সমুন্নত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন; সে দিন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। বন্যাস্রোত দূরে সরিয়া গেলে পল্লীপথ যেমন পূতিগন্ধময় ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া চলাচলের উপায় তিরোহিত করে, পূর্ব্বশিক্ষা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষের অবস্থাও তদনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে! এ সময়ে যিনি স্বদেশের কল্যাণকামনায় ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরাতন অধিকার পুনর্গ্রহণ করিবার জন্য সকাতরে আহ্বান করিতেছেন, তিনি ভারতভূমির সুযোগ্য সুসন্তান। তাঁহার "স্বদেশী সমাজের" প্রবন্ধ তাঁহার পরিণত পুণ্যজীবনের পরিপুষ্ট অমৃতফল। বিচারবিতণ্ডায় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ না করিয়া, জনসমাজ যাহাতে কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অগ্রসর হয়, তাহার জন্যই আয়োজন করা আবশ্যক। আলোচনায় সকল কথা সরস হয় না; সকল কথা সহসা বোধগম্য হয় না; বুঝিবার দোষে এবং বুঝাইবার দোষে অনেক কথাই অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল প্রতীয়মান অসঙ্গতির অন্তরালে হৃদ্গত প্রকৃত বক্তব্যের যে সুস্পষ্ট আভাস মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অদৃষ্ট হইয়াও অলৌকিক সৌন্দর্য্যে লোকচিত্ত মুগ্ধ করিয়া দেয়, তাহা ধরিয়াই গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার উপায় হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। কিন্তু অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণগণই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূলকারণ। তাঁহারা যে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া স্বদেশের অধঃপতন সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে; তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ। ইংরাজের মুখের এই সুমিষ্ট উপদেশ ভারতবর্ষের অধিকাংশ নরনারীকে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী করিয়া, ব্রাহ্মণের পক্ষে পুনরায় সমাজপতি হইবার পথে সযত্নে কণ্টকরোপণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন স্বদেশীসমাজ সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উন্নতিকামনায় যত্নশীল হইলেও, ব্রাহ্মণকে বিনা বিচারে সমাজপতি বলিয়া বরণ করিতে সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের এই কলঙ্ক কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ মানবজীবনের ক্রমোন্নতিলাভের যে সকল পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষের শিক্ষাগুরু হইয়া ইতিহাসে আপন

নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রথম সূত্র—"অথাতোঽধিকারঃ।" অথ—অতঃপর, অতঃ—এইজন্য, অধিকারবিচার। অধিকারবিচার না করিয়া, সকল শ্রেণীর নরনারীকে একইপ্রকার উপদেশে শিক্ষাদান করা অসম্ভব। আধুনিক বিদ্যালয়েও অধিকার-ভেদে শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। অধিকার যেমন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অধিকারীও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে সমুন্নত হইতে পারেন। ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাও সেইরূপ ছিল। গুণ এবং কর্ম্ম বিচার করিয়াই অধিকার নির্ণীত হইত। ইহার জন্যই জনসমাজ বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একালের ন্যায় সেকালেও, দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে ক্রমোন্নতি-লাভের চেষ্টা না করিয়া, একেবারেই সর্ব্বোচ্চ পদবী আক্রমণ করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহাকে অশিষ্ট আস্ফালনে কিছুমাত্র উত্তেজিত করিত না বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাস না থাকিলেও, ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে, অনধিকারীর মহোচ্চপদবীলাভের অশান্ত আগ্রহের প্রমাণপরম্পরার অভাব নাই। ব্রাহ্মণোচিত চিত্তসংযম লাভ না করিয়াই, ব্রাহ্মণোচিত সামাজিক পদগৌরব লাভের জন্য অনেকেই আগ্রহপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একালের ন্যায় সেকালেও অনধিকারচর্চ্চা নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। তাহার কথা সংস্কৃতসাহিত্যে নানা আখ্যায়িকার আবরণে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই চেষ্টা সকলদেশেই সমাজ-মন্দিরের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া থাকে; তজ্জন্য আচার্য্যগণকে অপরাধী করা যায় না। তাঁহাদের হস্তে রাজদণ্ড ন্যস্ত থাকিলে, তাঁহারা সমাজের কল্যাণকামনায় অপরাধীকে সমুচিত দণ্ডদান করিয়া শাসন করিতে পারিতেন। তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল—শিক্ষার সদুপদেশ। তাঁহারা কেবল উপদেশদানেই জনসমাজকে বুঝাইতেন,—উন্নতিলাভের প্রথম সূত্র—"অথাতোঽধিকারঃ।"

এই মূলসূত্র সংক্ষিপ্ত হইলেও, অসন্দিগ্ধ স্বল্পাক্ষরনিবদ্ধ বহুমূল্য উপদেশের আধার। যখন এই মূলসূত্র গ্রথিত হইয়াছিল, তখন জ্ঞানমাত্রেই 'বেদ'নামে অভিহিত হইত। তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর নরনারীর অধিকার ছিল; কেবল গুণকর্ম্মবিচারে এক এক শ্রেণীকে এক এক শ্রেণীর জ্ঞানানুশীলনের উপদেশ প্রদত্ত হইত। ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি তাহারই নিদর্শন বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহা অনাদি-অনন্ত-কাল হইতে বিশ্বসংসারে স্বপ্রকাশ হইয়া মানবের দর্শনগোচর হইবার জন্য অদ্যাপি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে। যখন যে বেদ মানবের দর্শনগোচর হইয়াছে, তখনই তাহা 'দৃষ্ট' বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনি ঋষিপদবাচ্য হইয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এইরূপে ঋষিপদবী লাভ করিয়া, সমাজশিক্ষক হইয়াছিলেন। বেদ যাঁহারা প্রচার করিতেন, তাঁহারা 'প্রোক্তা'নামে পরিচিত। তাঁহারাও ঋষিপদবাচ্য। 'দৃষ্ট' বেদ সর্ব্বত্র 'প্রোক্ত' হইয়া, জনসমাজের শিক্ষাদানের কার্য্যে ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ সেই পুণ্যব্রত গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণের পদগৌরব

প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য লোকে অধিকারলাভ না করিয়া, ব্রাহ্মণ হইবার উচ্চাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারিত না। একালের ন্যায় সেকালেও, জনসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াই ব্রাহ্মণকে অধঃপাতিত করিয়াছে; ব্রাহ্মণ জনসমাজকে অধঃপাতিত করেন নাই। বুঝিবার দোষে এবং বুঝাইবার দোষে ব্রাহ্মণের স্কন্ধে সকল অপরাধ ন্যস্ত করিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসনামধেয় যে সকল অভিনব গ্রন্থ রচিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক-কল্পনাপ্রসূত অলীক জল্পনাজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে!

ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়াই পরিচিত ছিল। অন্যথা অব্রাহ্মণের পক্ষে তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্বলাভের সম্ভাবনা থাকিত না। কালে ব্রাহ্মণত্ব জন্মগত অধিকারে পর্য্যবসিত হইবার জন্যই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত পতিতজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। জনসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাই তাহার প্রধান কারণ। জনসমাজ যখনই প্রকৃত ব্রাহ্মণ চাহিয়াছে, তখনই প্রকৃত ব্রহ্মতেজে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জনসমাজ যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ পাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কেবল প্রথারক্ষার্থ যজ্ঞসূত্রমাত্রকেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক করিয়া তুলিয়াছে, তখন হইতেই ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া স্বদেশের পূর্ব্বসৌভাগ্য বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন! জনসমাজ যদি আবার ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুরাতন অধিকার দান করিবার জন্য যথার্থই লালায়িত হয়, ব্রাহ্মণ আবার ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। জনসমাজ কি যথার্থই ব্রাহ্মণকে সকাতরে আহ্বান করিতেছে?

পৃথিবীর সকল পদার্থই প্রয়োজনের দিক্ দিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। যাহার প্রয়োজন নাই, সে কেবল প্রথারক্ষার জন্য অধিকদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। যাহার প্রয়োজন আছে, তাহাকে বাধ্য হইয়াই জনসমাজের সম্মুখে উপনীত হইতে হয়। ব্রাহ্মণের প্রয়োজন অনুভূত হইবামাত্র ব্রাহ্মণের অভ্যুদয় হইবে। কিন্তু যথার্থ প্রয়োজন অনুভূত হওয়া আবশ্যক। জনসমাজ আত্মোন্নতিসাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উদারচিত্তে আকুলকণ্ঠে আহ্বান না করিলে, সে প্রয়োজন কদাচ অনুভূত হইবে না। মৌখিক আমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাহার জন্য তপস্যার প্রয়োজন।

বর্ত্তমান জনসমাজ সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত; কিন্তু তপস্যা—সর্ব্বনাশ!—তাহা নিতান্ত পুরাতন, অনাবশ্যক আত্মবঞ্চনার বাহ্যাড়ম্বর। তাহা লইয়া কি হইবে? তপস্যাই যে ভারতবর্ষের সমুন্নতির মূল, তাহা নূতন করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। আমরা এখন তপস্যা বলিতে তপস্যার বাহ্যাড়ম্বরকেই প্রকৃতপদার্থ বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছি। সুতরাং তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা স্বাভাবিক। তপস্যা যে মানবপ্রকৃতির ক্রমোন্নতিসাধনের একমাত্র উপায়, সে কথা এখন আবার নূতন করিয়া বুঝিবার ও বুঝাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অভাবে ভারতবর্ষ কর্ণধারহীন উড়ুপের ন্যায় তরঙ্গসঙ্কুল অনন্ত সাগরে বিপর্য্যস্ত হইতেছে!

এই পতিতজাতির সমুন্নতিসাধন করিবার যোগ্যপাত্র কে? জনসমাজ ভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষকে সমুন্নতিসাধন করিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। ব্যক্তি-বিশেষ কেবল জনসমাজের মুখপাত্র; ব্যক্তি-বিশেষ জনসমাজকে পরিচালিত করিতে পারেন,—গঠন করিতে পারেন না। জন-সমাজের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইবার পথ না পাইয়া ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া যখন অকস্মাৎ পরিস্ফুট হয়, তখনই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া পূজা করিবার আড়ম্বর প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহা যে জনসমাজেরই হৃদয়-নিহিত অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফুট আর্ত্তনাদ, সে কথা কেহ বিচার করিয়া দেখে না। বর্ত্তমান জনসমাজের হৃদয়নিহিত কোনরূপ অব্যক্ত আর্ত্তনাদ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া থাকিলে, তাহা অবশ্যই একদিক্-না-একদিক্ দিয়া অচিরে ফুটিয়া বাহির হইবে।

আধুনিক সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে অব্যক্ত আর্ত্তনাদ স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জনসমাজের প্রথমস্তরের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। এই-শ্রেণীর সামাজিকগণের সাধারণ নাম শিক্ষিত-সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় কি চায়? বয়সের তারতম্য অনুসারে এই সম্প্রদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণীর বয়স হই-য়াছে;—প্রখর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসি-য়াছে। বিচারক, ব্যবহারাজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি বিবিধ পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিয়া, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীরমন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইঁহারা কি চান, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইঁহাদের পলিতকেশ অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যে ইঁহাদের হৃদ্গত প্রার্থনাকে চাপিয়া রাখিয়াছে; তথাপি মনে হয়, ইঁহারা সকলেই অল্পাধিক-মাত্রায় নিশ্চেষ্ট-নিশ্চল হইয়া বিশ্রামলাভার্থই সবিশেষ লালায়িত। দশের কথা এবং দেশের কথা ভাবিবার সময় থাকিলেও, দশের জন্য এবং দেশের জন্য খাটিবার উদ্যম অন্তর্হিত হই-য়াছে। এই শ্রেণীর শিক্ষিতসম্প্রদায় একরূপ উদাসীনের মতই অভ্যাসবশত দেশের কথার আলোচনা করিয়া থাকেন; প্রাণের সঙ্গে দেশের জন্য পরিশ্রম করিতে অসমর্থ। ইঁহারা সংসারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্বদেশীসমাজের সংস্কারসাধনে প্রয়োগ করিতে অসম্মত।

দ্বিতীয়শ্রেণীর শিক্ষিতসম্প্রদায় সম্প্রতি কার্য্যক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিয়া নানারূপে পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে ব্যতিব্যস্ত। রাও-সাহেব হইতে রাজা-বাহাদুর পর্য্যন্ত, নিতান্ত-পক্ষে যাহা-কিছু-একটা না হইলে আর শান্তি নাই। ইঁহারা প্রগল্ভ; না চান এমন বস্তু ভূভারতে দুর্লভ। সুতরাং ইঁহারা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে কি চান, তাহার আবিষ্কার-সাধন বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য ব্যাপার।

তৃতীয়শ্রেণী সবে-মাত্র সংসারদ্বারে দণ্ডায়মান; এখনও একপদ বিদ্যালয়ে, এক-পদ সংসারে; কখন আশা, কখন বা নিরাশায় দোদুল্যমান এই সকল শিক্ষিত যুবক কেবল বর্ষীয়ান্ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ধনমান উপার্জ্জনের সুখস্বপ্নেই বিভোর হইয়া রহিয়াছেন!

দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কি চায়, তাহা সর্ব্বাংশে নির্ণয় করা কঠিন হইলেও, একটি

বিষয়ে বিশেষ কোন সন্দেহের কারণ নাই। শিক্ষিতসম্প্রদায় কি চায়? অর্থ—অর্থ—অর্থ। তাহার জন্ত সমগ্রজীবনব্যাপী উচ্চশিক্ষাকেও প্রতিপদে ব্যর্থ করিতে প্রস্তুত! স্বদেশীসমাজের পুরাতন আদর্শ এতই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও অধিকাংশের কার্য্য ও বাক্যের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করা অসম্ভব। যে সৎসাহস মানুষকে প্রকৃতপথের চিন্তায় উৎসাহযুক্ত করিয়া, সুচিন্তিত সদুপদেশ নির্ভয়ে লোকসমাজে প্রচার করিবার শক্তিদান করে, সেই সৎসাহসের অভাবে সাহিত্যসেবক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ রচনাশ্রম নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ রচনা কেবল বাক্যজঞ্জাল পুঞ্জীকৃত করিতেছে। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, ইতিহাসে, ধর্ম্মতত্ত্বে বা বক্তৃতায় কেবল কথার বাহুল্য; সার কথা দুর্লভ। এই সকল কারণে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আশাভরসা লুপ্ত হইয়া যায়; অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে 'আশাহীনের' দলভুক্ত করিতে হয়।

তথাপি উষালোকের মত আশার তরুণকিরণ ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। এখনও তাহার আশা দীর্ঘরজনীর অবসানপ্রতীক্ষায় প্রভাতী গাহিয়া, নিদ্রাতুরকে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সহায়তা করিতেছে। সেই আশাই আশা। তাহাই শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হৃদগত গুপ্তবেদনার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

সকলেরই মূল্য আছে। আকর হইতে উত্তোলিত ধাতুপিণ্ডের সঙ্গে কত মূল্যহীন আবর্জ্জনা চিরসংযুক্ত থাকিলেও, তাহা যেমন মূল্যবান্ মূলধাতুকে মূল্যহীন করে না; সংস্কৃত হইবামাত্র সকল শ্রম সফল করিয়া দেয়;—বর্ত্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অবস্থাও সেইরূপ। তাঁহারা সকলেই আকরোত্তোলিত ধাতুপিণ্ড; সংস্কারের অভাবে ভালমন্দের সংমিশ্রণে আপাতত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিলেও, সংস্কৃত হইবামাত্র মূল্যবান্ হইবার আশা আছে। হাপরে না পোড়াইলে সংস্কারসাধনের উপায় নাই। বিদেশের যে সকল মূল্যহীন আবর্জ্জনা সর্ব্বাঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সযত্নে দগ্ধ করা আবশ্যক। বাহিরের আবর্জ্জনা দগ্ধ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। ভিতরের আবর্জ্জনায় এখনও অগ্নি সংযুক্ত হইতে বিলম্ব আছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের চিত্তক্ষেত্র হইতে ভারতীয় ভাবপ্রসূন পদবিদলিত করিয়া, তাহার স্থলে বিদেশীয় কণ্টকবন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার পার্থক্য কোথায়, তাহা এখন বিস্মৃতপ্রায়। এখন প্রতীচ্যসভ্যতাই সভ্যতা বলিয়া স্বীকৃত;—তাহার তুলনায় প্রাচ্যসভ্যতা পুরাতন অসভ্যসমাজের সভ্যতালাভের প্রথম চেষ্টার অপরিপক্ক ফল বলিয়া উপেক্ষিত। তাহা যে স্বতন্ত্রশ্রেণীর পরিপক্ক সভ্যতা, সে কথা কেহ স্বীকার করিতে সম্মত হইবার পূর্ব্বে, বিচারবিতণ্ডায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, নীরস তর্কে পরিশ্রান্ত হইয়া থাকেন।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আদর্শ একরূপ হইতে পারে না। বাঙালী সাহেব নহে বলিয়া

যেমন বাঙালীজন্ম বিফল ভাবিয়া উদ্বন্ধনে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা মস্তিষ্কবিকারের প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে, প্রাচ্য প্রতীচ্য নহে বলিয়া হাহাকার করাও সেইরূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার মূলসূত্রেই প্রবল পার্থক্য। প্রাচ্যসভ্যতা সংযমকেই মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে; প্রতীচ্যসভ্যতা সম্ভোগকে তাহারও উর্দ্ধে আসনপ্রদান করিয়া থাকে। প্রতীচ্য কাড়িয়া খায়; প্রাচ্য বিলাইয়া দিয়াই আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। আমাদের প্রতীচ্যশিক্ষা আমাদিগকে কাড়িয়া খাইবার লালসা দান করিয়া অশান্ত করিতেছে; কাড়িয়া খাইবার মত বাহুবল ও স্বাধীনতা দিলে, আমরাও এতদিনে দানব হইয়া উঠিতাম।

আমাদিগের ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম, মানবের ক্রমোন্নতিলাভেই তাহা আত্মতৃপ্ত হইয়া সাফল্যলাভ করে। সে ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইলে, পরকে আপন করিতে হয়; ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে হয়; নরনারীর কল্যাণকামনায় আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে হয়। বাহুবলে প্রাচ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইতে পারে না। তাহা পাশবধর্ম্ম বলিয়াই পরিচিত। ব্রাহ্মণ মানবধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য সর্ব্বভূতের কল্যাণকামনায় দীর্ঘতপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন উদারনীতির উপদেশ বিতরণ করিতেন, তখন জনসমাজ তাহার মর্য্যাদারক্ষা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইতে পারিত। এখনও ব্রাহ্মণকে সমাজপতি করিলে, তাঁহার শাসন জনসমাজের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। তাহার পূর্ব্বে জনসমাজকে প্রাচ্যসভ্যতার মূলতত্ত্ব নূতন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেই সকল কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। ব্রাহ্মণের বাক্যপালনের জন্য জনসমাজকে সুশিক্ষিত করাও আবশ্যক। ব্রাহ্মণ পাদ্য-অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আসনে সুখোপবিষ্ট হইবামাত্রই তারস্বরে শ্রুতিপাঠ করিয়া কহিবেন—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব"; জনসমাজ তাহাতে কিছুমাত্র উপকার লাভ করিবে না। কৌতূহলবশত একবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে, পরক্ষণেই তাঁহার উপদেশবাক্য নিতান্ত অর্থহীন বলিয়া সমালোচনা করিতে করিতে গৃহকোটরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সাধুজীবন লাভ করিবার লালসা স্বাভাবিক হইলেও, সাধুজীবন লাভ করা আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তাহারই নাম তপস্যা। তাহার আরম্ভেই বিধিনিষেধের তীব্রতাড়না, তাহারই নাম সংযম। জনসমাজ কি সে তাড়না সহ্য করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে? ভারতবর্ষের বর্ত্তমান জনসমাজ নিতান্ত অচেতন অবস্থায় দিনপাত করিতেছে। চেতনা থাকিলে, ধিক্কারেই তাহাকে স্বদেশের দিকে আকর্ষণ করিতে পারিত। স্বদেশপ্রেমিক হওয়া দূরে থাকুক, আমরা সকলেই অল্লাধিকমাত্রায় স্বদেশদ্রোহী। যাহাতে ভারতবর্ষের কল্যাণ, তাহা আমাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না; যাহাতে তাহার সমূহ অকল্যাণ, তাহাই নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে!

কখন জ্ঞাতসারে, কখন বা অজ্ঞাতসারে, আমরা সকলেই তাহার সহায়তাসাধন করিতেছি।

ছাত্রজীবন ক্রমশ ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। গার্হস্থ্যজীবন গৃহস্থের প্রধান কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া ক্রমশ আত্মম্ভরী হইয়া উঠিতেছে; এই দুই আশ্রম ভিন্ন অন্য আশ্রম এক্ষণে অবলম্বিত হয় না। জনসমাজ আশ্রমচতুষ্টয়ের শিক্ষায় সমুন্নত হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মণ তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় এবং চতুর্থ আশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছে; প্রথম এবং দ্বিতীয় আশ্রম সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এখন প্রথম আশ্রমে বর্ত্তমান, একবার তাঁহাদের সংস্কারসাধনের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেই দেশের দুর্দ্দশা যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের হাব ভাব বিলাস ছাড়িয়া, নগ্নপদে গৈরিকবসনে ব্রহ্মচর্য্যের আত্মসংযমলাভার্থ সিগারেট্ ছাড়িয়া, হরীতকী গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না।

তথাপি "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়,"—সম্মুখে অগ্রসর হইবার অন্য পন্থা বিদ্যমান নাই। নিশিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম হইলেও, তাহার উপর দিয়াই গমন করিতে হইবে। যাঁহারা সেই পথের পরিচালক হইয়া, শিক্ষকনাম গ্রহণ করিয়া, ছাত্রজীবনের পথপ্রদর্শক হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র সুসংস্কৃত না হইলে, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্য্যে সুসংযত না হইলে, গার্হস্থ্যজীবন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবে না। জনসমাজ এইরূপে সংস্কৃত হইয়া না উঠিলে, ব্রাহ্মণ কদাপি স্বদেশীসমাজকে সমুন্নত করিতে সমর্থ হইবেন না। সময় আসিয়াছে কি না, এ বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করা অনাবশ্যক। সময় আসে না; তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। তাহার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। আর কত নিম্নে নিপতিত হইব? এখনও সময় না আসিয়া থাকিলে, তাহা কখনও আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। সময় আসিয়াছে। না আসিলে, ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠে এরূপ করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিত না! ব্রাহ্মণ নিদ্রিত স্বদেশীসমাজকে প্রবুদ্ধ হইবার জন্য শঙ্খনিনাদে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ কম্পিত করিয়া ডাকিয়াছেন। এখন জনসমাজের সাড়া দিবার সময়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। চিন্তাকে নিরোধ করিয়া মনকে প্রশান্ত করিলে কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রসাদেই তাহা সম্ভাবনীয়।" সংক্ষেপে এ যাহা বলা হইয়াছিল, ইহার ভিতরে দুইএকটি কথা আছে এরূপ, যাহার ভাবার্থের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে ভ্রম অনিবার্য্য। এই যে একটি কথা বলা হইয়াছিল যে, "সাক্ষাৎ-উপলব্ধি শুধু-কেবল চিন্তাদ্বারা সম্ভাবনীয় নহে", ইহার অর্থ এ নহে যে, সাক্ষাৎ-উপলব্ধির সঙ্গে চিন্তা'র কোনো সম্পর্কই নাই;—সম্পর্ক খুবই আছে—শতরকমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; তাহা যদি না থাকিবে, তবে চিন্তা-বেচারী সাক্ষাৎ-উপলব্ধির আঁচল ধরিয়া রাত্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইবেই বা কেন, আর, সাক্ষাৎ-উপলব্ধি হইতে দূরে পড়িলে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেই বা কেন? চিন্তা কিছু-আর সাক্ষাৎ-উপলব্ধির পর নহে; ঠিক্ তাহার বিপরীত। চিন্তা সাক্ষাৎ-উপলব্ধির স্নেহের ললনা। তুমি হয় তো বলিবে—"তবে কেন চিন্তা'কে নিরোধ করিতে বলিতেছ?" নিরোধ করিতে বলিতেছি এইজন্য—যেহেতু চিন্তা নিতান্তই চঞ্চলপ্রকৃতি বালিকা। একটি কচি মেয়ে যদি মাতার হস্তের অবলম্বন ছাড়িয়া-দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে যায়, তবে পার্শ্ববর্ত্তী হিতৈষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তিনি তদ্দণ্ডে মেয়েটিকে বলপূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া মাতৃক্রোড়ে সমর্পণ করেন। আমি তাই বলিতেছি যে, এলোমেলো পাগ্‌লী চিন্তাকে বিপথের কণ্টকবন হইতে বল-পূর্ব্বক টানিয়া-আনিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-উপলব্ধির ক্রোড়ে সমর্পণ করা শুভান্বেষী ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ইহারই নাম চিন্তাকে নিরোধ করা। চিন্তাকে রোধ করিলে চিন্তাকে বধ করা হয় না;—হয় কেবল চিন্তাকে বিপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনা; অমূলক কল্পনা এবং অসম্বদ্ধ জল্পনা'র পথ হইতে বাস্তবিক-সত্যের পথে ফিরাইয়া আনা। এই গেল চিত্ত-নিরোধ। এত-দ্ব্যতীত, বিগত প্রবন্ধে ঐ কথাটির লেজুড় টানিয়া আর-একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বালোচনা করিতে গেলেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আপনা-আপ্‌নি আসিয়া পড়ে; যেহেতু উভয়ে উভয়ের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওতপ্রোত।" তুমি হয় তো বলিবে যে, হইতেছে চিন্তা-নিরোধের কথা—মাঝে হইতে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের কথা আনিয়া তাহার গুরুভার ঐ ক্ষুদ্র বেচারিটির স্কন্ধে চাপাইয়া-দেওয়া হইতেছে কেন?

তাহা যদি বলো—তবে নিম্নে প্রণিধান কর :—

ছয়টি মন্তব্য কথা।

(১) সত্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য পাত্র তৈয়ারি করিতেছেন অনবরত।

(২) সে পাত্র মনুষ্য, বা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড।

(৩) সত্য আপনাকে আপনি যেরূপে প্রকাশ করেন, তাহাই সত্য।

(৪) সত্যের হস্ত হইতে টাট্‌কা-টাট্‌কি সত্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ;—ইহারি নাম সাক্ষাৎ-উপলব্ধি (intuition)।

(৫) তাহা না করিয়া (সত্যের হস্ত হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সত্যগ্রহণ না করিয়া) চিন্তা খাটাইয়া আপনার বলে সত্য গড়িয়া তুলিতে যাওয়া নিতান্তই পাগ্‌লামি। সেরূপে-গড়িয়া-তোলা সত্য একপ্রকার ব্যাসের কাশী অথবা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ।

(৬) অতএব চিন্তাকে থামাও—কল্পনাকে থামাও—যাহা-কিছু পড়িয়াছ-শুনিয়াছ, সব ভুলিয়া যাও—মনের সমস্ত সংস্কার ধুইয়া-পুঁছিয়া মন'কে ধব্‌ধবে পরিষ্কার কর—মন'কে নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত কর—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখা'র ন্যায় একাগ্র এবং স্থিরীভূত কর—সত্য আপনাকে আপনি কিরূপে প্রকাশ করেন, তাহারই প্রতি চাতকের ন্যায় চাহিয়া থাক। যাবৎ-পর্য্যন্ত সত্য আপনার বলে এবং আপনার ক্রমে প্রকাশিত না হ'ন—তাবৎপর্য্যন্ত তুমি কোনো কথা মুখে উচ্চারণ করিও না ; বলিও না যে, সত্য নিরাকার বা সত্য সাকার বা সত্য জ্যোতি বা সত্য অন্ধকার, ইত্যাদি। আপনার একটা পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার লইয়া সত্যের সম্মুখে আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না। সত্যকে আগে প্রকাশ পাইতে দাও ; স্বয়ং প্রকাশ পাইতে দাও ; তাহার পরে তৎসম্বন্ধে তোমার যাহা বলিবার, তাহা বলিও ; তাহার পূর্ব্বে কোনোপ্রকার পুঁথিগত বিদ্যা খরচ করিতে যাইও না—কোনোপ্রকার শেখা-কথা তোতাপাখীর মতো আওড়াইতে থাকিও না।

বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অবতারণা।

উপরি-উক্ত-রূপে চিন্তাকে নিরোধ করিলে, করা হয় একপ্রকার অতলস্পর্শ মহাসাগরে নিমজ্জন—অনাকাশ এবং অকালের মহাসাগরে নিমজ্জন। যেখানে পূর্ব্বপশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ, উপরনীচে নাই—ভূতভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান নাই—সেই অকূল মহাসাগরে নিমজ্জন। সেই অতলস্পর্শ গভীর অন্ধকারের মধ্য হইতে—প্রশান্ত নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে—যে-এক বিশ্ব-বিধরণী মহতী শক্তি—যে-এক অটল প্রতিষ্ঠা—যে-এক জ্ঞান—যে-এক জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, তাহাই তুমি সত্য বলিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ করিবে। তুমি হয় তো বলিবে—"বেজায় কল্পনা! ভূতগত কল্পনা! এক তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এই যে, আকাশ এবং কালের অতীত প্রদেশে কল্পনারই কেবল দৌড় চলে, তা ভিন্ন, কোনো মর্ত্ত্য জীবেরই সেখানে গতিবিধি নাই ; তাহাতে আবার, যদি বা কল্পনার কুহকে ভুলিয়া সমস্ত ভাবনা-চিন্তার পরপারে অপার শান্তির গন্ধর্ব্বনগর পত্তন করিবার আশা আমার মনোমধ্যে সঙ্কেজে

অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বাড়িয়া উঠিতে-না-উঠিতেই দুরন্ত কল্পনা প্রশান্ত অন্ধকারের মধ্য হইতে জ্যোতি জাগাইয়া-তুলিয়া আশা বেচারিটি'র মস্তকে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিল। রক্ষা এই যে, সে আশাও যেমন, আর সে বজ্রও তেমনি, দুইই বাতাস। বাতাসের অস্ত্রের চোট বাতাসের উপর দিয়াই ক্ষপিত হইয়া গিয়াছে—ভালই হইয়াছে; এখন তবে আমি বিদায় হই।" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "অত ব্যস্ত হইও না—একটু স্থির হও! স্বীকার করিলাম যে, যাহা-কিছু আমি বলিলাম, সমস্তই আগা-গোড়া নিছক কল্পনা। কিন্তু সুপ্তি এবং জাগরণ প্রত্যহ যাহা তোমার ঘটিতেছে, তাহা কি? তাহাও কি কল্পনা? প্রতি রজনীতে তুমি যে অগাধ প্রশান্তির সাগরগর্ভে তলাইয়া যাইতেছ, তাহাও কি কল্পনা? আবার, প্রাতঃকালে যে, সেই অন্ধকারের গর্ভ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে, তাহাও কি কল্পনা? দুয়ের কোনোটিই যদি কল্পনা না হয়, তবে যাহার জন্য এত সাধ্যসাধনা—সাগরে ডুব-দেওয়া-দিয়ি—তাহা হাতের কাছে অনাহূত আসিয়া উপস্থিত; কি? না, পরমাত্মার প্রকাশ—জাগ্রত-জীবন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই তো চিন্তা-নিরোধের কথা হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া নিরবচ্ছেদে সীধা চলিয়া বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের দ্বারোপান্তে আসিয়া পড়িলাম। এইখানে থামিয়া-দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত সাতটি বিষয় ক্রমান্বয়ে দ্রষ্টব্য:—

(১) অব্যক্তের অন্ধকারগর্ভ হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ দশদিকে ফাটিয়া পড়ে—এটা কবির কল্পনা নহে, পরন্তু প্রাত্যহিক ঘটনা।

(২) যদি কোনো কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবৃত্তান্ত মনে ভাবিতে যা'ন, তবে তিনি ঐ প্রাত্যহিক ঘটনাটিকেই অনির্দেশ্য অতীত-কালে চালাইয়া-দিয়া তাহার প্রতি কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রেরণ করেন; এবং তাহাকেই কাব্যালঙ্কার দিয়া মাত্রাতীত মহান্ এবং সুন্দর করিয়া সাজা'ন—তাহার অধিক কিছুই করেন না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রলয়ের অন্ধকার সুষুপ্তির অন্ধকার হইতে কোনো অংশে বেশীও নহে, কমও নহে। সুষুপ্তির অন্ধকারের মধ্য হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে আশ্চর্য্যময় প্রকাশ, এ প্রকাশ মান্ধাতার আমলেও যেমন ছিল এখনো তেমনি রহিয়াছে। পরিমাণঘটিত ছোটো-বড় এবং মাত্রাঘটিত কম-বেশীর কথা এখানে হইতেছে না। প্রকাশ জিনিস্‌টা কি এবং অপ্রকাশই বা জিনিস্‌টা কি, তাহাই এখানে একমাত্র দ্রষ্টব্য এবং একমাত্র বিবেচ্য।

(৩) বহুপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনো বলিতেছি যে, প্রকাশ এবং অপ্রকাশ পরস্পরের প্রতিযোগিতাগুণেই প্রকাশ এবং অপ্রকাশ। ছবিতোলা যন্ত্রের প্রথম উদ্যমের আতপাঙ্ক অন্ধকারের ঘোম্‌টা'র মধ্যে কেমন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়! ফট্‌ক্'টে আলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহা একেবারেই অপ্রকাশ হইয়া যায়। প্রকাশের কারণ তবে কি অন্ধকার বা অপ্রকাশ? ইহার উত্তর এই যে, আলোকও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে, অন্ধকারও প্রকাশের ষোলো-আনা কারণ নহে। প্রকাশের ষোলো-

আনা কারণ হ'চ্চে—আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগিতা। আলোক কেবল প্রকাশের আট-আনা কারণ; অন্ধকারও তাই।

(৪) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার প্রথম মুহূর্ত্তে দর্শকের চক্ষে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহাতে—(১) এপিটে প্রকাশ, (২) ওপিটে অপ্রকাশ, এবং (৩) দুয়ের মাঝখানে শক্তির সঙ্কোচ-বিকোচ বা স্পন্দন, এই তিনটি ব্যাপার গা-ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হয়। ওপিটের ঐ যে অপ্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম তমোগুণ, এপিটের এই যে প্রকাশ, তাহার শাস্ত্রীয়নাম সত্বগুণ; মাঝের সেই যে স্পন্দনক্রিয়া, তাহার শাস্ত্রীয়নাম রজোগুণ। তিন গুণের সবটা একসঙ্গে ধরিয়া ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি।

(৫) সমগ্র প্রকৃতিকে আমরা বলিতেছি—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ আমরা প্রতিজনে) সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত; এবং পরমাত্মা সেই বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সারসর্ব্বস্ব।

(৬) হংসশাবক যেমন অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তেমনি, ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড অচেতন-অন্ধকারের যবনিকা ভেদ করিয়া বাহির হইবামাত্র বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি উন্মুখ হয়। এরূপ যে হয়, তাহার কারণ কি? কারণ অতীব স্পষ্ট। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র—তাহা অভাবের আলয়; বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ—তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের যত-কিছু অভাব আছে—সমস্তেরই পূরণ হইতে পারে—পূরণ হওয়া চাই—এবং পূরণ হইতেছে অনবরত—বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের অক্ষয়ভাণ্ডার হইতে। কচি-ছেলের অভাব-মোচনের জন্য মাতৃক্রোড়ে যেমন সমস্ত ভোগসামগ্রী পূর্ব্ব হইতেই সাজানো রহিয়াছে—শয়নের শয্যা, ক্রীড়ার দোলা, হৃদয়ের স্নেহ, জ্ঞানের উন্মেষণী মাতৃভাষা, সমস্তই পূর্ব্ব হইতে সাজানো রহিয়াছে; ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের অভাবমোচনের জন্য বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডেও অবিকল সেইরূপ। কাজেই সূর্য্যমুখীফুলের ন্যায় ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশের প্রতি স্বভাবতই উন্মুখ।

(৭) আমাদের সুষুপ্তিকালে বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা একচুলও বিলুপ্ত হয় না—পরন্তু ষোলো-আনা মজুত থাকে। কিন্তু তৎকালে—না আমাদের সম্মুখে তাহা প্রতিভাত হয়, না আমাদের অন্তরে তাহা প্রতিভাত হয়। সুষুপ্তিকালে আমাদের আত্মসত্তাও অন্তরে প্রতিভাত হয় না এবং বহির্বস্তুর সত্তাও সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। নিদ্রাভঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ যে-মাত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখীন হয়, তৎক্ষণাৎ আমাদের বাহিরে এবং ভিতরে উভয়ত্র এপিট-ওপিট ভাবে—সমগ্র বিশ্বের বাস্তবিক সত্তা প্রকাশমান হইয়া উঠে। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ—ইহাকে যখন এক প্রকাশ, বা এক শক্তি, বা এক সত্তা বলিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করা যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় স্পষ্ট যে, সে-যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ, তাহা চেতনের নিকটে চেতনের প্রকাশ, আত্মার নিকটে আত্মার প্রকাশ, জীবাত্মার নিকটে পরমাত্মার প্রকাশ। যেহেতু প্রকৃতি এবং পরমাত্মার মধ্যে প্রাচীরের ব্যবধান নাই।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে, অনেক-গুলি প্রয়োজনীয় কথা এখনো বলিবার আছে ;—তাহা ক্রমশ প্রকাশ্য।

প্রথমে আমি বলিয়াছিলাম - "মন হইতে সমস্ত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া-দিয়া সত্যের হস্ত হইতে সত্য গ্রহণ কর—সত্যের সম্মুখে আপনি আড়াল হইয়া দাঁড়াইও না।" এটা আমি বলিয়াছিলাম শুদ্ধকেবল জমি প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া। ঐ সোজা কথাটির অর্থ কেহ যেন এরূপ না বোঝেন যে, মনের ঐরূপ সংস্কারশূন্য অবস্থার নামই সত্যের উপলব্ধি। তখনই বলিব সত্যের সাক্ষাৎ-উপলব্ধি হইল, যখন দেখিব যে, সেই তৈয়ারি-করা জমি'তে—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্ম্মল এবং প্রশান্ত অন্তঃকরণে—বাস্তবিকই সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটিল। তুমি হয় তো বলিবে এই যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মার প্রকাশ হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করে না ;—পরমাত্মার প্রকাশের সঙ্গে তুমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ জুড়িয়া দিতেছ, সেইটিই হ'চ্চে গোলোযোগের মূল। এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পরমাত্মা স্বয়ং যখন নির্ম্মলচিত্ত সাধকের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হ'ন, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকুক্ বা না থাকুক্—সাধকের তাহাতে কিছুই যায়-আসে না। তা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, পরমাত্মা আপনার প্রকাশ'কে দূরে সরাইয়া-রাখিয়া শুধুই কি আপনার সত্তামাত্র সাধকের অন্তঃকরণে উদ্বোধিত করেন, অথবা সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ, তিনই একযোগে উদ্বোধিত করেন ? অবশ্য বলিতে হইবে যে, পরমাত্মা সাধকের তৈয়ারি-করা জমিতে—নির্ম্মল অন্তঃকরণে—আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে আবির্ভূত হ'ন ; কেন না, পরমাত্মার সত্তামাত্র বিনা-সাধনেই লোকের মনে (মনুষ্য-মাত্রেরই মনে) পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত রহিয়াছে ; তাহার জন্য শিক্ষারও প্রয়োজন নাই —গুরূপদেশেরও প্রয়োজন নাই—যুক্তি-তর্কেরও প্রয়োজন নাই সাধনেরও প্রয়োজন নাই- চিত্তশুদ্ধিরও প্রয়োজন নাই। কাজেই বলিতে হয় যে, সযত্নে তৈয়ারি করা সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা আপনার সত্তা, শক্তি এবং প্রকাশ লইয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে আবির্ভূত হ'ন। তবেই হইতেছে যে, সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হ'ন ; যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নামই পরমাত্মার প্রকাশ এবং পরমাত্মার প্রকাশের নামই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, পরমাত্মা কি সাধকের অন্তঃকরণে নূতন কোনো-একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন—অথবা আবহমান-কালের এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—এই চিরন্তন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লইয়া প্রকাশিত হ'ন ? ইহার উত্তর এই যে, প্রত্যেক সাধকের জন্য নূতন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এক-তো বাড়া'র ভাগ, তা ছাড়া, একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক বই দুই হইতে পারে না। বেদের এ কথা খুবই সত্য যে, "স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ"—পরমাত্মার জ্ঞানক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে প্রকাশ—যাহা আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি—ইহাই পরমাত্মার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া"—ইহা ব্যতীত আর-একটা নূতন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা—যেমন ব্যাসের কাশী বা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ—নিতান্তই অস্বাভাবিক। ইহার বিরুদ্ধে তুমি হয় তো বলিবে যে, "এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতি ছার পদার্থ;—ইহা পরমাত্মার প্রকাশ নহে—ইহা পরমাত্মার আবরণ।" তাহা যদি বলো, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি এই যে, "আবরণ কাহার নিকটে? যাহার অন্তঃকরণ মোহ-কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণে আবৃত, তাহার নিকটে সবই আবরণ। পক্ষান্তরে, যাঁহার অন্তঃকরণ কুজ্ঝটিকামুক্ত, নির্ম্মল, স্থির এবং প্রশান্ত, তাঁহার নিকটে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ প্রকাশ পরমাত্মারই প্রকাশ। এইজন্য বলিতেছি যে, অন্তঃকরণ হইতে সমস্ত পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার এবং ভাবনা-চিন্তা দূরে সরাইয়া-দিয়া অন্তঃকরণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত কর, এবং এই অভাবপূর্ণ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড আপনার অভাবের পূরণকামনায় স্বভাবতই যে মাতৃমুখের প্রতি উন্মুখ হয়—সেই মাতৃমুখের দিকে—বিশ্বপ্রকাশের দিকে—সুবিমল মনো-দর্পণ বাগাইয়া ধর, তাহা হইলেই সেই এক প্রকাশেই—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশেই—পরমাত্মার সত্তা, শক্তি এবং জ্ঞান, তিনেরই যুগপৎ প্রকাশ হইবে।

এই যে কথাগুলি বলিলাম, ইহার ভিতরে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথা চাপাচুপি দেওয়া রহিয়াছে: সেগুলি ভাঙিয়া বলা আবশ্যক। বারান্তরে তাহার চেষ্টা দেখা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়োদারাজ গায়কবাড়।*

রাগিণী ভূপালি—তাল তেওরা।†

বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে!
জয় বড়োদারাজ হে!
শঙ্খ, বাজহ বাজ হে—
জয় নৃপোত্তম পুরুষসত্তম
জয় বড়োদারাজ হে!

ভাষিছে শুন বঙ্গবাণী
রাজদর্শন পুণ্য মানি—
এসহে নৃপ, এস হে,
ধন্য কর এ দেশ হে!

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়কীর্ত্তিসৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল,
নাশ ভারতলাজ হে!
রাজধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্মে
লোকহৃদয়ে রাজ' হে!

শঙ্খ, বাজহ, বাজ হে—
জয় নৃপোত্তম, পুরুষসত্তম
জয় বড়োদারাজ হে!

* বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনে বড়োদারাজ গায়কবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত।
† সর্ব্বত্র দীর্ঘহ্রস্ব রক্ষা করিয়া পড়িতে হইবে।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৫১

চন্দ্রমোহনের কাছে রমেশের খবর পাইয়া অক্ষয়ের মনে অনেকগুলা চিন্তার উদয় হইল। সে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কি? রমেশ গাজিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতেছিল—এতদিন নিজেকে যথেষ্ট গোপনেই রাখিয়াছিল—ইতিমধ্যে এমন কি ঘটিল, যাহাতে সে সেখানকার প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়া-দিয়া আবার সাহসপূর্ব্বক কলুটোলার গলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। অন্নদাবাবুরা যে কাশীতে আছেন, কোন্‌দিন রমেশ কোথা হইতে সে খবর পাইবে এবং নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া হাজির হইবে।" অক্ষয় স্থির করিল, ইতিমধ্যে গাজিপুরে গিয়া সে সমস্ত সংবাদ জানিবে এবং তাহার পর একবার কাশীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে গিয়া দেখা করিয়া আসিবে।

একদিন অগ্রহায়ণের অপরাহ্ণে অক্ষয় তাহার ব্যাগ হাতে করিয়া গাজিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু বলিয়া একটি বাঙালি উকিলের বাসা কোন্‌দিকে?"—অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাজারে রমেশবাবুনামক কোনো ব্যক্তির উকিল বলিয়া কোনো খ্যাতি নাই। তখন সে আদালতে গেল। আদালত তখন ভাঙিয়াছে। শাম্‌লা-পরা একটি বাঙালি উকিল গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী বলিয়া একটি নূতন বাঙালি উকিল গাজিপুরে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসা কোথায় জানেন?"

অক্ষয় ইঁহার কাছ হইতে খবর পাইল যে, 'রমেশ ত এতদিন খুড়ামশায়ের বাড়ীতেই ছিল, এখন সে সেখানে আছে, কি কোথাও গেছে, তাহা বলা যায় না। তাহার স্ত্রীকে পাওয়া যাইতেছে না, সম্ভবত তিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন।'

অক্ষয় খুড়ার বাড়ীতে যাত্রা করিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল, "এইবার রমেশের চালটা বুঝা যাইতেছে। স্ত্রী মারা গিয়াছে, এখন সে অসঙ্কোচে হেমনলিনীর কাছে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার স্ত্রী কোনোকালেই ছিল না। হেমনলিনীর

অবস্থা যেরূপ, তাহাতে রমেশের কথা অবিশ্বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে!" —যাহারা ধর্ম্মনীতি লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বেড়ায়, গোপনে তাহারা যে কি ভয়ানক লোক, অক্ষয় তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া নিজের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করিতে লাগিল।

খুড়ার কাছে গিয়া তাঁহাকে রমেশের ও কমলার কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "আপনি যখন রমেশবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমার মা কমলাকে নিশ্চয় আপনি আত্মীয়ের মতই জানেন; কিন্তু আমি এ কথা বলিতেছি, কয়েকদিনমাত্র তাঁহাকে দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দুদিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম!"

অক্ষয় মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "এমন ঘটনাটা যে কি করিয়া ঘটিল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই রমেশ কমলার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নাই।"

খুড়া। আপনি রাগ করিবেন না,—আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলাম না। এদিকে বাহিরে ত দিব্য লোকটি, কিন্তু মনের মধ্যে কি ভাবেন,—কি করেন, বুঝিবার জো নাই। নহিলে কমলার মত অমন স্ত্রীকে কি মনে করিয়া যে অনাদর করিতেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কমলা এমন সতী-লক্ষ্মী, আমার মেয়ের সঙ্গে তার আপন বোনের মত ভাব হইয়াছিল—তবু কখনো একদিনের জন্যও নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও কহে নাই। আমার মেয়ে মাঝে মাঝে বুঝিতে পারিত যে, সে মনের মধ্যে খুবই কষ্ট পাইতেছে, কিন্তু শেষদিন পর্য্যন্ত একটি কথা বলাইতে পারে নাই। এমন স্ত্রী যে কি অসহ্য কষ্ট পাইলে এমন কাজ করিতে পারে, তাহা ত আপনি বুঝিতেই পারেন, সে কথা মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়। আবার আমার এম্নি কপাল, আমি তখন এলাহাবাদে চলিয়া গিয়াছিলাম, নহিলে কি মা কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন!

পরদিন প্রাতে খুড়াকে লইয়া অক্ষয় রমেশের বাংলা ও গঙ্গার তীর ঘুরিয়া আসিল। ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া কহিল, "দেখুন মশায়, কমলা যে গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সম্বন্ধে আপনি যতটা নিঃসংশয় হইয়াছেন, আমি ততটা হইতে পারি নাই।"

খুড়া। আপনি কিরূপ মনে করেন?

অক্ষয়। আমার মনে হয়, তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন—তাঁহাকে ভালরূপ খোঁজ করা উচিত।

খুড়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "আপনি ঠিক বলিয়াছেন, কথাটা নিতান্তই অসম্ভব নহে।"

অক্ষয়। নিকটেই কাশীতীর্থ। সেখানে আমাদের একটি পরম বন্ধু আছেন—এমনো হইতে পারে, কমলা তাঁহাদের কাছে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

খুড়া আশান্বিত হইয়া কহিলেন, "কই,

তাঁহাদের কথা ত রমেশবাবু আমাদের কখনো বলেন নাই। যদি জানিতাম, তবে কি খোঁজ করিতে বাকি রাখিতাম?”

অক্ষয়। তবে একবার চলুন না, আমরা দুইজনেই কাশী যাই—পশ্চিম-অঞ্চল আপনার সমস্তই জানা-শোনা আছে, আপনি ভাল করিয়া খোঁজ করিতে পারিবেন।

খুড়া এ প্রস্তাবে উৎসাহের সহিত সম্মত হইলেন। অক্ষয় জানিত, তাহার কথা হেমনলিনী সহজে বিশ্বাস করিবে না, এইজন্য প্রামাণ্য-সাক্ষীর স্বরূপে খুড়াকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে গেল।

৫২

সহরের বাহিরে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের অধিকারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় অন্নদাবাবুরা একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন।

অন্নদাবাবুরা কাশীতে পৌঁছিয়াই খবর পাইলেন, নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমঙ্করীর সামান্য জরকাশী ক্রমে ন্যুমোনিয়াতে দাঁড়াইয়াছে। জ্বরের উপরেও এই শীতে তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

হেমনলিনী তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইল। তখন তাঁহার জ্বর অত্যন্ত বেশি, বুকে বেদনা, এবং মাঝে মাঝে বুদ্ধির ভুল হইতেছে। হেমকে দেখিয়া কহিলেন, “কে ও, বৌমা বুঝি, নলিনের খাওয়া হইয়াছে? যাও যাও, তাড়া কর!”

কয়েকদিন অশ্রান্তযত্নে হেম তাঁহার সেবা করার পর ক্ষেমঙ্করীর সঙ্কটের অবস্থা কাটিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাঁহার অতিশয় দুর্ব্বল অবস্থা। শুচিতা লইয়া অত্যন্ত বিচার করাতে পথ্যজলপ্রভৃতিসম্বন্ধে হেমনলিনীর সাহায্য তাঁহার কোনো কাজে লাগিল না। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বপাক আহার করিতেন, এখন নলিনাক্ষ স্বয়ং তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল এবং আহারসম্বন্ধে মাতার সমস্ত সেবা নলিনাক্ষকে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহাতে ক্ষেমঙ্করী সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমি ত গেলেই হ’ত, কেবল তোদের কষ্ট দিবার জন্যই আবার বিশ্বেশ্বর আমাকে বাঁচাইলেন।”

ক্ষেমঙ্করী নিজের সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চারিদিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্যবিন্যাসের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দৃষ্টি ছিল। হেমনলিনী সে কথা নলিনাক্ষের কাছ হইতে শুনিয়াছিল। এইজন্য সে বিশেষ যত্নে চারিদিক্ পরিপাটি করিয়া এবং ঘরদুয়ার সাজাইয়া রাখিত এবং নিজেও যত্ন করিয়া সাজিয়া ক্ষেমঙ্করীর কাছে আসিত। অন্নদা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে যে বাগান ভাড়া করিয়াছিলেন, সেখান হইতে প্রত্যহ ফুল তুলিয়া আনিয়া দিতেন, হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীর রোগশয্যার কাছে সেই ফুলগুলি নানারকম করিয়া সাজাইয়া রাখিত।

নলিনাক্ষ মাতার সেবার জন্য দাসী রাখিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল—কিন্তু তাহাদের হস্ত হইতে সেবাগ্রহণ করিতে কোনোমতেই তাঁহার অভিরুচি হইত না। অবশ্য, জলতোলা প্রভৃতির জন্য চাকর রাখিতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক্ কোনো চাকরের হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করিতে পারি-

তেন না। যে হরির মা ছেলেবেলায় তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল, সে মারা গিয়া অবধি অতিবড় রোগের সময়েও কোনো দাসীকে তিনি পাখা করিতে বা গায়ে হাত বুলাইতে দেন নাই।

সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড় ভালবাসিতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সারিয়া পথে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় একএকদিন কোথা হইতে হয় ত একটি সুন্দর খোট্টার ছেলেকে অথবা কোনো ফুট্‌ফুটে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যাকে বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। পাড়ার দুটিএকটি সুন্দর ছেলেকে তিনি খেলনা দিয়া, পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া বশ করিয়াছিলেন; তাহারা যখন-তখন তাঁহার বাড়ীর যেখানে সেখানে উপদ্রব করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; ইহাতে তিনি বড় আনন্দ পাইতেন। তাঁহার আর একটি বাতিক ছিল; ছোটোখাটো কোনো একটি সুন্দর জিনিষ দেখিলেই তিনি না কিনিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ সমস্ত তাঁহার নিজের কোনো কাজেই লাগিত না;—কিন্তু কোন্ জিনিষটি কে পাইলে খুসি হইবে, তাহা মনে করিয়া উপহার পাঠাইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। অনেকসময় তাঁহার দূর আত্মীয়পরিচিতেরাও এইরূপ একটা-কোনো জিনিষ ডাকযোগে পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। তাঁহার একটি বড় আবলুষ-কাঠের কালো সিন্ধুকের মধ্যে এইরূপ অনাবশ্যক সুন্দর সৌখীন জিনিষপত্র, রেশমের কাপড়চোপড় অনেক সঞ্চিত ছিল। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, নলিনের বৌ যখন আসিবে, তখন এগুলি সমস্ত তাহারই হইবে। নলিনের একটি পরমা সুন্দরী বালিকাবধূ তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—সে তাঁহার ঘর উজ্জ্বল করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—তাহাকে তিনি সাজাইতেছেন-পরাইতেছেন, এই সুখচিন্তায় তাঁহার অনেক দিনের অনেক অবসর কাটিয়াছে।

তিনি নিজে তপস্বিনীর মত ছিলেন,—স্নানাহ্নিকপূজায় প্রায় দিন কাটিয়া গেলে একবেলা ফলদুধমিষ্ট খাইয়া থাকিতেন, কিন্তু নিয়মসংযমে নলিনাক্ষের এতটা নিষ্ঠা তাঁহার ঠিক মনের মধ্যে ভাল লাগিত না। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের আবার অত আচারবিচারের বাড়াবাড়ি কেন?" পুরুষমানুষদিগকে তিনি বৃহৎবালকদের মত মনে করিতেন;—খাওয়াদাওয়া-চালচলনে উহাদের পরিমাণবোধ বা কর্ত্তব্যবোধ না থাকিলে সেটা যেন তিনি সস্নেহ প্রশ্রয়বুদ্ধির সহিত সঙ্গত মনে করিতেন—ক্ষমার সহিত বলিতেন, "পুরুষমানুষ কঠোরতা করিতে পারিবে কেন!" অবশ্য, ধর্ম্ম সকলকেই রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নহে, ইহাই তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন। নলিনাক্ষ যদি অন্যান্য সাধারণ-পুরুষের মত কিঞ্চিৎপরিমাণে অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী হইত, সতর্কতার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ এবং অসময়ে তাঁহাকে স্পর্শকরাটুকু বাঁচাইয়া চলিত, তাহা হইলে তিনি খুসিই হইতেন।

ব্যামো হইতে যখন সারিয়া উঠিলেন, ক্ষেমঙ্করী দেখিলেন, হেমনলিনী নলিনাক্ষের

উপদেশ অনুসারে নানাপ্রকার নিয়মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন কি, বৃদ্ধ অন্নদাবাবুও নলিনাক্ষের সকল কথা প্রবীণ গুরুবাক্যের মত বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অবধান করিয়া শুনিতেছেন।

ইহাতে ক্ষেমঙ্করীর অত্যন্ত কৌতুকবোধ হইল। তিনি একদিন হেমনলিনীকে ডাকিয়া হাসিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরো ক্ষ্যাপাইয়া তুলিবে। ওর ও সমস্ত পাগ্‌লামির কথা তোমরা শোনো কেন? তোমরা সাজগোজ করিয়া হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে,—তোমাদের কি এখন সাধন করিবার বয়স? যদি বল, তুমি কেন বরাবর এই সব লইয়া আছ? তার একটু কথা আছে। আমার বাপ-মা বড় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে আমরা ভাইবোনেরা এই সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি ত আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা ত সেরকম নও—তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা ত সমস্তই আমি জানি। তোমরা এ যা-কিছু করিতেছ, এ কেবল জোর করিয়া করিতেছ—তাহাতে লাভ কি মা! যে যাহা পাইয়াছে, সে তাহাই ভাল করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি ত এই বলি। না না, ও সব কিছু নয়—ও সমস্ত ছাড়। তোমাদের আবার নিরামিষ খাওয়া কি, যোগতপই বা কিসের! আর নলিনই বা এত-বড় গুরু হইয়া উঠিল কবে? ও এ সকলের কি জানে? ও ত সেদিন পর্য্যন্ত যা-খুসি-তাই করিয়া বেড়াইয়াছে, শাস্ত্রের কথা শুনিলে একেবারে মারমূর্ত্তি ধরিত। আমাকেই খুসি করিবার জন্য এই সমস্ত আরম্ভ করিল, শেষকালে দেখিতেছি, কোন্‌দিন পুরা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইবে। আমি ওকে বারবার করিয়া বলি, 'ছেলেবেলা হইতে তোর যা বিশ্বাস ছিল, তুই তাই লইয়াই থাক্,—সে ত মন্দ কিছু নয় আমি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।' শুনিয়া নলিন হাসে—ঐ ওর একটি স্বভাব—সকল কথাই চুপ করিয়া শুনিয়া যায়—গাল দিলেও উত্তর করে না।"

অপরাহ্ণে পাঁচটার পর হেমনলিনীর চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে এই সমস্ত আলোচনা চলিত। হেমের খোঁপা-বাঁধা ক্ষেমঙ্করীর পছন্দ হইত না। তিনি বলিতেন, "তুমি বুঝি মনে কর মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফেশান্ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি যতরকম চুলবাঁধা জানি, এত তোমরাও জান না বাছা। একটি বেশ ভাল মেম্ পাইয়াছিলাম, সে আমাকে সেলাই শেখাইতে আসিত, সেই সঙ্গে কতরকম চুলবাঁধাও শিখিয়াছিলাম। সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কি করিব মা, সংস্কার, উহার ভালমন্দ জানি না—না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমাদের লইয়াও যে এতটা ছুঁই-ছুঁই করি, কিছু মনে করিয়ো না মা। ওটা মনের ঘৃণা নয়—ও কেবল একটা অভ্যাস। নলিনদের বাড়ীতে যখন অন্যরূপ মত হইল, হিন্দুয়ানি ঘুচিয়া গেল, তখন ত আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, কোনো কথাই বলি নাই—আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি যে, যাহা ভাল বোঝ কর—আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, এত-

কাল যাহা করিয়া আসিলাম, তাহা ছাড়িতে পারিব না।"—বলিতে বলিতে ক্ষেমঙ্করী চোখের একফোঁটা জল তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

এম্‌নি করিয়া, হেমনলিনীর খোঁপা খুলিয়া-ফেলিয়া তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ লইয়া প্রত্যহ নূতন-নূতন-রকম বিনানি করিতে ক্ষেমঙ্করীর ভারি ভাল লাগিত। এমনো হইয়াছে, তিনি তাঁহার সেই আব্‌লুষকাঠের সিন্ধুক হইতে নিজের পছন্দসই-রঙের কাপড় বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়াছেন। মনের মত করিয়া সাজাইতে তাঁহার বড় আনন্দ। প্রায়ই প্রতিদিন হেমনলিনী তাহার সেলাই আনিয়া ক্ষেমঙ্করীর কাছে দেখাইয়া-লইয়া যাইত—ক্ষেমঙ্করী তাহাকে নূতন-নূতন রকমের সেলাইসম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এ সমস্তই তাঁহার সন্ধ্যার সময়কার কাজ ছিল। বাংলা মাসিকপত্র এবং গল্পের বই পড়িতেও উৎসাহ অল্প ছিল না। হেমনলিনীর কাছে যাহা-কিছু বই এবং কাগজ ছিল, সমস্তই সে ক্ষেমঙ্করীর কাছে আনিয়া দিয়াছিল। কোনো কোনো প্রবন্ধ ও বই সম্বন্ধে ক্ষেমঙ্করীর আলোচনা শুনিয়া হেম আশ্চর্য্য হইয়া যাইত—ইংরাজি না শিখিয়া যে এমন বুদ্ধিবিচারের সহিত চিন্তা করা যায়, হেমের তাহা ধারণাই ছিল না। নলিনাক্ষের মাতার কথাবার্ত্তা এবং সংস্কার-আচরণ সমস্তটা লইয়া হেমনলিনীর তাঁহাকে বড়ই আশ্চর্য্য স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল। সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই নয়, সমস্তই অপ্রত্যাশিত।

৫৩

ক্ষেমঙ্করী পুনর্ব্বার জ্বরে পড়িলেন। এবারকার জ্বর অল্পের উপর দিয়া কাটিয়া গেল। সকালবেলায় নলিনাক্ষ প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইবার সময় বলিল, "মা, তোমাকে কিছুকাল রোগীর নিয়মে থাকিতে হইবে। দুর্ব্বল শরীরের উপর কঠোরতা সহ্য হয় না।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "আমি রোগীর নিয়মে থাকিব, আর তুমিই যোগীর নিয়মে থাকিবে! নলিন, তোমার ও সমস্ত আর বেশিদিন চলিবে না। আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে এবার বিবাহ করিতেই হইবে।"

নলিনাক্ষ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "দেখ বাছা, আমার এ শরীর আর গড়িবে না—এখন তোমাকে আমি সংসারী দেখিয়া যাইতে পারিলে মনের সুখে মরিতে পারিব। আগে মনে করিতাম, একটি ছোট ফুট্‌ফুটে বৌ আমার ঘরে আসিবে, আমি তাহাকে নিজের হাতে শিখাইয়া-পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিব, তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া মনের সুখে থাকিব। কিন্তু এবার ব্যামোর সময় ভগবান্ আমাকে চৈতন্য দিয়াছেন। নিজের আয়ুর উপরে এতটা বিশ্বাস রাখা চলে না, আমি কবে আছি, কবে নাই, তার ঠিকানা কি। একটি ছোটো মেয়েকে তোমার ঘাড়ের উপর ফেলিয়া গেলে সে আরো বেশি মুস্কিল হইবে। তার চেয়ে তোমাদের নিজেদের মতে বড়-বয়সের মেয়েই বিবাহ কর। জ্বরের সময় এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার রাত্রে ঘুম হইত না। আমি বেশ বুঝিয়াছি, এই

আমার শেষ কাজ বাকি আছে—এইটি সম্পন্ন করিবার অপেক্ষাতেই আমাকে বাঁচিতে হইবে, নহিলে আমি শান্তি পাইব না।”

নলিনাক্ষ। আমাদের সঙ্গে মিশ খাইবে, এমন পাত্রী পাইব কোথায়?

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“আচ্ছা, সে আমি ঠিক করিয়া তোমাকে বলিব এখন—সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।”

আজ পর্য্যন্ত ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুর সম্মুখে বাহির হন নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে বেড়াইতে বেড়াইতে অন্নদাবাবু যখন নলিনাক্ষের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন—“আপনার মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—তাহার ’পরে আমার বড়ই স্নেহ পড়িয়াছে। আমার নলিনকে ত আপনারা জানেন, সে ছেলের কোনো দোষ কেহ দিতে পারিবে না—ডাক্তারিতেও তাহার বেশ নাম আছে। আপনার মেয়ের জন্য এমনতর সম্বন্ধ কি শীঘ্র খুঁজিয়া পাইবেন?”

অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“বলেন কি! এমনতর কথা আশা করিতেও আমার সাহস হয় নাই। নলিনাক্ষের সঙ্গে আমার মেয়ের যদি বিবাহ হয়, তবে তার অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে! কিন্তু তিনি কি—”

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“নলিন আপত্তি করিবে না। সে এখনকার ছেলেদের মত নয়, সে আমার কথা মানে। আর, এর মধ্যে পীড়াপীড়ির কথাই বা কি আছে! আপনার মেয়েটিকে পছন্দ না করিবে কে? কিন্তু এই কাজটি আমি অতি শীঘ্রই সারিতে চাই। আমার শরীরের গতিক আমি ভাল বুঝিতেছি না।”

সে রাত্রে অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হইয়া বাড়ীতে গেলেন। সেই রাত্রেই তিনি হেমনলিনীকে ডাকিয়া কহিলেন—“মা, আমার বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, আমার শরীরও ইদানীং ভাল চলিতেছে না। তোমার একটা স্থিতি না করিয়া যাইতে পারিলে আমার মনে সুখ নাই। হেম, আমার কাছে লজ্জা করিলে চলিবে না; তোমার মা নাই, এখন তোমার সমস্ত ভার আমারই উপরে।”

হেমনলিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, “মা, তোমার জন্য এমন একটি সম্বন্ধ আসিয়াছে যে, মনের আনন্দ আমি আর রাখিতে পারিতেছি না। আমার কেবলি ভয় হইতেছে, পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে। আজ নলিনাক্ষের মা নিজে আমাকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন।”

হেমনলিনী মুখ লাল করিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—“বাবা, তুমি কি বল! না না, এ কখনো হইতেই পারে না।”

নলিনাক্ষকে যে কখনো বিবাহ করা যাইতে পারে, এ সম্ভাবনার সন্দেহমাত্র হেমনলিনীর মাথায় আসে নাই—হঠাৎ পিতার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তাহাকে লজ্জায়-সঙ্কোচে অস্থির করিয়া তুলিল।

অন্নদাবাবু প্রশ্ন করিলেন, “কেন হইতে পারে না?”

হেমনলিনী কহিল, “নলিনাক্ষবাবু! এও

কি কখনো হয়!”—এরূপ উত্তরকে ঠিক যুক্তি বলা চলে না—কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা ইহা অনেকগুণে প্রবল।

হেম আর থাকিতে পারিল না—সে বারন্দায় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তিনি এরূপ বাধার কথা কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার ধারণা ছিল, নলিনাক্ষের সহিত বিবাহের প্রস্তাবে হেম মনে মনে খুসিই হইবে। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ বিষণ্ণমুখে কেরোসিনের আলোর দিকে চাহিয়া স্ত্রীপ্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য ও হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হেম অনেকক্ষণ বারান্দার অন্ধকারে বসিয়া রহিল। তাহার পরে ঘরের দিকে চাহিয়া তাহার পিতার নিতান্ত হতাশমুখের ভাব চোখে পড়িতেই তাহার মনে বাজিল। তাড়াতাড়ি তাহার পিতার চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে কহিল—“বাবা চল, অনেকক্ষণ খাবার দিয়াছে, খাবার ঠাণ্ডা হইয়া গেল।”

অন্নদাবাবু যন্ত্রচালিতবৎ উঠিয়া খাবারের জায়গায় গেলেন—কিন্তু ভাল করিয়া খাইতেই পারিলেন না। হেমনলিনীসম্বন্ধে সমস্ত দুর্যোগ কাটিয়া গেল মনে করিয়া তিনি বড়ই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু হেমনলিনীর দিক্ হইতেই যে এত-বড় ব্যাঘাত আসিল, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দমিয়া গেছেন। আবার তিনি ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে ভাবিলেন, “হেম তবে এখনো রমেশকে ভুলিতে পারে নাই।”

অন্যদিন আহারের পরেই অন্নদাবাবু শুইতে যাইতেন, আজ বারান্দায় ক্যাম্বিসের কেদারার উপরে বসিয়া বাড়ীর বাগানের সম্মুখবর্ত্তী ক্যান্টন্‌মেন্টের নির্জ্জন রাস্তার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। হেমনলিনী আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, “বাবা, এখানে বড় ঠাণ্ডা, শুইতে চল।”

অন্নদা কহিলেন, “তুমি শুইতে যাও, আমি একটু পরেই যাইতেছি।”

হেমনলিনী চুপ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার খানিক বাদেই কহিল, “বাবা, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতেছে, না হয় বসিবার ঘরেই চল।”

তখন অন্নদাবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কিছু না বলিয়া শুইতে গেলেন।

পাছে তাহার কর্ত্তব্যের ক্ষতি হয় বলিয়া হেমনলিনী রমেশের কথা মনে মনে আন্দোলন করিয়া নিজেকে পীড়িত হইতে দেয় না। এজন্য এপর্য্যন্ত সে নিজের সঙ্গে অনেক লড়াই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাহির হইতে যখন টান পড়ে, তখন ক্ষতস্থানের সমস্ত বেদনা জাগিয়া উঠে। হেমনলিনীর ভবিষ্যৎ জীবনটা যে কিভাবে চলিবে, তাহা এপর্য্যন্ত সে পরিষ্কার কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না—এই কারণেই একটা সুদৃঢ় কোনো অবলম্বন খুঁজিয়া অবশেষে নলিনাক্ষকে গুরু মানিয়া তাহার উপদেশ অনুসারে চলিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখনি বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে, তখনি সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কি কঠিন! তাহাকে কেহ ছিন্ন করিতে

আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।

৫৪

এদিকে ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি তোমার পাত্রী ঠিক করিয়াছি।"

নলিনাক্ষ একটু হাসিয়া কহিল, "একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছ?"

ক্ষেমঙ্করী। তা নয় ত কি? আমি কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব? তা শোন, আমি হেমনলিনীকেই পছন্দ করিয়াছি—অমন মেয়ে আর পাইব না। রংটা তেমন ফর্সা নয় বটে, কিন্তু—

নলিনাক্ষ। দোহাই মা, আমি রংফর্সার কথা ভাবিতেছি না। কিন্তু হেমনলিনীর সঙ্গে কেমন করিয়া হইবে? সে কি কখনো হয়?

ক্ষেমঙ্করী। ও আবার কি কথা! না হইবার ত কোনো কারণ দেখি না!

নলিনাক্ষের পক্ষে ইহার জবাব দেওয়া বড় মুস্কিল। কিন্তু হেমনলিনী—এতদিন যাহাকে কাছে লইয়া অসঙ্কোচে গুরুর মত উপদেশ দিয়া আসিয়াছে—হঠাৎ তাহার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষকে যেন লজ্জা আঘাত করিল।

নলিনাক্ষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "এবারে আমি তোমার কোনো আপত্তি শুনিব না। আমার জন্য তুমি যে এই বয়সে সমস্ত ছাড়িয়া-দিয়া কাশিবাসী হইয়া তপস্যা করিতে থাকিবে, সে আমি আর কিছুতেই সহ্য করিব না। এইবারে যে দিন শুভদিন আসিবে, সেদিন ফাঁক যাইবে না, এ আমি বলিয়া রাখিতেছি।"

নলিনাক্ষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল—"তবে একটা কথা তোমাকে বলি মা। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়ো না। যে ঘটনার কথা বলিতেছি, সে আজ নয়দশমাস হইয়া গেল, এখন তাহা লইয়া উতলা হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার যেরকম স্বভাব মা, একটা অমঙ্গল কাটিয়া গেলেও তাহার ভয় তোমাকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। এইজন্যই কতদিন তোমাকে বলিব-বলিব করিয়াও বলিতে পারি নাই। আমার গ্রহশান্তির জন্য যত-খুসি স্বস্ত্যয়ন করাইতে চাও করাইয়ো, কিন্তু অনাবশ্যক মনকে পীড়িত করিয়ো না।"

ক্ষেমঙ্করী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, "কি জানি বাছা, কি বলিবে, কিন্তু তোমার ভূমিকা শুনিয়া আমার মন আরো অস্থির হয়। যতদিন পৃথিবীতে আছি, নিজেকে অত করিয়া ঢাকিয়া রাখা চলে না। আমি ত দূরে থাকিতে চাই, কিন্তু মন্দকে ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; সে আপনিই ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। তা ভাল হোক্ মন্দ হোক্, বল, তোমার কথাটা শুনি!"

নলিনাক্ষ কহিল, "এই মাঘমাসে আমি রংপুরে আমার সমস্ত জিনিষপত্র বিক্রি করিয়া, আমার বাগানবাড়ীটা ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। সাঁড়ায় আসিয়া আমার কি বাতিক গেল, মনে করিলাম, রেলে না চড়িয়া নৌকা করিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিব। সাঁড়ায়

একখানা বড় দিশী নৌকা ভাড়া করিয়া যাত্রা করিলাম। দুদিনের পথ আসিয়া একটা চরের কাছে নৌকা বাঁধিয়া স্নান করিতেছি, এমন-সময় হঠাৎ দেখি, আমাদের ভূপেন এক বন্দুক হাতে করিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই ত সে লাফাইয়া উঠিল, কহিল, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড় শিকারটাই মিলিয়াছে।' সে ঐ দিকেই কোথায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটি করিতেছিল—তাঁবুতে মফস্বলভ্রমণে বাহির হইয়াছে। অনেকদিন পরে দেখা, আমাকে ত কোনোমতেই ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া বেড়াইতে লাগিল। ধোবাপুকুর বলিয়া একটা জায়গায় একদিন তাহার তাঁবু পড়িল। বৈকালে আমরা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি—নিতান্তই গণ্ডগ্রাম—একটি বৃহৎ ক্ষেতের ধারে একটা প্রাচীর-দেওয়া চালাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। ঘরের কর্ত্তা উঠানে আমাদের বসিবার জন্য দুটি মোড়া আনিয়া দিলেন। তখন দাওয়ার উপরে ইস্কুল চলিতেছে। প্রাইমারি ইস্কুলের পণ্ডিত একটা কাঠের চৌকিতে বসিয়া ঘরের একটা খুঁটির গায়ে দুই পা তুলিয়া দিয়াছে। নীচে মাটিতে বসিয়া স্লেটহাতে ছেলেরা মহা কোলাহল করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিতেছে। বাড়ীর কর্ত্তাটির নাম তারিণী চাটুয্যে। ভূপেনের কাছে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া আমার পরিচয় লইলেন। তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভূপেন বলিল, 'ওহে, তোমার কপাল ভাল—তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।' আমি বলিলাম, 'সে কিরকম?' ভূপেন কহিল, 'ঐ তারিণী চাটুয্যে লোকটি মহাজনী করে, এত-বড় কৃপণ জগতে নাই। ঐ যে ইস্কুলটি বাড়ীতে স্থান দিয়াছে, সেজন্য নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট্ আসিলেই নিজের লোকহিতৈষিতা লইয়া বিশেষ আড়ম্বর করে। কিন্তু ইস্কুলের পণ্ডিতটাকে কেবলমাত্র বাড়ীতে খাইতে দিয়া রাত দশটা পর্য্যন্ত সুদের হিসাব কসাইয়া লয়, মাইনেটা গবর্মেণ্টের সাহায্য এবং ইস্কুলের বেতন হইতে উঠিয়া যায়। উহার একটি বোনের স্বামিবিয়োগ হইলে পর সে বেচারা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইহারই কাছে আসে। সে তখন গর্ভিণী ছিল। এখানে আসিয়া একটি কন্যা প্রসব করিয়া নিতান্ত অচিকিৎসাতেই সে মারা যায়। আর একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করিয়া ঝি রাখিবার খরচ বাঁচাইত, সে এই মেয়েটিকে মায়ের মত মানুষ করে। মেয়েটি কিছু বড় হইতেই তাহারো মৃত্যু হইল। সেই অবধি মামা ও মামীর দাসত্ব করিয়া অহরহ ভর্ৎসনা সহিয়া মেয়েটি বাড়িয়া উঠিতেছে। বিবাহের বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাথার পাত্র জুটিবে কোথায়? বিশেষত উহার মাবাপকে এখানকার কেহ জানিত না, পিতৃহীন অবস্থায় উহার জন্ম, ইহা লইয়া পাড়ার ঘোঁটকর্ত্তারা যথেষ্ট সংশয়প্রকাশ করিয়া থাকেন। তারিণী চাটুয্যের অগাধ টাকা আছে সকলেই জানে, লোকের ইচ্ছা, এই মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে কন্যাসম্বন্ধে খোঁটা দিয়া উহাকে বেশ একটু দোহন করিয়া লয়। ও ত আজ চারবছর ধরিয়া এই মেয়েটির বয়স দশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে। অতএব, হিসাবমত তার বয়স এখন অন্তত

চৌদ্দ হইবে। কিন্তু যাই বল; মেয়েটি নামেও কমলা,—সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা। এমন সুন্দর মেয়ে আমি ত দেখি নাই। এ গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণযুবক উপস্থিত হইলেই তারিণী তাহাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরে। যদি-বা কেহ রাজি হয়, গ্রামের লোকে ভাংচি দিয়া তাড়ায়। অতএব এবারে নিশ্চয় তোমার পালা।' জান ত মা, আমার মনের অবস্থাটা তখন একরকম 'মরিয়া' গোছের ছিল—আমি কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, 'এ মেয়েটিকে আমিই বিবাহ করিব।' ইহার পূর্ব্বেই আমি স্থির করিয়াছিলাম, একটি হিন্দুঘরের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি তোমাকে চমৎকৃত করিয়া দিব—আমি জানিতাম, বড়-বয়সের ব্রাহ্মমেয়ে আমাদের এ ঘরে আনিলে তাহাতে সকল পক্ষই অসুখী হইবে। ভূপেন ত একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে বলিল, 'কি বল!' আমি বলিলাম, 'বলাবলি নয়, আমি একেবারেই মন স্থির করিয়াছি।'—ভূপেন কহিল, 'পাকা!' আমি কহিলাম, 'পাকা!' সেই সন্ধ্যাবেলাতেই স্বয়ং তারিণী চাটুয্যে আমাদের তাঁবুতে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হাতে পৈতা জড়াইয়া জোড়হাত করিয়া কহিলেন, 'আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। মেয়েটি স্বচক্ষে দেখুন, যদি পছন্দ না হয় ত অন্য কথা—কিন্তু শত্রুপক্ষের কথা শুনিবেন না।' আমি বলিলাম, 'দেখিবার দরকার নাই, দিন স্থির করুন।' তারিণী কহিলেন, 'পশু দিন ভাল আছে, পশুই হইয়া যাক্!' তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়া বিবাহে যথাসাধ্য খরচ বাঁচাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। বিবাহ ত হইয়া গেল।"

ক্ষেমঙ্করী চমকিয়া-উঠিয়া কহিলেন—"বিবাহ হইয়া গেল—বল কি নলিন!"

নলিনাক্ষ। হাঁ, হইয়া গেল। বধূ লইয়া নৌকাতেও উঠিলাম। যেদিন বৈকালে উঠিলাম, সেইদিনই ঘণ্টা-দুয়েক বাদে সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পরে হঠাৎ সেই অকালে ফাল্গুনমাসে কোথা হইতে অত্যন্ত গরম একটা ঘূর্ণিবাতাস আসিয়া এক মুহূর্ত্তে আমাদের নৌকা উল্টাইয়া কি করিয়া দিল, কিছু যেন বোঝা গেল না।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন, "মধুসূদন!" তাঁহার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নলিনাক্ষ। ক্ষণকাল পরে যখন বুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিলাম, আমি নদীতে একজায়গায় সাঁতার দিতেছি, কিন্তু নিকটে কোনো নৌকা বা আরোহীর কোনো চিহ্ন নাই। পুলিসে খবর দিয়া খোঁজ অনেক করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না।

ক্ষেমঙ্করী পাংশুবর্ণ মুখ করিয়া কহিলেন, "যাক্, যা হইয়া গেছে তা গেছে, ও কথা আমার কাছে আর কখনো বলিস্ নে—মনে করিতেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

নলিনাক্ষ। এ কথা আমি কোনোদিনই তোমার কাছে বলিতাম না, কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া তুমি নিতান্তই জেদ করিতেছ বলিয়াই বলিতে হইল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন, "একবার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া তুই ইহজীবনে কখনো বিবাহই করিবি না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "সেজন্য নয় মা, যদি সে মেয়ে বাঁচিয়া থাকে!"

ক্ষেমঙ্করী। পাগল হইয়াছিস্? বাঁচিয়া থাকিলে তোকে খবর দিত না?

নলিনাক্ষ। আমার খবর সে কি জানে! আমার চেয়ে অপরিচিত তাহার কাছে কে আছে! বোধ হয় সে আমার মুখও দেখে নাই। কাশীতে আসিয়া তারিণী চাটুয্যেকে আমার ঠিকানা জানাইয়াছি—তিনিও কমলার কোনো খোঁজ পান নাই বলিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন।

ক্ষেমঙ্করী। তবে আবার কি!

নলিনাক্ষ। আমি মনে মনে ঠিক করিয়াছি, পূরা একটি বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।

ক্ষেমঙ্করী। তোমার সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! আবার একবৎসর অপেক্ষা করা কিসের জন্য?

নলিনাক্ষ। মা, একবৎসরের আর দেরিই বা কিসের! এখন অঘ্রাণ; পৌষে বিবাহ হইতে পারিবে না—তাহার পরে মাঘটা কাটাইয়া ফাল্গুন।

ক্ষেমঙ্করী। আচ্ছা বেশ। কিন্তু পাত্রী ঠিক রহিল। হেমনলিনীর বাপকে আমি কথা দিয়াছি।

নলিনাক্ষ কহিল—"মা, মানুষ ত কেবল কথাটুকুমাত্রই দিতে পারে, সে কথার সফলতা দেওয়া যাঁহার হাতে, তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিব।"

ক্ষেমঙ্করী। যাই হোক্ বাছা, তোমার এই ব্যাপারটা শুনিয়া এখনো আমার গা কাঁপিতেছে।

নলিনাক্ষ। সে ত আমি জানি মা, তোমার এই মন সুস্থির হইতে অনেকদিন লাগিবে। তোমার মনটা একবার একটু নাড়া পাইলেই তাহার আন্দোলন কিছুতেই আর থামিতে চায় না। সেইজন্যই ত মা, তোমাকে এরকম সব খবর দিতেই চাই না।

ক্ষেমঙ্করী। ভালই কর বাছা—আজকাল আমার কি হইয়াছে জানি না,—একটা মন্দ-কিছু শুনিলেই তার ভয় কিছুতেই ঘোচে না। আমার একটা ডাকের চিঠি খুলিতে ভয় করে,—পাছে তাহাতে কোনো কুসংবাদ থাকে। আমিও ত তোমাদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমাকে কোনো খবর দিবার কোনো দরকার নাই;—আমি ত মনে করি, এ সংসারে আমি মরিয়াই গেছি, এখানকার আঘাত আমার উপরে আর কেন!

ক্রমশ।

রামায়ণের রচনাকাল।

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি।

"যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥"

গন্ধারদেশের শালাতুরা-গ্রামে পাণিনির জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী। তিনি "অষ্টাধ্যায়ী"নামক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিক অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। হিয়ঙ্‌-থ্‌সাঙ্গ ভারতভ্রমণে নিযুক্ত হইবার সময় পর্য্যন্তও শালাতুরায় পাণিনির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।* এখন তাঁহার চিরস্মরণীয় নাম ও ভুবনবিখ্যাত ব্যাকরণ ভিন্ন অন্য কোন পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। পাণিনি কোন্‌ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকিলেও, পুনঃপুন. পাণিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ের চেষ্টা আরব্ধ হইয়া, নানা মতভেদের সুত্রপাত করিয়াছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পাণিনি কোন্‌ পুরাকালের ঋষি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়াই, অনুমানমূলক আবির্ভাবকালনির্ণয়ের আড়ম্বর অধিক হইয়া উঠিয়াছে! পাণিনির আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে পারিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের সুবিধা হইতে পারে; অন্যথা সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাণিনি-সূত্রে পুরাতন সাহিত্যের নানা প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; পরবর্ত্তী সংস্কৃত-সাহিত্যের সকল যুগেই পাণিনীয় প্রভাব অল্পাধিকমাত্রায় দেদীপ্যমান। সুতরাং সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া, সকলেই পাণিনির আবির্ভাবকাল-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর, ওয়েবর প্রভৃতি স্বনামখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত-বর্গ পাণিনির যে আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন, পাণিনি তাহা অপেক্ষাও পুরাকালের ঋষি। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর সে কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।†

পাণিনি কোন্‌ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও,

* Beal's Buddhistic Records of the Western World.

† That Sanskrita philology should not yet possess the means of ascertaining the date of Panini's life, is, no doubt, a serious impediment to any research concerning the chronology of ancient Hindu works. For Panini's grammar is the centre of a vast and important branch of the ancient literature. No work has struck deeper roots than his in the soil of the scientific development of India. It is the standard of accuracy of speech,—the grammatical basis of the Vaidik commentaries. It is appealed to by every scientific writer whenever he meets with a linguistic

তিনি কোন্ সময়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা মোটামুটি নির্ণয় করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, পাণিনিকে শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সে কোন্ পুরাকালের কথা, তাহা কে বলিতে পারে? অনুমানমূলে তাহার সীমানির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই।

পাণিনির সময়:পর্য্যন্ত যে সকল সাহিত্য ও ব্যাকরণ সংস্কৃতভাষাকে অলঙ্কৃত করিত, তাহা অবলম্বন করিয়াই পাণিনিসূত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। উত্তরকালে অন্যান্য পুরাতন ব্যাকরণ বিলুপ্ত হইয়া পাণিনিব্যাকরণের প্রভাব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুণ না থাকিলে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। কোন্ গুণে পাণিনিসূত্র দেশকাল জয় করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে? কোন্ গুণে পুনঃপুন পরীক্ষিত ও সমালোচিত হইয়াও, পাণিনিসূত্র আত্মগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে? বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে ভাষার শব্দানুশাসনপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করাই প্রধান গুণ। ইহারই নাম প্রকৃত ব্যাকরণ —এইভাবেই শব্দের 'ব্যাকার' বা ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই গুণে পাণিনিসূত্র নানা ঐতিহাসিক তথ্যের আধার হইয়া, ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পুরাকাল হইতেই পাণিনিসূত্রের বিবিধ ব্যাখ্যা ও সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ করে। তন্মধ্যে কোন্ গ্রন্থ প্রথম, তাহা নির্ণয় করিবার প্রমাণ না পাইয়া অনেকে কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিক'নামক সমালোচনাকেই প্রথম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন। কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিক' পাণিনিসূত্রের বৃত্তি বা ব্যাখ্যাপুস্তক নহে। ঐ গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও, বার্ত্তিকসূত্রগুলি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বুঝিতে পারা যায়,—যে সকল সূত্রে 'বার্ত্তিক'সংযোগের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, কাত্যায়ন কেবল তাহারই সমালোচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলি আবার সেই সকল 'বার্ত্তিকের' সমালোচনা উপলক্ষে 'ভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং 'মহাভাষ্যে' আদ্যন্ত সমগ্র পাণিনিসূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। এই কথা স্মরণ না করিয়া অধ্যাপক-ওয়েবর প্রমুখ

---

difficulty. Besides the inspired seers of the works which are the root of Hindu belief, Panini is the only one, among those authors of scientific works who may be looked upon as real personages, who is a *Rishi* in the proper sense of the word,—an author supposed to have had the foundation of his work revealed to him by a divinity. Yet, however we may regret the necessity of leaving this important personage in the chaos which envelopes the historical existence of all ancient Hindu celebrities, it is better to acknowledge this necessity than attach faith to a date devoid of real substance and resting on no trustworthy testimony.—Goldstucker's PANINI, p 87—89.

কতিপয় পাশ্চাত্যপণ্ডিত 'বার্ত্তিক' ও 'ভাষ্য'-হীন পাণিনিসূত্রকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেও ইতস্তত করেন নাই! তাঁহারা আবার কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির কোন কোন উক্তিকে পাণিনির উক্তি বলিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনজন তিন সময়ের বৈয়াকরণ; তিনজন ভাষার তিন অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনজনের লেখায় তিনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কথা স্মরণ রাখিয়া, 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণের' আলোচনা করিলে, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের প্রকৃত পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে। সে পথ যখনই আবিষ্কৃত হউক, অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকরকেই তাহার নেতা বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে তাঁহারই পাণিনিসেবা সার্থক হইয়াছে। মোক্ষমূলর পদে পদে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন; অধ্যাপক ওয়েবর মহাভাষ্য অধ্যয়ন না করিয়াই, পাণিনির আবির্ভাবকালনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন।* দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মতামত লইয়াই আমরা মতান্ধ হইয়া উঠিতেছি।

কাত্যায়নের 'মহাবার্ত্তিকে' ব্যাড়ীনামক একজন পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সংগ্রহ', তাহা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ ব্যাকরণ। পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ীর 'সংগ্রহ' রচিত হইয়াছিল। ব্যাড়ী কে, পতঞ্জলি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যাড়ীকে 'দাক্ষায়ণ' বলায়, পাণিনির সহিত ব্যাড়ীর সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ব্যাড়ী যে পাণিনির পরবর্ত্তী, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ব্যাড়ীর নাম সংস্কৃতব্যাকরণশাস্ত্রে অপরিচিত নহে। 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে' ব্যাড়ীর নাম পুনঃপুন উল্লিখিত আছে। পতঞ্জলিও ব্যাড়ীর নাম অনেকবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি। ২। ৩। ৬৬।

এই সূত্রের বিচারে, পতঞ্জলি উদাহরণপ্রয়োগে 'সংগ্রহ'নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহার রচয়িতাকে 'দাক্ষায়ণ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা:—

"শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ।"

"শোভনা খলু দাক্ষায়ণেন সংগ্রহস্য কৃতিরিতি।"

দাক্ষীর অধস্তন তৃতীয়পুরুষ দাক্ষায়ণনামে কথিত হইতে পারেন;—পাণিনিসূত্রানুসারে তাহাই দাক্ষায়ণশব্দের ব্যুৎপত্তি। তৃতীয় হইতে অধস্তন অন্যান্য ব্যক্তিগণও দাক্ষায়ণনামে পরিচিত হইতে পারেন; প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের পক্ষে এই নাম ব্যবহৃত হইতে পারে না। সুতরাং সংগ্রহকার দাক্ষায়ণ পাণিনির বংশে তাঁহার পৌত্র বা তাঁহার অধস্তন পুরুষ। দাক্ষায়ণ বংশা-

* অধ্যাপক মোক্ষমূলর অনেকস্থলে পাণিনিসূত্র উদ্ধৃত করিতে গিয়া সংখ্যাপাতেও ভুল করিয়াছেন; অনেকস্থলে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, সূত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক ওয়েবর স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—তিনি আদ্যন্ত মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন নাই। এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া, অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর তাঁহার 'পাণিনি'প্রবন্ধে উভয়কেই তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কোন গ্রন্থের আদ্যন্ত অধ্যয়ন না করিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতা হইলেও, আধুনিক সাহিত্যে সেরূপ ধৃষ্টতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা পল্লবগ্রাহী আধুনিকশিক্ষার প্রধান দোষ। তজ্জন্য ব্যক্তিবিশেষকে তিরস্কার করা অসঙ্গত।

সুষামী নাম; ব্যক্তিগত নাম ব্যাঢ়ী। সুতরাং পাণিনির পর ব্যাঢ়ী এবং ব্যাঢ়ীর পর কাত্যায়ন;—এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করা যায়। পাণিনির কত পরে ব্যাঢ়ী এবং ব্যাঢ়ীর কত পরে কাত্যায়ন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় না থাকায়, অনুমানমূলে কোনরূপ কাল-নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত। এই প্রমাণে কাত্যায়ন পাণিনির পরকালবর্ত্তী বৈয়াকরণ বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা গেল,—ইহাই পরম লাভ। পাণিনির কতকাল পরে কাত্যায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য প্রমাণের আলোচনা করা আবশ্যক। বার্ত্তিকসূত্রে সেরূপ প্রমাণের অভাব নাই।

পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে অনেক অভিনব সাহিত্য সমুদ্ভূত হইয়াছিল; ভাষার অবস্থাও নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তজ্জন্য কাত্যায়ন পাণিনিসূত্রের নানাস্থানে বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া, পুরাতন ব্যাকরণকে অভিনব ভাষার শব্দানুশাসনের উপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত অধিকাংশস্থলে বার্ত্তিকসংযোগের প্রয়োজন প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে।

অরণ্যান্মনুষ্যে। ৪।২।১২৯.

এই সূত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, নানা তথ্য প্রকাশিত হইবে। অরণ্যশব্দ হইতে আরণ্য ও আরণ্যক—এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। 'বুঞ্'প্রত্যয়ে 'আরণ্যক'-শব্দের উৎপত্তি। একটি বিশেষ-অর্থ-জ্ঞাপনার্থ অরণ্যশব্দে 'বুঞ্'প্রত্যয় হইত বলিয়া পাণিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে অর্থ কি, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য সূত্রে 'মনুষ্য'শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে,—অরণ্যবাসী 'মনুষ্য' বুঝাইতে হইলে, 'আরণ্য মনুষ্য' বলিলে চলিবে না, 'আরণ্যক মনুষ্য' বলিতে হইবে; অর্থাৎ 'আরণ্যক' বলিলে, মনুষ্য বুঝাইবে;—আর কিছু বুঝাইবে না। পাণিনির সময়ে যে সাহিত্য বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে 'আরণ্যক' বলিতে মনুষ্য ভিন্ন আর কিছু বুঝাইত কি না, তাহার প্রমাণাভাব। কাত্যায়নের সময়ে 'আরণ্যক' বলিতে মনুষ্য ভিন্ন আরও নানা অর্থ প্রতিভাত হইত। তাঁহার সময়ে আরণ্য পথ, আরণ্য অধ্যায়, আরণ্য ন্যায়, আরণ্য বিহার ও আরণ্য হস্তী বলিবার নিয়ম ছিল না। ঐ সকল স্থলেও 'আরণ্যক'-শব্দ ব্যবহার করিতে হইত। 'গোময়'-অর্থে আরণ্য ও আরণ্যক শব্দ তুল্যভাবে প্রযুক্ত হইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অর্থে আরণ্যশব্দই প্রযুক্ত হইত। এই পার্থক্য-সূচনার্থ কাত্যায়ন বার্ত্তিকসূত্রের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা:—

"পথ্যধ্যায়ন্যায়বিহারমনুষ্যহস্তিষিতি বক্তব্যম্।" ১।

"বা গোময়েষু।" ২।

'আরণ্যক'শব্দ পাণিনির সময়ে এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইবার নিয়ম থাকিলে, তিনি কেবল মনুষ্য-অর্থেই 'আরণ্যক'শব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিতেন না। পাণিনির ন্যায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-বিচারনিপুণ বিশেষজ্ঞ বৈয়াকরণের পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা বা অনবধানতা স্বীকার করা অসঙ্গত। অধ্যাপক গোল্ড্‌ষ্টুকর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

তিনি বলেন,—ভারতপ্রসিদ্ধ উপনিষদের নাম 'আরণ্যক'। আরণ্যক বলিতে প্রথমে সেই অর্থই প্রতিভাত হয়। 'বাইবেল' বলিলে 'পুস্তক' বুঝাইতে পারে; কিন্তু তাহার মুখ্যার্থ,—'ধর্ম্মপুস্তক'। একজন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীকে 'বাইবেল'শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রথমেই মুখ্যার্থের উল্লেখ করিবেন; সে অর্থ বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সেইরূপ হিন্দুর পক্ষেও 'আরণ্যক'শব্দের মুখ্যার্থ বিস্মৃত হইয়া, কেবল মনুষ্যার্থে আরণ্যকশব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণরচনা করা অসম্ভব। অধ্যাপক গোল্ড্ষ্টুকরের এই তর্ক অকাট্য। কিন্তু তিনি ইহার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"পাণিনির সময়ে উপনিষৎ রচিত হয় নাই।" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। উপনিষৎ চিরকাল 'আরণ্যক'নামে পরিচিত থাকিলে, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু উপনিষৎ কি চিরকাল 'আরণ্যক'নামে পরিচিত ছিল? না থাকিলে, কি সূত্রে তাহা আরণ্যকনামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে?

উপনিষদের অন্য নাম 'বেদান্ত'—অর্থাৎ বেদের অন্ত্য ভাগ; তাহা 'ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। একদা ব্রাহ্মণমাত্রেই 'ব্রাহ্মণের' আদ্যন্ত অধ্যয়নের অধিকারী ছিলেন। 'কঠোপনিষদে' দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণসভায় তাহা পাঠ করিবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তরকালে ব্রাহ্মণমাত্রের পক্ষে 'ব্রাহ্মণের' শেষাংশ অর্থাৎ উপনিষৎ পাঠ বা শ্রবণের অধিকার ছিল না। যাঁহারা বানপ্রস্থব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিতেন, তাঁহারা ভিন্ন গৃহী ব্রাহ্মণের পক্ষে উপনিষদের অধ্যয়ন দূরে থাকুক, শ্রবণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য 'ব্রাহ্মণের' কোন্ ভাগ ব্রাহ্মণমাত্রের পাঠ্য, কোন্ ভাগ কেবল ব্রতিগণের পাঠ্য, তাহা নির্ণয় করিয়া পৃথক্ নামকরণ করা আবশ্যক হইয়াছিল। তদনুসারে উপনিষদ্ভাগের নাম 'আরণ্যক' হইয়াছে।* পাণিনির সময়ে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই বলিয়া, তৎকালে 'আরণ্যক'শব্দে 'উপনিষৎ' বুঝাইত না। এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহার অধিক স্বীকার করিবার উপযোগী প্রমাণের অভাব। সুতরাং অধ্যাপক গোল্ড্ষ্টুকরের সিদ্ধান্তের শেষাংশ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না।†

আর্য্যসমাজে বেদ 'অপৌরুষেয়' বলিয়া চিরপরিচিত। যাঁহারা কোনরূপ 'অপৌরুষেয়' শাস্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত,

* "অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে ॥
অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেব বাক্যং প্রচক্ষতে ॥
এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি ॥"
—তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্যে সায়ণাচার্য্যঃ।

† Is it possible to assume that Panini could have known this sense of the word *Aranyaka*, when he is altogether silent on it; and if he did not know it, that the works so called could have already existed in his time? - Goldstucker's PANINI, p. 130.

তাঁহারা বেদবিশ্বাসী ভারতবর্ষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশে ত্রুটি করেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এরূপ অবজ্ঞাপ্রকাশ তথ্যানুসন্ধানের বাধাপ্রদান করে। পুরাকালের ঋষি ও ঋষিকল্প গৃহস্থগণ কি ভাবে ও কি অর্থে বেদকে 'অপৌরুষেয়' বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বেদশব্দের পুরাতন অর্থ 'জ্ঞান'। জ্ঞান মনুষ্যকৃত, না অপৌরুষেয়? নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণজ্ঞানের জন্য জগদ্বিখ্যাত, তিনি কি তাহার স্রষ্টা, না দ্রষ্টা? কোনও জ্ঞানের পক্ষেই মানবকে স্রষ্টা বলা যায় না; মানব দ্রষ্টা, মানব প্রোক্তা;—তাহার অধিক নহে। জ্ঞান অনাদিকাল হইতে দ্রষ্টা ও প্রোক্তার প্রতীক্ষায় বর্ত্তমান আছে;—কত জ্ঞান দৃষ্ট ও প্রোক্ত হইয়াছে; তথাপি কত জ্ঞান এখনও মানবসমাজে অপরিজ্ঞাত! যিনি যে জ্ঞান দর্শন করেন, তিনি তাহার 'দ্রষ্টা' বা ঋষি; যিনি তাহা প্রচার করেন, তিনি তাহার 'প্রোক্তা'। পাণিনি এইভাবেই সূত্ররচনা করিয়া, মন্ত্রভাগকে 'দৃষ্ট' এবং ব্রাহ্মণ ও কল্পাদিকে 'প্রোক্ত' বলিয়া গিয়াছেন। পাণিনির মতে বেদাঙ্গমাত্রেই 'প্রোক্ত'। যাহা 'দৃষ্ট' বা 'প্রোক্ত' নহে, মনুষ্যকৃত—পদ্যগদ্যময় ইতিহাস-উপাখ্যানাদি—তাহারই নাম 'কৃত'। এইরূপে পাণিনি প্রথমত কৃত ও অকৃত নামক দুই শ্রেণীর সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, অকৃত সাহিত্যকে আবার দৃষ্ট ও প্রোক্ত নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। কৃতাকৃত সমস্ত সাহিত্যই মনুষ্যের নামে পরিচিত; পার্থক্য এই যে,—কৃতগ্রন্থ কর্ত্তার নামে, অকৃতগ্রন্থ দ্রষ্টা ও প্রোক্তার নামে পরিচিত। অকৃতগ্রন্থেরও শব্দাবলী মনুষ্যকৃত; তাহা অপৌরুষেয় নহে; শব্দপ্রতিপাদ্য জ্ঞানই 'অপৌরুষেয়'। ইহাকে কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞাপ্রকাশ করিবার উপায় নাই।

যাহা 'দৃষ্ট', তাহা ক্রমে ক্রমে 'দৃষ্ট' হইয়াছিল। তদ্রূপ যাহা 'প্রোক্ত'সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাও ক্রমে ক্রমেই প্রচারিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহা পুরাতন ও আধুনিক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইবার যোগ্য। পাণিনিসূত্রে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তেন প্রোক্তম্। ৪।৩।১০১।

'প্রোক্তং'শব্দের অর্থ কাশিকা বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ৮৭সংখ্যক সূত্রে মনুষ্যকৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ, এই সূত্রদ্বারা 'প্রোক্ত'সাহিত্যের অধিকার আরব্ধ হইয়াছে। এই অধিকারভুক্ত তিনটি সূত্র একত্র বিচার করা আবশ্যক।

তেন প্রোক্তম্। ৪।৩।১০১।
কাশ্যপকৌশিকাভ্যাং ঋষিভ্যাং ণিনিঃ। ৪।৩।১০৩।
পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। ৪।৩।১০৫।

নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া, এই তিনটি সূত্র ইউরোপীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর বিচারে নানারূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকর সে সকল কাল্পনিক ব্যাখ্যার ভ্রমপ্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এই তিনটি সূত্রের সরল ব্যাখ্যা কি, তাহার আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

পাণিনি প্রথমে 'মনুষ্যকৃত' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া, পরে 'মনুষ্যপ্রচারিত' গ্রন্থের উল্লেখ করিবার জন্য নূতন অধিকার-সূত্রের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন, "তেন প্রোক্তম্।" অতঃপর 'প্রোক্ত'-গ্রন্থের কথা বলিব। তাহার সাধারণ নিয়ম এই যে,— 'প্রোক্ত'গ্রন্থ প্রোক্তার নামানুসারে কথিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য 'প্রোক্তার' নামে প্রত্যয় সংযোগ করা আবশ্যক। কাশ্যপ ও কৌশিক এই দুই ঋষির নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের 'প্রোক্ত'গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাশ্যপ বলিতে ঋষি-কাশ্যপ ও গোত্রকাশ্যপ বুঝায়। ঋষিকাশ্যপ পুরাতন; গোত্রকাশ্যপ আধুনিক ব্যক্তি। সেই পার্থক্যরক্ষার্থই সূত্রে 'ঋষি'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ও কল্পসূত্রের পুরাতন প্রচারকগণের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাদের গ্রন্থাদি পরিচিত হইয়া থাকে। যাঁহারা 'পুরাণ-প্রোক্তা' বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য,—যাঁহারা আধুনিক—তাঁহাদের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় না।

এই সরল ব্যাখ্যায় বুঝিতে পারা যায়,— পাণিনির মতানুসারে যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি পুরাণ-প্রোক্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার অযোগ্য। কারণ তাঁহার ব্রাহ্মণাদির নাম—"যাজ্ঞবল্কানি ব্রাহ্মণানি।" যাজ্ঞবল্ক্যের নামে 'অন্'-প্রত্যয় হইয়া 'যাজ্ঞবল্কানি'শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় নাই। পাণিনি-সূত্রের যে ইহাই সরলার্থ, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে 'যাজ্ঞবল্ক্যপ্রোক্ত' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় 'শতপথব্রাহ্মণ' আধুনিক হইয়া পড়ে! কাত্যায়ন তাহার মর্য্যাদা-রক্ষার্থ বার্ত্তিক সংযোগ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—পাণিনির বলা উচিত ছিল যে, যাজ্ঞবল্ক্যাদির পক্ষে তাঁহার সূত্র খাটিবে না; তাঁহারাও তুল্যকালবর্ত্তী পুরাণ-প্রোক্তা; কিন্তু তাঁহাদের নামে 'ণিনি'-প্রত্যয় হয় নাই। কাত্যায়ন এখানে স্পষ্টাক্ষরেই পাণিনির দোষপ্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।*

উত্তরকালে ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, এই বার্ত্তিকের দুইপ্রকার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এক দল হিন্দু; অপর দল বৌদ্ধ। বৌদ্ধ কাশিকাবৃত্তিকার কাত্যায়নের বার্ত্তিক স্বীকার না করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন,— "যাজ্ঞবল্ক্যাদি আধুনিক ব্যক্তি।"† উত্তরকালে সিদ্ধান্তকৌমুদীর হিন্দু গ্রন্থকারও কাশিকার মতই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন; কাত্যায়নের মত পরবর্ত্তী বৈয়াকরণসমাজে সর্ব্বত্র সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই! সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে পাণিনির পরকালবর্ত্তী ও কাত্যায়নের পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিতে হইতেছে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি কাত্যায়নের এত পূর্ব্বকালবর্ত্তী যে, কাত্যায়ন তাঁহাদিগকে পাণিনিরও পূর্ব্ব-কালবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—পাণিনির বহুকাল পরে কাত্যায়ন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান ছিল বলি-

* "পুরাণপ্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধস্তুল্যকালত্বাৎ।"
৪।৩।১০৫। বার্ত্তিকসূত্রম্।

† যাজ্ঞবল্ক্যাদয়োঽচিরকালা ইত্যাখ্যানেষু বার্ত্তা।

য়াই, পাণিনির সময়ের ভাষার সহিত কাত্যায়নের সময়ের ভাষার নানা পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল।* এই পার্থক্য রামায়ণেও দেদীপ্যমান।

কাত্যায়ন কেবল বার্ত্তিকসূত্র রচনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহার নাম বৈদিকসাহিত্যেও সুপরিচিত। কৃতাকৃত উভয়শ্রেণীর সাহিত্যেই কাত্যায়নের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং আর্য্যসাহিত্যে 'মুনি'নামেই সুপরিচিত। যে সকল বৈদিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) অনুক্রমণী, (২) প্রাতিশাখ্য, (৩) কল্পসূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সকল লৌকিকসাহিত্যের সহিত কাত্যায়নের নামের সংস্রব থাকা জানিতে পারা যায়, তন্মধ্যে (১) ভ্রাজাশ্লোক ও (২) মহাবার্ত্তিক সংস্কৃতসাহিত্যে সুপরিচিত। কাত্যায়ন প্রোক্তা এবং কর্ত্তা,—প্রচারক এবং গ্রন্থকার। তাঁহার টীকাকার ষড়্‌গুরুশিষ্য প্রসঙ্গক্রমে কাত্যায়নের সাহিত্যসেবার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ষড়্‌গুরুশিষ্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক টীকাকার হইলেও, তাঁহার উক্তি একেবারে অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। তিনি বলেন,—পুরাকালে শৌনকনামক ঋষি নানা সূত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্য আশ্বলায়নও সূত্রগ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ। শৌনক ও আশ্বলায়নের সূত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াই, কাত্যায়ন গ্রন্থসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে কাত্যায়ন এইরূপে বৈদিকসাহিত্যে সুপরিচিত, তিনিই পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার;—

"মহাবার্ত্তিকনৌকারঃ পাণিনীয়মহার্ণবে।"

পতঞ্জলি তাহারই সমালোচনাচ্ছলে 'মহাভাষ্য' রচনা করিয়া গিয়াছেন। ষড়্‌গুরুশিষ্যের এই সংক্ষিপ্ত উক্তি কাত্যায়নের কালনির্ণয়ের জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলরকর্ত্তৃক 'প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসবিষয়ক' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, ষড়্‌গুরুশিষ্য কোনস্থলে কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ না করিলেও, অধ্যাপক মোক্ষমূলর আশ্বলায়ন ও কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।† এরূপ অসঙ্গত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিবার কারণ কি? মোক্ষমূলর "কথাসরিৎসাগরের" আখ্যায়িকার উপর নির্ভর করিয়া, পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পাণিনিসূত্রে শৌনকের নাম যে ভাবে উল্লিখিত, তাহাতে শৌনক ও পাণিনি তুল্যকালবর্ত্তী বলিয়া তর্ক করা যাইতে পারে। সুতরাং

* This explanation, I hold, can only be derived from the circumstance that Panini and Katyayana belonged to different periods of Hindu antiquity.—Goldstucker's PANINI, p. 122.

† Several of the works mentioned before were ascribed to Saunaka and his two pupils, Katyayana and Asvalayana.—Max Muller's History of Ancient Sanskrita Literature.—p. 215.

কাত্যায়নকে শৌনকের শিষ্য না বলিলে, পাণিনির সহিত কাত্যায়নের তুল্যকাল-বর্ত্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। বলা বাহুল্য, এরূপ বিচারপদ্ধতি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রবল অন্তরায়। কাত্যায়ন যে শৌনকের শিষ্য, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই; প্রমাণ কেবল মোক্ষমূলরের অনুমান;—তাহাও ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না! অথচ তাহার উপর নির্ভর করিয়াই "সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস" সঙ্কলিত হইয়াছে! সে ইতিহাস লিপিচাতুর্য্যে বিশ্ববিখ্যাত হইলেও, বিশেষজ্ঞগণের নিকট নিরতিশয় কৌতূহলের আকর। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টূকর সে কথা ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ এরূপ দুর্লভ ও দুরূহ যে, তাঁহার কথা অল্পলোকেই অবগত; তজ্জন্যই মোক্ষমূলরের "সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস" প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া সমাদরলাভ করিতেছে!

বৈদিকসাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় বেদাঙ্গের প্রয়োজন থাকায়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ নামক ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত হইয়াছিল। ষড়ঙ্গ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নাম; ছয়খানি গ্রন্থের নাম নহে। এক এক বিষয়ে বহুলোকের বহুগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এই সকল গ্রন্থের সাহায্যে বেদবাক্যের উচ্চারণ, বেদমন্ত্রের প্রয়োগ, বৈদিকশব্দের শাসন, পদ-পদার্থের নিরূপণ ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইত। সেকালে বৈদিকসাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইয়া সমগ্র বেদবাক্যের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ঋষিগণ সময়ে সময়ে 'অনুক্রমণী'নামক সূচীপুস্তক সঙ্কলিত করিতেন। শৌনক ঋগ্বেদের নানাপ্রকার অনুক্রমণী সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাত্যায়নকৃত অনুক্রমণীই এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত;—তাহার নাম "সর্ব্বানুক্রমণী"। ষড়্‌গুরু-শিষ্য তাহারই "বেদার্থদীপিকা"নামক টীকা বা ভাষ্য রচনা করেন। শৌনকের সময়ে ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্ত নামক বিবিধ বিভাগে বিভক্ত থাকায়, তাঁহার অনুক্রমণীতে তাহারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শৌনকের পরে এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গানুসারে ঋগ্বেদ বিভক্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য কাত্যায়নের "সর্ব্বানুক্রমণীতে" আমরা অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গানুসারে ঋগ্বেদের পরিচয় প্রাপ্ত হই। শৌনকের বহুপরকালবর্ত্তী না হইলে, কাত্যায়নের "সর্ব্বানুক্রমণীতে" শৌনকের "অনুক্রমণীর" ন্যায় মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তের নামই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মোক্ষমূলরের মতানুসারে কাত্যায়ন শৌনকের শিষ্য ও সমসাময়িক হইলে, তাহাই দেখিতে পাইতাম। সর্ব্বানুক্রমণীর ন্যায় "প্রাতিশাখ্য"-নামক এক গ্রন্থও কাত্যায়নের লেখনী-প্রসূত। তাহা "বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য" নামে কথিত হইয়া থাকে। এই প্রাতিশাখ্য ও মহাবার্ত্তিকে কাত্যায়নের অসাধারণ ব্যাকরণজ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ওয়েবর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ 'প্রাতিশাখ্য'গুলিকে পাণিনির পূর্ব্বকালবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পাণিনির পরে ব্যাড়ী, ব্যাড়ীর পরে প্রাতিশাখ্য। কাত্যায়ন

শুক্লযজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে শুক্লযজুর্ব্বেদের শিক্ষা ও প্রয়োগ এইরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাণিনির সময়ে এই সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। এই সকল বৈদিকগ্রন্থ ভিন্ন কাত্যায়ন 'ভ্রাজা'নামক শ্লোকগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' তাহার উল্লেখ আছে। কাত্যায়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ীর 'সংগ্রহ'নামক গ্রন্থে শ্লোকনামক রচনাপ্রণালীর প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শ্লোক বলিতে সেকালে কেবল অনুষ্টুভ্‌ছন্দকেই বুঝাইত। বৈদিকসাহিত্যে কদাচিৎ অনুষ্টুপের ব্যবহার থাকিলেও, আদ্যন্ত অনুষ্টুপ্‌ ব্যবহৃত হয় নাই। ঋগ্বেদের দশসহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে ৮৫৫ মন্ত্র অনুষ্টুপ্‌। পাণিনির সময়ে আদ্যন্ত অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত কোন গ্রন্থ প্রচলিত থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন পাণিনিসূত্রের উদাহরণে 'শ্লোক'শব্দের উল্লেখ দেখিয়া, পাণিনির সময়ে শ্লোকগ্রন্থ প্রচলিত থাকা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ সকল উদাহরণ পাণিনির লেখনীপ্রসূত নহে। পাণিনির পরে এবং কাত্যায়নের পূর্ব্বে সংস্কৃতসাহিত্যের এই সকল বিবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ও কাত্যায়নের মধ্যে বহুকালের ব্যবধান না থাকিলে, এই সকল পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল-নির্ণয়ে অগ্রসর হইলে, সমালোচ্য গ্রন্থের উপর পাণিনি বা কাত্যায়নের প্রভাব আবিষ্কার করা কঠিন হয় না। রামায়ণের ন্যায় পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করিতে হইলে, এই পথেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য পতঞ্জলিরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

কাত্যায়নের কতকাল পরে পতঞ্জলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি কোন্‌ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পতঞ্জলির মাতার নাম গোণিকা; তাঁহার বাসস্থান গোনর্দ্দ। তিনি কিছুকাল কশ্মীরে বাস করিয়াছিলেন, এবং অভিমন্যুনামক কশ্মীরাধিপতির শাসনসময়ে তদ্দেশে মহাভাষ্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সকল প্রমাণ অনুসারে পতঞ্জলিকে দ্বিসহস্রবৎসর পূর্ব্বের বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার প্রমাণপরম্পরার বিস্তৃত আলোচনা করা অনাবশ্যক।

পুরাতন সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে পাণিনিযুগ, কাত্যায়নযুগ ও পতঞ্জলিযুগ নামক তিনটি সাহিত্যযুগ কল্পনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনিযুগে 'রামায়ণ' পরিচিত না থাকিলেও, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিযুগে 'রামায়ণ' পরিচিত ছিল। পাণিনির পরে ও কাত্যায়নের পূর্ব্বে কোনও সময়ে রামায়ণ রচিত হইয়া থাকিবে। রামায়ণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলেই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাণিনিযুগে শুক্লযজুর্ব্বেদ, বাজসনেয়িসংহিতা, শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নকল্পসূত্র

বা শ্লোকনিবদ্ধ ভাষাসাহিত্য বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কাত্যায়নযুগ হইতে এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিবিধ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কথাগুলি স্মরণ রাখিয়া রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে, তাহার রচনাকালনির্ণয়ের প্রকৃত পথের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তৎপূর্ব্বে রামায়ণের ভাষাবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মুক্তিবিষয়ে রামানুজস্বামীর উপদেশ।

ছেলে স্কুলে যায়, ক্লাসেও বেশ পড়া হয়, মাষ্টারও ভাল, অথচ ছেলে কিছু শিখিতে পারে না, ক্লাস্‌প্রমোশন্‌ও পায় না। ছেলের ঝোঁক ঘুটিনাটীর দিকে, পড়ার দিকে নহে। সে সুযোগ পাইলেই পেন্‌সিল্‌ দিয়া ছবি আঁকে, কেতাবের গায়ে ফুল কাটে, দেয়ালের গায়ে ঘরবাড়ী আঁকে। তাহার পড়াশুনা ভাল লাগে না, ভাল লাগে—ঐরূপ ঐরূপ কারুকার্য্য! সেই অশিক্ষিত অবস্থায় সে যাহা আঁকে, তাহা নিতান্ত মন্দও হয় না। এরূপ দেখিলে কে না বলে—তুমিও বল, আমিও বলি—ছেলেটিকে আর্টস্কুলে দাও। হয় ত তাহাতেই কিছু হইবে, নচেৎ লেখাপড়ায় কিছু হইবে না। আমরা যেমন আমাদের ছেলের ঝোঁক ও পারকতা দেখিয়া শিক্ষাধিকারে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করি, করি বা না করি, অন্তত মুখেও বলি, ছেলেটিকে অমুক বিষয়ে দিলে ভাল হইত, এইরূপ আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরাও ঝোঁক ও পারকতা অনুসারে শাস্ত্রাধিকার নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। ঝোঁক ও পারকতা, এই দুই বিষয়ের শাস্ত্রীয় নাম অর্থিত্ব ও সামর্থ্যবত্ব। অর্থিত্ব অর্থাৎ উৎকটতর ইচ্ছা। সামর্থ্যবত্ব অর্থাৎ ঈপ্সিত বিষয় নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা থাকা। এই সামর্থ্য লৌকিক-বৈদিকভেদে নানাপ্রকার, এবং তৎসংক্রান্ত নানা বিচার থাকিলেও সে সকল এ প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে। এখানে স্থূলত এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে, ঈপ্সিত বিষয় আয়ত্ত করিবার শক্তি থাকাই উল্লিখিত সামর্থ্যবত্বকথার অর্থ। ইচ্ছা আছে সামর্থ্য নাই, অথবা সামর্থ্য আছে ইচ্ছা নাই, সেরূপ লোক অনধিকারী। অর্থী ও সমর্থ, এরূপ ব্যক্তিই অধিকারী, তদ্ভিন্ন ব্যক্তি অনধিকারী। যে অধিকারী, সে-ই অধিকর্ত্তব্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে এবং যে যে-বিষয়ে অনধিকারী, সে শতচেষ্টা করিলেও সে-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহারা জন্মাবধি গান করিয়া বেড়ায়, অথচ তালবোধ-সুরবোধ-বর্জ্জিত। অনেক সুপণ্ডিত লোক দেখিয়াছি, পরন্তু তাঁহারা গণিতবিষয়ে মূর্খ। ব্যাকরণ-সাহিত্য-অলঙ্কারাদি নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন,—কেবল ন্যায়শাস্ত্রের নামে

ভীত, এরূপ লোকও অনেক আছেন। আবার ন্যায়শাস্ত্রে বুৎপন্ন, অথচ ব্যাকরণ বুঝেন না, এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে। অতএব, মনুষ্য যে সামর্থ্যযোগ ব্যতীত কেবল অর্থিতার দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পারে না। না পারার পক্ষে ঐ সকল পুষ্কল নিদর্শন। আমাদের শাস্ত্রে যে দ্বয়-অদ্বয়-বাদের কথা আছে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির পন্থা উপদিষ্ট আছে, সে সমস্তই অধিকারিবিশেষের জন্য, সাধারণের জন্য নহে। পাত্র বা অধিকারী অনুসারে সুপথ কুপথ হয়, আবার কুপথ সুপথ হয়। তাই শাস্ত্রকারদিগের আদেশ—যে যে-পথের অধিকারী, সে সেই পথে গমনাগমন করুক। স্বামী মধুসূদনসরস্বতী স্বকৃত ভক্তিরসায়নগ্রন্থে জ্ঞান ও ভক্তি এই দুই পথের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"অদ্রুতচিত্তস্য নির্ব্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্। দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎকথাশ্রবণাদিভাগবতধর্ম্মশ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিরিত্যধিকারভেদেন দ্বয়মপ্যুপাত্তম্।"

অর্থাৎ যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত তীব্র,—অত্যন্ত নীরস, কিছুতেই দ্রুত হয় না,—গলে না, তাহারাই ঐহিক সম্পদে নির্ব্বিণ্ণ হওয়ার পর তত্ত্বজ্ঞানের পথ বা অদ্বয়বাদের পথ গ্রহণ করুক; কিন্তু যাহাদের চিত্ত সেরূপ শক্তিশালী নহে,—সেরূপ তীব্র নহে, যাহাদের চিত্ত দ্রুতিপ্রবণ,—সহজে গলিয়া যায়, তাহারা ঐহিকসম্পদে নির্ব্বিণ্ণ হওয়ার পর দ্বয়বাদের উপদিষ্ট ভক্তির পথ গ্রহণ করুক। অদ্বয়বাদের তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বয়বাদের ভক্তিনামক জ্ঞান, উভয়ই অধিকারিভেদে গ্রহণীয়।

কথায় কথা উঠে,—"ঐহিকসম্পদে নির্ব্বিণ্ণ" এই কথায় অপর এক কথা উঠিতেছে। কথাটা এই—

অন্য জীবের প্রকৃতিতে কি আছে,—কি নাই, অন্য জীবের প্রকৃতি কি চায়,—কি চায় না, তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু মনুষ্যজীবের প্রকৃতিতে বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বলবৎ। মনুষ্যের প্রকৃতিতে ভবিষ্যতের আশা অত্যধিক প্রবল বলিয়াই মনুষ্যজগতের এত পরিবর্ত্তন ও এত উন্নতি। ভবিষ্যতের সীমা দৈবাৎ কাহার প্রকৃতিতে মরণাকারে অভিব্যক্ত হয়;—যাবৎ না মরণ হয়, তাবৎ তাহারা সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারের চেষ্টা করে, তদূর্দ্ধে নহে। কেন না, তাহারা বুঝে, মরণেই শেষ, মরণেই বিরাম। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কতকলোকের প্রকৃতি ঐ সীমা অতিক্রম করিয়া পরলোক ও স্বর্গনরকাদি কল্পনা করে এবং তদবশিষ্ট লোক স্বর্গনরকাদির অতীত মুক্তিনামক দুঃখান্ত পদের অস্তিত্ব মান্য করে। যাহাদের ভবিষ্যৎ মরণ, তাহাদের জন্য শাস্ত্র—নীতি। যাহাদের ভবিষ্যৎ স্বর্গনরকাদি, তাহাদের জন্য তৎপ্রাপ্তিপরিহারের উপায়ীভূত কর্ম্মকাণ্ড এবং যাহাদের ভবিষ্যদাশা মুক্তি, তাহাদের জন্য কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ, এই চার পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে যে-পথের অধিকারী, সে সেই পথ অবলম্বন করুক, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের ঘোষণা বা ডিণ্ডিম। শঙ্কর জ্ঞানপথের পথিকদিগের জন্য অদ্বয়বাদের দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন এবং রামানুজস্বামী ভক্তিপথের অধিকারীদিগের জন্য

ভক্তিবাদের দর্শন প্রচারিত করিয়াছেন। প্রমাণপ্রয়োগ প্রদর্শন করি বা না করি, কথাটা বলিয়া রাখি, শঙ্কর অদ্বয়বাদের প্রথমোপদেষ্টা নহেন এবং রামানুজস্বামীও ভক্তিবাদের আদিগুরু নহেন। রামানুজের পূর্ব্বেও অনেক মুনি-ঋষি ও আচার্য্য ভক্তির পন্থা বর্ণন করিয়াছিলেন, রামানুজ তাঁহাদের সেই বর্ণিত পথের সুগমতাবিধানমাত্র করিয়াছেন।

রামানুজ ভক্ত ও ভক্তিপথের উপদেষ্টা। ভক্তিপথের উপদেষ্টা হইলেও সকলকে ভক্তি-পথে যাইতে বলেন না। যাহারা প্রকৃত অধিকারী, যাহাদের চিত্ত দ্রুত হয়,—ভক্তিরসে বিগলিত হয়, তাহাদিগকেই বলেন, তোমাদের মুক্তির পথ এই। তিনি শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈত শুনিয়া,—মুক্তিতে জীব ব্রহ্ম হয়, এই উপদেশ শুনিয়া, কিছুমাত্র কোলাহল করেন না, কান্নাহাটিও করেন না, লাঠি বাহিরও করেন না, খড়্গাধারণও করেন না, উপহাসের হাসিও হাসেন না, বাতুলের প্রলাপ বলিয়া অদ্বয়বাদের উপেক্ষাও করেন না, এবং জীব ব্রহ্ম হইবে ভাবিয়া সাবেক তারা-শঙ্করী ভাষায় "হা হতোঽস্মি, হা দগ্ধোঽস্মি," বলিয়া রোদনও করেন না। তিনি উপযুক্ত অধিকারীদিগকে ডাকিয়া অতি ধীরভাবে বিনয়নম্রবচনে বলেন, "তোমরা আপনাকে ব্রহ্ম ভাবিতে পারিবে না, ভাবিলেও ব্রহ্ম হইতে পারিবে না, তোমরা ভাব—আমরা ব্রহ্মসমুদ্ভূত ব্রহ্মাংশ, এবং চিত্তকে তাঁহার ভক্তিরসে গলাইয়া সেই স্বাংশিব্রহ্মরূপ ছাঁচে ঢালিয়া দাও, দিয়া তৎস্বরূপ হইয়া তদীয় অসীম আনন্দে আপনার সসীম আনন্দ লুপ্ত করিয়া দাও। তাহাই তোমাদের মুক্তি, তাহাই তোমাদের ব্রহ্ম হওয়া এবং তাহাই তোমাদের সর্ব্বোচ্চ দুঃখাত্যস্থান—পরম পদ।"

মোক্ষধর্ম্মে যাইবার প্রথম সোপান নির্ব্বেদ, এ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজ উভয়ে একমত। শঙ্করও বলেন,—স্বীকার করেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।"

রামানুজও শ্লোকের অপরার্দ্ধে গিয়া বলেন—

"মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

উভয়েরই অভিপ্রায়—মানুষ কামনা ছাড়িয়া কর্ম্ম করিতে থাকুক, ক্রমে তাহার কামনাত্যাগ অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে, কামনাত্যাগ অভ্যস্ত হইলে নির্ব্বেদ বা ঐহিকবাঞ্ছাপরিহার আপনা হইতেই সম্পন্ন হইবে। কামনাত্যাগ না হইলে চিত্ত পরিমার্জ্জিত হয় না,—ক্রোধদ্বেষাদিদোষশূন্য হয় না, সুতরাং নির্ব্বেদও হয় না। নির্ব্বেদ না হইলেও, কি জ্ঞান কি ভক্তি, দুএর কোনটিই দেখা দেয় না।

কর্ম্ম যেমন নির্ব্বেদপ্রাপ্তির উপায়, তেমনি স্বর্গনরকপ্রাপ্তিপরিহারেরও উপায়। কামনাত্যাগযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা নির্ব্বেদলাভ ও কামনাযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা উভয় আচার্য্যেরই অনুমত। জীব বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গনামক দুঃখাসম্ভিন্ন সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে, আবার কর্ম্মবিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া নরকনামক যাতনাবিশেষ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থানে কর্ম্মবাদী আচার্য্যগণ বলেন, শঙ্কর ও রামানুজ ইঁহারাও বলেন, কামনাপূর্ব্বক বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পুণ্য জন্মে, পরে তাহারই সামর্থ্যে স্বর্গলাভ হয়। আর

স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকল বিধিবহির্ভূত বলিয়া পুণ্যের জনক হয় না, অধিকন্তু পাপেরই জনক হয়। অতএব, মানুষ যদি বিধির অধীন হইয়া চলিতে না পারে, তাহা হইলে সে অবশ্যই পাপী—জন্মাবধি পাপী। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বশে চলিতে শেখা অনেক বয়সে ঘটে, কাহার বা না-ও ঘটে। কাজেই মনুষ্য সাধারণত জন্মপাপী। এই সকল আর্ষমত যেন অনেকটা খৃষ্টানিমতের মত। খৃষ্টানেরা বলে, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী। প্রকারান্তরে ঋষিরাও বলিয়া গিয়াছেন, মনুষ্য জন্মাবধি পাপী।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
প্রসজ্যংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥"

খৃষ্টানেরা বলে, মানুষ পাপের ফলভোগ করিতে বাধ্য। ঋষিরাও বলেন—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

খৃষ্টানেরা বলে, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারক গড্ * পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য। ঋষিরাও বলেন—

"ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।"

খৃষ্টান বলে, যে তাঁহার শরণাগত, সে পাপ-মুক্ত হইবে। ঋষিরাও বলেন—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইত্যাদি।

এই তুলনা শুনিয়া হয় ত আজকাল-কার ঔপমিতিক ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া উঠিবেন, "কি আশ্চর্য্য! কি করিয়া ঋষিরা খৃষ্টানি স্যাল্‌ভেশন্ (salvation) শিখিলেন?" যাহাই হউক, মনুষ্য স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে বাধ্য বটে; পরন্তু মুক্তিতে নহে। মুক্তিতে অর্থাৎ জীবন্মুক্তির অবস্থায়—দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রারব্ধকর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়া থাকে, মুক্তপুরুষ তাহা সাক্ষীর ন্যায় কেবল দেখিয়া থাকেন, ভোগ করেন না। আর সঞ্চিতকর্ম্ম যাহা থাকে, তাহার ফলভোগ হওয়া দূরে থাকুক, মূলে ফলই হয় না। ফল ত হয়-ই না, তাহার অঙ্কুর পর্য্যন্তও হয় না। দগ্ধবীজের অঙ্কুরজননসামর্থ্য নষ্ট হওয়ার ন্যায় তদীয় সঞ্চিতকর্ম্মসকল জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়। আজকাল অনেকে আপনা-আপনি বেদান্ত দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা বলেন ও অকুতোভয়ে লেখেন—"মুক্তির পর অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর সুখদুঃখ কেন থাকিবে না? থাকিবে বৈ কি? বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে।" আমরা জানি ও লিখিয়া থাকি—সঞ্চিতকর্ম্মের ফল ভুগিতে হয় না, তাহা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়, ভৃষ্ট বীজের ন্যায় জননশক্তিরহিত হইয়া যায়। কাজেই তাহা ফলপ্রসবও করে না, ভুগিতেও হয় না। আজকাল ঐরূপ বেদান্তব্যাখ্যা অনেক। আরও দুচারটা ব্যাখ্যার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১। "তাহা আত্মার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব।"

আমরা জানি, বেদান্তপরিভাষিত অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে; পরন্তু ভাব।

* কেহ কেহ গড বলায় ঠিক তর্জ্জমা হয় না ভাবিয়া বলেন, খোদা।

অর্থাৎ তাহাও একপ্রকারের জ্ঞান এবং উহা—

"সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।"

২। "যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, তদ্দ্বারা ব্যক্ত-জগতের নির্ম্মাণ করে, অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলসূক্ষ্মভূতসমষ্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম সৃষ্টি।"

সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা সৃষ্টিকালে ভিতর-বাহির ছিল, আত্মার জ্ঞানরাশি আত্মা হইতে চতুর্দ্দিকে চলিয়া যায়, গিয়া জ্ঞেয়-পদার্থে বিবর্ত্তিত হইয়া জ্ঞেয়পদার্থে পরিণত করে, আত্মা আত্মার জ্ঞানরাশি নিক্ষেপ করে, এরূপ ব্যাখ্যা আমরা বেদান্তীদিগের নিকট কখনও শুনি নাই। বেদান্তীরা জ্ঞান-শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করেন। এক মনোবৃত্তি অর্থে, অপর চৈতন্য অর্থে। আত্মা যে জ্ঞানকে স্থূলসূক্ষ্মভূতসমষ্টিসৃষ্টির জন্য ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করেন, সে জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? আমরা জানি, দুইটির একটিকেও আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করেন না।

৩। "মোটা কথায় এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয়? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়।"

মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়, এ কথা বেদান্তীর কথা নহে। জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এ কথাও বেদান্তীর কথা নহে। ঐ কথা বলিলে লোকে হয় ত বুঝিবে, তবে বুঝি আমাকে লইয়া স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। যদি সে আমাকেই লইয়া, তবে তাহার সে স্বাধীন অস্তিতা কিরূপ স্বাধীন অস্তিতা? বেদান্তীরা জ্ঞানোদয়কে মুক্তি বলেন না; বলেন, জ্ঞানোদয় মুক্তির কারণ। মুক্তির পূর্ব্বে তাহার উদয় হইয়া থাকে।

৪। বেদান্তব্যাখ্যাতা শঙ্কর শারীরক-ভাষ্যের প্রারম্ভে বিশ্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন সত্য, এক ভাগ বিষয় ও এক ভাগ বিষয়ী, এ কথাও বলেন সত্য; পরন্তু বেদান্তীরা তদর্থে "বিষয়-আমি ও বিষয়ি-আমি," এরূপ ভাব বুঝেন না এবং "আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তাও আমি, কর্ম্মও আমি", এরূপ নিদর্শনও দেখান না। ইঁহারা কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধকে বড়ই অগ্রাহ্য ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। বেদান্তীদিগের শাস্ত্রে "বিষয়-আমার অর্থাৎ জ্ঞানগম্য-আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা, আর বিষয়ি-আমার বা জ্ঞাতা-আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা," এরূপ করিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মা বুঝান নাই। ইঁহারা জানেন বা বুঝেন, পরমাত্মা জ্ঞাতাও নহেন, বিষয়ীও নহেন। শারীরকভাষ্যের যে অংশে বিষয়বিষয়ীর কথা আছে, সে অংশ এই—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্-বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ-প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্।"

ইত্যাদি।

ইহারই কিয়দ্দূরে পূর্ব্বপক্ষ—

"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মা-

গাম্‌? সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি ?"

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আছে—

"ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ।"

এই অংশের স্থূল সংস্কৃত ব্যাখ্যা—

"অয়ম্‌ আত্মা একান্তেন নিয়মেন অবিষয়ো ন ভবতি। অত্র হেতুমাহ, অস্মদিতি। অস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহমিত্যধ্যাসঃ, তত্র ভাসমানত্বাদিত্যর্থঃ। অথবা অস্মদর্থশ্চিদাত্মা প্রতিবিম্বিতত্বেন যত্র প্রতীয়তে সঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহঙ্কারস্তত্র ভাসমানত্বাদিত্যর্থঃ।"

পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য— আত্মা অবিষয়, সেজন্য অধ্যাস অসম্ভব। উত্তরপক্ষের তাৎপর্য্য — ঐকান্তিক অবিষয় নহে, বুদ্ধিতত্ত্বে তদীয় প্রতিবিম্ব পড়ে, সেভাবে তদীয় প্রতিবিম্ব অহংবৃত্তির বিষয়। অপরোক্ষত্বাৎ কথার অর্থ —স্বপ্রকাশত্বাৎ। অতএব, "বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়," এ কথা ভাষ্যকারীয় কথা নহে। একজন উকিল বলিয়াছিলেন, দলিলের ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য যিনি অধিক কথা লিখিবেন, তাঁহার দলিলে তত অধিক ছিদ্র হইবে। প্রবন্ধলেখকেরাও যদি এক কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বারবার বহুবার না লেখেন, বৃথা প্রবন্ধশরীর বিস্তৃত না করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইতে পারে।

বহুবিস্তৃত করিলে প্রাসঙ্গিক কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া যায়, সেজন্য এই স্থানেই প্রসঙ্গোত্থাপিত কথায় বিরত হইলাম। এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রামানুজস্বামীর উপদেশ—মোক্ষার্থী মনুষ্য আপনার অধিকার বুঝিয়া অর্থাৎ অধিত্ব-সামর্থ্যবত্ত্ব বুঝিয়া হয় ভক্তির পথে যাউক, না হয় জ্ঞানের পথ অবলম্বন করুক। যাহার চিত্ত দ্রব হয়—রসে বিগলিত হয়, সে ভক্তিপথে যাউক। যাহার চিত্ত গলে না,—কিছুতেই গলে না, সে জ্ঞানের পথে যাউক। বিপর্য্যয় করিলে অনধিকারচর্চ্চা হইবে, অনধিকারচর্চ্চার ফল হয় না। যাহারা অধিকারের অনুগামী হইয়া চলে,—কার্য্য করে, তাহারাই প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হয়,—কৃতকার্য্য হয়, অন্যে অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে।

শঙ্কর বলেন, মোক্ষের একমাত্র পন্থা জ্ঞান, রামানুজ বলেন, তাহা ভক্তিসমুচ্চিত হওয়া আবশ্যক। যাহাই হউক, জ্ঞান অথবা ভক্তি, দুইটির একটিও সহজলভ্য নহে। শঙ্করের তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ও রামানুজের পরা ভক্তি কিরূপ প্রভেদযুক্ত, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শঙ্কর ব্রহ্মাকারা অখণ্ড-চিত্তবৃত্তিকে তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, রামানুজও ধ্যেয়ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তিকে পরা ভক্তি বলেন। সুতরাং তাহাও জ্ঞানবিশেষ। রামানুজ ব্রহ্মশব্দের অর্থে সম্পূর্ণ ষড়্‌গুণযোগী পরমেশ্বরের গ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই পুরাণাদিবর্ণিত নাম বাসুদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি। অতএব, শঙ্করের তত্ত্বজ্ঞান ও রামানুজের পরা ভক্তি, দুইটির একটিও সহজলভ্য নহে। দুইটিই দুঃসম্পাদ্য ও ধ্যানসাধ্য। এই ধ্যানসাধ্যতাবিষয়ে জ্ঞানবাদী শঙ্কর ও ভক্তিবাদী রামানুজ উভয়েই একমত এবং উভয়েই—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

এই স্মৃতিবাক্য মান্য করেন।

"যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মোহবদপরোক্ষাদৃতে।"

যেমন প্রণিধানজ সাক্ষাৎকার ব্যতীত উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা দিগ্‌ভ্রান্তি যায় না,—নিবৃত্ত হয় না, তেমনি ভাবনাময়ধ্যানজাত কিংবা প্রণিধানময়ধ্যানপ্রভব জ্ঞানবিশেষ ব্যতীত কেবল উপদেশে মুক্তির উপায় তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করা যায় না। ধ্যান দুইপ্রকার—এক ভাবনাময়, অপর প্রণিধানময়। সদ্বয়বাদী ও অদ্বয়বাদী উভয়েই উক্ত দ্বিবিধ ধ্যানের এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন—

"ভাবনাময়ং নাম নষ্টবনিতাদিবদসন্নিহিতবিষয়ং পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্‌। প্রণিধানময়ন্তু বস্তুতন্ত্রবিষয়ম্‌।"

বেদান্তীরা এই দ্বিবিধ ধ্যান বর্ণনা করিয়া বলেন—

"দ্বিবিধমপি ধ্যানং শুদ্ধং বস্তু প্রতিপিৎসোরাবশ্যকম্‌।"

যাঁহারা বিশুদ্ধ বস্তু জানিবার জন্য—ব্রহ্ম জানিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত দ্বিবিধ ধ্যান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রামানুজস্বামী এইস্থলে বলেন, প্রণিধানময় ধ্যান অপেক্ষা ভাবনাময় ধ্যান ভাল। সকলের পক্ষে না হউক, অন্তত ভক্তিমান্‌ অধিকারীর পক্ষে ভাল। বেদান্তীরা বলেন—

"ভাবনাময়ধ্যানেন বশীকৃতং চিত্তং ক্রমশো মূর্ত্ত্যাকারতঃ প্রচ্যাব্য অব্যক্তমাত্রাবলম্বনো ভূত্বা বিরাড়াদৌ কারণে ব্রহ্মণি চিত্তং প্রণিদধ্যাৎ। ততশ্চাস্যধ্যস্তস্য বিরাড়াদিত্রয়স্য রজ্জুসর্পস্যেব চিত্তস্থিরীকরণেন অধিষ্ঠানভূতশুদ্ধবস্তুদর্শনেন প্রবিলাপনকরণম্‌। তচ্চ দর্শনং দগ্ধেন্ধনানলবৎ স্বয়মুপশান্তং সৎ সুষুপ্তিসরূপা কাচিদানন্দাবস্থা আবির্ভবতি সা মুক্তিঃ।"

প্রচলিত বঙ্গভাষায় কথাগুলির ব্যাখ্যা বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। সেজন্য ব্যাখ্যা না বলিয়া, মাত্র স্থূল তাৎপর্য্যটুকু বলিতেছি। প্রথমত চিত্তকে ভাবনাময় ধ্যান দ্বারা বশীভূত করিতে হয়। চিত্ত বশীভূত হইলে অল্পে অল্পে ও ধীরে ধীরে সে মূর্ত্ত্যবলম্বন ত্যাগ করিয়া অব্যক্তাবলম্বী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বিশ্বকারণ বিরাট্‌, হিরণ্য ও ঈশ্বর তত্ত্বে প্রণিধানতৎপর হইতে হয়। প্রণিধানধ্যান স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে একপ্রকার সাক্ষাৎকারকারী জ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে। তাহাতেই, যেমন রজ্জুসাক্ষাৎকার হইলে তন্নিমেষে রজ্জ্বধিষ্ঠানের সর্পাবভাস লুকাইয়া যায়, তেমনি, আত্মাধিষ্ঠানস্থ বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর, এই তিন অবভাসও লুকাইয়া যায় এবং তৎসঙ্গে ব্যষ্টিনিয়মের বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, এ সকল অবভাসও (মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানপ্রভব কল্পনাসমূহ) বাধিত হইয়া যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে প্রণিধান বা ধ্যানপ্রবাহ, তাহাও কাষ্ঠভস্মকারী বহ্নির ন্যায় আপনা-আপনি উপশমপ্রাপ্ত হয়। এই উপশমের পর একপ্রকার সুষুপ্তিতুল্য অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থা তারতম্যবর্জ্জিত, পূর্ব্বাপরবিভাগশূন্য ও আদ্যন্তমধ্যরহিত আনন্দাবস্থা এবং এই অবস্থাই বেদান্তীদিগের অভিমতা মুক্তি। এই স্থানে রামানুজ বলেন, আদর, নৈরন্তর্য্য, ও সৎকার সহকারে ও অবিচ্ছেদে দীর্ঘকালব্যাপী ভাবনাময় ধ্যান করিতে করিতে অল্পে অল্পে জীব তন্ময় হইয়া যায়,—কীটবিশেষের পতঙ্গ হওয়ার অনুরূপে ধ্যেয়সারূপ্য অর্থাৎ ভগবৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সেই ভগবৎসারূপ্যপ্রাপ্তিই তাহার মুক্তি,—জীবন্মুক্তি, অন্য কোনরূপ মুক্তি নাই। সারূপ্যপ্রাপ্তি হইলে জীব দেহপাতের পর সম্পূর্ণ-

ষড়্ গুণ ভগবানের জগৎকর্তৃত্ব গুণ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় গুণ প্রাপ্ত হয় ও ভগবদ্-যাথাত্ম্য ও নিত্যনিরতিশয় নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। মুক্তপুরুষকে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না কেন? না, জন্মপরিগ্রহের কারণ বা বীজ কর্ম্মাশয় বা সঞ্চিতকর্ম্ম তাঁহার থাকে না, জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ হইয়া যায়। তাই তাঁহার জন্ম হয় না। একাত্মবাদীর মুক্তিতত্ত্ব বুঝাইতে গেলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি না হয় কেন? আমি, তুমি, তিনি, আমরা সকলেই সাধনা বা জ্ঞানপ্রাপ্তির চেষ্টা করি কেন? হিমালয়-গুহায় সন্ন্যাসী জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছেন, তিনি যখন মুক্ত হইবেন, আমিও তখন মুক্ত না হইব কেন? এইরূপ অনেকানেক আপত্তি খণ্ডন করিয়া সামঞ্জস্যরক্ষা করিতে হয়, না করিলে অপূর্ণতাদোষ থাকে।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

ত্রিবঙ্কুর।

৩

ত্রিবঙ্কুরে এই-যে প্রথম রাত্রি আমি অতি-বাহিত করিতেছি, এই রাত্রির শেষভাগে আমার ছাদের উপর একটা ভীষণ কোলাহল উপস্থিত। হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, তাহার পর লড়ালড়ি। আমার নিবাসগৃহ চারি-দিকে খোলা, এই মনে করিয়া আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব ছিল। এখন যেন আমি আধো-ঘুমন্ত অব-স্থায় দেখিতে পাইলাম, কতকগুলা বড়-বড় বিড়াল লম্ফঝম্প দিয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতাহেতু ও গৃহের মধ্যে কাঠের কাজ অধিক থাকায়, বেশি শব্দ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আসলে উহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বনবিড়ালের পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্তদিন উহারা উদ্যানস্থ বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায়; রাত্রিকালে শিকারে বাহির হইয়া আত্মবিনোদন করে এবং ধৃষ্টতাসহকারে মনুষ্যরাজ্য আক্রমণ করে।

অতি প্রত্যূষে, ত্রিবন্দ্রমে আমার মনে একটা বিষাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। উষার প্রথম আরম্ভেই, ভীষণ একটা শোকসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। শব্দটা যেন একটু দূর হইতে আসিতেছে,—ব্রাহ্মণের সেই পূতভূমি হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। হাজার-হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; উহা যেন সমস্ত মানবমণ্ডলীর আর্ত্তনাদ; সমস্ত মানব-মণ্ডলী যেন জাগ্রত হইয়াই আবার সেই চির-ন্তন পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিতেছে—মৃত্যুচিন্তার ভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহার পরেই, বিহঙ্গেরা নব-ভানুকে অভি-বাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বসন্তকালে

উহারা আমাদের ফলবাগানে যেরূপ মৃদু-লঘু-ধরণে সুমধুর প্রভাতী গাহিয়া থাকে, ইহাদের সঙ্গীত সেরূপ নহে।

এখানে, 'নকুলে' টিয়াপাখীর স্থূল কণ্ঠস্বরে—বিশেষত কাকের শোকবিষাদময় চীৎকারে ছোট-ছোট পাখীর কলধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রথমে, সঙ্কেতস্বরূপ পৃথক্‌ভাবে দুইএকটা কা-কা-শব্দ সুরু হয়, তাহার পর শতকণ্ঠে—সহস্রকণ্ঠে কা-কা-শব্দের ভীষণ সমবেত-সঙ্গীত বাহির করিয়া, কাকেরা পূতিগন্ধি শবদেহের জয়ঘোষণা করে। ......কাক, কাক, সর্ব্বত্রই কাক, ভারত-ভূমি কাকে আচ্ছন্ন; বরাবর দেখিতেছি,—ত্রিবঙ্কুরে, এই মনোমুগ্ধকর শান্তিময় রাজ্যে,—উষার আরম্ভ হইতেই উহাদের চীৎকারে তালতরুমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং যাহারা উহার সুন্দর পত্রপুঞ্জের নীচে বাস করে ও জাগ্রত হয়, তাহাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাকেরা যেন এই কথা বলে:—"সমস্ত মাংস কখন্ পচিয়া উঠিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা এখানে আছি, আমাদের খাদ্য নিশ্চিত মিলিবে, আমরা সমস্তই আহার করিব।"......

তাহার পর, তাহারা চারিদিকে উড়িয়া যায়, আর তাহাদের সাড়াশব্দ থাকে না। আবার মনুষ্যের দূর-কোলাহল শ্রুত হয়;—অতীব প্রবল, অতীব গভীর; বেশ বুঝিতে পারা যায়, অসংখ্য ব্রাহ্মণ কোন বৃহৎ মন্দিরে সমবেত হইয়া স্বকীয় দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। তাহার পরেই, 'ত্রিবন্দ্রম'-নগর যে তালকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, তাহার চারিদিক্ হইতে ঢাক-ঢোল, করতাল-শব্দে মিশ্রিত কল্লোল এখানে আসিয়া পৌঁছে। অরণ্যের মধ্যে যে সকল ছোট-ছোট দেবালয় ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দিরে ইহাই দিবসের প্রথম পূজা।

অবশেষে সূর্য্যের উদয় হইল। সম্পূর্ণ-অবারিত এই সকল গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল। অত্রত্য গৃহ ও নৈশপদার্থের মধ্যে স্তম্ভ ও পাতলা 'চিক্' ভিন্ন আর কোন অন্তরাল নাই। এই আলোকে, এই সুন্দর চমৎকার আলোকে, এই সুমধুর সময়ে, উষার সমস্ত বিষণ্ণতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। আমি উদ্যানে নামিলাম।

তালবনের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় এই উদ্যানটি অবস্থিত। ইহার মধ্যে কত শাদ্বলভূমি, কত গোলাপি-রঙের ফুলের বৃক্ষ, কত পর্ণতরু (Fern); উত্তপ্ত আর্দ্র-স্থানেই এই পর্ণতরুগুলি জন্মায়। এরূপ অপূর্ব্ব পত্রপুঞ্জ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এইজাতীয় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষই এখানে আছে। কোন কোন পাতায় ফুলের মত রং; কোনটা ঘোর লাল, কোনটা বেগ্‌নি, কোনটা ফিঁকে রক্তবর্ণ; কোনটায় সরীসৃপজাতীয় জীবদিগের পৃষ্ঠের ন্যায় ডোরাকাটা; আবার কোনটার গায়ে, প্রজাপতির পাখায় যেরূপ থাকে, সেইরূপ চোখ আঁকা।

প্রাতে ৭টায়—যে সময়ে তরুবীথিমণ্ডপতলে নিশার শৈত্য একেবারে চলিয়া যায় নাই—সেই সময়েই এখানকার লোকদিগের দেখাশুনা করিবার, লোক-লৌকিকতা করিবার সময়।—অস্মদ্দেশীয় রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি সংবাদ পাইলাম, কাল এই

সময়ে, রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য, আমাকে ব্রাহ্মণগণেরই মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি,—ঐ ভূতলবৃক্ষ, এত ছায়া সত্ত্বেও, ঊর্দ্ধগগনাবলম্বী সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনপ্রবাহ যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই ঘুমন্ত ভাব, সর্ব্বত্রই নিস্পন্দতা; সেই চিরন্তন বায়সেরাও নিস্তব্ধ,—পত্রপুঞ্জের নীচে ভূতলে উপবিষ্ট।

আমার বারণ্ডা হইতে যে রাস্তাটি দেখিতে পাইতেছি, উহা হরিতের নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহা লোকশূন্য থাকিবে। এখনও দুইচারিজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে; উহারা নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতবাসী অথবা ভারতবাসিনী; পরিধানে একইরকম লালধুতি; উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ তাম্রাভ গাত্র—নগ্নপদে নিঃশব্দে চলিতেছে। লোকদিগের লাল্‌চে-রঙের কাপড়; এবং উহারা লালমাটির উপর দিয়া চলিতেছে; এদিকে তালপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ;—এই বৈপরীত্য-সংযোগে লালরঙের আরো যেন খোল্‌তাই হইয়াছে। কখন-কখন, কোন নিঃশব্দ গুরুপদক্ষেপে পথভূমি কাঁপিয়া উঠিতেছে। উহা হস্তীর পদক্ষেপ। মহারাজার হস্তিগণ, কোনো মেঠো কাজ সমাধা করিয়া, চিন্তামগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে; উহারা হস্তিশালায় গিয়া এইবার নিদ্রা যাইবে। ইহার পর, আর কিছুই শুনা যায় না। কেবল যে সকল জীব স্বকীয় স্বাভাবিক গতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই তরুনিবাসী চটুল কাঠবিড়ালীরা চারিদিক্‌কার নিস্তব্ধতায় সাহস পাইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সায়াহ্নে, যখন মনুষ্যের চেষ্টা-উদ্যম আবার আরম্ভ হইল, তখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহারাজার গাড়িতে আমি আরোহণ করিলাম। অশ্বদিগের দ্রুতগতিতে আমার মনে যেন একটা শৈত্যবিভ্রম উপস্থিত হইল।

এখন, ত্রিবন্দ্রমনগরের আর-এক নূতন বিভাগ আমার চতুষ্পার্শ্বে প্রসারিত। এখন আর বৃক্ষের আধিপত্য নাই,—শাদ্বলভূমি উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কতকগুলি বালুকাকীর্ণ সুন্দর বীথি প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক-ধরণের রাজধানীতে যে সকল দ্রষ্টব্য বস্তু থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই উদ্যানসমূহের অভ্যন্তরে বিকীর্ণ রহিয়াছে:—মন্ত্রণাভবন, আতুরাশ্রম, কর্জ্জ-কুঠী, বিদ্যালয়। এ সব জিনিস তত বেসুরো-বেখাপ্পা বলিয়া মনে হইত না,—যদি একটু ভারতীয়-ধরণে গঠিত হইত; কিন্তু, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই একই প্রকারের রুচিদোষ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, এখানে প্রটেস্‌টান্ট, ল্যাটিন ও সিরিয়া সম্প্রদায়ের বিবিধ খৃষ্টান গির্জ্জাদিও আছে। এই সিরিয়া-সম্প্রদায়ের গির্জ্জাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং উহাদের সম্মুখভাগের আকৃতিটি নিতান্ত সাদাসিদা-ধরণের। কিন্তু সে যাহাই হোক, এ সমস্ত দেখিতে আমি ত্রিবন্দ্রমে আসি নাই। এখন আমি বুঝিতেছি, ব্রাহ্মণভারতের—রহস্যগভীর ভারতের সংস্পর্শে আসা কতটা কঠিন,—যদিও সেই জীবন্ত ভারত, সেই অপরিবর্ত্তনীয় ভারত

আমার খুব নিকটেই রহিয়াছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি এবং উহার মহারহস্য আমার চিত্তকে সততই বিক্ষুব্ধ করিতেছে।

নগরের এই নব অঞ্চলটির বাহিরে, যে সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সমস্ত নীচজাতীয় হিন্দুরা বাস করে, তাহার উপর তাল-তরুর হরিৎ খিলান প্রসারিত। বাঁশের ছোট-ছোট বাড়ী, পাথর ও খড়-পাতার ছোট-ছোট পুরাতন দেবালয়, সেই চিরন্তন নারিকেলপুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন; এই স্থানটি ছায়ার রাজ্য এবং ইহার বীথিগুলি তমসাচ্ছন্ন উদ্ভিজ্জের ঢাকা-বারণ্ডা-পথ বলিয়া মনে হয়।

কেবল একটিমাত্র রীতিমত রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া, নক্ষত্র-পরিদৃশ্যমান একটা মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িলাম এবং এই রাস্তা দিয়াই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র গণ্ডির দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই রাস্তাটি বণিক্-বীথি; নিস্তব্ধপ্রায় এই যে নগর, ইহার যাহা-কিছু চলাচল, যাহা-কিছু কোলাহল, সমস্তই এইখানে কেন্দ্রীভূত। সায়াহ্নের এই সময়ে, এই রাস্তাটি লোকাকীর্ণ; এইখানে ঘোড়াদিগকে একটু আস্তে-আস্তে চালাইতে হইল। লোকদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন সব দেবমূর্ত্তি, এমনি সুন্দর মুখশ্রী, এমনি শোভন-গম্ভীর দাঁড়াইবার ভঙ্গি এবং সুগভীর অন্তঃস্পর্শ চোখের দৃষ্টি।

এই লোকদিগের বাহু ও গাত্র যেন তাম্র-ধাতুতে কোঁদা—চূড়ান্ত গঠন-উৎকর্ষে ও সুচারু ভঙ্গিমায়, পুরাতন গ্রীসের উৎকীর্ণ চিত্রমূর্ত্তির সদৃশ।

সূক্ষ্মরুচি ও মহাগৌরবান্বিত উন্নতপদবি ব্রাহ্মণেরা লজ্জাসজ্জা তুচ্ছ করিয়া, নিকৃষ্ট-বর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা—এমন কি, পারিয়াদিগের অপেক্ষাও স্বল্প পরিচ্ছদে যাতায়াত করিতেছে। শাদা কাপড়ের ধুতি কোমরে জড়ানো এবং তাহাই নগ্নবক্ষের উপর, চাপ্‌রাসের মত বক্রভাবে গিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে; সেই নগ্নবক্ষে ছোট একটা শণ-সূতার দড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই বর্ণভেদের বাহ্যচিহ্ন; জন্মাবামাত্রই পুরোহিত উহা গলায় বাঁধিয়া দেয়; উহা কস্মিন্‌কালেও আর ত্যাগ করিবার জো নাই; এই পবিত্র যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণের জীবন-মরণের সাথী। উহাদের ললাটদেশে, গভীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে স্বকায় ইষ্টদেবতার সাঙ্কেতিক নাম অঙ্কিত থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এই চিহ্নটি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পরে উহাদিগকে নূতন করিয়া সযত্নে ললাটে অঙ্কিত করিতে হয়। একটা লাল ফোঁটা ও তিনটা শাদা রেখা—ইহাই শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন; বৈষ্ণবদিগের একপ্রকার শাদা ও লাল রঙের ত্রিশূলরেখা, যাহা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি আমাদিগের পক্ষে নিতান্তই প্রহেলিকা।

স্ত্রীলোক খুব অল্প কিংবা নাই বলিলেই হয়—যদিও প্রথমদৃষ্টিতে, গ্রন্থিবদ্ধ বা স্কন্ধের উপরে বিলম্বিত সুচিক্কণ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দেখিয়া পুরুষদিগকে স্ত্রীলোক বলিয়া সর্ব্বত্রই ভ্রম হয়। যে সকল স্ত্রীলোক দেখা যায়, তাও আবার অতি নীচবর্ণের—তাহাদের

মুখশ্রী রাস্তার মজুররমণীদিগের ন্যায় নিতান্ত ইতরধরণের। অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও কন্যাগণ এই পবিত্র গণ্ডির মধ্যে বাস করে। সন্ধ্যার সময় উহারা দলে দলে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সমস্ত বাড়ী,—যাহা গতরাত্রে, নীলাভ-প্রশান্ত-কিরণ-তলে, নিদ্রামগ্ন ও মুদ্রিতনেত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল—এক্ষণে উহা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এখন উহাতে বাজার বসিয়াছে; ফল, শস্য-দানা, রঙিন ফুলের ছাবা-দেওয়া মিহি কাপড়; সোনার মত ঝক্‌ঝকে পিতলের সামগ্রী:—এই পিতলের সামগ্রীর মধ্যে, বহুডালবিশিষ্ট পাতলা-গঠনের প্রদীপ—খুব উচ্চ পায়ার উপর বসানো—(যেরূপ 'পম্পে'তে দেখিতে পাওয়া যায়); বিবিধপ্রকার পূজার বাসন ও পাত্র, এবং হস্তীর উপর আরূঢ় দেবদেবীর মূর্ত্তি।

তাহার পর, আমার প্রদর্শকমহাশয় আমাকে কতকগুলি কুমারের কর্ম্মস্থান দেখাইলেন। এই সকল কারখানা বর্ত্তমান মহারাজার স্থাপিত। এখানে সুন্দর প্রাচীন-ধরণে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়।—আর কতক-গুলি কারখানা দেখিলাম, যেখানে রাজ-পুতানা ও কাশ্মীরপ্রচলিত রঙের অনু-করণে পশমের গালিচাদি তৈয়ারি হয়। অবশেষে কতকগুলি শিল্পশালা দেখিলাম, যেখানে ধৈর্য্যশালী ক্ষোদকেরা নিকটস্থ অরণ্যহস্তীদিগের দন্ত কুঁদিয়া দেবদেবীর ছোট-ছোট সুন্দর মূর্ত্তি অথবা চামরের ও ছাতার ডাণ্ডি নির্ম্মাণ করিতেছে।

কিন্তু এ সব দেখিবার জন্য আমি ত্রিবন্ধুরে আসি নাই। রাজপ্রাসাদগণ্ডির বাহিরে ও নিষিদ্ধপ্রবেশ বৃহৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে—যাহা নিতান্তই ভারতীয়—যাহা ভারতের একেবারে নিজস্ব-জিনিস—কেবল তাহাই দেখিবার জন্য আমার মন আকৃষ্ট হয়।...

ত্রিবন্ধুরে একটি পশু-উদ্যান আছে; আমাদের য়ুরোপীয় রাজধানীসমূহের পশু-উদ্যান-গুলির ন্যায় এটিও সযত্নরক্ষিত;—ইহাতে হরিণদিগের বিচরণভূমি আছে, কুম্ভীরের চৌবাচ্ছা আছে:—এইরূপ স্থান অতি বিরল; শ্বাসরোধী নিবিড় তালপুঞ্জের ছায়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানটিতে আসিয়া অরণ্য ও জঙ্গলের দূরদৃশ্য একটু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলি শাদ্বলভূমি আছে, যাহার চারিধারে দুর্লভ গাছের চারা ও বড় বড় বিদেশী ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছে। এই অংশটি এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, এখানে বেশ নিরাপদে বিচরণ করা যায়; কেন না, এখানকার তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সযত্নে ছাঁটা, এবং যে সকল ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্রজন্তু এখান হইতে দশ ছয়সাতক্রোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করে—এখানে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ। সূর্য্য এখন আর জগৎকে দগ্ধ করিতেছে না—রাত্রিও আসিয়া পড়ে নাই; এই অল্পস্থায়ী মনোহর সময়টিতে একদল ঐকতানবাদক, উদ্যানের দ্বারহীন চারিদিক্‌-খোলা একটি ক্ষুদ্র বিনোদমন্দিরে বাজাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়; উহারা য়ুরোপীয় সুর অতি বিশুদ্ধভাবে বাজায়। বালুকাবিকীর্ণ উদ্যানের সুঁড়িপথগুলিতে অধিষ্ঠিত—দুর্লভ

শ্রোতৃবর্গের মধ্যে—কতকগুলি পাত্‌লা-পাত্‌লা নগ্নগাত্র ব্যক্তি অবস্থিত; শ্বেতজাতীয় দুই-চারিটি খোকা-খুকি—(শ্বেতজাতির মধ্যে দুইচারিজনমাত্র এখানে আছে) রং খুব ফ্যাকাসে—ভারতীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত। তা ছাড়া, দেশীয় শিশুও কতকগুলি ছিল—রাজাদের ছেলে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন তাহারা আর নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে না, পরন্তু উদ্ভট-অদ্ভুত পাশ্চাত্যপুতুলের ছদ্মবেশ ধারণ করে; তাম্রবর্ণসত্ত্বেও এই নরপুত্তলিকাগুলি অতি সুন্দর, আর চোখগুলিও খুব বড়-বড় ও কালো মখমলের মত। এই পশু-উদ্যানটি একটু উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দূরস্থ ভারতসমুদ্র অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ সমুদ্রে জাহাজ নাই; অন্যদেশে সমুদ্র বাহ্যজগতের সহিত গতিবিধির পথ বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু এ অঞ্চলের সমুদ্রটি একেবারেই অব্যবহার্য্য ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী;—যোগনিবদ্ধ করা দূরে থাকুক, বাহ্যজগতের সহিত উহা যেন আরও বেশি পৃথক্ করিয়া দেয়। কেন না, এই উপকূলের কোথাও একটি বন্দর নাই; এমন কি, একখানি নৌকাও নাই, ধীবরও নাই, কেবল চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বীচিমালা। ত্রিবঙ্কমের এই 'সৌখীন' দিবাবসানসময়ে যখন কেবলমাত্র দুইচারিটি বেচারি খোকা-খুকির জন্য ঐকতানবাদ্য বাদিত হয়, তখন ঐ দূরস্থ সমুদ্রের উপচ্ছায়া প্রবাসীর মনে কষ্ট ও বিষাদের ভাব আরো যেন বাড়াইয়া তুলে।

এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন—বড় শীঘ্র অস্ত গেলেন:—ক্ষণেকের জলন্ত মহিমা; দেখিলে মনে হয়, যেন রক্তবর্ণ ভূমির উপর গোলাপি রংমশালের আলো, এবং তৃণপুঞ্জের উপর—দিগন্তব্যাপী দুর্ভেদ্য বনভূমির উপর—সবুজ রংমশালের আলো পতিত হইয়াছে। তাহার পর অতি শীঘ্র (সহসা বলিলেও হয়) রাত্রির আবির্ভাব হইল। এখানে দীর্ঘ-বিলম্বিত গোধূলি নাই—ঠিক্ একই অপরিবর্ত্তনীয় সময়ে রাত্রি আসিয়া পড়ে—আমাদের দেশের ন্যায় এই সময়টি ঋতুর উপর কোন প্রভাব প্রকটিত করে না। উদ্যানে রাত্রিটা যেন আরো বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে—কেন না, ইহার ঝোপ্‌ঝাড়ের সুঁড়িপথে, তাল-পুঞ্জের নীচে—চতুর্দ্দিকের সকল স্থানই ইহারই মধ্যে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সময়ে ব্রহ্মার মন্দির হইতে একটা কোলাহল উত্থিত হইল; আর সমস্ত অন্যান্য ইতস্ততোবিকীর্ণ মন্দির হইতে, প্রাতঃকালের ন্যায়, আবার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নারিকেল-তৈল-সিক্ত শতসহস্র প্রদীপ বনভূমিতলে প্রজ্বলিত হইল এবং এই লাল আগুনের আলোকচ্ছটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথসমূহে প্রসারিত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবাহযাত্রী।

[ছবি]

দেখ্‌লাম একটা যাচ্ছে বিয়ে
সমারোহে রাস্তা দিয়ে।—
রাস্তার দুধার চলেছে দুই 'এসেটেলিন্ ল্যাম্পের' সারি;
প্রথমত ঢোল ও কাঁশী,
তাহার পরে দক্ষ বাঁশী,
তাহার পরে গোরার বাদ্য, তাহার পরে সানাইদারি;—
বাঁশী, সানাই, ঢক্ক, ঢোল,
কচ্ছে মিলে হট্টগোল;
সবই আছে, নাইক কেবল মৃদঙ্গ ও হরিবোল!

একটি যুবা—সুগৌর, হ্রস্ব,
চড়ে' একখান চতুরশ্ব
মন্দগতি 'ফেটিনাখ্য' যানে, যাচ্ছেন সগৌরবে;—
অতি সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি;
পরনে তাঁর রেশ্‌মি কূর্ত্তি,
রেশ্‌মি ধুতি, জরির টুপি;—বয়স বছর পঁচিশ হবে;—
সুবিস্তৃতপরিসর,
যেন বিন্ধ্য মহীধর,
কিম্বা ইন্দ্র ঐরাবতে;—তিনি হচ্ছেন বিয়ের বর।

পিছনে তাঁর, ইতস্তত,
ধূমকেতুর লেজের মত,—
আস্‌ছে নানাবিধ শকট অন্নবিস্তর অন্ধকারে;
তাতে বরযাত্রিবর্গ—
(তাঁরা মাত্র উপসর্গ)
এ কার্য্যে প্রকারান্তরে সমুৎসাহ দিতে তাঁরে।

(দিলেন দণ্ডবিধির মাপ
বিয়ে যদি হ'ত পাপ,—
তাঁদেরও এ বিয়ের জন্য পেতে হ'ত মনস্তাপ।

—এখন এটা বড়ই ইতর
বরের আসল মনের ভিতর
কিরকমটা হচ্ছিল, তা খুঁচিয়ে দেখা বারেবারে ;
সে সময়, সে স্থানে, জানি,
সে ব্যাপারে, একটুখানি
তাঁহার মনে মনে গর্ব্ব,—সে ত স্বতই হতেই পারে ;
'ওয়েলিংটন্' 'ওয়াটার্ল'জয়
করেছিলেন যে সময়,
তখন জয়ীর মনের ভাবটা হওয়াও তাঁর আশ্চর্য্য নয় !

সুসজ্জিত দিব্যসাজে ;
নানাবিধ বাদ্য বাজে ;
তা'তে 'এসেটেলিন্' আলো ; তা'তে চতুরশ্ব গাড়ি ;
[যদিও সে বাহকস্কন্ধে
অবস্থিত 'ল্যাম্পের' গন্ধে
বাল্যে ভুক্ত মাতৃদুগ্ধও উঠে আসে জঠর ছাড়ি' ;
যদিও সেরকম সাজ
পর্ব্বে আমার হ'ত লাজ,—
বিংশ শতাব্দীতে একটু বেশী পৌরাণিকী ধাঁজ ;

যদিও সে গাড়িখানা
কোথাও কর্জ্জ করে' আনা ;
বরযাত্রী—দূরে থাকুক দেখা বরে সসম্মানে—
বরের সজ্জা, ধরণ দেখে,
হাস্‌ছে মুখে রুমাল ঢেকে ;
তাকাচ্ছিলও পথিকবৃন্দ বরের চেয়ে গোরার পানে ;
যদিও সে বাদ্য—হোক
কেবলমাত্র গোলোযোগ ;—
বাদক এবং শ্রোতার পক্ষে দস্তুরমত কর্ণভোগ ;]

তথাপি সে বরের পক্ষে,
(অন্তত তাঁর নিজের চক্ষে)
সে রাত্রিটি ভবিষ্যতে স্মরণীয় পৃথক্ করে';
দেখ্‌ছিলেন সে সমারোহে
একটু হর্ষে, একটু মোহে,
একটু বিচলিত বক্ষে, একটু যেন নেশার ঘোরে;
শুন্‌ছিলেন সে বাদ্যরব
মধ্যে যেন আত্মস্তব—
(ভাবী বধূর মনের শব্দ শোনাও নয় ক অসম্ভব!)

দেখ্‌ছিলেন "এ কোথা থেকে,
দু গণ্ডে অলক্ত মেখে,
পেশোয়াজে মর্ত্তে নেমে এসেছে অপ্সরাবর্গ?"
ভাব্‌ছিলেন "সে—ভাবী বধূ
(বাহিরে-অন্তরে মধু)
মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গ থাকে—সেই স্বর্গ,—সেই স্বর্গ!
পূর্ণ সর্ব্ব মনোরথ;—
প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ
ব্যাপি', একটা পুষ্পকীর্ণ আলোকিত ভবিষ্যৎ।"

ভাব্‌ছিলেনও করে' দম্ভ—
"হোল অন্ত যে আরম্ভ,
গীতিঝঙ্কারিত, দীপ্ত, প্লুত পূর্ণমহোৎসবে;
হোল সে আরম্ভ যদি,
সে আরম্ভ নিরবধি,—
কালের মত ব্যাপ্তির মত কভু না সমাপ্ত হবে;
[যদি বা সমাপ্ত হয়
দর্শকবৃন্দ সমুদয়,
পড়ে' গেলে যবনিকা, 'আঙ্কোর' করবে অতিশয়"]

ভাব্‌ছিলেন না তিনি "আছে
এই আরম্ভটির পাছে,
অনেক বিরাগ, অনেক বিবাদ, অনেক বিশ্রী গণ্ডগোলে;

অনেক বাক্যহানাহানি ;
গর্জ্জনবর্ষণ অনেকখানি ;
অনেক অভিব্যক্ত ইচ্ছা—'বাঁচি আমার মরণ হোলে'।
পরে অভিজ্ঞতালাভ—
আরম্ভটি অমিতাভ ;
তৃতীয়াঙ্ক-কাছাকাছি কিন্তু একটু অসদ্ভাব।"

ভাব্‌ছিলেন না "পরিশেষে,
পঞ্চমাঙ্কে পড়্‌লে এসে,
পিছন থেকে লৌহহস্ত একটির এসে ধর্ব্বে টুঁটি ;
নিঠুর কঠিন কঠোর ভাবে,
টুঁটি ধরে' নিয়ে যাবে ;
চিরকালের জন্য সেদিন ভিন্ন হবে হৃদয়দুটি ;
এ রহস্য হবে ভেদ ;
ঘুচে যাবে সকল খেদ ;
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়্‌বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ !"

—ভালবাসে শ্রোতা, পাঠক,
বটে, 'মিলনান্ত নাটক' ;
কিন্তু আমরা অসমাপ্ত গল্প শুধু শুনাই তথা ;
পূর্ণজীবন যদি লিখি,
দেখাই সেটির সমাপ্তি কি,
সব নাটকই 'বিয়োগান্ত'—কহি যদি সত্য কথা ;
সব নাটকের শেষে হায়
একই দৃশ্য ;—সমুদায়
সেই একই চিতানলে ধূধূ করে' পুড়ে যায়।

এই যে রাত্রি আঁধার স্তব্ধ ;
উঠ্‌ছে যে এই ঢাকের শব্দ
নিস্তব্ধতার বিজনদুর্গ লুঠে নিতে বারেবারে ;
অন্ধকারকে ছিন্ন করে',
ব্যঙ্গ করে', ভিন্ন করে',
জল্‌ছে যে এই আলোকশ্রেণী সমুদ্ধত অহঙ্কারে ;—

পরে স্তব্ধ হবে রব,
আঁলোক নিভে যাবে সব,
—নিমেষের দণ্ডব্যাপী স্পর্দ্ধা তখন কর্ব্বে অনুভব।

অন্ধকারের বিরাট্ রাজ্য ;—
তাহে জ্যোতি হচ্ছে বাহ্য,
হচ্ছে লুপ্ত,—সাগরবক্ষে দ্বীপের মত, ইতস্তত ;
মহাব্যাপ্তি গভীর স্তব্ধ ;—
তা'তে কোটি মহাশব্দ
উঠে-নামে, পরিব্যাপ্ত সাগরবক্ষে ঢেউয়ের মত ;
মরণসিন্ধু বিশ্বময়
ছেয়ে আছে সমুদয় ;
জীবন তাহে বিম্বসম উদয় এবং বিলীন হয়।

—হে কাম্য বিবাহযাত্রি !
এই যে আলোকিত রাত্রি,
এই যে যাত্রাসমারোহ, দেখ্‌ছ অন্ত সগৌরবে ;
ভাব্‌ছ কি হে—একদিন আবার
(বটে সময় হ'লে যাবার)
একদিন আবার অন্যরকম সমারোহে যেতে হবে ?
(তবে কিনা সেটা ঠিক
নয় ক শ্বশুরবাড়ীর দিক্—
আলোক কিম্বা বাদ্যও তা'তে থাক্‌বে নাক সমধিক।)

সেদিন—বিনা গণ্ডগোলে,
(ছন্দমুদ্দ হরিবোলে)
মন্দগতি বাহকস্কন্ধে সোজাপথে চলে' যাবে !
(এমন সমারোহ—আহা !—
তুমিই দেখ্‌বে নাক-তাহা ;
কিন্তু পথের অন্যসকল পথিকমাত্রই দেখ্‌তে পাবে ;
দেখ্‌বে তারা—যাচ্ছ বেশ,
নাইক কষ্টদুঃখলেশ ;
কিন্তু যারা নিয়ে যাচ্ছে তাদের কষ্টের পরিশেষ।)

আপন ব্যক্তি সময় দেখে,
তোমার আপন বাড়ী থেকে
কর্ব্বে সেদিন বহিষ্কৃত, নিয়ে যাবে দড়ির খাটে
তোমার আপন দেহ, 'বাসি'
হবামাত্রই, অবিশ্বাসী ;
পুড়িয়ে তারে, নেহাইৎ একা রেখে আস্‌বে শ্মশানঘাটে।
(বেশী কিম্বা অল্প হোক)
দুদিন তারা কর্ব্বে শোক ;
পরে আবার অন্যজনে করে' নেবে আপন লোক।

—হে কাম্য শকটারূঢ়!
বল্‌ব না আজ সে নিগূঢ়
সেই নিত্য সত্য রূঢ়।—তোমার সুখের রাত্রি হেন!—
তোমার সুখে সমুৎসাহে
কেবা বাধা দিতে চাহে ?
তোমার পূর্ণ শরচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত কর্ব্ব কেন ?
যাও বিয়ে কর্ত্তে যাও ;
—সে সব কথা ভেব না-ও
অদ্য তোমার সুখের রাত্রি—যত পার হেসে নাও।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দিল্লির শিল্পপ্রদর্শনী।

দিল্লিদরবারের বিরাট্‌ ব্যাপারের মধ্যে যাহা-কিছু খাঁটি, যাহা-কিছু দ্রষ্টব্য, যাহা-কিছু শিক্ষার জিনিষ, সমস্তই তাহার শিল্পপ্রদর্শনীতে ছিল, ভারতবাসিমাত্রকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপ-আমেরিকা, জাপান-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দূরদেশ হইতে,—ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাগত দর্শকবৃন্দ এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, 'ভারতের শিল্প' আজও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার তুলনা অন্যত্র সম্ভবে না। প্রাচীনতার জন্য ভারত গরিমা করে বটে—কিন্তু এ গরিমার যথেষ্ট কারণ আছে। এ গরিমা গায়ের জোরে, মুখের তোড়ে, কলের বলে, রাক্ষসপ্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সেদিনের

সভ্যতার প্রচণ্ড উত্তাপের ঝলমলানি প্রতাপে হয় নাই। ভারতে প্রাচীনসভ্যতার যে একটা সাহিত্য ছিল, আর্য্যদিগের যে প্রদীপ্ত প্রতিভা—যে আরাম ও শান্তিশীতল ধীরতা ছিল, তাহারই মাহাত্ম্যে এক সুনিপুণ শিল্প সেই পুণ্যভূমির নানা স্থানে নানা জাতির মধ্যে আবহমানকাল নিহিত হইয়া ছিল;—হিন্দু-সাম্রাজ্যপতনের পর মুসলমান তাহাকে মাল্য-দান করিতে কৃপণতা করে নাই,—শিক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই,—ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে নাই।

বিদেশী রাজাদের আমলেও ভারত-শিল্প ভূপতিবর্গের আপাদমস্তক ভূষিত করিত,—অন্দরমহলে মহিষীগণের দেহ-কান্তি বাড়াইতে ব্যস্ত থাকিত,—বিলাসিতার একমাত্র সহায় হইত;—তখন অঙ্গশোভা-বৃদ্ধির অনন্ত উপায় ছিল ভারতশিল্প। মুসলমান বাদশাহগণ শিল্পের আদর করিতে যাইয়া ভারতবর্ষকে যেন আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন। ভারতললনা রাজ-অন্তঃপুরে মহিষী হইলেন—ভারতশিল্প তাঁহাদের মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সাজাইয়া দিল। কাঠখোট্টার মত মোগল-পাঠানের স্বদেশের সাজগোজগুলি নিজের লজ্জায় নিজেই লুপ্ত হইল,—আপন মহিমায় ভারতশিল্প তাহার স্থান দখল করিয়া লইল। ভারতশিল্পই দেখাইল, জয়লাভের পর মুসলমান যেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলিয়া ভারতের হীরামাণিক্যখচিত চরণখানি ধরিয়া মানভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতের দুর্দ্দিনের মধ্যে ঐ ভাবটিই বুঝি ঘনান্ধকারে বিজলিলীলা দেখাইয়াছিল। হায় সে দিন!

তাহার পর ভাগ্যলক্ষ্মী যখন মোগল-বাদশাহকে ত্যাগ করিয়া ইংরেজের অঙ্ক-শায়িনী হইলেন, তখন ভারতশিল্পকলা অভিভাবকহীনা হিন্দুবিধবার ন্যায় পিতৃকুলে আশ্রয় লইয়া নিরাভরণার দীনমূর্ত্তি প্রকাশ করিল। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও গুণগ্রাহী ভাগ্যবন্তদের গৃহে ভারতশিল্পগুলি আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু শিল্পের আর বিস্তারলাভ হইল না। সখের জন্য,—প্রাচীনতার যশোমাহাত্ম্যের পরিচায়ক বোধে,—চিরপ্রসিদ্ধ দ্রব্যগুলি নানাদেশে নানা ঘরে মাত্র রক্ষিত হইল। তাহাদের চিহ্নমাত্র যাহা-কিছু এবার এই দিল্লিপ্রদর্শনীতে Loan collection বিভাগে দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি তাহার বিবরণ Indian Art at Delhi 1903 নামক গবর্মেণ্টকর্ত্তৃক প্রকাশিত Sir George Watt সম্পাদিত গ্রন্থে সচিত্র বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ। ইহারই উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

ইংরেজ ভারতে প্রভাব বিস্তার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ভারতের ভাণ্ডার লুটপাট হইয়া গিয়াছিল। নাদিরশাহ ময়ূরসিংহাসন লুণ্ঠন করিলেন,—ভারতসিংহাসন শূন্য হইল,—সঙ্গে সঙ্গে ভারতশিল্পও হস্তান্তরিত হইয়া পড়িল। ইংরেজ শনৈঃশনৈঃ ভারতে রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন—তাঁহাদের সঙ্গে নানা দেশের নরপতিবর্গের যুদ্ধবিগ্রহাদি হইতে লাগিল—মহারাষ্ট্রা, শিখ, মুসলমান, রাজ-পুতগণ ইংরেজপ্রতাপের সম্মুখে পরাজিত বা সন্ধিসূত্রে গ্রথিত হইল। সে সময়ে ভারত-ইতিহাস কেবলই ইংরেজের জয়কাহিনীতে

পূর্ণ। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী সমৃদ্ধ শান্তিসুখের অভ্যন্তরে পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। এই কালের মধ্যে কত রাজ্যে কত গোলযোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, আত্মকলহ, রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি ঘটনার ঝঞ্ঝাবাতে ছোট-বড় কত-শত প্রলয় হইয়া গেল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী রহিয়াছে। কত ঘরের কত মণিমাণিক্যাদি শিল্পসামগ্রী কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কে তাহার অনুসন্ধান লইয়াছে? ব্রিটিশদ্বীপেই বা কত প্রেরিত হইয়াছে! সামান্য সৈনিকেরা পর্য্যন্ত কত লুণ্ঠন-সামগ্রী স্বদেশে লইয়া-গিয়া অল্পবিস্তর মূল্যে ধনবানদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা করা কঠিন। একমাত্র টিপুসুলতানের লুণ্ঠিত হৃতাবশেষ কোষাগার হইতে, তোষাখানা হইতে তিনকোটি টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য পাওয়া গিয়াছিল। জয়ের পর ইংরেজরাজপুরুষেরা এই সকল দ্রব্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। টিপুর দরিয়া-দৌলত-বাগের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রমোদভবন দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া যান। কাঠের উপর এরূপ সুন্দর খোদকারী কাজ ইউরোপে সম্ভব নহে। অথচ টিপুসুলতানের দুই-পুরুষমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শিল্পদ্রব্যাদি এখনও অতি প্রাচীন রাজবংশে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পী আর নাই। উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে, পৃষ্ঠপোষকের অভাবে, অর্থসামর্থ্যের অভাবে এক ব্যবসা হইতে ব্যবসান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে শিল্পিকুল লুপ্ত হইয়া গেছে। এমন কি, কোন কোন শিল্প একেবারেই নাই। নাম কত করিব?

এই ইংরেজরাজ্যে ভারতীয় শিল্প রাজানুগ্রহ পায় নাই;—কোম্পানীর আমলে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিল্পদ্রব্য তাহাদের ব্যবসায়ের উপযুক্ত ছিল না;—ডাল, গম, পাট প্রভৃতি যতটা লাভজনক, শিল্পদ্রব্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। ইংরেজ সওদাগর-রাজা সওদাগরি করিতে লাগিলেন, সস্তাদরে বিলাতিদ্রব্য ভারতে পৌঁছিতে লাগিল, শিল্প টিকে কিসে? শিল্পিগণও পাট বুনিতে আরম্ভ করিল,—ধানচাস করিতে লাগিল—বেনারসী, ঢাকাই, আমাদাবাদী, দিল্লিওয়ালা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি শিল্পিকুল জাতি নষ্ট করিয়া চাষাভূষা হইল। ভাগ্যে দুইএকজন দেশীয় রাজা ও ধনশালী সখ করিয়া কোন কোন জিনিষের খরিদদার ছিলেন, তাই প্রাণে প্রাণে দুএকটি ঘর বাঁচিয়া গেছে—কিন্তু তাহাদের অবস্থাও পূর্ব্বের মত রহিল না। ফ্যাশনের সঙ্গে সঙ্গে সস্তাদরের জিনিষের দরকার হইল। বিলাতি সূতা, রং ও গিল্‌টি আসিয়া ভারতশিল্পকুলে যে বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করিল, তাহাতে তাহার এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সিগারেট্‌বাক্স, দেশেলায়ের বাক্স, দস্তানা-রুমালের বাক্স, বিবিদের গাউনের মগ্‌জিতে দেশীয়শিল্পের কত রকমের অপব্যবহার, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। হিন্দুদেবদেবী চুরুটের ভস্মধারীতে, জুতা লাগাইবার কলকের মুঠিতে, চাদানের টিপায়ের পায়ায় পরিণত হইয়াছেন,—ভারতীয় শিল্প ইংরেজিঘরে শোভা পাইতেছে।

ভারতে ইংরেজরাজ্য যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইল, দেশীয়দ্রব্য তখন ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পকলার আদরের স্থান এখন ইউরোপ, তাই ইউরোপ ভারতশিল্পের আদর করিতে অগ্রসর হইয়াছে—রাজানুগ্রহও এখন কতকপরিমাণে এদিকে ফিরিয়াছে। কতক-পরিমাণে বলিতেছি এইজন্য যে, হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের মত ইংরেজরাজ এই সব শিল্পদ্রব্যের জন্য অজস্র টাকাখরচ করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিশেষ-কিছু সার্থকতা ইহাতে দেখিতে পান না, তাই এভাবে অর্থ-ব্যয়কে অর্থের অপব্যবহার বলিয়া ধরিয়া লন এবং patroniseনামক ইংরেজীশব্দে যতটা বুঝায়, কেবল সেইটুকুই করিতে প্রস্তুত হন। অন্তত লর্ড কার্জ্জন এ অনুগ্রহটুকু করিয়াছেন। এই অনুগ্রহবিতরণে তিনি যেরূপ মুক্ত-কণ্ঠ হইয়াছিলেন, সেরূপ মুক্তহস্ত হইতে পারিলে প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি অধিকাংশ ভারত-সম্রাটের তোষাখানার জন্য খরিদ হইত। তবুও লর্ড কার্জ্জন ভারতশিল্পের উন্নতি ও পুনরাবির্ভাবের জন্য যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিই। ভারতের স্থায়ী রাজপ্রতিনিধি হইবার আশা যদি তাঁহার থাকে, ভারতশিল্পদেবতা তাঁহার সে আশা পূর্ণ করুন।

লর্ড কার্জ্জনের ভারতে পদার্পণের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর ইংরেজ-দিগের একটা সখ জন্মে। ক্রমে তাঁহাদের ঐ সব দ্রব্যের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত হয় —তাঁহারা উহার খরিদ্দার হইতে থাকেন। দেখিতে দেখিতে ভারতের প্রধান প্রধান নগরগুলিতে এই সকল সামগ্রীর পণ্যবীথিকা খুলিতে আরম্ভ করিল—দিল্লির চাঁদনীচৌকে, লাহোরবাজারে, বারাণসী, বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতিতে এই সকল দ্রব্য বৈদেশিক ভবঘুরেদের নিকট বহুগুণ মূল্যে বিক্রী হইতে লাগিল। India Curio না দেখাইলে কোন ভ্রমণকারীর ভ্রমণ দেশের দশজনের কাছে কল্কে পায় না। এই কলিকাতা-নগরীতে এখন রাস্তায় রাস্তায় দেশীয় দ্রব্যের দোকান খোলা হইয়াছে, বেশ বিক্রীও হই-তেছে। কিন্তু ক্ষোভ ও আশ্চর্য্যের বিষয়, দেশীয় লোকের মতিগতি বিলাতি জিনিষের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এ সকল কথা লইয়া সম্প্রতি আলোচনা বড় অল্প হয় নাই—তাহার ফলে দেখা যায়, আমাদের মধ্যেও এখন অর্থশালিগণ দেশীয় দ্রব্যের আদর করিতেছেন। ইহা সুখের কথা, আশার কথাও বটে।

লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার পত্নী ভারত-শিল্পদ্রব্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং ভারতেশ্বরীর রাজবেশ ভারতবর্ষের কারুকার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছিল—লাটপত্নী দিল্লির দরবারঘটিত নানা উৎসবে সুন্দর ভারতজাত বস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট—দেশের লোকের নিকট ভারতবর্ষের দ্রব্যগুলির মাহাত্ম্যপ্রচারের জন্য তিনি গত ১৯০২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর দিল্লিতে ভারতশিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার সময় দেশীয় ভদ্রমণ্ডলীকে, বিশেষত ভারতের রাজন্য-বৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া যে কথাগুলি বলিয়া-ছিলেন, আমরা আশা করি, পুরুষানুক্রমে তাঁহারা সেগুলি স্মরণ রাখিবেন এবং কায়মনে

পালন করিবেন। Tottenham Court নিবাসী গৃহসজ্জানির্ম্মাতাদের কারুকর্ম্মের তুলনায় তিনি এ দেশের দ্রব্যগুলির সমধিক সম্মান দিয়াছিলেন--ঐ সব দ্রব্যের যাহাতে বহুলবিস্তার হয়, সেজন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। ইহাতে Tottenham Court হইতে তাঁহাকে গালি পর্য্যন্ত খাইতে হইয়াছিল। Tottenham Court চটিলেন—ভারতের বড় বড় রাজারাজড়া তাঁহাদের খরিদদার, পাছে লাটসাহেবের যুক্তিতে খরিদদার ছুটিয়া যায়। কিন্তু লাট কার্জ্জনের ঐরূপ ভাষাপ্রয়োগের কারণ যথেষ্ট ছিল। তিনি অনেকানেক দেশীয় রাজ্যে ঘুরিয়াছেন;—আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীন রাজ্যগুলির রাজভবনে প্রাচীন ভারতশিল্পের সমাদর ও শোভা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তৃপ্তিলাভ দূরের কথা, তাঁহার বিরক্তি ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তৃতীয়শ্রেণীর বিলাতি গৃহসজ্জায় রাজাবাস সজ্জিত,—অতি কদর্য্য বিলাতি টুম্‌টাম্‌ দ্রব্যাদিতে কলঙ্কিত,--নকলের নাকাল গ্লাসের জিনিষে শ্রীভ্রষ্ট এবং নিতান্ত শ্রীহীন বিলাতি গালিচায় গৃহপ্রাঙ্গণ মণ্ডিত। সোনা ফেলিয়া রাংতার আদর—মণিমাণিক্যের স্থানে কুৎসিত নকল সাজ। সর্ব্বোপরি অতীব আদরের দেশীয় বস্ত্রাদির—কিংখাব, শাল, ঢাকাই বস্ত্রের—পরিবর্ত্তে ভারতের নমুনার সঙ্গে অসংলগ্ন জর্ম্মণিনির্ম্মিত বস্ত্রাদিতে ইংরেজদর্জ্জির নির্ম্মিত রাজবেশ; —রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত বিলাতি নমুনায় গঠিত। আবার কোন রাজ-অন্তঃপুরে বিলাতি সাটিন-মখমল রাজরাণীদের পরিধেয় পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সব দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়াছিলেন—ভারতশিল্পের জন্য অন্তরে-অন্তরে ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে তাঁহার আত্মনিবেদন বিদেশীয় শিল্পীদের নিকট কঠোর ঠেকিলেও, ভারতবাসীদের নিকট মর্ম্মব্যথার সেই কথাগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাহার পর যখন প্রদর্শনীগৃহের দ্বারমোচন হইল, দর্শকবৃন্দ যথার্থই বুঝিতে পারিলেন, কার্জ্জনের কথা সত্য, সাধু এবং সদভিপ্রায়পূর্ণ। এই প্রদর্শনীতে না ছিল কি? শিল্পজগতে উত্তমশ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে, নানাদেশের নানাজাতীয় সেইরূপ জিনিষ এই শিল্পাগারের প্রত্যেক শ্রেণীতে ছিল। ভারতের শিল্পকে এভাবে একত্র সমাবেশ ও সাধারণের দৃষ্টিপথে আনয়ন করার ব্যবস্থা এই সর্ব্বপ্রথম। কাজেই দিল্লির দরবার উপলক্ষ্যে এই মহৎ কার্য্যটি যথার্থই ভারতের একটি মঙ্গলব্যাপার হইয়াছিল এবং দরবারের মহিমাও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রদর্শনীমণ্ডপটিও আবার একটি এদেশীয় মন্দিরের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। গৃহের অভ্যন্তরভাগ ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজচিহ্ন বংশচিহ্ন-বিশিষ্ট পতাকাদিতে সজ্জিত এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ নানা দেশীয়দ্রব্যাদিতে অতিরিক্তমাত্রায় পূর্ণ ছিল। যেদিকে দেখ, কেবলই বিচিত্র সামগ্রীর বাহার। কাঠের, ধাতুর, পশমের, সূতার, দাঁতের, হাড়ের, পশুশৃঙ্গের, কাগজের শতসহস্রাধিক দ্রব্যজাতে গৃহটি পূর্ণ হইয়াছিল। যিনি তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহার চক্ষু সার্থক হইয়াছে। কি দেশীয়, কি বিদেশীয়,

সকলকেই এই সব সামগ্রী দেখিয়া একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ভারতবর্ষে যে এরূপ বিচিত্র, সুরম্য-সুন্দর, দুর্লভ শিল্প সম্ভবে, ইহা পূর্ব্বে তাঁহাদের ধারণা ছিল না। দেশীয় রাজন্যবর্গ স্বদেশজাত দ্রব্যের মূল্য জানিতে যাইয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। এত সস্তায় এরূপ সুন্দর সামগ্রী পাওয়া যায়, ইহা তাঁহাদের মনেও হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি, একজন রাজা আর মূল্য জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা পাইয়া কেবলমাত্র জিনিষ পসন্দ করিয়া লইতেছিলেন—আর মূল্য জানাইতে গেলে দুহাতে নিষেধ করিয়া বলিতেছিলেন, আর যেন মূল্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া না হয়। রাজার কথা শুনিয়া একজন ইংরেজমহিলা সঙ্গিনীর প্রতি ইঙ্গিত করিতে করিতে বলিলেন —"Now the native chiefs seem to be getting wise!" সঙ্গিনী উত্তর করিলেন—"They ought to be"—আর হস্তস্থিত লক্ষ্ণৌয়ের চিকণের-রুমালখানার প্রতি বারবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে ভারতনৃপতিবৃন্দ একে অন্যের দেশের শিল্পকলার মাহাত্ম্য বুঝিতেছেন, পছন্দসই জিনিষ কিনিতেছেন, ফরমাইস দিতেছেন, কারিকরের খোঁজ নিতেছেন, এ দৃশ্য কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সত্যসত্যই শিল্পপ্রদর্শনীতে তাহা দেখা গিয়াছিল।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতরে-ভিতরে মনুষ্যমাত্রই সত্যের অন্বেষী। কিন্তু লোকসমাজে বয়স্থমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে মুখে এইরূপ ভাণ করেন যে, "সত্যে আমার কাজ নাই—সত্যের বদলে একমুটা অন্ন পাইলে বর্ত্তিয়া যাই; কেন না, সত্যে পেট ভরে না—অন্নে পেট ভরে।" লোকের এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। যদি জল তুলিতে হয়, তবে তাহার পূর্ব্বে কলস তৈয়ারি করা চাই। সত্যের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সত্যের ধারণক্ষম পাত্র তৈয়ারি করা চাই। অন্নাভাবে যাহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ, সে ব্যক্তি সত্যগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। প্রাণের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ রহিয়াছে। এক-তালায় প্রাণ, দোতালায় মন, তেতালায় জ্ঞান। মনুষ্যের প্রাণের উপরে মন, মনের উপরে জ্ঞান উপর্য্যুপরি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তবে মনুষ্য সত্যের উপযুক্ত বাসস্থান হয়। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যশরীরে উদরের উপরে হৃদয়, হৃদয়ের উপরে মস্তক উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সত্য আপনার বাসস্থান আপনিই তৈয়ারি করিতেছেন—সে বাসস্থান মনুষ্য। পশুপক্ষীরা অন্ন পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়; মনুষ্য রাজ-

ভোগেও পরিতৃপ্ত হয় না—মনুষ্য চায় সত্য। মনুষ্যের চক্ষু ফুটিয়াছে। মনুষ্য জানিতে পারিয়াছে যে, রাজভোগও যেমন, দেবভোগও তেমনি—সবই ক্ষণস্থায়ী। কাজেই, চিরস্থায়ী পদার্থের অন্বেষণ মনুষ্যের একটা দৈনিক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণ, মন এবং জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমনটি হওয়া চাই, তাহা কার্য্যে ঘটিয়া ওঠে নাই। পৃথিবীতে সত্যের বাসস্থান সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে পরিগঠিত হইয়া দাঁড়ায় নাই। এক কথায়—মানুষ এখনো মানুষ হইয়া ওঠে নাই। প্রকৃতিমাতা মানুষকে মানুষ করিতেছেন নির্নিদ্রনয়নে। তথাপি মানুষের মানুষ হইতে এখনো একটু বিলম্ব আছে। মানুষ এখনো ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মুল্লুক ছাড়াইয়া মানুষের মুল্লুকে পৌঁছে নাই। পৌঁছে নাই বটে, কিন্তু অচিরে পৌঁছিবে, তাহার জোগাড় হইতেছে পৃথিবীময় সর্ব্বত্র; কেন না, প্রকৃতিমাতার স্নেহচক্ষু মনুষ্যের উপরে ক্রমাগতই লাগিয়া রহিয়াছে।

ভিতরে-ভিতরে কিন্তু মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধিই মানুষ। ক্রোড়স্থ শিশুও জ্ঞানের জন্য আঁকুপাঁকু করে। স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে-সঙ্গেই মনুষ্য জ্ঞানামৃত পান করিতে থাকে। নবাগত মনুষ্যের চাহনিই স্বতন্ত্র। শিশুর চাহনির কিছুতেই পেট ভরে না। ক্রোড়স্থ শিশু মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া সকল বিষয়েরই সমাচার জানিতে চায়। শিশুর ভিতরে-ভিতরে জ্ঞান অল্পে-অল্পে উদ্বোধিত হইয়া সত্যের প্রতি হাত বাড়াইতে থাকে—যদিও সত্য আকাশের চাঁদ।

প্রকৃতিমাতার চক্ষে লোকশিরস্থ মহাজ্ঞানী এবং মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মধ্যে অল্পই প্রভেদ। শিশুর জ্ঞানোপার্জ্জনপ্রণালী কিরূপ? মাতার স্তন হইতে দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর যেমন প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, মাতার মুখচক্ষু হইতে স্নেহভরা সত্য পান করিয়া শিশুর তেমনি জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়। শিশুর নিকটে মাতার মুখচক্ষুই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; সে জানে—মাতার মুখচক্ষুতে সব সত্য একঠাঁই ভরা রহিয়াছে। ইহাই জ্ঞানোপার্জ্জনের আদিম প্রণালী। আদিম ঋষিরা প্রকৃতিমাতার মুখচক্ষু হইতে সত্য পান করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইত; তাঁহাদিগকে পুঁথিপাজির দ্বারস্থ হইতে হইত না। স্তন্যদুগ্ধ যেমন সাক্ষাৎ প্রাণ, তেমনি আদিম ঋষিরা প্রকৃতিমাতার মুখচক্ষু হইতে যে-রকমের সত্যামৃত পান করিতেন, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান। এই যে সাক্ষাৎ-জ্ঞান বা সাক্ষাৎ-উপলব্ধি—ইহা পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞান—খাঁটি জ্ঞান। এক্ষণে সাক্ষাৎ-উপলব্ধি যে পদার্থটা কি, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

সাক্ষাৎ-উপলব্ধি।

ধ্বনির স্রোত আমাদের এক কান দিয়া প্রবেশ করিয়া আরেক কান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে; আলোকের স্রোত আমাদের চক্ষুর মধ্য দিয়া বহিয়া চলিতেছে। তড়িদ্বেগে বহিয়া চলিতেছে বলিলে কিছুই বলা হয় না—সত্য এই যে, তড়িৎ অপেক্ষা শতসহস্রগুণ অধিক বেগে বহিয়া চলিতেছে। সাক্ষাৎ-উপলব্ধি ইহার কোন্‌খানটায়? তোমার সম্মুখ দিয়া নদী যখন দ্রুতবেগে বহিয়া চলি-

তেছে, তখন তুমি তাহার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছ—"এই নদী"। যাহাকে বলিতেছ "এই নদী", সে নদী কোথায়? যেই বলিতেছ "এই", অমি তাহা নেই। তুমি যাহাকে বলিতেছ "এই নদী", সে তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া নেই-নদী হইয়া সরিয়া পালাইয়াছে। নদীর স্রোতও যেমন, ধ্বনির প্রবাহও তেমনি, আলোকের রশ্মিও তেমনি—সবই ছুই নৌকায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—এক নৌকা হ'চ্চে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্ত, আর-এক নৌকা হ'চ্চে অতীত-মুহূর্ত্ত। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তই জীবন্ত মুহূর্ত্ত, অতীত-মুহূর্ত্ত মৃত মুহূর্ত্ত। যাহা বর্ত্তিয়া থাকিতেছে, তাহারই নাম বর্ত্তমান। বর্ত্তমান কাল বর্ত্তিয়া থাকিবার কাল—বাঁচিয়া থাকিবার কাল। বর্ত্তমান কাল সজীব কাল—তাই বর্ত্তমান কাল আমাদের জীবনের উপরে—প্রাণের উপরে—কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, মৃতব্যক্তিকে যেমন চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না—কেবল মনে স্মরণ হয় মাত্র, অতীত কাল সেইরূপ আমাদের মনের স্মরণেতেই যাওয়া-আসা করে, তা বই, বর্ত্তমানের ন্যায় তাহা আমাদের প্রাণের হস্তে ধরা দ্যায় না। বর্ত্তমান কালের দর্শন হ'চ্চে প্রাণের ব্যাপার, অতীত কালের স্মরণ হ'চ্চে মনের ব্যাপার; এই দুই ব্যাপারের উপরে ভর দিয়া বুদ্ধি-ব্যাপার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। বুদ্ধি-ব্যাপার কি? না, "এটা এই" এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া। আমরা প্রথমে বলি "এটা," তাহার পরমুহূর্ত্তে সেই এটা'র পরিবর্ত্তে যখন তাহার যমক-সহোদর আর-একটা আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই দ্বিতীয়-এটাকে আমরা বলি "এই"; আর, তাহা যখন বলি—দ্বিতীয় এটাকে অর্থাৎ আর-একটাকে যখন আমরা বলি "এই",—তখন প্রথম-"এটা" আমাদের স্মরণে টাট্‌কা রহিয়াছে যেন সাক্ষাৎ বর্ত্তমান; সেই প্রথম-এটা যাহা আমাদের স্মরণে জাগিতেছে এবং তাহার জুড়ি এই দ্বিতীয়-এটা যাহাকে আমরা এক্ষণে বলিতেছি "এই"—এই দুই এটাকে এক বন্ধনে বাঁধিয়া আমরা বলি "এটা এই"। ইহারি নাম বুদ্ধির নিশ্চয়ক্রিয়া। (১) প্রাণ বর্ত্তমানকে ধরে, (২) মন অতীত'কে ধরে, এবং বুদ্ধি বর্ত্তমান এবং অতীত উভয়কে একীভূত করিয়া ত্রৈকালিক ধ্রুববস্তুকে উপলব্ধি করে। ইহারই নাম বাস্তবিক-সত্তা'র উপলব্ধি। বাস্তবিক-সত্তা'র উপলব্ধিতে প্রাণ, মন এবং বুদ্ধি, তিনই একযোগে কার্য্য করে। প্রাণ করে—দর্শন, মন করে—স্মরণ, এবং বুদ্ধি করে—তত্ত্ব-অবধারণ। এই যে তিনটি ব্যাপার—দর্শন, স্মরণ এবং তত্ত্বনিরূপণ, তিনই সমান আশ্চর্য্য। যদি মনে কর যে, দর্শন তো অষ্টপ্রহরই করিতেছি—স্মরণও তাই; তত্ত্বনিরূপণটাই কেবল সব সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া ওঠে না—অতএব তত্ত্ব-নিরূপণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য, তবে সেটা তোমার বড়ই ভুল। বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি বলিতেছি যে, গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম। গতকল্য সত্যসত্যই যে আমি কাশীতে ছিলাম, তাহার প্রমাণ কি? তোমার নিকটে তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে তাহার প্রমাণ নিতান্তই অনাবশ্যক। কেন না, আমার স্মরণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, গত-

কল্য আমি কাশীতে ছিলাম। যদি বলো যে, তোমার এই যে স্মরণ—এ তো তোমার বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তি; বর্ত্তমান কালের মনোবৃত্তিকে অতীত ঘটনা'র সাক্ষী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ কোন্ যুক্তিতে? "ঐখানটিতে ঐ দেয়ালটা রহিয়াছে" এটা যেমন তুমি তোমার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছ; গতকল্য "তুমি কাশীতে ছিলে" এটাও কি তুমি সেই-রূপে তোমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছ? তাহা তুমি বলিতে পার না—কেন না, যাহাকে তুমি বলিতেছ "ঐখানটি", তাহা তোমার চক্ষের সম্মুখে বাস্তবিকই উপস্থিত রহিয়াছে; পক্ষান্তরে, যাহাকে তুমি বলিতেছ "গতকল্য", তাহা কোনোকালেই তোমার চক্ষের সম্মুখে জীবিতমান ভাবে—অর্থাৎ সত্যসত্যই—উপস্থিত হইতে পারে না। তবে যে বলিতেছ যে, তোমার মনশ্চক্ষে তাহা উপস্থিত—সে কেবল কল্পনাতে। কিন্তু কল্পনাকে বিশ্বাস কি? আমি যদি মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতাম যে, "গতকল্য আমি কাশীতে ছিলাম", তবে কি তাহাকে আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম? স্পষ্ট আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমি গতকল্য কাশীতে ছিলাম, তাই তাহা আমার নিকটে ধ্রুবসত্য। স্মরণ এবং কল্পনা দুইই আমার আপনার, অথচ স্মরণের কথায় যাথার্থ্যে আমার বিশ্বাস দাঁড়াইতেছে ভরপুর—কল্পনার কথার যাথার্থ্যের মূল্য আমার নিকটে কিছুই নহে। এক যাত্রায় এই যে পৃথক্ ফল—ইহা কি কম আশ্চর্য্য! স্মরণ এই তো এক আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দর্শন আবার আর-একতরো আশ্চর্য্য-ব্যাপার। এ বলে আমায় ছাখ্—ও বলে আমায় ছাখ্। এমন কি, দর্শন এবং স্মরণের মধ্যে যে প্রভেদ কোন্-খানটায়, তাহার ঠিকানা পাওয়া কঠিন। তার সাক্ষী:—

মনে কর, একটা অঙ্গুলিপরিমাণ আগ্নেয়-নলিকা (যেমন হাউইবাজি'র চোঙা)

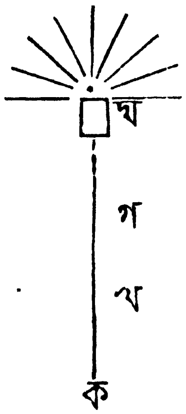

ক-স্থান হইতে ছুটিয়া ঘ-স্থানে পৌঁছিল। তাহা ঘ-স্থানে পৌঁছিবামাত্র দর্শকের চক্ষে একটি আগ্নেয়বিন্দু ঘ প্রকাশ পাওয়াই উচিত; কিন্তু প্রকাশ পাইতেছে—শুধু-কেবল সেই আগ্নেয়বিন্দুটি না, পরন্তু ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত সমস্ত ক-খ-গ-ঘ-পথ জুড়িয়া একটা সুদীর্ঘ আগ্নেয়রেখা। হইতেছে একটি আশ্চর্য্য-ব্যাপার—দৃশ্যমান ঘ-বিন্দুর সঙ্গে স্মৃতিপথের ক, খ, গ, বিন্দুগুলা সংস্কারের আটায় জোড়া লাগিয়া-গিয়া ক-খ-গ-ঘ-পথের আগাগোড়া সমস্তটা দর্শকের দৃষ্টিক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। 'বর্ত্তমানের দর্শন, অতীতের' স্মরণ এবং ভবিষ্যতের কল্পনা, এই তিন ভ্রাতা কাঁধ-ধরাধরি করিয়া একসঙ্গে দৌড়িয়া চলিতেছে। দৃষ্টির হাঁপাপার পড়িয়া স্মৃতিও দৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে

—কল্পনাও সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। এস্থলে (১) সম্মুখে-বর্ত্তমান আগ্নেয়বিন্দু দৃষ্টির বিষয়, (২) অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তের আগ্নেয়-বিন্দু স্মৃতির বিষয়, এবং (৩) অব্যবহিত ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তের আগ্নেয়বিন্দু কল্পনায় গড়িয়া-তোলা—এই তিন আগ্নেয়বিন্দু, আর সেই সঙ্গে দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, এই তিন মনোবৃত্তি, একেবারেই এক। দর্শনের গায়ে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, স্মরণ এবং কল্পনা মাখা রহিয়াছে—বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তের গায়ে অতীত-মুহূর্ত্ত এবং ভবিষ্যৎ-মুহূর্ত্ত মাখা রহিয়াছে। বর্ত্তমানকে যেমন অতীত এবং ভবিষ্যতের সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন, দর্শনকে তেমনি স্মরণ এবং কল্পনার সংস্রব হইতে ছাড়ানো কঠিন।

উপরে যাহা দেখানো হইল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যাহাকে আমরা বলি সাক্ষাৎ-উপলব্ধি, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং কল্পনা, তিনের মিলিতাঙ্গ। তাহা শুধুই কেবল দর্শনের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল স্মরণের ব্যাপার নহে, শুধুই কেবল কল্পনার ব্যাপার নহে;—তাহা দর্শন-এবং-স্মরণ সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। অথবা, যাহা একই কথা—প্রাণ-এবং-মন-সংবলিত বুদ্ধির ব্যাপার। প্রাণের সহিত দর্শনের এবং মনের সহিত স্মরণের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা যদি-চ পূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি—তথাপি তাহা আরেকবার বলি :—

(১) বর্ত্তমানের বিষয়ই দর্শনের বিষয়।

(২) যাহা বর্ত্তিয়া থাকে বা বাঁচিয়া থাকে, তাহাই বর্ত্তমান। যাহা জীবিতমান, তাহাই বর্ত্তমান; প্রাণই বর্ত্তমান। দর্শনের ব্যাপার প্রাণেরই ব্যাপার।

(৩) যাহা অতীত, তাহা মৃত। অতীতেরই স্মরণ হয়—মৃতেরই স্মরণ হয়। দর্শন হয় চক্ষে বা চাক্ষুষ প্রাণে, স্মরণ হয় মনে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, দর্শন এবং স্মরণ দুয়ের যোগে—প্রাণ এবং মন দুয়ের যোগে—বুদ্ধিতে লক্ষ্যবস্তুর সাক্ষাৎ-উপলব্ধি সঙ্ঘটিত হয়। সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমি যখন বলি যে, "এটা বটবৃক্ষ," তখন আমার বুদ্ধি করে কি? না, পূর্ব্বদৃষ্ট বটবৃক্ষ যাহা আমার স্মরণে জাগিতেছে, তাহার সহিত দৃশ্যমান বটবৃক্ষকে একীভূত করিয়া বটবৃক্ষরূপী বস্তুতে অবগাহন করে। আমার সম্মুখ দিয়া যখন নদীর প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে, তখন যে জলরাশি সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, তাহা চক্ষুর মধ্য দিয়া আমার প্রাণের উপরে কার্য্য করিতেছে, এবং যে জলরাশি চলিয়া যাইতেছে, তাহা স্মৃতির মধ্য দিয়া আমার মনের উপরে কার্য্য করিতেছে। বুদ্ধি করিতেছে কি? না, যাহা উপস্থিত হইতেছে এবং যাহা চলিয়া যাইতেছে, দুইকে একদৃষ্টিতে দেখিয়া নদীরূপী বস্তুতে অবগাহন করিতেছে। বুদ্ধি যে-নদীকে উপলব্ধি করিতেছে, তাহা শুদ্ধ-কেবল বর্ত্তমানের দৃশ্য নদী নহে—অতীত-কালের স্মৃত নদীও নহে, পরন্তু দৃশ্য এবং স্মৃত এই দুই নদীকে লইয়া যে এক নদী, সেই-নদীরূপী বস্তু। দর্শনের ব্যাপার এবং স্মরণের ব্যাপার কিরূপ আশ্চর্য্য, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কিন্তু বুদ্ধি যেরূপে বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তা উপলব্ধি করে, তাহার ন্যায় আশ্চর্য্য জগতে আর কিছুই নাই। বিশেষ আশ্চর্য্য যে কোন্‌খানটায়, তাহা বলিতেছি, প্রণিধান করুন :—

ঐ বটগাছটিকে দেখিয়া আমি বলিতেছি "এটা বটগাছ"। এই যাহা আমি বলিতেছি, এ কথাটি সত্য। কেন না, বটগাছের ভাব যাহা আমার মনে বর্ত্তমান আছে, তাহার সহিত লক্ষ্যবস্তুটির সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এই যে মিল, ইহারি নাম সত্য। আর, মনের ভাবের সহিত লক্ষ্যবিষয়ের এইরূপ মিল ঘটাইবার যিনি কর্ত্রী, তাঁহারই নাম বুদ্ধি। পুনশ্চ, অন্তঃকরণে ঐরূপ মিলের যে উপলব্ধি (সত্যের যে উপলব্ধি), তাহারই নাম জ্ঞান। "এটা বটবৃক্ষ" এই জ্ঞানটি জন্মিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বদৃষ্ট অনেকানেক বটবৃক্ষের একটা সাধারণ আদর্শ বা নক্সা জ্ঞাতার মনে বর্ত্তমান থাকা চাই; সেই সাধারণ আদর্শটি দৃশ্যমান বটবৃক্ষের সহিত স্মৃত বটবৃক্ষের মিল ঘটাইয়া দ্যায়। পূর্ব্বে আমি বটবৃক্ষ দেখিয়াছি, তাই আমি এক্ষণে বলিতে পারিতেছি যে, "এটা বটবৃক্ষ"। পূর্ব্বে যদি আমি বটবৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে আমি "বটবৃক্ষ" না বলিয়া শুদ্ধকেবল বলি যে, "এটা বৃক্ষ"। পূর্ব্বে যদি আমি বৃক্ষ না দেখিয়া থাকি, তবে বৃক্ষ না বলিয়া বলি যে, "এটা একটা বস্তু"। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বে যদি আমি বস্তুও না দেখিয়া থাকি, তবে আমি সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষটাকে কি বলিব? নবপ্রসূত বালকের মনে যখন সবে-মাত্র প্রথমজ্ঞানের উদ্বোধন হইয়াছে, তখন সেই প্রথমজ্ঞানের অবলম্বন শুধুই কি কেবল সম্মুখের দৃশ্যবিষয়, না, তা ছাড়া আরো-কিছু? এটা দেখা চাই যে, সেই জ্ঞানটিই শিশুটির প্রথম জ্ঞান, তাহার পূর্ব্বে তাহার কোনো জ্ঞানই ছিল না; এরূপ স্থলে এ কথা খাটে না যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুসকলের একটা সাধারণ নক্সা শিশুর মনে বর্ত্তমান আছে, আর, সেই নক্সার সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুর ঐক্য-উপলব্ধি-হওয়া-গতিকে জ্ঞানের উদ্বোধন হইল। কাজেই বলিতে হয় যে, সেই প্রথম-জ্ঞানের পূর্ব্বসূত্র একপ্রকার অব্যক্ত সংস্কার, তা বই, তাহা কোনো প্রকার আঁকিয়া-জুঁকিয়া প্রস্তুত-করা নক্সা নহে। সর্ব্বাদিম প্রথমজ্ঞানে দর্শন, স্মরণ এবং তত্বনিরূপণ, এই তিন মনোবৃত্তির মধ্যে ব্যবধান থাকিতে পারে না একচুলও। আদিম-উদ্ভিদ-সম্বন্ধে (protoplasm সম্বন্ধে) যেমন আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা বীজ, বৃক্ষ এবং ক্ষেত্র, তিনই একাধারে; আদিমজ্ঞান-সম্বন্ধেও তেমনি আমরা অগত্যা বলিতে বাধ্য হই যে, তাহা দর্শন, স্মরণ এবং তত্বনিরূপণ, তিনই একাধারে। অর্থাৎ আদিমজ্ঞানে দর্শনই স্মরণ, স্মরণই দর্শন এবং তাহাই তত্ব-নিরূপণ। আদিম জ্ঞানের সম্মুখে বিষয়ের উপস্থিতি এবং পশ্চাতে সংস্কারের গোড়া-বন্ধন, দুইই শুদ্ধকেবল ঐশী শক্তি দ্বারা সম্ভাবিত হয়; তা বই, দুয়ের কোনোটিতেই জ্ঞাতার নিজের কোনো হস্ত নাই। ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা শুধুই কি কেবল আদিম-জ্ঞানে, নব্যতম পরিপক্ক জ্ঞানে কি ঐশী শক্তির কার্য্যকারিতা তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে কম? এই কথাটি বারান্তরে আলোচনার জন্য স্থগিত রাখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতির প্রতি।

কোন্ দূরদেশ হ'তে আঁধার জগতে
তুমি এসেছ
হ'য়ে শশী সুন্দর মম অন্তর
আলো করেছ।

সেই আলোকসুধায় হরিয়া আঁধার
ঘর সৃজিল
তব প্রীতির সুজলে সেই গৃহতলে
শোভা তুলিল।

কর লহর বহিয়া নাচিয়া নাচিয়া
হৃদে প্রয়াণ
তব বদনকমলে আমি কুতূহলে
লইনু ঘ্রাণ।

পরে তুলি মৃদুস্বর অতি মনোহর
কহিলে কথা
রহি সে কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
ভুলিয়া ব্যথা।

ক্রমে আরো কাছে আসি সুমধুর হাসি
হাত ধরিলে
তব চন্দনরসে পূরিত পরশে
মোরে মোহিলে।

আমি এতকাল ধরে' জগত-ভিতরে
জড় আছিনু
তুমি জ্ঞানময়ী হ'য়ে আসিলে হৃদয়ে
তাই বাঁচিনু।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গদর্শন।

সংস্কৃতসাহিত্যে সামাজিক চিত্র।

আমি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সুপরিচিত মৃচ্ছকটিকনামক প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাটক অবলম্বন করিয়া কথা উপস্থিত করিব। মৃচ্ছকটিক শূদ্রকনৃপতিবিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই শূদ্রকনৃপতি কোথায় বিরাজিত ছিলেন এবং তিনি বাস্তবিক নিজে মৃচ্ছকটিককার কি না, তাহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডের উল্লেখ অনুসারে শূদ্রকের কালকে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করিতে হয়। এখন দেখা যাউক, মৃচ্ছকটিকের অন্তর্ভূত বিষয়সকলের আলোচনা দ্বারা ইহার রচনাকালসম্বন্ধে কতদূর নির্ণীত হইতে পারে।

দেখা যাক্, মৃচ্ছকটিকে কি আছে। প্রথমত ইহাতে দুইটি রাজধানীর উল্লেখ দেখিতেছি—প্রথম উজ্জয়িনী, দ্বিতীয় পাটলিপুত্র। ইহার মধ্যে উজ্জয়িনী নবোদীয়মান এবং পাটলিপুত্র প্রাচীন ও পতনোন্মুখ; উজ্জয়িনীতে শৈবধর্ম্মের নবাভ্যুদয়, পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। ইহার প্রমাণ দ্বিতীয় অঙ্কে দ্যূতকরদিগের সহিত সংবাহকের বিবাদের উল্লেখ যেখানে আছে, সেখানে পাওয়া যায়। সংবাহক বসন্তসেনাকে বলিতেছে:—

"আর্য্যে শুনুন, পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, আমি গৃহস্থের সন্তান, সংবাহকের কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। পর্য্যটকদিগের মুখে শুনিয়া অপূর্ব্বদেশদর্শনকুতূহলবশত এখানে আসিয়াছি। উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করিয়া এক ভদ্রলোকের সেবা করিয়াছি," ইত্যাদি।

এ ব্যক্তি সংবাহকের অর্থাৎ পা-টেপা খানসামার কাজ করে। বিভব ও বিলাস পূর্ণ মহানগরেই এরূপ ভৃত্যের প্রয়োজন হয়। পাটলিপুত্র ত এক মহানগর, তবে কেন সে পাটলিপুত্র ছাড়িয়া উজ্জয়িনীতে আসিল? বিষ্ণু, বায়ু, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা জানা যায় যে, পুষ্যমিত্রনামক এক রাজা চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের ১৩৭ বৎসর পরে পাটলিপুত্রকে আক্রমণ করিয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্যবংশের উচ্ছেদসাধন এবং মগধে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। ইতিবৃত্তের গণনা অনুসারে খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ সালে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রনগরে মৌর্য্যবংশ স্থাপন করেন। সুতরাং মৌর্য্য-

বংশের বিলোপ খ্রীষ্টীয় ১৭৮ সালে ঘটিয়া থাকিবে। ইহা মৃচ্ছকটিকরচনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকিবে। মৌর্য্যবংশের বিনাশের এবং পাটলিপুত্রে বিপ্লবঘটনার পর ইহা স্বাভাবিক যে, সংবাহকের ন্যায় ব্যক্তিগণ, কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া পতনোন্মুখ পাটলিপুত্রকে ত্যাগ করিয়া নবোদীয়মান উজ্জয়িনী-নগরীতে আসিবে।

তখন পাটলিপুত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, ইহা অনুমান করিবার কারণ এই—যেই সংবাহক দ্যূতকরদিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অপমানিত হইল, অমনি তাহার মনে নির্ব্বেদের উদয় হইল; এবং তাহার ফলস্বরূপ সে বৌদ্ধশ্রমণ হইয়া গেল। নির্ব্বেদের অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন তখন দৈনিক ঘটনা না হইলে কবি এত শীঘ্র ও এত সহজে একজন পাটলিপুত্রাগত ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী করিয়া দিতে পারিতেন না।

উজ্জয়িনীতে নবরাজ্যের অভ্যুদয় ও শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার অনুমান করিবার কারণ এই—কবি বর্ণন করিতেছেন যে, তখনও উজ্জয়িনীতে মধ্যে মধ্যে প্রজাদের বিদ্রোহ ঘটিতেছে। তাঁহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ আর্য্যক; এই ব্যক্তি গোপকুলোদ্ভব। এ ব্যক্তি গোপনে বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, এরূপ সংবাদ পাইয়া উজ্জয়িনীপতি ইহাকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু সে স্বীয় বন্ধুগণের সাহায্যে আপনার বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া উজ্জয়িনীপতিকে বিনাশপূর্ব্বক উক্ত নগরে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে।

ইহাতে এপ্রকার অনুমান করা কিছুই অযৌক্তিক নয় যে, কবি যে সময়ে মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছিলেন, তখনও উজ্জয়িনী-নগরে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মধ্যে মধ্যে আদিম অধিবাসিগণ অভ্যুত্থিত হইয়া বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিতেছিল।

আর এরূপ অনুমান ইতিবৃত্তের ঘটনার অনুরূপও বটে। এতদুপলক্ষে প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্তের একটি বিষয় আলোচ্য বোধ হইতেছে। ভারতে আর্য্যজাতির সমাগমসম্বন্ধে লোকের সাধারণত এই ধারণা আছে যে, আর্য্যগণ প্রাচীনতম কালে মধ্য-আশিয়ার কোন এক শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতেন। তৎপরে সেখানে জ্ঞাতি-বিবাদবশত পৃথক্ হইয়া দুই ধারাতে তাঁহারা দক্ষিণগামী হন। পরে ইঁহাদের এক ধারা হিন্দুকুশের দ্বার দিয়া পঞ্চনদে প্রবেশ-পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। অপর ধারা ইরাণে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় প্রতিষ্ঠিত হন। পঞ্চনদ ও ব্রহ্মর্ষিদেশবাসী আর্য্যগণের বংশধরগণ ক্রমে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান ভারতীয় হিন্দুজাতি। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলস্বরূপ ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভারতে আর্য্যসমাগম প্রাচীনতম কালের একমাত্র বিজয়প্রবাহে ঘটে নাই; পর-বর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও ইরান্ প্রভৃতি দেশ হইতে নব নব বিজয়-প্রবাহ ভারতক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে। এমন কি, মহাভারতাদি গ্রন্থে যে সূর্য্যবংশীয় ও

চন্দ্রবংশীয় রাজগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইঁহারা এই সকল পরবর্ত্তী বিজয়প্রবাহের অন্তর্ভূত হইয়া প্রতীচ্যদেশ হইতে এই প্রাচ্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎপরে প্রতীচ্যদেশ হইতে শক, জাঠ, হূন প্রভৃতি আরও অনেক জাতি আসিয়া ভারতক্ষেত্রকে অধিকার করিয়াছে; এবং কালে হিন্দুরূপে পরিণত হইয়াছে।

কোন্ জাতি কোন্ কালে আসিয়াছিলেন ও কোথায় কতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা এখন একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলে হয়। মোটের উপরে এই বলা যায় যে, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক কোন কোন সামরিক জাতিকে খ্রীষ্টীয় অব্দের বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই সিন্ধুনদের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ মাসিডোনিয়াধিপতি সিকন্দর শাহ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিন্ধুর উভয় কূলে যদুবংশীয় রাজগণকে এবং পঞ্চনদে পুরুবংশীয় রাজগণকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরিয়ান্‌নামক একজন গ্রীক্ ইতিবৃত্তলেখক দেখা দেন। ইনি বাণিজ্যকার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন বর্ত্তমান ব্রোচ্‌নামক নগরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। আরিয়ান্ সিন্ধুর পশ্চিম উপকূলে মীনগরনামক এক মহাসমৃদ্ধিশালী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ অনুমান করেন যে, উহা বর্ত্তমান সেওয়ান্‌নামক নগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এবং তাহার প্রকৃত নাম ছিল স্বামিনগর। মুসলমানগণ প্রাচীন নাম লুপ্ত করিয়া তাহার সেওয়ান নাম রাখিয়াছে। টড্ আরও অনুমান করেন যে, ঐ রাজনগর সাইথিয়ান্ ও পার্থিয়ান্ রাজগণের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সিন্ধুর উপকূলবাসী রাজগণ দুই ধারাতে ভারতক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এক ধারা পঞ্চনদকে প্লাবিত করিয়া কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হয়। অপর ধারা সিন্ধুদেশের দক্ষিণভাগ হইতে সৌরাষ্ট্রদেশে ব্যাপ্ত হয়। এই সৌরাষ্ট্রবাসী শকবংশীয় রাজগণ উত্তরকালে মিবার ও মালব প্রভৃতি দেশেও স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করেন। ইঁহারা আবার উত্তরকালে হূনদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন।

সৌরাষ্ট্রদেশ হইতে শিবারাধক রাজগণ মিবার ও মালবে রাজ্যবিস্তার করেন। শাসনলিপি প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১২৬ অব্দে এক সৌরাষ্ট্রসমাগত রাজা মালব অধিকারপূর্ব্বক উজ্জয়িনীকে স্বীয় রাজধানী করেন। মিবারের প্রাচীন কাহিনী অনুশীলনের দ্বারা এবং ইতিবৃত্তের আলোচনা দ্বারাও জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যোপাসক ও শিবোপাসক শকবংশীয় রাজগণ যখন মালব প্রভৃতি আক্রমণ করেন, তখন ঐ সকল প্রদেশ ভীলজাতীয় আদিম নিবাসীদিগের হস্তে ছিল। তাহাদেরই সহিত নবাগত জেতাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব মৃচ্ছকটিকে উজ্জয়িনীপতির গোপালদারকের সহিত যে বিবাদের বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা এই আদিম অধিবাসীদিগের বংশধরদিগের অভ্যুত্থান মনে করা যাইতে পারে; অথবা তৎপূর্ব্বপ্রসূত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের ফল মনে করা যাইতে পারে।

শেষোক্ত অনুমান করিবার আর একটু যুক্তি এই, এই মৃচ্ছকটিকেরই একস্থানে দুইজন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া একজন অপরকে বলিতেছে—“জানি, জানি, তুই ত চামারের ছেলে, রাজপ্রসাদে সেনাপতি হইয়াছিস্।”—ক্ষত্রিয়ের কার্য্য চামারে করিতেছে, ইহাও বোধ হয় বৌদ্ধ-প্রভাবের ফল। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এই বৌদ্ধপ্রভাব খ্রীষ্টীয় অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই মালব প্রভৃতি দেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীপতি শকবংশীয় রাজগণ এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে দমন করিয়া শিবোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিন্ধুর উপকূল হইতে এক প্রবল জাতি আসিয়া সৌরাষ্ট্রদেশকে অধিকার এবং তাহার রাজধানী বল্লভীপুরকে দগ্ধ ও ধ্বংস করে। ধ্বংস করিলে তাহার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে বহুসহস্র লোক উত্তরাভিমুখে গিয়া এক স্বতন্ত্র নগর স্থাপন করিয়া বাস করে। ইহারা জৈনমতাবলম্বী বলিয়া এবং জেতারা সূর্য্য ও শিবের উপাসক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল প্রদেশে বৌদ্ধ, জৈন ও শিবোপাসকদিগের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে। এই বিবাদের ফলস্বরূপ আর্য্যাবর্ত্তে কান্যকুব্জ, ইন্দ্রপ্রস্থ ও উজ্জয়িনী, এই তিনটি স্থান পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধানকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠে। মৃচ্ছকটিকে এই বৌদ্ধপ্রভাবের হ্রাস ও উদীয়মান শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় উভয়েরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

উজ্জয়িনীতে শৈবধর্ম্মের অভ্যুদয় অনুমানের আর এক কারণ এই যে, কবি বারবার ‘নানক’নামক একপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ করিতেছেন। প্রথম অঙ্কে শকার বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে :—

“এষা নানকমোষি-কাম-কশিকা।”

অর্থ—নানককে যে হরণ করে অর্থাৎ চোর, তার কামকে যে চরিতার্থ করে, অর্থাৎ গণিকা।

এতদ্ভিন্ন এই নাটকের অপরাপর স্থানেও ‘নানক’নামক মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। পুরাতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে ও এক বা দুই শতাব্দী পরে সিন্ধুনদের তীরে যে রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা ‘নানক’ নামে শিবনামাঙ্কিত একপ্রকার মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। এই ‘নানক’মুদ্রা সেই মুদ্রা। এরূপ অনুমান করা যায়, শকবংশীয় রাজগণই মালব, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে স্বীয় অধিকারবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ব্যবহৃত নানকমুদ্রা ঐ সকল স্থানে প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। এই নানকমুদ্রা এক সময়ে অনেক প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহার প্রমাণ, মৃচ্ছকটিককার ‘দরিদ্র’শব্দের পরিবর্ত্তে ‘নির্নানক’শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। উজ্জয়িনীর প্রতিষ্ঠাতা শকবংশীয় রাজগণ যেখানেই গিয়াছিলেন, শৈবধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিকে আমরা সেই লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিতেছি।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখিতেছি, সংবাহক দ্যূতকরদিগের দ্বারা অনুসৃত হইয়া তাহাদের

ভয়ে এক পরিত্যক্ত দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দেবীর স্থান অধিকার করিয়া রহিল; এবং সভিক, দ্যূতকর প্রভৃতি সেই মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল। ইহাতেই প্রমাণ, খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধনরপতিগণের প্রভাবে আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থানেই হিন্দুধর্ম্ম এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, অনেক দেবদেবীর মন্দির পূজারীর অভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কেবল তাহাও নহে, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। নাটকের প্রধান পুরুষ চারুদত্ত একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি শ্রেষ্ঠিচত্বরে বাস করেন; তিনি শ্রেষ্ঠীদিগের অর্থাৎ কুসীদব্যবসায়ী ধনীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, নিজের দানধ্যানের জন্যই দরিদ্র হইয়াছেন। চারুদত্ত প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা করিতেছেন বটে, এবং তাঁহার পত্নী ধূতা উপবাস ও ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদানাদি করিতেছেন বটে, কিন্তু আসল ব্রাহ্মণের কাজ তখন বিলুপ্ত হইয়াছে। চারুদত্ত একটি গণিকার প্রণয়ে আসক্ত হওয়াকে অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য মনে করিতেছেন না।

অধিক কি, তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, শর্ব্বিলক একজন ব্রাহ্মণের সন্তান, সে দুষ্ক্রিয়ান্বিত ও গণিকাসক্ত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সে চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটিবার সময় আপনার যজ্ঞোপবীতটিকে পরিমাণসূত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে; আর বলিতেছে :—

"যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং বিশেষতোঽস্মদ্বিধস্য। কুতঃ—

এতেন মাপয়তি ভিত্তিষু কর্ম্মমার্গং
এতেন মোচয়তি ভূষণসম্প্রয়োগান্।
উদ্‌ঘাটকো ভবতি যন্ত্রদৃঢ়ে কপাটে
দষ্টস্য কীটভুজগৈঃ পরিবেষ্টনঞ্চ ॥"

অর্থ—"যা হোক, পৈতাটা ব্রাহ্মণের, বিশেষত আমার মত ব্রাহ্মণের, অনেক কাজে লাগে। কেন না, এতদ্দ্বারা সিঁধ কাটিবার সময় ভিত্তি মাপা যায়, অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি খুলিয়া লওয়া যায়, দ্বারে অর্গল দিয়া রাখিলে খোলা যায়, এবং সর্ব্বশেষে সাপ্‌খোপে কামড়াইলে তাগা বাঁধা যায়।"

পূর্ব্বোক্ত উক্তির ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এরূপ মনে লাগে যে, সে সময়কার আচারভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণ্যচ্যুত ব্রাহ্মণগণকে উপহাস করিবার উদ্দেশেই কবি শর্ব্বিলকের ন্যায় এক পুরুষকে স্বীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। এই অনুমানের আর এক প্রমাণ এই, কবি এই সময়েই শর্ব্বিলকের মুখে আর একটি উক্তি দিয়াছেন। শর্ব্বিলক বলিতেছেন :—

"অহং হি চতুর্ব্বেদবিদোঽপ্রতিগ্রাহকস্য পুত্রঃ শর্ব্বিলকো নাম ব্রাহ্মণো গণিকামদনিকার্থমকার্য্যমনুতিষ্ঠামি।"

অর্থ—"আমি শর্ব্বিলক, জাতিতে ব্রাহ্মণ, চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পুত্র, আমি মদনিকা গণিকার নিমিত্ত অপকার্য্য করিতেছি।"

কবি যেন বলিতে চাহিতেছেন—"কালে কালে এই হ'ল যে, যার বাপ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী, তার ছেলে বেশ্যাসক্ত চোর।" ইহাতেই জানা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সে সময়ে কতদূর ম্লান ও শিথিল হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের আরও কিছু কিছু পরিচয় এই নাটকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধনীতির দুইটি প্রধান অঙ্গ—অহিংসা ও দান। দরিদ্রদিগকে দান বৌদ্ধ আচার্য্য গণ সকল গুণের উপরে শ্রেষ্ঠগুণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অশোকের ন্যায় বৌদ্ধ উপাসকগণও দানধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ। এমন কি, চৈন পরিব্রাজক হিউএন্‌সঙ্গ ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন থানেশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের রাজসভাতে উপস্থিত হন, তখন তিনি প্রয়াগের "সন্তোষক্ষেত্রে" অদ্ভুত মেলা ও অদ্ভুত দানের ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। ঐ দান অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় শ্রেণীর সাধকদিগকে করা হইয়াছিল। ঐ দানের ব্যাপার দেখিয়াই বোধ হয় হিউএন্‌সঙ্গ শিলাদিত্যকে বৌদ্ধ উপাসক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে শৈবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা বোধ হয় এই,—সে সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় শ্রেণীর রাজগণই অভেদে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান করিতেন। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম অবিবাদে পাশাপাশি বাস করিতেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মধ্যেও বৌদ্ধনীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে-কোন কাব্যপুরাণাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে অহিংসা ও দানধর্ম্মের মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে।

হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান, দাতাকর্ণের পুত্রশিরশ্ছেদন, বলির পাতালগমন, নাগানন্দে জীমূতবাহনের পক্ষিমুখে আত্মসমর্পণ, এই দানমহিমাঘোষণা মাত্র। এই মৃচ্ছকটিকনাটকের গ্রন্থকার যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির জন্য ব্রাহ্মণদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, তথাপি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান পুরুষ চারুদত্তের সর্ব্বপ্রধান প্রশংসার বিষয় এই, তিনি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফকীর হইয়াছেন। নতুবা গণিকাসঙ্গ করিতে, মিথ্যা বলিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে তাঁহার বাধিতেছে না। বসন্তসেনার ন্যস্তসম্পত্তি চোরের দ্বারা অপহৃত হইলে, তিনি নিজ পত্নীর রত্নমালা বিদূষকের হস্তে প্রেরণ করিয়া এই কথা বলিতে বলিতেছেন যে, "সে ন্যস্তসম্পত্তি আমি নিজের মনে করিয়া দ্যূতে হারিয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে এই রত্নাবলী প্রেরণ করিতেছি।" বিচারস্থলে তিনি হতাশ ও নিজ প্রাণের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া অবশেষে বলিতেছেন—"আমি বসন্তসেনাকে মারিয়াছি," যাহা সত্য নহে। কিন্তু ইঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসার বিষয় এই, ইনি আপনার সমুদয় বিভব অর্থিগণের উদরসাৎ করিয়াছেন। এমন কি, স্বীয় পুত্রকে একটি মাটীর শকটের অধিক দিবার সাধ্য নাই।

আমাদের ত পড়িতে পড়িতে চারুদত্তের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ বিরাগ উৎপন্ন হয়। দারিদ্র্যের জন্য কাতরোক্তি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় এবং বলিতে ইচ্ছা করে—"বাবা, শেষে যদি কাঁদ্‌বে, তবে দান কর্‌তে গেলে কেন?" কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহাকে আদর্শচরিত্র বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। নিশ্চয় এই দানশক্তি তাঁহার চক্ষে মানবচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ "আদর্শ" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

তৎপরে দানশক্তির স্তায় অহিংসাধর্ম্মের প্রতিও দৃষ্টি দেখা যায়। কবি শকারের মুখ দিয়া বসন্তসেনাকে যখন গালাগালি দিতেছেন, তখন অপরাপর অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনের মধ্যে "মৎস্যাশিকা" বা মৎস্যভোজিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইহাতে প্রমাণ, সেই প্রাচীন সময়েও মৎস্য-মাংস-আহার নিকৃষ্টশ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ ও ঘৃণিত কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। ইহাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবজাত বলিতে হইবে।

এ সময়ে আর একটি অনুষ্ঠান দেখিতেছি, যাহা দেখিলে বর্ত্তমান জৈনধর্ম্মকে স্মরণ হয়। তাহা পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতিকে আহার দেওয়াকে ধর্ম্মজ্ঞান করা। এই ভাব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সেই প্রাচীনকালেও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ধার্ম্মিকপ্রবর চারুদত্ত নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও সন্ধ্যাবন্দনান্তে ভূতদিগকে বলি অর্পণ করিতে ভুলিতেছেন না। বিদূষককে বলি অর্পণ করিতে বাধ্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যাইতেছে, জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের চক্ষে ইহা নিত্য আচরণীয় মহা ধর্ম্মানুষ্ঠান। গুজরাটের অন্তর্গত আমদাবাদ প্রভৃতি জৈনপ্রধান স্থানে, এমন কি, কলিকাতার বড়বাজারের মাড়ওয়ারীপটীর স্তায় স্থানে পদার্পণ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ রাজপথে পক্ষিদের জন্য নানাজাতীয় শস্যবীজ, অথবা, পিপীলিকাদের জন্য চিনি প্রভৃতি অর্পণ করিতেছেন। এই ধর্ম্মবুদ্ধি এতদূর গিয়াছে যে, এরূপও শুনিয়াছি, পয়সা দিয়া মানুষ ভাড়া করিয়া তাহাকে সমস্তরাত্রি খাটের সহিত বাঁধিয়া-রাখিয়া ছাঁরপোকাদিগকে খাওয়ানকেও তাঁহাদের অনেকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। এই অহিংসা ও ভূতবলির ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই অহিংসা হিন্দুভাব নহে; কারণ যাগযজ্ঞ ও পশুবলি এদেশের প্রাচীন ভাব। তান্ত্রিক বামাচারকে এই অতিরিক্ত অহিংসাপরতার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তৎপরে এই নাটকের মধ্যে সামাজিক রীতিনীতির যে নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত তখন দাসদাসীদিগকে ক্রয়বিক্রয় করা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। মদনিকা বসন্তসেনার দাসী; শর্ব্বিলক তাহার প্রতি অনুরক্ত; তাহাকে একেবারে চায়,—বসন্তসেনা তাহাকে যে মূল্যে কিনিয়াছিলেন, তাহা না পাইলে দিবেন না, এই আশঙ্কা করিয়া শর্ব্বিলক চুরি করিতে গেল; এবং চারুদত্তের গৃহ হইতে বসন্তসেনার ন্যস্ত অলঙ্কারগুলি চুরি করিয়া আনিল। দ্বিতীয়ত সংবাহক সভিক, দ্যূতকর প্রভৃতির নিকট দ্যূতে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, যখন তাহাদের হস্তে ধরা পড়িল এবং বাজির টাকা দিতে অসমর্থ হইল, তখন আপনাকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ দিবার চেষ্টা করিল; এবং প্রকাশ্য রাজপথে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়রা কে চাকর চান, আমাকে ক্রয় করুন, আমি সংবাহনবিদ্যাতে পারদর্শী", ইত্যাদি।—এই ক্রীতদাসপ্রথা ও বাঁদীক্রয়-প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশে

চলিয়া আসিয়াছে। ইংরাজরাজ্যে ইহা অপরাধের মধ্যে গণ্য হইয়া নিবারিত হইয়াছে।

তৎপরে আর একটা এই দেখিতেছি—বারাঙ্গনাদিগের মহাসম্ভ্রম। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হুতোম প্যাঁচা যখন তাঁহার সরস ভাষাতে কলিকাতাসহরের নক্‌সা অঙ্কিত করেন, তখন বলিয়াছিলেন—

"আজব সহর কলকেতা।
* * * *
রাঁড়ী-সুঁড়ীর খাসা বাড়ী ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।"

এ সম্বন্ধে এই খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর সমকালের মহানগরীসকলের কিছু প্রভেদ দেখিতেছি না। ভদ্রতম চারুদত্তের ভবনে একটি প্রদীপ জ্বলে কি না, সন্দেহ! কিন্তু গণিকা বসন্তসেনার ভবনে সাত প্রকোষ্ঠ, এক একটি প্রকোষ্ঠ এক একটি রাজভবনের ন্যায়; বসন্তসেনার মদমত্ত হস্তী রাজপথে সকলের ত্রাস উৎপন্ন করিতেছে; বসন্তসেনার দাসদাসী, পরিচারক-পরিচারিকার অন্ত নাই; কি ঐশ্বর্য্য! কি বিভব!

এই বারাঙ্গনাবৃত্তির বিষয়ে আবার এই দেখিতেছি যে, ইহা ভদ্রজনসম্মত একটি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে। ভদ্রলোকে ইহাদের গৃহে যাইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। ইহারাও অবাধে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আসিতেছে। এ বিষয়ে ইহারা গ্রীক্ হেটেরিদিগের ন্যায় ছিল, যাহাদের ভবনে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস্‌ও যাইতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

বসন্তসেনার অভিসারক্রিয়া কি নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা! ইহাতেই প্রমাণ, এ-জাতীয় গণিকাগণ তখন কিরূপ অবারিতগতি ছিল। কিন্তু এ কথা বলিবার সময় মনে হইতেছে, এখনও ত ভারতবর্ষে এরূপ একশ্রেণীর বারাঙ্গনা রহিয়াছে। পঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যে এখনও দুই শ্রেণীর বারাঙ্গনা দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীকে বলা যাউক "রাহী", আর এক শ্রেণীকে বলা যাউক "গেহী"। "রাহী" তাহারা, যাহারা পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণ করে। গেহীরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত বাস করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নৃত্যগীতে পরিপক্ক। বিবাহাদি উৎসবে ইহারাই গৃহস্থের গৃহে নৃত্যাদি করিতে আসে। দাক্ষিণাত্যে এই শ্রেণীর বারাঙ্গনাগণ সচরাচর দেবমন্দিরের দেবদাসী বলিয়া পরিচিত। ইহারা নামত মন্দিরের দেবগণের সহিত বিবাহিত হয়, কিন্তু ফলত বিলাসী পুরুষগণের জন্যই থাকে। ইহাদের সহিত মেশা বা ইহাদিগকে বাড়ীতে আনা তত্তৎপ্রদেশের সামাজিকদিগের পক্ষে লজ্জাজনক কার্য্য নহে। ইহারা dancing girl নামে পরিচিত। এজন্য সে সকল প্রদেশের বহুসংখ্যক পুরুষের নীতি অতি কলুষিত। সে নীতি সংশোধিত হইতে যে কতদিন লাগিবে, তাহা বলা যায় না। এই দেবদাসী বা dancing girl শ্রেণী বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। চৈতন্যচরিতামৃতে রামানন্দ রায়ের চরিত্রবর্ণনস্থলে গোদাবরীপ্রদেশে এই দেবদাসীদলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহাকে এই "গেহী"শ্রেণীগণ্য বারাঙ্গনা বলা যাইতে পারে। বসন্ত-

সেনার মাতা ও ভ্রাতার উল্লেখ দেখা যাই-তেছে। মাতা ও ভ্রাতা তাহার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। এখনও পঞ্জাবে ও অপরাপর স্থানে গিয়া দেখুন, এই ব্যাপার চলিতেছে। কেবল তাহাও নহে, বিদূষক বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া বলিতেছে— "স্ত্রীলোকটা সুরাপান করিয়া করিয়া স্থূলোদরা হইয়াছে।" ইহাতে প্রমাণ, তখনও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক ও ইহাদের সংসর্গী পুরুষগণ পানাসক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

তৎপরে সে সময়কার বিচারপ্রণালী। ইহা যেন কতকটা এখনকার বিচারপ্রণালীর অনুরূপ, তবে উকীল নাই। অধিকরণিক-শব্দবাচ্য একজন রাজনিযুক্ত বিচারক অধিকরণে আসিয়া বিচারাসনে বসিলেন, সঙ্গে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। কায়স্থ সাক্ষীর জবানবন্দী লেখেন; শ্রেষ্ঠীর কি কাজ, তাহা নাটকে প্রকাশ পাইতেছে না; হয় তিনি জুরির কাজ করেন,—বিচারকের বিচার-কার্য্যের সহায়, না হয় জরিমানার টাকা প্রভৃতি যাহা-কিছু জমা হয়, তাহা লইয়া রাজ-কোষে জমা দিবার ভারগ্রহণ করেন। অনু-মানে বোধ হয়, শ্রেষ্ঠীদিগের প্রতি দ্বিতীয়-প্রকার কার্য্যের ভার থাকিত। কারণ প্রাচীন হিন্দুবিচারপ্রণালীতে প্রাড়্বিবাক-গণই অনেকপরিমাণে জুরীর কার্য্য করি-তেন। মৃচ্ছকটিকের বিচারে কিন্তু প্রাড়্বিবাক দেখা যাইতেছে না।

এই নাটকে তদানীন্তন লৌকিক প্রচলিত ধর্ম্মের যে ছবি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও কতকটা বর্ত্তমানপ্রচলিত লৌকিকধর্ম্মের অনুরূপ। দেখিতেছি, সেই প্রাচীনকালেও লৌকিকধর্ম্ম প্রধানত স্ত্রীলোকদিগের ব্রত-উপবাসাদিতে দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিয়া বসিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া কথা শুনাইয়া যান; এবং ব্রত-উপবাসাদি করিলে অন্তত একটি ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়।

ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতকে সেই প্রাচীনকালেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে খুব পরিচিত দেখা যাইতেছে। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ পদে পদে রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণিত আখ্যায়িকাসকলের উল্লেখ করিতে-ছেন, কিন্তু অপর কোন পুরাণোল্লিখিত আখ্যায়িকাদির উল্লেখ দেখা যায় না। ইহাও মৃচ্ছকটিকের খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইবার অপর প্রমাণ; কারণ অধিকাংশ পুরাণ তৎপরে রচিত হইয়াছে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

বাচ্ছা-চর।

[অনুবাদ]

তাহার নাম ষ্টেনের পো, খালি ষ্টেনের পো।

সে পারী-নগরের একটি সহুরে ছেলে, কাহিল, ক্যাকাসে। তাহার বয়স দশও হইতে পারে, পনের বলিলেও চলে, এ-রকম ছোঁড়াদের বয়স ঠিক করা মুস্কিল। তার মা মারা গিয়াছিল। বাপ আগে সিপাহী ছিল, এখন সহুরের একটা পাড়ার চকের হেফাজতের কাজে নিযুক্ত।

শিশুর দল, চাকরাণী, নিড়বিড়ে বুড়ী, ছেলে-কোলে পথচলতি স্ত্রীলোক, যে কেহ গাড়িঘোড়ার ভিড় হইতে চার-দিক্-রাস্তার-ঘেরা সেই চকের বাগানের মধ্যে আশ্রয় লইত, সকলেই বাবা ষ্টেন্‌কে চিনিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

তাহারা জানিত যে, সেই ঝাঁটার মত গোঁফ-জোড়া, যা দেখিয়া পাড়ার বদমাইস ও রাস্তার কুকুরগুলো ভয়ে অস্থির হইত, তার মধ্যে বড় নরম, মিঠে, প্রায়-মায়ের-মত-স্নেহমাখা একটি হাসি লুকান ছিল। সেই হাসিটুকু দেখিতে হইলে ভদ্রলোককে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেই হইত—"তোমার ছেলেটি কেমন?"

বাবা ষ্টেন্ ছেলেকে কি ভালটাই বাসিত! ছোক্‌রা যখন শেষবেলায় ইস্কুল থেকে ফিরিয়া তাহাকে ডাকিত, তখন সে খুসী কত! তার পর বাপে-বেটায় মিলিয়া চকের চারদিকের রাস্তায় চক্র দিত, বেঞ্চিতে যারা বসিয়া আছে তাহাদিগকে অভিবাদন করিত, তাদের কুশল-প্রশ্নের উত্তর দিত।

দুঃখের মধ্যে পারী-অবরোধের সঙ্গে সঙ্গে সবই উলট্‌পালট্ হইয়া গেল। এই চকের ভিতর একরাশ কেরোসিন্-তেল আনিয়া জমা করা হইল, তাই পাহারা দিতে দিতে বেচারা বাবা ষ্টেন্‌কে সমস্তদিন সেই লোকশূন্য জঙ্গলপড়া বাগানে একলাটি কাটাইতে হইত। তামাকটুকু পর্য্যন্ত খাইবার জো ছিল না; সেই কত রাত্রে বাড়ী-ফেরার আগে ছেলেরও দেখা পাইত না। সুতরাং প্রুশিয়ানদের নাম করিলে তার গোঁফ-ফোলানটা একটা দেখ্‌বার জিনিষ ছিল।"

ষ্টেনের পোর কিন্তু এ নূতন বন্দোবস্তে আপত্তির বিশেষ কারণ ছিল না। অবরোধ! ছোঁড়াদের পক্ষে এমন মজার জিনিষ কি আর আছে? ইস্কুল নাই, পড়া নাই, রোজই ছুটি, রাস্তায় যেন সমস্তক্ষণ মেলা লাগিয়া রহিয়াছে।

বালক সারাদিন বাইরে-বাইরে টোটো করিয়া রাত্রে বাড়ী ফিরিত। পল্টনের দলগুলো যে সময়ে পাড়ার ব্যারাক্ হইতে গড়ে যাইত, সে একটা-না-একটার সঙ্গ ধরিত, যেটার বাজনা ভাল, সেইটাই পছন্দ করিয়া লইত। এ সম্বন্ধে ষ্টেনের পোর বেশ জানা-শোনা ছিল। সে ফস্ করিয়া

বলিয়া দিতে পারিত যে, ৯৬ নং. পল্টনের ব্যাণ্ড তেমন কাজের নয়, কিন্তু ৫৫রটার বড় জবর। আবার কখনো বা সে দাঁড়াইয়া ফৌজের কাওয়াজ দেখিত।

এর উপর দোকানের দরজায় লোকের সার ছিল। শীতকালের এই অন্ধকার ভোর হইতে মাংসওয়ালা-রুটিওয়ালার দোকানের সাম্‌নে সারবন্দী লোক জমিয়া থাকিত, সেই বরফ-গলা জলে পা দিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে সেখানে সকলের পরস্পরের সহিতআলাপ হইত, গল্প চলিত, রাজনীতির তর্কবিতর্ক বাধিত। টেনের পো চুপ্‌ড়ী-হাতে সেই সারের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিত, টেন্‌-মহাশয়ের ছেলে বলিয়া সকলে ওরও মতামত জিজ্ঞাসা করিত।

কিন্তু সব চেয়ে ভারি আমোদ ছিল জুয়াখেলা। টেনের পোকে সৈন্যদলের সঙ্গে বা দোকানের সাম্‌নে না দেখা গেলে, বড় চক্রের ভিতরে, যেখানে যুদ্ধ সুরু হওয়া অবধি একটি মস্ত জুয়ার আড্ডা বসিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাকে নির্ঘাত পাওয়া যাইত। সে যে নিজে খেলিত না, তা আর বলিতে হইবে কেন, সে ত ঢের পয়সার কাজ। কিন্তু খেলওয়াড়দের দিকে কি প্যাট্‌প্যাট্ করিয়া চাহিয়া থাকিত!

এক চোটে পাঁচমুদ্রার কম বাজি ফেলিতই না, এমন একটি নীল-জামা-পরা ঢ্যাঙা ছোকরা তাহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। সে একটু জোরে চলিলেই তার পকেট সর্ব্বদা ঝম্‌ঝম্ করিত।

একদিন তাহার একটি মুদ্রা টেনের পোর পায়ের কাছে গড়াইয়া আসিল্যে কুড়াইয়া লইবার সময়ে ঢ্যাঙা ছোকরাটি চাপা আওয়াজে তাহাকে বলিল—"টাকা দেখে' যে ট্যারা হয়ে গেলি, অ্যাঁ? আচ্ছা, চাস্ ত এ সব কোথা পাওয়া যায়, তোকে বলে' দিতে পারি।"

খেলা শেষ হইলে সে তাকে চকের এক কোণে লইয়া গিয়া প্রুশিয়ানদিগকে ফরাসী খবরের কাগজ বেচিতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। ইহাতে সে প্রত্যেক খেপে ত্রিশমুদ্রা করিয়া পাইত।

টেনের পো প্রথমটা মহা রেগেমেগে অস্বীকার করিল; এমন কি, তিনদিন সে খেলার ধারেই গেল না। তিনটি বড় সাঙ্ঘাতিক দিন। ঘুমাইতেও পারে না, খাইতেও পারে না। রাত্রে সে কেবলি দেখিতে থাকে, খাটের গোড়ায় একরাশ খেলার ঘুঁটি, আর চারদিকে রুপার মুদ্রা চেপ্টা হইয়া পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। লোভের মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়িল।

চতুর্থ দিনে সে আবার বড় চকে হাজির, ফের সেই ঢ্যাঙা ছোকরার পাল্লায় পড়িল, এবার জড়িয়াও গেল।

একদিন সকালে বরফের মধ্য দিয়া দু'জনে বাহির হইল, কাঁধের উপর একটি করিয়া চটের থলে, কাপড়ের মধ্যে খবরের কাগজ লুকান। তাহারা যখন সহরের ফটকে উপস্থিত, তখন সবে আলো হইয়াছে। ঢ্যাঙা ছোকরাটি টেনের পোর হাত ধরিয়া সান্ত্রীর নিকট এগিয়ে গেল—লাল-নেকো সিপাহী, মুখে ভালমানুষী ভাব—এবং ভিক্ষুকের নাকে-কাঁদুনি সুরে তাহাকে বলিল—"আমাদের ছেড়ে দাও গো, দয়াল সেপাই-

বাবা! আমাদের বাপ মারা গেছে, 'মা ব্যারামে পড়ে', আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আমি মাঠে আলু কুড়ুতে যাব।"

বলিয়া সে কান্না জুড়িয়া দিল। ষ্টেনের পো লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। সান্ত্রী একবার উহাদিগকে দেখিয়া লইল, একনজর চারদিক্‌ চাহিল. কেউ কোথাও নাই, তার পরে চট্‌ করিয়া পথ ছাড়িয়া-দিয়া কহিল—"ফূর্ত্তি কর্‌!"

যাঁহাতক্‌ বলা, আর তাহারাও সদর-রাস্তায় বাহির। তখন ঢ্যাঙা ছোঁড়াটার হাসি দেখে কে!

ষ্টেনের পো স্বপ্নের মত ঝাপ্‌সাভাবে দু'ধারের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কারখানা-গুলোকে সব ব্যারাক্‌ করিয়া ফেলা হইয়াছে, লম্বা-লম্বা ধোঁয়াশূন্য চোংগুলো কোয়াশা ফুঁড়িয়া ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এখানে-ওখানে পাহারা; কোথাও ঝাপ্পা-ঝোপ্পা-আঁটা সেনা-নায়ক দূরবীণ দিয়া দূরে কি দেখিতেছে; মাঝে মাঝে গলা-বরফে-ভেজা তাঁবু, সাম্‌নে রাত্রে-জ্বালা আগুনের ছাই পড়িয়া।

ঢ্যাঙা ছোঁড়ার পথঘাট সব চেনা ছিল, সে সান্ত্রী-বসান স্থানগুলি বাঁচাইয়া মাঠে মাঠে চলিতে লাগিল; শেষে কিন্তু একদল গোলন্দাজের সাম্‌নে পড়িয়া গেল, তাহাদিগকে আর এড়াইতে পারিল না। তাহারা বরাবর রেলের রাস্তার জলার ধারে সার-বাঁধা ছোট ছোট চালার মধ্যে চৌকি দিতেছিল।

এবার ঢ্যাঙা ছোকরা তার গৎটি বৃথা আওড়াইল, তারা কিছুতেই ছাড়িবে না। কান্নাকাটি শুনিয়া কোঁচকান-মুখ, চুলে-পাক-ধরা কতকটা বাবা ষ্টেনের ধরণের এক বুড়ো জমাদার পাহারা-ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিয়া বলিল—"কিরে বেটারা! অমন করে' কি কাঁদ্‌তে আছে? আলু কুড়'তে যাবি এখন, আগে ঘরে এসে একটু গরম হয়ে নে, ছোট ছোঁড়াটা যে প্রায় জমে' গেছে।"

হায় রে! ষ্টেনের পো যে কাঁপিতেছিল, সে ত শীতে নয়, ভয়ে ও লজ্জায়! পাহারা-ঘরে ঢুকিয়া তাহারা দেখে, গরীবিয়ানা-রকমের অল্প একটুখানি আগুনের চার-দিকে জনকতক সিপাহী জড়সড় হইয়া সঙীনের উপর বরফ-জমা বিস্কুটগুলি বিঁধিয়া তাতাইয়া লইতেছে।

ছেলেদের জন্য জায়গা করিয়া তাহারা আর-একটু ঘেঁষাঘেঁষি বসিল। তাহা-দিগকে একটু কাফি খাইতে দিল। তাহারা সেটা খাইতেছে, এমন সময়ে এক নায়ক দরজার গোড়ায় আসিল, জমাদারকে ডাকিল, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কি বলিল, আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল। জমাদার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া-আসিয়া উৎফুল্লমুখে কহিল—"ওহে বাপসকল, আজ রাত্তে একটা কাণ্ডমাণ্ড কিছু হবে! প্রুশিয়ান্‌দের সঙ্কেত মেরে নেওয়া গেছে, এবার বোধ হয় সয়তানদের বুর্জে-গড়টা আবার আমাদের হাতে পড়্‌বে।"

তখন হাসি ও জয়ধ্বনির চোটে ঘর ভাঙিয়া পড়িবার জোগাড়! সকলে নাচিয়া-গাহিয়া সঙীন আস্ফালন করিতে লাগিল। এই মাতামাতির সুযোগে ছোকরারা সট্‌কাইয়া পড়িল।

রেলের রাস্তা পার হইলে সাম্‌নে ফাঁকা-

মাঠ ছাড়া আর কিছু রহিল না। দূরে একটি টানা দেওয়াল, ঘনঘন ঘুলঘুলি কাটা। এই দেওয়ালের দিকে ইহারা আলু কুড়াইবার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে নুইতে নুইতে চলিল। ষ্টেনের পো বারে-বারে বলিতে লাগিল—"চল ফিরে যাই, আর গিয়ে কাজ নেই।"

কিন্তু অপরটি শুধু ভ্রু কোঁচকায়, আর চলিতে থাকে। হঠাৎ বন্দুকের ঘোড়াতোলার কটাস্-শব্দ শোনা গেল। ঢ্যাঙা ছোঁড়া মাটীতে লুটাইয়া-পড়িয়া বলিল—"শুয়ে পড়্!"

দুই জনেই জমির উপর লম্বা হইলে সে শিশ্ দিল। বরফের উপর দিয়া পাল্টা শিশ্ আসিল। তাহারা গুড়ি মারিয়া আগিয়ে চলিল। দেওয়ালের ঠিক সাম্‌নে মাটীর সঙ্গে সমান হইয়া এক ময়লা টুপি ও তাহার নীচে কটা গোঁফ-জোড়া দেখা দিল। ঢ্যাঙা ছোকরা সেই প্রুশিয়ান্‌টার পাশে নালার মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গীটির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—"এটি আমার ভাই।"

ষ্টেনের পো এমন ছোট্টটি ছিল যে, প্রুশিয়ান্‌টা তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির। তাহাকে আড়্‌কোলা করিয়া তবে দেওয়ালের কাটা জায়গাটা পার করা গেল।

দেওয়ালের ও-পাশে মস্ত মস্ত মাটীর ঢিবি, কাটা গাছের গুঁড়ি, বরফের মধ্যে কালো কালো গর্ত্ত, প্রত্যেক গর্ত্তের ভিতর সেইরকম ময়লা টুপি, তার নীচে সেইরকম কটা গোঁফ, ছেলেদিগকে যাইতে দেখিয়া সবগুলোতে মুচ্‌কি-হাসি।

এক কোণে বাগান-ওয়ালার বাড়ী, তাহা গাছের গুঁড়ি দিয়া আগাগোড়া মোড়া হইয়াছে। নীচের ঘরে সিপাহী পোরা, তাহারা তাস খেলিতে ব্যস্ত। গম্‌গমে আগুনটার উপর হাঁড়ি চড়ান, দিব্য রান্নার গন্ধে ভুর্‌ভুর্ করিতেছে। সেই ফরাসী গোলন্দাজদের আড্ডা হইতে কত তফাৎ!

উপরের তলায় সেনানায়করা। তাহারা মদ খাইতেছে, গানবাজনা করিতেছে। ফরাসী ছোকরা-দু'টা ঢুকিতে খুব আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। তাহারা উপরে গিয়া খবরের কাগজগুলি বাহির করিয়া দিল। তাহাদের নিকট আরো কথা আদায় করিবার আশায় মদ দেওয়া হইল।

নায়কদের খুব ঘাড়-তোলা নাক-সিঁটকান ভাব, কিন্তু ঢ্যাঙা ছোঁড়াটার নানারকম সহুরে রসিকতা ও গলিচ্ বোলচালের চোটে তাহারা নরমে আসিল। প্রথমটা হাসিল, ক্রমে সেই সব চোখা-চোখা বুলি তার সঙ্গে সঙ্গে আওড়াইতে লাগিল, এক কথায় পারী-নগরের এই কাদায় শুয়ারের মত আনন্দে লুটাপুটি করিতে থাকিল।

ষ্টেনের পোর ইচ্ছা হইল, সেও দুটো বিদ্যা জাহির করিয়া প্রমাণ করে যে, সে নেহাৎ অজ্ নয়, কিন্তু কি-একটা যেন তাহাকে দমাইয়া রাখিল। তার ঠিক সাম্‌নে, দল হইতে একটু তফাতে, একটি প্রবীণ গম্ভীর প্রুশিয়ান্ বসিয়া পড়িতেছিল, অর্থাৎ প্রথমটা পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আসলে তাহার চোখ একবারও ষ্টেনের পোর মুখ থেকে নামে নাই। তাহার চাহনীতে তিরস্কার-মেশান স্নেহ ছিল—যেন বাড়ীতে তাহার

এই বয়সের ছেলে আছে, যাহার সম্বন্ধে ভাবিতেছে--"ছেলেকে এমন কাজে দেওয়ার চেয়ে মরণ ভাল!"

সেই মুহূর্ত্ত থেকে ষ্টেনের পোর মনে হইল, যেন তার বুকের মধ্যে কাহার হাত ঢুকিয়া দম চাপিয়া বন্ধ করিতেছে। এই যন্ত্রণা এড়াইবার জন্ত সে মদ খাইতে লাগিয়া গেল। ক্রমে চারদিক্‌টা পাক দিতে আরম্ভ করিল। তাহার মধ্যে সে অস্পষ্টভাবে হাসির গর্‌রা শুনিল, দেখিল যে, তাহার সঙ্গীটি নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া ফরাসী-সৈন্তদের রকমসকম নকল করিতেছে।

পরে ঢ্যাঙা ছোকরাটি গলা নামাইল, নায়কগুলো তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের মুখ গম্ভীর। হতভাগাটা বুঝি গোলন্দাজদের রাত্রের আক্রমণসম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছে। তখন ষ্টেনের পোর নেশা ছুটিয়া গেল, সে রাগিয়া টং হইয়া লাফাইয়া উঠিল—"ও হবে না, ও সব চল্‌বে না!"

অপরটি খালি একটু হাসিয়া বলিয়া চলিল। তাহার শেষ হইতে না হইতেই নায়করা সব খাড়া হইয়া উঠিল। একজন দরজার দিকে দেখাইয়া ছেলেদিগকে বলিল—"বেরো!"

তাহার পর তাহারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কি বিড়্‌বিড়্‌ করিতে লাগিল।

ঢ্যাঙা ছোকরাটা পকেট বাজাইতে বাজাইতে রাজার মত বুক ফুলাইয়া বাহির হইল। ষ্টেনের পো মাথা লটকাইয়া তাহার পিছনে-পিছনে চলিল; যে প্রুশিয়ান্‌টির চাহনি তাহাকে এত উতলা করিয়াছিল, তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময়ে সে দুঃখের স্বরে এই কয়টি কথা শুনিল—"এ কাজ বড় ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়।"

তাহার চোখে জল আসিল।

একবার মাঠে পড়িলে পর বালকরা দৌড় মারিয়া শীঘ্রই ফরাসী সীমানায় উপস্থিত হইল। প্রুশিয়ান্‌রা আলু দিয়া তাহাদের থলেগুলো পুরিয়া দিয়াছিল, তাই নিয়া গোলন্দাজদের সার পর্য্যন্ত তারা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিল।

সেখানে রাত্রের আক্রমণের আয়োজন চলিতেছিল। ফৌজ চুপিচাপি আসিয়া দেওয়ালের আড়ালে জমায়েৎ হইতেছে। সেই বুড়া জমাদার বন্দোবস্ত করিতে মহাব্যস্ত, মুখে কি প্রফুল্লভাব! ছেলেরা যাইতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিয়া একটু স্নেহহাসি হাসিল।

উঃ! সে হাসি ষ্টেনের পোকে কি বেঁধাই বিঁধিল! একবার তাহার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া বলে—"ওগো, তোমরা ওখানে যেয়ো না গো, আমরা তোমাদের সর্ব্বনাশ করে' এসেছি!"

কিন্তু অপরটি উহাকে বলিয়া রাখিয়াছিল—"খবরদার, মুখ খুলিস্ নে, তা হ'লে আমাদের গুলি কর্‌বে!"

সেই ভয়ে সে চাপিয়া গেল।

সহরের দেওয়ালের বাইরে তাহারা এক পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিয়া টাকা ভাগ করিয়া লইল। সত্য কথা বলিতেই হইবে যে, ভাগ কড়ায়-গণ্ডায় মিলাইয়া লওয়া হইল, এবং ষ্টেনের পো যখন তার কাপড়ের মধ্যে টাকার ঝম্‌ঝমানি শুনিল, তা' দিয়া কত খেলা

যাইতে পারিবে কল্পনা করিল, তখন তার দুষ্কর্মটা আর তত ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইল না।

কিন্তু বেচারা ছেলেমানুষ! সে যখন একলা পড়িল, তখন? ফটক পার করিয়া-দিয়া যখন ঢ্যাঙা ছোঁড়াটা চলিয়া গেল, তখন তাহার পকেটের ভার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তার বুকের মধ্যের সেই হাতটা আরও কসিয়া ধরিল। এ পারী-সহর আর সে পারী নয়। রাস্তায় লোকজন যেন সকলেই তাহার বিস্তা টের পাইয়াছে, সকলেই তাহার পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতেছে। গাড়ির চাকার ঘড়্‌ঘড়ানীতে, খালধারে যে যুদ্ধঢাক বাজিতেছে তাহার বোলে, সবটাতেই ক্রমাগত বলিতেছে—"ঘুষখোর!"

শেষে কোনরকমে বাড়ী পৌঁছিলে, বাপ তখনো আসেন নাই দেখিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তার নিজের বালিশের নীচে সেই টাকার বোঝাটা নামাইয়া-রাখিয়া তবু কতক হাল্‌কা বোধ করিল।

সে রাতে বাবা ষ্টেন্‌ যেমন খোস-মেজাজে বাড়ী ফিরিল, আগে এমন তার কখনো দেখা যায় নাই। মফস্বল হইতে যুদ্ধসংবাদ পৌঁছিয়াছে, লড়াইয়ের অবস্থা যেন একটু ভালর দিকে। খাইতে খাইতে বুড়া সিপাহী তাহার দেওয়ালে-টাঙান বন্দুকের দিকে তাকাইয়া, তাহার সেই শাদা খোলা হাসি হাসিয়া ছেলেকে বলিল—"বড় হ'লে তুই প্রুশিয়ান্‌দের খুব ঠুক্‌তিস্‌, কেমন?"

আটটা-আন্দাজ সময়ে তোপের আওয়াজ শোনা গেল।

—"ঐ শোন্‌! সদররাস্তার দিক্‌ থেকে আওয়াজ আস্‌ছে—বুর্জে-গড়ে খুব লেগে গেছে!"—ভদ্রলোক যুদ্ধের সমস্ত অন্ধিসন্ধি জানিত।

ষ্টেনের পো ফ্যাকাসে মারিয়া গেল; শ্রান্তিবোধ হইতেছে ছুতা করিয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম আসিল না। কামানের ধড়্‌ধড়ানি চলিতে থাকিল। তাহার মনে খালি সেই গোলন্দাজদের ছবি আসে; তারা প্রুশিয়ান্‌দিগকে রাত্রে আচম্‌কা ধরিতে গিয়া নিজে ফাঁদে পড়িয়া যাইতেছে। সেই বুড়া জমাদারের হাসি মনে পড়িল, অন্ত অনেকের সঙ্গে সে এতক্ষণ বরফের উপর পড়িয়া।

এই সব রক্তের মূল্য তাহার বালিশের নীচে লুকান—আর কারো নয়, বৃদ্ধ যোদ্ধা ষ্টেন্‌মহাশয়ের ছেলের বালিশের—

—চোখের জলে তার চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হইয়া গেল।

পাশের ঘরে শুনিল, বাবা জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইতেছেন। নীচের চকে ভেঁপু বাজিতেছে, ফৌজ সব বাহিরে যাইবে বলিয়া তৈয়ারী হইতেছে। তবে ত সত্য-সত্যই রীতিমত লড়াই বাধিয়াছে। ব্যাকুল বালক সশব্দে ফোঁপাইয়া উঠিল।

—"তোর কি হয়েছে রে?"—বাবা ষ্টেন্‌ ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

ছেলে আর থাকিতে পারিল না; এক লাফে খাট হইতে নামিয়া-পড়িয়া বাপের পা জড়াইয়া ধরিল। সেই ধাকায় মুদ্রাগুলি ঘরময় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

—"এ সব কি? তুই কি চুরী করে-ছিস্ নাকি?"—বুড়া কাঁপিতে কাঁপিতে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

তখন দম পর্য্যন্ত না লইয়া টেনের পো একটানে প্রুশিয়ানদের সীমানায় যাওয়ার ও সেখানকার কাণ্ডকারখানার বৃত্তান্ত বলিয়া গেল।

বলিতে বলিতে যেন তার বুকের চাপ একটু কমিয়া গেল, নিজের দোষস্বীকার করা হইলে একটু খোলসা বোধ করিল। বাবা টেন্ শোকবিহ্বল মুখে সব শুনিয়া গেল, শেষ হইলে হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

—"বাবা, বাবা!" - ছেলে কি বলিতে গেল, কিন্তু বুড়া কোন উত্তর না করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া-দিয়া মুদ্রাগুলি কুড়াইয়া লইল।

—"এই ত সব?"—সে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল।

টেনের পো ইঙ্গিতে জানাইল যে, আর নাই। বৃদ্ধ দেওয়াল হইতে বন্দুক ও টোটার বাক্স নামাইয়া লইল এবং মুদ্রাকয়টা পকেটে পুরিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ, আমি তাদের এগুলো ফিরিয়ে দিই গে যাই।"

আর একটি কথাও না বলিয়া, একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া সে নামিয়া বাহির হইল, এবং পল্টনের দলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া গেল!

তাহাকে আর দেখা যায় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিম ধর্ম্মভাব ও যোগের অঙ্কুর।

১

আদিম বা অনুন্নত মনুষ্যসমাজে প্রেতপূজা খুব প্রচলিত। দলপতির আত্মার পূজা, দুষ্ট শত্রুর আত্মার তৃপ্তিবিধান, পূজার ইতিহাসে প্রথম কথা। প্রেতাত্মার বৃক্ষ এবং জীবশরীরে সংক্রমণবিষয়ে সকল অসভ্যজাতির মধ্যেই দৃঢ়বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ব্বর যখন নিভৃত গুহা বা কুটীরে নিদ্রিত থাকিয়া রাত্রে স্বপ্ন দেখিত যে, সে পরিচিত অরণ্যে ও পাহাড়ে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেছে এবং হিংস্রজন্তু তাহাকে তাড়া করিলে জাগিয়া-উঠিয়া দেখিত যে, সে আপনার শয্যায় নিভৃতে শুইয়া আছে, তখন তাহার মনে বিস্ময় উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। ছায়া, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি হইতে যখন আপনার মধ্যে আর-একটা আমির জ্ঞান ভাল করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই লুক্কায়িত আমিটাই যে রাত্রে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়, তাহাতে তাহার সন্দেহ থাকিত না। এই বিশ্বাস জন্মিবার পর যখন

কোন লোকের মূর্চ্ছা, আবার অনেক ক্ষণের পর মূর্চ্ছিতের চেতনাপ্রাপ্তি হইতে দেখিত, তখন অতি সহজেই তাহাদের প্রতীতি হইত যে, লুকান মানুষটা কোথাও ছল করিয়া পালাইয়া গিয়াছিল এবং অনেক সাধ্যসাধনায় ফিরিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুকেও যখন প্রথম মূর্চ্ছা বলিয়া ভাবিয়াছিল, তখন নানা চেষ্টায় তাহাকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,—আহার্য্যসামগ্রী পর্য্যন্ত উপহার দিয়াছিল। শ্রাদ্ধের পিণ্ডজলের ইহাতেই উৎপত্তি।*

যখন কেহ কোন শত্রু তাড়াইবার জন্য মৃত দলপতির আত্মার উদ্বোধন করিত এবং পাহাড়ে-বনে প্রেতাত্মার পরিহাস-উত্তর মনে করিয়া প্রতিধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিত, তখন পূজাটা সহজ ছিল। তাহার পর যখন স্বপ্নে মৃতজনের দর্শনলাভ করিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল যে, কোন কোন শুভ-মুহূর্ত্তেই অচেতন অবস্থায় প্রেতাত্মার দর্শন পাওয়া যায়, তখন ধীরে ধীরে কৃত্রিম স্বপ্ন ও মন্ত্রতন্ত্রের অনেক সৃষ্টি হইয়াছিল। Tylor এর Primitive Culture প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া এ তত্ত্ব অনেকেই শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যদি এদেশের অনার্য্যপ্লুত স্থান পরিদর্শন করা যায়, তাহা হইলে ইতিহাসটা সহজেই যথার্থ বলিয়া ধারণা হইতে পারিবে। আমাদের সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা অসভ্যজাতির সহিত এত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছে যে, তাহাদের সমাজেও এগুলি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। একালের ভূতবাদী এবং থিয়সফিষ্টেরাও স্বপ্নতত্ত্বের যে বাড়াবাড়ি করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের মূলেও যে ঐ একই কথা, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

প্রথমে যখন কেহ কৃত্রিম স্বপ্নের জোরে স্বীয় শরীরে মৃত আত্মার আবির্ভাব করাইয়া লইয়াছিল, তখন যে একটা চালাকি করিয়াছিল, তাহা নয়। ভ্রান্তবিশ্বাসের ফলে অসত্য সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। সহজে যে ব্যক্তি কৃত্রিম স্বপ্নের দ্বারা পরাভূত হইতে পারিত, সে বেশ প্রতিপত্তিও লাভ করিত। অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিজীবিগণ তখন চালাকি করিয়া সম্মান লাভ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। মৃত দলপতির আশীর্ব্বাদে বললাভ করা যাইতে পারে, ইহা সাধারণত সকলেই বিশ্বাস করিত; বিশ্বাস করিত বলিয়াই তাঁহাকে ডাকিত। উহা হইতেই অমানুষিক ও অস্বাভাবিক শক্তিলাভের বিশ্বাসও জন্মিয়া যায়। উপবাস করিয়া, একাসনে বসিয়া-বসিয়া হাতে-পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরাইয়া, একদৃষ্টে একদিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মাথা ঘুরাইয়া এবং আরো নানাপ্রকার উপায়ে কৃত্রিম স্বপ্নের সৃষ্টি করিতে হইত। এ কষ্ট সকলে সহ্য করিতে পারিত না; কাজেই সাধকের দল গোড়াগুড়িই অল্প ছিল। অল্পসংখ্যক লোক যদি একবার একটা কিছু হাতে লয় এবং তাহা হইতে যদি সম্মানাদি লাভ করিতে পারে, তবে

* মানবতত্ত্ববিজ্ঞানের (Anthropologyর) অতি পরিচিত মূল সূত্রগুলির উল্লেখ করিতে হইল; বিজ্ঞ পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। যোগের উৎপত্তির ইতিহাসের জন্য কথাগুলির প্রয়োজন আছে বলিয়াই একবার উহাদের আবৃত্তি করিয়া লইতেছি।

তাহা সযত্নে নিজস্ব করিয়া তোলে। শুধু শারীরিক পরিশ্রমে হয় না, আরো কিছু চাই প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইয়া একটা গুরুর দল জন্মগ্রহণ করে। জিনিষটার শিক্ষাদীক্ষার ভার তখন ঐ দলের একচেটিয়া হয়; এবং অনুষ্ঠেয় বিষয়টি যে ভারি উপকারী, তাহা প্রচারিত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের কাছে শক্তিলাভাদির কথা পরীক্ষিত জিনিষ না হইলেও, উহারা সর্ব্বান্তঃকরণে উহাতে বিশ্বাসস্থাপন করে। প্রকারান্তরে সকল অসভ্য সমাজের মধ্যেই এই শ্রেণীর দেবদর্শনবাদে বিশ্বাস আছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা মানবতত্ত্বশাস্ত্রের কয়েকটি স্থূল মীমাংসা। এইপ্রকার দেবদর্শনবাদই যে এদেশের চিরপূজিত মহামান্য যোগের মূলে, তাহা সহজে অনুমিত হইতেও পারে। তথাপি প্রাচীন সমাজের অবস্থার ইতিহাস হইতে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২

ঋগ্বেদে প্রাচীন আর্য্যদের সামাজিক অবস্থা এবং ধর্ম্মভাবের যে মনোজ্ঞ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বত্রই আনন্দের সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। দেবতার চিত্রে ভূতপ্রেতবিভীষিকার ধূম্রবর্ণ নাই; মানবের আশা আকাঙ্ক্ষায় জন্মান্তরবাদের বিষাদকালিমার দাগ নাই। জীবন আনন্দময়, দেবতারাও মঙ্গলময়। প্রথম ঋক্‌সৃষ্টির কতকাল পূর্ব্বে যে প্রেতাত্মপূজার যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রেতাত্মার পূজা যে এক সময়ে ছিল, তাহা পিতৃদিগের পূজা হইতেই সূচিত হয়; এবং ঐ পূজা যে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে দেবতাপূজার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল, তাহাও দেবলোকের ঊর্দ্ধে পিতৃলোকের অবস্থান হইতে বুঝিতে পারা যায়। একমাত্র বেদত্রয় হইতে যদি আর্য্যধর্ম্মের পরবর্ত্তী বিকাশ বুঝিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে কিরূপে যে ভূতপেত্নীর (গণ ও মাতৃকার) পূজা এবং জন্মান্তরবাদ উপস্থিত হইল, তাহার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া উঠে। অতি প্রাচীন বেদে জন্মান্তরবাদের নামগন্ধ নাই, অথচ সহসা যখন প্রাচীন উপনিষদে উহা সত্য বলিয়া গৃহীত দেখিতে পাই, তখন কোন শাস্ত্রেই উহা লইয়া বাদবিবাদ পর্য্যন্ত নাই। নূতন করিয়া যদি কোন পণ্ডিতের মাথায় জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে উহা প্রমাণ করিবার জন্য তর্কবিতর্ক উঠিত। যে কোন দর্শনশাস্ত্র দেখ, ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, সর্ব্বত্রই উহা স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বেদত্রয়ে প্রেতাত্মার অন্য জীবশরীরে সংক্রমণের আভাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, অথচ বৌধায়নের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, পিতৃগণ পক্ষিরূপে গৃহের নিকটে উড়িয়া আসেন বলিয়া উঁহাদের জন্য বলি বিতরণ করা কর্ত্তব্য। মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে গণ বা ভূতপ্রেতের পূজকেরা হেয় বলিয়া গণ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা প্রাচীন দেববর্গ অপেক্ষা অধিক পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

সমাজের মধ্যে যাহার সতেজ জীবন্তবীজ না থাকে, তাহা নির্ব্বিবাদে অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে পারে না। অন্যদিকে আবার প্রাচীন বৈদিকসমাজে

ঐ বীজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় না। এই সমস্যাটি মীমাংসা করিবার জন্য পণ্ডিতেরা নানা কথা বলিয়াছেন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উহার মধ্যে যে মতটি অধিকতর সম্ভাবনীয় মনে হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বৈদিকযুগ হইতেই বহুশ্রেণীর অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়াছিল। অনার্য্যেরা যেমন আর্য্যধর্ম্ম দ্বারা আপনাদের সংস্কারসাধন করিয়াছিল, আর্য্যেরাও সেইরূপ নিতান্ত অলক্ষ্যে অনার্য্যদের অনেক জিনিষ আত্মশরীরস্থ করিয়া লইয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতে যে আর্য্য-অনার্য্য-মিশ্রণ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

৩

অতি প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে ভারতবর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়েরও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের অনেক ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ রিস্ ডেবিড্স্ প্রণীত Buddhist India গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদেশে এবং অবন্তী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রদেশে আর্য্যেরা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অঙ্গ, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি নাম উক্তপ্রদেশবাসী জাতিসমূহের নাম ছিল; এবং জাতির নাম হইতেই দেশের নামকরণ হইয়াছিল। ঐ প্রাচীন সময়ের রাজবংশের নামের তালিকায় শাক্য-বংশব্যতিরিক্ত বৃজি, বৃজিজাতিভুক্ত লিচ্ছবি, ভগগ, কালাম প্রভৃতি অনার্য্য নাম পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন বৈদিকসাহিত্যে উঁহাদের কাহারও নাম পাওয়া যায় না, এবং পরবর্ত্তী ধর্ম্মসূত্রে অঙ্গ, মগধ, অবন্তী প্রভৃতি দেশ অতি অপবিত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। বৌধায়নের অনুশাসনে ঐ সকল দেশে গমন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অথচ সূত্রকর্ত্তার পূর্ব্ব হইতেই ঐ দেশসমূহে আর্য্য ভাষা, আর্য্য ধর্ম্ম এবং আর্য্য রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত।

কথা এই যে, প্রাচীন আর্য্যেরা যে কেবল একটি পরিপুষ্ট দল লইয়া গঙ্গা এবং যমুনার প্রবাহপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নহে। যাঁহারা ঐ পথে আসিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের সংখ্যা খুব অধিক ছিল, এবং তাঁহাদের সমাজে বহুকাল পর্য্যন্ত অনার্য্যেরা স্থানলাভ করিতে পারে নাই। ঋক্ হইতে সাম-যজু ইঁহাদেরই হস্তে বিকশিত এবং সুবৃহৎ ব্রাহ্মণনামক সাহিত্য ইঁহাদেরই সৃষ্টি। আর্য্যদের আর একটি দল কচ্ছ-উপসাগরের দিক্ দিয়া অবন্তীপ্রদেশে, এবং অন্য একটি দল হিমাচলের পাদপ্রদেশ দিয়া শাক্যরাজ্যের মধ্যে এবং তথা হইতে মগধ ও অঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটির ১৯০১ সালের পত্রিকায় এবং গত জানুয়ারীমাসের এশিয়াটিক্ কোয়াটার্‌লি রিভিউ কাগজে ডাক্তার গ্রিয়ার্সন্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এ বিষয়ের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের অনুমান যে,

ব্রিজি, শাক্য প্রভৃতি জাতি মঙ্গোলীয় এবং মল্ল, কোলীয় প্রভৃতি জাতি দ্রাবিড়ী। রাজপ্রভাব মগধ, কাশী, কোশল প্রভৃতি স্থানেই বেশি বিকশিত হইয়াছিল। রাজবর্গই ক্ষত্রিয়নাম পাইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয়কুলে মগধরাজগণই চিরকাল শ্রেষ্ঠ। বর্ণবিভাগে ক্ষত্রিয়ের পীতবর্ণ কথাটায়, উল্লিখিত মঙ্গোলীয় উৎপত্তির মত সমর্থিত হইতে পারে। মঙ্গোলীয় হউন বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হউন, উঁহারা যখন অতি প্রাচীন সময় হইতেই আর্য্যধর্ম্ম এবং আর্য্যভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন আর্য্যপ্রভাব এবং আর্য্যমিশ্রণ অস্বীকার করিয়া উঠিতে পারা যায় না। দেশগুলি আর্য্যসভ্যতায় সংস্কৃত, ক্ষমতাশালী এবং সমৃদ্ধিপূর্ণ; তথাপি যখন ধর্ম্মসূত্রকারেরা উঁহাদিগকে অপবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং সহসা আবার অল্প সময়ের মধ্যেই যখন নিষ্কলঙ্ক আর্য্যেরা উঁহাদের সহিত মিশিয়া গেলেন, তখন আর্য্য এবং অনার্য্য মিশ্রণের মতদ্বারাই অবস্থাটির একটা সুবোধ্য ব্যাখ্যা হইতে পারে। আর্য্যগন্ধ না থাকিলে ব্রাহ্মণ্যগৌরবে গৌরবান্বিতেরা ঐ জাতির সহিত মিশিতেন না। পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রবাদটির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, হয় ত বহুদিন পর্য্যন্ত উঁহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিও চলিয়াছিল।

মহামান্য বেদত্রয়ে মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব্ব-অঞ্চলের দেশের নাম নাই। যে অথর্ব্ববেদ আর্য্যের নিকট বহুকাল পর্য্যন্ত অপবিত্র ছিল, এখনও যাহা ব্রাহ্মণদের নিকট সম্পূর্ণ সম্মানিত নহে, উহার সৃষ্টি যে বৈদিকযুগে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। ঐ অথর্ব্ববেদে কিন্তু মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি দেশের কথা আছে। এইজন্য ঐ হতাদর অথর্ব্ববেদ পূর্ব্বপ্রদেশের কথঞ্চিৎ আচারভ্রষ্ট সঙ্কর আর্য্যমন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া অনুমান হয়। এই মীমাংসা গ্রহণ করিলে উল্লিখিত সকল অবস্থার সহিত বেশ মিল হয়।

৪

ঠিক যে সময়ের বৈদিকসাহিত্যে ভূতপ্রেতপূজার নামগন্ধ পাওয়া যায় না, সেই সময়ের অথর্ব্ববেদে উহাদের বিস্তৃত প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যাদুমন্ত্র এবং ভূতপ্রেতের কথাই অথর্ব্ববেদে বিস্তর। পণ্ডিতেরা এই বেদ পাঠ করিয়া স্বীকার করেন যে, যে আনন্দপূর্ণ এবং উন্নত ধর্ম্ম সামসময়িক ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অথর্ব্ববেদের শিক্ষা তাহা হইতে বহুদূরে। বিভিন্নসংস্কারের জাতির হাতে সৃষ্ট না হইলে কদাচ এরূপ হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত মেক্‌ডোনেল্‌ অথর্ব্ববেদের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—Taken as a whole, it is a heterogeneous collection of spells. Its salient teaching is sorcery, for it is mainly directed against hostile agencies, such as diseases, noxious animals, demons, wirzards, foes, oppressors of Brahmans ইত্যাদি।

প্রাচীন ও আদিম বৌদ্ধগ্রন্থগুলি মগধাদি পূর্ব্বপ্রদেশের সাহিত্য। ঐ সাহিত্যে ভূতপ্রেতাদির কথা এবং জন্মান্তরের কথা অতি অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজের নিম্নস্তর হইতে যে সকল ভাব ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে উচ্চ সমাজস্তরে সংক্রামিত হয়, তাহা সাধারণের বিশ্বাসের সামগ্রী বলিয়া কোন পণ্ডিতকে একটা মতস্থাপনের জন্ম দার্শনিক তর্কজাল বিস্তার করিতে হয় না। সম্ভবত এইজন্যই জন্মান্তরবাদ সর্ব্বত্র স্বীকৃত দেখিতে পাই।

প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি যে মগধ, বিদেহ * প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয়দের প্রভাবে আবির্ভূত, তাহা এখন প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত বলিয়া কোন প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইলাম না। ঐ উপনিষদে যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মণের বৃথা জ্ঞানাভিমানের দৃষ্টান্ত দিয়া অনেক কথা লিখিত আছে। ব্রাহ্মণ আসিয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা মূলত আর্য্য না হইলেও, ইঁহারা যে সাহসী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। আর্য্য সংমিশ্রণে যে পূর্ব্বাঞ্চলের ঐ সকল জাতির প্রতিভা অধিক বিকশিত হইয়াছিল, তাহা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধদেবের অসামান্য কীর্ত্তি হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ্‌গুলি পূর্ব্বাঞ্চলে উৎপন্ন, এবং সর্ব্বপ্রথম ঐ সাহিত্যেই জন্মান্তরবাদ পাওয়া যায়। ব্রহ্মতত্ত্বাদি উহাতে সযত্নে আলোচিত; কিন্তু জন্মান্তরবাদ কেবল সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত।

প্রেতপূজার যুগ ধর্ম্মভাববিকাশের প্রথম স্তরে। বেদ হইতে উপনিষদাদি পর্য্যন্ত আলোচিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যসমাজ নিত্য উন্নতিশীল, ধীরে ধীরে উন্নততর স্তরে তাঁহাদের সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতেছিল। কাজেই প্রেতপূজার যুগ একবার অতিবাহিত করিবার পর, উন্নতিশীল আর্য্যসমাজে আবার উহা বিকশিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আজ পর্য্যন্তও যখন সকল অনার্য্যজাতির মধ্যেই মানবাত্মার বৃক্ষ এবং জীবশরীরে প্রবিষ্ট হইবার বিশ্বাস প্রচলিত দেখিতে পাই, তখন সমাজের নিম্নস্তর হইতেই ঐ বিশ্বাস সংক্রামিত হইয়াছিল বলিয়া দৃঢ় অনুমান হয়। পূর্ব্বাঞ্চলেই যখন উহার মূলটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে, তখন এই মীমাংসাটি সুধীগণের বিচারাধীন করা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসটির আলোচনা করিতে গিয়া সুপণ্ডিত গার্ব লিখিয়াছেন—It is natural enough to suspect foreign influence in this sudden revolution of thought.

অনার্য্যের বিশ্বাসের সহিত জন্মান্তরবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও আর্য্যদের এই জন্মান্তরবাদ ও "সংসারচক্র"বাদে একটু বিশেষত্ব আছে। ঠিক সংসারচক্রবাদ বা metempsychosis অনার্য্যের বিশ্বাসের সামগ্রী নহে। দোষগুণের হিসাবে কোন প্রেতাত্মা বা এ জীবশরীরে এবং কোনটা বা অন্য জীবশরীরে প্রবিষ্ট হয়; অনার্য্যের এই বিশ্বাসটি যে কর্ম্মফলে আত্মার জীবজীবান্তরশরীরে পরিভ্রমণ করিবার বিশ্বাসের মূলে, তাহা যেন সুস্পষ্ট। কিন্তু শরীর হইতে শরীরান্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া

* বিদেহে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই বজ্জিপ্তা বৃজিজাতির বিদেহশাখার রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

বেড়ানটা একটা নূতন কথা। কেহই নিরবচ্ছিন্ন দোষে দোষী নহে; দুঃখীও সুখী হইবে, মন্দও ভাল হইবে, এই ভাব হইতেই পরিক্রমণবাদের উৎপত্তি। যাঁহারা মঙ্গলময় দেবতায় বিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদের হাতে অনার্য্যের বিশ্বাসটার ঐপ্রকার সংস্করণ বা পরিবর্দ্ধন হওয়াই স্বাভাবিক।

জ্ঞানকাণ্ডের গ্রন্থে যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত এবং দেশব্যাপী প্রচলিত বিশ্বাস যাহার অনুকূলে, সে জিনিষটা বৈদিক নহে বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডে বা ক্রিয়াকাণ্ডে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইতে দেখা যায়। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যজুর্ব্বেদে বিধিবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণখণ্ডে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। উহারই নাম বেদের কর্ম্মকাণ্ড। পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পূর্ণরূপে ঐ কর্ম্মকাণ্ড হইতে উৎপন্ন। মৃত্যুর পর মানবাত্মা পিতৃলোকে গমন করেন; পুত্রহীন বলিয়া যাঁহারা পিতৃলোকে গমন করিতে পারেন না, তাঁহারাও অদৃশ্যলোকে মহাকষ্টে সময়ক্ষেপ করেন; পাপিগণ যমলোকে যাইয়া বহুকষ্ট প্রাপ্ত হয়; ইত্যাদি কথার সহিত জন্মান্তরবাদের বিরোধ হয়। এইজন্যই পৌরাণিক (মূলত বৈদিক) শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও অনুষ্ঠান কোনপ্রকারে জন্মান্তরবাদের সহিত মিলাইতে পারা যায় না। যদি মনুষ্যের আত্মা জীবশরীর হইতে জীবশরীরে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অলঙ্ঘ্য কর্ম্মফলে ব্রহ্মে লীন হইবে বা আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়া-ফেলিয়া মুক্ত হইবে, তাহা হইলে পিতৃলোক এবং পিতৃতর্পণ অর্থশূন্য হয়। মৃত্যুর পর যদি কোন আত্মা অন্য জীবদেহে চলিয়া গিয়াছে, এবং সেখানে মায়াময় দেহ ধারণ করিয়া আহারপানাদি করিতেছে, তাহা হইলে পিতৃলোককে তৃপ্ত করিবার জন্য ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন থাকে না। পিতৃগণ পিণ্ড এবং উদকের আশায় বসিয়া আছেন বলিয়াই উহা প্রদত্ত হয়। রাজা দিলীপ বলিতেছেন যে, তিনি মরিয়া গেলে পূর্ব্বপুরুষেরা আর পিণ্ড পাইবেন না বলিয়া, তাঁহারা দুঃখে ভাল করিয়া পিণ্ড খাইতেছেন না এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তর্পণের জলটুকু "কবোষ্ণ"রূপে পান করিতেছেন। জন্মান্তরবাদ যে বৈদিক নহে, কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও তাহার একটি প্রমাণ।

অন্যদিকে আবার দেখুন, যে ভূতের কৃপায়, অথবা ভূত নামাইয়া, অথবা ভূতের মত অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া কোন অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা বেদত্রয়ে এবং বেদত্রয়ের সাহিত্যে কুত্রাপি নাই। যাদুমন্ত্র এবং মন্ত্রবল অথর্ব্ববেদের বিশেষত্ব। মন্ত্রবলে কাহাকেও ভস্ম করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, একটা অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি বিদ্যা অথর্ব্ববেদ হইতে উৎপন্ন। অথর্ব্ববেদের উপাধ্যায়েরাই উহাতে পারদর্শী ছিলেন; এবং উঁহারাই গণপূজক এবং গ্রামযাজক পুরোহিত হইয়াছিলেন বলিয়া, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে উঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ। Hopkins প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এতদূর পর্য্যন্তও বলিতে চাহেন যে, অথর্ব্ববেদের 'উপাধ্যায়'কথার অপভ্রংশই ওঝা। অথর্ব্ববেদ যে পূর্ব্বাঞ্চলে পরিবর্দ্ধিত বলিয়া অনুমান করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা বলিয়াছি। আর্য্যদের ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত উহার ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হয় না বলিয়া,

ঐ হতাদর বেদের অনেক কথা যে সমাজান্তর হইতে সমাগত, এইরূপ মীমাংসাই উপযুক্ত বোধ হয়। এখনও যখন এ দেশের সমগ্র অনার্য্যজাতির মধ্যে এবং নিম্নস্তরের হিন্দুদের মধ্যে স্কন্ধে ভূত চাপাইয়া অলৌকিক জ্ঞানলাভের অনুষ্ঠান রহিয়াছে, তখন ঐ শ্রেণীর বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ যে নিম্নস্তর হইতে উন্নতিশীল আর্য্যসমাজে সংক্রমিত, তাহাতে সন্দেহ করিব কেন?

জন্মান্তরবাদ, ভূত নামাইবার শক্তি এবং যাদুমন্ত্রাদির বলের উপর যে যোগতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহা যোগপ্রক্রিয়ার বিশেষ বর্ণনা হইতে লক্ষিত হইতে পারিবে। সময়ান্তরে সে কথা লইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

উৎসবের দিন।

সকালবেলার অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখীদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখীরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান্, গতিবান্, চেতনাবান্ পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সঙ্গীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্ত্তিমান্ উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্য্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্বশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে;—সেদিন ত আমরা জড়ের মত, উদ্ভিদের মত, সাধারণ জন্তুর মত—সেদিন ত আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্ব্বজয়ী

মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্ম্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সঙ্গীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জ্বলিয়াছে, সঙ্গীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি—আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কি আশ্চর্য্যশক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্দ্ধে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্ম্মী কর্ম্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে! জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া-দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়! প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উদ্যম, মানুষের উদ্যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং দুর্ব্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজনসাধনের সীমায় মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট

হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে একি জোয়ার আসিয়াছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া, সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্য, কোন্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে! যাহাকে জানিবার জন্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কি প্রয়োজন! যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়? যাহার কর্ম্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব-লেখা থাকিতেছে কই? আশ্চর্য্য! ইহাই আশ্চর্য্য! আনন্দ! ইহাই আনন্দ! যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম, সর্ব্বোচ্চতম শক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দ-সঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী। এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে! মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সঙ্কীর্ণতা, কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়—যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন!—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়

পান না। এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ্ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের উর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া একি কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্ব্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।—

অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়। সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম্, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে, এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক-মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি—স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও, মধু-মক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনোশ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসামপ্রাচুর্য্যবশতই আপনাকে নির্ব্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জ্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।

এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ॥
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥
তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো ।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে —ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার—এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্ম্মবিস্তার-কার্য্যে, মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র, তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজ-শক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্য—ইহা সহসা চক্রবর্ত্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্ত্তে হীনপ্রভ করিয়া-দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, বিস্মৃত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গল-শক্তির মহান্ আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌর-বের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি-সঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা

স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি—ফাল্গুনের পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি—মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি—কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট্ বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত, সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসঙ্ঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান্ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্মমঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মত দীনহীন জগতে আর কে থাকিত! সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন, বস্ত্র, আবাস, ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্ত্তে ধন্য হইয়াছে! তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া-দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব! অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ

করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা একএকদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এককালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্য্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সঙ্কুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্ম্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া, নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড় হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে, এই গৃহসজ্জায়, এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর! আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত কর, প্রতিদিনের নির্বীর্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে,—আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার কর! যে কঠোরতায়, যে উদ্যমে, যে আত্মবিসর্জ্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর! আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব, যে প্রেমের গৌরব, যে মঙ্গলের গৌরব, যে কঠিনবীর্য্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মত আজ না শুনিতে পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল! এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন—যেখানে তোমার সর্ব্বত্যাগী সেবক কর্ত্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন—

যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য! কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য্য, সেইখানেই তুমি! দূর কর—দূর কর এই সমস্ত আবরণ-আচ্ছাদন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও! সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জ্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু!

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক্ আজি কঠিন আদেশে!
কর মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়! পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার! ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে!

ত্রিবঙ্কুর।

৪

প্রাতঃকাল, সাতটা; রাজাদিগের সহিত দস্তুরমত দেখাসাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার ইহাই নির্দ্দিষ্ট সময়। যে সময়ে, চিরনিদাঘ ত্রিবঙ্কুরের দীপ্যমান প্রখর সূর্য্যরশ্মি দিগন্ত হইতে সুদীর্ঘ সরলরেখায় প্রসারিত হইয়া, পত্রাবরণ ভেদ করিয়া তালকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নারিকেল ও সুপারি তরুর শিখরদেশ স্বর্ণাভ গোলাপি-রঙে রঞ্জিত করিল,—সেই সময়ে, আমি মহারাজের অতিথিস্বরূপে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গাড়িতে উঠিলাম। প্রথমে, তালজাতীয় তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া আমাদের গাড়ি চলিতে লাগিল; একটু পরেই, একটা প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে পৌঁছিবার প্রথম রাত্রেই, যে তোরণটি পার হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—ইহা সেই তোরণ। ইহার ভিতর দিয়া একটা চতুষ্কোণ প্রাচীরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইহা যেন একটি নগরের মধ্যে নগর। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করিতে পায় না।

এইবার আমার গাড়ি তোরণের মধ্য দিয়া একেবারে সিধা চলিয়া গেল। সেইখানে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক তোরণ রক্ষা করিতেছিল। প্রবেশ করিবামাত্র

পুণ্যস্থানের বিবিধ নিদর্শন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই সরোবরজলে আ-কটি-মজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে; প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজার মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; উহাদের লম্বিত কেশগুচ্ছ বাহিয়া জলবিন্দু ঝরিতেছে; উহাদের আর্দ্র গাত্র সূর্য্যকিরণে, অভিনব পিত্তলসামগ্রীর ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন উহারা কতকগুলি জলদেবতা। উহারা স্বকীয় ধ্যানে এমনি নিমগ্ন,—আমাদের গাড়ি উহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সৈনিকগণ আমাদের সম্মানার্থ তূরীনাদ করিতেছে, জয়ঢাক পিটাইতেছে, তথাপি সেদিকে উহাদের দৃক্‌পাত নাই।

ইতরসাধারণের অপ্রবেশ্য এই ঘেরটির মধ্যে রাজপরিবারবর্গের নিবাসগৃহ, পাঠশালাসমূহ, আর সেই সর্ব্বপ্রধান মন্দিরটি অধিষ্ঠিত—যাহা আর চারিটি বিরাট্ অট্টালিকার উপর—সেই দেবমন্দিরের গগনভেদি-চূড়াচতুষ্টয়ের উপর আধিপত্য করিতেছে। এই প্রাসাদের সম্মুখভাগের আকৃতি ও প্রাসাদপ্রাচীরের বহির্ভাগটি যেন একটু বিষাদময়। প্রাসাদদ্বারের উপর দুইটি যুগল কাল্পনিক মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; এই মূর্ত্তিদুটি ভারতীয়-ধরণের। আরো কিছু দূরে, পূর্ব্বদিকের শেষপ্রান্তে, কতকগুলি 'ড্রাগন'মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত—উহা স্পষ্ট চীনদেশীয় বলিয়া মনে হয়।

সমস্তই অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; এবং বহুবর্ষাবধি ধূলিরাশি সঞ্চিত হইয়া উহাদিগকে 'পোড়া-পোড়া' ও আরক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। কেন না, পথগুলির ন্যায়, এদেশে ধূলিও লাল।

মহারাজের প্রাসাদদ্বারের সম্মুখে, অশ্বারোহী রক্ষিগণ আবার আমার সম্মানার্থ স্কন্ধ হইতে অস্ত্রাদি নামাইয়া লইল। সৈনিকগুলিকে দেখিতে খুব জাঁকালো, বেশ কায়দা-দোরস্ত, লাল-পাগ্‌ড়ি-পরা; এবং উহারা আধুনিক নিয়মানুসারে, 'পুনঃপুন-আওয়াজকারী' নবপ্রচলিত বন্দুকের যথাযথ প্রয়োগ ও চালনা করিতে পারে।

মহারাজা স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার সম্মুখে য়ুরোপীয়-বৃহৎ-কোর্ত্তাধারী কোন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু না—মহারাজা সুরুচির পরিচয় দিয়া খাঁটি ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন।—শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, মখ্‌মলের পরিচ্ছদ—বোতামগুলি স্বচ্ছ হীরকের।

যে দরবারশালায় প্রথমে আমার অভ্যর্থনা হইল, উহার কুট্টিমতল চীন-বাসনের দ্রব্যে মণ্ডিত; চাঁদোয়া হইতে কতকগুলি বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে; মধ্যস্থলে খোদাই-কাজ-করা একটা রৌপ্যসিংহাসন; উহার চারিধারে কালো-রঙের আস্‌বাব্;—পুরু আব্‌নুস্-কাঠে খোদাই-কাজ-করা ভারতীয়-ধাঁচার কালো আরাম-কেদারা; এ কেবল আশিয়াখণ্ডের লোকেরাই জানে, কি করিয়া এরূপ মূল্যবান্ কঠিন কাষ্ঠে খোদাই-কাজ করা যাইতে পারে।

ফরাসী-সরকারের একটি সম্মানভূষণ মহারাজকে প্রদান করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল;—এই সহজ কাজটি

সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত য়ুরোপের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। এই য়ুরোপদর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেন না, বর্ণাশ্রমপ্রথার দুর্লঙ্ঘ্য শাসনে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাঁহার কোথাও যাইবার জো নাই। প্রধানত সাহিত্যের বিষয় লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল; কেন না, মহারাজা মার্জ্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত। পরে, তিনি হস্তিদন্তের বিচিত্র আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য-সামগ্রী দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে একটি উচ্চ শিল্পাগারে লইয়া গেলেন। এই শিল্প-সামগ্রীগুলি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইবার বিদায়কাল উপস্থিত হইল; আমি মহারাজের নিকট বিদায় লইলাম।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জের হরিৎ আঁধারের মধ্য দিয়া আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। এই অমায়িক রাজার সহিত, আর-একটু গভীরভাবে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিয়া গেল। কেন না, আমাদের মনের গঠন ও তাঁহার মনের গঠন ভিন্ন হইবারই কথা।

যে কয়েকদিন আমি এখানে থাকিব, তাহার মধ্যে অবশ্যই আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎ-কারেই আমি বুঝিয়াছি, এখানকার বৃহৎ মন্দিরটির ন্যায়, তাঁহার মনের অন্তরতম প্রদেশটিও আমার নিকট দুর্ভেদ্যরহস্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে, কি জাতি, কি কুল, কি ধর্ম্ম,—সকল বিষয়েই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া, আমাদের ভাষা এক নহে। বাধ্য হইয়া একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে রাখিতে হয়;—ইহাই ত একটা বিষম বাধা; দোভাষীর দ্বারা যতই কেন সাহায্য হউক না, তবু যেন আমাদের মধ্যে একটা পর্দার ব্যবধান থাকিয়া যায়; এইজন্য আমাদের কথাবার্ত্তা বেশিদূর অগ্রসর হইতে পায় না,—একস্থানে সহসা থামিয়া যায়।

দুইতিনদিনের মধ্যে, আমি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। মহারাণী পৃথক্ প্রাসাদে থাকেন। ইনি মহারাজের পত্নী নহেন,—ইনি তাঁহার মাতুলানী। ত্রিবঙ্কুরের প্রধান গোষ্ঠীবর্গ যে জাতির অন্তর্গত, সে জাতিটি বহু প্রাচীন; উহা এক্ষণে ভারত-বর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে, কেবল পত্নীর দিক্ দিয়াই লোকের নাম, উপাধি ও সম্পত্তি উত্তরবংশে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া, পত্নীর স্বেচ্ছামত স্বামি-পরিত্যাগের অধিকার আছে।

রাজপরিবারের মধ্যে, অভিজাতা প্রধানা মহিলার জ্যেষ্ঠকন্যা—'মহারাণী' এবং জ্যেষ্ঠ-পুত্র—'মহারাজা' হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাণী কিংবা তাঁহার ভগিনীগণ—ইঁহাদের সেরূপ কোন বংশসূত্র না থাকায়, বর্ত্তমান রাজবংশ শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার কথা।

এই রাজত্বে, মহারাজার সন্তানদিগের কোন উত্তরাধিকারস্বত্ব নাই; শুধু অধি-কার নাই, তাহা নহে—"রাজকুমার" কিংবা "রাজকুমারী" এই উপাধিলাভেও তাহারা বঞ্চিত।

এই 'নায়ের'জাতীয় মহিলাদিগের মুখশ্রী অতীব সুন্দর। অস্মদ্দেশীয় কুমারী-

দিগের ন্যায় উহারা কেশের কিয়দংশ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখে, এবং অবশিষ্ট অংশ এক-প্রকার গোলাকৃতি "চাপাটির" আকারে রচনা করিয়া তাহাই মস্তকের চূড়াদেশে ধারণ করে; তাহার কতকটা সম্মুখভাগে ও কতকটা পার্শ্বদেশে কপালের দিকে ঝুলিয়া পড়ে;—দেখিলে মনে হয়,—কোঁচ্‌কানো-কিনারা একপ্রকার টুপি যেন বেশ একটু ঢং করিয়া মাথায় পরিয়াছে। কিন্তু উহাদের কেশরচনায় যেরূপ বিলাস-লীলা প্রকাশ পায়, উহাদের দেহের সমস্ত সাজসজ্জায় তেমনি আবার তাপসসুলভ একটা কঠোর গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, নবপ্রসূত বালকের মনে জ্ঞান যখন সবে-মাত্র নূতন উন্মেষিত হয়, তখনকার সেই আদিমজ্ঞান কেবলমাত্র ঐশী শক্তিরই ব্যাপার, তা বই তাহাতে জ্ঞাতার নিজের কর্তৃত্ব বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। জ্ঞান কি? না, "এটা এই" এইরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া; কিন্তু যাহাকে বলা হইতেছে "এটা", তাহার ন্যায় আর দশ-পাঁচটা যদি পূর্ব্বে কোনোসময়ে জ্ঞাতার জ্ঞানগোচর হইয়া না থাকে, তাহা হইলে "এটা" যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞানে প্রতিভাত হইতে পারে না, কাজেই "এটা এই" এরূপ নিশ্চয়ক্রিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। নব-প্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে যখন প্রথম আলোক উদ্ভাসিত হইল, তখন পূর্ব্বে কোনোসময়ে সেরূপ কোনো আলোক তাহার জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয় নাই; তাহা যখন হয় নাই, তখন সেই নূতন আলোকের উদ্ভাসনকালে অভিনব জ্ঞাতা কেমন করিয়া বলিবে যে, "এটা আলোক" বা "এটা এই"। জ্ঞানের রূপই হ'চ্চে "এটা এই"; তা বই শুদ্ধকেবল "এটা" জ্ঞানশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কাগচের যেমন দুই পিট—এ-পিট এবং ও-পিট, জ্ঞানেরও তেমনি দুই পিট—এটা এবং এই, অর্থাৎ বিশেষ্য এবং বিশেষণ। একপিঠিয়া কাগচও যেমন—একপিঠিয়া জ্ঞানও তেমনি, দুইই বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ একান্ত-পক্ষেই অসম্ভব। কাজেই বলিতে হয় যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানের "এটা"র ভিতরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো-প্রকার "এটা এই" লুকানো রহিয়াছে। সে "এটা এই" যে ব্যাপারটা কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আবশ্যক;—তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আদিম জ্ঞানা-লোক ফুটিয়া বাহির হইল। বিশেষ একটা ব্যাপার ফুটিয়া বাহির হইল। যখন বলি-তেছি "বিশেষ একটা ব্যাপার", তখন

তাহাতেই প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, আদিম জ্ঞানালোক কোনো-না-কোনো-প্রকারের বিশেষণদ্বারা বিশেষিত। কিন্তু একটা বিষয় আর-একটা বিষয় হইতেই বিশেষিত হইতে পারে; তা বই, একাকী একটা বিষয় বিশেষিত হইতে পারে না। আদিম জ্ঞানালোক তো এক, তাহার প্রতিযোগী আর-এক কে? আদিমজ্ঞান তো এ-পিট, তাহার প্রতিযোগী ও-পিট কে? ও-পিট হ'চ্চে অজ্ঞান-অন্ধকার। আদিম জ্ঞানালোক অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে বিশেষিত। আদিম জ্ঞান অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত—অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থিত। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত ছিল—এক্ষণে তাহাই ব্যক্ত হইল। এ নহে যে, পূর্ব্বে তাহা নাস্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অস্তি হইল। শাল এবং তাল দুইই যেমন বৃক্ষ, ব্যক্ত-বস্তু এবং অব্যক্ত-বস্তু দুইই তেমনি বস্তু। তালগাছ দেখিয়া যখন আমরা বলি যে, "এটা বৃক্ষ", তখন সে কথার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বদৃষ্ট শালগাছও যেমন বৃক্ষ, দৃশ্যমান তালগাছটিও তেমনি বৃক্ষ। তবেই হইতেছে যে, দৃশ্যমান তালগাছকে বৃক্ষ বলিলে পূর্ব্বদৃষ্ট শালগাছকেও প্রকারান্তরে বৃক্ষ বলা হয়। তেমনি ব্যক্ত-বস্তুকে বস্তু বলিলে, পূর্ব্বে যখন তাহা অব্যক্ত ছিল, সেই অব্যক্ত-বস্তুকেও প্রকারান্তরে বস্তু বলা হয়। শালগাছও বৃক্ষ, তালগাছও বৃক্ষ। শাল এবং তাল দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষপ্রত্যয়, আর, সেই উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি শাল এবং তাল দুয়েরই বিশেষণ। তেমনি "ব্যক্ত এই" এবং "অব্যক্ত এই" এ-দুয়ের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়, আর সেই বস্তুপ্রত্যয়ই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত দুয়েরই বিশেষণ। তালগাছের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই যেমন শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে, তেমনি আদিম প্রকাশের প্রতি সজ্ঞানভাবে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিবামাত্রই ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি জ্ঞানসমীপে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। শাল-তালের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বৃক্ষপ্রত্যয়; ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ ঐক্যভূমি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়। আদিম জ্ঞানালোক পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইল; সুতরাং ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে একটা ঐক্যভূমি রহিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সন্দেহ নাই কখন্? না, অব্যক্ত যখন ব্যক্ত হইল, তখন্। আদিমজ্ঞানে "ব্যক্ত ইতি" এই বিশেষ্যের সহিত ব্যক্তাব্যক্তের উভয়সাধারণ বস্তুপ্রত্যয় আপনা হইতেই আসিয়া জোটে। আর সেই বস্তুপ্রত্যয়ই আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ। বস্তুপ্রত্যয়ের রূপ কি, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই :—

প্রকাশ নূতন, কিন্তু বস্তু নূতন নহে—বস্তু পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান;—এইটি হ'চ্চে বস্তুপ্রত্যয়ের রূপ। আদিমজ্ঞানে যখন "এটা" বলিয়া প্রথম বিশেষ্য বা প্রথম লক্ষ্য-বস্তু উপস্থিত হয়, তখন "এটা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান" এই বিশেষণটিও সেই সঙ্গে উপস্থিত হয়, তবে কিনা—অতীব অপরিস্ফুট নিগূঢ়ভাবে।

বিগত প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে বলা

হইয়াছিল যে, নবপ্রসূত শিশুর আদিমজ্ঞানে জ্ঞাতার নিজের কোনো কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না; কর্তৃত্ব থাকিবে কেমন করিয়া? জ্ঞাতা নিজে এবং সেই সঙ্গে তাহার জ্ঞান যখন অব্যক্ত ছিল, তখন জ্ঞানকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত করিয়া তোলা কেমন করিয়া তাহার নিজের ইচ্ছায় বা নিজের শক্তিতে বা নিজের কর্তৃত্বে সম্ভবসাধ্য হইবে? তা ছাড়া, আর-একটি কথা আছে, তাহা এই:—

বৃক্ষের বিশেষণ এক নহে—বৃক্ষের বিশেষণ অনেক; বৃক্ষ স্থাবর, সজীব, বৃক্ষ উদ্ভিদ্, বৃক্ষ নশ্বর—এইরূপ নানা বিশেষণ। নানা বিশেষণের যোগে এক বৃক্ষকে আমরা নানাভাবে দেখিতে পারি। বৃক্ষকে চাই আমরা স্থাবর বলিয়া অবধারণ করি, চাই সজীব বলিয়া অবধারণ করি, চাই উদ্ভিদ্ বলিয়া অবধারণ করি—সে আমাদের ইচ্ছা; সুতরাং তাহার উপরে আমাদের কর্তৃত্ব চলে। পক্ষান্তরে, আদিম জ্ঞানালোকের বিশেষণ একটিমাত্র—কি? না, অস্তিপ্রত্যয় বা বস্তুপ্রত্যয়। কাজেই আদিমজ্ঞানের লক্ষ্য বস্তুতে অভিনব জ্ঞাতা সেই অবিকল্পিত একই-ধাঁচা'র বিশেষণটি আরোপ করিতে অগত্যা বাধ্য। সুতরাং শেষোক্তস্থলে জ্ঞাতা এরূপ বলিতে পারে না যে, "উপস্থিত বিষয়টাকে—চাই আমি বস্তু বলিয়া অবধারণ করি—চাই আমি আর-কিছু বলিয়া অবধারণ করি—সে আমার ইচ্ছা"। লক্ষ্য বিষয়টাকে বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেই হইবে। কেন না—লক্ষ্য বিষয়কে তুমি যে, বস্তু বলিয়া অবধারণ করিতেছ, করিতেছ তাহা ঐশী শক্তির বলে—তোমার নিজের ইচ্ছার বলে নহে।

আদিমজ্ঞান যখন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হইতে প্রকাশে পদনিক্ষেপ করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে বিকাশের মঞ্চে আরূঢ় হয়, তখন তাহার ভিতর হইতে নিজের কর্তৃত্ববোধ ফুটিয়া বাহির হয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জ্ঞাতার সেই যে নিজের কর্তৃত্ব, তাহা ঐশী শক্তিরই প্রতিধ্বনি। বৃক্ষের পুষ্প যদি বলে যে, "আমি বৃক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; আমার মধু আমারই মধু—তাহা বৃক্ষের নির্যাস নহে; আমার পাপ্ড়ি আমারই পাপ্ড়ি—তাহা বৃক্ষের পল্লব নহে; আমার গর্ভজাত ফল আমারই ফল—তাহা বৃক্ষের ফল নহে"; তবে পুষ্পটাকে বৃক্ষ হইতে উন্মূলিত করিয়া দুইদিন পরে তাহাকে যদি বলি যে, "তোমার পাপ্ড়ি কোথায়—তোমার মধু কোথায়—তোমা হইতে ফলোৎপত্তিরই বা সম্ভাবনা কি?" তবে পুষ্প বলিবে যে, "মড়া'র উপর খাঁড়ার ঘা দিও না"। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, পুষ্পের যে মধু তাহা বৃক্ষের নির্যাসেরই মূর্ত্তিভেদ, পুষ্পের যে পাপ্ড়ি তাহা বৃক্ষের পল্লবেরই মূর্ত্তিভেদ; পুষ্পের যে গর্ভপুষ্ট বীজ তাহা বৃক্ষবীজেরই মূর্ত্তিভেদ। তেমনি, মনুষ্যের জ্ঞানবিকাশের মধ্যে তাহার নিজের কর্তৃত্বশক্তি যাহা-কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঐশী শক্তিরই মূর্ত্তিভেদ। বৃহৎ-ব্রহ্মাণ্ডে যেমন করিয়া মনুষ্য ভূতরাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য এবং জীবরাজ্য মাড়াইয়া সর্ব্ব-সমভিব্যাহারে মানবরাজ্যে উপনীত হইয়াছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি মনুষ্যের আত্মা প্রাণরাজ্য এবং মনোরাজ্য মাড়াইয়া প্রাণমন-সমভিব্যাহারে জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইয়াছে। দুই ঘটনাই

একই ঐশী শক্তির প্রভাবে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে—তাহার উপরে কোনো জীবেরই কোনো কর্ত্তৃত্ব চলে না। মনুষ্যের জ্ঞানের প্রকাশ এবং বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্ব-শক্তির প্রকাশ এবং বিকাশ হয়, ইহা সকলেরই দেখা কথা; কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি যাহা সর্ব্বজগতে কার্য্য করিতেছে, সেই ঐশী শক্তিই মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বশক্তির সারসর্ব্বস্ব। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, একদিকে আকাশ, প্রকাশ এবং বিকাশ, ও আর-একদিকে কারণ, করণ এবং উপকরণ, এই দুই ত্রিকের অন্ধিসন্ধি বিধিমতে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। অতঃপর তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

৫৫

কমলা যখন গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিল, শীতের সূর্য্য তখন রশ্মিচ্ছটাহীন ম্লান পশ্চিমাকাশের প্রান্তে নামিয়াছেন। কমলা আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অস্তগামী সূর্য্যকে কি মনে করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া নদীর মধ্যে কিছুদূর নামিল এবং জোড়করপুটে গঙ্গায় জলগণ্ডূষ অঞ্জলি দান করিয়া ফুল ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুরুজনদের উদ্দেশ করিয়া সেইখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিতেই আর একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা সে মনে করিল। কোনোদিন মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে সে চাহে নাই—এম্নি তাহার দুর্ভাগ্য, যখন একদিন রাত্রে সে তাঁহার পাশে বসিয়াছিল, তখন তাঁহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে নাই—বাসরঘরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে দুই-চারিটা কথা কহিয়াছিলেন, তাহাও সে যেন ঘোম্‌টার মধ্য দিয়া, লজ্জার মধ্য দিয়া তেমন সুস্পষ্ট করিয়া শুনিতে পায় নাই। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার জন্য আজ এই জলের ধারে দাঁড়াইয়া সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনোমতেই মনে আসিল না।

অনেক রাত্রে তাহার বিবাহের লগ্ন ছিল; নিতান্ত শ্রান্তশরীরে সে যে কখন্ কোথায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও মনে নাই—সকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের প্রতিবেশীর বাড়ীর একটি বধূ তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতেছে—বিছানায় আর কেহই নাই। জীবনের এই শেষমুহূর্ত্তে জীবনেশ্বরকে একটিবার স্মরণ করিবার সম্বল তাহার কিছুমাত্র নাই। তাঁহাকে ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া যে কেবল এই ক'টি কথা বলিবে, "নাথ, এবারকার এ-জন্মের মত তবে আমি

আসি", তাহাও হইল না;—সেদিকে একেবারে অন্ধকার—কোনো মূর্ত্তি নাই, কোনো বাক্য নাই, কোনো চিহ্ন নাই! যে লাল চেলীটির সঙ্গে তাঁহার চাদরের গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছিল—তারিণীচরণের প্রদত্ত সেই নিতান্ত অল্পদামের চেলীর মূল্য ত কমলা জানিত না—সে চেলীখানিও সে যত্ন করিয়া রাখে নাই!

জগতের মধ্যে তাহার সেই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচিত আত্মীয়তমের উদ্দেশে কমলা দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিল, "তুমি কোথায় আছ, আমি কিছুই জানি না, তোমার কাছে আমার শরীরমন—আমার জন্মজন্মান্তর উৎসর্গ করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর!"—কমলা চোখ যখন খুলিল, সূর্য্যমণ্ডলের শেষ অগ্নিরেখা তখন দিগন্তের অন্তরালে ডুবিয়া গেছে। কমলা মনে মনে কহিল, "এই ত শেষ আলোক নির্ব্বাণ হইল, আমার স্বামীর মূর্ত্তি ইহজীবনে দেখিতে পাইলাম না!" রমেশ হেমনলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানি কমলার আঁচলের প্রান্তে বাঁধা ছিল—সেই চিঠি খুলিয়া বালুতটে বসিয়া তাহার একটি অংশ গোধূলির আলোকে পড়িতে লাগিল। সেই অংশে তাহার স্বামীর পরিচয় ছিল,—বেশি কথা নয়, কেবল তাঁহার নাম নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, আর তিনি যে রংপুরে ডাক্তারি করিতেন ও এখন সেখানে তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় না—এইটুকুমাত্র। চিঠির বাকি অংশ সে অনেক সন্ধান করিয়াও পায় নাই। "নলিনাক্ষ" এই নামটি তাহার মনের মধ্যে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল,—এই নামটি তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন ভরিয়া তুলিল, এই নামটি যেন এক বস্তুহীন দেহ লইয়া তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—তাহার চোখ দিয়া অবিশ্রাম ধারা বাহিয়া জল পড়িয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দিল—মনে হইল, তাহার অসহ্য দুঃখদাহ যেন জুড়াইয়া গেল। কমলার অন্তঃকরণ বলিতে লাগিল, "এ ত শূন্যতা নয়, এ ত অন্ধকার নয়—আমি দেখিতেছি, সে যে আছে, সে আমারই আছে!" তখন কমলা প্রাণপণবলে বলিয়া উঠিল, "আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না। আমি যখন আছি, তখন তিনি কখনই যান নাই, তাঁহারই সেবা করিবার জন্য ভগবান্ আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।"

এই বলিয়া সে তাহার রুমালে বাঁধা চাবির গোছা সেইখানেই ফেলিল এবং হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রমেশের দেওয়া একটা ব্রোচ্ তাহার কাপড়ে বেঁধানো আছে। সেটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পরে পশ্চিমে মুখ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল—কোথায় যাইবে, কি করিবে, তাহা তাহার মনে স্পষ্ট ছিল না—কেবল সে জানিয়াছিল, তাহাকে চলিতেই হইবে, এখানে তাহার একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শীতের দিনান্তের আলোকটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে বিলম্ব হইল না। অন্ধকারের মধ্যে শাদা বালুতট অস্পষ্টভাবে ধূধূ করিতে লাগিল, হঠাৎ এক জায়গায় কে যেন বিচিত্র রচনাবলীর মাঝখান হইতে সৃষ্টির খানিকটা চিত্রলেখা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকাররাত্রি তাহার সমস্ত নির্নিমেষ তারা লইয়া এই জনশূন্য নদীতীরের উপর অতি ধীরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কমলা সম্মুখে গৃহহীন অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে জানিল, তাহাকে চলিতেই হইবে—কোথাও পৌঁছিবে কি না, তাহা ভাবিবার সামর্থ্যও তাহার নাই।

বরাবর নদীর ধার দিয়া সে চলিবে, এই সে স্থির করিয়াছে—তাহা হইলে কাহাকেও পথ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না এবং যদি বিপদ্ তাহাকে আক্রমণ করে, তবে মুহূর্ত্তের মধ্যেই মা গঙ্গা তাহাকে আশ্রয় দিবেন।

আকাশে কুহেলিকার লেশমাত্র ছিল না। অনাবিল অন্ধকার নিদ্রাহীন জননীর সতর্কতার মত কমলাকে আবৃত করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টিকে বাধা দিল না।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যবের ক্ষেতের প্রান্ত হইতে শৃগাল ডাকিয়া গেল। কমলা বহুদূর চলিতে চলিতে বালুর চর শেষ হইয়া মাটির ডাঙা আরম্ভ হইল। নদীর ধারেই একটা গ্রাম দেখা গেল। কমলা কম্পিত-বক্ষে গ্রামের কাছে আসিয়া দেখিল, গ্রামটি সুষুপ্ত। ভয়ে ভয়ে গ্রামটি পার হইয়া চলিতে চলিতে তাহার শরীরে আর শক্তি রহিল না। অবশেষে একজায়গায় এমন একটা ভাঙা-তটের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, যেখানে সম্মুখে আর কোনো পথ পাইল না। নিতান্ত অশক্ত হইয়া একটা বটগাছের তলায় শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্রই কখন্ নিদ্রা আসিল, জানিতেও পারিল না।

প্রত্যূষেই চোখ মেলিয়া দেখিল, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোকে অন্ধকার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"তুমি কে গা? শীতের রাত্রে এই গাছের তলায় কে শুইয়া?"

কমলা চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। দেখিল, তাহার অদূরে ঘাটে দুখানা বজ্‌রা বাঁধা রহিয়াছে—এই প্রৌঢ়াটি লোক উঠিবার পূর্ব্বেই স্নান সারিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়া কহিলেন—"হাঁ গা, তোমাকে যে বাঙালির মত দেখিতেছি।"

কমলা কহিল—"আমি বাঙালি।"

প্রৌঢ়া। এখানে পড়িয়া আছ যে?

কমলা। আমি কাশীতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছি। রাত অনেক হইল, ঘুম আসিল, এইখানেই শুইয়া পড়িলাম।

প্রৌঢ়া। ওমা সে কি কথা! হাঁটিয়া কাশী যাইতেছ? আচ্ছা চল, ঐ বজ্‌রায় চল, আমি স্নান সারিয়া আসিতেছি।

স্নানের পর এই স্ত্রীলোকটির সহিত কমলার পরিচয় হইল।

গাজিপুরে যে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ীতে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ হইতেছিল, তাঁহারা ইঁহাদের আত্মীয়। এই প্রৌঢ়াটির নাম নবীনকালী এবং ইঁহার স্বামীর নাম মুকুন্দলাল দত্ত—কিছুকাল কাশীতেই বাস করিতেছেন। ইঁহারা আত্মীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, অথচ পাছে তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতে বা খাইতে হয়, এইজন্য বোটে করিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহ-বাড়ীর কর্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করাতে নবীনকালী বলিয়াছিলেন, "জানই ত ভাই, কর্তার

শরীর ভাল নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়ীতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখনমারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়,—আবার সে গোরুকে যা'-তা' খাওয়াইলে চলিবে না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নবীনকালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

কমলা কহিল, "আমার নাম অমলা।"

নবীনকালী। তোমার হাতে লোহা দেখিতেছি, স্বামী আছে বুঝি।

কমলা কহিল, "বিবাহের পরদিন হইতেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গেছেন।"

নবীনকালী। ওমা, সে কি কথা! তোমার বয়স ত বড় বেশি বোধ হয় না।

তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "পনেরোর বেশি হইবে না।"

কমলা কহিল, "বয়স ঠিক জানি না, বোধ করি, পনেরোই হইবে।"

নবীনকালী। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে ?

কমলা কহিল—"হাঁ।"

নবীনকালী কহিলেন, "তোমাদের বাড়ী কোথায় ?"

কমলা। কখনো শ্বশুরবাড়ী যাই নাই, আমার বাপের বাড়ী বিশুখালি।

কমলার পিত্রালয় বিশুখালিতেই ছিল, তাহা সে জানিত।

নবীনকালী। তোমার বাপ-মা—

কমলা। আমার বাপ-মা কেহই নাই!

নবীনকালী। হরি বল! তবে তুমি কি করিবে ?

কমলা। কাশীতে যদি কোনো ভদ্র গৃহস্থ আমাকে বাড়ীতে রাখিয়া দু'বেলা দুটি খাইতে দেন, তবে আমি কাজ করিব। আমি রাঁধিতে পারি।

নবীনকালী বিনা-বেতনে পাচিকা ব্রাহ্মণী লাভ করিয়া মনে মনে ভারি খুসি হইলেন। কহিলেন, "আমাদের ত দরকার নাই – বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই—কর্ত্তার খাবারের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে আর কি রক্ষা আছে! বামুনকে মাইনে দিতে হয় চোদ্দটাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা হোক্, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ,—তা চল, আমাদের ওখানেই চল। কত লোক খাচ্চে-দাচ্চে, কত ফেলা-ছড়া যায়, আর, একজন বাড়িলে কেহ জানিতেও পারিবে না। আমাদের কাজও তেমন বেশি নয়। এখানে কেবল কর্ত্তা আর আমি আছি। মেয়েগুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা তাহারা বেশ বড়ঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জে আছে, লাট-সাহেবের ওখান হইতে দুমাস-অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্ত্তাকে বলি, আমাদের নোটোর ত অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো! এত-বড় হাকিমি সকলের ভাগ্যে জোটে না, তা' জানি, কিন্তু বাছাকে তবু ত সেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হয়! কেন! দরকার কি! কর্ত্তা বলেন, 'ওগো সেজন্য নয়, সেজন্য নয়! তুমি মেয়েমানুষ, বোঝ না! আমি কি রোজগারের জন্য নোটোকে চাকরিতে দিয়াছি! আমার অভাব কিসের!

সবে কি না, হাতে একটা কাজ থাকা চাই, নহিলে অল্প বয়স, কি জানি কখন্ কি মতি হয়!”

পালে বাতাসের জোর ছিল, কাশী পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিল না। সহরের ঠিক বাহিরেই অল্প-একটু বাগানওয়ালা একটি দোতলা বাড়ীতে সকলে গিয়া উঠিলেন।

সেখানে চোদ্দটাকা-বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না—একটা উড়ে-বামুন ছিল, অনতিকাল পরেই নবীনকালী তাহার উপরে একদিন হঠাৎ অত্যন্ত আগুন হইয়া উঠিয়া বিনা বেতনে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে চোদ্দটাকা-বেতনের অতি দুর্লভ দ্বিতীয় একটি পাচক জুটিবার অবকাশে কমলাকেই সমস্ত রাঁধাবাড়ার ভার লইতে হইল।

নবীনকালী কমলাকে বারবার সতর্ক করিয়া কহিলেন, “দেখ বাছা, কাশী সহর ভাল জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ীর বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান-বিশ্বেশ্বরদর্শনে আমি যখন যাইব, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।”

কমলা পাছে দৈবাৎ হাতছাড়া হইয়া যায়, নবীনকালী এজন্য তাহাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিলেন। বাঙালী মেয়েদের সঙ্গেও তাহাকে বড়-একটা আলাপের অবসর দিতেন না। দিনের বেলা ত কাজের অভাব ছিল না, সন্ধ্যার পরে একবার কিছুক্ষণ নবীনকালী তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য, যে গহনাপত্র, যে সোনারূপার বাসন, যে মখ্‌মল্-কিংখাবের গৃহসজ্জা চোরের ভয়ে কাশীতে আনিতে পারেন নাই, তাহারই আলোচনা করিতেন। “কাঁসার থালায় খাওয়া ত কর্ত্তার কোনোকালে অভ্যাস নাই, তাই প্রথম-প্রথম এ লইয়া তিনি অনেক বকাবকি করিতেন। তিনি বলিতেন, ‘না হয় দুচারখানা চুরি যায়, সেও ভাল, আবার গড়াইতে কতক্ষণ!’ কিন্তু টাকা আছে বলিয়াই যে লোকসান করিতে হইবে, সে আমি কোনোমতে সহ্য করিতে পারি না। তার চেয়ে বরঞ্চ কিছুকাল কষ্ট করিয়া থাকাও ভাল! এই দেখ না, দেশে আমাদের মস্ত বাড়ী, সেখানে লোকলস্কর যতই থাক্ আসে-যায় না, তাই বলিয়া এখানে কি সাতগণ্ডা চাকর আনা চলে? কর্ত্তা বলেন, ‘কাছাকাছি না হয় আরো একটা বাড়ী ভাড়া করা যাইবে।’ আমি বলিলাম, ‘না, সে আমি পারিব না—কোথায় এখানে একটু আরাম করিব, না, কতকগুলো লোকজন-বাড়ীঘর লইয়া দিনরাত্রি ভাবনার অন্ত থাকিবে না!’” ইত্যাদি।

৫৬

নবীনকালীর আশ্রয়ে কমলার প্রাণটা যেন অল্পজল এঁধো-পুকুরের মাছের মত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এখান হইতে বাহির হইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সেদিনকার রাত্রে গৃহহীন বাহিরের পৃথিবীকে সে জানিয়াছে; সেখানে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আর তাহার সাহস হয় না। কিন্তু তাহার জীবনটা কি শেষকালে এই খাঁচাটার মধ্যে আসিয়াই চিরদিনের মত আট্‌কা পড়িয়া গেল? এইজন্য কি তাহার বাঁচিবার কোনো প্রয়োজন ছিল? প্রতিদিন রাত্রে যে প্রার্থনা করিয়া সে বিছানায় শোয়, প্রতিদিন প্রাতে যে

আশা করিয়া সে জাগিয়া উঠে, এখানে এমন করিয়া বদ্ধ হইয়া থাকিলে কি তাহা সিদ্ধ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে? কমলার এখন অল্পবয়স, এখনো কতদিন তাহাকে বাঁচিতে হইবে কে জানে,—কিন্তু তাহার অবশিষ্ট জীবনের প্রত্যেক দিনই যদি এম্নি করিয়া সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিতে থাকে, তবে আর কেন? কিন্তু মরিতেও কিছুতে প্রবৃত্তি হয় না—এতদিন সে যে এত দুঃখে বাঁচিয়া আসিয়াছে, তাহার সার্থক পরিণাম হইতে যদি সে বঞ্চিত হয়!

নবীনকালী যে কমলাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে রস ছিল না। দুই একদিন অসুখ-বিসুখের সময় তিনি কমলাকে যত্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে যত্ন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা বড় কঠিন। বরঞ্চ সে কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিত ভাল, কিন্তু যে সময়টা নবীনকালীর সখীত্বে তাহাকে যাপন করিতে হইত, সেইটেই তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসময়।

কর্ত্তা মুকুন্দলালবাবু প্রত্যহ সকালে শিথিল একখানি তেলধুতি পরিয়া রৌদ্রে রাস্তার ধারে এক মোড়া লইয়া বসিতেন এবং প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক ধরিয়া একজন হিন্দুস্থানী চাকর তেল মাখাইতে মাখাইতে তাঁহার স্থূল-কৃষ্ণ দেহকে নানাপ্রকারে সুশব্দে দলন, মর্দ্দন, তাড়ন করিত;—সম্মুখে আর একটা মোড়ার উপর তাঁহার গড়গড়া থাকিত, তাহারই নলটা মুখে লাগাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ধূম আকর্ষণ করিতেন—এই বিরাট্ দৃশ্যটি একদিন রাস্তার লোকে দেখিতে পাইল না। সেদিন সকালবেলা নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, ও বামুনঠাকরুণ, আজ কর্ত্তার শরীর বড় ভাল নাই, আজ ভাত হইবে না, আজ রুটি। কিন্তু তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়ো না! জানি ত তোমার রান্নার শ্রী, উহাতে এত ঘি কেমন করিয়া খরচ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারি না। এর চেয়ে সেই যে উড়ে-বামুনটা ছিল ভাল—সে ঘি লইত বটে, কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।"

কমলা এ সমস্ত কথার কোনো জবাবই করিত না—যেন শুনিতে পায় নাই, এম্নিভাবে নিঃশব্দে সে কাজ করিয়া যাইত।

আজ অপমানের গোপনভারে আক্রান্তহৃদয় হইয়া কমলা চুপ করিয়া তরকারি কুটিতেছিল—সমস্ত পৃথিবী বিরস এবং জীবনটা দুঃসহ বোধ হইতেছিল, এমন-সময় গৃহিণীর ঘর হইতে একটা কথা তাহার কানে আসিয়া কমলাকে একেবারে চকিত করিয়া তুলিল। নবীনকালী তাঁহার চাকরকে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, "ওরে তুল্সি, যা ত, সহর হইতে নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া আন্। বল্, কর্ত্তার শরীর বড় খারাপ।"

নলিনাক্ষ-ডাক্তার! কমলার চোখের উপরে সমস্ত আকাশের আলো আহতবীণার স্বর্ণতন্ত্রীর মত কাঁপিতে লাগিল। সে তরকারি-কোটা ফেলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তুলসী নীচে নামিয়া আসিতেই কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছিস্ তুল্সি?" সে কহিল, "নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি।"

কমলা কহিল—"সে আবার কোন্ ডাক্তার?"

তুলসী কহিল—"তিনি এখানকার একটি বড় ডাক্তার বটে।"

কমলা। তিনি থাকেন কোথায়?

তুলসী কহিল—"সহরেই থাকেন, এখান হইতে আধক্রোশটাক হইবে।"

আহারের সামগ্রী অল্পস্বল্প যাহা-কিছু বাঁচাইতে পারিত, কমলা তাহাই বাড়ীর চাকরবাকরদের ভাগ করিয়া দিত। এজন্ত সে ভর্ৎসনা অনেক সহিয়াছে, কিন্তু এ অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই। বিশেষত গৃহিণীর কড়া আইন অনুসারে এ বাড়ীর লোকজনদের খাবার কষ্ট অত্যন্ত বেশি। তা ছাড়া কর্ত্তা-গৃহিণীর খাইতে বেলা হইত—ভৃত্যেরা তাহার পরে খাইতে পাইত। তাহারা যখন আসিয়া কমলাকে জানাইত, "বামুন-ঠাকরুণ, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে," তখন সে তাহাদিগকে কিছু-কিছু খাইতে না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারিত না। এম্‌নি করিয়া বাড়ীর চাকরবাকর দুইদিনেই কমলার একান্ত বশ মানিয়াছে।

উপর হইতে রব আসিল, "রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে তুলসি! আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস্! সহরে যাইবার পথে একবার বুঝি রান্নাঘর না মাড়াইয়া গেলে চলে না। এম্‌নি করিয়াই জিনিষপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে! বলি বামুনঠাকরুণ, রাস্তায় পড়িয়া ছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এম্‌নি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি!"

সকলেই তাহার জিনিষপত্র চুরি করিতেছে, এই সন্দেহ নবীনকালীকে কিছুতেই ত্যাগ করে না। যখন প্রমাণের লেশমাত্রও না থাকে, তখনো তিনি আন্দাজে ভর্ৎসনা করিয়া লন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অন্ধকারে ঢেলা মারিলেও অধিকাংশ ঢেলা ঠিক জায়গায় গিয়া পড়ে, আর তিনি যে সর্ব্বদা সতর্ক আছেন ও তাঁহাকে ফাঁকি দিবার জো নাই, ভৃত্যেরা ইহা বুঝিতে পারে।

আজ নবীনকালীর তীব্রবাক্য কমলার মনেও বাজিল না। সে আজ কেবল কলের মত কাজ করিতেছে, তাহার মনটা যে কোন্‌খানে উধাও হইয়া গেছে, তাহার ঠিকানা নাই।

নীচে রান্নাঘরের দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এমন-সময় তুলসী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল। কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"তুলসি, কই ডাক্তারবাবু আসিলেন না?"

তুলসী কহিল—"না, তিনি আসিলেন না।"

কমলা। কেন?

তুলসী। তাঁহার মার অসুখ করিয়াছে।

কমলা। মার অসুখ? ঘরে আর কি কেহ নাই?

তুলসী। না, তিনি ত বিবাহ করেন নাই।

কমলা। বিবাহ করেন নাই, তুই কেমন করিয়া জানিলি?

তুলসী। চাকরদের মুখে ত শুনি, তাঁহার স্ত্রী নাই।

কমলা। হয় ত তাঁহার স্ত্রী মারা গেছে।

তুলসী। তা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চাকর ব্রজ বলে, তিনি যখন রংপুরে

ডাক্তারি করিতেন, তখনো তাঁহার স্ত্রী ছিল না।

উপর হইতে ডাক পড়িল—"তুল্‌সি!"—কমলা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং তুলসী উপরে চলিয়া গেল।

নলিনাক্ষ- রংপুরে ডাক্তারি করিতেন—কমলার মনে আর ত কোনো সন্দেহ নাই। তুলসী নামিয়া আসিলে পুনর্ব্বার কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ্ তুল্‌সি, ডাক্তারবাবুর নামে আমার একটি আত্মীয় আছেন—বল্ দেখি, উনি ব্রাহ্মণ ত বটেন?

তুলসী। হাঁ, ব্রাহ্মণ, চাটুয্যে।

গৃহিণীর দৃষ্টিপাতের ভয়ে তুলসী বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে সাহস করিল না—সে চলিয়া গেল।

কমলা নবীনকালীর নিকট গিয়া কহিল—"কাজকর্ম্ম সমস্ত সারিয়া আজ আমি একবার দশাশ্বমেধঘাটে স্নান করিয়া আসিব।"

নবীনকালী। তোমার সকল অনাসৃষ্টি। কর্ত্তার আজ অসুখ,—আজ কখন্ কি দরকার হয়, তাহা বলা যায় না—আজ তুমি গেলে চলিবে কেন?

কমলা কহিল—"আমার একটি আপনার লোক কাশীতে আছেন খবর পাইয়াছি, তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইব।"

নবীনকালী। এ সব ভাল কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল? তুলসী বুঝি? ও ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়। শোন বলি বামুনঠাকরুণ, আমার কাছে যতদিন আছ, ঘাটে একলা স্নান করিতে যাওয়া, আত্মীয়ের সন্ধানে সহরে বাহির হওয়া, ও সমস্ত চলিবে না, তাহা বলিয়া রাখিতেছি।

দরোয়ানের উপর হুকুম হইয়া গেল, তুলসীকে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন এ-বাড়ী-মুখো হইতে না পারে।

গৃহিণীর শাসনে অন্যান্য চাকরেরা কমলার সংস্রব যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিল।

নলিনাক্ষসম্বন্ধে যতদিন কমলা নিশ্চিত ছিল না, ততদিন তাহার ধৈর্য্য ছিল; এখন তাহার পক্ষে ধৈর্য্যরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই নগরেই তাহার স্বামী রহিয়াছেন, অথচ সে একমুহূর্ত্তও যে অন্যের ঘরে আশ্রয় লইয়া থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। কাজকর্ম্মে তাহার পদে পদে ত্রুটি হইতে লাগিল।

নবীনকালী কহিলেন—"বলি বামুন-ঠাকরুণ, তোমার গতিক ত ভাল দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে? তুমি নিজে ত খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়াছ, আমাদিগকেও কি উপোস করাইয়া মারিবে? আজকাল তোমার রান্না যে আর মুখে দেবার জো নাই!"

কমলা কহিল—"আমি এখানে আর কাজ করিতে পারিতেছি না—আমার কোনোমতে মন টিকিতেছে না। আমাকে বিদায় দিন্!"

নবীনকালী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বটেই ত! কলিকালে কাহারো ভাল করিতে নাই! তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন

ভাগ বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, একবার খবরও লইলাম না—তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না! আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন্! যদি পালাইবার চেষ্টা কর ত পুলিসে খবর দিব না! আমার ছেলে হাকিম—তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে—আমার কাছে তোমার চালাকি খাটিবে না। শুনেইছ ত—গদা কর্ত্তার মুখের উপরে জবাব দিতে গিয়াছিল, সে বেটা এম্‌নি জব্দ হইয়াছে, আজো সে জেল্ খাটিতেছে! আমাদের তুমি যেমন-তেমন পাও নাই!”

কথাটা মিথ্যা নহে—গদাচাকরকে ঘড়িচুরির অপবাদ দিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে বটে!

কমলা কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহার চিরজীবনের সার্থকতা যখন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায়, তখন সেই হাতে বাঁধনপড়ার মত এমন নিষ্ঠুর আর কি হইতে পারে! ব্যাকুল পাখী তাহার পিঞ্জরের শলাকাকে যেমন করিয়া আঘাত করিতে থাকে, কমলার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার শরীরকে যেন তেম্‌নি করিয়া আঘাত করিতে লাগিল। কমলা আপনার কাজের মধ্যে, ঘরের মধ্যে কিছুতেই আর ত বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার রাত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলে পর সে শীতে একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বাগানে বাহির হইয়া পড়িত। প্রাচীরের ধারে দাঁড়াইয়া যে পথ সহরের দিকে চলিয়া গেছে, সেই পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার যে তরুণ হৃদয়খানি সেবার জন্য ব্যাকুল, ভক্তিনিবেদনের জন্য ব্যগ্র, আত্মোৎসর্গের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—সেই হৃদয়কে, কমলা এই রজনীর নির্জ্জন পথ বাহিয়া নগরের মধ্যে কোন্ এক অপরিচিত গৃহের উদ্দেশে প্রেরণ করিত—তাহার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার শয়নকক্ষের মধ্যে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু এইটুকু সুখ, এইটুকু স্বাধীনতাও কমলার বেশিদিন রহিল না। রাত্রির সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গেলেও একদিন কি কারণে নবীনকালী কমলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেহারা আসিয়া খবর দিল, “বামুনঠাকরুণকে দেখিতে পাইলাম না!”

নবীনকালী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, “সে কিরে, তবে পালাইল নাকি?”

নবীনকালী নিজে সেই রাত্রে আলো ধরিয়া ঘরে ঘরে খোঁজ করিয়া আসিলেন, কোথাও কমলাকে দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দবাবু অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে গুড়্‌গুড়ি টানিতেছিলেন—তাঁহাকে গিয়া কহিলেন—“ওগো শুন্‌চ, বামুনঠাকরুণ বোধ করি পালাইল।”

ইহাতেও মুকুন্দবাবুর শান্তিভঙ্গ করিল না—তিনি কেবল আলস্যজড়িতকণ্ঠে কহিলেন—“তখনি ত বারণ করিয়াছিলাম—জানাশোনা লোক নয়। কিছু সরাইয়াছে নাকি?”

গৃহিণী কহিলেন—“সেদিন তাহাকে যে শীতের কাপড়খানা পরিতে দিয়াছিলাম, সেটা ত ঘরে নাই, এ ছাড়া আর কি গিয়াছে, এখনো দেখি নাই!”

কর্ত্তা অবিচলিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"পুলিসে খবর দেওয়া যাক্!"

একজন চাকর লণ্ঠন লইয়া পথে বাহির হইল। ইতিমধ্যে কমলা তাহার ঘরে ফিরিয়া-আসিয়া দেখিল, নবীনকালী সে ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। কোনো জিনিষ চুরি গেছে কি না, তাহাই তিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন-সময় কমলাকে হঠাৎ দেখিয়া নবীনকালী বলিয়া উঠিলেন—"বলি, কি কাণ্ডটাই করিলে? কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?"

কমলা কহিল, "কাজ শেষ করিয়া আমি একটুখানি বাগানে বেড়াইতেছিলাম।"

নবীনকালীর মুখে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া গেলেন। বাড়ীর সমস্ত চাকরবাকর দরজার কাছে আসিয়া জড় হইল।

কমলা কোনোদিন নবীনকালীর কোনো ভর্ৎসনায় তাঁহার সম্মুখে অশ্রুবর্ষণ করে নাই। আজও সে কাঠের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নবীনকালীর বাক্যবর্ষণ একটুখানি ক্ষান্ত হইবামাত্র কমলা কহিল,"আমার প্রতি আপনারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন—আমাকে বিদায় করিয়া দিন্।"

নবীনকালী। বিদায় ত করিবই। তোমার মত অকৃতজ্ঞকে চিরদিন্ ভাতকাপড় দিয়া পুষিব, এমন কথা মনেও করিয়ো না! কিন্তু কেমন লোকের হাতে পড়িয়াছ, সেটা আগে ভাল করিয়া জানাইয়া তবে বিদায় দিব।

ইহার পর হইতে কমলা বাহিরে যাইতে আর সাহস করিত না। সে ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে মনে এই কথা বলিল—"যে লোক এত দুঃখ সহ্য করিতেছে, ভগবান্ নিশ্চয় তাহার একটা গতি করিয়া দিবেন।"

৫৭

মুকুন্দবাবু তাঁহার দুইটি চাকর সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। বাড়ীতে প্রবেশের দরজায় ভিতর হইতে হুড়কা বন্ধ। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

দ্বারের কাছে রব উঠিল—"মুকুন্দবাবু ঘরে আছেন কি?"

নবীনকালী চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঐ গো, নলিনাক্ষ-ডাক্তার আসিয়াছেন! বুধিয়া! বুধিয়া!"

বুধিয়ানামধারিণীর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন নবীনকালী কহিলেন—"বামুনঠাকরুণ, যাও ত, শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও গে। ডাক্তারবাবুকে বল, কর্ত্তা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, এখনি আসিবেন,—একটু অপেক্ষা করিতে হইবে।"

কমলা লণ্ঠন লইয়া নীচে নামিয়া গেল;—তাহার পা কাঁপিতেছে, তাহার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্ করিতেছে, তাহার করতল ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। তাহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে এই বিষম ব্যাকুলতায় সে চোখে ভাল করিয়া দেখিতে না পায়।

কমলা ভিতর হইতে হুড়কা খুলিয়া-দিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইল।

নলিনাক্ষ জিজ্ঞাসা করিল—"কর্ত্তা ঘরে আছেন কি?"

কমলা কোনোমতে কহিল—"না, আপনি আসুন।"

নলিনাক্ষ বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে বুধিয়া আসিয়া কহিল—"কর্ত্তাবাবু বেড়াইতে গেছেন, এখনি আসিবেন, আপনি একটু বসুন্।"

কমলার নিশ্বাস প্রবল হইয়া তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। যেখান হইতে নলিনাক্ষকে স্পষ্ট দেখা যাইবে, অন্ধকার-বারান্দার এমন একটা জায়গা সে আশ্রয় করিল,—কিন্তু দাঁড়াইতে পারিল না। বিক্ষুব্ধ বক্ষকে শান্ত করিবার জন্য তাহাকে সেইখানে বসিয়া পড়িতে হইল। তাহার হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্যের সঙ্গে শীতের হাওয়া যোগ দিয়া তাহাকে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল।

নলিনাক্ষ কেরোসিন্-আলোর পাশে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতেছিল। অন্ধকারের ভিতর হইতে বেপথুমতী কমলা নলিনাক্ষের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার দুই চক্ষে বারবার জল আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া-ফেলিয়া সে তাহার একাগ্রদৃষ্টির দ্বারা নলিনাক্ষকে যেন আপনার অন্তঃকরণের গভীরতম অভ্যন্তরদেশে আকর্ষণ করিয়া লইল। ঐ যে উন্নতললাট স্তব্ধ মুখখানির উপরে দীপালোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ মুখ যতই কমলার অন্তরের মধ্যে মুদ্রিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত শরীর যেন ক্রমে অবশ হইয়া চারিদিকের আকাশের সহিত মিলাইয়া যাইতে লাগিল;—বিশ্বজগতের মধ্যে আর কিছুই রহিল না, কেবল ঐ আলোকিত মুখখানি রহিল—যাহার সম্মুখে রহিল, সেও ঐ মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গেল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কমলা সচেতন কি অচেতন ছিল, তাহা বলা যায় না—এমন-সময় হঠাৎ সে চকিত হইয়া দেখিল, নলিনাক্ষ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মুকুন্দবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে।

এখনি পাছে উঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া আসেন এবং কমলা ধরা পড়ে, এই ভয়ে কমলা বারান্দা ছাড়িয়া নীচে তাহার রান্না-ঘরে গিয়া বসিল। রান্নাঘরটি প্রাঙ্গণের এক ধারে—এবং এই প্রাঙ্গণটি বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথ।

কমলা সর্ব্বাঙ্গমনে পুলকিত হইয়া বসিয়া-বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার মত হতভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মত এমন সৌম্য-নির্ম্মল প্রসন্ন-সুন্দর মূর্ত্তি! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে!"

—বলিয়া বারবার করিয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার পদশব্দ শোনা গেল। কমলা তাড়াতাড়ি অন্ধকারে দ্বারের পাশে দাঁড়াইল। বুধিয়া আলো ধরিয়া আগে-আগে চলিল, তাহার অনুসরণ করিয়া নলিনাক্ষ বাহির হইয়া গেল।

কমলা মনে মনে কহিল—"তোমার শ্রীচরণের সেবিকা হইয়া এইখানে পরের দ্বারে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া আছি, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে, তবু জানিতেও পারিলে না।"

মুকুন্দবাবু অন্তঃপুরে আহার করিতে গেলে কমলা আস্তে আস্তে সেই বসিবার ঘরে গেল। যে চৌকিতে নলিনাক্ষ বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে ভূমিতে ললাট ঠেকাইয়া সেখানকার ধূলি চুম্বন করিল। সেবা

করিবার কোনো অবকাশ না পাইয়া অবরুদ্ধ ভক্তিতে কমলার হৃদয় কাতর হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন কমলা সংবাদ পাইল, বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ডাক্তারবাবু কর্ত্তাকে সুদূর পশ্চিমে কাশীর চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন। তাই আজ হইতে যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

কমলা নবীনকালীকে গিয়া কহিল, "আমি ত কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

নবীনকালী। আমরা পারিব, আর তুমি পারিবে না! বড় ভক্তি দেখিতেছি!

কমলা। আপনি যাহাই বলুন, আমি এখানেই থাকিব।

নবীনকালী। আচ্ছা, তা কেমন থাক, দেখা যাইবে!

কমলা কহিল—"আমাকে দয়া করুন্, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না!"

নবীনকালী। তুমি ত বড় ভয়ানক লোক দেখিতেছি! ঠিক যাবার সময় বাহানা ধরিলে! আমরা এখন তাড়াতাড়ি লোক কোথায় খুঁজিয়া পাই! আমাদের কাজ চলিবে কি করিয়া!

কমলার অনুনয়-বিনয় সমস্ত ব্যর্থ হইল—কমলা তাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমশ।

পথে।

১

তখন তরুণী উষা—বাহিরিনু পথে;
ফোট' ফোট' করে আলো,
সরিছে আঁধার কালো,
পাখী ডেকে উঠে, নিশি যাপি' কোনমতে।
বাহিরিনু পথে!

২

আকাশে উথলি উঠে নব রবিচ্ছটা;
মেঘে মেঘে দীপ্ত হাসি—
জলন্ত অনলরাশি!
দিবস খুলিয়া দেছে স্বর্ণময় জটা—
কি উজ্জ্বল ঘটা!

৩

বাড়িছে দিনের দাহ; আগে ভাগে পথ;
কোথা তরুছায়াতলে,
কোথা মরু-অগ্নি জ্বলে;
নাহি শেষ—নাহি সীমা, চলি অবিরত—
অফুরন্ত পথ!

৪

আমি ত একক নহি—আরো কতজন,
কেহ কাছে—কেহ আগে,
চলিয়াছে অনুরাগে!
নাহি জানে কোথা যাবে, কোথা নিকেতন-
নাহি নিরূপণ!

৫

বলিতে পার কি "পথ কোথা হ'বে শেষ ?"
টুটে আসে পায়ে বল,
তবু বলে "চল্-চল্" ;
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ—নাহি সহে ক্লেশ !
কোথা পথ-শেষ !

৬

কেহ পিছে প'ড়ে থাকে—কেবা তারে চায় ?
আগে-ভাগে পথ বাহি,
কে দাঁড়ায় পিছে চাহি ?
শুধু পথ চলিয়াছি—না জানি কোথায় ?
বেলা বেড়ে যায় !

৭

এই পরিচয় পথে, দেখা নাহি আর !
শুকায় কণ্ঠের মালা,
থাকে কণ্টকের জ্বালা,
থাকে স্মৃতি—আর থাকে অনন্ত অপার
পথ দুর্নিবার !

৮

শিথিল খসিয়া পড়ে বাহুর বন্ধন !
কাছে-কাছে ছিল যেই,
দেখি আর কাছে নেই !
নিঃসঙ্গ চলিতে হ'বে পথে একাকী—
মুদিয়া নয়ন !

৯

ক্রমে বেলা প'ড়ে আসে, পথ না ফুরায় !
শুধু পথ চলিয়াছি,
শুধু আগে চেয়ে আছি ;
ছায়া করি' আসে সন্ধ্যা, রবি ডুবে যায় ;
চ'লেছি কোথায় !

১০

সম্মুখে প্রান্তর দীর্ঘ—আসন্ন রজনী !
চির অনুত্তীর্ণ পথ,
প'ড়ে অজগরবৎ !
"আর কতদূর ?"—হেথা সুধাই আপনি,
মনে ভয় গণি !

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে হৃদয় বিস্ময় ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাঁহার রচিত বাঙ্‌লা গদ্য অসম্পূর্ণ ও অপ্রস্ফুট। উহার অন্বয় দুরূহ, বিভক্তিবিধান, সর্ব্বনামপ্রয়োগ ও ক্রিয়া-সংস্থান কতকটা উদ্ভট। বিশেষত বিরাম-চিহ্নবিরহিত হওয়াতে রচনা নিতান্ত জটিল ও বিরক্তিকর এবং অর্থবোধ একান্ত দুরধিগম্য হইয়াছে। তথাপি সেই রচনার মত উন্নত ও সুন্দর সামগ্রী বঙ্গভাষায় আর কিছু বিরচিত হয় নাই। প্রত্যেকটি ছত্রে যে তীক্ষ্ণ ধী, যে অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিবল দৃষ্ট হইবে, তাহা অনন্যসাধারণশক্তি-সম্পন্ন। তিনি বেদান্তসূত্রের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এ ভাষার গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে নাই, ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুইতিন বাক্যের অন্বয় করিয়া হঠাৎ অর্থবোধ করিতে পারেন না।" সুতরাং এই গদ্যরচনার বোধসৌকর্য্যার্থে রামমোহন রায়কে একটা "অনুষ্ঠানপ্রকরণ" লিখিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে লিখিত হইয়াছে—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুয়ের বিবেচনা বিশেষমত করিতে উচিত হয়। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ চেষ্টা করিবেন না।" এইরূপে বহু নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বাঙ্‌লাগদ্যে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। স্বয়ং কাঠ কাটিয়া ও লাউ শুকাইয়া যে বীণা গঠন করিয়াছেন, তাহার বাহ্যরূপ কতকটা উদ্ভট হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে ব্রহ্মকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতে দেবর্ষির বীণানিঃসৃত স্বরলহরীর আনন্দ ও পবিত্রতা পাওয়া যায়। উপায়ের তুচ্ছতা দূর করিয়া,—উপায়কে নবভাবে সৃষ্ট ও বলসম্পন্ন করিয়া তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অবস্থা তাঁহার অন্তরায় হয় নাই—শক্তিশালী মহাজনগণের পক্ষে কোনকালেই তাহা হয় না।

যে কয়েকখানি ক্ষুদ্রপুস্তকে তিনি বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষার কিরীটরত্ন। ঋষিগণের কথা লইয়া তিনি নিজে ঋষির ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—তাহা এই যুগে, বিশেষত বঙ্গদেশ হইতে আমরা প্রত্যাশা করি নাই।

অংকৃত এক এক ছত্র ব্যাখ্যা করিতে এক-একখানি পুস্তকরচনার প্রয়োজন; এত সংক্ষিপ্ত, অথচ পরিপূর্ণ-অর্থব্যঞ্জক, এরূপ উন্নত অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক কিছু এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা মনে করিবেন, রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিদেশীশিক্ষার প্রভাবান্বিত, তাঁহাদিগকে আমরা তাঁহার বাঙ্‌লা গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঋষিবাক্যের প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল, তিনি ধীর ও প্রশান্ত ভাবে ঋষিবাক্যের সমর্থ করিয়াছেন, বৈদেশিক নানা ভাষায় প্রাজ্ঞ হইয়াও তিনি সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং আজীবন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি শ্লেষ, বিদ্রূপ, বিদ্বেষ ও মৎসরতার বান নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও শান্ত-সমাহিত সহিষ্ণুতা কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই। শিশুর চীৎকার ও আস্ফালনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিতা যেরূপ তাহাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া অতি সন্তর্পণে সৎপথে আনিতে যত্ন করেন,—বিদ্বেষিগণের প্রতি তিনিও সেইরূপ ঐকান্তিকী করুণার সহিত অগ্রসর হইয়াছেন। কোলাহলের উত্তর দিতে যাইয়া নিজে কোলাহল করেন নাই, তাই তাঁহার প্রত্যুত্তরগুলিতে উন্নততর নৈতিকরাজ্যের ক্ষমা অক্ষরিত হইয়া রহিয়াছে।

যিনি নিজের সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কেনই বা নিজে উদ্‌ভ্রান্ত হইবেন? তাহা হইলে অসামান্য মনস্বিতা সত্ত্বেও পরের ভ্রমপ্রদর্শন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। যে যুগে গর্জ্জন, আস্ফালন, এমন কি, সময়ে সময়ে অল্পবিস্তর বাহুযুদ্ধ ভিন্ন কোন তর্কেরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইত না, সেই যুগে রামমোহনের একি অসামান্য সৌম্যভাব! অতি তুচ্ছ কথা লইয়া বিরোধী লোকেরা তাঁহাকে গালি দিয়াছে, তিনি সেই সকল তুচ্ছ কথার এমন গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়াছেন যে, আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তিনি সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন কেন? তাঁহার বেদান্তসূত্রের ভূমিকা হইতে পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি—"শুনিতে পাই যে, কোনো কোনো ব্যক্তি কহিয়া থাকেন, তোমরা ব্রহ্মোপাসক, তবে শাস্ত্রপ্রমাণে সকল বস্তুকে ব্রহ্মবোধ করিয়া পঙ্ক-চন্দন, শীত-উষ্ণ, চোর-সাধু, এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর—ইহার উত্তর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যবিবরণের ২২ পৃষ্ঠায় লেখা গিয়াছে যে, বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও লৌকিকজ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা যোগবাশিষ্ঠ-মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ, অর্জ্জুন যে গৃহস্থ, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিকজ্ঞানশূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে বেশী পটু হইয়া কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন।" আর এক স্থলে—"মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর সকল লোকের মত যাহা হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া দুইএক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে

করে, তাঁর পূর্ব্বে কেহ কি পণ্ডিত ছিলেন না এবং অন্য কেহ কি সংসারে পণ্ডিত নাই যে, তাঁহারা এই এই মতকে জানিলেন না।" অপর কেহ হইলে এ সকল কথা উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু রামমোহন সহিষ্ণুতামর্য্যাদার সহিত ইহারও এই উত্তর দিয়াছেন, "এই সকল প্রশ্ন শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে, তত্রাপি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছি। প্রথমতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি, তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান, না হয়, হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুররূপে বাস করেন, তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়—এই হিন্দোস্থান অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন— এই হিন্দোস্থানেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণসম্প্রদা, নানকসম্প্রদা, দাদুসম্প্রদা এবং শিবনারায়ণীসম্প্রদা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তবে কিরূপে কহেন যে, তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়।" এই বিনয় ও সহিষ্ণুতা এবং লোকশিক্ষাকল্পে অতি দুর্ব্বল অভিযোগীকেও বুঝাইবার জন্য এরূপ আন্তরিক যত্ন, তাঁহার বিশ্বহিতেচ্ছা সপ্রমাণ করিতেছে। অথচ যে স্থানে তর্কনিপুণ শাস্ত্রনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের শ্লোক অজস্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, সে স্থানে রামমোহনের লেখনী হইতে লোকপাবনী গঙ্গাধারার ন্যায় শাস্ত্রের যে সুনির্ম্মল ব্যাখ্যা ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে হৃদয়ে স্বতঃই সশ্রদ্ধ নমস্কারপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। কোন অটল গিরিশিখর হইতে যেরূপ নির্ম্মল স্রোত শতমুখে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে, তাঁহার লোকহিতেচ্ছাপ্রণোদিত বিশুদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যায় হিন্দুসমাজ যেন সেইরূপ নবপ্রাণ লাভ করিয়াছিল।

আর একটি কথা এই, তাঁহার অসাধারণ যুক্তিবল সর্ব্বদাই শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিয়াছে। যে সকল ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা কোন জাতিবিশেষের উন্নতিকল্পে গ্রন্থ লিখেন নাই,—বিশ্বহিতেচ্ছার প্রেরণায় অক্ষয় সত্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কোন সময়বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই—সর্ব্বকালে যে কথা বিকাইবে,—যে সুধাময় বাক্য আতুর ও আর্ত্তের চিরকাল হৃৎস্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিবে, সেই সকল সনাতন বাণী যাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই হিন্দুস্থানের কোন্ ব্যক্তি সাধু বলিয়া গণ্য হইবেন? রামমোহন অসীম শ্রদ্ধার সহিত জগদ্‌গুরু ঋষিগণের বাক্যের অনুশীলন করিয়াছেন। যে স্থানে তিনি ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাও প্রাচীনতর ও যোগ্যতর ঋষিবাক্যের বলে; যথা অঙ্গিরা, হারীত প্রভৃতির বাক্য তিনি মনুর বাক্যদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ বেদে আছে—

যৎকিঞ্চিৎ মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজম্—

এবং বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

এই মহোদয়ের অসামান্য পাণ্ডিত্য, বিনয় ও শাস্ত্রপ্রমাণ সহ ব্যাখ্যাত অকাট্যযুক্তির 'মোহিনী' বিদ্বেষীরাও দীর্ঘকাল

অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহমরণসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও প্রবন্ধাবলী পাঠ করুন। সহমরণ এক ভীষণ নির্ম্মম প্রথা। এজন্য সহমরণ অশাস্ত্রীয়, ইহাই প্রমাণ করিতে তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু যুক্তির প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া ঋষিরাজ্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিলে এই ঋষিশাসিত ভারতীয় সমাজে কে তাঁহার কথা শুনিতে দাঁড়াইত? যাঁহারা শত শত শ্লোক লইয়া প্রতিপক্ষতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র শ্লোকের দ্বারা পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। সহমরণ এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও সন্দর্ভগুলি পর্য্যালোচনা করিলে আর একটি বিষয়ের প্রতি স্বতই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। রামমোহন, প্রতিপক্ষের যতপ্রকার যুক্তি, তাহার সমস্তগুলি তর্কস্থলে দাঁড় করাইয়া শাস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। সচরাচর এরূপ স্থলে দৃষ্ট হয় যে, কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা প্রতিপক্ষের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া তাহাদিগকে আড়ম্বরের সহিত সজোরে আঘাত করিয়া স্বমতস্থাপনের চেষ্টা পাই—অনেক সময়েই অপেক্ষাকৃত প্রবল যুক্তিগুলির পাশ কাটাইয়া যাই। কিন্তু রামমোহনের আলোচনায় পরিদৃষ্ট হয় যে, প্রতিপক্ষের সূক্ষ্মতম যুক্তিগুলিকেই তিনি বিশেষ করিয়া ধরিয়াছেন।—যতপ্রকারে তাঁহারা স্বমতসমর্থনের চেষ্টা পাইতে পারেন, ততপ্রকারেই তিনি তাঁহাদের যুক্তিগুলিকে ঝুঁটি ধরিয়া আলোর সম্মুখে আনিয়াছেন এবং যে শাস্ত্রভিত্তির উপর তাঁহারা দাঁড়াইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছেন, শাস্ত্রের অনুশাসনদ্বারাই তাঁহাদিগকে সে-আশ্রয়-বিচ্যুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে তাঁহার প্রতিভার উদার ও নির্ভীক শ্রেষ্ঠত্ব, অপর দিকে তাঁহার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালীর সাধুতা সপ্রমাণ করিতেছে।

যে অমৃতময়, তেজোময় পুরুষের শরণ লইয়া তিনি ভক্তিসহকারে বেদান্তের অনুশীলন করিয়াছেন, সেই নির্ব্বিকার পুরুষের পরম সৌম্যভাবের আভাস তাঁহার চরিত্রে পড়িয়াছিল, এইজন্য তিনি জগতের শিক্ষকরূপে পূজা পাইবার যোগ্য। তিনি ঋষিগণের যোগ্য বংশধর এবং প্রকৃতব্রাহ্মণরূপে সমাজের বরণীয়। সত্যকথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল, সত্য প্রমাণ করিবার যোগ্য পাণ্ডিত্য তাঁহার ছিল, সত্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিবার যোগ্য বিশ্ববিস্তার প্রীতি ও বিনয় তাঁহার ছিল। তিনি একুশটি ভাষা জানিতেন, ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার অসামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও উচ্ছ্বাস পূর্ণ অনুরাগের কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িতেন। কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজপণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"যদি প্লেটো বা সক্রেটিস্, মিণ্টন্ বা নিউটন্ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেরূপ মনের ভাব হওয়া সম্ভব, তদনুরূপ ভাবে অভিভূত হইয়া আমি রাজা রামমোহন রায়ের অভ্যর্থনায় জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেছি।" এই অসামান্য লোকটিকে দেখিয়া ইংরেজপণ্ডিত জাতীয় স্পর্দ্ধা ও বৈষম্য, সকলই ভুলিয়া

আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাতে তিনি যে সকল তর্কে যোগদান করেন, তাহাতেও তাঁহার শান্ত-সমাহিত ভাব, বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব-স্থৈর্য্য সর্ব্বত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ Robert Owen সাহেব তর্কে পরাভূত হইয়া ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে মেরি কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—"Robert Owen রাজাকে তাঁহার সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদে দীক্ষিত-প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত ছিলেন, কিন্তু রাজার যুক্তির অসামান্য প্রখরতা ও আমাদের ভাষায় তাঁহার বিস্ময়কর অধিকার Robert Owenএর সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করিয়া দিল, Robert Owen পরাভূত হইয়া রাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার ন্যায় ধীর ও শান্ত ব্যক্তির এরূপ অধীরতা আমি আর কখনও দেখি নাই, কিন্তু রাজা রামমোহন তাঁহার প্রতি কোন অশ্রদ্ধাযুক্ত কিংবা অধীর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।"

এই প্রশান্ত ও অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্য কোথা হইতে আসিল? তাঁহার বিরুদ্ধে যতপ্রকার বিদ্রূপ, তাচ্ছীল্য ও রূঢ়বাক্য প্রযুক্ত হইত, তাহা তাঁহার সাধুত্বের বর্ম্মে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত,—তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ফেলিত, কিছুতেই তিনি বিচলিত হইতেন না। তিনি যে সমাজে গিয়াছেন, সেইখানে অপরাপর সকলে শিশুর মত হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার প্রবীণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও হিতসঙ্কল্প, সকলের নিকট হইতে নিজের প্রাপ্য মর্য্যাদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন সবলে আদায় করিয়া লইয়াছে। যে দেশে কপিল, শঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই দেশই যেন রামমোহনের জন্মিবার প্রকৃত স্থান বলিয়া মনে হয়।

এতদ্দেশীয়গণের সঙ্গে তর্কের সময় তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রোক্ত মতের দ্বারা স্বীয় যুক্তির পোষকতা করিতেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি সমুচিত সম্ভ্রমের অভাব দেখাইয়া যাঁহারা সহমরণপ্রথা সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের জন্য তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করা ততটা প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। তাঁহার যুক্তিগুলি কেমন গম্ভীরভাবে ও অল্পকথায় ব্যক্ত হইত এবং নারীজাতির প্রতি তাঁহার কি অপূর্ব্ব ভক্তি ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত উত্তরপ্রত্যুত্তরে পাঠক বিদিত হইবেন—

"প্রতিদ্বন্দ্বী।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ যে, স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সানুরাগা এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর শাস্ত্রানুসারে পুনরায় বিধবার বিবাহ হইতে পারে না—এককালে সমুদায় সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশ হয়, অতএব এপ্রকার দুর্ভাগা যে বিধবা, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে কালযাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট; সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা—যাহাতে কুলত্রয়ের কলঙ্ক জন্মে।

রামমোহন।—স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল

জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন—পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদপ্রাপ্তির যোগ্যা নহে—কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক। প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্‌কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীনা হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন। বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাটরাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাত আছে। বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন। কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্যদ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন যে, তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই। তৃতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক, কি স্ত্রীতে অধিক, উভয়ের চরিত্রে দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেন। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে বিবেচনা কর যে, কত স্ত্রী পুরুষ হইতে প্রতারিতা হইয়াছে, আর কত পুরুষ স্ত্রী হইতে প্রতারণাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা অনুভব করি যে, প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক, তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্ম্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোনরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্ব্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষ স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না। স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদিগের ন্যায় অন্যকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায়, এ পর্য্যন্ত যে, কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়। চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহগণনাতেই ব্যক্ত আছে অর্থাৎ এক পুরুষের প্রায় দুই, তিন, দশ, বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্টে যে ব্রহ্মচর্য্য, তাহার অনুষ্ঠান করে। পঞ্চম তাহার ধর্ম্মভয় অল্প, এ অতি অধর্ম্মের কথা। দেখ, কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশপনেরো বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না

—অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহার সহিত দুইচারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামীর দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃ-গৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানাদুঃখসহিষ্ণুতা-পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাঁহারা আপন আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাঁহারদিগের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি কি দুর্গতি না পায়। বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ-অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন, যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে, কি বর্ষাতে স্থানমার্জ্জন, ভোজনাদিপাত্রমার্জ্জন, গৃহলেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুরশাশুড়ী ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ, অমাত্যবর্গ, সকলের রন্ধনপরিবেশনাদি আপন আপন নিয়মিতকালে করে। রন্ধনে ও পরিবেশনে যদি কোনো অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী, শাশুড়ী, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলকে স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদরপূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষপূর্ব্বক আহার করিয়া কালযাপন করে। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যভিচারদোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে একদিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই। স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানসদুঃখে কাতর হয়। এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহ্য করে। আর যাহার স্বামী দুইতিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্মভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে। কখন এমন উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে এবং কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ হইলে চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে। অনেকে ধর্ম্ম-ভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদি কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্যনিমিত্ত পুনরায় তাহা-দিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূর্ব্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখনও বা ছলে প্রাণবধ করে। এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখের দুঃখিনী তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"

এই বিবরণটি পাঠ করিয়া স্বতই বলিতে ইচ্ছা হয়—"হে মাতৃরূপা রমণি, তুমি রামমোহনকে সার্থক পালন করিয়াছিলে, রামমোহন তোমার দুগ্ধধারার পবিত্র সুম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" উদ্ধৃত অংশটিতে কোন উচ্ছ্বাস

নাই, কিন্তু উহাতে দুঃখের যে জীবন্ত চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, কোন্ কাব্যের কোন্ অংশ তদপেক্ষা অধিক সকরুণ?

অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায় হিন্দুদেবদেবীবিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক পাদ্রীদের মত এদেশের প্রতিমা-পূজাকে হেয় বলিয়া কখনই প্রচার করেন নাই। পৌরাণিক দেবদেবীগণ অল্পস্বত্ব সাধারণ লোকের ধর্ম্মধারণার সহায়তার জন্য কল্পিত এবং সমাজে তাঁহাদের প্রয়োজন ছিল, এ কথা তিনি পাদ্রীদের সঙ্গে বিচারের সময় পুনঃপুন ঘোষণা করিয়াছেন; চিহ্ন ও রূপ যে উদ্দেশ্যে কল্পিত, সেই উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট হইয়া তাহারাই উদ্দেশ্যস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং জাতীয়জীবনে ব্রহ্ম-বুদ্ধির পুনঃসঞ্চার করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পাদ্রীরা পৌত্তলিক বলিয়া যখন হিন্দু-দিগকে গালি দিতেছিলেন, তখন তাহা তিনি সহ্য করেন নাই, পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম প্রতিপন্ন করিয়া দেবদেবীকল্পনার আবশ্য-কতা বুঝাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং যে খ্রীষ্টানেরা পবিত্রাত্মাকে কপোতরূপে কল্পনা ও যিশুকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহাদের হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিবার কোন অধিকার নাই, নির্ভীক-ভাবে এ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি কখনই স্বজাতির দ্রোহ আচরণ করিয়া বিদেশীর সঙ্গে কণ্ঠ মিশাইয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করেন নাই। প্রত্যুত রামপ্রসাদের ন্যায় ভক্ত, যাঁহারা সাকারবাদী হইয়া উচ্চ ধর্ম্ম-তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা তিনি সর্ব্বদা বিশিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী নন্দলাল ঠাকুর তাঁহাকে রাম-কৃষ্ণ-মহাদেব-বিদ্বেষী বলিয়া কোন প্রতিবাদপুস্তকে উল্লেখ করিলে তিনি লিখিয়াছিলেন—"হরি-হরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নামগ্রহণ হইয়াছে, তথায় 'ভগবান্'-শব্দ কিংবা 'পরমারাধ্য'শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামসকলকে দেখিতে পাইবেন।" এই কথা প্রমাণের জন্য তিনি স্বীয় বহুবিধ গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশপূর্ব্বক হরিহরের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ প্রতিপন্ন করিতেছেন। নন্দলাল ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—"রামমোহন এদেশীয় ব্রাহ্মণকে বেদবিহীন বলিয়া নিন্দা করেন।" এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া রামমোহন রায় লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার উচিত ছিল, কোন্ পুস্তকে কোন্ স্থানে লিখিয়াছি, তাহার ধ্বনি দিয়া লিখি-তেন।" উক্ত ঠাকুর তাঁহার উপর বেদব্যাসকে মিথ্যাবাদী বলার অভিযোগ দেওয়ায় তিনি দুঃখিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"যে বেদব্যাসের নাম লইয়া উপনিষদের ভূমিকায় মঙ্গলাচরণ করি, যাঁহাকে এক স্থানে বিষ্ণুর্ব্রাংশসম্ভব বলিয়া লিখিয়াছি, যাঁহার সূত্রকে বেদ বলিয়া জানিয়াছি।" সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন অসম্মানসূচক উল্লেখ অসম্ভব। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিযোগের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—"স্মার্ত্ত ভট্টা-চার্য্যের বাক্যকে প্রমাণ স্বীকার করিয়া তাঁহার ধৃত বচনসকলের ও তাঁহার কৃত ব্যাখ্যাকে পুনঃপুনঃ গৌরবপূর্ব্বক লিখিয়াছি।" সুতরাং ক্রাইষ্ট যেরূপ বলিয়াছিলেন,

রামমোহনও তেমনই বলিতে পারিতেন—"আমি ভাঙিতে আসি নাই, গড়িতে আসিয়াছি।"

বর্ত্তমান যুগের প্রথমাবস্থার সঙ্গে তাঁহার আরাধ্যচিত্র আমাদের মনে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। রামমোহনের ছবি যেমনই প্রতিভা-ব্যঞ্জক, তেমনই অসামান্যবীরত্বপূর্ণ। তীক্ষ্ণ সঙ্কল্পারূঢ় উজ্জ্বল চক্ষু, বাগ্মিতার পরিচায়ক স্থূল হনু, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং ঋজু সুদীর্ঘমূর্ত্তিতে যেন কটি বাঁধিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার বহুস্তরে বিভক্ত শিথিল জামার আস্তরণ হইতে গ্রন্থবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত যেন সত্যপ্রতি-পাদনের জন্য উদ্যত হইয়া আছে, বিশাল পাগ্‌ড়ীটি ঘনসংচ্ছন্ন বক্রকেশাস্তের উপান্তে কুটিলভাবে সংন্যস্ত। এই বীরবেশে ষোড়শবর্ষকাল কলিকাতামহানগরীর বক্ষে রামমোহন তর্কযুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কোনদিন নাস্তিক বৌদ্ধকে ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি সমস্তদিন উপবাসী থাকিয়া ক্রমাগত তর্ক করিতেছেন, মিঃ আর্নট এতদবস্থায় তাঁহাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়া-ছিলেন। মৌলভি গোলাম আব্বাস তাঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের এমনই গোঁড়া হইয়াছিলেন যে, তিনি আত্মীয়সভার উৎসবের সময় পাখোয়াজ বাজাইতেন। এদিকে Mr. Adamsএর ন্যায় কত পাদ্রী তাঁহার সঙ্গে তর্কপরাজয় স্বীকার করিয়া ইউনিটিরিয়ান্‌ মত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

দেশের সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হিন্দুর দায়ভাগসম্বন্ধে তাঁহার শ্রম ও যত্ন বিস্ময়কর, সহমরণপ্রথা উঠাইয়া-দিয়া তিনি হিন্দুসমাজের অনেকের শ্রদ্ধাপ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার চেষ্টা আমাদের চিরকৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিবে। সংস্কৃতশিক্ষার পরিবর্ত্তে ইংরাজিশিক্ষাপ্রবর্ত্তনের চেষ্টার জন্য তিনি তুল্যরূপই প্রসিদ্ধ। পাদ্রীদিগকে অকুণ্ঠিতভাবে প্রতিরোধ করিয়া এবং বিলাতে যাইয়া বেদান্তের মহিমা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগকে তিনি বুঝাইয়া-ছেন, তাঁহার ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, তাঁহার ধর্ম্ম উন্নত-তর। কোনস্থানেই তিনি স্বীয় সম্মান ও স্বীয় ধর্ম্মকে লঘু করিয়া পরের পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থী হন নাই। তিনি বাঙ্‌লা গদ্যসাহিত্যের এক-রূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গভাষার তিনি যে ক্ষুদ্র ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন, বঙ্গভাষার প্রতিভার তিনি তখন যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত অন্য কেহ সে পরিচয় পান নাই। সেই ব্যাকরণখানি আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি সেই চেষ্টার বিকাশে যত্নপর হইলে ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের অশেষ উন্নতি হইত। তাহা না করিয়া আধুনিক ব্যাকরণগুলি উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছে। আর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—হিন্দুর যে নির্ম্মল প্রাচীন ধর্ম্ম "খনির তিমিরগর্ভে হীরক যেমতি" সেইরূপ লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হিন্দুর

চিরন্তন ও স্বাভাবিক সংস্কার অনুসারে তিনিই আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষিরা সাধুগুম্ফিত, সর্ব্বপ্রকার-বৈষম্য-বর্জ্জিত পুণ্য তপোবনে বসিয়া যে আনন্দ ও শান্তির অমরকাব্য বেদবেদান্তদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেই আনন্দ ও শান্তির আধার-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করিয়া তিনি সমাজে নবজীবনের উৎস সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন—প্রকৃত গুরুর ন্যায় তিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। আজ যাহা-কিছু দৈন্য, যাহা-কিছু দুঃখ, তাহা আমাদের নিজস্ব,—কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে আশার যে একটি ক্ষীণ-কিরণ সঞ্চরিত হইয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতা প্রদান করিতেছে, তাহা রামমোহনের দিব্যপ্রতিভানিঃসৃত। তিনি প্রাচীন জীর্ণসমাজকে ধরিয়া-তুলিয়া চিরন্তন সত্যধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছিলেন,—অদ্যাবধি সেই লক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ কলকোলাহল করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে। শাহ আলম্ বাদশাহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন,—যাঁহার ললাটে প্রকৃতি স্বহস্তে রাজটীকা আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের প্রতি অর্পিত হইয়া লৌকিক উপাধিটি ধন্য হইয়া গিয়াছে। যিশুও 'King of Jews' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে শাসনের পরিবর্ত্তন, সম্রাটের অভ্যুদয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতবর্ষের যে কয়েক-জন চিরন্তন সম্রাট্ আছেন, রামমোহন তাঁহাদেরই পার্শ্বে দাঁড়াইবেন,—এ রাজ্য তাঁহাদেরই আছে—এবং চিরকাল তাঁহাদেরই হউক।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

নৌকাডুবি।

৫৮

যেদিন সন্ধ্যার সময় নলিনাক্ষের সহিত বিবাহ লইয়া হেমনলিনীর সঙ্গে অন্নদাবাবুর আলোচনা হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রেই অন্নদাবাবুর আবার সেই শূলবেদনা দেখা দিল।

রাত্রিটা কষ্টে কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে তাঁহার বেদনার উপশম হইলে তিনি তাঁহার বাড়ীর বাগানে রাস্তার নিকটে শীত-প্রভাতের তরুণ সূর্য্যালোকে সম্মুখে একটি টিপাই লইয়া বসিয়াছেন—হেমনলিনী সেইখানেই তাঁহাকে চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতেছে। গতরাত্রের কষ্টে অন্নদাবাবুর মুখ বিবর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গেছে, তাঁহার চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে, মনে হইতেছে, যেন এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার বয়স অনেক বাড়িয়া গেছে।

যখনি অন্নদাবাবুর এই ক্লিষ্টমুখের প্রতি হেমনলিনীর চোখ পড়িতেছে, তখনি তাহার

বুকের মধ্যে যেন ছুরি বিঁধিতেছে। নলিনাক্ষের সহিত বিবাহে হেমনলিনীর অসম্মতিতেই যে বৃদ্ধ ব্যথিত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেই মনোবেদনাই যে তাঁহার পীড়ার অব্যবহিত কারণ, ইহা হেমনলিনীর পক্ষে একান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে ; সে যে কি করিবে, কি করিলে বৃদ্ধ পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে, তাহা বারবার করিয়া ভাবিয়া কোনোমতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন-সময় হঠাৎ খুড়াকে লইয়া অক্ষয় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমনলিনী তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই অক্ষয় কহিল—"আপনি যাইবেন না, ইনি গাজিপুরের চক্রবর্ত্তিমহাশয়, ইঁহাকে পশ্চিম-অঞ্চলের সকলেই জানে—আপনাদের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ কথা আছে।"

সেই জায়গাটাতে বাঁধানো চাতালের মত ছিল—সেইখানে খুড়া আর অক্ষয় বসিলেন।

খুড়া কহিলেন, "শুনিলাম, রমেশবাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে—আমি তাই জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি তাঁহার স্ত্রীর খবর কি আপনারা কিছু পাইয়াছেন ?"

অন্নদাবাবু ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাহার পরে কহিলেন, "রমেশবাবুর স্ত্রী !"

হেমনলিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "মা, তোমরা আমাকে বোধ করি নিতান্ত সেকেলে অসভ্য মনে করিতেছ। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া সমস্ত কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে, আমি খামকা গায়ে পড়িয়া পরের কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে আসি নাই। রমেশবাবু পূজার সময় তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ষ্টীমারে করিয়া যখন পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই ষ্টীমারেই তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আপনারা ত জানেন, কমলাকে যে একবার দেখিয়াছে, সে তাহাকে কখনো পর বলিয়া মনে করিতে পারে না। আমার এই বুড়াবয়সে অনেক শোকতাপ পাইয়া হৃদয় কঠিন হইয়া গেছে, কিন্তু আমার সেই মা-লক্ষ্মীকে ত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। রমেশবাবু কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠিক করেন নাই—কিন্তু এই বুড়াকে দুইদিন দেখিয়াই মা কমলার এম্‌নি স্নেহ জন্মিয়া গিয়াছিল যে, তিনি রমেশবাবুকে গাজিপুরে আমার বাড়ীতেই উঠিতে রাজি করেন। সেখানে কমলা আমার মেজো মেয়ে শৈলর কাছে আপন বোনের চেয়ে যত্নে ছিল। কিন্তু কি যে হইল, কিছুই বলিতে পারি না—মা যে কেন আমাদের সকলকে এমন করিয়া কাঁদাইয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভাবিয়া পাইলাম না। সেই অবধি শৈলর চোখের জল আর কিছুতেই শুকাইতেছে না।"

বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কহিলেন, "তাঁহার কি হইল, তিনি কোথায় গেলেন ?"

খুড়া কহিলেন—"অক্ষয়বাবু, আপনি ত সকল কথা শুনিয়াছেন, আপনিই বলুন। বলিতে গেলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

অক্ষয় আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করিল। নিজে

কোনোপ্রকার টীকা করিল না, কিন্তু তাহার বর্ণনায় রমেশের চরিত্রটি রমণীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিল না।

অন্নদাবাবু বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা ত এ সমস্ত কথা কিছুই শুনি নাই। রমেশ যেদিন হইতে কলিকাতার বাহির হইয়াছেন, তাঁহার একখানি পত্রও পাই নাই।"

অক্ষয় সেই সঙ্গে যোগ দিল—"এমন কি, তিনি যে কমলাকে বিবাহ করিয়াছেন, এ কথাও আমরা নিশ্চয় জানিতাম না। আচ্ছা চক্রবর্ত্তিমহাশয়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কমলা রমেশের স্ত্রী ত বটেন? ভগ্নী বা আর কোনো আত্মীয়া ত নহেন?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"আপনি বলেন কি অক্ষয়বাবু? স্ত্রী নহেন ত কি? এমন সতীলক্ষ্মী স্ত্রী কয়জনের ভাগ্যে জোটে?"

অক্ষয় কহিল—"কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, স্ত্রী যত ভাল হয়, তাহার অনাদরও তত বেশি হইয়া থাকে। ভগবান্ ভাল লোকদিগকেই বোধ করি সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন!"—এই বলিয়া অক্ষয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অন্নদা তাঁহার বিরল কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে বলিলেন—"বড় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যাহা হইবার তা ত হইয়াই গেছে, এখন আর বৃথা শোক করিয়া ফল কি?"

অক্ষয় কহিল—"আমার মনে সন্দেহ হইল, যদি এমন হয়, কমলা আত্মহত্যা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন। তাই চক্রবর্ত্তিমহাশয়কে লইয়া কাশীতে একবার সন্ধান করিতে আসিলাম। বেশ বুঝা যাইতেছে, আপনারা কোনো খবরই পান নাই। যাহা হউক, দুচারদিন এখানে তল্লাস করিয়া দেখা যাক্!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"রমেশ এখন কোথায় আছেন?"

খুড়া কহিলেন, "তিনি ত আমাদিগকে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেছেন।"

অক্ষয় কহিল—"আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, কিন্তু লোকের মুখে শুনিলাম, তিনি কলিকাতাতেই গেছেন। বোধ করি আলিপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিবেন। মানুষ ত আর অনন্তকাল শোক করিয়া কাটাইতে পারে না, বিশেষত তাঁহার অল্পবয়স। চক্রবর্ত্তিমহাশয়, চলুন, সহরে একবার ভাল করিয়া খোঁজ করিয়া দেখা যাক্।"

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অক্ষয়, তুমি ত এইখানেই আসিতেছ?"

অক্ষয় কহিল—"ঠিক বলিতে পারি না। আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া আছে অন্নদাবাবু। যতদিন কাশীতে আছি, আমাকে এই খোঁজেই থাকিতে হইবে। বলেন কি, ভদ্রলোকের মেয়ে, যদিই তিনি মনের দুঃখে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে আজ কি বিপদেই পড়িয়াছেন বলুন দেখি! রমেশবাবু দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি ত পারি না।"

খুড়াকে সঙ্গে লইয়া অক্ষয় চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একবার হেমনলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হেমনলিনী প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া

বসিয়াছিল। সে জানিত, তাহার পিতা মনে মনে তাহার জন্ত আশঙ্কা অনুভব করিতেছেন।

হেমনলিনী কহিল—"বাবা, আজ একবার ডাক্তারকে দিয়া তোমার শরীরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করাও। একটুতেই তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, ইহার একটা প্রতিকার করা উচিত।"

অন্নদাবাবু মনে মনে অত্যন্ত আরাম অনুভব করিলেন। রমেশকে লইয়া এতবড় আলোচনাটার পর হেমনলিনী যে তাঁহার পীড়া লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিল, ইহাতে তাঁহার মনের মধ্য হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। অন্তসময় হইলে তিনি নিজের পীড়া'র প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেন—আজ কহিলেন, "সে ত বেশ কথা। শরীরটা না হয় পরীক্ষা করানোই যাক্। তাহা হইলে আজ না হয় একবার নলিনাক্ষকে ডাকিতে পাঠাই। কি বল?"

নলিনাক্ষসম্বন্ধে হেমনলিনী একটুখানি সঙ্কোচে পড়িয়া গেছে। পিতার সম্মুখে তাহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সহজভাবে মেলা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে, তবু সে বলিল, "সে-ই ভাল, তাঁহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নদাবাবু হেমের অকিঞ্চিলিত ভাব দেখিয়া ক্রমে সাহস পাইয়া কহিলেন—"হেম, রমেশের এই সমস্ত কাণ্ড—"

হেমনলিনী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, রৌদ্রের ঝাঁজ বাড়িয়া উঠিয়াছে—চল, এখন ঘরে চল।"—বলিয়া তাঁহাকে আপত্তি করিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। সেখানে তাঁহাকে আরামকেদারায় বসাইয়া তাঁহার গায়ে বেশ করিয়া গরম কাপড় জড়াইয়া-দিয়া তাঁহার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিল এবং চসমার খাপ হইতে চসমাটি বাহির করিয়া নিজে তাঁহার চোখে পরাইয়া-দিয়া কহিল—"কাগজ পড়, আমি আসিতেছি।"

অন্নদাবাবু সুবাধ্য বালকের মত হেমনলিনীর আদেশপালন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনোমতেই মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। হেমনলিনীর জন্ত তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একসময় কাগজ রাখিয়া হেমের খোঁজ করিতে গেলেন—দেখিলেন, সেই প্রাতে অসময়ে তাহার ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছু না বলিয়া অন্নদাবাবু বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে আবার একবার হেমনলিনীকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, তখনো তাহার দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তখন শ্রান্ত অন্নদাবাবু ধপ্ করিয়া তাঁহার চৌকিটার উপর বসিয়া-পড়িয়া মুহুর্মুহু মাথার চুলগুলাকে করসঞ্চালনদ্বারা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

নলিনাক্ষ আসিয়া অন্নদাবাবুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং যথাকর্ত্তব্য বলিয়া দিল এবং হেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্নদাবাবুর মনে কি বিশেষ কোনো উদ্বেগ আছে?" হেম কহিল, "তা থাকিতে পারে।"

নলিনাক্ষ কহিল, "যদি সম্ভব হয়, উঁহার মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। আমার

মার সম্বন্ধেও ঐ এক মুস্কিলে পড়িয়াছি—তিনি একটুতেই এম্‌নি ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার শরীর সুস্থ রাখা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সামান্ত কি-একটা চিন্তা লইয়া কাল বোধ হয় সমস্তরাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা করি যাহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হন, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে তাহা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না।"

হেমনলিনী কহিল, "আপনাকেও আজ তেমন ভাল দেখাইতেছে না।"

নলিনাক্ষ। না, আমি বেশ ভালই আছি। মন্দ থাকা আমার অভ্যাস নয়। তবে কাল বোধ হয় কিছু রাত জাগিতে হইয়াছিল বলিয়া আজ আমাকে তেমন তাজা দেখাইতেছে না।

হেমনলিনী। আপনার মাকে সেবা করিবার জন্ত সর্ব্বদা যদি একটি স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে থাকিত, তবে বোধ হয় ভাল হইত। আপনি একলা, আপনার কাজকর্ম্ম আছে, কি করিয়া আপনি উঁহার শুশ্রূষা করিয়া উঠিবেন?

এ কথাটা হেমনলিনী সহজভাবেই বলিয়াছিল, কথাটা সঙ্গত, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই—কিন্তু বলার পরেই হঠাৎ তাহাকে লজ্জা আক্রমণ করিল, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল—তাহার সহসা মনে হইল, নলিনাক্ষবাবু যদি কিছু মনে করেন। অকস্মাৎ হেমনলিনীর এই লজ্জার আবির্ভাব দেখিয়া নলিনাক্ষও তাহার মা'র প্রস্তাবের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিল না।

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি সারিয়া-লইয়া কহিল—"উঁহার কাছে একজন ঝি রাখিলে ভাল হয় না?"

নলিনাক্ষ কহিল, "অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, মা কিছুতেই রাজি হন না। তিনি শুদ্ধাচারসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক বলিয়া মাহিনা-করা লোকের কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না। তা ছাড়া, তাঁহার স্বভাব এমন যে, কেহ যে দায়ে পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না।"

ইহার পরে এসম্বন্ধে হেমনলিনীর আর কোনো কথা চলিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আপনার উপদেশমতে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এক-একবার বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার আমি পিছাইয়া পড়ি। আমার ভয় হয়, আমার যেন কোনো আশা নাই। আমার কি কোনোদিন মনের একটা স্থিতি হইবে না—আমাকে কি কেবলি বাহিরের আঘাতে অস্থির হইয়া বেড়াইতে হইবে?"

হেমনলিনীর এই কাতর আবেদনে নলিনাক্ষ একটু চিন্তিত হইয়া কহিল—"দেখুন, বিঘ্ন যদি না আসে, তবে আমরা জানিতেই পারি না, আমরা কতদূর অগ্রসর হইলাম। বিঘ্ন আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিবার জন্তই উপস্থিত হয়। আপনি হতাশ হইবেন না।"

হেমনলিনী কহিল, "কাল সকালে আপনি একবার আসিতে পারিবেন? আপনার সহায়তা পাইলে আমি অনেকটা বললাভ করি।"

নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরে যে একটি অবিচলিত শান্তির ভাব আছে, তাহাতে হেমনলিনী যেন একটা আশ্রয় পায়। নলিনাক্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু হেমনলিনীর মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার স্পর্শ রাখিয়া গেল। সে তাহার শয়নগৃহের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া একবার শীতরৌদ্রালোকিত বাহিরের দিকে চাহিল। তাহার চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই রমণীয় মধ্যাহ্নে কর্ম্মের সহিত বিরাম, শক্তির সহিত শান্তি, উদ্যোগের সহিত বৈরাগ্য একসঙ্গে বিরাজ করিতেছিল, সেই বৃহৎ ভাবের ক্রোড়ে সে আপনার ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করিয়া দিল—তখন সূর্য্যালোক এবং উন্মুক্ত উজ্জ্বল নীলাম্বর তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে জগতের নিত্য-উচ্চারিত সুগভীর আশীর্ব্বচন প্রেরণ করিবার অবকাশ লাভ করিল।

হেমনলিনী ভাবিতে লাগিল, "এই আলোক ত প্রতিদিন আমার সম্মুখে উদিত হয়, এই জগৎ ত অহরহ আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকে—কিন্তু যতক্ষণ না একটি মানুষ আসিয়া মাঝখানে দাঁড়ায়, ততক্ষণ কেন ইহাদের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় হয় না!"

তাহার পর নলিনাক্ষের মার কথা ভাবিতে লাগিল। কি চিন্তা লইয়া তিনি ব্যাপৃত আছেন, তিনি কেন যে রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেছেন না, তাহা হেমনলিনী বুঝিতে পারিল। নলিনাক্ষের সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের প্রথম আঘাত, প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়া গেছে। নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর একান্ত নির্ভরপূর্ণ ভক্তি ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারময়ী বেদনা নাই—না-ই থাকিল! ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষ যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালবাসার অপেক্ষা রাখে, তাহা ত মনেই হয় না। তবু সেবার প্রয়োজন ত সকলেরই আছে। নলিনাক্ষের মাতা পীড়িত এবং প্রাচীন—নলিনাক্ষকে কে দেখিবে! এ সংসারে নলিনাক্ষের জীবন ত অনাদরের সামগ্রী নহে—এমন লোকের সেবা ভক্তির সেবাই হওয়া চাই।

আজ প্রভাতে হেমনলিনী রমেশের জীবন-ইতিবৃত্তের যে একাংশ শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার মর্ম্মের মাঝখানে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে যে, এই নিদারুণ আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার সমস্ত মনের সমস্ত শক্তি আজ উদ্যত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ এমন অবস্থা আসিয়াছে যে, রমেশের জন্য বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে লজ্জাকর। সে রমেশকে বিচার করিয়া অপরাধী করিতেও চায় না। পৃথিবীতে কত শতসহস্র লোক ভালমন্দ কতকি কাজে লিপ্ত রহিয়াছে, সংসারচক্র চলিতেছে—হেমনলিনী তাহার বিচারভার লয় নাই। রমেশের কথা হেমনলিনী মনেও আনিতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে আত্মঘাতিনী কমলার কথা কল্পনা করিয়া তাহার শরীর শিহরিয়া উঠে—তাহার মনে হইতে থাকে, এই হতভাগিনীর আত্মহত্যার সঙ্গে আমার কি কোনো সংস্রব আছে? তখন লজ্জায়, ঘৃণায়, করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় মথিত হইতে থাকে। সে জোড়হাত করিয়া বলে, "হে ঈশ্বর, আমি ত অপরাধ

করি নাই, তবে আমি কেন এমন করিয়া জড়িত হইলাম ? আমার এ বন্ধন মোচন কর; একেবারে ছিন্ন করিয়া দাও! আমি আর কিছুই চাই না, আমাকে তোমার এই জগতে সহজভাবে বাঁচিয়া থাকিতে দাও!"

রমেশ ও কমলার ঘটনা শুনিয়া হেমনলিনী কি মনে করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য অন্নদাবাবু উৎসুক হইয়া আছেন—অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া পাড়িতে তাঁহার সাহস হইতেছে না। হেমনলিনী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছিল, সেখানে একএকবার গিয়া হেমনলিনীর চিন্তারত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের উপদেশমত অন্নদাবাবুকে জারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইয়া হেমনলিনী তাঁহার কাছে বসিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "আলোটা চোখের সাম্‌নে হইতে সরাইয়া দাও।"

ঘর একটু অন্ধকার হইলে অন্নদাবাবু কহিলেন, "সকালবেলায় যে বৃদ্ধটি আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বেশ সরল বোধ হইল।"

হেমনলিনী এই প্রসঙ্গ লইয়া কোনো কথা কহিল না—চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু আর অধিক ভূমিকা বানাইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "রমেশের ব্যাপার শুনিয়া আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেছি—লোকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছে,—আমি আজ পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করি নাই—কিন্তু আর ত—"

হেমনলিনী কাতরকণ্ঠে কহিল—"বাবা, ও সকল কথার আলোচনা থাক্।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"মা, আলোচনা করিতে ত ইচ্ছা করেই না। কিন্তু বিধির বিপাকে অকস্মাৎ একএকজন লোকের সঙ্গে আমাদের সুখদুঃখ জড়িত হইয়া যায়, তখন তাহার কোনো আচরণকে আর উপেক্ষা করিবার জো থাকে না।"

হেমনলিনী সবেগে বলিয়া উঠিল—"না না—সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে-সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব! বাবা, আমি বেশ আছি—আমার জন্য তুমি বৃথা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে, এখন তোমার একটা স্থিতি না করিয়া ত আমার মন স্থির হইতে পারে না। তোমাকে এমন তপস্বিনীর মত কি আমি রাখিয়া যাইতে পারি ?"

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখ মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর সমস্ত দুর্ম্মূল্য জিনিষকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। তোমার জীবন কিসে সুখী হইবে, সার্থক হইবে, আজ হয় ত মনের ক্ষোভে তাহা তুমি না জানিতেও পার—কিন্তু আমি নিয়ত তোমার মঙ্গলচিন্তা করি—আমি জানি তোমার কিসে সুখ, কিসে মঙ্গল, আমার প্রস্তাবটাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়ো না।"

হেমনলিনী দুই চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন কথা বলিয়ো না, আমি তোমার কোনো কথাই উপেক্ষা করি না।

তুমি ত জান বাবা, জীবনে এমন একএকটা সময় আসে, যখন সহজ কথাও অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। আমাকে মনের সমস্ত চিন্তা একটু গুছাইয়া লইবার সময় দিবে না? তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি নিশ্চয় তাহা পালন করিব, কেবল একবার অন্তঃকরণটা পরিষ্কার করিয়া একবার ভালরকম করিয়া প্রস্তুত হইয়া লইতে চাই!"

অন্নদাবাবু সেই অন্ধকারে একবার হেমনলিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিলেন। আর কোনো কথা কহিলেন না।

পরদিন সকালে যখন অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে লইয়া বাহিরে গাছের তলায় চা খাইতে বসিয়াছেন, তখন অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্নদাবাবু নীরব প্রশ্নের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। অক্ষয় কহিল, "এখনো কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।" এই বলিয়া এক-পেয়ালা চা লইয়া সে সেখানে বসিয়া গেল।

আস্তে আস্তে কথা তুলিল—"রমেশবাবু ও কমলার জিনিষপত্র কিছু-কিছু চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের ওখানে রহিয়া গেছে, সেগুলি তিনি কোথায় কাহার কাছে পাঠাইবেন, তাই ভাবিতেছেন। রমেশবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ঠিকানা বাহির করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন, তাই আপনাদের এখানে যদি—"

অন্নদাবাবু হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিয়া কহিলেন—"অক্ষয়, তোমার কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নাই! রমেশ আমার এখানেই বা কেন আসিবে, আর তাহার জিনিষ-পত্র আমিই বা কেন রাখিতে যাইব?"

অক্ষয় কহিল, "যা হোক্, অন্যায় করুন আর ভুল করুন্, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ সময়ে কি তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্ত্তব্য নয়? তাঁহাকে কি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয় তুমি কেবল আমাদের পীড়ন করিবার জন্য এই কথাটা লইয়া বারবার আন্দোলন করিতেছ। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছি, এ প্রসঙ্গ তুমি আমাদের কাছে কখনোই তুলিয়ো না!"

হেমনলিনী স্নিগ্ধস্বরে বলিল—"বাবা, তুমি রাগ করিয়ো না, তোমার অসুখ করিবে—অক্ষয়বাবু যাহা বলিতে চান, বলুন্ না, তাহাতে দোষ কি।"

অক্ষয় কহিল—"না না, আমাকে মাপ করিবেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

৫৯

মুকুন্দবাবু সপরিজনে কাশী ত্যাগ করিয়া মিরাটে যাইবেন, স্থির হইয়া গেছে। জিনিষপত্র বাঁধা হইয়াছে, কাল প্রভাতেই ছাড়িতে হইবে। কমলা নিতান্ত আশা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে এমন একটা-কিছু ঘটনা ঘটিবে, যাহাতে তাহাদের যাওয়া বন্ধ হইবে। ইহাও সে একান্তমনে আশা করিয়াছিল যে, নলিনাক্ষডাক্তার হয় ত আর দুইএকবার তাঁহার রোগীকে দেখিতে আসিবেন। কিন্তু দুয়ের কোনোটাই ঘটিল না।

পাছে বামুনঠাকরুণ যাত্রার উদ্যোগের গোলেমালে পালাইয়া যাইবার অবকাশ পায়; এই আশঙ্কায় নবীনকালী তাহাকে কয়দিন সর্ব্বদাই কাছে-কাছে রাখিয়াছেন - তাহাকে দিয়াই জিনিষপত্র-বাঁধাছাঁদার অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছেন।

কমলা একান্তমনে কামনা করিতে লাগিল, আজ রাত্রির মধ্যে তাহার এমন একটা কঠিন পীড়া হয় যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া নবীনকালীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই গুরুতর পীড়ার চিকিৎসা-ভার কোন্ ডাক্তারের উপর পড়িবে, তাহাও সে মনে মনে ভাবে নাই, এমন নহে। এই পীড়ায় যদি অবশেষে তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে আসন্ন মৃত্যুকালে সেই চিকিৎসকের পায়ের ধূলা লইয়া সে মরিতে পারিবে, ইহাও সে চোখ বুজিয়া কল্পনা করিতেছিল।

রাত্রে নবীনকালী কমলাকে আপনার ঘরে লইয়া শুইলেন। পরদিন ষ্টেশনে যাইবার সময় নিজের গাড়ির মধ্যে তুলিয়া লইলেন। কর্ত্তা মুকুন্দবাবু রেলগাড়িতে সেকেণ্ডক্লাসে উঠিলেন—নবীনকালী বামুন-ঠাকরুণকে লইয়া ইণ্টারমীডিয়েটে স্ত্রীকক্ষে আশ্রয়লাভ করিলেন।

অবশেষে গাড়ি কাশীষ্টেশন্ ছাড়িল—মত্ত হস্তী যেমন করিয়া লতা ছিঁড়িয়া লয়, তেম্‌নি করিয়া রেলগাড়ি গর্জ্জন করিতে করিতে কমলাকে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। কমলা ক্ষুধিতচক্ষে জান্‌লা হইতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। নবীন-কালী কহিলেন, "বামুনঠাকরুণ, পানের ডিপেটা কোথায় রাখিলে?"

কমলা পানের ডিপেটা বাহির করিয়া দিল। ডিপে খুলিয়া নবীনকালী কহিলেন, "এই দেখ, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে! চূনের কৌটোটা ফেলিয়া আসিয়াছ? এখন আমি করি কি! যেটি আমি নিজে না দেখিব, সেটিতে একটা-না-একটা গলদ্ হইয়া আছেই! এ কিন্তু বামুনঠাকরুণ তুমি সয়তানী করিয়া করিয়াছ! কেবল আমাকে জব্দ করিবার মৎলবে! ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ! আজ তরকারিতে নুন্ নাই, কাল পায়সে ধরা-গন্ধ—মনে করিতেছ, এ সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না! আচ্ছা, চল মিরাটে, তার পরে দেখা যাইবে তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে!"

গাড়ি যখন পুলের উপর দিয়া চলিল, কমলা জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া গঙ্গা-তীরবর্ত্তী কাশীসহরটা একবার দেখিয়া লইল—ঐ সহরের মধ্যে কোন্ দিকে যে নলিনাক্ষের বাড়ী, তাহা সে কিছুই জানে না। এইজন্য রেলগাড়ির দ্রুতধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ী, মন্দিরচূড়া, যাহা-কিছু তাহার চক্ষে পড়িল, সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিল।

নবীনকালী কহিলেন, "ওগো, অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কি! তুমি ত পাখী নও তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।"

কাশীনগরীর চিত্র কোথায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কমলা স্থির-নীরব হইয়া বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে গাড়ি মোগলসরাইয়ে থামিল। কমলার কাছে ষ্টেশনের গোলমাল, লোক-জনের ভিড়, সমস্তই ছায়ার মত, স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে কলের পুতলীর মত এক গাড়ি হইতে অন্য গাড়িতে উঠিল।

গাড়ি ছাড়িবার সময় হইয়া আসিতেছে, এমন-সময় কমলা হঠাৎ চমকিয়া-উঠিয়া শুনিতে পাইল, তাহাকে কে পরিচিতকণ্ঠে "মা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিয়াছে! কমলা প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, উমেশ।

কমলার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কহিল, "কিরে উমেশ!"

উমেশ গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলা নামিয়া পড়িল। উমেশ তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কমলার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত মুখ আকর্ণপ্রসারিত হাসিতে ভরিয়া গেল।

পরক্ষণেই গার্ড্‌ কাম্‌রার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। নবীনকালী চেঁচামেচি করিতে লাগিলেন, "বামুনঠাকরুণ, করিতেছ কি! গাড়ি ছাড়িয়া দেয় যে! ওঠ, ওঠ!"

কমলার কানে সে কথা পৌঁছিলই না। গাড়িও বাঁশী ফুঁকিয়া-দিয়া গস্‌গস্‌শব্দে ষ্টেশন্‌ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্‌?"

উমেশ কহিল, "গাজিপুর হইতে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"সেখানে সকলে ভাল আছেন ত? খুড়ামশায়ের কি খবর?"

উমেশ কহিল—"তিনি ভাল আছেন।"

কমলা। আমার দিদি কেমন আছেন?

উমেশ। মা, তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া অনর্থ করিতেছেন।

তৎক্ষণাৎ কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "উমি কেমন আছে রে? সে তার মাসীকে কি মাঝে মাঝে মনে করে?"

উমেশ কহিল, "তুমি তাহাকে যে একজোড়া গহনা দিয়া আসিয়াছিলে, সেইটে না পরাইলে তাহাকে কোনোমতে দুধ খাওয়ানো যায় না। সেইটে পরিয়া সে দুই হাত ঘুরাইয়া বলিতে থাকে, 'মাসি গ-গ গেছে', আর তার মার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—"তুই এখানে কি করিতে আসিলি?"

উমেশ কহিল, "আমার গাজিপুরে ভাল লাগিতেছিল না, তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি।"

কমলা। যাবি কোথায়?

উমেশ কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে যাইব।"

কমলা কহিল, "আমার কাছে একটি পয়সাও নাই।"

উমেশ কহিল—"আমার কাছে আছে।"

কমলা। তুই কোথায় পেলি?

উমেশ। সেই যে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়াছিলে, সে ত আমার খরচ হয় নাই।

—বলিয়া গাঁট হইতে পাঁচটা টাকা বাহির করিয়া দেখাইল।

কমলা। তবে চল্‌ উমেশ, আমরা কাশী যাই, কি বলিস্‌? তুই ত টিকিট করিতে পারিবি?

উমেশ কহিল, "পারিব।"—বলিয়া তখনি টিকিট কিনিয়া আনিল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল, গাড়িতে কমলাকে উঠাইয়া দিল—কহিল, "মা, আমি পাশের কাম্‌রাতেই রহিলাম।"

কাশীষ্টেশনে নামিয়া কমলা উমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, এখন কোথায় যাই বল্ দেখি?"

উমেশ কহিল, "মা, তুমি কিছুই ভাবিয়ো না—আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় লইয়া যাইতেছি।"

কমলা। ঠিক জায়গা কিরে! তুই এখানকার কি জানিস্ বল্ দেখি?

উমেশ কহিল, "সব জানি। দেখ ত কোথায় লইয়া যাই।"

—বলিয়া কমলাকে একটা ভাড়াটে গাড়িতে তুলিয়া-দিয়া সে কোচ্‌বাক্সে চড়িয়া বসিল। একটা বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ি দাঁড়াইলে উমেশ কহিল—"মা, এইখানে নাম।"

কমলা গাড়ি হইতে নামিয়া উমেশের অনুসরণ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই উমেশ ডাকিয়া উঠিল—"দাদামশায়, বাড়ী আছ ত?"

পাশের একটা ঘর হইতে সাড়া আসিল—"কে ও, উম্‌শে না কি! তুই কোথা থেকে এলি?"

পরক্ষণেই হুঁকাহাতে স্বয়ং চক্রবর্ত্তি-খুড়া আসিয়া উপস্থিত। উমেশ সমস্ত মুখ পরিপূর্ণ করিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল। বিস্মিত কমলা ভূমিষ্ঠ হইয়া চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম করিল। খুড়ার খানিকক্ষণ মুখে আর কথা সরিল না;—তিনি কি যে বলিবেন, হুঁকাটা কোন্‌খানে রাখিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে কমলার চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত নতমুখ একটু-খানি উঠাইয়া কহিলেন—"মা আমার ফিরে এল! চল চল, উপরে চল!"

"ও শৈল, শৈল! দেখে যা, কে এসেছে!"

শৈলজা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। শৈল তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকে চাপিয়া-ধরিয়া তাহার ললাট-চুম্বন করিল। চোখের জলে দুই কপোল ভাসাইয়া-দিয়া কহিল, "মা গো মা! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয়!"

খুড়া কহিলেন—"ও সব কথা থাক্ শৈল, এখন উঁহার নাওয়া-খাওয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দাও!"

এমন-সময় উমা 'মাসি মাসি' করিয়া দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কমলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া-লইয়া বুকে চাপিয়া-ধরিয়া চুমা খাইয়া-খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

শৈলজা কমলার রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে টানিয়া লইয়া-গিয়া যত্ন করিয়া স্নান করাইল—নিজের ভাল কাপড় একখানি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিল। কহিল, "কাল রাত্রে বুঝি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই! চোখ বসিয়া গেছে যে! ততক্ষণ তুই বিছানায় একটু গড়াইয়া নে! আমি রান্না সারিয়া আসিতেছি!"

কমলা কহিল—"না দিদি, তোমার সঙ্গে, চল, আমিও রান্নাঘরে যাই।"

দুই সখীতে একত্রে রাঁধিতে গেল।

চক্রবর্ত্তিখুড়া অক্ষয়ের পরামর্শে যখন কাশীতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, শৈলজা ধরিয়া পড়িল—"বাবা, আমিও তোমাদের সঙ্গে কাশী যাইব।"

খুড়া কহিলেন—"বিপিনের ত এখন ছুটি নাই।"

শৈল কহিল—"তা হোক্, আমি একলাই যাইব। মা আছেন, উঁহার অসুবিধা হইবে না।"

স্বামীর সহিত এরূপ বিচ্ছেদের প্রস্তাব শৈল পূর্ব্বে কোনোদিন করে নাই।

খুড়াকে রাজি হইতে হইল। গাজিপুর হইতে যাত্রা করিলেন। কাশীষ্টেশনে নামিয়া দেখেন, উমেশও গাড়ি হইতে নামিতেছে। —"আরে, তুই এলি কেন রে!" সকলে যে কারণে আসিয়াছেন, তাহারো সেই একই কারণ। কিন্তু উমেশ আজকাল খুড়ার গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে—সে এরূপ অকস্মাৎ চলিয়া আসিলে গৃহিণী অত্যন্ত রাগ করিবেন জানিয়া সকলে মিলিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া উমেশকে গাজিপুরে ফিরাইয়া পাঠান। তাহার পরে কি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সে গাজিপুরে কোনোমতেই টিকিতে পারিল না। গৃহিণী তাহাকে বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বাজারের পয়সা লইয়া সে একেবারে গঙ্গা পার হইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত। চক্রবর্ত্তিগৃহিণী সেদিন এই ছোকরাটির জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া-ছিলেন।

ক্রমশ।

রামায়ণের রচনাকাল।

ভাষাবিচার।

"যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে কুশলো বিশেষে
শব্দান্ যথাবৎ ব্যবহারকালে।
সোঽনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র
বাগ্‌যোগবিৎ দুষ্যতি চাপশব্দৈঃ॥"

মানবসমাজে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। তাহা প্রধানত দ্বিবিধ;—নীরব ও সরব। ইঙ্গিত, চিত্র ও লিপি, ভাবপ্রকাশের নীরব উপায়। সরব উপায়ের সাধারণ নাম ধ্বনি। তাহা ব্যক্তাব্যক্তভেদে দ্বিবিধ। তাহাই সাধারণত ভাষানামে পরিচিত। প্রয়োগভেদে ভাষা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—সাহিত্যের ভাষা এবং কথোপকথনের ভাষা।

কথোপকথনের ভাষাই প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার তুলনায় সাহিত্যের ভাষা

অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উভয় ভাষার উৎপত্তি-স্থান এক হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের অভাব নাই। সাহিত্যের ভাষা সুসংযত; কথোপকথনের ভাষা অসংযত। সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্ত্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প; কথোপকথনের ভাষা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সাহিত্যের ভাষা দেশকালপাত্রের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহুদেশে বহুলোকের মধ্যে একভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু কথোপকথনের ভাষা তাহার পূর্ব্বেই দেশকালপাত্রভেদে নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রমশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যের ভাষা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; পুরাতন কথোপকথনের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে!

ভাষা প্রথমে সংস্কারশূন্য উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় কোনরূপ সাংসারিক কথোপকথনের প্রয়োজন সাধন করিত। সে ঠিক কতদিনের কথা, মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সংস্কার সাধিত হইয়া, সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া, মানবভাষা ক্রমশ উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছে। মানব-সমাজের সর্ব্বপুরাতন সাহিত্য ভারতবর্ষের সংস্কৃতসাহিত্য। তাহা কত পুরাতন, সভ্য-সমাজের সুধীগণ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য লালায়িত। তথাপি এ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই ঐতিহাসিক তথ্যরূপে স্বীকৃত হইবার উপযুক্ত হয় নাই। এখনও তাহার অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

সংস্কৃতভাষা কত পুরাতন, কে তাহার কালনির্ণয় করিবে? সেকালের কোন লিখিত ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। কতকালে ভাষা ধীরে ধীরে সংস্কারসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বা কে বলিবে? তাহারও কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বহু ব্যাকরণ প্রচলিত ও বিলুপ্ত হইবার পর, যে পাণিনীয় ব্যাকরণ অবশেষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা যে কত পুরাতন, তাহারও মীমাংসা করিবার উপায় নাই!

যে ভাষা মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন সাহিত্যরচনার পরিচয় প্রদান করিয়া, সভ্য-সমাজে ভারতবর্ষের নাম চিরগৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহা কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? তাহা কি কখনও কথোপকথনে ব্যবহৃত হইত না? এইপ্রকার মীমাংসা করিবার জন্য কৌতূহল প্রবল হইলেও, ইহার মীমাংসা করা সহজ বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পাণিনির সময়ে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহারই কিছু কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পাণিনিসূত্রে যে সকল শব্দের অনুশাসন সাধিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—পাণিনি ধ্বনি-মাত্রকেই "শব্দ"-শব্দের অন্তর্গত করেন নাই। ভাষ্যকার তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য ধ্বনিকে "শব্দ" ও "অপশব্দ" নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। অপশব্দ অশিষ্য; তাহার জন্য পাণিনিসূত্র রচিত হয় নাই। শব্দানুশাসনের জন্যই পাণিনিসূত্র রচিত হইয়াছিল। সুতরাং "শব্দ"-শব্দের অর্থ,—সংস্কৃত বা সাধু শব্দ।

অপশব্দ ব্যাকরণ হইতে নির্ব্বাসিত

হইলেও, জনসমাজের কথোপকথন হইতে নির্ব্বাসিত হইতে পারে নাই। বরং শব্দ অপেক্ষা অপশব্দের সংখ্যাই যে অধিক ছিল, ভাষ্যকার তাহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।* লোকে কথোপকথনে অপশব্দের ব্যবহার করিত; তথাপি তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা ছিল। প্রধান চেষ্টা অপশব্দ-ব্যবহারের নিন্দা। তাহা ম্লেচ্ছাচার বলিয়া নিন্দিত!

একালের সভ্য ও অসভ্য শব্দের ন্যায় সেকালের আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ লোকসমাজের দ্বিবিধ অবস্থার পরিচয় প্রদান করিত। আর্য্য-অনার্য্যের প্রভেদ অদ্যাপি পৃথিবী হইতে দূরীকৃত হয় নাই। এখনও সভ্য-সমাজ অসভ্যনাম গ্রহণ করিতে অসম্মত। সেকালের আর্য্যগণ আর্য্যত্বরক্ষার্থ ইহা অপেক্ষাও লালায়িত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে নানা বিষয়ে অনার্য্যের সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ যত্ন করিতে হইত।

প্রধান পার্থক্য ভাষায়। কে শিক্ষিত সুসভ্য, কে অশিক্ষিত অসভ্য, কথোপকথনেই তাহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আর্য্যগণ যে কথোপকথনেও পার্থক্যরক্ষার্থ যত্নশীল ছিলেন, তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই। পাণিনিসূত্র এই অনুমানের পক্ষসমর্থন করে।

পাণিনি সমগ্র সংস্কৃতশব্দকে "ছন্দস্" ও "ভাষা" নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। "ছন্দস্" যে সাহিত্যের ভাষা, কথোপকথনের নহে; তাহা বুঝিতে কোনও ইতস্তত হয় না। পাণিনি যাহাকে "ভাষা" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কি কেবল সাহিত্যের ভাষা? পাণিনি ভাষা-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। উত্তর-কালের অনেক টীকাকার তাহাকে লোক-সমাজের "কথোপকথনের ভাষা" বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।† এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইলে, পাণিনির সময়ে কথোপকথনে আর্য্যসমাজে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু উত্তরকালের টীকাকারের ব্যাখ্যা ধরিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা সকলে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবেন না। অন্য প্রমাণের আবশ্যক। কারণ, অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"সংস্কৃতভাষার গঠন-প্রণালীই এরূপ সিদ্ধান্তের প্রধান অন্তরায়। সমুচিত শিক্ষা ভিন্ন যে ভাষা অধিগত হয় না, সে ভাষায় কথোপকথন সম্পাদন করা সহজ নহে।" এ বিষয়ে একালের অভিজ্ঞতা লইয়া বিচার করিলে চলিবে না। আমরা একালের লোক; ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া বহুক্লেশে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করি। আমাদের পক্ষে সে ভাষায় কথোপকথন সম্পাদন করা সহজ হয় না। কিন্তু সংস্কৃতভাষাই যখন আর্য্যসমাজের চিরপরিচিত ভাষা ছিল, তখন আর্য্যসমাজের পক্ষে সে ভাষা শিক্ষা করা বা তাহাতে কথোপকথন সম্পাদন করা এরূপ কঠিন ছিল না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পক্ষে সংস্কৃতে কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার করিবার প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও প্রচলিত ছিল। এদেশে যখনই পুনরায়

---

* ভূয়াংসোঽপশব্দা অল্পীয়াংসঃ শব্দাঃ। একৈকস্য হি শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ॥

† ভাষিতে লোকোঽনয়া পরিপাট্যা ইতি বৃত্তিকারাচার্য্যাঃ॥

আর্য্যগৌরবসংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, তখনই সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ"নামক অলঙ্কারশাস্ত্রে ইহার একটি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।* বিক্রমাদিত্যের সময়ে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত হইত। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃতে কথোপকথন করিতেন, এই কথা ব্যক্ত করিবার জন্য বলা হইয়াছে—"কে না সংস্কৃতে কথোপকথন করিত?" ইহা অতিশয়োক্তি হইলেও, কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করাই যে মুখ্যকল্প হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

অন্যদেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা বিষয়ে পার্থক্য আছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বানুশীলনের সময়ে সেই পার্থক্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। অন্যদেশের ইতিহাস ক্রমোন্নতির ইতিহাস; ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ক্রমোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পর, অবনতির সূত্রপাত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি পুরাকাল হইতেই তাহার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা ভারতবর্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া, জ্ঞানগৌরবের সমুচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তখন আর্য্যমাত্রেই সুশিক্ষায় সমুন্নত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ হইতে চাহিতেন না; প্রাণপণে আর্য্যাচার রক্ষা করিতেন; কথোপকথনেও অনার্য্যের সহিত পার্থক্যরক্ষার্থ যত্নশীল হইতেন। তৎকালে তাঁহাদের পক্ষে সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিবার চেষ্টা করা বিচিত্র নহে; তাহাই বরং স্বাভাবিক। শাস্ত্রেও তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।†

সেকালের ভারতবর্ষের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের আচারব্যবহারের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—জ্ঞানানুশীলনই ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিতেন—

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ।"

ব্রাহ্মণকে বিনা কারণেই ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিতে ও ধর্ম্ম জানিতে হইবে। এই শাস্ত্রশাসনের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণকে তাঁহার পদমর্য্যাদারক্ষার্থই সুশিক্ষিত হইতে হইবে। একদা এই শাস্ত্রশাসন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণসমাজে শিক্ষার প্রভাব এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দীর অধঃপতনের পরেও, অদ্যাপি নিরক্ষর ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত বিরল! সেকালে নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শশবিষাণের ন্যায় অপরিচিত ছিল।

ব্রাহ্মণকে যে মহোচ্চপদবী প্রদান করিয়া পুরাতন ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের চরণে আত্মবিক্রয় করিতে লজ্জিত হয় নাই, ব্রাহ্মণের পক্ষে সে পদমর্য্যাদা রক্ষা করা সহজ হয় নাই,—তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মানবজীবনে ভূদেবরূপে জনসমাজে বিচরণ করিতে হইত। কালে ব্রাহ্মণের অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার গতিরোধের জন্য শাস্ত্র নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া-

* কালে শ্রীসাহসাঙ্কস্য কে ন সংস্কৃতবাদিনঃ।

† ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ।

ছিলেন। উত্তরকালের ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সংস্কৃত-ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া বোধ হয় না; অভ্যাসদোষে যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও অপশব্দ ব্যবহার করিয়া বসিতেন। তাহার জন্ম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল।* ব্রাহ্মণকে তাঁহার পবিত্র পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্ম উত্তরকালের মনীষিগণ নানারূপে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের আরম্ভেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ভারতবর্ষের আর্য্য-সমাজ বিনা প্ররোচনায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত, সেই ভারতবর্ষে বসিয়া পতঞ্জলি ব্যাকরণ-অধ্যয়নের প্রয়োজনসংস্থাপনার্থ গ্রন্থা-রম্ভেই দীর্ঘবক্তৃতার অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিব কেন? এই প্রশ্নের অবতারণাই অধঃপতনের সূচনা করিতেছে! পতঞ্জলি প্রাণপণে ব্যাকরণ-অধ্যয়নের বিবিধ-প্রয়োজন-সংস্থাপনের জন্ম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি তর্ক এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। তাহা তর্ক নহে; তাহার নাম উত্তেজনা। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আর কোন কারণে না হউক, আমরা ম্লেচ্ছ না হইয়া পড়ি, এইজন্যই আমাদিগকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে! †

আর্য্যসন্তানের পক্ষে ম্লেচ্ছ হইয়া পড়া নিরতিশয় নিন্দার বিষয় বলিয়া পরিচিত না থাকিলে, ব্যাকরণ-অধ্যয়নের জন্ম এইরূপ তর্কে উত্তেজনা করিবার চেষ্টা হইত না!

পাণিনির সময়ে আর্য্যসমাজে কথোপ-কথনেও সংস্কৃতশব্দ ব্যবহৃত হইত; কাত্যায়নের সময়ে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষার ব্যবহার না করিলে কি কি ক্ষতি হয়, তাহার আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল; পতঞ্জলির সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে কথোপকথনেও সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিবার রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়া-ছিল। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির যুগে কথোপকথনের ভাষায় এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ রচিত হইবার সময়ে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহার মীমাংসা করিতে পারিলে, রামায়ণ কোন্ সাহিত্যযুগের গ্রন্থ—তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে। রামায়ণে এ বিষয়ে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

রামায়ণে এই বিষয়ের প্রমাণের আধিক্য না থাকিলেও, অভাব থাকা স্বীকার করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে যে দুইএকটি প্রমাণ প্রক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহাতে রামায়ণরচনাকালে শিক্ষিতসমাজের কথোপ-কথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইবারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইল্বলনামক রাক্ষস ব্রাহ্মণ সাজিয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আহার করিত। সে যখন নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইত, তখন সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিত। যথা—

"ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপম্ ইল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥" ৩।১১।৫৬॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন,—ইল্বল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-

* আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।
†. ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

অপরের মনে বিশ্বাস-উৎপাদনার্থই ব্রাহ্মণবৎ সংস্কৃতবাক্য ব্যবহার করিত। * ইহা দ্বারা রামায়ণরচনাকালে ব্রাহ্মণসমাজের নিমন্ত্রণ-রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পরিচয় কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হওয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণ সাজিতে হইলে বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট হইত না; ভাষাকেও ব্রাহ্মণের উপযোগী করিয়া লইতে হইত। এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট। তথাপি রামায়ণে আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে রামলক্ষ্মণের সহিত হনুমানের প্রথম কথোপকথন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সীতাবিরহিত রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূকপর্ব্বতসন্নিকটস্থ পম্পা-সরোবরের নিসর্গসুন্দর তটান্তদেশে উপনীত হইলেন, তখন বালিভয়সন্ত্রস্ত গৃহনির্ব্বাসিত হৃতসর্ব্বস্ব সুগ্রীব ঋষ্যমূকে লুকায়িত ছিলেন। তিনি রামলক্ষ্মণকে বালিপ্রেরিত গুপ্তচর মনে করিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া বানরসেনাও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; প্রাণ-ভয়ে ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল; যে যেখানে ছিল, সকলেই সুগ্রীবের সম্মুখে করজোড়ে সমবেত হইয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিল! কেবল এক বীর অচল-অটল-ভাবে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন, তিনি মহাবীর আঞ্জনেয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব।
তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্‌॥" ৪।২।১৫॥

যাহার ভয়ে তুমি এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছ, সেই ক্রূরদর্শন বালিকে ত এখানে দেখিতেছি না;—তবে এত সন্ত্রস্ত হইয়াছ কেন? হনুমানের এই উক্তিতে ফল হইল না দেখিয়া, তিনি পুনরায় ধিক্‌কারে সুগ্রীবের আত্মমর্য্যাদা প্রবুদ্ধ করিবার আশায় বলিতে লাগিলেন—

"অহো! শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম!
লঘুচিত্ততয়াত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ॥" ৪।২।১৭॥

হায়! তুমি যে শাখামৃগ, তাহাই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে! লঘুচিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া সঙ্কল্পাত্মক বুদ্ধিতে স্থির হইতে পারিতেছ না। ইহাতেও ফল হইল না। তখন হনুমান্‌ পুনরায় বলিলেন—

"বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্ব্বমাচর।"

যাহা করিবে, বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন কৌশলে তাহা সাধন কর। এই শেষ কথা সুগ্রীবের মনঃপূত হইল। তিনি হনুমান্‌কেই তথ্য-নির্ণয়ার্থ দৌত্যকার্য্যে বরণ করিলেন। তখনও প্রাণের ভয় দূর হয় নাই; তাই তিনি হনুমান্‌কে ছদ্মবেশে গমন করিবার পরামর্শ দিয়া বলিলেন—

"তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম।"

তুমি যাও, এই মানবযুগল কে, তাহার সন্ধান লও; কিন্তু "প্রাকৃতজনের" ন্যায় গমন কর। প্রাণের ভয়েই সুগ্রীব এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এস্থলে "প্রাকৃতেনেব"পদের ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন,—"উদাসীনেনেব।" তাহাতে ভাবার্থ পরিস্ফুট হয় না। 'উদাসীনের ন্যায় গমন কর' বলিলে, দুইপ্রকার অর্থবোধ হইতে পারে;—(১) প্রাণের আশা বিস-

* ব্রাহ্মণরূপং ব্রাহ্মণসদৃশবেষম্‌। সংস্কৃতং বদন্‌ ব্রাহ্মণবদিতি শেষঃ। এতদুভয়ং বিশ্বাসার্থম্‌।

ধন করিয়া যাও; (২) সন্ন্যাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে গমন কর। উভয় অর্থই ভাব-প্রকাশে অসমর্থ। এস্থলে দূতের প্রাণরক্ষার কৌশল-উদ্ভাবনার্থই সুগ্রীব ছদ্মবেশের উপদেশ দিয়াছিলেন; রামচন্দ্রও জানিতে পারিবেন না, অথচ কৌশলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তাই সুগ্রীব হনুমান্‌কে অশিক্ষিত পল্লিবাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সুগ্রীবের আশঙ্কা ছিল,—চরের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইলেই, চর বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাহাকে নিশ্চয় নিহত করিবে। তিনি তজ্জন্যই 'বোকা সাজিয়া' গমন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। এখানেও প্রাণের ভয় সুগ্রীবের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়াছিল। হনুমান্ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রাণের ভয় না থাকিলেও সত্যসংবাদসংগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রাকৃতজনের ছদ্মবেশে গমন করিলে, রামচন্দ্র অবজ্ঞাবশত সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন; তাঁহার পক্ষেও সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অবসর উপস্থিত হইবে না। তাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও, সুগ্রীবোপদিষ্ট প্রাকৃতবেষ ধারণ করিলেন না; ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের সমীপস্থ হইলেন। যথা—

"কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ॥" ৪।৩।২॥

এখানে "ভিক্ষুরূপের" ব্যাখ্যায় টীকাকার "প্রাকৃততাপসরূপং" লিখিয়া সুগ্রীবের উপদেশের সহিত হনুমানের কার্য্যের সামঞ্জস্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়া ভাবার্থ পরিস্ফুট হইবার বাধা প্রদান করিয়াছেন। আধুনিক "তিলকটীকার" এই ব্যাখ্যা মহাত্মা তুলসীদাসের ভাষারামায়ণের অনুরূপ। সেখানে সুগ্রীব যাহা বলিয়াছেন, হনুমান্ যন্ত্রের ন্যায় তাহাই করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"অতি সভীত কহ সুন হনুমানা।
পুরুষ-যুগল বল-রূপ-নিধানা॥
ধরি বটুরূপ দেখউঁ জাঈ।
কহি সুজান। জিয় সৈন বুঝাঈ॥
বিপ্ররূপ ধরি কপি তঁহ গয়উ।
মাথ নায় পুঁছত অস ভয়উ॥"

বাল্মীকিবর্ণিত হনুমান্ এরূপ প্রকৃতির পাত্র ছিলেন না। তিনি কিজন্য ভিক্ষুরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভিক্ষুর ভাষা—সংস্কৃতভাষা—ব্যবহার করিয়া, রামচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণে কার্য্যসিদ্ধির আশায়, হনুমান্ সুগ্রীবের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে ভিক্ষুরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে "ভিক্ষু" বলিতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী "প্রাকৃত-তাপস" বুঝাইত; তাঁহারা প্রাকৃতভাষাই ব্যবহার করিতেন। এস্থলে সেই আধুনিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, পুরাতন গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পদে পদে ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিলকটীকায় এরূপ ব্যাখ্যাবিভ্রাটের অভাব নাই।

ভিক্ষুশব্দ পাণিনিসূত্রের নানা স্থানে উল্লিখিত। বৌদ্ধগণ ঐ শব্দের সৃষ্টি করেন নাই; প্রচলিত সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণিনিসূত্রে যে ভিক্ষুশব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রসঙ্গক্রমে সেই ভিক্ষুগণের শিক্ষাদীক্ষারও কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সনাশংসভিক্ষ উঃ॥৩।২।১৬৮॥

এই সূত্রানুসারে "ভিক্ষু"শব্দের ব্যুৎপত্তি

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সন্-প্রত্যয়ান্ত ধাতুর উত্তর এবং আশংস ও ভিক্ষ এই দুইটি ধাতুর উত্তর "তাচ্ছীল্যার্থে" উ-প্রত্যয় হয়। তদনুসারে চিকীর্ষু, আশংসু ও ভিক্ষু শব্দের উৎপত্তি। সূত্রানুসারে ভিক্ষুশব্দের অর্থ— ভিক্ষাশীল। সুতরাং যে-কোন ভিক্ষাশীলকেই "ভিক্ষু" বলা যাইতে পারে। অন্যান্য সূত্র না থাকিলে, এই সিদ্ধান্তই প্রবল হইত। কিন্তু অন্য সূত্রে ভিক্ষুর পরিচয় থাকায়, ভিক্ষুকমাত্রকেই "ভিক্ষু" বলা যায় না।

পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ ॥৪।৩।১১০॥

পারাশর্য্যপ্রোক্ত ভিক্ষুসূত্র এবং শিলালিপ্রোক্ত নটসূত্র অধ্যয়ন করিয়া যাঁহারা ব্যুৎপন্ন হইতেন, এই সূত্রে তাঁহাদের কথাই উক্ত হইয়াছে।

পারাশর্য্যের ন্যায় কর্ম্মন্দ-প্রোক্ত "ভিক্ষুসূত্র" এবং শিলালির ন্যায় কৃশাশ্ব প্রোক্ত "নটসূত্র" প্রচলিত থাকার কথা পরসূত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে জানিতে পারা যায়,—সেকালের "ভিক্ষু" একশ্রেণীর অধ্যয়নশীল সন্ন্যাসী; তাঁহারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করিতেন বলিয়া, "ভিক্ষু"নামে কথিত। তাহার অর্থ—বিলাতী "ভ্যাগাবণ্ড" নহে! হনুমান্ রামলক্ষ্মণের নিকট ভিক্ষুর ছদ্মবেশে উপনীত হইয়া, ছদ্মবেশের মর্য্যাদারক্ষার্থ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিয়া, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের স্বতন্ত্র সূত্র ছিল; সাধারণত ভিক্ষুগণের পক্ষে তাহার অধিক অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত না। হনুমানের কথোপকথনে তাহারও অধিক শাস্ত্রাধ্যয়নের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন—

"নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্ব্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্ ॥" ৪।৩।২৮॥

যিনি ঋগ্বেদে বিনীত হন নাই, যজুর্ব্বেদ ধারণ করেন নাই, সামবেদ জ্ঞাত হন নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপভাবে বাক্যোচ্চারণ করা সম্ভব নহে। এই শ্লোকোক্ত "বিনীত"শব্দের ব্যাখ্যায় তিলকটীকাকার "প্রাতিশাখ্যের" উল্লেখ করিয়াছেন।

"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্ ॥" ৪।৩।২৯ ॥

রাম আরও বলিলেন,—এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বহুপ্রকারে সমগ্র ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছে; অনেক কথোপকথনের মধ্যেও কিছুমাত্র অপশব্দ ব্যবহার করে নাই। এই বর্ণনায় সেকালের কথোপকথনে অপশব্দ পরিহার করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করিতে পারা যে জনসমাজের শ্রদ্ধা-আকর্ষণের উপায় বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণ সেই সমুন্নত শিক্ষাযুগের মহাকাব্য। এ বিষয়ে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

সেকালে কোন্ শ্রেণীর নরনারী কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, তাহার প্রধান প্রমাণ—ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র। অধ্যাপক ওয়েবর্‌প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেও, তাহাকে দ্বিসহস্র বৎসরের পরকালবর্ত্তী বলিতে সাহস করেন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে নটসূত্র যে কত পুরাতন, পাণিনিসূত্রেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তথাপি তাহাকে নৃত্যশাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টার

ত্রুটি হয় নাই! নট ও নাট্যশালা যে নর্ত্তক ও নৃত্যাগার নহে, তাহা সংস্কৃতজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করিবেন। নাট্যশালায় নৃত্য হইত, নট নৃত্য করিত; তথাপি নটের নাম "নর্ত্তক" এবং নাট্যশালার নাম "নৃত্যাগার" বলা যায় না। নৃত্য অভিনয়ের অঙ্গীভূত ছিল। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য কত পুরাতন, এস্থলে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক। তাহা পুরাতন হউক বা আধুনিক হউক, তাহাতে সমাজচিত্র সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্য ঐতিহাসিকের নিকট অধিক আদরের সামগ্রী। ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের অধিকাংশ গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল গ্রন্থের নাম সুপরিচিত, তাহারও সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই! একদা ভারতীয় নাট্যসাহিত্য যে কিরূপ বিপুলাকার ধারণ করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র নাট্যসাহিত্য "রূপক" ও "উপরূপক" নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত ছিল। আগে রূপক, তাহার পর উপরূপক। ভরতপ্রণীত "নাট্যশাস্ত্রে" রূপকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, উপরূপকের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রূপক দশ শ্রেণীতে ও উপরূপক অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীতে যে বহুগ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল, তাহা অতিশয়োক্তি নহে। বহু গ্রন্থ না থাকিলে, শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। এই সকল রূপক ও উপরূপকের নানা গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া, নাট্যকোবিদ স্বনামখ্যাত শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছেন। তাহাতে সেকালের লোকব্যবহারের নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়াছে। কিন্তু সেকালে কোন্ শ্রেণীর লোকে কথোপকথনে কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিত, অনূদিত গ্রন্থে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য মূলগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহাতে কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

শ্রব্যকাব্য অধীত হইত; দৃশ্যকাব্য অধ্যয়নার্থ বিরচিত হইত না। তাহা নরনারীর সম্মুখে অভিনীত হইত। প্রত্যক্ষবৎ লোকব্যবহারের অভিনয় করিয়া, আনন্দের সঙ্গে শিক্ষাদান করাই নাট্যসাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল ব্যবহার লোকসমাজে অপরিচিত ছিল, নাট্যাভিনয়ে পাত্রপাত্রীগণ সেরূপ ব্যবহার করিলে, অভিনয়ের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবার কথা। নাট্যসাহিত্যের পাত্রপাত্রীগণ উত্তম ও অধম নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তম পাত্রের সংস্কৃতে, অধম পাত্রের প্রাকৃতভাষায় কথোপকথন করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাত্রীগণ সাধারণত প্রাকৃতভাষাই ব্যবহার করিতেন; বিশেষ প্রয়োজনে সংস্কৃতভাষাব্যবহারেরও নিয়ম ছিল। তাপসীগণ উত্তম পাত্রের ন্যায় সংস্কৃতভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। নাট্যসাহিত্যের এই রচনারীতি লোকব্যবহারের বিশিষ্ট প্রমাণ। রূপকে সংস্কৃতের বাহুল্য; উপরূপকে প্রাকৃতের প্রাবল্য। দুই শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য দুইটি সাহিত্যযুগের রচনারীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাহাতে পুরাকালের কথোপ-

কথনে সংস্কৃতভাষার প্রাধান্য এবং উত্তরকালের কথোপকথনে প্রাকৃতভাষার প্রাধান্য প্রকটিত হইতেছে। সংস্কৃতভাষা কথোপকথনে কদাপি ব্যবহৃত হইবার রীতি না থাকিলে, নাট্য-সাহিত্যে এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইতাম না।

লোকব্যবহার নানা ভাগে বিভক্ত। রাজদ্বারে, সজ্জনসমাজে, ক্রয়বিক্রয়ব্যাপারে, গৃহকার্য্যে, নানা স্থানে নানা কার্য্যে নানা ভাবে নরনারীকে কথোপকথন সম্পাদন করিতে হয়। সকল স্থানে ও সকল কার্য্যেই একপ্রকারের ভাষা ব্যবহার করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

আমরা নিরক্ষর ভৃত্য বা পল্লিবাসী কৃষক ও শ্রমজীবীর সহিত যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকি, গৃহে, সজ্জনসমাজে বা বিচারালয়ে সেরূপ ভাষায় কথোপকথন করিতে পারি না। প্রয়োজনের অনুরোধেই ভাষার পার্থক্য রক্ষা করিতে হয়। সেকালে যে এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত। এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূল কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজদ্বারে সংস্কৃতভাষাই প্রযুক্ত হইবার নিয়ম ছিল। অদ্যাপি যে সকল পুরাতন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া, আমাদিগকে সেকালের রাজাজ্ঞার মর্ম্মঘোষণা করিয়া, পুরাতত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিতেছে, তাহাতে সংস্কৃতভাষারই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।* সুতরাং রাজকার্য্যে ও বিচারালয়ে যে সংস্কৃতভাষাই ব্যবহৃত হইত, তাহাতে সংশয় নাই। শাস্ত্রীয়বিচারে সজ্জনসমাজে অদ্যাপি সংস্কৃতভাষাব্যবহারের রীতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। এই রীতি, পুরাকালে প্রবল ছিল। এই সকল কারণে, সেকালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যাবহারিক কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত থাকাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ভারতবর্ষের পুরাতন কথোপকথনের ভাষা কিরূপ ছিল, তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় "রয়াল এশিয়াটিক্ সোসাইটি" নামক সুধীসমিতিতে নানা আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহাদের তর্কবিতর্ক এক্ষণে প্রবন্ধাকারে সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে কথোপকথনে সংস্কৃতভাষা ব্যবহৃত হইবার রীতি তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কথোপকথনের ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সুতরাং কোনকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃতভাষা নিয়ত কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবার রীতি থাকিলেও, তাহা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতভাষার মর্য্যাদাবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। কোন্ সময়ে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিতে পারিলে, পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসসঙ্কলনের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

কাত্যায়নের যে "ভ্রাজা-শ্লোক" রচনা করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি শ্লোক "মহাভাষ্যে" উদ্ধৃত হইয়াছে। "মহাভাষ্যের" টীকাকার মহামহোপাধ্যায় জৈয়টাত্মজ কৈয়ট তাহাকে "কাত্যায়ন-

* পালিভাষানিবদ্ধ অশোকশাসনকে রাজশাসন বলা যায় না; তাহা ধর্ম্মশাসনলিপি।

বিরচিত" বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।* তাহা এই প্রবন্ধের শিরোভাগ অলঙ্কৃত করিতেছে। ঐ শ্লোকে কাত্যায়নের সময়ে কথোপকথনের রীতি কিরূপ ছিল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাতে অপশব্দপ্রয়োগের নিন্দা এবং যথাবৎ ব্যবহারকালে সাধুশব্দপ্রয়োগের শুভফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাত্যায়নের সময়ে ভারতবর্ষ শিক্ষাদীক্ষা ও লোকব্যবহারে পূর্ব্বাবস্থা হইতে কিয়ৎপরিমাণে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল-প্রতাপ ভারতবর্ষের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রধাবিত হইয়াছে। যে প্রাকৃতভাষা পুরাকালে সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ব্যবহৃত হইত না, তাহাই ধর্ম্মপ্রচারে, শাস্ত্রবিচারে ও সাহিত্যরচনায় প্রচলিত হইতেছিল। এই বিপ্লবযুগে আর্য্যসমাজ বেদরক্ষার্থ, আর্য্যাচাররক্ষার্থ, পূর্ব্বগৌরবরক্ষার্থ নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "ভ্রাজা"শ্লোকের অপশব্দনিন্দায় ও সাধুশব্দপ্রশংসায় তাহারই ক্ষীণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথাপি সজ্জনসমাজের কথোপকথনেও ক্রমে ক্রমে প্রাকৃতভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া, কালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনেও তাহা স্থানলাভ করিয়াছিল। সে পরিবর্ত্তনযুগে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা যুগপৎ ব্যবহৃত হইবার কথা। কারণ, পরিবর্ত্তনবেগ যতই প্রবল হউক, তাহা পূর্ব্বরীতিকে সহসা ভাসাইয়া-লইয়া যাইতে পারে না। নূতন আসিয়া পুরাতনের সঙ্গে মিলিত হইলে, কিছুদিন একসঙ্গে অবস্থানের পর, নূতনের উজ্জ্বলালোকে পুরাতনের ক্ষীণপ্রভা ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃতসাহিত্যে এই পরিবর্ত্তনযুগের কথোপকথনের ভাষার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রমাণ "নিরুক্ত-পরিশিষ্টের" ভাষ্যকারের লেখনীপ্রসূত। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত "দেবভাষা" এবং প্রাকৃত "মানুষী ভাষা" নামে কথিত হইত। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ কথোপকথনে কিরূপ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া, "নিরুক্ত-পরিশিষ্ট"-ভাষ্যকার লিখিয়া গিয়াছেন,—তৎকালে ব্রাহ্মণগণের কথোপকথনে উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত—

"যা চ দেবানাং যা চ মানুষাণাম্।"

কথোপকথনের ভাষার এইরূপ পরিবর্ত্তনের ন্যায় সাহিত্যের ভাষারও নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। সাহিত্যের ভাষায় পরিবর্ত্তনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও, দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর, নানা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। রচনারীতি চিরকাল একরূপ থাকে না; ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিবার পূর্ব্বে রচনারীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রচনারীতি দেশকালপাত্রভেদে পৃথক্ না হইয়া পারে না। একই দেশে একই কালে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের রচনারীতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাহা ব্যক্তিগত পার্থক্য। তদ্দ্বারা কোন ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্যের ন্যায়, কালগত পার্থক্যও দেখিতে

* কাত্যায়নোপনিবদ্ধভ্রাজাখ্যশ্লোকমধ্যপঠিতস্য যস্য শ্রুতিরনুগ্রাহিকাস্তি। ইতি কৈয়টঃ।

পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা সম্ভব।

"এক যুগে সরল সুললিত বাক্যবিন্যাসের প্রভাব; অন্য যুগে আবার নিরতিশয় দুরূহ আড়ম্বরপূর্ণ রচনাবলীর প্রাদুর্ভাব;—ভারতীয় সংস্কৃতসাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এক যুগে রূপক অপেক্ষা সহজ বর্ণনার আধিক্য; অন্য যুগে সকল বর্ণনার মধ্যেই রূপকের আতিশয্য;—ইহার প্রমাণও নিতান্ত দুর্লভ নহে। এক যুগে এক শব্দের একরূপ অর্থ; অন্য যুগে সেই শব্দের অন্যরূপ অর্থ;—তাহারও নানারূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল পার্থক্য ব্যতীত, সংস্কৃতসাহিত্যে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এক যুগে যে শব্দ কেবল বৈদিক সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত না; অন্য যুগে তাহাই ভাষাসাহিত্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক যুগে যাহা ভাষাসাহিত্যে ব্যবহৃত হইত, অন্য যুগে তাহার ব্যবহার বিলুপ্ত বা পরিবর্ত্তিত হইবারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণে এই সকল রচনারীতির পার্থক্যের অভাব নাই। পাণিনিসূত্রের সহিত পরবর্ত্তী বার্ত্তিক ও ভাষ্যের সমালোচনা করিলে, বিভিন্ন সাহিত্যযুগের রচনারীতির বিবিধ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়;—রামায়ণের সঙ্গে বার্ত্তিক, ভাষ্য ও পাণিনিসূত্রের সমালোচনা করিলেও, সেইরূপ নানা পার্থক্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই সকল পার্থক্য বিচার করিতে পারিলে, রামায়ণ কোন্ সাহিত্যযুগের গ্রন্থ, তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাষাবিচার নিরতিশয় শ্রমসাধ্য দুরূহ ব্যাপার। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি না। যে-পরিমাণ অধ্যয়নলব্ধ অভিজ্ঞতা থাকিলে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার অভাবে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে, অনধিকারচর্চ্চার অন্যায় অত্যাচারে মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইবারই আশঙ্কা উপস্থিত হয়!

রামায়ণের ভাষার বিশেষত্ব কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, বহুবার রামায়ণের আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। প্রথম অধ্যয়নে তাহা প্রতিভাত না হইতে পারে; ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যাহা সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা সচরাচর "আর্ষপ্রয়োগ"নামে সুপরিচিত। রামায়ণে এই শ্রেণীর প্রয়োগের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ষপ্রয়োগের প্রচলিত অর্থ—ঋষির প্রয়োগ। বাল্মীকি ভারতবর্ষের শেষ ঋষি হইলে, আর্ষপ্রয়োগ-অবলম্বনে রচনাকালনির্ণয়ের চেষ্টা করা সহজ হইত। কিন্তু বাল্মীকির পরেও ঋষিলিখিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

"আর্ষপ্রয়োগ"নামে যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা ঋষিমাত্রের পদমর্য্যাদাগত রচনারীতি হইলে, তদ্দ্বারা রচনাকাল নির্ণয় করা অসম্ভব। তদ্দ্বারা কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে,—এই গ্রন্থ সাধারণ লেখকের লেখনীপ্রসূত নহে; ইহা ঋষিপ্রণীত। কিন্তু যাহা সচরাচর "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহা কি কেবল ব্যক্তিগত রচনারীতি? রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, এই সিদ্ধান্ত

স্বীকার করা যায় না। "আর্ষপ্রয়োগ" হইতে কালগত রচনারীতিরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আর্ষপ্রয়োগ" টীকাকারগণের সহজ ব্যাখ্যা। কোন প্রয়োগকে "আর্ষ-প্রয়োগ" বলিয়া দিলে, পাঠক আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক সে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহাকে "আর্ষপ্রয়োগের" প্রয়োজন, নিয়ম ও মূলকারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রামায়ণের যে সকল প্রয়োগ "আর্ষপ্রয়োগ" বলিয়া পরিচিত, তাহার আলোচনা না করিয়া, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসঙ্গত। রামায়ণের ভাষা-বিচারের প্রথম বিষয়—"আর্ষপ্রয়োগ"। অতঃপর সর্ব্বাগ্রে তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

প্রার্থনা।*

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতম পিতৄণাম্, এই সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য দশদিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমহুতাশনের ঊর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কি শান্তিতে, কি অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগ্নীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়,

* স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধসভায় বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি!

আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কি দুঃখ, কি চিন্তা, কি চেষ্টা, কি দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতি রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময় তাহাদের মত অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শান্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্তত্তা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কি করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিষস্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়িবন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় ত

কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল—তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিগুলিকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন; কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেম্নি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনিদরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে

পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কি পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে, ধর্ম্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া, সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না,—ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদ-বিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া-দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মান-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব!

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের

আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধীরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক্, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক্!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।*

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা একান্ত কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যপরিষদের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু পারিভাষিক হিন্দুধর্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। এবং পরম আহ্লাদের বিষয় যে, সেই সনাতন ধর্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে,

* গত ২২শে মাঘ জেনেরেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ হলে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত শোকসভায় লেখককর্ত্তৃক পঠিত।

আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্ম্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে ঊর্দ্ধে দেবলোকে; ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজে কর্ম্মরূপ ফুল-ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মানব-জীবনের যাহাতে স্ফূর্ত্তি ধর্ম্মের তথায় অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্ত্তি, অতএব সাহিত্য ধর্ম্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্ম্মের অভিপ্রায় - সাহিত্য লোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিয়া, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়,—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব-পিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; এবং আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের ব্যবহার-সম্পাদনার্থ যে-কিছু লৌকিকসাহিত্য বর্ত্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্চ্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত-পুস্তক-মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম্ম তখন মূর্ত্তিমান্ হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতির আনুকূল্যের জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তর স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না, আমরা স্বদেশীকে বিদেশীয় ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই এই অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্ব্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজজীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই

জানেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কি উৎকট ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সেদিন 'সঞ্জীবনী'-পত্রিকায় পড়িতেছিলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না; এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধিরূপে দেখিতে পাই। অন্য উদাহরণের উল্লেখের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়িভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্য্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্য-ভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারতসমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহার তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতসমাজের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন, ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণস্বরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্যক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, 'সার সত্যের আলোচনা'য় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ'এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্ত্তব্যপথ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্মরণ-চিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়-দেশ অলঙ্কৃত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নবজীবনের আদর্শ। *

তত্ত্ববিদ্যাসভার দ্বাদশবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সভার নামে সভ্য ও সুহৃদ্বর্গের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সবিনয়ে ও সাদরে অভিবাদন করিতেছি। আপনাদিগের আন্তরিক শুভ-ইচ্ছা দ্বারা এই সভাকে সংবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

বর্ত্তমানযুগের ধর্ম্মের আদর্শকে, তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে, উভয় দিকেই, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মই সেই যুগের বিজ্ঞান ও দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করে। কিন্তু কোন প্রাচীনযুগের অন্তিম ও নবযুগের আরম্ভকালে, যুগসন্ধি ও যুগান্তর উপস্থিত হইলে, সর্ব্বথাই প্রাচীনধর্ম্মের সঙ্গে নূতন বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপেই যুগে যুগে ধর্ম্মসমস্যা উৎপন্ন হয়, এবং এই সমস্যা ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে নবযুগের উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন আয়োজনও আবশ্যক হইয়া উঠে। তত্ত্ববিদ্যাসভা এই ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই দ্বাদশবর্ষকাল নিষ্ঠাসহকারে এই লক্ষ্যেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা এই চেষ্টাকে হীনচক্ষে দর্শন করেন,—যুক্তিতর্কের শুষ্ক-কঙ্করচর্ব্বণ জ্ঞানে ইহার বিচার ও আলোচনার প্রতি যাঁহারা উপেক্ষাপ্রদর্শন করেন,—ভক্তির স্ফুরণ ও অধ্যাত্মজীবনের পরিপুষ্টিসম্পাদনের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ আলোচনাকে যাঁহারা অনাবশ্যক মনে করেন,—তাঁহারা অধ্যাত্মজীবনের অজ্ঞ অভিমানে পূর্ণ হইলেও যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সুমহৎ উপাসনামন্দিরের বহিরঙ্গনের বহিঃপ্রাচীরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান যুগে জড়বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও কর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতি যেরূপ একদিকে অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ-লাভ করিতেছে, সেইরূপ এই সকল আলোচনা ও আবিষ্কারের গুণেই, সকল বিজ্ঞানের মূল বিজ্ঞান যাহা, সেই দর্শন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানও অন্যদিকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গভীরতা প্রাপ্ত হইতেছে। এইজন্য, বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের অন্বেষণে ও সাধনে বিজ্ঞান ও দর্শনকে উপেক্ষা বা বর্জ্জন করিলে চলিবে না। "সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যেখানেই স্রষ্টার ধ্যানধারণা করিতে যাইবে, সেখানেই পদে পদে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসত্য মানসী প্রতিমার পূজা

---

* শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণদিনে তত্ত্ববিদ্যাসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত বক্তৃতার মর্ম্ম অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ।

করিতেই হইবে। প্রতীকের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিলেই যে সত্য উপাসনা হয়, তাহা নহে। শব্দ যখন বন্ধ্যাপুত্রবৎ বা আকাশকুসুমবৎ কল্পনামাত্রকে নির্দ্দেশ করে না, কিন্তু প্রকৃতবস্তু নির্দ্দেশ করে, শব্দ-উচ্চারণে যখন বস্তুজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে,—তখনই শব্দ সত্য ও সেই-সত্য-শব্দ-সাহায্যে সত্য উপাসনা সম্ভব হয়। কিন্তু স্রষ্টৃসম্বন্ধিনী ধারণাকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র করিতে গেলে, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্বসকল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির আয়ত্তাধীন করা আবশ্যক হয় এবং তখন জড়বিজ্ঞানের আলোচনা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা ব্যতিরেকে স্রষ্টার সত্যজ্ঞান লাভ করা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জনসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্ত্তনের মুখ্যতত্ত্বসকলের কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ না করিলে, ঈশ্বরকে নিয়ন্তৃরূপে—Moral Governor রূপে—সত্যভাবে ধ্যান করা সম্ভব হয় না। ঈশ্বর যে দণ্ডধারী ধর্ম্মরাজ হইয়া জনসমাজের পরিবর্ত্তনশীল বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়াই আপনার সনাতন অনুশাসনসকল যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মকে সংবর্দ্ধিত ও অধর্ম্মকে নিরস্ত করিতেছেন, সমাজতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা ব্যতিরেকে এই জ্ঞান কদাপি পরিস্ফুট, কদাপি সত্য, কদাপি বস্তুতন্ত্র হইতে পারে না। এইজন্য সমাজ-বিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের আলোচনা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। সেইরূপ সৌন্দর্য্যব্যক্ত কলাবিজ্ঞানের সম্যক্ আলোচনা ব্যতিরেকে, কি জড়প্রকৃতিতে, কি মানবসমাজে, হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রসের মধ্যে,—নিখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে যিনি নিয়ত আপনার অরূপ রূপমাধুরী বিচিত্র জগৎরঙ্গমঞ্চে প্রকট করিয়া, জীবের সঙ্গে অপূর্ব্ব-নিগূঢ় রসলীলায় নিযুক্ত রহিয়াছেন,—সেই সুন্দরের সত্যধ্যান এবং বস্তুগত সম্ভোগ কদাপি সম্ভব নহে। এইজন্য রসতত্ত্বমাত্রই ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। এবং এই সকল কারণেই বর্ত্তমানের যুগধর্ম্ম প্রাচীনযুগের সাধনচক্রের সঙ্কীর্ণ নেমিরেখা পরিত্যাগ করিয়া, নিখিল জ্ঞান, নিখিল তত্ত্ব, নিখিল কর্ম্ম, নিখিল রসকে অধিকার করিয়া, 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে সকলের মধ্যে প্রত্যক্ষ, সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা, সকলের মধ্যে সম্ভোগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিশ্বসাধনাব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রসঙ্গের বহুলপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপে ধর্ম্মের আদর্শও অনিবার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, স্ফুটতর, গভীরতর, প্রশস্ততর ও উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে। এই উন্নত-ধর্ম্ম সাধন করিতে যাইয়া পদে পদে আমাদিগকে বিজ্ঞান-দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; না করিলে, ইহার জটিল সমস্যাসকলের সত্যসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মকে আর কেবল কিংবদন্তির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব নহে। বর্ত্তমানের ধর্ম্মের আদর্শে ও সাধনে, মানবসমাজের পূর্ব্বসঞ্চিত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণীরূপে শাস্ত্রসকল সম্যক্‌ভাবে সম্মানিত হইবে সত্য, কিন্তু অভ্রান্ত বলিয়া আর গৃহীত

হইবে না। প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে বর্ত্তমানের সাধনাকে মিলাইয়া প্রাচীন অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট এবং বর্ত্তমানের অনুভূতিকে সংশোধিত ও সপ্রমাণিত করিতে হইবে। এই যুগধর্ম্মকে কেবল গুরুমুখীন করিয়া রাখিলেও আর চলিবে না। বর্ত্তমানের ধর্ম্মের আদর্শে ও সাধনে, উন্নত সাধক ও বিশ্বস্তসাক্ষিরূপে গুরু নিশ্চয়ই পূজার্হ হইবেন, কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের যষ্টিরূপে গৃহীত হইবেন না। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন শিষ্যের জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করাই যখন গুরুর ধর্ম্ম এবং জ্ঞানমাত্রেই যখন জ্ঞাতার অনুভূতির অপেক্ষা করে, তখন গুরূপদেশকেও আপনার কৃতার্থতালাভের জন্যই শিষ্যের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ধর্ম্মকে আবার ব্যক্তিগত মতামতের শিথিল বালুকাস্তূপের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিলেও চলিবে না। কেন না, ধর্ম্ম কদাপি মতের উপরে স্থাপিত হইতে পারে না, সত্যের উপরেই স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। মতামত এ জগতে অগণ্য, কিন্তু সত্য স্বরূপত এক। সেই এক মহাসত্যের অন্বেষণ, সেই মহাসত্যকে সাধন করা, সেই মহাসত্যকে লাভ করা, জীবনে, চরিত্রে জনসমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা সেই সত্যকে মূর্ত্তিমৎ করিয়া লোকমণ্ডলীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্ম্মের একমাত্র সনাতন লক্ষ্য। সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন, সকল সাধনা বিভিন্নক্ষেত্রে সেই এক সত্যেরই অন্বেষণ করিতেছে। সত্যলাভ যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য হয়, তবে বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কদাপি আপনার লক্ষ্য লাভ করিতে পারিবে না।

ফলত ধর্ম্মসাধন যুগে যুগে তত্তৎযুগের জ্ঞানবিজ্ঞানাদিকে স্বল্পবিস্তররূপে আপনার অঙ্গীভূত করিয়াছে। আমাদিগের দেশে ভক্তিসাধন ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। বৈষ্ণবসাধনায় রসতত্ত্বের উপরেই ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৈষ্ণবদর্শনে, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর তত্ত্ববিচারে, রসতত্ত্বের অতি গভীর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়;—এবং তাঁহারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তিরূপে ভগবানের ভজনা ও ভগবল্লীলা সম্ভোগ করিতে যাইয়া, সমগ্র কলাচর্চ্চাকে আপনাদিগের ভক্তিসাধনের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। খৃষ্টীয়সমাজে, বিশেষত ক্যাথলিক্‌সম্প্রদায়মধ্যে, বহুলপরিমাণে সমাজতত্ত্বের উপরে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসংহতি প্রত্যেক মানবশিশুর জননীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া তাহার নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিপুষ্ট করিতেছে। মা যেমন আপনার অঙ্কে ধারণ করিয়া সন্তানকে স্তনদানে জীবিত রাখেন ও পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করেন, জনসংহতি সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেককে আপনার সঞ্চিত জ্ঞান, ভাব, কল্যাণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিত রাখিতেছে এবং নিয়ত পরিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতেছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যে সম্বন্ধ, তাহার মূল প্রকৃতিই একদিকে এই উদারপ্রেম ও অযাচিত দান ও প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অসীম ব্যাকুলতা এবং অন্যদিকে এই বশ্যতা, এই নির্ভরশীলতা, এই বিশ্বস্ততা।

এই সমাজতত্ত্ব রোমকসম্প্রদায়ের ধর্ম্মসাধনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, Catholic Churchএর সঙ্গে প্রত্যেক Catholic সাধকের সম্বন্ধকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। মাতা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহশীল, সেইরূপ প্রত্যেক Catholic সাধকের প্রতি স্নেহশীল হইয়া Catholic Church আপনার উদার প্রেমগুণে প্রত্যেকের বন্ধনমোচন করিতেছে—আর প্রত্যেক Catholic সাধক এই মাতৃরূপিণী Churchএর নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া, তাহার উপরে নির্ভরশীল ও তাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া, এই উদার প্রেমের প্রতিদান করিতেছে। রস ভক্তির প্রাণ। ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবসাধন রসতত্ত্বকে এইজন্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে; না করিলে, এ সাধন কদাপি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। বশ্যতাতে বিধিনিষেধাত্মক নৈতিকসাধন ও সমাজধর্ম্মের সনাতন প্রতিষ্ঠা। Catholic সাধন এই নীতিবিজ্ঞান ও এই সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে; না করিলে, তাহা ভিত্তিহীন ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়িত।

আজ পর্য্যন্ত জগতের ঐতিহাসিক ধর্ম্মসকল যে পরিমাণে কোথাও বা রসতত্ত্বকে, কোথাও বা নীতিবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বকে আয়ত্ত ও আত্মভূত করিয়াছে, সেই পরিমাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বা জড়বিজ্ঞানকে কোথাও অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত জগতের ধর্ম্মসকল জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্যজগতে, বিশেষতঃ ইহুদী, আরব প্রভৃতি সেমিটিক্ জাতিসকলের ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনে সর্ব্বথাই ব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছে। ইহুদার ভূমিতেই খৃষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি। গ্রীকচিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইলেও, ইহুদার প্রভাবে সেমিটিক্ দ্বৈতবাদ খৃষ্টধর্ম্মের অস্থিমজ্জাগত হইয়া, খৃষ্টীয়সাধনায় জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের প্রকৃত একত্বপ্রতিষ্ঠার পক্ষে অদ্যাপি প্রবল অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। গ্রীক্-প্রভাবে, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সাধনায় ও শিক্ষায়, একসময়ে খৃষ্টধর্ম্মেও অতি উন্নত ব্রহ্মতত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু রোমকচিন্তাদ্বারা অভিভূত হইয়া, রোমক নেতৃবর্গের প্রভাবে, অতি অল্পকালমধ্যেই খৃষ্টীয়সাধনার তত্ত্বাঙ্গ অসাড় এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্ম রোমক ব্যবহারবিজ্ঞানের জালে জড়িত ও পরমার্থতত্ত্ব হইতে স্বল্পবিস্তর বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন হইতে খৃষ্টীয়সাধনায় বিধিনিষেধাত্মক নৈতিক আদর্শই প্রবল হইয়া রহিয়াছে। দ্বৈতভাব এই নৈতিক আদর্শের প্রাণ; অদ্বৈততত্ত্বে, এই কঠোর বিধিনিষেধাত্মক আদর্শের সম্যক্ প্রসার অসম্ভব। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যজগতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম, তিনের মধ্যে প্রকৃত একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

আমাদিগের দেশে এই একত্বপ্রতিষ্ঠার বিপুল চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা জীব ও জড়ের সত্য ও স্বাতন্ত্র্যকে বহুলপরিমাণে অলীক ও মায়িক বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি

উপদেশের দ্বারা যেখানে আপাতত জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেও জীবকে শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অতীত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ চৈতন্যরূপেই দেখা হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যে নিত্যবস্তু নিয়ত বিদ্যমান থাকিয়া শরীরের জন্ম-স্থিতি-ক্ষয়-রোগ-স্বাস্থ্য প্রভৃতি অবস্থাবিপর্য্যয় এবং মন ও বুদ্ধির সঙ্কল্প-বিকল্প-সচেতন-অচেতনাদি ভাবপরিবর্ত্তনের মধ্যে আমাদিগের একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে জীবরূপে গৃহীত হইয়াছে।

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এ সকল সেই পরমপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদিগের মধ্যে তাঁহার স্বরূপপ্রকাশ হয় না। তাঁহাকে স্বরূপত জানিতে হইলে, তাঁহার যে শ্রেষ্ঠ জীবপ্রকৃতি দ্বারা তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাকে জানিতে হইবে। সেখানেই তিনি স্বরূপত বিদ্যমান ও প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই জীবপ্রকৃতিকে জানিতে হইলে, শরীর-মন প্রভৃতি হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে হইবে। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে, ইন্দ্রিয় হইতে মনকে, মন হইতে বুদ্ধিকে, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারকে প্রত্যাহৃত করিয়া, অবশেষে সেই অহঙ্কার হইতেও তাহার মূলস্থ সাক্ষিচৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া,—আপনার অন্তরস্থ নিত্যবুদ্ধশুদ্ধ চৈতন্যবস্তুকে দেখিতে হইবে। এইরূপে জীব যখন সংসার-মুক্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানে—

> অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
> সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥—

যখন জীবের এই সত্যজ্ঞান আবির্ভূত হয়, তখনই তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার চরমাদর্শ। এই আদর্শে জড়জগৎ বা জনসমাজ, এ দুএর কোন একটিরও বিশেষ স্থান নাই।

বৈষ্ণবতত্ত্বে জীবব্রহ্মের আপাতপার্থক্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু মৌলিক একত্ব কদাপি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্মের অখণ্ডৈকত্ব বা একরসত্ব অস্বীকার করিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বগত ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠা করিয়াই বৈষ্ণবতত্ত্ব আপনার মধ্যে ভক্তি ও ভক্তিসাধক নিত্য-উপাসনাদির স্থান করিয়া লইয়াছে। জড়-জগৎ ও জীবজগৎ উভয়কেই ভগবল্লীলার আধার ও প্রকাশরূপে গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব-সাধন কিয়ৎপরিমাণে ইহাদের সত্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবসাধনে ভগবান্‌কে সম্যক্‌ভাবে স্রষ্টারূপে ভজনা করিবার প্রয়াস অতি অল্পই হইয়াছে। পঞ্চরসের মধ্যে শান্তরস ভক্তিসোপানের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিতেছে। বৈদিকধর্ম্মে মানবীয় সাধনার সঙ্গে নিসর্গের একটা সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও মাখামাখিভাব দৃষ্ট হয় সত্য, পৌরাণিক ধর্ম্মের উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গে ও পৌরাণিক উপাসনার রূপকল্পাদির মধ্যেও নিসর্গের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, তথাপি ইহা

স্বীকার করিতেই হইবে যে, উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুধর্ম্ম ইহার অশেষ ক্রিয়াকর্ম্ম-কাব্যকল্পনার মধ্যেও, চিরদিনই নিতান্ত নির্গুণের পক্ষপাতী হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল কারণে জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম-সাধনে আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান আপনার যথাযথ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্ম এইজন্য প্রায় সর্ব্বত্রই একান্ত অন্তর্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য এই সকল ধর্ম্মে ও সাধনে নবজীবনের আদর্শও বহুলপরিমাণে এই অন্তর্মুখীনতাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে।

ফলত একদিকে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি এবং অপরদিকে আত্মা ও ধর্ম্ম, এতদুভয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ কল্পনা করিয়াই নবজীবনশব্দ ও তদাশ্রয়ী ভাবসকল পৌরাণিক ধর্ম্মে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম আদিতে,—কি বেদে, কি তালমুদে,—প্রায় সর্ব্বত্রই স্বভাব ও নিসর্গকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ধর্ম্মবিবর্ত্তনের সেই আদিম সোপানের আরাধ্য দেবতাসকল স্বল্পবিস্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছিলেন, এবং তাঁহাদের আরাধনা শরীরব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সূত্রে অনুস্যূত ছিল। ঋগ্বেদের অগ্নি, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি সকলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নৈসর্গিক বস্তু। বরুণ আকাশরূপে সকলকে আচ্ছাদন করিয়া সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের সেই সর্ব্বজনবিদিত শ্লোক,—দুইজন মনুষ্য যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়, তিনজন যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ, চারিজন যেখানে মিলিত হয়, বরুণ তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চম,—বরুণ-অর্থে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে নির্দ্দেশ করে নাই, কিন্তু এই চাক্ষুষ আকাশদেবতাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এই চাক্ষুষ আকাশদেবতার সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই ক্রমে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ অগ্নি প্রভৃতিও চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন। নৈসর্গিক আকারেই অগ্নি পূজিত হইতেন। একদিকে এই সকল নিসর্গদেবতা, অন্যদিকে পিতৃদেবতা, এই উভয়বিধ বৈদিক দেবতাশ্রেণীই স্বল্প-বিস্তর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা মনোগ্রাহ্য ছিলেন। ইহুদার ইলোহিম, জিহোভা প্রভৃতিও সমাজপতিরূপে স্বল্পবিস্তর বুদ্ধিগ্রাহ্য, ও বিধিনিষেধাত্মক সামাজিকজীবনের চাক্ষুষ ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপাদির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহির্মুখীন শারীরধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের সঙ্গে প্রাচীন ইহুদাধর্ম্মের কোন বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই।

কিন্তু ক্রমে দেবতা যখন নিসর্গ ছাড়িয়া অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, আত্মাতে পরমাত্মরূপে প্রকাশিত হইলেন বা হৃদয়ের অভ্যন্তরে কর্ম্মের মৌলিক অদৃষ্ট-প্রেরণার মধ্যে আপনার অনুজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন বাহিরের সঙ্গে অন্তরের বিরোধের সূত্রপাত হইল। বাহিরে সংসার, অন্তরে সংসারাতীত ব্রহ্মজ্ঞান। বাহিরে কর্ম্ম, অন্তরে ভাব ও উদ্দেশ্য। সংসারে বা কর্ম্মে নহে, কিন্তু জ্ঞানে, ভাবে, হৃদয়ের প্রেরণার মধ্যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিরাজ

করেন। সুতরাং তখন হইতে বহির্জীবনকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে, এই আদর্শ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিল। এবং তদবধি নবজীবন-শব্দ ও তদাশ্রয়ী ভাব পৌরাণিক চিন্তা ও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

নবজীবন বলিতে এখনও আমরা এই প্রাচীন, এই পৌরাণিক, এই একান্ত অন্তর্মুখীন আদর্শ ই বুঝিয়া থাকি। নবজীবন লাভ করিতে হইলে, সংসারে মৃত হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বে সজীব হইতে হইবে। এই বহির্জীবনকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া অন্তর্জীবনকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। বিষয়ে বিরক্তি ও ব্রহ্মে অনুরাগ সাধন করিতে হইবে। দৃশ্যবিষয়ে অবজ্ঞা ও অদৃশ্যে আস্থাস্থাপন করিতে হইবে। খৃষ্টীয়, ইস্লামীয়, বৈষ্ণবীয় নবজীবনের আদর্শ স্বল্পবিস্তর ইহাই।

এই আদর্শের মধ্যে যে মৌলিক ভাব আছে, তাহা বর্জ্জন করিলেও চলিবে না। বিবেকবৈরাগ্যাদি সাধন যেমন প্রাচীনকালে, সেইরূপ আমাদিগের মধ্যেও ধর্ম্মলাভের উপায়রূপে অবশ্যই অবলম্বিত হইবে। কিন্তু ধর্ম্মের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইবে না। যথাযথ ও পূর্ণতর ভোগের জন্যই বৈরাগ্যের প্রয়োজন। আপাততঃ যাহা অনাত্ম বলিয়া মনে হয়, তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার জন্যই আত্মানাত্মবিবেক কঠোর ও দৃঢ়ভাবে সাধন করিতে হইবে। যতদিন না বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধিত হইয়াছে, ততদিন আত্মাকেই অনাত্মরূপে দেখিবে, অনাত্মাতে আত্মার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। দেহকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা বিরোচনধর্ম্ম,—আসুরতত্ত্ব,—অজ্ঞানান্ধকারের সৃষ্টি। আত্মাকে দেহের মধ্যে, ব্রহ্মকে ব্রহ্মাণ্ডে, শিবকে জীবের মধ্যে, ভিন্নাভিন্নভাবে দর্শন করা ইন্দ্রধর্ম্ম। ব্রহ্মতত্ত্ব শুদ্ধপ্রজ্ঞালভ্য। এই তত্ত্বলাভ, এই ধর্ম্মসাধন ও এই প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠার জন্য বিবেক-বৈরাগ্যাদি পৌরাণিক সাধনাও আধুনিক আদর্শে যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ এই সকল সাধন ব্যতিরেকে কোনপ্রকারেই নবজীবনের নবীন আদর্শ আয়ত্ত হইবে না।

এই আদর্শ কি, প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৬০

দিনের মধ্যে অক্ষয় একসময় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাকে কমলার প্রত্যাবর্ত্তনসম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। কমলা কেন যে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা না জানিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে কাহারো কাছে কোনো কথা বলিতে চান না। সে যখন ইচ্ছা করিয়া তাহার আত্মীয়বন্ধুসভার অন্তরালে চলিয়া আসিয়াছে, যখন লজ্জাভয়ও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তখন তিনি তাহাকে সেই বন্ধুসমাজের নিকট, সমস্ত কথা না জানিয়া, প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। তা ছাড়া, রমেশের প্রতি অক্ষয়ের যে বিশেষ বন্ধুভাব নাই, তাহাও খুড়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

কমলা কেন চলিয়া গিয়াছিল, কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, এ সম্বন্ধে বাড়ীর কেহ কোনো প্রশ্নই করিল না—কমলা যেন ইঁহাদের সঙ্গেই কাশী বেড়াইতে আসিয়াছে, এম্‌নিভাবে দিন কাটিয়া গেল। উমির দাই লছমনিয়া স্নেহমিশ্রিত ভৎর্সনার ছলে কিছু বলিতে গিয়াছিল, খুড়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া শাসন করিয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রে শৈলজা কমলাকে আপনার বিছানায় লইয়া শুইল। তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল এবং দক্ষিণহস্ত দিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। এই কোমল হস্তস্পর্শ নীরব প্রশ্নের মত কমলাকে তাহার গোপনবেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

কমলা কহিল—"দিদি, তোমরা কি মনে করিয়াছিলে? আমার উপরে রাগ কর নাই?"

শৈল কহিল—"আমাদের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নাই? আমরা কি এটা বুঝি নাই, সংসারে তোর যদি কোনো পথ থাকিত, তবে তুই এই ভয়ানক পথ লইতিস্ না! আমরা কেবল এই বলিয়া কাঁদিয়াছি, ভগবান্ তোকে কেন এমন সঙ্কটে ফেলিলেন! যে লোক কোনো অপরাধ করিতে জানে না, সেও দণ্ড পায়!"

কমলা কহিল—"দিদি, আমার সব কথা তুমি শুনিবে?"

শৈল স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"শুনিব না ত কি বোন্?"

কমলা। তখন যে তোমাকে কেন বলিতে পারি নাই, তাহা জানি না। তখন আমার কোনো কথা ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মাথায় এমন বজ্রাঘাত হইয়াছিল যে, লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিতেছিলাম না। সংসারে আমার মা-বোন কেহ নাই, দিদি, তুমি আমার মা-বোন্ দুই—তাই তোমার কাছে সব কথা বলিতেছি, নহিলে আমার যে কথা, তাহা কাহারো কাছে বলিবার নয়।

কমলা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বসিল। শৈলও উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। সেই অন্ধকার বিছানার মধ্যে বসিয়া কমলা বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে লাগিল।

কমলা যখন বলিল, বিবাহের পূর্ব্বে বা বিবাহের রাত্রে সে তাহার স্বামীকে দেখে নাই, তখন শৈল কহিল—"তোর মত বোকা মেয়ে ত আমি দেখি নাই। তোর চেয়ে কম বয়সে আমার বিবাহ হইয়াছিল—তুই কি মনে করিস্, লজ্জায় আমি আমার বরকে কোনো সুযোগে দেখিয়া লই নাই!"

কমলা কহিল—"লজ্জা নয় দিদি। আমার বিবাহের বয়স প্রায় পার হইয়া গিয়াছিল। এমন সময়ে হঠাৎ যখন আমার বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল, তখন আমার সমস্ত সঙ্গিনীরা আমাকে বড়ই ক্ষ্যাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অধিক বয়সে বরকে পাইয়া আমি যে সাতরাজার ধন মাণিক পাই নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র করি নাই। এমন কি, তাঁহার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ মনের মধ্যেও অনুভব করা আমি নিতান্ত লজ্জার বিষয়, অগৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আজ তাহারই শোধ দিতেছি।"

এই বলিয়া কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে আরম্ভ করিল—"বিবাহের পর নৌকাডুবি হইয়া আমরা কি করিয়া রক্ষা পাইলাম, সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু যখন বলিয়াছিলাম, তখনো জানিতাম না যে, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া যাঁহার হাতে পড়িলাম, যাঁহাকে স্বামী বলিয়া জানিলাম, তিনি আমার স্বামী নহেন।"

শৈলজা চম্‌কিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি কমলার কাছে আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া কহিল—"হায়রে পোড়াকপাল—ও তাই বটে! এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম! এমন সর্ব্বনাশও ঘটে!"

কমলা কহিল—"বল্ দেখি দিদি, যখন মরিলেই চুকিয়া যাইত, তখন বিধাতা এমন বিপদ্ ঘটাইলেন কেন!"

শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—"রমেশবাবুও কিছু জানিতে পারেন নাই?"

কমলা কহিল—"বিবাহের কিছুকাল পরে তিনি একদিন আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাকিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'আমার নাম কমলা, তবু তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?' আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, সেইদিন তাঁহার ভুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু দিদি, সে সকল দিনের কথা মনে করিতেও আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়!"—এই বলিয়া কমলা চুপ করিয়া রহিল।

শৈলজা একটু একটু করিয়া কথায় কথায় সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া বাহির করিয়া লইল। সমস্ত কথা শোনা হইলে সে কহিল, "বোন, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি! যাই বলিস্, বেচারা রমেশবাবুর কথা মনে করিলে বড় দুঃখ হয়। আজ রাত অনেক হইল, কমল, তুই আজ ঘুমো। কদিন রাত জাগিয়া কাঁদিয়া মুখ কালী হইয়া গেছে। এখন কি করিতে হইবে, কাল সব ঠিক করা যাইবে।"

রমেশের লিখিত সেই চিঠি কমলার কাছে ছিল। পরদিন সেই চিঠিখানি লইয়া শৈলজা তাহার পিতাকে নিভৃতঘরে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠি তাঁহার হাতে দিল। খুড়া চস্‌মা চোখে তুলিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তাহার পরে চিঠি মুড়িয়া চস্‌মা খুলিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই ত, এখন কি কর্ত্তব্য!"

শৈল কহিল, "বাবা, উমির কয়দিন হইতে সর্দ্দিকাশি করিয়াছে, একবার নলিনাক্ষ-ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাও না! কাশীতে তাঁহার আর তাঁর মার ত খুব নাম শোনা যায়। একবার তাঁকে দেখিই না।"

রোগীকে দেখিবার জন্য ডাক্তার আসিল—এবং ডাক্তারকে দেখিবার জন্য শৈল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "কমল, আয়, শীঘ্র আয়!"

নবীনকালীর বাড়ী যে-কমলা নলিনাক্ষকে দেখিবার ব্যগ্রতায় প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কমলা আজ লজ্জায় উঠিতে চায় না।

শৈল কহিল, "দেখ্ পোড়ারমুখি, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না, তা আমি বলিয়া রাখিতেছি—আমার সময় নাই—উমির ব্যামো কেবল নামমাত্র, ডাক্তার বেশিক্ষণ থাকিবে না—তোকে সাধাসাধি করিতে গিয়া মাঝে হইতে আমার দেখা হইবে না।"

এই বলিয়া কমলাকে জোর করিয়া টানিয়া-লইয়া, শৈলজা দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনাক্ষ উমার বুক-পিঠ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ওষুধ লিখিয়া-দিয়া চলিয়া গেল।

শৈল কমলাকে কহিল, "কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন্, তোর ভাগ্য ভাল। এখন দুইএকদিন বোন তোকে একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে হইবে—আমরা একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে উমির জন্যে ঘন-ঘন ডাক্তারের প্রয়োজন হইবে, অতএব নিতান্ত তোকে বঞ্চিত হইতে হইবে না।"

খুড়া একদিন এমন সময় বাছিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন, যখন নলিনাক্ষ বাড়ীতে থাকে না। চাকর কহিল, "ডাক্তারবাবু নাই।" খুড়া কহিলেন, "মাঠাকরুণ ত আছেন, তাঁহাকে একবার খবর দাও। বল, একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

উপরে ডাক পড়িল। খুড়া গিয়া কহিলেন, "মা, আপনার নাম কাশীতে বিখ্যাত। তাই আপনাকে দেখিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে আসিলাম। আমার আর কোনো কামনা নাই। আমার একটি দৌহিত্রীর অসুখ, আপনার ছেলেকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম, তিনি বাড়ী নাই—তাই মনে করিলাম

শুধু-শুধু ফিরিব না, একবার আপনাকে দর্শন করিয়া যাইব।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"নলিন এখনি আসিবে, আপনি ততক্ষণ একটু বসুন। —বেলা নিতান্ত কম হয় নাই—আপনার জন্য কিছু জলখাবার আনাইয়া দিই।"

খুড়া কহিলেন, "আমি জানিতাম, আপনি আমাকে না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না—আমার যে ভোজনে বেশ একটুখানি সখ আছে, তাহা আমাকে দেখিলেই লোকে টের পায়—এবং সকলেই এ বিষয়ে আমাকে একটু দয়াও করে।"

ক্ষেমঙ্করী খুড়াকে জল খাওয়াইয়া বড় খুসি হইলেন। কহিলেন, "কাল আমার এখানে আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ রহিল—আজ প্রস্তুত ছিলাম না, আপনাকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।"

খুড়া কহিলেন, "যখনি প্রস্তুত হইবেন, এই ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিবেন। আপনাদের বাড়ী হইতে আমি বেশি দূরে থাকি না। বলেন ত আপনার চাকরটাকে লইয়া আমার বাড়ী দেখাইয়া আসিব।"

এম্‌নি করিয়া খুড়া দুইচারিদিনের যাতায়াতেই নলিনাক্ষের বাড়ীতে বেশ একটু জমাইয়া লইলেন।

ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন—"ও নলিন, তুই চক্রবর্ত্তিমশায়ের কাছ থেকে ভিজিট্ নিস্ নে যেন!"

খুড়া হাসিয়া কহিলেন—"মাতৃ-আজ্ঞা উনি পাইবার পূর্ব্ব হইতেই পালন করিয়া আসিতেছেন—আমার কাছ হইতে উনি কিছুই নেন নাই। যাঁহারা দাতা, তাঁহারা গরীবকে দেখিলেই চিনিতে পারেন।"

৬১

দিনদুয়েক পিতায় ও কন্যায় পরামর্শ চলিল। তাহার পরে একদিন সকালে খুড়া কমলাকে কহিল—"চল মা, আমরা দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাই।"

কমলা শৈলকে কহিল—"দিদি, তুমিও চল না!"

শৈল কহিল, "না ভাই, উমির শরীর তেমন ভাল নাই।"

খুড়া যে পথ দিয়া স্নানের ঘাটে গেলেন, স্নানান্তে সে পথ দিয়া না ফিরিয়া অন্য এক রাস্তায় চলিলেন। কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন, একটি প্রবীণা স্নান সারিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন।

কমলাকে সম্মুখে আনিয়া খুড়া কহিলেন—"মা, ইঁহাকে প্রণাম কর, ইনি ডাক্তারবাবুর মাতা।"

কমলা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"তুমি কে গা!—দেখি দেখি, কি রূপ! যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা!"—বলিয়া কমলার ঘোমটা সরাইয়া তাহার নতনেত্র মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন। কহিলেন—"তোমার নাম কি বাছা?"

কমলা উত্তর করিবার পূর্ব্বেই খুড়া কহিলেন—"ইঁহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার

মা-বাপ কেহ নাই—আমার উপরেই নির্ভর।”

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“আসুন না চক্রবর্ত্তিমশায়, আমার বাড়ীতেই আসুন্।”

বাড়ীতে লইয়া-গিয়া ক্ষেমঙ্করী একবার নলিনাক্ষকে ডাকিলেন। নলিনাক্ষ তখন বাহির হইয়া গেছেন।

খুড়া আসনগ্রহণ করিলেন—কমলা মেজের উপরে বসিল। খুড়া কহিলেন—“দেখুন, আমার এই ভাইঝির ভাগ্য বড় মন্দ। বিবাহের পরদিনেই ইহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন—ইহার সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ নাই। হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া তীর্থবাস করে—ধর্ম্ম ছাড়া উহার সান্ত্বনার সামগ্রী আর ত কিছুই নাই। এখানে আমার বাড়ী নয়—আমার চাকরি আছে—উপার্জ্জন করিয়া আমাকে সংসার চালাইতে হয়। আমি যে এখানে আসিয়া ইহাকে লইয়া থাকিব, আমার এমন সুবিধা নাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। এটিকে আপনার মেয়ের মত যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড় নিশ্চিন্ত হই। যখনি অসুবিধাবোধ করিবেন, গাজিপুরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি বলিতেছি, দুদিন ইহাকে কাছে রাখিলেই মেয়েটি কি রত্ন, তাহা বুঝিতে পারিবেন—তখন মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িতে চাহিবেন না।”

ক্ষেমঙ্করী খুসি হইয়া কহিলেন—“আহা, এ ত ভাল কথা। এমন মেয়েটিকে আপনি যে আমার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন—এ ত আমার মস্ত লাভ। আমি কতদিন রাস্তা হইতে পরের মেয়েকে বাড়ীতে আনিয়া খাওয়াইয়া-পরাইয়া আনন্দ করি, কিন্তু তাহাদের ত রাখিতে পারি না। তা হরিদাসী আমারই হইল—আপনি ইহার জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমার ছেলের কথা অবশ্য আপনারা পাঁচজনের কাছে শুনিয়া থাকিবেন—নলিনাক্ষ—সে বড় ভাল ছেলে। সে ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ নাই।”

খুড়া কহিলেন—“নলিনাক্ষবাবুর নাম সকলেই জানে। তিনি এখানে আপনার কাছে থাকেন জানিয়া আমি আরো নিশ্চিন্ত। আমি শুনিয়াছি, বিবাহের পর দুর্ঘটনায় তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া মারা যাওয়াতে তিনি সেই অবধি একরকম ব্রহ্মচারীর মতই আছেন।”

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“সে যাহা হইয়াছে, হইয়াছে—ও কথা আর তুলিবেন না—মনে করিলেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।”

খুড়া কহিলেন—“যদি অনুমতি করেন, তবে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখিয়া এখন বিদায় হই। মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইহার একটি বড় বোন আছে—সেও আপনাকে প্রণাম করিতে আসিবে।”

খুড়া চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী কমলাকে কাছে টানিয়া-লইয়া কহিলেন, “এস ত মা, দেখি! তোমার বয়স ত বেশি নয়। আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষাণও আছে! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনো বৃথা নষ্ট করিবার জন্য গড়েন নাই।”—বলিয়া কমলার চিবুক

স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা চুম্বন গ্রহণ করিলেন।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"এখানে তোমার সমবয়সী সঙ্গিনী কেহ নাই—একলা আমার কাছে থাকিতে পারিবে ত?"

কমলা তাহার দুই বড় বড় স্নিগ্ধ চক্ষে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করিয়া কহিল, "পারিব মা!"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"তোমার দিন কাটিবে কি করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি!"

কমলা কহিল—"আমি তোমার কাজ করিব।"

ক্ষেমঙ্করী। পোড়াকপাল! আমার আবার কাজ! সংসারে ঐ ত আমার একটিমাত্র ছেলে—সেও সন্ন্যাসীর মত থাকে—কখনো যদি বলিত মা, 'এইটে আমার দরকার আছে, আমি এইটে খেতে চাই, আমি এইটে ভালবাসি', তবে আমি কত খুসি হইতাম—তাও কখনো বলে না। রোজগার ঢের করে, হাতে কিছুই রাখে না—কত সৎকাজে যে কতদিকে খরচ করে, তাহা কাহাকে জানিতেও দেয় না। দেখ বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চব্বিশ-ঘণ্টা থাকিতে হইবে, তখন এ কথা আগে হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, আমার মুখে আমার ছেলের গুণগান বারবার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে—কিন্তু ঐটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।

কমলা পুলকিতচিত্তে চক্ষু নত করিল।

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আমি তোমাকে কি কাজ দিব, তাই ভাবিতেছি। সেলাই করিতে জান?"

কমলা কহিল—"ভাল জানি না মা।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে সেলাই শিখাইয়া দিব।"

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পড়িতে জান ত?"

কমলা কহিল—"হাঁ, জানি।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সে হইল ভাল। চোখে ত আর চস্‌মা নহিলে দেখিতে পাই না—তুমি আমাকে পড়িয়া শোনাইতে পারিবে।"

কমলা কহিল—"আমি রাঁধাবাড়া-ঘরকন্নার কাজ সমস্ত শিখিয়াছি।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"অমন অন্নপূর্ণার মত চেহারা, তুমি যদি রাঁধাবাড়ার কাজ না জানিবে ত কে জানিবে! আজ পর্য্যন্ত নলিনকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছি—আমার অসুখ হইলে বরঞ্চ স্বপাক রাঁধিয়া খায়, তবু আর কাহারো হাতে খায় না। এবার হইতে তোমার কল্যাণে তাহার স্বপাক খাওয়া আমি ঘোচাইব। আর অক্ষম হইয়া পড়িলে আমাকেও যদি চারটিখানি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খাওয়াও ত আমার তাহাতে অনভিরুচি হইবে না। চল মা, তোমাকে আমার ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর সমস্ত দেখাইয়া আনি।"

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্করী তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরকন্নার সমস্ত নেপথ্যগৃহ কমলাকে দেখাইলেন। কমলা ইতিমধ্যে একটা অবকাশ বুঝিয়া আস্তে আস্তে আপনার দরখাস্ত জারি করিল। কহিল, "মা, আমাকে আজকে রাঁধিতে দাও না।"

ক্ষেমঙ্করী একটুখানি হাসিলেন। কহিলেন,

"মা, মানুষ জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনার রাজত্ব ছাড়িতে চায় না—এম্‌নি মায়ার বন্ধন! গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে—জীবনে অনেক জিনিষ ছাড়িতে হইয়াছে—তবু ওটুকু সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়াই আছে। এই কর্ত্তৃত্বটুকু প্রাণ ধরিয়া আর কাহারো হাতে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। সর্ব্বদাই ভয় হয়, আমি যেমন করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখিয়াছি, পাছে আর কেহ তাহা উলট্‌পালট্‌ করিয়া দেয়। পাছে রান্নার সময় কোথাও লেশমাত্র নোংরামি ঘটে। কিন্তু মরিতে বসিয়াও যদি এই হাঁড়িকুঁড়ির ভাবনা লইয়া বেলা বহিয়া যায়, তবে আর করিলাম কি? তা মা, আজকের মত তুমিই রাঁধ—দুইচারদিন যাক্‌—ক্রমে সমস্ত ভার আপনিই তোমার হাতে পড়িবে—আমিও ভগবানে মন দিবার সময় পাইব। বন্ধন একেবারেই ত কাটে না—এখনো দুইচারিদিন মন চঞ্চল হইয়া থাকিবে—ভাঁড়ারঘরের সিংহাসনটি কম নয়।"

এই বলিয়া ক্ষেমঙ্করী, কি রাঁধিতে হইবে, কি করিতে হইবে, কমলাকে সমস্ত উপদেশ দিয়া পূজাগৃহে চলিয়া গেলেন। ক্ষেমঙ্করীর কাছে আজ কমলার ঘরকন্নার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কমলা তাহার স্বাভাবিক তৎপরতার সহিত রন্ধনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া, কোমরে আঁচল জড়াইয়া, মাথায় এলোচুল ঝুঁটি করিয়া-লইয়া রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল।

নলিনাক্ষ বাহির হইতে বাড়ীতে ফিরিলেই প্রথমে তাহার মাকে দেখিতে যাইত। তাহার মাতার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে কখনই ছাড়িত না। আজ বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র রান্নাঘরের শব্দ এবং গন্ধ তাহাকে আক্রমণ করিল। মা এখন রান্নায় প্রবৃত্ত আছেন মনে করিয়া নলিনাক্ষ রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদশব্দে চকিত কমলা পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে নলিনাক্ষের সহিত তাহার চোখে-চোখে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতাটা রাখিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিল—কোমরে আঁচল জড়ান ছিল—টানাটানি করিয়া ঘোম্‌টা যখন মাথার কিনারায় উঠিল, বিস্মিত নলিনাক্ষ তখন সেখান হইতে চলিয়া গেছে। তাহার পর কমলা যখন হাতা তুলিয়া লইল, তখন তাহার হাত কাঁপিতেছে।

পূজা সকাল-সকাল সারিয়া ক্ষেমঙ্করী যখন রান্নাঘরে গেলেন, দেখিলেন, রান্না সারা হইয়া গেছে। ঘর ধুইয়া কমলা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে—কোথাও পোড়াকাঠ বা তরকারির খোসা বা কোনোপ্রকার অপরিচ্ছন্নতা নাই। দেখিয়া ক্ষেমঙ্করী মনে মনে খুসি হইলেন, কহিলেন, "মা, তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে বটে।"

নলিনাক্ষ আহারে বসিলে ক্ষেমঙ্করী তাহার সম্মুখে বসিলেন—আর একটি সঙ্কুচিত প্রাণী কান পাতিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল—উঁকি মারিতে সাহস করিতেছিল না—ভয়ে মরিয়া যাইতেছিল,—পাছে তাহার রান্না খারাপ হইয়া থাকে।

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নলিন, আজ রান্নাটা কেমন হইয়াছে?"

নলিনাক্ষ ভোজ্যপদার্থসম্বন্ধে সমজদার ছিল না—তাই ক্ষেমঙ্করী এরূপ অনাবশ্যক প্রশ্ন কখনো তাহাকে করিতেন না—আজ বিশেষ কৌতূহলবশতই জিজ্ঞাসা করিলেন।

নলিনাক্ষ যে অন্ধকার রান্নাঘরের নূতন রহস্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা তাহার মা জানিতেন না। ইদানীং মাতার শরীর খারাপ হওয়াতে নলিনাক্ষ রাঁধিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে মাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে রাজি করিতে পারে নাই। আজ নূতন লোককে রন্ধনে নিযুক্ত দেখিয়া সে মনে মনে খুসি হইয়াছে। রান্না কিরূপ হইয়াছে, তাহা সে বিশেষ মনোযোগ করে নাই—কিন্তু উৎসাহের সহিত কহিল, "রান্না চমৎকার হইয়াছে মা!"

আড়াল হইতে এই উৎসাহবাক্য শুনিয়া কমলা আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে পাশের একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার চঞ্চল বক্ষকে দুই বাহুর দ্বারা পীড়ন করিয়া ধরিল।

আহারান্তে নলিনাক্ষ আপনার মনের মধ্যে কি-একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রাত্যহিক অভ্যাস অনুসারে নিভৃত অধ্যয়নে চলিয়া গেল।

বৈকালে ক্ষেমঙ্করী কমলাকে লইয়া নিজে তাহার চুল বাঁধিয়া সীমন্তে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন—তাহার মুখ একবার এপাশে, একবার ওপাশে ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—কমলা লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষেমঙ্করী মনে মনে কহিলেন, "আহা, আমি যদি এইরকমের একটি বৌ পাইতাম!"

সেই রাত্রেই ক্ষেমঙ্করীর আবার জ্বর আসিল। নলিনাক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কহিল, "মা, তোমাকে আমি কিছুদিন কাশী হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাইব। এখানে তোমার শরীর ভাল থাকিতেছে না।"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"সেটি হবে না বাছা। দুচারদিন বাঁচাইয়া রাখিবার আশায় আমাকে যে কাশী ছাড়িয়া অন্য কোথাও লইয়া মারিবি, সেটি হবে না। ওকি মা, তুমি যে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছ? যাও যাও, শুতে যাও। সমস্ত রাত অমন জাগিয়া কাটাইলে চলিবে না। আমি যে-কদিন ব্যামোতে আছি, তোমাকেই ত সব দেখিতে-শুনিতে হইবে। রাত জাগিলে পারিবে কেন? যা ত নলিন, একবার ও ঘরে যা ত।"

নলিনাক্ষ পাশের ঘরে যাইতেই কমলা ক্ষেমঙ্করীর পদতলে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আর জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার মা ছিলে মা। নহিলে কোথাও কিছু নাই, তোমাকে এমন করিয়া পাইব কেন? দেখ, আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না—কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়। আশ্চর্য্য এই যে, মনে হইতেছে, তোমাকে আমি যেন কতকাল ধরিয়াই জানি। তোমাকে ত একটুও পর মনে হয় না। তা শোন মা, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে যাও। পাশের ঘরে নলিন

রহিল—মার সেবা সে আর কারো হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবে না—তা হাজার বারণ করি আর যাই করি—ওর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কে বল! কিন্তু ওর একটি গুণ আছে, রাত জাগুক্ আর যাই করুক, ওর মুখ দেখিয়া কিছু বুঝা যাইবে না—তার কারণ, ও কখনো কিছুতে অস্থির হয় না। আমার ঠিক তার উল্টা। মা, তুমি বোধ করি মনে মনে হাসিতেছ। ভাবিতেছ, নলিনের কথা আরম্ভ হইল, এবারে আর কথা থামিবে না। তা মা, এক ছেলে থাকিলে ঐরকমই হয়। আর নলিনের মত ছেলেই বা কজন মায়ের হয়। সত্য বলিতেছি, আমি একএকবার ভাবি—নলিন ত আমার বাপ—ও আমার জন্যে যতটা করিয়াছে, আমি কি উহার জন্যে ততটা করিতে পারি! ঐ দেখ, আবার নলিনের কথা। কিন্তু আর নয়—যাও মা, তুমি শুইতে যাও। না না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না—তুমি যাও—তুমি থাকিলে আমার ঘুম আসিবে না। বুড়োমানুষ, লোক কাছে থাকিলেই কেবল বকিতে ইচ্ছা করে।”

পরদিন কমলাই ঘরকন্নার সমুদয় ভার গ্রহণ করিল। নলিনাক্ষ পূর্ব্বদিকের বারান্দার এক অংশ ঘিরিয়া-লইয়া মার্ব্বেল দিয়া বাঁধাইয়া একটি ছোটঘর করিয়া লইয়াছিল—ইহাই তাহার উপাসনাগৃহ ছিল—এবং মধ্যাহ্নে এখানেই সে আসনের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিত। সেদিন প্রাতে সে ঘরে নলিনাক্ষ প্রবেশ করিয়াই দেখিল—ঘরটি ধৌত, মার্জ্জিত, পরিচ্ছন্ন—ধুনা জ্বালাইবার জন্য একটি পিতলের ধুনুচি ছিল, সেটি আজ সোনার মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। শেল্‌ফের উপরে তাহার কয়েকখানি বই ও পুঁথি সুসজ্জিত করিয়া বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গৃহখানির যত্নমার্জ্জিত নির্ম্মলতার উপরে মুক্তদ্বার দিয়া প্রভাতরৌদ্রের উজ্জ্বলতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দেখিয়া স্নান হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত নলিনাক্ষের মনে বিশেষ একটি তৃপ্তির সঞ্চার হইল।

কমলা প্রভাতে ঘটিতে গঙ্গাজল লইয়া ক্ষেমঙ্করীর বিছানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহার স্নাতমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন—“একি মা, তুমি একলাই ঘাটে গিয়াছিলে? আমি আজ ভোর হইতে ভাবিতেছিলাম, আমার অসুখ, তুমি কাহার সঙ্গে স্নানে যাইবে। কিন্তু তোমার অল্প বয়স, এমন করিয়া একলা—”

কমলা কহিল—“মা, আমার বাপের বাড়ীর একটা চাকর থাকিতে পারে নাই, আমাকে দেখিতে কাল রাত্রেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম।”

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“আহা, তোমার খুড়িমা বোধ হয় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—চাকরটাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তা বেশ হইয়াছে—সে তোমার কাছেই থাক্ না—তোমার কাজে-কর্ম্মে সাহায্য করিবে। কোথায় সে, তাহাকে ডাক না।”

কমলা উমেশকে লইয়া হাজির করিল। উমেশ গড় হইয়া ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোর নাম কিরে?”

সে কহিল—“আমার নাম উমেশ।”—

বলিয়া অকারণ-বিকশিত হাস্যে তাহার মুখ ভরিয়া গেল।

ক্ষেমঙ্করী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উমেশ, তোর এই বাহারে কাপড়খানা তোকে কে দিলে রে?"

উমেশ কমলাকে দেখাইয়া কহিল—"মা দিয়াছেন।"

ক্ষেমঙ্করী কমলার দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া কহিলেন, "আমি বলি, উমেশ বুঝি ওর শাশুড়ির কাছ হইতে জামাইষষ্ঠী পাইয়াছে।"

ক্ষেমঙ্করীর স্নেহলাভ করিয়া উমেশ এই-খানেই রহিয়া গেল।

উমেশকে সহায় করিয়া কমলা দিনের বেলাকার সমস্ত কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলিল। স্বহস্তে নলিনাক্ষের শোবার ঘর ঝাঁট দিয়া, তাহার বিছানা রৌদ্রে দিয়া তুলিয়া, সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নলিনাক্ষের ময়লা ছাড়া-ধুতি ঘরের এক-কোণে পড়িয়া ছিল। কমলা সেখানি ধুইয়া, শুকাইয়া, ভাঁজ করিয়া আল্‌নার উপরে ঝুলাইয়া রাখিল। ঘরের যে-সব জিনিষ কিছুমাত্র অপরিষ্কার ছিল না, তাহাও সে মুছিবার ছলে বারবার নাড়াচাড়া করিয়া লইল। বিছানার শিয়রের কাছে দেয়ালে একটা গা-আল্‌মারি ছিল—সেটা খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে আর-কিছুই নাই, কেবল নীচের থাকে নলিনাক্ষের একজোড়া খড়ম আছে। তাড়াতাড়ি সেই খড়মজোড়াটি তুলিয়া লইয়া কমলা মাথায় ঠেকাইল—এবং ছোট শিশুটির মত বুকের কাছে ধরিয়া অঞ্চল দিয়া বারবার তাহার ধূলা মুছাইয়া দিল।

বৈকালে কমলা ক্ষেমঙ্করীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন-সময় হেমনলিনী একটি ফুলের সাজি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিল।

ক্ষেমঙ্করী উঠিয়া-বসিয়া কহিলেন—"এস এস, হেম এস, বোস। অন্নদাবাবু ভাল আছেন?"

হেমনলিনী কহিল—"তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া কাল আসিতে পারি নাই, আজ তিনি ভাল আছেন।"

কমলাকে দেখাইয়া ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"এই দেখ বাছা,—শিশুকালে আমার মা মারা গেছেন; তিনি আবার জন্ম লইয়া এতদিন পরে কাল পথের মধ্যে হঠাৎ আমাকে দেখা দিয়াছেন। আমার মার নাম ছিল হরি-ভাবিনী—এবারে হরিদাসী নাম লইয়াছেন। কিন্তু হেম, এমন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছ? বল ত!"

কমলা লজ্জায় মুখ নীচু করিল। হেম-নলিনীর সঙ্গে আস্তে আস্তে তাঁহার পরিচয় হইয়া গেল।

হেমনলিনী ক্ষেমঙ্করীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আপনার শরীর কেমন আছে?"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"দেখ, আমার যে বয়স হইয়াছে, এখন আমাকে আর শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। আমি যে এখনো আছি, এই ঢের। কিন্তু তাই বলিয়া কালকে চিরদিন ফাঁকি দেওয়া ত চলিবে না। তা তুমি যখন কথাটা পাড়িয়াছ, ভালই হই-য়াছে—তোমাকে কিছুদিন হইতে বলিব-বলিব করিতেছি, সুবিধা হইতেছে না। কাল

রাত্রে আবার যখন আমাকে জ্বরে ধরিল, তখন ঠিক করিলাম, আর বিলম্ব করা ভাল হইতেছে না। দেখ বাছা, ছেলেবয়সে আমাকে যদি কেহ বিবাহের কথা বলিত ত লজ্জায় মরিয়া যাইতাম—কিন্তু তোমাদের ত সেরকম শিক্ষা নয়। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ—বয়সও হইয়াছে—তোমাদের কাছে এ সব কথা স্পষ্ট করিয়া বলা চলে। সেইজন্যই কথাটা পাড়িতেছি, তুমি আমার কাছে লজ্জা করিয়ো না। আচ্ছা বল ত বাছা, সেদিন তোমার বাবার কাছে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তিনি কি তোমাকে বলেন নি ?”

হেমনলিনী নতমুখে কহিল—“হাঁ, বলিয়াছিলেন।”

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—“কিন্তু তুমি বাছা সে কথায় নিশ্চয়ই রাজি হও নাই। যদি রাজি হইতে, তবে অন্নদাবাবু তখনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। তুমি ভাবিলে, আমার নলিন সন্ন্যাসিমানুষ, দিনরাত্রি কি-সব যোগযাগ লইয়া আছে, উহাকে আবার বিবাহ করা কেন ? হোক্ আমার ছেলে, তবু কথাটা উড়াইয়া দিবার নয়। উহাকে বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, উহার যেন কিছুতেই কোনোদিন আসক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ;—আমি উহাকে জন্মকাল হইতে জানি, আমার কথাটা বিশ্বাস করিয়ো। ও এত বেশি ভালবাসিতে পারে যে, সেই ভয়েই ও আপনাকে এত করিয়া দমন করিয়া রাখে। উহার এই সন্ন্যাসের খোলা ভাঙিয়া যে উহার হৃদয় পাইবে, সে বড় মধুর জিনিষটি পাইবে, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি। মা হেম, তুমি বালিকা নও, তুমি শিক্ষিত, তুমি আমার নলিনের কাছ হইতেই দীক্ষা লইয়াছ, তোমাকে নলিনের ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমি যদি মরিতে পারি, তবে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারিব। নহিলে, আমি নিশ্চয় জানি, আমি মরিলেও আর বিবাহই করিবে না। তখন ওর কি দশা হইবে, ভাবিয়া দেখ দেখি! একেবারে ভাসিয়া বেড়াইবে! যাই হোক্, বল ত বাছা, তুমি ত নলিনকে শ্রদ্ধা কর আমি জানি, তবে তোমার মনে আপত্তি উঠিতেছে কেন ?”

হেমনলিনী নতনেত্রে কহিল, “মা, তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর, তবে আমার কোনো আপত্তি নাই।”

শুনিয়া ক্ষেমঙ্করী হেমনলিনীকে কাছে টানিয়া-লইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বলিলেন না।

“হরিদাসি, এই ফুলগুলো”—বলিতে বলিতে পাশে চাহিয়া দেখিলেন, হরিদাসী নাই। সে নিঃশব্দপদে কখন্ উঠিয়া গেছে।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর ক্ষেমঙ্করীর কাছে হেমনলিনী সঙ্কোচবোধ করিল—ক্ষেমঙ্করীরও বাধো-বাধো করিতে লাগিল। তখন হেম কহিল, “মা, আজ তবে সকাল-সকাল যাই। বাবার শরীর ভাল নাই।”—বলিয়া ক্ষেমঙ্করীকে প্রণাম করিল। ক্ষেমঙ্করী তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন—“এস মা, এস!”

হেমনলিনী চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী নলিনাক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, “নলিন, আর আমি দেরি করিতে পারিব না।”

নলিনাক্ষ কহিল, "ব্যাপারখানা কি ?"

ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"আমি আজ হেমকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম—সে ত রাজি হইয়াছে, এখন তোমার কোনো ওজর আমি শুনিতে চাই না। আমার শরীর ত দেখিতেছিস্। তোদের একটা স্থিতি না করিয়া আমি কোনোমতেই সুস্থির হইতে পারিতেছি না। অর্দ্ধেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া আমি ঐ কথাই ভাবি।"

নলিনাক্ষ কহিল, "আচ্ছা মা, ভাবিয়ো না, তুমি ভাল করিয়া ঘুমাইয়ো, তুমি যেমন ইচ্ছা কর, তাহাই হইবে।"

নলিনাক্ষ চলিয়া গেলে ক্ষেমঙ্করী ডাকিলেন—"হরিদাসি।"

কমলা পাশের ঘর হইতে চলিয়া আসিল। তখন অপরাহ্নের আলোক ম্লান হইয়া ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। হরিদাসীর মুখ ভাল করিয়া দেখা গেল না। ক্ষেমঙ্করী কহিলেন—"বাছা, এই ফুলগুলিতে জল দিয়া ঘরে সাজাইয়া রাখ।" বলিয়া বাছিয়া একটি গোলাপ তুলিয়া ফুলের সাজিটি কমলার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

কমলা তাহার মধ্যে কতকগুলি ফুল তুলিয়া একটি থালায় সাজাইয়া নলিনাক্ষের উপাসনাগৃহের আসনের সম্মুখে রাখিল। আর কতকগুলি একটি বাটিতে করিয়া নলিনাক্ষের শোবার ঘরে টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিল। বাকি কয়েকটি ফুল লইয়া সেই দেয়ালের গায়ের আল্‌মারিটা খুলিল এবং সেই খড়মজোড়ার উপর ফুলগুলি রাখিয়া তাহার উপরে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেই তাহার চোখ দিয়া আজ ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই খড়ম ছাড়া জগতে তাহার আর কিছুই নাই—পদসেবার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছে।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে কে প্রবেশ করিতেই কমলা ধড়্‌ফড়্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দেখিল, নলিনাক্ষ। কোনোদিকে কমলা পালাইবার পথ পাইল না—লজ্জায় কমলা সেই আসন্ন সায়াহ্নের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল না কেন ?

নলিনাক্ষ ঘরের মধ্যে কমলাকে দেখিয়া বাহির হইয়া গেল। কমলাও আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তখন নলিনাক্ষ পুনর্ব্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মেয়েটি আল্‌মারি খুলিয়া কি করিতেছিল—তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিলই বা কেন ? কৌতূহলবশত নলিনাক্ষ আল্‌মারি খুলিয়া দেখিল—তাহার খড়মজোড়ার উপর কতকগুলি 'সদ্যসিক্ত' ফুল রহিয়াছে। তখন সে আবার আল্‌মারির দরজা বন্ধ করিয়া শয়নগৃহের জান্‌লার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শীতসূর্য্যাস্তের ক্ষণকালীন আভা মিলাইয়া আসিয়া অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

ক্রমশ।

ত্রিবঙ্কুর।

৫

যখন সূর্য্যের প্রখর তাপ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই অপরাহ্ণ চারঘটিকার সময় গায়ক-বাদকের দল আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দলে-দলে গরুর গাড়িতে আসিয়াছে। মহারাজা নিজ প্রাসাদের গায়ক-বাদক-দিগকে কিয়ৎকালের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

উহাদের মুখাবয়ব-রেখা সূক্ষ্ম ও সুকুমার, সমস্ত মুখশ্রী কলা-গুণিজন-সুলভ। নিঃশব্দে নগ্নপদে উহারা প্রবেশ করিল;—মার্জ্জারবৎ মখমল-কোমল-পদ-সঞ্চারে প্রবেশ করিল। দস্তুরমত সম্মানপ্রদর্শনার্থ একটু নতশির হইয়া, তাহার পর ভূতলে গালিচার উপর উপবেশন করিল। মাথায় ক্ষুদ্র জরির পাগ্‌ড়ি; উহাদের গাত্র পুরাকালীন গ্রীসীয়-ধরণে—রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত;—উদরের একপার্শ্ব অনাবৃত রাখিয়া উহা স্কন্ধের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় ধাতব বলয়ে ভূষিত। উহাদের ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা পরিচ্ছদের মধ্য হইতে আতর-গোলাপের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করিয়া বাহির হইতেছে।

উহারা তাম্রতন্ত্রীযুক্ত বড় বড় বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছে:—সে একপ্রকার বিরাট্ "ম্যাণ্ডলিন্" কিংবা "গিতার্"। যন্ত্রগুলির ডাণ্ডি বাঁকিয়া-গিয়া একপ্রকার বিরাড়াকার জন্তুবিশেষের মস্তকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই "গিতার্"-গুলি বিভিন্নপ্রকারের এবং উহা হইতে বিভিন্নপ্রকারের স্বর নিঃসৃত হইবার কথা। কিন্তু সকলগুলিরই স্বরকোষ প্রকাণ্ড এবং স্বরের রেঁস্ বৃদ্ধি করিবার জন্য যন্ত্রগুলির গায়ে ফাঁপা তুম্বসকল রহিয়াছে;—মনে হয়, যেন একটি তরু-কাণ্ডের গায়ে বড়-বড় ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এই যন্ত্রগুলি রং-করা, গিল্‌ট-করা, হাতীর-দাঁতের কাজ-করা, বহু পুরাতন, সম্পূর্ণরূপে শুষ্কীকৃত, শব্দযোনি ও বহুমূল্য দুর্লভ জিনিষ। কেবলমাত্র উহাদের বিচিত্র আকৃতি ও অদ্ভুত গঠন দেখিয়াই আমার মনে রহস্যময় ভাব—ভারতসংক্রান্ত রহস্যময় ভাব জাগিয়া উঠিল। বাদকেরা হাসিমুখে যন্ত্রগুলি আমাকে দেখাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গুলীর দ্বারা, কতকগুলি ছড়ের দ্বারা ও কতকগুলি ঝিনুকের দ্বারা বাজাইতে হয়। আর-এক-প্রকার যন্ত্র আছে—তাহার তারের উপর কালো ডিম্বাকার একটুক্‌রা আবলুশ্-কাষ্ঠ বুলাইয়া বাজাইতে হয়। বাদনের কি সূক্ষ্ম ভেদ! এই সকল সূক্ষ্মভেদ আমাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যার অগোচর!

তা ছাড়া, কতকগুলি "টম্‌টম্"-বাদ্য আছে,—সেগুলি বিভিন্ন সুরে বাঁধা। আবার, কতকগুলি বালক-গায়ক আসিয়াছে; উহাদের পরিচ্ছদ বিশেষরূপে জম্‌কালো ও

বিলাস-জৃম্ভিত। আমার জন্য, সঙ্গীত-কার্য্যের যে অনুক্রমণিকা ছাপা হইয়াছে, উহার একখণ্ড আমার হস্তে উহারা অর্পণ করিল। গায়ক-বাদকদিগের শ্রুতিমধুর অদ্ভুত নাম উহাতে লেখা রহিয়াছে—সকল নামগুলিই প্রায় দ্বাদশ-পদাক্ষরের।

পাঁচটা বাজিল। গায়ক-বাদকের দল সব-সুদ্ধ প্রায় ২৫জন। উহারা গালিচার উপর আসীন। যে বৈঠকখানা-ঘরে উহারা বসিয়াছে, সেই ঘরের মধ্যে এখনি যেন সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। দোলার দোলন-বৎ অলসভাবে "পাখা" চলিতেছে। এইবার সঙ্গীতের আলাপ সুরু হইবে; কেন না, যন্ত্রের অগ্রপ্রান্তস্থ পশুমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলি হইতে না-জানি-কি ভয়ানক শব্দ—এই "টম্‌টম্"-গুলি হইতে না-জানি-কি ভীষণ কোলাহলই সমুত্থিত হইবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি—একটা তুমুল শব্দ শুনিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। গায়ক-বাদকদিগের পশ্চাদ্ভাগে একটা খিলানা-কৃতি দ্বার উন্মুক্ত; তাহার পরেই একটা শাদা প্রবেশ-দালান। সেই দালানে অস্তমান সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি প্রবেশ করিয়া মহারাজের একদল সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়াছে। শোভার্থ সজ্জিত এই সৈনিকমূর্ত্তিগুলি, মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি পরিয়া, রক্তিম সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান। এদিকে, গায়ক-বাদকের দল ঘোর-ঘোর অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে নিমজ্জিত।

উহাদের সঙ্গীত কি আরম্ভ হইয়াছে? হাঁ, বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, দেখিতেছি, উহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কিছুই ত শুনা যাইতেছে না।...না না—ঐ যে...একটি ক্ষুদ্র তার-গ্রামের সুর—কদাচিৎ শ্রুতিগ্রাহ্য—"লোহেন্‌গ্রিন্"-গীতিনাট্যের উদ্ঘাটক আলাপ-চারীর ন্যায় অতি-বিলম্বিত লয়ে বাদিত হইতেছে। পরে, উহা "দ্রুন্"-লয়ে বাজিতে লাগিল, তান-পল্লবে জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু শব্দের মাত্রা, আদৌ বৃদ্ধি না পাইয়া, শুধু ছন্দোময় গুঞ্জনে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সকল শক্তিমান্ তন্ত্রীসমূহ হইতে নিঃশব্দপ্রায় সঙ্গীত বাহির হইতেছে!—যেন করপুট-বন্দী মক্ষিকার গুন্‌গুন্‌শব্দ, যেন জান্‌লা-শাসির গায়ে পতঙ্গের ঘর্ষণশব্দ অথবা যেন dragon-fly মক্ষিকার কাতরধ্বনি বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে একজন মুখের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের জিনিষ রাখিয়া তাহার উপর গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিয়া ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছন্‌ছন্ শব্দ বাহির করিতেছে। একটা বৃহৎ "গিতারের" উপর এবং অন্যান্য বিচিত্র যন্ত্রের উপর বাদক যেন অতি ভয়ে-ভয়ে ও সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া প্রায় একই সুর ক্রমাগত বাহির করিতেছে। পেচকের চাপা কণ্ঠস্বরের ন্যায়, ক্রমাগত হুহু!—হুহু!—এই-রূপ শব্দ নির্গত হইতেছে। আবার সুদূর সমুদ্রতটের উপর বীচিভঙ্গশব্দের ন্যায় একপ্রকার চাপা আওয়াজ কোন-এক যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। একপ্রকার "টম্‌টম্"-জাতীয় যন্ত্র আছে, তাহার কিনারার উপর বাদক অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া

বাজাইতেছে।...তাহার পর, হঠাৎ অতর্কিত-পূর্ব্ব কতকগুলি ঝাঁকানি আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ মুহূর্ত্তদ্বয়-স্থায়ী। সেই সময় "গিতার্"-তন্ত্রীগুলি যার-পর-নাই সজোরে কম্পিত হইতে থাকে এবং টম্‌টম্‌গুলি হইতেও তখন গম্ভীর চাপা আওয়াজ বাহির হইতে থাকে। কোন ফাঁপা মাটির উপর গুরুপদক্ষেপে হাতী চলিয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, উহার সেইরূপ শব্দ; অথবা কোন গূঢ়মার্গ আন্তর্ভৌম জল-প্রবাহনিঃসৃত কল্লোলের ন্যায়—কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত প্রশমিত হইল। আবার সেই পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দপ্রায় বাদনক্রিয়া।

একজন ব্রাহ্মণযুবক—যার চোখদুটি অতি সুন্দর—সে ভূমির উপর আসনবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জানুর উপর একটি জিনিষ রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যেরূপ সুশোভন ও সুরুচিসূচক, এ জিনিষটা ঠিক তার বিপরীত। ইহা নিতান্ত রূঢ় গ্রাম্যধরণের। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ি, তাহার মধ্যে কতকগুলো নুড়ি। হাঁড়ির বৃহৎ মুখটা তাহার নগ্ন সুবক্র বক্ষের উপর স্থাপিত। ঐ মুখের কিয়দংশ যে পরিমাণে খুলিয়া রাখিতেছে কিংবা বুকে চাপিয়া বন্ধ করিতেছে, তদনুসারে তন্নিঃসৃত শব্দেরও তারতম্য হইতেছে। এবং অঙ্গুলীর দ্বারা সেই হাঁড়িটা এত তাড়াতাড়ি বাজাইতেছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহার শব্দ কখন লঘু, কখন গভীর, কখন খট্‌খটে। এক-এক সময়ে যখন নুড়িগুলা নড়িয়া উঠে, তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় পট্‌পট্‌শব্দ শ্রুত হয়। পূর্ব্বোক্ত শব্দময় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন কোন একটি গিতার্ হইতে স্বতন্ত্রভাবে তান উত্থিত হয়, তখন কোন স্বর হইতে স্বরান্তরে গড়াইয়া যাইবার সময় ধ্বনিটা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আবেগময় তানটি সজোরে পূর্ণস্বরে বাদিত হয় এবং তীব্র যাতনায় যেন একেবারে অধীর ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন টম্‌টম্‌গুলির বাদ্য এই কম্পমান আর্ত্তনাদকে আবৃত না করিয়া, একপ্রকার রহস্যময় তুমুল শব্দ বাহির করিতে থাকে। উহা মানবহৃদয়ের দুঃখ-যাতনার পরাকাষ্ঠা এরূপ তীব্রভাবে প্রকাশ করে—যাহা আমাদের উচ্চতম পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সাধ্যাতীত।...

—"হস্তীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে"—একজন বলিয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলাম—এই বাক্যে আমার সেই মোহ ছুটিয়া গেল।...হাতী আবার কোথা হইতে আসিল?—ও! মনে পড়িয়াছে; ...ভারতীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত হাওদা-সমেত একটি হস্তী দেখিবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং তদনুসারে আমার জন্য রাজার হস্তিশালা হইতে হস্তী সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ হয়।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। কেন না, হাতী দেখিবার জন্য এখন আমাকে ঘরের বাহির হইতে হইবে। বাড়ীর দ্বারদেশ পার হইয়াই হঠাৎ দেখিলাম—আমার সম্মুখে তিনটা বড়-বড় হস্তী দণ্ডায়মান। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই তিনটা হাতী দ্বারদেশের সন্নিকটে আমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। উহাদের সর্ব্বশরীর

সাজসজ্জায় এরূপ আবৃত যে, সম্মুখে আসিয়া প্রথমে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না;—লক্ষ্য হয় শুধু উহাদের সুদীর্ঘ আত্মরক্ষণের অস্ত্র দন্তদ্বয়, উহাদের কালো-ফুট্‌কি-যুক্ত গোলাপি-রঙের প্রকাণ্ড শুণ্ড, আর উহাদের কর্ণদ্বয়—যাহা হাতপাখার ন্যায় ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছে। সবুজ ও লাল রঙের দীর্ঘ পরিচ্ছদ; শুন্ডযুক্ত হাওদা, ঘণ্টিকার হার এবং জরির টুপি—যাহা উহাদের বিস্তৃত ললাট পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। তিনটা হাতীই প্রকাণ্ড, ৭০বৎসর বয়ঃক্রম, বেশ বলিষ্ঠ, আর এমন বশ্য—এমন শান্ত। উহাদের বুদ্ধিব্যঞ্জক ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত হইল। আর এমন শায়েস্তা, যাহাতে আমি ধীরে-সুস্থে আরোহণ করিতে পারি, তজ্জন্য অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল।

আবার যখন আমি সেই মক্ষিকাগুঞ্জন-বৎ সঙ্গীতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, তখন শুভ গোধূলি সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্তব্ধপ্রায় সমবেত সঙ্গীতের বিরাম হইতেছে—সেই অবকাশ-কালে প্রত্যেক যন্ত্র আবার পৃথক্‌ভাবে খুব উচ্চৈঃস্বরে সজোরে তান ধরিতেছে। বাদক কোনটাকে ছড়ের দ্বারা, কোনটাকে হস্তের দ্বারা প্রপীড়িত—কোনটাকে বা মিজ্‌রাফের দ্বারা সন্তাড়িত করিতেছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, কোনটাকে তারের উপর ডিম্বাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড বুলাইয়া কাঁদাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই বিষাদময় সুরগুলি, মঙ্গলিয়া কিংবা চীন-দেশীয় সঙ্গীতের ন্যায়, আমাদের নিকট নিতান্ত দূরদেশীয় কিংবা দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় না। আমরা উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। সেই একই মানবজাতির সুতীব্র মর্ম্মবেদনা উহারা প্রকাশ করিতেছে—যে জাতি কালসহকারে আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মূলত ভিন্ন নহে। "জিগান্"-নামক য়ুরোপীয় বেদিয়ারা আমাদের মধ্যেও এইরূপ জ্বরজ্বালাময় সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে।

শেষে কণ্ঠসঙ্গীত। একটির পর একটি সেই সমস্ত সুকুমার বালকগুলি (সুন্দর-পরিচ্ছদ-পরিহিত—বড় বড় চোখ) খুব তাড়াতাড়ি দ্রুতলয়ে কতকগুলি গান গাহিল। উহাদের বালকণ্ঠস্বর ইহারই মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে—চিরিয়া গিয়াছে। জরির পাগ্‌ড়ি-পরা একটি লোক উহাদের অধিনেতা ও শিক্ষক। সে মাথা নীচু করিয়া—পাখীকে যেরূপ সর্পেরা দৃষ্টির দ্বারা মুগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্তক্ষণ উহাদের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। মনে হইল, যেন সে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা উহাদিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে;—ইচ্ছা করিলে যেন সে উহাদের ভঙ্গুর ক্ষীণ কণ্ঠযন্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। "কনিষ্ঠ-গ্রামের" সুরে উহারা যে গান ধরিয়াছিল, সেই গানটিতে কুপিত কোন দেবতাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রসন্ন করা হইতেছে।

সর্ব্বশেষে, ঐ দলের যে প্রধান গায়ক, এইবার তাহার গাহিবার পালা। ত্রিশবর্ষ-বয়স্ক যুবাপুরুষ, দেখিতে বলিষ্ঠ, সুন্দর মুখশ্রী। কোন যুবতী ভামিনীর বল্লভ আর

তাহাকে ভালবাসে না বলিয়া সেই কামিনী আক্ষেপ করিয়া যে গান করিতেছে, সেই গানটি ঐ গায়ক এইবার আমাকে শুনাইবে।

সে বরাবর ভূতলেই বসিয়া ছিল। প্রথমে সে গানটি মনে-মনে ঠিক করিয়া লইল, পরে, তাহার দৃষ্টি একটু ঘোর-ঘোর ভাব ধারণ করিল। তাহার পরেই সে একেবারে সজোরে গলা ছাড়িয়া দিল। প্রাচ্যদেশীয় শানাই প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর অতীব তীক্ষ্ণ। স্বর-গ্রামের কতকগুলি সুরের উপর পুরুষোচিত বল-সহকারে (একটু কর্কশ) উহার কণ্ঠস্বর স্থায়ী হইল। খুব তীব্রভাবে (আমার পক্ষে নূতন) কত মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিল। তাহার মুখে কত দুঃখের ভঙ্গী—তাহার সরু-সরু হস্তে কত কষ্টের সঙ্কোচন প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সমস্তই উচ্চাঙ্গকলার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

ইহারা মহারাজের খাস্ গায়ক-বাদক। মহারাজা প্রতিদিন, রুদ্ধপ্রাসাদে, ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, উহাদের সঙ্গীত শুনিয়া থাকেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে ভৃত্যবর্গ মার্জ্জারবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জোড়হস্তে নতশিরে ক্রমাগত প্রণাম করে।...জীবনের দুঃখযন্ত্রণা, প্রেমের দুঃখ-যন্ত্রণা, মৃত্যুর দুঃখযন্ত্রণা—এই সম্বন্ধে মহারাজের কল্পনা ও চিন্তাপ্রবাহ আমাদিগের হইতে না-জানি কত ভিন্ন!...আদব-কায়দার সহিত বিদেশীয় ভাষায় বাধ-বাধ-ভাবে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা স্বল্পক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে যত-না আমি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি—তাহা অপেক্ষা এই উচ্চাঙ্গের দুর্লভ সঙ্গীত (যাহা তাঁহার খাস্ জিনিষ) শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনোভাবের একটু বেশি আভাস পাইয়াছি, সন্দেহ নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়সঙ্গীত।

(১)

শতাব্দীর দীপ্তসূর্য্য এইবার উঠিয়াছে জ্বলি
প্রাচীপথ আলো করি। জাগিয়াছে নব বলে বলী
এশিয়ার সুপ্ত সিংহ। বহি আসে গভীর গর্জ্জন;
ছুটে আসে লক্ষধারে নবোদিত রবির কিরণ
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে।—ভাগ্য যার চির অন্ধকার,
তার দ্বারে আজ কেন সৌভাগ্যের শুভ সমাচার?
এ কাহার পরিহাস, কার্ এই নিদারুণ খেলা,
শ্মশানে বসাতে চাহে অকস্মাৎ উৎসবের মেলা?

(২)

মৃত যারা, তারা আজ কি বুঝিবে জীবনের স্বাদ ?
তাদের ললাটে লেখা —আছে, থাক্ কলঙ্ক-সংবাদ ।
তবু কি ঘুমাবে তারা ? ঘুমে কারো নাই অধিকার ;
মেলি তন্দ্রালস আঁখি দেখে নিক্ আলোক আবার ।
হায় আঁধারের কীট, চিরদিন রহিলি এমন ;
বৃথা তোর আশে-পাশে আসিতেছে নব জাগরণ !
তাই মুগ্ধ বিশ্ব ভরি উঠিছে যে জয়কোলাহল,
তার মাঝে যোগ দিতে আজ তোর বক্ষে নাহি বল ।

(৩)

তাই তোর মুখে শুনি' জয় আর যশের ঘোষণা,
ব্যঙ্গ করে বিশ্ববাসী । রাখ্ তবে নিষ্ফল বন্দনা !
এই দৃপ্ত সমারোহ, উৎসবের মঙ্গল-আচার,
মাতৃভূমি, হে বিধবা, এতে তোর নাই অধিকার ।
কোথা সে অম্বর, মুক্ত, কোথা এই লোহার পিঞ্জর !
পারে কি খাঁচার পাখী ফুটাইতে অভ্রবাহী স্বর ?
তবু আজ প্রাণভরা উদ্বেলিত আনন্দ-বিস্ময়,
বাহিরে ঝঙ্কারি তোলে,—জয় জয়, জাপানের জয় ।

(৪)

কাদের এ দেশ ? তারা কবে হ'ল জগতে প্রকাশ ?
কি ভাব ? কি ভাষা ?—ছিল এদের কি কোন ইতিহাস,
যাহে ভাবী গৌরবের চিহ্ন কিছু গিয়েছিল দেখা ?
কিম্বা এরা সদ্যসৃষ্ট, ভাগ্যচক্রে উঠে এল একা
জলন্ত গ্রহের মত, আত্মতেজে আপনি অধীর,
নাই ত্রুটি, নাই দৈন্য ; হেরি' বিশ্ব নোয়াইল শির ?
আজ শুধু প্রাণভরা বন্দনার আনন্দ-বিস্ময়,
উচ্ছ্বাসে গাহিয়া উঠে,—জয় জয়, এশিয়ার জয় ।

(৫)

কাহাদের বাহুবল সংগঠিত হৃদয়ের বলে,
সংযমী সাধক ত্যাগী কারা দীর্ঘ তপস্যার ফলে,
ধর্ম্ম কাহাদের কর্ম্মে জেগে থাকে ধ্রুবতারামত,
দর্পে কারা নহে স্ফীত, অবিচারি-অবমানে নত,

কারা হেন শক্তিধর বিশ্বস্পর্দ্ধী জয় অগণন
পারে নির্ব্বিকারচিত্তে অনায়াসে করিতে গ্রহণ,
কাহাদের দেশহিত নহে শুধু বাক্যের প্রবাহ,
ঘরে ঘরে যার তরে পড়ে গেছে মরণে উৎসাহ!

(৬)

মিত ভাষা, ক্ষিপ্র কর্ম্ম, সৌজন্য, ঔদার্য্য অতুলন,
শান্ত সহৃদয় গৃহে, রণে কারা অজেয় ভীষণ,
যুদ্ধশেষে কারা ভুলে প্রতিহিংসা ঘোর বৈরিতার,
ক্ষমা-প্রেমে করে কারা অরাতিরে চির আপনার,
নাই ভীরু পলায়িত অবিশ্বাসী কাহাদের ঘরে,
বীরপ্রসূ অন্তঃপুরে ক্ষমা নাই কাপুরুষ-তরে,
ছিন্ন করি' আলিঙ্গন পতি-পুত্রে আপনার হাতে
সাজায়ে পাঠায় কারা মৃত্যুশুভ্র যশের সভাতে!

(৭)

কাহাদের রাজতন্ত্র পীড়নের যন্ত্রসম নয়,
রাজভক্তি প্রজাপ্রীতি এক খাতে একসাথে বয়,
রাজার প্রাসাদ হ'তে তুচ্ছতম দীনের কুটীরে
ঐক্যে সখ্যে পূত মন্ত্র বাজিতেছে অন্তরে-বাহিরে,
কাহাদের গৃহস্থালী ধনধান্যে স্বাস্থ্যে উদ্ভাসিত,
শিল্পসজ্জা পণ্যভার দেশে আর বিদেশে পূজিত,
কাদের বাণিজ্যতরী উড়াইয়া বিজয়কেতন
স্বগর্ব্বে সর্ব্বত্র ফিরি করিতেছে সৌভাগ্যকীর্ত্তন!

(৮)

কাহাদের শিক্ষাদীক্ষা দেশান্তরে লভি নববল
স্বজাতির স্বদেশের করিতেছে শুধু মুখোজ্জ্বল,
কাহাদের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ নহে গণ্য ধনে আর কুলে।
গৌরবের সিংহাসন গুণিজনে শিরে লয় তুলে!
কারা এই মহাজাতি, ধন্য কোন্ রত্নগর্ভা ভূমি?
কেমনে বলিব তাহা, হে ভারত, কি সুধাও তুমি!
হে মোর দুর্ব্বলা মাতা, তব রক্তে গঠিত যে প্রাণ,
বীরযোগ্য বন্দনা কি তার কণ্ঠে পায় কভু স্থান?

(৯)

ধন্য ধন্য বীরভূমি, ধন্য ধন্য হে বীরের জাতি,
জয় হোক্, জয় হোক্, চিরদীপ্ত থাক্ যশোভাতি।
আবার আসুক্ শান্তি, গ্লানিশেষে পরম মঙ্গল,
পুন তব গৃহে গৃহে উঠুক্ আনন্দকোলাহল!
ধনধান্যে থাকো পূর্ণ, প্রীতিপুণ্যে অক্ষুণ্ণ সতত,
সমস্ত বিশ্বের শিরে শোভা পাও কিরীটের মত।
মহোজ্জ্বল অতীতের অনাদৃত ভ্রংশ-ধ্বংস-প'রে
তোমারে সম্মুখে করি' এশিয়া দাঁড়াক্ গর্ব্বভরে।

(১০)

পশ্চিমের গণ্ডী ছাড়ি' ভাগ্যরেখা পূবে এল সরি,
হারায়ো না পশ্চিমের মিথ্যা আর স্বার্থ অনুসরি'
ভাগ্যের সে অভ্যুদয়। হারায়ো না আপন সম্বল,
ত্যাগে স্নিগ্ধ, সত্যে শুদ্ধ প্রাচ্যের সে আদর্শ উজ্জ্বল,
যে সাধনবলে পেলে বিধাতার অনুকম্পা হেন,
সে আলোক জ্বেলে রেখো, ভস্ম তাতে নাহি হ'য়ো যেন,
পড়িয়ো না রাজরোষে, কত রাজ্য চূর্ণ হ'ল যায়,
মহাসম্রাটের সেই দণ্ড যেন পড়ে না মাথায়।

(১১)

ভারতের পুণ্যতীর্থ, এশিয়ার প্রজ্বলিত আশা,
এই ভালো, এই ভালো! আর যেন বাড়ে না পিপাসা।
অতিদর্প, অতিলোভ, অতিস্ফীতি ধ্বংসের কারণ,
এই চিরন্তন নীতি চিরদিন রাখিয়ো স্মরণ।
আর তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ অভিমানি হে মোর স্বদেশ,
নবীনের পদতলে বসি লহ নব উপদেশ।
বল তারে,—জ্যেষ্ঠত্ব না মান যদি, মোরে শিষ্যবৎ
ডাক স্নেহে তব কাছে, গড়ে' তোল মোর ভবিষ্যৎ।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

রঘুবংশ।

দিলীপের পুত্রলাভ।

রঘুবংশের প্রথম আট সর্গে বর্ণিত বৃত্তান্তগুলির মূল কোথায়, এই প্রশ্ন স্বতই সকল পাঠকের মনে উদয় হয়। এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসা রঘুবংশের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় না। অথচ বিষয়টি বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। সম্প্রতি 'বঙ্গবাসী'-সংবাদপত্রের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড' পাঠ করিতে করিতে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাইলাম, সেটির সহিত রঘুবংশের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত 'দিলীপের পুত্রলাভ' প্রসঙ্গের কতকটা মিল রহিয়াছে।* পাঠকগণের, বিশেষত কলেজের ছাত্রবর্গের নিকট বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত না থাকাই সম্ভব, এই বিবেচনায় অদ্যকার প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম।

রঘুবংশবর্ণিত বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে ও স্থূলভাবে বলিতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়:—একদা রাজা দিলীপ অন্যমনস্কতাবশত ইন্দ্রের কামধেনুর প্রতি সমুচিত সম্মান দেখান নাই। সেই অবমাননায় কামধেনু রাজাকে শাপ দেন যে, তাঁহার দুহিতার সেবা না করিয়া রাজা অপত্যলাভ করিবেন না। পরে রাজা অনপত্যতানিবন্ধন মনস্তাপে কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। ঋষিবর যোগবলে শাপবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজাকে স্বীয় আশ্রমে প্রতিপালিতা কামধেনুদুহিতা 'নন্দিনীকে ভক্তিসহকারে সেবা করিতে বলিলেন। রাজাও নন্দিনীর সেবা করিয়া সেই গবীর নিকট অভীপ্সিত বর পাইলেন ও যথাসময়ে পুত্রলাভ করিলেন। গোচারণকালে একটি ঘটনা হইয়াছিল, সেটিও উল্লেখযোগ্য। একদিন এক প্রকাণ্ডকায় সিংহ ধেনুকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন ধর্ম্মশীল রাজা আপনার দেহবিনিময়ে ধেনুর নিষ্ক্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু বাস্তবিক সেটি মায়াসিংহ রাজার ভক্তিপরীক্ষার্থ নন্দিনীকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সূক্ষ্ম ঘটনাগুলি ছাড়িয়া দিলে মুখ্যবৃত্তান্তটি এই দাঁড়ায় যে, ধেনুর সমুচিত সম্মান না করিলে শ্রেয়োহানি ঘটে ও পুত্রলাভের জন্য গোসেবা প্রশস্ত উপায়। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়, গোসেবায় অক্ষয় পুণ্যলাভ হয় ও গোজাতির প্রতি অনাদরে প্রত্যবায় ঘটে। এই প্রসঙ্গে ঋতম্ভর রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্তটি এই:—ঋতম্ভর রাজা পুত্রলাভের জন্য জাবালি-ঋষির উপদেশে গোসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং গবীর উচ্ছিষ্ট তৃণজলে ক্ষুৎপিপাসা প্রশমিত করিয়াছিলেন। একদিন রাজা বনশোভা-নিরীক্ষণে অন্যমনা হইয়া আছেন, এমন সময়ে এক সিংহ আসিয়া গবীকে আক্রমণ করিল। অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির

* রামায়ণে ঘটনাটি অবশ্য নাই। রামায়ণে দিলীপ রঘুর প্রপিতামহ। (আদিকাণ্ড, ৭০ অধ্যায়)

সহিত 'কালিদাসবর্ণিত ঘটনাগুলির ঐক্য নাই। কিন্তু উপাখ্যানের শেষভাগে আবার একইপ্রকারের বৃত্তান্ত রহিয়াছে। ঋতম্ভর রাজাও আবার অন্ত ধেনু চরাইয়া তাহার নিকট ঈপ্সিত পুত্রবর পাইলেন। তাহা হইলেই দেখা গেল, উভয় স্থলেই ঋষির উপদেশে গোসেবার কথা রহিয়াছে। উভয় স্থলেই গোসেবার প্রণালী, সিংহের আক্রমণ ও সেবাপ্রসন্না ধেনুর বরদান, অনেকটা একরকমের। পাঠকগণ রঘুবংশের শ্লোকগুলির সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের সৌসাদৃশ্য সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিবেন, এই আশায় উপাখ্যানটির প্রধান প্রধান অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম।*

ঋতম্ভরোঽত্র নৃপতিরনপত্যঃ পুরাভবৎ।
কলত্রাণি বহূন্যস্য ন পুত্রং প্রাপ তেষু বৈ ॥ ১৭ ॥
তদা জাবালিনামানং মুনিং দৈবাদুপাগতম্।
পপ্রচ্ছ কুশলোদ্‌যুক্তঃ স পুত্রোৎপত্তিকারণম্ ॥ ১৮ ॥
স্বামিন্ বন্ধ্যাস্য মে ব্রূহি পুত্রোৎপত্তিকরং বচঃ।
যৎ কৃত্বা জায়তেঽপত্যং মম বংশধরং বরম্ ॥ ১৯ ॥

* * * *

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা জগাদ মুনিসত্তমঃ।
সুতোৎপত্তিকরং বাক্যং প্রণতস্য সুতার্থিনঃ ॥ ২১ ॥
অপত্যপ্রাপ্তিকামস্য সন্ত্যুপায়াস্ত্রয়ঃ প্রভো।
বিষ্ণোঃ প্রসাদো গোশ্চাপি শিবস্যাপ্যথবা পুনঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাত্ত্বং কুরু বৈ পূজাং ধেনোর্দেবতনোর্নৃপ।
যস্যাঃ পুচ্ছে মুখে শৃঙ্গে পৃষ্ঠে দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ২৩ ॥
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং বাঞ্ছিতং ধর্ম্মসংযুতম্।
এবং বিদিত্বা গোপূজাং বিধেহি ত্বমৃতম্ভর ॥ ২৪ ॥

১৮শ অধ্যায়।

তস্মাত্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ গোপূজাং বৈ সমাচর।
সা তুষ্টা দাস্যতি ক্ষিপ্রং পুত্রং ধর্ম্মপরায়ণম্ ॥ ১৫ ॥

* * * *

জাবালিঃ কথয়ামাস ধেনুপূজাং যথাবিধি।
প্রত্যহং বিপিনং গচ্ছেচ্চারণায় ব্রতী তু গোঃ ॥ ১৭ ॥
গবে যবাংস্তু সন্তোজ্য গোময়স্থান্ সমাহরেৎ।
ভক্ষণীয়া যবাস্তে তু পুত্রকামেন ভূপতে ॥ ১৮ ॥
সা যদা পিবতে তোয়ং তদা পেয়ং জলং শুচি।
সোচ্চস্থানে যদা তিষ্ঠেৎ তদা নীচাসনস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
দংশান্ নিবারয়েন্নিত্যং যবসং স্বয়মাহরেৎ।
এবং প্রকুর্ব্বতঃ পুত্রং দাস্যতে ধর্ম্মতৎপরম্ ॥ ২০ ॥
ইতি বাক্যং সমাকর্ণ্য পুত্রকাম ঋতম্ভরঃ।
ব্রতঞ্চকার ধর্ম্মাত্মা ধেনুপূজাং সমাচরন্ ॥ ২১ ॥
প্রত্যহং কুরুতে গাঞ্চ যবসাদ্যেন তোষিতাম্।
দংশান্ ন্যবারয়দ্ধীমান্ যবভক্ষ্যকৃতাদরঃ ॥ ২২ ॥
এবং ধেনুং পূজয়তো গতাস্তু দিবসা যদাঃ।
বনমধ্যে তৃণাদীংশ্চ চরন্তীমকুতোভয়াম্ ॥ ২৩ ॥
একদা নৃপতিস্তস্য বনস্য শ্রীনিরীক্ষণে।
ন্যস্তদৃষ্টিঃ স পরিতো বভ্রাম সুকুতূহলী ॥ ২৪ ॥
তদাগত্যাহনদ্‌গাং বৈ পঞ্চাস্যঃ কাননান্তরাৎ।
ক্রোশন্তীং বহুধা দীনাং হম্বারাবেণ দুঃখিতাম্ ॥ ২৫ ॥
তদা নৃপঃ সমাগত্য বিলোক্য নিজমাতরম্।
সিংহেন নিহতাং পশ্যন্ রুরোদাতীব বিহ্বলঃ ॥ ২৬ ॥

* * * *

পূর্ব্ববৎ পালয়ন্ ধেনুং জগাম বিপিনং মহৎ।
রামনাম স্মরন্নিত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মৈ তুষ্টা তু সুরভিঃ প্রোবাচ পরিতোষিতা।
রাজন্ বরয় মত্তো বৈ বরং হৃৎস্থং মনোরমম্ ॥ ৫১ ॥
তদা প্রোবাচ বৈ রাজা পুত্রং দেহি মনোরমম্।
রামভক্তং পিতুর্ভক্তং স্বধর্ম্মপ্রতিপালকম্ ॥ ৫২ ॥
তুষ্টা দত্বা বরং সাপি তস্মৈ রাজ্ঞে সুতার্থিনে।
জগামাদর্শনং দেবী কামধেনুঃ কৃপাবতী ॥ ৫৩ ॥

১৯শ অধ্যায়।

রঘুবংশের আরও অনেক স্থলের সহিত পদ্মপুরাণের কোন কোন শ্লোকের ঐক্য লক্ষ্য করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ

* শ্লোকগুলি 'বঙ্গবাসী'-সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত।

রঘুবংশের আরম্ভে কালিদাসের বিনয়গর্ভ শ্লোককয়েকটির সহিত পদ্মপুরাণের পাতাল-খণ্ডের আরম্ভে বর্ণিত শেষনাগের উক্তির কয়েকটি শ্লোকের সৌসাদৃশ্য দেখাইতেছি:—

রামপারিকথাবার্দ্ধৌ মশকো মাদৃশঃ কিয়ান্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মোহিতা ন বিদন্ত্যপি॥ ১২॥
তথাপি ভো ময়া তুভ্যং বক্তব্যং স্বীয়শক্তিতঃ।
পক্ষিণঃ স্বগতিপ্রায়ং খে গচ্ছন্তি সুবিস্তরে॥ ১৩॥

* * * *

রঘুনাথস্য সংকীর্ত্তির্মদ্বুদ্ধিং নির্ম্মলীমসাম্।
করিষ্যতেঽগ্নিসম্পর্কাৎ কনকং অমলং যথা॥ ১৫॥

১ম অধ্যায়।

রঘুবংশে দিলীপের পুত্রলাভবৃত্তান্ত ও পদ্মপুরাণে ঋতম্ভরের বৃত্তান্ত পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিতে গেলে দেখা যায়, পৌরাণিক বৃত্তান্তটি নিতান্ত কাঁচা (Crude); পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনায় প্রকৃত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা হইতে এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, মহাকবি এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত হইতেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নিজের শিল্পনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ইংরাজিসাহিত্যে দেখিতে পাই, কবিশ্রেষ্ঠ শেক্স্পীয়র তাঁহার নাটকের গল্পাংশ অপরের নিকট গ্রহণ করিয়াও, স্বীয়প্রতিভাবলে আখ্যানবস্তুর পরিবর্ত্তন করিয়া ও পাত্রগণের চরিত্র নূতন করিয়া গড়িয়া, অসাধারণ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। প্রতিভাশালী কবির কৃতিত্বই এইখানে। সেইজন্যই কবিবর মিল্টন্ বলিয়াছেন 'To borrow and to better it in the process is no plagiary.'

আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে কালিদাস প্রতিভার বলে উপাখ্যানটির কিরূপ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন, ইহা একটা দেখিবার জিনিষ। প্রথমত দেখিতেছি, কালিদাস সমস্ত বৃত্তান্তটিকে rationalise করিতেছেন, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর করিয়া তুলিতেছেন। অলৌকিক ঘটনাকেও প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আনিবার চেষ্টা শেক্স্পীয়র তাঁহার 'টেম্পেষ্ট' প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতঘটনামূলক নাটকে করিয়াছেন। কালিদাসের প্রণালীও এস্থলে কতকটা সেইরূপ। গোনিগ্রহে শ্রেয়োহানি ও গোসেবায় পুত্রলাভ হয়, এই পৌরাণিক তত্ত্বটি সাধারণভাবে বলিলে যেন কেমন-কেমন শুনায়। সম্ভবত কালিদাসের কালেও স্বাধীনচিন্তার স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল,—পুরাণবর্ণিত বৃত্তান্তগুলি শিক্ষিতলোকে অবিচারিতভাবে লইতে ইতস্তত করিত। সেইজন্য কবি যে-সে ধেনুর কথা বলিতেছেন না,—ইন্দ্রের কামধেনু ও বশিষ্ঠপ্রতিপালিতা কামধেনুদুহিতা নন্দিনীর কথা বলিতেছেন। দেবযোনি ধেনুর ক্রোধে ও প্রসাদে কি না হইতে পারে? কালিদাসের বর্ণিত ব্যাপারে বেশ একটা সুস্পষ্ট কার্য্যকারণসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কামধেনুর অবমাননায় যখন অনপত্যতা ঘটিয়াছিল, তখন কামধেনুদুহিতার সেবায় যে সেই দৈবী বাধা দূরীভূত হইয়া পুত্রলাভ ঘটিবে, ইহা বেশ সুসঙ্গত মনে হয়। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে এই দৈবী বাধার উল্লেখ নাই। অবমানিতা কামধেনুর সাক্ষাৎভাবে প্রসাদন না করাটা পাছে অসঙ্গত ঠেকে, সেইজন্য কালিদাস বশিষ্ঠের

মুখ দিয়া সে কথাটাও বলাইয়াছেন যে, ঐ উপায় এখন সুদূরপরাহত। দিলীপের অন্যমনস্কতার কারণটি যদিও সুরুচিসঙ্গত নহে বলিয়া বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু সেখানেও একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ওরূপ অপরাধের ঐরূপ শাস্তিই ঠিক যুক্তিযুক্ত। এ ঠিক সেই শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপের ন্যায় logical। এইখানেই কালিদাসের কৃতিত্ব ও কাব্যকৌশল। এতক্ষণে বুঝা গেল, শাপবৃত্তান্ত সংযোজনা করিয়া পরবর্ত্তী বৃত্তান্তটিকে অনেকটা সম্ভবপর করিয়া তোলা হইয়াছে। ইহার উপর আবার বশিষ্ঠের যোগবলে শাপবৃত্তান্তজ্ঞান প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার সন্নিবেশিত করিয়া ঘটনাটিকে আরও জমাট করিয়া তোলা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক সকল ব্যাপারেই যেন একটা অলৌকিকের প্রভাব আসিয়া পড়িতেছে।

ঋতম্ভরের উপাখ্যানে ধেনুর বরেই তাঁহার পুত্রলাভ ঘটিল। কালিদাস এখানেও দুইটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া ব্যাপারটিকে সম্ভবপর করিয়া (rationalise করিয়া) তুলিয়াছেন। প্রথম, যদিও নন্দিনীর বরেই রাজার অভীষ্টসিদ্ধি হইল, তথাপি কবি একটা স্থূলকারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা সেই সুলক্ষণা গবীর দুগ্ধপান করিতে আদিষ্ট হইলেন। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, যজ্ঞীয় চরুর ন্যায় সেই দুগ্ধেই পুত্রবীজ নিহিত ছিল। দ্বিতীয়, কুলগুরুর আদেশে 'রাজা ও রাজ্ঞী ইন্দ্রিয়দমনে, বাহ্যাভ্যন্তরশুচি হইয়া সংযম অভ্যাস করিলেন। এখানেও আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সেই পবিত্রভাবে সম্মেলনেই পুণ্যাত্মা রঘুর উৎপত্তি। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' এই ঋষিবাক্যের অনুসারে কবি সস্ত্রীক দিলীপকে তপোবনে আনিয়াছেন ও কুলগুরুনির্দ্দিষ্ট সংযম পালন করাইয়াছেন। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে এ সকল কিছুই নাই।

পরে সিংহের আক্রমণব্যাপারেও কালিদাস একটু সূক্ষ্ম শিল্প দেখাইয়াছেন। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে দেখা যায় যে, ঋতম্ভর রাজা বনশোভায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া গবীকে ছাড়িয়া এদিক্-ওদিক্ বেড়াইতেছিলেন,—'পরিতো বভ্রাম',—ইত্যবসরে সিংহ গবীকে আক্রমণ করিল। ইহাতে রাজার অপরাধ গুরুতর ঠেকে। অপর পক্ষে কালিদাস বলিতেছেন, রাজা দিলীপ অন্য কোথাও যান নাই, ধেনুর কাছে থাকিয়াই ক্ষণমাত্রের জন্য পর্ব্বতের শোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই অনর্থ ঘটিল। এখানে রাজার অপরাধ খুব কম। তাহার উপরও আবার কালিদাস একটা যুক্তির অবতারণা করিয়া রাজার অপরাধ আরও লঘু করিয়া দিতেছেন :—'সা দুষ্প্রধর্ষা মনসাপি হিংস্রৈঃ' ইহা ভাবিয়াই রাজা অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। পরে আবার যখন দেখিলাম যে, সেটা মায়াসিংহ,—নন্দিনীর মায়ায় পরিকল্পিত, তখন ত বেশই বুঝিলাম, রাজার কিছুই অনবধানতা ঘটে নাই; রাজা বরাবর ধেনুর উপর ন্যস্তদৃষ্টি থাকিলেও এই অনর্থ ঘটিত। রাজাকে উন্মনস্ক করিবার জন্যই যে নন্দিনী দেবমায়ায় পর্ব্বতশোভা বাড়াইয়া তোলেন নাই, অথবা দেবমায়ায় রাজাকে

উদ্ভ্রান্তচিত্ত করেন নাই, এ কথাই বা সাহস করিয়া কে বলিতে পারে? ঋতম্ভর রাজা আততায়ী সিংহের বধের উদ্যোগ না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলাইলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে জাবালির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনায় দিলীপের বীরত্ব, করুণচিত্ততা, ক্ষত্রিয়োচিত আর্ত্তত্রাণশীলতা, মহানুভাবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সম্যক্ পরিচয় পাই। ঋতম্ভরের ন্যায় দিলীপ সত্যসত্যই গোবধ-জনিতপাপভাক্ হইলেন না। এই প্রসঙ্গেও আবার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে মূলবৃত্তান্তটি আরও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

আরও দুইএকটি খুঁটিনাটিতে কালিদাসের প্রতিভার পরিচয় পাই। ঋতম্ভরের উপাখ্যানে জাবালি-ঋষি দৈবাৎ আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ আছে। এটা নিতান্ত অকৌশলীর মত নির্দ্দেশ। কালিদাস, দিলীপকে অপুত্রতার কারণ ও প্রতিষেধের উপায় জানিবার জন্য, কুলগুরুসন্নিধানে যাত্রা করাইয়াছেন। তিনি যে পুণ্যাত্মা ছিলেন, ইহা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার ইন্দ্রালয়ে অবাধ গতিবিধি ছিল, এ কথাও কবি কৌশলে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। স্বর্গ হইতে অবতরণকালে তাঁহার অন্যমনস্কতার যে সুরুচিবিগর্হিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানেও তিনি ধর্ম্ম-জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন,—কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তাড়নায় নহে, ইহাই কবির অভিপ্রেত। দুইটি স্থলে তাঁহার অন্যমনস্কতার উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, তাঁহার চিত্তের একাগ্রতার কিঞ্চিৎ ত্রুটি ছিল। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্যই কুলগুরু তাঁহাকে সংযম অভ্যাস ও গোসেবা করিতে নিযুক্ত করিলেন, এরূপও অনুমান করা যায়। গোময়স্থ-যব-ভক্ষণ একটু বীভৎস হয় বলিয়া, কালিদাস এটুকু পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক কাব্যকৌশলই ধরা পড়ে।

পদে পদে পুরাণবর্ণিত ঋতম্ভরের উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের সর্গদ্বয়ের তুলনা করিতে গিয়া কবির কাব্যকে বড় আংশিক ও খণ্ডিত ভাবে দেখিতে হইয়াছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলাম, মূলগল্পটি কবি স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে কেমন ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। এখন যদি সমস্ত বিবরণটি একত্র করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কালিদাসের কি অতুলনীয় প্রতিভা ও রচনাকৌশল। দিলীপের ধর্ম্মনিষ্ঠতা ও পরাক্রম, তাঁহার সুশাসন ও রাজ্যসমৃদ্ধি, অপুত্রতাবশত চিত্তক্ষোভ ও এই অনর্থপ্রশমনের জন্য কুলগুরুর উপদেশ লইতে সস্ত্রীক তপোবন-যাত্রা; পথের শোভাবর্ণন, তপোবনের মাহাত্ম্য ও তপোবনবাসিগণের ক্রিয়াকলাপ-বর্ণন; বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর সহিত দিলীপ ও সুদক্ষিণার সদালাপ, বশিষ্ঠের কুশল-পরিপ্রশ্ন, রাজার সখেদ নিবেদন, বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক যোগবলে অপুত্রতার কারণনির্দ্দেশ ও তৎপ্রশমনের উপায়নির্দ্দেশ; নন্দিনীর তৎসমকালে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, রাজা ও রাজ্ঞীর শুদ্ধাচারে গোসেবা, রাজার

গোচারণে যাত্রা; কাননের শোভাবর্ণন, ধেনুর চেষ্টাদিবর্ণন, সিংহের সহিত রাজার কথোপকথন, নন্দিনীর প্রসন্নতা ও বরদান; রাজার তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন ও নন্দিনীর নিদেশপালন; ইত্যাদি পর-পর ঘটনা কালিদাস সুকৌশলে ও সুসৌষ্ঠবে সাজাইয়া একখানি সুবিন্যস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। তাহাতে দিলীপের দেবচরিত্র জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হইতেছে, এবং তপোবন ও গোচারণস্থলী, গোপপল্লী ও শৈলশিখর, পয়স্বিনী হোমধেনু ও শুদ্ধসংযত ঋষিদম্পতি, এ সমস্তই তাহার পশ্চাতে ও পার্শ্বে স্পষ্ট মানসগোচর হইতেছে। পঞ্চতন্ত্রোক্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যেমন মৃতসিংহের অস্থিগুলি সংগ্রহ করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে সেগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন, মহাকবি কালিদাসও সেইরূপ অনন্যসামান্য প্রতিভাবলে শুষ্কনীরস পৌরাণিক উপাখ্যানটিকে সরস ও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশীয় মদ্য।

এদেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে মদ্যপান প্রচলিত আছে। সমাজের যে সকল লোকই মদ্যপান করিত, এমন নহে; কিংবা মদ্যপান যে দূষণীয় বিবেচিত হইত না, তাহাও নহে। এখানে মদ্যের বা মদ্যপানের দোষগুণ বিচার্য্য নহে। মদ্য যে বিদেশ হইতে এদেশে আসে নাই, উহার সাধনক্রম যে দেশীয়, তাহাই এখানে স্মরণ করা যাইতেছে। বস্তুত যে দেশে মধুপর্ক ও মধু সবিশেষ প্রচলিত ছিল, সে দেশে মধুশব্দের এক অর্থ মদ্য হওয়া বিচিত্র ছিল না। যে দেশে তাল ও খর্জ্জুর রস একদিন রাখিয়া দিলে সে রসের মাদকতা জন্মে, সে দেশে মদ্যপিপাসা অক্লেশে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। যে দেশে মধুপুষ্প (মউলফুল) ও ইক্ষুরস সুলভ্য ছিল, সে দেশে নানাবিধ মদ্য প্রস্তুত করা দুরূহ ছিল না। বৈদিককালের সোমরস গণনার মধ্যে না আনিয়া পুলস্ত্য, দ্বাদশবিধ মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।* যথা, পানস—পনস বা কাঁঠাল হইতে, দ্রাক্ষ দ্রাক্ষা হইতে, মাধূক—মধু হইতে, খার্জ্জুর—পাকা খেজুর হইতে, তাল—পাকা তাল হইতে, ঐক্ষব—ইক্ষুরস হইতে, মাধ্বীক—মউলফুল হইতে, টাঙ্ক—কপিত্থ হইতে, মার্দ্বীক—মৃদ্বিক বা দ্রাক্ষাবিশেষ হইতে, মৈরেয়—ধাত্রীপুষ্প-(ধাউফুল)-যোগে শর্করা হইতে, নারিকেলজ—নারিকেলের জল বা নারিকেলগাছের রস হইতে, মদ্য জাত হইত। এই একাদশবিধ মদ্য ব্যতীত সুরানামক মদ্য ছিল। মনু বলেন—

* মনুসংহিতার টীকায় কুল্লুকভট্ট।

গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।

গুড় হইতে গৌড়ী, যবতণ্ডুলাদি হইতে পৈষ্টী এবং মধুপুষ্প (মউল) হইতে মাধ্বী*—এই ত্রিবিধ মদ্য সুরানামে কথিত হইত। পুলস্ত্য সুরাকে সকল মদ্যের অধম বলিয়াছেন, এবং মনু সুরাপান কেবল শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ করেন নাই। বোধ হয়, মদ্য চ্যাবিত করিলে (চোয়াইলে) সুরা বা অর্ক (আরক) হইত। চ্যাবিত মদ্য অচ্যাবিত মদ্য অপেক্ষা তীক্ষ্ণ বলিয়া সুরার অধমত্ব হইয়াছিল, কিংবা শৌণ্ডিক সুরাজীবী ছিল বলিয়া সুরা দ্বিজগণের অপেয় হইয়াছিল। সুরা বলিলে পূর্ব্বকালে পৈষ্টী সুরা অধিক বুঝাইত। সুরা চ পৈষ্টী মুখ্যোক্তা। মনু বলেন, সুরা অন্নের মল।

উপরে দ্বাদশবিধ মদ্যের প্রধান উপকরণের উল্লেখ করা গিয়াছে। বস্তুত প্রাচীনকালের কোন মদ্য কেবল একটি উপকরণে প্রস্তুত হইত না। পানস মদ্য করিতে পাকা আম, মাংস, দুগ্ধ, সিদ্ধি প্রভৃতি; দ্রাক্ষমদ্য করিতে দধি মধু; মাধুকমদ্য করিতে বিড়ঙ্গ, সালেপ মিশ্রি, লবণাদি; খার্জ্জুরমদ্য করিতে কাঁঠাল-আদা; ইত্যাদি প্রযুক্ত হইত।† বঙ্গদেশের মধ্যে বেহারে এবং বেহারের মধ্যে গয়াজেলায় মদ্যপান অত্যন্ত প্রচলিত আছে। সেখানে ধনবান্ মদ্যপায়ী আম, বেল, কাঁঠাল, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি উপকরণ সুরাজীবীর নিকট পাঠাইয়া ইচ্ছামত সুরা প্রস্তুত করিয়া আনেন।

উল্লিখিত দ্বাদশবিধ মদ্য ব্যতীত অন্য বহুবিধ মদ্যের নাম পাওয়া যায়। সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদে অন্য কয়েকপ্রকার মদ্যের নাম আছে। তন্মধ্যে দুইএকটির নাম করা যাইতেছে। শীধু দ্বিবিধ;—ইক্ষুর পক্করসে সিদ্ধ, পক্বরসশীধু; এবং ইক্ষুর আমরসে সিদ্ধ, শীতরসশীধু। বারুণী— পুনর্নবা-(পুণ্যে)-যুক্ত তাল বা খর্জ্জুররস জাত। চলিত কথায় ইহাকে তালী বা তাড়ী বলা যাইতে পারে। অরিষ্ট- পক্ক ঔষধের জলযুক্ত মদ্য, এবং আসব—অপক্ক ঔষধের জলযুক্ত মদ্য, আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্যবর্গের অন্তর্গত। মদ্যের অবস্থাবিশেষ বা সঞ্জাত-মদ্যভাবকে আসব বলে।‡

বর্ণ, আস্বাদ, উৎপত্তি এবং শরীরের প্রতি ক্রিয়াভেদে মদ্য নানাবিধ। কিন্তু একটি উপাদান যাবতীয় মদ্যে বর্ত্তমান থাকে। তাহারই মাদকতাগুণে মদ্যের মাদকতা, এবং পরিমাণানুসারে মদ্যের তীক্ষ্ণতা বা মৃদুতা হয়। আধুনিক ও প্রাচীন শব্দসাম্যরক্ষার নিমিত্ত এই উপাদানকে কোহল বলা যাইবে। সুশ্রুত কোহল-নামক মদ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

যে দ্রব্যে শর্করা আছে, কিংবা যাহাকে শর্করায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, তাহা হইতেই কোহল পাওয়া যাইতে পারে। শর্করার কিয়দংশ কোহলে, অপর কিয়দংশ কার্বন্ দ্বাক্সাইড্ নামক গ্যাসে পরিণত হয়। এনিমিত্ত শর্করার সহিত প্রচুর জল মিশ্রিত

---

* মধুকবৃক্ষো মধুস্তৎপুষ্পৈঃ কৃতা সা মাধ্বী।—কুল্লুকভট্ট।

† মৎস্যতন্ত্র। রাজেন্দ্রলাল in J. A. S. B. for 1873, quoted in the Report of the Bengal Excise Commission, 1883—84.

‡ আসবো মদ্যানামবস্থাবিশেষঃ সদ্যঃকৃতসংসাধনঃ সঞ্জাতমদ্যভাবঃ।—বাচস্পত্য।

করা আবশ্যক। শুষ্ক শর্করা কোহলে পরিণত হইতে পারে না। তাই আমরা চিনি ও মিছরি খাইতে পাই। শর্করারস অত্যন্ত ঘন হইলেও কোহল জন্মিতে পারে না। তাই আম, বেল প্রভৃতি ফলের মোরব্বা করা যাইতে পারে। কিন্তু জলমিশ্রিত হইলেও শর্করা স্বত কোহলে পরিণত হইতে পারে না। জলমিশ্রিত শর্করার সহিত দ্রব্যবিশেষ যোগ করা আবশ্যক। ইহাকে মদ্যবীজ বলা যায়। মনুর ভাষায় ইহার নাম কিণ্ব। যেমন দুগ্ধে দধিবীজ যোগ না করিলে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় না, তেমনই সজল শর্করায় কোহল-কিণ্ব না পড়িলে কোহল জন্মে না। গ্রীষ্মানুসারে তাল ও খর্জ্জুর রস দুইতিন ঘণ্টায় মদ্যে পরিণত হয়। সে রসে জল ও শর্করা থাকে; খর্জ্জুরবৃক্ষের পত্রাদিতে এবং বায়ুতে কোহল-কিণ্ব ধূলিবৎ বিদ্যমান আছে। কালক্রমে তাহা রসে গিয়া পড়িলে রসের শর্করার কিয়দংশ কোহলে এবং অপর কিয়দংশ কার্বন্-ডায়ক্সাইড্নামক গ্যাসে পরিণত হয়। ফলে রস হইতে উক্ত গ্যাসের বুদ্বুদ উঠিতে থাকে, এবং রসের মাদকতাগুণ আসে। সেই কিণ্বের যোগ নিবারিত হইলে মিষ্টরসে কোহল জন্মিতে পারে না। কোহল-কিণ্ব সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্‌বিশেষ। উহা এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। পুঞ্জীকৃত হইলে সূক্ষ্ম বস্তুও দৃষ্ট হয়। তাড়ী দুইচারিদিন রাখিয়া দিলে তলে শাদা কাদার মত বস্তু জমিতে দেখা যায়। তাহাই পুঞ্জীকৃত সূক্ষ্ম উদ্ভিদরূপ কোহল-কিণ্ব। শুকাইলে তাহা শাদা ধূলার মত হয়। তদবস্থায় তাহার ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। সদ্য খেজুররসে অল্পসংখ্যক কিণ্বরূপ উদ্ভিদ পতিত হয়। কিন্তু তাহারা প্রচুর খাদ্য পাইয়া একদিকে পুষ্টিলাভ ও বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, অন্যদিকে রসের শর্করার কোহলিক বিকার উৎপন্ন হয়। তেমনই দধিবীজে দধ্যম্ল-কিণ্ব থাকে। দুগ্ধে একপ্রকার শর্করা থাকে। তজ্জন্য দুগ্ধের ঈষৎ মিষ্ট স্বাদ আছে। দধ্যম্ল-কিণ্বের ক্রিয়াবশত দুগ্ধশর্করার কিয়দংশ দধ্যম্লে পরিণত হয়। এইরূপ, ধান্যমণ্ডাদিসন্ধিত কাঞ্জিক বা আমানি ও তাড়ীর অম্লত্বের কারণস্বরূপ বিশেষ বিশেষ কিণ্ব আছে। কিন্তু যাবতীয় কিণ্বের একটি লক্ষণ এই আছে যে, তাহাদের অত্যল্পেই উপযুক্ত দ্রব্যের বহুপরিমাণে বিকার উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ বিকারকে সন্ধান * (fermentation) বলা যায়।

তবে, কোহল পাইতে হইলে শর্করা, জল এবং কোহল-কিণ্ব আবশ্যক। বায়ুর উষ্ণতাবিশেষে কিণ্ব সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উষ্ণতা তদপেক্ষা উনাধিক হইলে বৃদ্ধি মন্দ-মন্দ হয়। অধিক উষ্ণতায় এই সকল কিণ্বরূপ উদ্ভিদ, অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায়, অবসন্ন বা মৃত হয়। শীতকালে খেজুররস অল্পসময়ে মাতিয়া উঠে না, গ্রীষ্মকালে অল্পসময়ের মধ্যে মাতিয়া উঠে, এবং পরে অম্ল হইয়া পড়ে। এখানে প্রথমে কোহল-

* কেহ কেহ সন্ধান-শব্দে distillation বুঝিয়াছেন। কিন্তু ভাবপ্রকাশের সন্ধানবর্গ দেখিলে তাঁহাদের ভ্রম তিরোহিত হইবে।

কিণ্ব এবং পরে শুক্ত-কিণ্ব, এই দুই বিকার উৎপাদন করে।

শর্করা একপ্রকার নহে, নানাপ্রকার আছে। যাবতীয় শর্করা সমভাবে কোহল-কিণ্বাক্রান্ত হয় না। ইক্ষুশর্করা সহসা কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয় না। কিন্তু মধু-সহজেই হয়। গ্রীষ্মকালে মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে একদিনেই মধু-শর্করার কিয়দংশ কোহলে পরিণত হয়। এখানে অবশ্য বায়ুর ধূলিরূপে বিদ্যমান কোহলকিণ্ব মধুতে পতিত হয়। মধুতে দ্বিবিধ শর্করা থাকে। সদ্য মধু রৌদ্রে রাখিলে মধুর কিয়দংশ দানা বাঁধে, কিয়দংশ বাঁধে না, দ্রবভাবেই থাকে। ঐ দুই অংশ দ্বিবিধ শর্করা। যে শর্করা দানা বাঁধে, তাহা শ্বেতসারকে (যেমন পালো) বিকৃত করিলে পাওয়া যায়। এজন্য সে শর্করাকে শ্বেতসার-শর্করা বলা যায়। মধুর যে শর্করা দানা বাঁধে না, তাহা অধিকাংশ মিষ্টফলের রসের মিষ্টতার কারণ। এজন্য এই শর্করাকে ফল-শর্করা বলা যায়। মধুতে ইক্ষুশর্করা নাই। কিন্তু ইক্ষুশর্করাকে উক্ত দ্বিবিধ শর্করাময় মধুবিশেষে পরিণত করিতে পারা যায়। ইক্ষুশর্করা মধুশর্করায় পরিণত হইলে তাহা কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয়, এবং তখন কোহলের উৎপত্তি হয়। তবে, গুড় হইতে কোহল পাইতে গেলে ইক্ষুশর্করাকে প্রথমে মধুশর্করায়, এবং পরে মধুশর্করাকে কোহলে পরিণত করিতে হয়। এখানে দুইটি ক্রিয়া হয়।

তাড়ীতে কোহলকিণ্ব থাকে। জল-মিশ্রিত মধুতে অত্যল্প তাড়ী বা কোহলকিণ্ব যোগ করিলে মধুশর্করা দ্রুতবেগে কোহলে পরিণত হইতে থাকে। কোহলকিণ্ব জলে ফেলিয়া ছাঁকিলে সেই কিণ্বের একপ্রকার নির্যাস পাওয়া যায়। সে নির্যাসে কিণ্ব থাকে না। কিন্তু ইক্ষুশর্করার সহিত সে নির্যাস যোগ করিলে, ইক্ষুশর্করা মধুশর্করায় পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত্যল্প নির্যাস বহুপরিমিত ইক্ষুশর্করাকে মধুশর্করায় পরিণত করিতে পারে। অতএব এই নির্যাসের ক্রিয়া কিণ্বতুল্য। কিন্তু কিণ্ব জীবিতপদার্থ, কঠিন; এই নির্যাস জীবিত-পদার্থ নহে, দ্রব জৈবপদার্থ। ইংরাজিতে এরূপ কিণ্বধর্ম্মসম্পন্ন পদার্থকে 'এন্‌জাইম্' (enzyme) বলে। ক্লেদে জাত বলিয়া বাঙ্‌লায় ইহাকে ক্লৈদ বলা যাইতে পারে। তবে, ইক্ষুগুড়ে কোহলকিণ্ব পড়িলে কোহল-কিণ্বজাত ক্লৈদবিশেষের ক্রিয়ায় ইক্ষুশর্করা প্রথমে মধুশর্করায় পরিণত হয়; * তখন কোহলকিণ্বের ক্রিয়ায় সে শর্করা কোহলে পরিণত হয়।

তণ্ডুল, যব, গোধূমাদিতে শ্বেতসারনামক পদার্থ আছে। আরারুট সেই পদার্থ। শ্বেতসারকে শর্করাবিশেষে (শ্বেতসার-শর্করায়) পরিণত করিতে পারা যায়। শ্বেতসার ও শর্করার মূল উপাদান একই,—কার্বন্, হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্। উভয়ের মধ্যে একটা সুবোধ্য প্রভেদ এই যে, শ্বেতসার জলে দ্রব হয় না, শর্করা হয়।

* অত্যল্প হাইড্রোক্লোরিক্ কিংবা সল্‌ফ্যুরিক্ অম্লের সহিত ইক্ষুশর্করাজল ফুটাইলে মধুশর্করা হয়। এখানে এরূপ অজৈবক্রিয়া আলোচ্য নহে।

তণ্ডুল হইতে কোহল পাইতে হইলে তণ্ডুলকে প্রথমে শর্করায় পরিণত করা আবশ্যক। শর্করা হইলে তাহাকে কোহলে পরিণত করা সুসাধ্য। আমরা তণ্ডুলকে শর্করায় নিত্য পরিণত করিয়া থাকি। আমরা চাউল বা ভাত খাই ; তাহা পাকাশয়ে দ্রবীভূত না হইলে রক্তের সহিত মিশিতে পারিত না। তেমনই ধান্য হইতে যখন অঙ্কুর বহির্গত হয়, তখন তাহা মাটি, জল, বায়ু লইয়া নিজের খাদ্য গড়িতে পারে না। তখন তাহা ধান্যে সঞ্চিত চাউল খাইয়া বাঁচিতে ও বাড়িতে থাকে। চাউল বা চাউলের শ্বেতসারাদি পদার্থ রসে পরিণত না হইলে সে রস চারার সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতে পারিত না। অতএব দেখা যাইতেছে, চাউলের শ্বেতসার দ্রবীভূত হইতে পারে। এইরূপে যবতণ্ডুলাদির শ্বেতসার হইতে যে শর্করা জন্মে, তাহাকে যবশর্করা বলা যায়। যবশর্করা মধুর ন্যায় সহজে কোহলকিণ্বাক্রান্ত হয়। অতএব যব, তণ্ডুল, গোধুম, বিলাতি আলু প্রভৃতি যাহাতে শ্বেতসার আছে, তাহাকেই মদ্যের উপকরণ করা যাইতে পারে।

জলে চাউল ভিজাইয়া রাখি, চাউল দ্রব হয় না। চাউল ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করি, চাউলের শ্বেতসার জলের সহিত মিশিয়া ভাতের ফেন হয়। কিন্তু জলে শর্করা যেমন দ্রব হয়, শ্বেতসার তেমন দ্রব হয় না। কিন্তু ভাত খাই, তাহা মুখের লালা এবং উদরের পাচকাশয়-(pancreas)-রসযোগে, ভাতের শ্বেতসার শর্করাবিশেষে (যবশর্করায়) পরিণত হয়। মুখের লালা ও ক্লোমরসে ক্লেদবিশেষ থাকে। তাহাদেরই ক্রিয়ায় শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয়। যেমন বহুবিধ কিণ্ব আছে, তেমনই বহুবিধ ক্লেদ আছে। আমরা যে দাইলমৎস্য-মাংস খাই, তৎসমুদয় আমাশয়ের রসস্থিত ক্লেদ দ্বারা জীর্ণ হয়। ডুমুর ও পেঁপের রসে তত্তুল্য ক্লেদ আছে। তাহার ক্রিয়ায় মাংস দ্রব হয়। যেমন কিণ্ব পৃথক্ করিতে পারা যায়, ক্লেদ তেমন পৃথক্ করিতে পারা যায় ; কিন্তু বিশুদ্ধ পাইবার উপায় অদ্যাপি অজ্ঞাত। তবে তাড়ীর সহিত যেমন কোহলকিণ্ব চলিয়া আসে, তেমনই পেঁপের রসের সহিত পেঁপের ক্লেদ চলিয়া আসে।

এই সকল তত্ত্বে আর অধিক প্রবেশ না করিয়া এখন দেশীয়মদ্যোৎপাদন বুঝা যাউক। আজকাল বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থানে গুড় হইতে, বিহারে (এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার কোন কোন জেলায়) মউল হইতে, এবং ওড়িশার তিনটি জেলায় চাউল হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন মউলের সহিত অল্প গুড় মিশ্রান হইয়া থাকে। তবে, বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় ;

গৌড়ী মাধ্বী চ পৈষ্টী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।

ইহাদের সহিত তাড়ী আনিলে,

গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী নির্যাসাঃ কথিতাঃ পরাঃ।

পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মদ্য প্রাচীনকালে যে ক্রমে প্রস্তুত হইত, অদ্যাপি সেই ক্রমই চলিতেছে। কারণ গবর্মেণ্ট উৎপন্ন সুরার উপর শুল্ক লইয়াই ক্ষান্ত হন, সুরাজীবীর অবলম্বিত ক্রমে হস্তক্ষেপ করেন না।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, মদ্য ও সুরা শব্দের অর্থ এক নহে। মদহেতু দ্রবদ্রব্যমাত্রেই মদ্য, কিন্তু মদ্যমাত্রেই সুরা নহে। গৌড়ী, মাধ্বী ও পৈষ্টী সুরা। এই সকল সুরা পাইতে চ্যাবন বা পাতন আবশ্যক। সুরা-শব্দের প্রাচীন অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া চ্যাবিত মদ্যমাত্রের সামান্যনাম সুরা রাখা যাইতে পারে। চ্যাবন বা চোয়ান অর্থে কোন দ্রব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং সেই বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করা বুঝায়। জল, কোহল ও বহুবিধ গন্ধদ্রব্যকে তাপে বাষ্পীভূত এবং তাহাদের বাষ্পকে শীতে ঘনীভূত করিতে পারা যায়। কোহল জলে মিশে; কিন্তু জল অপেক্ষা কোহল অধিক উদ্বেয় অর্থাৎ সহজে বাষ্পীভূত হয়। যাবতীয় মদ্যে কোহলের সহিত জল ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে যে সকল পদার্থ উদ্বেয়, তৎসমুদয় তাপ পাইলে কোহল ও জলের সহিত বাষ্পাকারে চলিয়া আসে, অনুদ্বেয় পদার্থ পড়িয়া থাকে।

সুরাপাতন নিমিত্ত যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার সংস্কৃত নাম ময়ূরযন্ত্র। কেহ কেহ তাহাকে বকযন্ত্র বলেন। ময়ূর বা বকের আকারের সহিত সে যন্ত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চলিত ভাষায় ইহার নাম অন্ধা। অন্ধা অন্ধশব্দের অপভ্রংশ। এই নাম হইবার কারণ এই যে, এই যন্ত্রের পাত্রের মুখ বন্ধ থাকে, অথচ ভিতরে বাষ্প উত্থিত ও ঘনীভূত হইতে থাকে। এই যন্ত্রের তিনটি অঙ্গ:—(১) একটি স্থালী (ভাটী), যাহাতে মদ্য রাখিয়া আগুনে উত্তপ্ত করা হয়; (২) একটি স্থালী (ধরণী), যাহাতে বাষ্প ঘনীভূত এবং ক্ষরিত হয়; ইহা শীতল জলে ব্যাপ্ত থাকে; (৩) একটি কি দুইটি নল ভাটীর ও ধরণীর মুখে যুক্ত থাকে। দেশীয় অন্ধায় বাঁশের নল ব্যবহৃত হয়। জল ও কোহলের বাষ্প ভাটী হইতে নলপথে ধরণীতে উপস্থিত হয়। সেখানে শীতে ঘনীভূত হইয়া সুরা হয়। কোন কোন স্থানে গর্ভযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রে নল থাকে না। চুলীর উপরে তিনটি হাঁড়ি উপরে উপরে রাখিলে যেমন দেখায়, গর্ভযন্ত্র সেইরূপ দেখায়। প্রথম, নীচের হাঁড়িটি বড়; তাহাতে মদ্য থাকে। তৃতীয়, উপরের হাঁড়িটি ছোট; তাহাতে শীতল জল থাকে। দ্বিতীয়, মধ্যের হাঁড়িটির তলে একটি ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের পাশে ইটের টুকরা রাখিয়া তাহার উপরে একটি ছোট হাঁড়ি বা ভাঁড় বসান হয়। এই ভাঁড়টি সুরাধার। নীচের হাঁড়ি হইতে সুরাবাষ্প উঠিয়া দ্বিতীয় হাঁড়িতে প্রবেশ করে। তাহার মুখে স্থাপিত শীতল হাঁড়ির সংস্পর্শে সে বাষ্প জমিয়া সুরাধারে ক্ষরিত হয়। এইরূপে মদ্যের সমস্ত কোহল পৃথক্ হয় না। কিন্তু যন্ত্র প্রস্তুত করা সুসাধ্য। বঙ্গীয় সুরা-কমিশন্ মনে করিয়াছেন যে, গুপ্তভাবে সুরাপাতন নিমিত্ত গর্ভযন্ত্র অধিক ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে গর্ভপাতনযন্ত্র আবশ্যক হয়। নেপালীরা এইরূপ যন্ত্রে সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

কোহলের পরিমাণানুসারে মদ্য তীক্ষ্ণ বা মৃদু হয়। যে মদ্যে যত অধিক কোহল থাকে, সে মদ্য তত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মাদকতা-শক্তিসম্পন্ন। এখানে ভাঙ্, ধুতুরা, কুচিলা,

প্রভৃতির মাদকতা লক্ষ্য নহে। মদ্যের কোহলের পরিমাণজ্ঞাপন নিমিত্ত 'প্রমাণ-সুরা' (proof spirit) নামক সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। ওজনে জলের প্রায় সমান কোহল থাকিলে সেই-জল-মিশ্রিত কোহলকে 'প্রমাণ-সুরা' বলা যায়। বিলাতি ব্রাণ্ডি ও হুইস্কি প্রায় প্রমাণ-সুরা। প্রমাণ-সুরা অপেক্ষা অধিক কোহল থাকিলে তীক্ষ্ণ সুরা, এবং অল্প থাকিলে মৃদু সুরা হয়। দেশীয় প্রচলিত সুরার কোনটাই প্রমাণ-সুরা নহে; সকলেই জলের ভাগ অধিক থাকে।

এখন দেশীয় মদ্য বর্ণিত হইতেছে। (১) তাড়ী। ইহার নিমিত্ত কোন আয়োজন আবশ্যক হয় না। খেজুর বা তাল রস দুইতিনঘণ্টা রাখিয়া দিলেই তাড়ী হয়। অধিক সময় রাখিলে তাড়ী অম্ল হইয়া পড়ে। প্রথমে রসের শর্করা কোহলে, এবং পরে কোহল শুক্তাম্ল প্রভৃতি অম্লে পরিণত হয়। বায়ু ও গাছের পাতা প্রভৃতি হইতে কোহল-কিণ্ব ও শুক্তকিণ্ব রসে পতিত হয়। তাড়ীতে কোহলের ভাগ অল্প থাকে। শত ভাগে দুইতিন ভাগের অধিক প্রমাণ-সুরা প্রায় পাওয়া যায় না। খেজুররস হইতে মদ্য হয় বলিয়া ওড়িশার ব্রাহ্মণেরা খেজুরগাছ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না।

(২) পচাই। ইহাকে পচা ভাতের মদ্য বলা যাইতে পারে। বিলাতি বিয়র্-নামক মদ্য পচাইর তুল্য। কিন্তু ঐ দুই মদ্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী এক নহে। পচাই করিতে ভাতের সহিত 'বাকর'নামক উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত করিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হয়। পাঁচছয়দিনে ভাত সন্ধিত বা অভিষুত হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। সেই রসের সহিত জল মিশাইয়া কিংবা সন্ধিত ভাতের সহিত গরমজল মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইলে পচাই হয়। 'হাণ্ডিয়া'নামক মদ্যও পচাইমাত্র। চলিত কথায় পচাই 'পাঁচি'-মদ নামে খ্যাত। সাঁওতাল, কোল এবং বাউরি-বাগ্‌দি, ডোম-হাড়ি প্রভৃতি জাতিরা পচাই পান করিয়া থাকে। *

সুরা।—(১) গৌড়ী, কেবল গুড় হইতে উৎপন্ন। এ নিমিত্ত খেজুরেগুড় প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ আখের গুড় অপেক্ষা খেজুরে সস্তা। খাঁড় অপেক্ষা মাত বা চিটে বা চোয়া ভাল।† কারণ মাতে মধুশর্করা এবং খাঁড়ে ইক্ষু-শর্করা অধিক থাকে। জল ও গুড় বড় বড় মট্‌কাতে ঢালিয়া অল্প মদ্যবীজ (পুরাতন মদ্য) যোগ করা হয়। মট্‌কার গলা পর্য্যন্ত মাটীতে পোঁতা থাকে। একজন্য মট্‌কা সহসা ভাঙে না, মট্‌কায় জলও প্রায় সমান উষ্ণতায় থাকে। গ্রীষ্মকালে চারিপাঁচ-

* পচাই লেখকের অজ্ঞাত। উপরের বর্ণনা ১৮৮৩ সনের বেঙ্গল এক্‌সাইস্ কমিশনের রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

† 'সংস্কৃত গুড়শব্দে বাঙ্‌লা চিটে বা মাত বুঝায়। অতএব এই সুরাকে গৌড়ী বলাই সঙ্গত। বঙ্গদেশের গৌড়নগর কি গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল? সংস্কৃত শর্করা হইতে ইংরাজি sugar, এবং খণ্ড (বাঙ্‌লা খাঁড়, ওড়িয়া কণ্ড) হইতে ইংরাজি candy শব্দ হইয়াছে।

দিনে, এবং শীতকালে সাতআটদিনে 'ফুটা' বা কোহলিক সন্ধান শেষ হয়। তখন সেই জল চোয়াইলে গৌড়ী সুরা পাওয়া যায়। নির্জল শুষ্ক শর্করা হইতে মণকরা প্রায় ৪৬সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাইবার কথা।* কিন্তু বিলাতেও মণকরা ৪৩৷৷০ সের ভাঁড়ের অধিক পাওয়া যায় নাই। এদেশে গুড় (শর্করা নহে) হইতে ১৬ হইতে ২০ সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া যায়। কারণ গুড়ের জল ও কিট্টের পরিমাণ সমান থাকে না। তদ্ভিন্ন, সন্ধান ও চ্যাবনের দোষে সুরা কম হয়। সুরা চোয়াইয়া লইবার পর যে মদ্য অবশেষে থাকে, তাহাতে শর্করা ও কোহলের ভাগ থাকে। এজন্য তাহা ফেলিয়া না দিয়া নূতন মদ্য প্রস্তুত করিবার সময় গুড়ের সহিত মদ্যবীজস্বরূপ যোগ করা হইয়া থাকে।

(২) মাধ্বী সুরা।—মউলফুল হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতের অরণ্য মউলের প্রধান জন্মস্থান। কাংড়া ও অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ছোট-নাগপুর, গুজরাট ও বোম্বাই প্রভৃতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্থানে মউলের গাছ আছে। কেবল কলিকাতা ও মাদ্রাজ-অঞ্চলে নাই। চৈত্র বা মধুমাসে মধূকের ফুল হয়। গাছ হইতে ফুল পড়িতে থাকে, দরিদ্রস্ত্রীলোকেরা তাহা কুড়াইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। মউলফুলের ঘটাকার কিরীট (corolla) স্থূল ও মিষ্ট। কাঁচাফুল শুকাইলে ওজনে প্রায় অর্দ্ধেক শুকাইয়া যায়। সেই ফুলে শতকরা প্রায় ৪০ভাগ মধুশর্করা এবং প্রায় ১২ভাগ মধুশর্করার পরিণামশীল পদার্থ থাকে।† দরিদ্রলোকেরা মউলফুল চাউলের সহিত বাটিয়া পিটে করিয়া খায়। বস্তুত মউলের ফুল এদেশের বহু দরিদ্র-লোকের প্রাণধারণের উপায়স্বরূপ হইয়া আছে। মউলের ফল, বীজের শাঁস ও তৈল, এবং মউলের কাঠ, সকলই মূল্যবান্।

যেখানে মউলগাছ জন্মে, সেখানে ফুলের মণ প্রায় এক টাকা। যতই মূল্য হউক, তাহা গুড়ের মূল্য অপেক্ষা কম। সুতরাং মউল হইতে সুরা প্রস্তুত করায় লাভ আছে। যাঁহাদিগের নিকট সুরা পরিচিত, তাঁহারা বলেন, মউলের সুরা আইরিশ্ হুইস্কির তুল্য।

জলে মউলফুল ভিজাইয়া রাখিলেই ফুলের শর্করা কোহলে পরিণত হইতে থাকে। তবে, বায়ুর অনিশ্চিত কোহলকিণ্বের আশা না করিয়া মদ্যবীজ যোগ করিলে ক্রিয়া নিশ্চিত হইয়া উঠে। অতএব গুড় হইতে মদ্য প্রস্তুত করা যেমন সহজ, মউল হইতেও তেমনই সহজ। কিন্তু সুরাপায়ীরা কেবল কোহল চায় না, বিশেষ গন্ধ ও স্বাদও চায়।

* ইংরাজি gallon ৫সের ভাঁড় ধরা গেল।

† সকল মউলফুলে জল এবং শর্করার ভাগ অবশ্য সমান থাকে না। কোন ফুলে ৩৬ ভাগ+১২ ভাগ শর্করা, কোন ফুলে ৪২+১০ ভাগ পাইয়াছি। সে যাহা হউক, যে ফুলে এত মধু থাকে, তাহার নাম মধুপুষ্প হওয়াতে ভালই হইয়াছে। মাক্ষিক মধুতে শত ভাগে প্রায় ৭২ ভাগ মধুশর্করা থাকে। মধুমাসে জাত বলিয়া মধুপুষ্প, না মধু আছে বলিয়া মধুপুষ্প নাম হইয়াছে? মধু, মহু, মউ হইতে মহুল, মহুয়া, মউল প্রভৃতি চলিত নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কোলেরা মউলগাছকে মধূকং দারু বলে। তেমনই তাহারা সালগাছকে সর্জরস বলে। সংস্কৃত হইতে কোল না কোল হইতে সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি?

এই গন্ধ ও স্বাদ জন্মাইতে সকল শৌণ্ডিক দক্ষ নহে। কেহ বা অধিক লাভের আশায় মণ্ডের জলের পরিমাণ কম করে, কেহ বা সুরার শেষ পর্য্যন্ত মণ্ড চ্যাবিত করিতে থাকে। উভয় স্থলেই সুরায় এক দোষ জন্মে। রসায়নবিদ্যায় কোহল একটি নহে, বহুবিধ আছে। সুরাপায়ী একপ্রকার কোহল চায়, কিন্তু অধিকাংশ সুলভ সুরায় কেবল সেই কোহলটি না থাকিয়া অন্যবিধ কোহল ও উদ্বেয় পদার্থ থাকে। এই সকল পদার্থ তৈলাকারে সুরার উপরে ভাসিতে থাকে। এই তৈল বিষাক্ত, উৎকটগন্ধ ও তীব্রস্বাদ। সুতরাং পেয় সুরায় তৈল না থাকিলেই ভাল। মণ্ড যত ঘন হয়, পাতিত সুরায় তত তৈল থাকে। মণ্ড ঘন করিলে চ্যাবনব্যয় কম হয়। কিন্তু ঘন মণ্ডে কোহলের পরিমাণ কম হয়। ইহার দুই কারণ আছে। শর্করার ঘনজলে কোহলকিণ্ব স্বচ্ছন্দে বাড়িতে পারে না, এবং কোহলের ভাগ কিছু অধিক হইলেও পারে না। এইরূপ কারণে শর্করার ঘনরসে কিংবা সুরাতে জৈবপদার্থ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে শীঘ্র পচে না। সুতরাং চ্যাবনব্যয় কমাইতে গিয়া শৌণ্ডিকের অন্যদিকে ক্ষতি হয়। সুরা-উৎপাদন ব্যবসায়ের বিষয়। ক্রেতার রুচি অনুসারে সুরাজীবী সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। যাহারা ঘোর মাতাল হইতে চায়, তাহারা সুরাতৈল আকাঙ্ক্ষা করে। আবার, প্রতারক সুরাবিক্রেতা সতৈল সুরায় জল মিশাইয়া তীক্ষ্ণ সুরা বলিয়া বিক্রয়ের পথ দেখে। দেশীয় সুরাকরে একমণ মউলফুল হইতে গড়ে ১২।১৩সের ভাঁড় প্রমাণসুরা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু মণকরা অর্দ্ধেক শর্করা ধরিলে প্রায় ২০সের ভাঁড় পাইবার কথা। বিলাতে এইরূপ পাওয়া গিয়াছে।

অধিকাংশ দেশীয় সুরাকরে কেবল গুড় কিংবা কেবল মউলের মণ্ড না করিয়া ঐ দুই দ্রব্য মিশাইয়া করা হইয়া থাকে। এইরূপে গৌড়মধ্বী সুরা পাওয়া যায়। বাস্তবিক কোহলিক সন্ধানের নিমিত্ত বিভিন্ন শর্করা ও কিট্টযুক্ত (গাদযুক্ত) শর্করা ভাল। মউলের সপ্তমাংশ কি অষ্টমাংশ গুড় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে মণ্ড শীঘ্র সন্ধিত হয় এবং বোধ হয় সুরাপায়ীর নিকট গুণেও ভিন্ন হয়। দেখা যায়, মউল ও গুড় হইতে মণকরা প্রায় ১২।১৩সের ভাঁড় প্রমাণ-সুরা উৎপন্ন হয়। ৩০সের মউল ও ১০সের গুড় হইতে ২০সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া কঠিন নহে। আরাজেলায় মণকরা ২৫সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, এদেশের অধিকাংশ শৌণ্ডিকেরা যথোচিত পরিমাণে সুরা নিষ্কাশিত করিতে পারে না।

(৩) পৈষ্টী সুরা।—চাউল, যব, গোধূম প্রভৃতির পিষ্ট হইতে এই সুরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ বলেন—

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মদ্যং সুরা স্মৃতা।

বঙ্গদেশে ইহা ধেনোমদ নামে খ্যাত। ধেনোমদের একটা দুর্গন্ধ থাকে। 'ধেনো' নাম হইলেও ধান হইতে এই মণ্ড হয় না। এদেশে আতপচাউল এক্ষণে পৈষ্টীর উপকরণ। চাউলের সহিত দুইএকটা ধান্য মিশ্রিত থাকে বলিয়া পৈষ্টীর নাম 'ধেনো' হইয়াছে।

বিলাতেও যব, গোধুম, তণ্ডুল প্রভৃতি হইতে সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু সে দেশের অবলম্বিত ক্রম এদেশের ক্রম হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বস্তুত সে দেশের ক্রম ধরিয়া এদেশের পৈষ্টীর উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা।

ওড়িশায় নিম্নলিখিত ক্রমে পৈষ্টী সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে আতপচাউল উত্তমরূপে ধুইয়া ফুটন্ত জলের উষ্ণ বাষ্পে সিদ্ধ করা হয়। সিদ্ধ চাউল শীতল হইলে তাহার সহিত 'বাকর'নামক উদ্ভিজ্জপদার্থবিশেষ উত্তমরূপে মিশান হয়। এই চাউল একরাত্রি একটা ঝুড়িতে চাপা দিয়া রাখা হয়। এই সময় চাউল গরম হইয়া উঠে। পরদিন উক্ত চাউল বড় বড় পিষ্টকের আকারে মাটির উচ্চ মেজের সারি সারি করিয়া সাজান হয়। সেখানে দুইএকদিনের মধ্যে চাউল আবার গরম হইয়া উঠে, তাহাতে এক জাতীয় ছত্রাক (ছাতা) ধরে, এবং পিষ্টকসকল ('কলাইচ') কুৎসিত কৃষ্ণবর্ণ হয়। এ সময়ে ছত্রাকের ব্যাপ্তিবশত চাউল পিষ্টকের আকার ধারণ করে। তিনচারিদিন পরে পিষ্টকসকল তুলিয়া উপরি উপরি স্তূপাকার করিয়া রাখা হয়। এইভাবে চারিপাঁচদিন গেলে বড় বড় মটুকাতে পিষ্টক ও জল নিক্ষেপ করা হয়। পরদিন নূতন সিদ্ধ আতপচাউল পিষ্টকের সমপরিমাণে সেই মটুকায় ফেলা হয়। পুরাতন সঞ্চিত মদ্য কিংবা মদ্যবীজ যোগ করা হয় না। দুইএকদিনের মধ্যে জল ফুটিতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে ৭।৮দিনের মধ্যে সমুদয় চাউল গুলিয়া জলের মত হয় এবং ফুটা বন্ধ হয়। শীতকালে ২।৪দিন অধিক লাগে। এখন সেই মদ্য চোয়াইয়া লইলে সুরা পাওয়া যায়। একমণ চাউল হইতে প্রায় ২০সের ভাঁড়প্রমাণসুরা উৎপন্ন হয়।

বিলাতে যবকে জলে আর্দ্র রাখিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদন করা হয়। সেই যবে ক্লৈদবিশেষ জন্মে। তখন তাহাকে উত্তপ্ত ও শুষ্ক করিলে সেই ক্লৈদের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তদনন্তর সেই যব কিংবা সেই যবের সহিত অন্য যব বা তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে ফেলা হয়। এখানে যবশর্করাক্লৈদের ক্রিয়াবশত যব ও তণ্ডুলের শ্বেতসার যবশর্করায় পরিণত হয়। তার পর সেই জলে কোহলকিণ্ব যোগ করিলে শর্করা কোহলে পরিণত হয়।

এদেশের পৈষ্টী সুরার উৎপাদনে 'বাকর' এবং পিষ্টকে জাত ছত্রাক চাউলের শ্বেতসারকে যবশর্করায় এবং যবশর্করাকে কোহলে পরিণত করে। বোধ হয়, 'বাকর' শব্দ বাকল বা বল্কল শব্দের অপভ্রংশ। নানাজাতীয় গাছের বাকল ও শিকড় রৌদ্রে শুকাইয়া ও পরে গুঁড়া করিয়া আতপচাউলের গুঁড়ার সহিত মিশান হয়। তাহাতে গরমজল মাখাইয়া সমুদয় চূর্ণে ছোট ছোট পিণ্ড পাকান হয়। এই সকল পিণ্ড একদিন খড়ের মধ্যে রাখা হয়। তখন পিণ্ডসকল গরম হইয়া উঠে। পরদিন তৎসমুদয় রৌদ্রে শুকান হয়। এই সকল পিণ্ড 'বাকর'নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বাগ্‌দি ও শুঁড়িরা বাকর প্রস্তুত করে, ওড়িশায় করদরাজ্যের পার্ব্বত্যলোকেরা করে। বঙ্গদেশের বাকর শাদা,

ওড়িশার বাকর কালো। শুনা যায়, শতাবিকজাতীয় গাছ হইতে বাকর করা হইয়া থাকে। সে সকল গাছ কি, তাঁহা বাকর-বিক্রেতারা বলিতে চায় না। সে যাহা হউক, চাউল হইতে মদ্য করিতে হইলেই বাকর যোগ করা হইয়া থাকে। পচাই ও হাণ্ডিয়া করিতে লাগে, চাউলের সুরা করিতে লাগে। বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে গুড়ের সহিত চিঁড়া কিংবা চাউল যোগ করা হইয়া থাকে। সেখানেও বাকর লাগে।

বিম্‌স্‌সাহেব পচাই করিবার বাকরের কতকগুলি গাছগাছড়ার নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। * তন্মধ্যে দেখা যায়, কতকগুলি গাছ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়; যথা—কণ্টকারি, গোক্ষুর, অনন্তমূল, শতমূল ইত্যাদি। কতকগুলি কষায়; যথা—হরীতকী, কেন্দু, গামার, শোণা, সোদাল ইত্যাদি। কতকগুলি তিক্তদ্রব্য; যথা—ক্ষেতপাপড়া, নিম, বাসক, কুরচি, কালমেঘ ইত্যাদি। কতকগুলি ঘোর বিষ; যথা—চিতা, ধুতুরাবীজ, কুচিলাবীজ, সিদ্ধি ইত্যাদি। এই সকল গাছের গুণ স্মরণ করিলে মনে হয়, অনেকগুলি উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বাকরের প্রয়োজন হইয়াছে। (১) ভাতের সন্ধান উৎপাদন। সকলেই জানেন, গাছপালার ছাল ও শিকড় গুঁড়া করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহাদের সন্ধানজ বিকার শীঘ্র আরম্ভ হয়। কি কারণে হয়, তাহা এখানে বলিবার স্থান নাই। যে কারণেই হউক, ভাত রাখিলে তাহার বিকার জন্মিতে কালবিলম্ব হয়। (২) মদ্যের গুণবৃদ্ধি। ঔষধ যোগ করিবার উদ্দেশ্য এই। আয়ুর্বেদোক্ত মদ্যে এইরূপ ঔষধ যোগ করা হইয়া থাকে। (৩) পূতিনিবারণ। তিক্তদ্রব্য দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতি বিয়র্‌-নামক মদ্যে তিক্ত 'হপ্‌'নামক উদ্ভিদ যোগ করার উদ্দেশ্য এই। (৪) মাদকতাবৃদ্ধি। ধুতুরা, কুচিলা প্রভৃতি যোগ করিবার অন্য উদ্দেশ্য নাই।

বাকরের এই সকল উপকরণ দেখিলে মনে হয়, পচাই মদ্য করিবার সময় উহাদের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। পচাই চোয়ান হয় না, কাজেই তাহা শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুরায় সে আশঙ্কা কম। দ্বিতীয়ত পচাইর তীক্ষ্ণতা বা মাদকতা বৃদ্ধির চেষ্টা স্বাভাবিক মনে করা যাইতে পারে। কারণ সুরাতে যত কোহল থাকিতে পারে, 'পচাই'য়ে তত পারে না। কিন্তু ধুতুরা-কুচিলা যোগ করিয়া সুরার মাদকতাবৃদ্ধির চেষ্টা দুরাশা। কারণ মাদকদ্রব্য উদ্‌বেয় না হইলে সুরাতে গিয়া পড়িতে পারে না। বস্তুত মদ্যে ধুতুরা-কুচিলা মিশাইয়া চোয়ান হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক ওয়ার্ডেন্‌সাহেব সে সুরায় তাহাদের অংশ পান নাই। মদ্যে যোয়ান, মৌরী, মেথী, দারুচিনি, চন্দন, এলাচ প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যোগ করিয়া মদ্য এবং সুরা সুগন্ধ করা হইয়া থাকে। ইহাদের সার উদ্‌বেয়। কিন্তু বাকরের অনেকগুলি উপকরণ আদৌ উদ্‌বেয় নহে।

সুধার বাকরের উপকরণ জানা নাই। কিন্তু বোধ করি, ইহার উপকরণ এত অধিকসংখ্যক নহে। যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে,

* Vide appendix to the report of the excise commission 1883—84. Vol I.

তাহাতে বোধ হয় যে, উপকরণের মধ্যে কষায় এবং তিক্ত দ্রব্য থাকিলেই চলে। যেমন এক বিশল্যকরণী খুঁজিতে গিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বত আনিবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেকালের অনেক উপকরণে গন্ধমাদনের বহু উদ্ভিদ অনর্থক আসিয়া পড়িয়াছিল। এ কথা আধুনিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। তবে প্রশংসার কথা এই যে, নিরর্থক উপকরণ থাকিলেও ফলে প্রায় সমান দাঁড়ায়। যে ক্রমে পৈষ্টী সুরা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহার প্রত্যেক অনুক্রম আবশ্যক, সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত। এখানে সে বিজ্ঞানে প্রবেশ করিবার স্থান নাই, অধিকন্তু সাধারণ পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির প্রবল আশঙ্কা আছে। ফলে কি দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখাইয়াই নিরস্ত হইতেছি। শতভাগ চাউলে ৭৮ভাগ শ্বেতসার আছে। বিজ্ঞানের হিসাবে শতভাগ শ্বেতসার হইতে ৩৫ কি ৩৬ভাগ কোহলের অধিক আশা করিতে পারা যায় না। কেহ কেহ ৩১ ভাগকেই সীমা মনে করেন। তদনুসারে একমণ চাউল হইতে ২৫সের ভাঁড় প্রমাণসুরা পাওয়া যাইতে পারে। কটকে একমণ চাউল হইতে ২২॥৹সেরপ্রমাণসুরা পাওয়া গিয়াছে। মদ্যের সমস্ত কোহল চোয়াইয়া লওয়া হয় না। প্রায়ই ১॥৹সের ভাঁড় প্রমাণসুরা ফেলা যায়। অতএব দেশীয় পৈষ্টী সুরার উৎপাদনের ক্রম নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে।

নির্দ্দোষ না হইলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হইত। কারণ যে ব্যবসায় বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, তাহার দোষ গিয়া উন্নতি না হইয়া পারে না। তবে, সকল স্থলেই যে সম্ভাব্য উন্নতি লাভ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নহে। তথাপি স্থূলত বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে যে সকল পণ্যদ্রব্য বহুকাল হইতে উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানও তৎসমুদয়ের উৎপাদনে অধিক সুবিধা দেখাইতে পারে না। ঘরে বসিয়া অব্যবসায়ী হইয়া দেশীয় কলার কূট সমালোচনা করিতে অবশ্য পারা যায়। কিন্তু দেশকাল পাত্র, উপকরণ-আয়োজন-বিক্রয় প্রভৃতি চিন্তা করিলে উন্নতিমার্গপ্রদর্শন নিতান্ত দুরূহ।

সুরা যে কেবল পানের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে, এমন নহে। বার্নিশ ও গন্ধযুক্তিতে, ঔষধকরণে, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতিতে কোহল অত্যন্ত আবশ্যক। ত্রিবিধ সুরার উপকরণ ও কোহলপরিমাণ দেখিলে মাধ্বী সুরার উৎপাদনব্যয় অল্প। একমণ মউল ও একমণ চাউলের মূল্য কখন সমান হইবে না। অথচ উভয় উপকরণ হইতে প্রায় সমানপরিমাণে কোহল উৎপন্ন হয়। ধান্য অপেক্ষা যব মহার্ঘ এবং চাউলে যত শ্বেতসার আছে, যবে তদপেক্ষা কম আছে। এজন্য বিলাতে সুরার নিমিত্ত চাউলের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপত্তিতে বিলাতি হুইস্কি আমাদের পৈষ্টীর তুল্য। এদেশে পৈষ্টীর অভাব নাই, তথাপি দেশীয় ধনবান্ সুরাপায়ীর নিমিত্ত বিস্তর বিলাতি হুইস্কি এদেশে আসিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, সুরাব্যবসায়ে শিক্ষিত উদ্যোগী পুরুষ আবশ্যক হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

* এই প্রবন্ধসঙ্কলনবিষয়ে কটকের এক্‌সাইজ্‌ ডেপুটি কলেক্টর্‌ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এবং সেণ্ট্রাল্‌ ডিস্টিলারির সুপারিণ্টেডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ সেন লেখককে সবিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সফলতার সদুপায়।

ভারতবর্ষে পাঠশালা প্রভৃতিতে দেশীভাষায় যে শিক্ষা চলিতেছে, তাহার সংস্কারসাধনের জন্ত গবর্মেণ্ট বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। সহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, কৃষিপল্লীগুলিতে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা অনুপযুক্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল স্থানের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠ্যবিষয় সরল করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্ত গবর্মেণ্ট একটি কমিটি বসাইয়াছিলেন। পাঁচজন এই কমিটির সদস্ত;—তাঁহারা পাঁচজনেই গবর্মেণ্টকর্ম্মচারী; তাহার মধ্যে চারিজন ইংরেজ; যে একজনমাত্র বাঙালী ছিলেন, তিনি অনরেব্‌ল্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ তারিখে ভারতশিক্ষানীতিসম্বন্ধে গবর্মেণ্টের যে মন্তব্য বাহির হইয়াছে, কমিটি তাহারই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই—বিশেষভাবে চাষবাসের উপদেশ দেওয়াই যে গ্রাম্যস্কুলের লক্ষ্যহওয়া উচিত, তাহা নহে; পরন্ত সেখানে ছাত্রদের এমনভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্ চাষী এবং বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু ("observer, thinker and experimenter") হইতে পারে, তা সে যতই সামান্তভাবে হউক না কেন। সেই সঙ্গে, যে জমিদারকে খাজনা দেয় ও যে মহাজনের সঙ্গে শস্তের কারবার করে, তাহাদের হাত হইতে যাহাতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, এরূপভাবে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি অপরিচিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রীতিতে না হইয়া শাদাভাষায় লিখিত হওয়া উচিত এবং তাহার বিষয়গুলি গ্রাম্যজীবনযাত্রাসংক্রান্ত হওয়া চাই। এই সকল স্কুলে ব্যাকরণের প্রথম পরিচয়মাত্র ও শুভঙ্করীমতে অঙ্কশিক্ষা চলিবে। ছাত্রগণ গ্রামের ম্যাপ্ ভাল করিয়া বুঝিবে এবং হিসাবনিকাশের কাগজ বুঝিবার উপযুক্ত এমন কেজোরকমের শিক্ষা লাভ করিবে, যাহাতে পাঠশালাত্যাগের পূর্ব্বে গ্রাম্যহিসাবের সমস্ত মারপ্যাঁচসম্বন্ধে ওস্তাদ হইয়া বাহির হইতে পারে এবং তলবের খাজনার অঙ্ক বুঝিতে তাহাদের ধোঁকা না লাগে। চাষীদের জন্ত সরল, উপযুক্ত এবং কার্য্যকরধরণের স্কুল স্থাপন এবং প্রজাদের মধ্যে এইরূপ স্কুলের আদর জন্মানো ভারত-সরকার একটি সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারের মধ্যে গণ্য করেন।—

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, গবর্মেণ্টের উক্ত সাধু মন্তব্যের মধ্যে আমাদের পক্ষে সুদূর আশঙ্কার কারণ যে কিছু প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

পঞ্চায়তের চারিজন ইংরেজ ও তাঁহাদের

পশ্চাতে একজন বাঙালী মিলিয়া ভারত-সরকারের এই মন্তব্য হইতে দুইটি সংক্ষিপ্ত-সার মর্ম্ম উদ্ধার করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, গবর্মেণ্টের এই সকল বাক্য আলোচনা করিয়া কমিটি দেখিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বাংলার গ্রাম্যস্কুলগুলি প্রধানত দুই বিষয়ে দোষযুক্ত :—১। শিক্ষার প্রবাহ অতিরিক্ত দীর্ঘ, অতিরিক্ত অগ্রগামী, এবং অতিরিক্ত বিচিত্র; ২। পাঠ্যগ্রন্থগুলি জনসাধারণের ব্যবহৃত সরলভাষায় লিখিত নহে।

এ দুটি কথাও অত্যন্ত নিরীহ। যে দোষ বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতিকারও অত্যন্ত সোজা। আর কিছু নয়, চাষীকে সৌরজগতের বিবরণ না মুখস্থ করাইয়া তাহার গ্রামের ভূবৃত্তান্ত জানাইয়া দাও এবং ভদ্রপল্লীতে যেখানে সাধুভাষা তাহার "সুশীতল সমীরণ"-এর ষত্ব-ণত্ব-বিচার লইয়া ভদ্রসন্তানকে ঘর্ম্মসিক্ত করিতেছে, কৃষিপল্লীতে সেখানে "ঠাণ্ডা বাতাস" চালাইলেই ব্যাকরণের দুঃসহ তাপ নিবারণ হইতে পারিবে। পাঠ্যপুস্তক ত আজকাল সরকারী কারখানাতেই তৈরি হইতেছে, কলের চাপে রসকস সব বাহির হইয়া গেছে, এখন বড় কথা ভাঙিয়া ছোট কথা করাই বা শক্ত কিসের!

অতএব এ পর্য্যন্ত আমরা ভারত-সরকারের মন্তব্য এবং কমিটি-পঞ্চায়তের টিপ্পনী দিব্য নিশ্চিন্তচিত্তে পড়িয়া যাইতেছিলাম। মনে করিতেছিলাম, যে সকল খালবিলের মধ্যে বিদ্যার জাহাজ চলিবার পথ নাই, সে সকল জায়গাতেও বিদ্যার ডিঙি-ডোঙা চালাইবার এই যে ব্যবস্থা হইতেছে, ইহা বিদ্যোৎসাহী রাজসরকারের উপযুক্ত বটে।

তাহার পরে এই সঙ্কল্পিত গ্রাম্য প্রাইমারী স্কুলের চারি শ্রেণীতে কি কি বিষয় পড়ানো হইবে, তাহার তালিকা বাহির হইয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলেই খুসি হইয়াছেন।

তাহার পরে দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন—বাংলা নিম্ন প্রাইমারী স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ ন্যূনাধিক সংস্কৃতান্বিত (sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন সকল পরিভাষা থাকে, যাহা পল্লিবাসীরা বোঝে না। অতএব এই সকল স্কুলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্য কয়েকটি বিচক্ষণ কর্ম্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক্। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জুর করিলে কমিশনার সাহেব ও স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর-দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জ্জমা করিবার জন্য লোক নির্ব্বাচন করিবেন। ডিরেক্টর যে সকল বিচক্ষণের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন বোধ করিবেন, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া তর্জ্জমাগুলি মঞ্জুর করিয়া দিবেন।

এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে একটু হাসিয়াছিলাম। চাষাদের জন্য সহজ বইটি তৈরি করিতে হইবে, কিন্তু প্রণালীটি একেবারেই সহজ নয়। ইংরেজিতে বই লিখিয়া সেটাকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে জিনিষটা যে কিরকম সরল ও স্বাভাবিক হইবে, তাহা বুঝা শক্ত নয়। হইতে পারে, স্কুলের ইন্‌স্পেক্টরগণ একত্র

হইলে, বিশেষত কমিশনারসাহেবের মত অতবড় লোক যদি মনোযোগ করেন, তবে এই কঠিন কাজের জন্য ক্ষমতাশালী লেখক যথেষ্টপরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে, তাহার উপর আবার এই সকল সুযোগ্য লোকের রচনা পরীক্ষা করিবার জন্য, আর কেহ নয়, স্বয়ং ডিরেক্টরসাহেব যখন নিজের বিবেচনাশক্তি খাটাইয়া যোগ্যতর যাচনদার নিযুক্ত করিতে প্রস্তুত, তখন খুঁৎ থাকিবার কোনো সম্ভাবনা না থাকাই সম্ভব; কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করি, এত কেন? যেখানে সুগমতার জন্য সরকারবাহাদুর এত কাতর, সেখানে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য-সহকারে এমন দুর্গমপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে বসা কেন? না হয়, বইগুলি একেবারেই ভাষায় লেখা হইত! দেশী ভাষার অজ্ঞ সরকারবাহাদুরের মঞ্জুরির জন্য ইংরেজিতে লেখা চাই! এতবড় অক্ষমতার জন্য যদি সরকারের লজ্জা না হয়, তবে এতবড় অবিশ্বাসের জন্য তাঁহার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। অন্তত অনরেবল্ কে, জি, গুপ্ত মহাশয়ের মতও কি আর চারজনমাত্র বিশ্বাস-যোগ্য বাঙালী এই হতভাগ্য বাংলাদেশে জুটিত না—হায়, এদেশে সরকারবাহাদুরের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইবার কি কোনো সহজ উপায়ই নাই?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দশম প্যারাগ্রাফটি পড়িয়া মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম—তাহার প্রধান কারণ, মন তখনো নিশ্চিন্ত ছিল। এই প্যারাগ্রাফটিতে, পাঠ্য-গ্রন্থগুলি "local vernacular"এ তর্জ্জমা করিবার প্রস্তাব ছিল। কথাটি ভীতিজনক মনে হয় নাই—মনে করিয়াছিলাম, বাংলার "local vernacular" বাংলা, বেহারের বেহারী, উড়িষ্যার উড়িয়া।

অবশেষে একাদশ প্যারাগ্রাফে উত্তীর্ণ হওয়া গেল। প্যারাগ্রাফটি অত্যন্ত ছোট—সমস্ত রেজোল্যুশনের মধ্যে ইহার অপেক্ষা ছোট প্যারাগ্রাফ আর নাই। কিন্তু জগতে মারাত্মক জিনিষের যে খুব বড় হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা নহে—তীরের কাঠিটা যত বড়ই হোক, তাহার ফলাটুকু ছোট হইলেও হৃৎপিণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট।

এই ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন:—ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তকগুলি যথেষ্টপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিতভাষায় তর্জ্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। যথা, তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত তিন উপভাষায় তর্জ্জমা হওয়া চাই, ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্তত পক্ষে উত্তর, পূর্ব্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জ্জমা হওয়া উচিত হইবে।

এ সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্য নাই;—এই প্যারাগ্রাফটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়া পশ্চাতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে অন্তর্দ্ধান করিল। ইহার পরে অন্য কথার অবতারণা করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, দেখা গেল, চারিজন ইংরেজ এবং তাঁহাদের অনুগত একজন বাঙালি বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিপত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে "matter of great importance" গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।

প্রয়োজনীয়তার বিচার ভিন্নপক্ষ হইতে ভিন্নরকম আকার ধারণ করে। যে ব্যক্তি ঝোল রাঁধিয়া মাছ খাইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে মাছটাকে চারপাঁচটুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলা matter of great importance – কিন্তু মাছের পক্ষে কোনোমতে আগাগোড়া ল্যাজামুড়া আস্ত রাখিয়া চলাই matter of great importance। এইরূপ ভিন্নপক্ষের ভিন্ন লক্ষ্য থাকাতেই কমিটির নিকট যাহা এত বেশি প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে, আমাদের তাহাতে কিছুতেই উৎসাহবোধ হইতেছে না।

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু জগতে সকলের সব উপকার করা যায় না—সকলদিক্ সামঞ্জস্য করিয়া উপকার করিতে হয়। একতলার এমন উপকার করিতে বসা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভাল নয়। সরকারবাহাদুর যদি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাবিচ্ছেদ সুরু করিয়া দেন, তবে কৃষিপল্লীতে তাহার সূত্রপাত হইয়া দিনে দিনে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।

এ কথা বলা বাহুল্য, জাতীয় ঐক্যের প্রধান অবলম্বন ভাষা—পরস্পরের মধ্যে অন্তরের গতিবিধির ইহাই রাজপথ। ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতর গিরিসমুদ্র ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেখানে আবার যথার্থ বিচ্ছেদ নাই, সেখানেও যদি বিচ্ছেদ সযত্নে তৈরি করিয়া তোলা হয়, যাহা ভগ্ন তাহাকেও যদি জাঁতার মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ করিবার চেষ্টা দেখিতে পাই, তবে—তবে কি আর করিতে পারি, অন্তত দুইহাত তুলিয়া ব্রিটিশসরকারকে আশীর্ব্বাদ করিব না।

শান্তপ্রকৃতি লোকেরা বলিবেন, এখনি এত ভয় পাইবার প্রয়োজন কি? কেবল প্রস্তাবমাত্র হইয়াছে, এখনো ত পাকা হয় নাই।

কিন্তু সময় যে খারাপ, এ যে কালবৈশাখ। উত্তরপশ্চিমে প্রথমে অল্প একটুখানি মেঘ উঁকি দেয় মাত্র, তাহার পরে সামাল-সামাল করিতে করিতেই যে ঝড় আসিয়া পড়ে। এমন যে বারবার ঘটিতেছে। এই হতশ্রী দেশে মন্দ যদি একবার দেখা দেয়, সে যে আর যাইতেই চায় না; ম্যালেরিয়াই বল, প্লেগ্‌ই বল, আর অন্য যা-কিছুই বল, ছুটির সময় হইলেও আবার মেয়াদ বাড়াইয়া লয়। লক্ষ্মীই চঞ্চলা, কিন্তু অলক্ষ্মীর স্বভাবটা ঠিক যে তাহার উল্টা। তাই আশঙ্কা হইতেছে, কমিটির মন্তব্যের এই যে এগারো প্যারাগ্রাফটি, বুঝি বা ইহাকে ঠেলিয়া নাড়ানো সহজ হইবে না।

বিশেষত দেখা যাইতেছে, এটা একটা খাপছাড়া ব্যাপার নয়—আমাদের ভাগ্যগগনে ধূমকেতুর পুচ্ছটা হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার মুণ্ডটা পর্য্যন্ত সমস্তটা যেন ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—সুতরাং এখন ইহাকে স্বপ্ন বা মায়া বা মতিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বোঝা যাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে আমাদের

দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ সন্দেহ করাটা যে আমাদের চরিত্রগত দোষ, তাহা লইয়া কিছুদিন হইতে কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন। দোষ সংশোধন করা আমাদের পক্ষে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। বেদনা যেখানে, ভয় সেখানে বেশি, সুতরাং সন্দেহ সেখানে স্বাভাবিক। রাশিয়া একটু নড়িলে-চড়িলেই অমনি ইংরেজ সন্দেহ করেন, বুঝি ভারতবর্ষের দিকে সিঁধকাটি অগ্রসর হইতেছে—এ সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকেরা কতদিন তাহাকে কতই আশ্বাস দিয়াছে, কত ভৎর্সনা করিয়াছে, কিন্তু স্বভাব কিছুতেই যায় না—পতন্তি পতত্রে বিচলন্তি পত্রে শঙ্কিতরূপোপযানং—তাহার কারণ, এই সাম্রাজ্যটুকুর প্রতি ইংরেজের অত্যন্ত দরদ। আমাদেরও যেখানে দরদ, সেখানে আমরা তাঁহাদেরই মত দুর্ব্বল, সেখানে আমরা সতর্ক না হইয়া বাঁচি না। আজ সমস্ত য়ুরোপ পরস্পরের প্রতি সন্দেহে কামানে-বন্দুকে আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে—আর আমরা হীনশক্তি জাতি, প্রবল রাজার ইচ্ছাধীন হইয়া আছি, শুধু ইচ্ছাধীন নহে সন্দেহাধীন হইয়া আছি, আমরা মাঝে মাঝে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কাগজে লিখি ও সভা ডাকি, রেজোল্যুশন্ জারি করি ও মেমোরিয়াল্ পাঠাই মাত্র—তাহাতে জগতে ক্ষতিও কাহারো নাই, খরচও বেশি হয় না, ফলও অতি অল্পই পাওয়া যায়, লাঞ্ছনা যথেষ্টই ঘটে—তবু স্বভাব যায় না—যে স্বভাব প্রাচ্য-স্বভাব নহে, মনুষ্যস্বভাব।

স্নেহের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সন্দেহ করাটা কেবল যে স্বাভাবিক, তাহা নহে, তাহা কর্ত্তব্য। মাতা ছেলের গলায় সোনার কণ্ঠি পরাইয়া বাহিরে পাঠাইতে গেলে সন্দেহ করেন যে, যে ব্যক্তি পর, তাহার কাছে আমার ছেলের প্রাণের চেয়ে তাহার সোনার কণ্ঠি বেশি মূল্যবান্ মনে হইতে পারে। পরের প্রতি তাঁহার এই সন্দেহ অন্যায় হইলেও, অতিমাত্র হইলেও, ছেলের রক্ষার পক্ষে ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য। সরকারের সকল মৎলব যখন আমরা বুঝি না এবং বোঝা সম্ভবও নহে, তখন দেশের প্রতি মমত্ববশত মন্দটা সন্দেহ করিয়া বসা যে অন্যায় হয়, তাহা নয়। মনেই কর না কেন, তিব্বতীরা যদি তাহাদের দেশে ইংরেজের পরম বৈষ্ণবভাবের সাত্ত্বিক অভিযান peaceful mission এর কথা একেবারেই বিশ্বাস না করিয়া গোরাদের তরফে কিছু ক্রূর মৎলব ছিল, এইরূপই সন্দেহ করিয়া থাকে, তবে তাহাদের প্রাচ্য পূর্ব্বপুরুষ ধরিয়া তাহাদিগকে কটু কথা বলা কি সকলের পক্ষে মানাইবে? ব্যাধের নিরীহভাবে অত্যন্ত পা টিপিয়া-টিপিয়া চলা সত্ত্বেও সন্দিগ্ধ পাখী যখন উড়িয়া যায়, তখন শিকারী তাহাকে দুষ্ট বলিয়া গালি দেয় শুনিয়াছি—কিন্তু সে ব্যক্তি যদি ব্যাধ না হইত, তবে এত রাগ করিয়া পাখীকে গালি দিত না,—যে সকলপাখিকে বলিত, সন্দিগ্ধ সতর্কতা বেচারী পাখীর পক্ষে প্রাণরক্ষার একটা উপায়। বিশেষত এও একটা ভাবিবার কথা যে, পাখী যদি বলিষ্ঠ ও সতর্ক না হয়, তবে আজ যে ব্যক্তি ব্যাধ

নয়, কাজেই তাহাদের শিকার করিবার প্রলোভন জাগিয়া ওঠে।

যাই হোক, ভালই বল আর মন্দই বল, এই অতি ক্ষুদ্র একাদশ প্যারাগ্রাফটিতে আমাদের মনে বৃহৎ সন্দেহ জন্মিয়াছে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত-সরকারের ১৯০৪ সালের রেজোল্যুশনের অত্যন্ত সুকোমল খাবার মধ্য হইতে অস্ত্র এই যে কমিটির ক্ষুদ্র পঞ্চনখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য সাধু হইতে পারে, তবু আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না।

কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয় ত চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে সেই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন, সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত, যদি দেখিতাম কর্তৃ-পক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের শাস্ত্রে বলে, charity begins at home, বদান্যতা ঘর হইতে সুরু হয়—এ স্থলে ঘরের চেয়ে পরের প্রতি বদান্যতার আত্যাধিক্য দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইতেছি।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং সেখানে যে ভাষায় পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয়, তাহা সকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজের বাক্য উদ্ধৃত করিব। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমাদের আমেরিকান্ মিশনরিগণ যখন আমাদের বিদ্যালয় হইতে বাংলা পড়ানো উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন সেখানকার স্কুল-ইন্স্পেক্টর রবিন্সন্‌সাহেব তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই প্রতিবাদের এক স্থানে ল্যাঙ্কাশিয়রের চাষীদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া লিখিতেছেন :—

Is there not some difference between this language and that used by Johnson? The Orthography appears different, the grammatical forms are different; the vocables themselves, as here given, it would be impossible to find in any dictionary of the English language. * * * * Call this a distinct language, the vernacular dialect of the people, having more points of difference from, than of resemblance to, the language usually known as the English, and proceed to prepare school-books in it?

রবিন্সন্‌সাহেব এম্‌নিভাবে লিখিয়াছেন, যেন এ সম্বন্ধে কোনো তর্কই উঠিতে পারে না। বস্তুত আজিও ল্যাঙ্কাশিয়রের উপভাষায় ল্যাঙ্কাশিয়রের চাষীদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলণ্ডে চাষীদের শিক্ষা সুগম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ইংরাজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু, যে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অখণ্ডতারক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই—সুতরাং সেখানে ভাষাকে চারটুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ

ক্লেশলাঘব করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্রসম্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্যদেশে রাজপুরুষ ভাবিতেছেন চাষার পরিশ্রম বাঁচাইবার কথা, আর আমরা ভাবিতেছি সেই সঙ্গে ভাষার ঐক্য বাঁচাইবার উপায়;—যাহা এক ভাবনার অন্তর্গত হওয়া উচিত ছিল, তাহা দুইখানা হইয়া গিয়া বিপদ্ বাধিয়াছে। দুই পক্ষ যদি সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও আজ আমাদের এত উদ্বেগ জন্মিত না। আমরা জানি, গবর্মেণ্টের রেজোল্যুশন এবং আমাদের রেজোল্যুশনে বস্তু ও ছায়ার মত প্রভেদ—গবর্মেণ্টের রেজোল্যুশন্ আকাশের বজ্র আর আমাদের সভাস্থলের রেজোল্যুশন্ রঙ্গমঞ্চীয় বজ্রের ব্যঙ্গমাত্র—তবু, বিপদের সময়, যে ব্যক্তি অসহায়, সে খানিকটা ঝট্পট্ করিয়াও বাঁচে, আমরাও তাহাই করি—অতএব আসন্ন সঙ্কটের সময় আর কিছু না হয় ত একটা রেজোল্যুশন্ উত্থাপন ও একখানা মেমোরিয়াল্ পাঠাইবার উদ্যোগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু একটা কথা মনে হয় এই যে, আমাদের পক্ষ হইতে যিনি সভাস্থলে রেজোল্যুশন্ উত্থাপন করিবেন, তিনি তদুপলক্ষ্যে তর্কটা তুলিবেন কি? আমাদের তরফের কোন্ কথাটা তিনি পরিষ্কার করিবেন?

সেদিন লাটসাহেব পূর্ব্বদেশকে খোঁটা দিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বদেশের মনের ভাব পশ্চিমদেশ বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের বর্ত্তমানকালের কবিগুরু কিপ্লিঙের শাস্ত্র হইতে তিনি এই সারশিক্ষা উদ্ধার করিয়াছেন। যেখানে পরস্পরের মধ্যে এমনতর না-বুঝিবার সম্বন্ধ আছে, সেখানে শাসনকার্য্য চালানো কঠিন—এমন অবস্থায় আমাদের দুরবগাহ প্রাচ্যভাবগুলিকে যদি আমরা পাশ্চাত্যবুদ্ধির উপযুক্ত সুগম করিয়া না তুলি, তবে আমাদের পক্ষে বিপদ্।

কিন্তু যে আশঙ্কা মনে লইয়া আজ আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাচ্য দুর্বোধ্যতা ত লেশমাত্র নাই—এমন কিছুই নাই, যাহা আমাদের চেয়ে তাঁহারা কম বোঝেন। জনসাধারণের শিক্ষার উপসর্গ লইয়াই হৌক বা যে উপলক্ষ্যেই হৌক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্ত্তৃপক্ষেরা, এমন কি, তাঁহাদের বিশ্বস্ত বাঙালীসদস্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালই বোঝেন।

কর্ত্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের বাঙালি পারিষদ বলেন, তোমাদের সাহিত্যভাষা বড় বেশি Sanscritized—সংস্কৃতান্বিত। এইজন্যই কৃষিপল্লীর পাঠশালা হইতে তাহাকে নির্ব্বাসিত না করিলে, চাষার ছেলেদিগকে observer, thinker এবং experimenter বীক্ষণপর, মননশীল ও পরীক্ষাপটু করা যাইতে পারিবে না।

পূর্ব্বতন যুগে য়ুরোপে হঠাৎ যখন একসময়ে শিল্পসাহিত্যের একটা যেন বান আসিয়াছিল, সেই সময়কার য়ুরোপীয় নাম "রেনেসাঁস্"—সেই রেনেসাঁসের বন্যার মুখে ষোড়শ শতাব্দীতে বিস্তর লাটিনমূলক কথা ইংরেজিভাষায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার সহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির এরূপ আকস্মিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃতভাষার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্ম্মসাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবণ সংস্কৃত। পুরাণপাঠ, কীর্ত্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তর্জ্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের সাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের, ভাবসম্বন্ধের পথ চিরদিন অবারিত আছে। বর্ত্তমানকালেও দেশের বিদ্বানেরা যে ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, যে ভাষায় দেশের সমস্ত ভদ্রসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণা শক্তি, মননা শক্তি, পরীক্ষণা শক্তির সমস্ত ফলকে বিস্তীর্ণ দেশ ও বিস্তীর্ণ কালের জন্য স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিম্নসাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না। যদিও তিনি বাঙালি, এবং বাঙালি হইয়াও বাংলাদেশের ভাষাকে চারখানা করিবার জন্য ছুরি তুলিয়াছেন, এবং যদিও তিনি Brutusএর মতই honourable man, তথাপি তাঁহার হস্তে এই গুপ্ত আঘাত পাইবার কালে আজ তাঁহার মাতৃভাষা বলিয়া উঠিয়াছে—"Et tu Brute!" তুমিও গুপ্তমহাশয়!

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে মিশনরীদের সঙ্গে আসামে বাংলাভাষাপ্রচলন লইয়া তখনকার শিক্ষাবিভাগের বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে আসামে রাজস্ববিভাগের কমিশনার ছিলেন, ফ্রান্সিস্ জেঙ্কিন্স্। ইনি এই সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্মেণ্টের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই——"if in England it is now a matter of deep regret that we have so long neglected to teach our language to the Irish and Welsh, and thus made them one people with ourselves, it must be equally the policy and duty of the Government of India, by all means in its power, to assimilate the many nations and tribes under our rule into one people; and if the early introduction of Bengali into the lately-conquered Province of Assam has been in any degree productive of binding this people closer to the people of our earlier acquired Provinces, and of putting them on the same footing of civilization, I think the Government will have cause to rejoice at the chance or the necessity which led Messrs. Scott and Robertson to

adopt that as the official language of our Courts.

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ! নিতান্ত প্রাচীনকাল নয়, কিন্তু সে সময়ে কি সত্যযুগ ছিল! জেঙ্কিন্স্ সাহেবের এই পত্রাংশের মর্ম্ম অনুসারে এখনকার ভারতরাষ্ট্রনীতি বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইংরেজ কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তখনকার কমিশনারসাহেব ইংরেজশাসনে ভারতের বিচিত্রজাতিকে এক করিবার সঙ্কল্প গৌরবের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন; আর এখন এ কিরূপ নৈপুণ্যের সহিত যে সকল প্রদেশ এক, তাহাদিগকেও বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে!

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজরাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যসাধন-প্রক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাটবাজারের সৃষ্টি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্য পক্ষের ভালো কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম্ম, সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত— সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়— এবং—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই একপক্ষের সুবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্য্যয় আপনিই ঘটাইবে; নিরস্ত্র, নিঃসত্ত্ব, নিরন্ন ভারতের দুর্ব্বলতাই ইংরেজসাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু রাষ্ট্রনীতিকে বড় করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত লোভ যখন বেশি হয়, তখন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিরুদ্ধ—ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়—চিরদিন বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত, তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে দুর্ব্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জ্জীব করিয়া রাখা—এ বিশেষভাবে কোন্

সময়কার রাষ্ট্রনীতি, যে সময়ে ওয়ার্ড্স্বার্থ, শেলি, কীট্স্, টেনিসন্, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপ্লিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল্, রাস্কিন্, ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ আর নাই, একমাত্র জন্ মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্ল্যাড্ষ্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্ভ্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না,—একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্ব্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্য্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও দুঃসময় বলিব কি না বলিব, তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় দুঃখের দিনেই ভাল করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয়, তাহা দরখাস্ত দ্বারা হয় না; যাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, তাহার জন্য বাক্যব্যয় করিলে কোনো ফল নাই; এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই বিধাতা দুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বুঝিব, ততদিন দুঃখ হইতে দুঃখে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি, সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব,—যাহার দ্বারা তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে আশ্বস্ত হইবেন? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন, ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয়? যদি-বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন যে, এমন কথায় মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের নানাজাতির মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তি যথার্থভাবে, স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, সে পর্য্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয়স্বার্থের দিকে তাকাইয়া—সেই স্বার্থকে যত-বড় নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ই বল—যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারতরাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরঙ্কুশ উচ্চ-অঙ্গের ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কি জবাব আছে? এ কথাটা যে সত্য যে, আমাদের

দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান্, বলবান্ হইয়া উঠিতেছে; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্পে অল্পে সমাজের উচ্চ হইতে নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; যে সকল জ্ঞান, যে সকল ভাব কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামরসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালের মুখস্থকথামাত্র ছিল, এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায়, স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে! আমরা কি বলিতে পারি, না, তাহা হইতেছে না, এবং বলিলেও কি তাহাতে কাহারো চোখে ধূলা দেওয়া হইবে? জ্বলন্ত দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে, না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যস্রোতকে অন্তত চারটে বড়-বড় বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কি বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া পড়িবে। যখন বাংলাদেশকে দুই অংশে ভাগ করিবার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তখনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যখন বনস্পতির ডাল কাটে, তখন যদি বনস্পতি বলে, আহা, কি করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে! তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে, তাহা কি আমি জানি না, আমি কি শিশু! কিন্তু তবুও তর্কের উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি, পার্লামেণ্টেও তর্ক হয়, সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষের জবাব দেয়; সেখানে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুসি হয়। আমরা কোনোমতেই ভুলিতে পারি না,—এখানেও ফললাভের উপায় সেই একই।

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেখানে দুই পক্ষই যে বামহাত-ডানহাতের ন্যায় একই শরীরের অঙ্গ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেম্নি একই? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেখানে, আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে? তাঁহারা যে ডাল নাড়া দিলে যে ফল পড়ে, আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ সম্বন্ধে মিল্ কি বলিয়াছেন, স্পেন্সর্ কি বলিয়াছেন, সীলি কি বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার শিকিপয়সার লাভ নাই। প্রত্যক্ষশাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদূর তলাইবার দরকার নাই, নিজের মনের মধ্যেই একবার দৃষ্টিপাত কর না। যখন য়ুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তখন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেণ্ট আমাদের বিস্তার

উন্নতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন? কারণ লেখাপড়া শিখিয়া আমরা শাসনসম্বন্ধে অসন্তোষ অনুভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিখিয়াছি। মনেই কর, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেণ্ট্ আছে, সে দেশেও এডুকেশন্ বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল—কিন্তু দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য্য ফল এই যে, ইহার দ্বারা লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তিসম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এত-বড় বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কখনই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন-সম্বন্ধে পরস্পর ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতেহাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য্য করা একই।

আমাদের দেশে সে কথা খাটে না। কারণ, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম এবং আমরা কর্ত্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন—"সে কি কথা! আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর, আমাদের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না কেন! আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দনন্দনকে দুইবেলা দুধ দেয়, সেই দুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে সেই দুধের হিসাব তলব না করে? কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাত্মাই জানে এবং তাহার অন্তর্যামীই জানেন।

শাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে কর না কেন, ফরাসিরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো সুবিধা আদায়ের মৎলব করে, তবে ফরাসি-প্রেসিডেণ্ট্‌কে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশও শোনায় না—তখন ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্য তাহাকে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়—এই-জন্যই কৌশলী রাজদূত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জর্ম্মণি যখন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল, তখন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজরাজদূত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জর্ম্মন্‌রাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যেদিন মোগলসভায়, নবাবের দরবারে ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থব্যয়, বহু গুপ্তকৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জ্বালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য্য প্রসন্নতার সহিত গায়েই মিলাইতে হইয়াছিল, তাঁহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে সুযোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যম্ভাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মত নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা দেখিতে

হয়, তবে কি আন্দোলনের দ্বারাতেই তাহা সফল হইবে? যে দুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই দুধে আন্দোলন করিলে মাখন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাখনের দুধ রহিল গোয়ালবাড়ীতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতেও কি মাখন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী, তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন—আমরা ত কোনোরূপ সুযোগ চাই না, আমরা ন্যায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভাল। মনে কর, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ন্যায্যস্বত্বও যে দখলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে ত একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছে—তাঁহারা যে ন্যূনাধিকপরিমাণে ষড়্‌রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদ্বেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এদেশে আসেন নাই। তাঁহারা অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে-হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্যায়সংশোধনের সুন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবেন না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহস করেন না, জজের মন বুঝিয়া অনেকসময় ভাল তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেকসময় বিচারকের কাছে মৌখিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়—তাহার কারণ, জজ্ ত আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মনুষ্য। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্‌পাত করাও প্রয়োজন হইবে না?

কিন্তু আমাদের যে কি অবস্থা, কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদিবা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল্ কর্ত্তব্যক্ষেত্র যেন স্কুলবালকের ডিবেটিং ক্লাব্—গবর্মেণ্ট্ যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জবাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এখানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য্য নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

মনে করিয়াছিলাম, আমিও আজ ডিবেটিংক্লাবে দাঁড়াইয়া বাহবা লইব;—য়ুরোপের নানা ইতিহাস হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, জাতীয়মিলন ও সাহিত্যের একভাষা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় দিয়া দেশের ঐক্যচেষ্টাকে সফল করিয়া তোলে। গ্রাম আপনার সঙ্কীর্ণ ব্যবহারের জন্য যেমন স্বভাবতই আপন সঙ্কীর্ণ উপভাষাকে গড়িয়া তোলে, দেশ তেম্‌নি আপন বৃহৎ ব্যবহারের জন্য আপন সাহিত্যভাষাকে স্বভাবতই গড়িয়া তুলিতে থাকে। এক কুটীর হইতে আর এক কুটীরে, এমন কি, এক পল্লি হইতে আর এক পল্লিতে যাইবার জন্য রাজপথের প্রয়োজন না হইতে পারে—সেখানে মেঠো রাস্তা, পদচিহ্নিত পথই যথেষ্ট;—কিন্তু

যেখানে ব্যাপক বাণিজ্যের বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে, যেখানে দেশ হইতে দেশান্তরে, গ্রাম হইতে নগরে যাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে, সেখানে পাকা-রাস্তা, বড়-রাস্তা তৈরি না হইয়া থাকিতে পারে না। চাষাপাড়ায় বেড়া তুলিয়া-দিয়া পল্লিবাসীদিগকে এই পাকা-রাস্তার ব্যবহার হইতে নিরস্ত করিলে তাহাদের দুইবেলার ঘোরো কাজ, মেঠো প্রয়োজন যে একপ্রকার চলিয়া না যায়, তাহা নহে; কিন্তু দিনে দিনে চাষা বিষম চাষা এবং পল্লি ঘোরতর পল্লি হইয়া উঠিতে থাকে। বিলাতে দেখিতে পাই, কারখানার মজুরদিগকে শিক্ষিত সাধারণের সহিত সমান উন্নতির অধিকারী করিবার জন্য নানাপ্রকার শিক্ষার আয়োজন চলিতেছে। যদি তাহাদিগকে উপভাষা ও অপভাষার সীমার মধ্যেই বদ্ধ করিয়া রাখা হইত, তবে সুবিধার দোহাই দিয়া মস্ত একটা অসুবিধাকেই খাড়া করিয়া তোলা হইত না? একটা ভাষার জায়গায় চারটে ভাষা? কিন্তু এককেই যদি ত্যাগ করিতে হয়, তবে চারটেই বা কেন? চল্লিশটাই বা নয় কেন? কেবলমাত্র চারগুণ সুবিধায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া চল্লিশগুণ সুবিধাই বা ছাড়া যায় কেন?

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রণীত "সেকালের কথা" নামক একটি সুন্দর সচিত্র বই বাহির হইয়াছে। পাঠকেরা সেই গ্রন্থে একটি কিম্ভূতকিমাকার জন্তুর বিবরণ পাঠ করিয়া দেখিবেন, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম রাখিয়াছেন 'ষ্টাইগোসরাস্'। প্রকৃতি তাহাকে লইয়া এক অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার দেহাবশেষ হইতে প্রমাণ হইয়াছে, তাহার মাথায় যেমন একটা মস্তিষ্ক ছিল, তেম্নি তাহার কটিদেশেও একটা মস্তিষ্ক ছিল। তাহার উত্তমাঙ্গে এবং অধমাঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মস্তিষ্ক স্থাপন করিয়া এই জীবটির ল্যাজার দিকে অথবা মুড়ার দিকে যে বিশেষ একটা অসাধারণ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা মনে করি না। প্রকৃতি এই সমস্ত খেয়াল এখনকার দিনে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন জীবলোকে এক মস্তিষ্কেই তিনি ল্যাজামুড়া উভয়কেই চালনা করিয়া দিব্য সন্তুষ্ট আছেন। কিন্তু আমাদের কমিটির বিশ্বকর্ম্মা আমাদের নিম্ন অঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র মস্তিষ্ক যোজনা করিয়া আমাদিগকে আধুনিক জীবশ্রেণীর বাহিরে ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ অনাবশ্যক অমিতাচার আধুনিক কালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া নানা পুঁথিগত প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলাম।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কমিটিতে যে পাঁচজন যোগ্যলোক বসিয়াছিলেন, এমনতর ইস্কুলমাষ্টারি করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিবিদ্যাকে অপমান করিব কোন্ সাহসে? পেড্‌লার্‌সাহেব শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তা, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত উপদেশ দেওয়া আবশ্যক হইলেও তাহা অশিষ্টতা হইত। অনরেবল্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়কে সিভিল্‌সর্ভিসে প্রবেশ করিবার জন্য যে-পরিমাণ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মের পক্ষে তাহার অধিকাংশই অত্যাবশ্যক নহে—তবু গবর্মেণ্ট ব্যাবসায়িক প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশি বিদ্যা গুপ্তমহাশয়ের নিকট জোর করিয়া দাবি করিয়াছে

ছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার ক্লেশলাঘবের জন্য কোনো কমিটির পরামর্শ লইয়া কোনো সহজ উপায়ের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহাকে এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে গেলে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইবে যে, চাষাকে thinker, observer ও experimenter করিতে গেলে উপভাষায় কেবল গ্রামের গোটাকতক বিষয়েই তাহার জ্ঞানকে বদ্ধ করিলে যথেষ্ট হয় না। এ কথা শুনিতে স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু ইহা সত্য যে, মানুষের যতটুকু আবশ্যক, তাহার চেয়ে তাহার আবশ্যক আরো অনেক বেশি এবং সে যতটুকু পায়, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার পথ তাহার নিকট নিয়ত অবারিত রাখা প্রয়োজনীয়।

একটা কথা এই উঠিতে পারে, আমাদের দেশের চাষাকে মনুষ্যত্বের সমস্ত সুবিধা দিবার জন্য এত বাড়াবাড়ি করিবার দরকার নাই, আপাতত চাষাদের যতটুকু সুবিধা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহারি চেষ্টা করা যাক্‌। আচ্ছা, তার বেশি আর কাজ নাই। যেটুকু বিদ্যাতে তাহারা কেবল জমিদার ও মহাজনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে, সেই পর্য্যন্তই ভাল, বিদ্যা যতদূর বাড়িলে তাহারা একদিন পুলিস্‌ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতেও নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে পারে, ততদূর নাই গেল। কিন্তু জমিদার কোন্‌ ভাষায় কাগজপত্র রাখে? পাট্টা-কবুলতি লেখা হয় কোন্‌ ভাষায়? নগরবাসী জমিদারকে দরখাস্ত লিখিবার সময় কোন্‌ ভাষায় লিখিলে চাষার সুবিধা হইতে পারে? তা ছাড়া, চাষার কুটুম্বিতা যে তাহার গ্রামগণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে, এমন কোনো কথা নাই। এক জেলার চাষা তাহার ভিন্ন জেলার জামাতাকে কি ভাষায় পত্র লিখিবে? যদি বল, এখনি বা কয়জন চাষা পত্র লেখালেখি করে? নিজে না-ও করিতে পারে, কিন্তু সে যাহাকে দিয়া পত্র লেখায়, তাহার ভাষা, তাহার জামাতা যাহাকে দিয়া পড়াইয়া লয়, সে অনায়াসে বুঝিতে পারে। মনে কর, উত্তরদেশের পল্লিবাসী দক্ষিণদেশের সহরে চাকরি করে, সে বেচারা দক্ষিণদেশী মুহুরির সহায়তায় যে পত্র তাহার পাড়ার লোককে লিখিবে, পাড়ার লোকে সে পত্র স্পষ্ট বুঝিবার জন্য কোথায় ছুটাছুটি করিয়া মরিবে? সাহিত্যভাষা শিখিবার যেটুকুমাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রম, তাহার তুলনায় এই সমস্ত দেশব্যাপী নানা ছোট-বড় সম্বন্ধজালের ছেদসাধন যে কতবড় গুরুতর অসুবিধা ও অনিষ্টকর, তাহা কি সত্যই কমিটির পাঁচজন বুদ্ধিমানে বোঝেন না?

বোঝেন না বলিলে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হইবে এবং বোঝেন বলিতে গেলে কটুতর সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইবে, আমি ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত নহি। অতএব আমি ও পথেই যাইব না। আমি আজ আমার দেশের লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি—আমার যা-কিছু বক্তব্য, সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই সমস্ত বাদবিবাদের উন্মাদনায়, এই সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার এক-

দিনের জন্যও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জ্বালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে ? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন-- ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোট ছোট আঘাত নানাদিক্ হইতে আসিয়া পড়ে— হাতে-হাতে প্রতিশোধ বা উপস্থিত প্রতিকারের জন্য দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দ্দিকের ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যখন হঠাৎ এখানে বেদনা, ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনি তখনি সেটা নিবারণের জন্য রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জ্বালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে, তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেম্নি প্রত্যেক তাড়নার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই—কর্ত্তৃপক্ষের বর্ত্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথাতৃপ্তি, তাহাই ভোগ করিবার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হই নাই, আমি দুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশীলোকের কাছে উত্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে বারংবার ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জস্যবোধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক-শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্য উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধার-ক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি কোন্‌দিন কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেকবার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে ; দ্বিতীয়ত যেখানে বজ্রপড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই, আমার পরামর্শ, প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না ; তৃতীয়ত বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পাল্টা জবাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য ; যেখান হইতে বজ্র পড়ে, সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্রনিবারণের তাম্র-দণ্ডটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে

বিচারপূর্ব্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তুত আজ যে পোলিটিকাল্ প্রসঙ্গ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি, সেটা হয় ত সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ—কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আশ্চর্য্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাঁহার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম, তিনি সাড়া দিলেন না—অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলাম, ইঁহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আসিবেন,—তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি-বা দয়া করেন, তবু আশ্বস্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আসিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাত-নাগাদ সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড় অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। "সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আমার পাখা পোড়ানো উচিত নয়" বলিয়া পতঙ্গ যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাখা পুড়িবে। সে স্থলে ধর্ম্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্ত্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি শিথিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক স্ক্রুটো পেরেক ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক—পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—আমরা সূক্ষ্ম তর্ক করিতে এবং নিখুঁৎ ইংরাজি বলিতে পারি বলিয়াই যে ইহার অন্যথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক্, রাগারাগি করা চলে না।

মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিসাবের মধ্যে আনিয়া ব্যবসা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র খৃষ্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—আইনঘটিত ত্রুটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন্ সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দু ভ্রাতা আইনের বিরূপতাসত্ত্বেও তাঁহার ভ্রাতার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়া এই লাখটাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃসত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খৃষ্টানধর্ম্মের উন্নতির জন্য টাকা দিব কেন—আইনমতে যাহা আমার, তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিন্দা করিবার জো থাকিত না, কারণ সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবী খাটে না, সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্ত্বের জোরে যান, মহত্তের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিতদেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে সকল সর্ব্বসম্মত

অধিকার আছে, তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভাল বাগ্মী,—যদি বলিত, বিজিত পরদেশীসম্বন্ধে অল্প-সংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক-আশঙ্কা-বশত যে সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে, তাহা আমরা করিব না; যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্মেণ্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য, এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব; সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে; এদেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণই এ দেশবাসীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরদারি করিতে আসিয়াছি, এম্‌নিতর নিরাসক্ত-ভাবে কাজ করিয়া যাইব, তবে আমাদের মত লোককে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধূলি পড়িবে, ততকাল আমরা ধন্য হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই, তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন খাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক্, আমরা মুড়ি খাই, তোমরা চাহিয়া দেখ অথবা তোমরা চাহিয়া দেখ, আমরা মুড়ি খাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মানুষকে মানুষের হিসাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে—সেই হিসাবে যা পাই সেই ভাল; তাহার উপরে যাহা জোটে সেটা নিতান্তই উপরি-পাওনা, তাহার জন্য আদালতে দাবী চলে না, এবং কেবলমাত্র "ফাঁকি দিয়া" সেরূপ উপরি-পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে দুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোট। সুদূর য়ুরোপের নিত্যলীলাময় সুবৃহৎ পোলিটিকাল্ রঙ্গমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে—ফরাসি, জর্ম্মান্, রুষ, ইটালিয়ান্, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের সঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল—তাহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল্ ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-দ্বেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, সুতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্যই ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ পার্লামেণ্টের এমন তন্দ্রাকর্ষক;—ইংরেজ স্রোতের জলের মত নিয়তই এদেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এখানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহ্লাদ করে, সেও স্বজাতির সঙ্গে—এখানকার ইতিবৃত্তচর্চ্চার ভার জর্ম্মান্‌দের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জবানবন্দিসূত্রে, এখানকার সাহিত্যের

সহিত পরিচয় গেজেটে গবর্মেণ্ট-অনুবাদকের তালিকাপাঠে—এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোট, তাহা নিজের প্রতি মমত্ববশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেই-জন্যই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হই, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিস্ময়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্ত্তৃপক্ষগণ কখনো বা ক্রুদ্ধ হন, কখনো বা হাস্যসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি, ব্যাপারখানা এই—এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র, তাহার মর্ম্মান্তিক বেদনাকেও তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্টপরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর, তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার একটুখানি ম্যুনিসিপালিটি লইয়া, আমার এই সামান্য য়ুনিভার্সিটি লইয়া আমরা ভয়ে-ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য্য হইতেছি, এত কলরবেও মনের মত ফল পাইতেছি না কেন? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে, সেখানে যদি যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোট দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জ্জন্‌সাহেব অমন অত্যন্ত সহজকথার মত বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্রের মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন? সর্ব্বনাশ, আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়সম্ভাষণের মত শুনাইতেছে! এই, অষ্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল্‌ আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্য্যাপ্ত প্রেমের সঙ্গীতে সে আকাশ মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া নিজের রুটি পর্য্যন্ত দুর্ম্মূল্য করিতে রাজি হইয়াছে—তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড় অত্যুক্তিতে যদি কর্ত্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি! আমরা অষ্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্ত্তৃত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমনস্থলে ইম্পীরিয়াল্‌ বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্‌ কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জ্জন্‌সাহেব আমাদের সুখ দুঃখের সীমানা হইতে বহু উর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না; নিজের এতটুকু স্বাতন্ত্র্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছট্‌ফট্‌ করে কেন? এ কেমনতর—যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেখানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য মাল্য-সিন্দূরহস্তে লোক আসে এবং এই সাদরব্যবহারে ছাগের

একান্ত সঙ্কোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়—একি আশ্চর্য্য, এতবড় মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্যের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ, তাহা যে, সে একমুহূর্ত্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজ্ঞে আত্মবিসর্জ্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগ-শিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্ত্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিৎকর! ইম্পীরিয়াল্‌তন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার খরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লবনিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর জোগান দেওয়া! বড়য়-ছোটয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিসাব যখন এক খাতায় রাখা হয়, তখন জমার অঙ্ক এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এম্‌নিভাবে হওয়াই স্বাভাবিক—এবং যাহা স্বাভাবিক, তাহার উপর চোখ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, আমরা যখন ইংরেজকে বলিতেছি, "তুমি সাধারণ মনুষ্যস্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠ, তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে খর্ব্ব কর", তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, "আচ্ছা, তোমার মুখে ধর্ম্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ-মনুষ্য-স্বভাবের যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি, সেই কোঠায় তুমিও এস, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই—স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ কর—স্বজাতির উন্নতির জন্য তুমি প্রাণ দিতে না পার, অন্তত আরাম বল, অর্থ বল, কিছু একটা দাও! তোমাদের দেশের জন্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!" এ কথা বলিলে তাহার কি উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কি দিতেছি, কে কি করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের খবর লইতাম, তাহাও বুঝি—আলস্য-পূর্ব্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জ্জমা করি; ভাষাতত্ত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই; ঘরের পাশে কি আছে জানিতে হইলেও হাণ্টার বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষিসম্বন্ধে বল, বাণিজ্যসম্বন্ধে বল, ভূতত্ত্ব বল, নৃতত্ত্ব বল, নিজের চেষ্টার দ্বারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎসুক্যহীনতা-সত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনসম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্ত্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে, তাহার দায়িত্ব আছে, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই, এই উভয় পক্ষের মধ্যে কখনই যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না।

এক পক্ষে টাকা আছে, অন্য পক্ষে শুদ্ধমাত্র চেক্‌বইখানি আছে, এমন স্থলে সে ফাঁকা চেক্ ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না—ইহাতে পেটের জ্বালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, একএকবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল —কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হোক, আর নিঃশব্দেই হোক, গলাধঃকরণ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট্ সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড় কঠিন, তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্ব্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্য বৈদ্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ্ নিজেকে অর্জ্জন করিতে হইবে, নিজের সম্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নূতনত্ব কোথায়! পুরাতন কথা বলিতেছি,—এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব, আমি নূতন-উদ্ভাবনা-বর্জ্জিত,—এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, এ আবার তুমি কি নূতন কথা তুলিয়া বসিলে, তবেই আমার পক্ষে মুস্কিল—কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়! এমন কি, শুনিলে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশূন্য পদ্মার চরে অন্ধকার-রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে, সেই জানে, যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে, যেম্‌নি আলো হয়, অম্‌নি সেই মুহূর্ত্তেই নিজের ভ্রমের জন্য বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকাররাত্রি—এখন এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণ্যকথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন, তবে তাহাও সকরুণ-চিত্তে সহ্য করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা, তাহা নহে। আমাদের দেশে এমন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কি দিবেন, কাহাকে দিবেন, তাহার কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল

লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দ্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাইতেছি, সে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, সে কেবল আমাদিগকে সেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্য; আমাদের দেশে পরমুখাপেক্ষা কর্ম্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্য;—কোনো বিশেষ আইন রদ্ করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ প্রার্থনা সফল করিবার জন্য নয়, কোনো বিশেষ গাত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্য নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তখন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তখন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব, তাহাকে কার্য্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গভীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা ঐশ্বর্য্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা ঐশ্বর্য্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিদ্যাশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি, তবে আজ একটা বিঘ্ন, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্য যখন-তখন তাড়াতাড়ি দুইচারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টৌনহল্ মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই যে থাকিয়া-থাকিয়া চম্‌কাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্যকর হইয়া উঠিতেছে—আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যরক্ষা করা আর ত সম্ভব হয় না। এই প্রহসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেণ্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল—সেরূপ অভিমান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সম্বন্ধেই শোভা পায়। আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সদুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে—যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না, তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদানপ্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি, সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলি চাওয়া, আর এক পক্ষে কেবলি দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়? ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনোদিন নেবানো যায় না, সে ত শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতাভিক্ষুকের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায়, বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অমঙ্গল, দাতার পক্ষেও তেমনি অসুবিধা।

কিন্তু যেখানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়েরই মঙ্গল—সেখানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ন্যায্য হইয়া আসে এবং সকল কথাই আপোসে মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরূপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীনশক্তিতে দেশের মঙ্গলসাধনের উপায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অন্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের আকর। ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে চলে না, নিজেকেও একস্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদূর পাইবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত পাইতে পারি, যদি দেশকে আমাদের যতদূর পর্য্যন্ত দিবার, তাহার শেষকড়া পর্য্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে দুই পক্ষ আছে এবং দুই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না; কিন্তু তাই বলিয়া সকল কর্ম্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায়, তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত বাধা দেওয়া বড় শক্ত। এই মনে কর, স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন্ আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্ত্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কান্না! যাহা একজন দিতে পারে, তাহা আর একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে?

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে—কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি,—যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই; এজন্য গবর্মেণ্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না! তবে

চুলায় যাক্ স্বায়ত্তশাসন! তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই!

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে, গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব—তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না, যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, সে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।—তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ, কাড়িতেও ততক্ষণ—যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহমুক্তচিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক্ এবং কর্জ্জনও বাঁচিয়া থাকুন্!

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম্ম দিবে কে? কর্ম্মও আমাদিগকেই দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্ব্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জ্জীব দুর্ব্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম্ম দিবে, সেই আমাদের প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না,—যে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না, ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানে স্বদেশী বিদ্যালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্ত্তকার্য্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মঙ্গলকর্ম্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনই সন্তোষজনকরূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন, কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি দরখাস্তকাগজের নৌকা বানাইয়া সাতসমুদ্রপারে সাতরাজার ধন মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারো-কারো কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অনুরোধ করা কন্‌ষ্টিট্যুশনাল্ অ্যাজিটেশন

নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড় কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায়, তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি—তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমস্ত দায়কে হাল্কা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারি করিয়া তোলা কর্ত্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যখন বিচার করিব, তখন সমস্ত বাধাবিঘ্ন এবং মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অঙ্ককে যতদূর সম্ভব খাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টাদিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলা ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত সুবিধার খাতিরে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্য আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক-উত্তেজনা-মূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জব্দ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্ত্তব্য হইতে, সফলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যখন রাগ করিয়া মকদ্দমা করিতে উদ্যত হয়, তখন নিজের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলি উক্তবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে গিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড় হইয়া উঠে। যথার্থভাবে, গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মুক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্রুদ্ধ এবং উত্যক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়—ছোট কথাকে বড় করিয়া তুলি—প্রত্যেক তুচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসঙ্গত অমিতাচারের দ্বারা নিজের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধিই হয়—ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই সকল ক্ষুদ্রতা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—স্বভাবের দুর্ব্বলতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষের উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের প্রতিও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরস্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের দুই ভিন্ন শাখা। ইহার দুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের দুর্ব্বলতা, তাহাকে বড় নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ত্বনালাভ করিতেছি, তাহা নহে, গর্ব্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখ, মাতাকে

তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া সেই কার্য্যভার যদি অন্যে গ্রহণ করে, তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ্য হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশহিতৈষারও যথার্থ লক্ষণ, দেশের হিতকর্ম্ম আগ্রহপূর্ব্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনোমতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষা যে আমাদের দেশে সুলভ নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই, তাহা আছে ভান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কি আছে? এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষা আমাদের যথেষ্ট দুর্ব্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না—কারণ, সেরূপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই দুর্ব্বল দেশহিতৈষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দ্বারাতেই প্রেমের চর্চ্চা হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা সুযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে, যেখানে দেশ-জিনিষটা যে কি, তাহা ভূরিপরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতে হইবে না, যেখানে সেবাসূত্রে দেশের ছোটো-বড়, দেশের পণ্ডিত-মূর্খ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একস্থানে সংহত করিবার জন্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে একস্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ্ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যে একদিনেই হইবে—কথাটা পাড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারিদিক্ হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে খর্ব্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ সমস্ত কাজের লোকের গুণ—কাজ করিতে করিতে এই সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়—এই সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হোক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন সকল খাঁটিলোক, শক্তলোক যাঁহারা আছেন, যাঁহারা দেশের কল্যাণকর্ম্মকে দুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অনুভব করেন এবং সেই কর্ম্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দ্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্ত্তী সংসদ্‌কে ও সেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তৃত্বে বরণ করিতে

পারেন, তবে একদিন এই সংসদ্ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, সুবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা কেবল কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনি আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্ম্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে যাহাদের উদ্যম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জন্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষসম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব, অন্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি, অন্যে আমার প্রভু হইয়া বসিবে; আমি যদি শক্তি অর্জ্জন না করি, অন্যে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলি ফাঁকি দিই; তবে সফলতা অন্যের ভাগ্যেই জুটিবে—ইহা বিশ্বের অনিবার্য্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার দুর্ভাগ্য এই যে, তুমি আপনার সম্মুখে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু যদি তুমি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার, নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব, তবেই তুমি ধন্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্যত্বকে আবাহন করা, এই মহৎ সৃষ্টিকার্য্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে—এজন্য আনন্দিত হও! নিজের শক্তির প্রতি আস্থাস্থাপন কর, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধারক্ষা কর এবং ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিকশিক্ষা চারখানা করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা দুঃখের বিষয়—কিন্তু শুধু কি নিরাশ্বাস দুঃখভোগেই এই দুঃখের পর্য্যবসান? ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই? শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে দুইটুক্‌রা করিতে গবর্মেণ্ট্ পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না? বাংলাভাষাকে গবর্মেণ্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যসূত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না? এই যে আশঙ্কা, ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে? যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয়, তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না? সেই আমাদের সমুদয় চেষ্টার সম্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমুদয় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সমুদয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই! আমাদের কয়েকজনের চেষ্টাতেই সেই

বৃহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা দুরূহ, তাহা অসাধ্য, এই বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এপর্য্যন্ত আমরা ফুটা-কলসে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেইজন্যই বারবার আক্ষেপ করিয়াছি,—এদেশে কাজ করিয়া সিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজিভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছি,—দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরূপ উদাসীন কেন? ইংরেজিভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন্ পাস্ করিয়াছি, অথচ দুঃখ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্যবোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন? পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তাহার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি,—এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন? একবার যথার্থ কর্ম্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক্, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক্, তাহার পরেও যদি সফলতালাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

সঙ্কটকে স্বীকার করিয়া, দুঃসাধ্যতাসম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই দুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্ম্মে দুর্গমপথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি সেই বীরযুবকদিগকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—রাজদ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয়শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে, সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু খনি আমাদের দেশের মর্ম্মস্থানেই আছে—যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি, তাহাদেরই নির্ব্বাক্ হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিম্নতম গুহার গভীরতম ঐশ্বর্য্যলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে?

একটি বিখ্যাত সংস্কৃতশ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্ত্তিত অনুবাদদ্বারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি :—

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি পরে জানি
কমলা সদয়।
পরে করিবেক দান এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিস্মরি কর পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

এপার-ওপার।

আমি এপারের তীর, তুমি ওপারের
মাঝখানে বয়ে যায় নদী ;
আমি হেথা পড়ে' আছি, তুমি আছ হোথা
কি অন্তর মাঝে নিরবধি।

নরনারী নিয়ে নিত্য খেয়াতরীখানি
পারাপার করে আনাগোনা ;
তাই সে তোমার সাথে, এতদূর থাকি
চিরদিন তবু জানাশোনা।

এপারের যাহা কিছু পাঠায়ে ওপারে
আপনি কৃতার্থ ধন্য হই ;—
ওপারের পদধ্বনি শুনিবার লাগি
রাত্রিদিন সচকিত রই ;

তুমি ছাড়া আমি মিথ্যা, আমি ছাড়া তুমি
দু'য়ে তবে এপার-ওপার,
দেওয়া-নেওয়া, জানাশোনা, আনাগোনা দিয়ে
সার্থকতা তোমার আমার।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী